আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

REFERENCE

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

RETROCONVERTED
B C. S. C. L.

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দেস্ট্রীট, কলি-৭৩

—একশ পঞ্চাশ টাকা—

সম্পাদনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন—অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রণ—সানলিথোগ্রাফী

BCSC
Audio Library
Lib. Fin. Corp. No. 3126
Lib. Fin. Com. M.R. No. 12465

ASHUTOSH MUKHOPADHAYA RACHANAVALI VOL II

An anthology of complete works of Ashutosh Mukherjee Vol II

Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt Ltd
10 Shyama Charan Dey Street. Calcutta - 700 073

Price Rs 150/-

I S B N 81-7293-225 1

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও এস সি অফসেট, ৩০/২বি হরমোহন ঘোষ লেন,
কলকাতা-৭০০ ০৮৫ হইতে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	পবিত্র সরকার	[১]
উপন্যাস		
পঞ্চতপা	....	১
বাজীকর	....	২৩৭
বকুলবাসর	....	৪৩৭
গ্রন্থ-পরিচিতি	....	৫২৯

মুখবন্ধ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত একমাত্র লেখক, যাঁর লেখা আমি পড়বার আগে 'দেখা'র সুযোগ পেয়েছিলাম, চলচ্চিত্র হিসেবে। অসিত সেনের অত্যন্ত সুশৃঙ্খল পরিচালনায় দুটি অসাধারণ চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল—'চলাচল' আর 'পঞ্চতপা' ; এবং আমরা অনেকেই চমকে ভেবেছিলাম যে, কে এই লেখক যাঁর গল্প এমন মনোরম ও সুগঠিত, এবং তখনকার চলচ্চিত্রধারায় অবশ্যই ব্যতিক্রমী—ছবির জন্ম দিতে পারল ! সাধারণভাবে বিদেশী ছবি যেমন well-made হয়, তেমনই এ দুটি ছবির বাঁধুনিও ছিল অসম্ভব ভালো, এবং লেখকের সুসংবদ্ধ গল্পের সমর্থন ছাড়া ও-ধরণের ছবি হওয়া কঠিন ছিল—একথা পরিচালকের কৃতিত্বকে বিন্দুমাত্র গৌণ না করে বলতে পারি।

সেই ছবি দেখেই মনে হয়ে গেল, এই লেখক অন্যদিক থেকেও ব্যতিক্রমী, কারণ বাঙালির মানসভূগোলকে তিনি অনেকটা বিস্তারিত করার ইচ্ছা নিয়েই যেন আসরে নেমেছেন। পরে তাঁর অন্যান্য বই পড়ে এই মানচিত্রবিস্তারের বৈশিষ্ট্যটা আর একটু পরিষ্কার হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক বা অনুজ অনেক লেখক different places, different people-দের নিয়ে গল্প লিখেছেন, তাঁদের ব্যাপক অভিজ্ঞতার সূত্রে। আসামের অরণ্যচারী, বিহারের উত্তর দক্ষিণের বঞ্চিত কৃষক ও অন্ত্যজ শ্রেণী, দক্ষিণভারতের তামিলনাড়ুর ধীবর সম্প্রদায় বা কোনো সমুদ্রবিচ্ছিন্ন সুদূর দ্বীপের মানব-মানবীর দলকে নিয়ে, কিন্তু আশুতোষ, তাঁর উপন্যাসে অন্তত, নতুন ভৌগোলিক ও মানবিক পটভূমিকায় প্রধানভাবে দেখেছেন বাঙালিদেরই। নিশ্চয়ই বাঙালি ছাড়াও অন্য চরিত্র এসেছে, সেদিক থেকে তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিকেও রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে "চরিত্রচিত্রশালা" বলা অবশ্যই যায়। কিন্তু সেই অ-বাংলা প্রতিবেশ এবং অ-বাঙালি চরিত্রের বর্ণাঢ্য প্রেক্ষাপটে আশুতোষ মূলত লক্ষ করেছেন বাঙালি ছেলেমেয়েদেরই ; তারা কেমন করে বদলায়, চেনা ও অচেনার মধ্যিখানে তারা কতটা ভিন্ন হতে হতে কতটা বাঙালি থেকে যায়। গল্পের সীমাবদ্ধ পরিসরে অবশ্য 'অন্য স্থান অন্য মানুষ' একাধিক ক্ষেত্রে পুরো জায়গা দখল করেছে।

বলা বাহুল্য, 'চলাচল', 'পঞ্চতপা' আশুতোষের ক্ষেত্রেও দুটি ভিন্ন ধরণের উপন্যাস। কিন্তু এই লেখকের একটা বলিষ্ঠ প্রবণতা প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়—সাদামাঠা মধ্যবিত্ততার গল্প তিনি যেন অনেকটা এড়িয়ে যেতে চান। গ্রামীণতাও তাঁকে খুব একটা আকর্ষণ করে না, যদিও গ্রামীণ জীবনে স্থাপিত কাহিনী তাঁর আছে 'শতরূপে দেখা' বা 'মানুষের দরবারে', এবং আধুনিক নাগরিক মধ্যবিত্তের সমস্যা তাঁর 'সাত পাকে বাঁধা' উপন্যাসে মর্মগ্রাহী হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তবু ল্যাবরেটরি,

শেয়ারমার্কেট, বিমান-চালনা, বাঁধ তৈরি ইত্যাদি নতুন নতুন পশ্চাৎপটে তাঁর নায়ক-নায়িকাদের স্থাপন করে তিনি বাঙালি চরিত্রগুলিকেই যেন নতুন নিরীক্ষার অধীন করেন, এবং স্বাধীনতার পরে ধীরে ধীরে ভারতীয় নাগরিকের জীবনে জীবিকা ও উদ্যোগের যে বিস্তার ঘটছে, তার পরিবর্তমান এবং ব্যস্তসমস্ত ছবিটি আমাদের জন্য ধরে রেখে দেন। এই অর্থনৈতিক (বিশেষভাবে অর্থনৈতিক), ফলত সামাজিক ও পরিবেশগত সচলতার মধ্যে কতকগুলি মানুষ যেন স্রোতের পক্ষে ও বিপক্ষে সাঁতার দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এভাবেই তাদের জীবন নির্মিত ও ক্ষয়িত হয়ে চলেছে। রুদ্ধশ্বাস এই গতিবেগ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের এক বড় চরিত্র।

২

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় আশুতোষের সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। বর্তমান ক্ষেত্রে এই আলোচকের কর্তব্য পূর্বনির্ধারিত—কেবল এ গ্রন্থবদ্ধ তিনটি উপন্যাসের আলোচনা—'পঞ্চতপা', 'বাজীকর' এবং 'বকুলবাসর'। এই তিনটি উপন্যাসকে—প্রথম দুটি যথাক্রমে ২৮৪ ও ২৫৪ পৃষ্ঠার এবং তৃতীয়টি ১০৬ পৃষ্ঠার—পাশাপাশি রাখলেই বোঝা যায়, আশুতোষ নিজের কাজের পুনরাবৃত্তি বা পুনরনুসরণ কী সযত্নে এড়িয়ে যান। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন নতুন মানুষ ও পটভূমিকা সন্ধান করেন ; এবং তাঁর সন্ধানও কত বিচিত্র। 'পঞ্চতপা'-তে আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকে একটি মেয়ে, ওই উপন্যাসের নায়িকা সান্ত্বনা ; 'বাজীকর'-এ সেই নজর টানে নায়ক গুণীডাটা, আর 'বকুলবাসর'-এ প্রথমাংশে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এক বিচিত্র মানসিকতাগ্রস্ত বৃদ্ধা—মিষ্টিমাসি, পরে কমলেশ ও দেবযানীর পরস্পরের কাছে আসার মিষ্টি রোমান্টিক আখ্যান।

উপন্যাসের আয়তন, পটভূমিকা, সময়ভিত্তি ইত্যাদি যেমন বদলে যায়, তেমনই বদলে যায় তার আলোকসম্পাতের বৃত্তগুলি। এবং এটা খুব দ্রুত আমরা বুঝতে পারি যে, 'মেজর' হোক 'মাইনর' হোক—যে-কোনো উপন্যাসেই আশুতোষ গল্প বলেন অতিশয় দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। পাঠককে সরল ও প্রত্যাশিত পথে এগিয়ে না নিয়ে গিয়ে কাহিনীতে নানা বক্রতা ও ব্যাঘাতের সৃষ্টি করেন, এবং অন্তত বড় উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে আগে থেকে কিছুতেই আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে গল্পের শেষটায় কী দাঁড়াবে। কখনও কখনও মনে হয়, শেষটা যে এরকম হল তার কোনো পূর্বসূত্র কি লেখক আগে রেখে গিয়েছেন—'পঞ্চতপা'-য় সান্ত্বনার মৃত্যু যেমন ? থাকে হয়তো দু'একটি সূত্র, তা যথেষ্ট কিনা তা নিয়ে লেখক ও সমালোচকের মধ্যে মতপার্থক্য তৈরি হতেই পারে। কিন্তু গল্পের মধ্যে যে একটি দুর্ধর্ষ গতি তৈরি হয়ে যায় এবং পাঠক যে তাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আশুতোষ শুধু পরিবেশ ও জীবনের চিত্রকর নন, সুনিপুণ কথকও বটে। এবং তাঁর বড় উপন্যাসগুলিতে প্রায়ই একটি বড় সন্ধান তৈরি হয়ে যায়, তা কখনও যদি-বা বড় নৈতিকতা বা অস্তিত্বের সংকটের জায়গায় সবসময় পৌঁছে নাও যায়, নিছক গল্পের

জগতে কখনওই তা সীমাবদ্ধ থাকে না। সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কোনো একটা সন্ধান বা রহস্যের ইঙ্গিতে পাঠককে নিয়ে যান তিনি।

৩

'পঞ্চতপা'-তে নায়িকা সান্ত্বনা যে প্রচলিত অর্থে নায়িকা নয়, তা একেবারে প্রথম থেকেই চোখে পড়ে। মানুষের যৌবনে শারীরিক-মানসিক নানা পরিবর্তনের ফলে নর ও নারীর পরস্পরের মধ্যে জৈবিক ও আত্মিক যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র খেলার সুযোগ তৈরি হয়, এ উপন্যাসে সান্ত্বনা প্রকাশ্যভাবে তার বাইরে থেকে যায় এবং তার বিবর্তন ও উপসংহার সেই বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। তার নিজের যৌবন তার ক্ষেত্রে শুধু যৌবন-সংক্রান্ত কোনো প্রত্যাশা বা স্বপ্নের, এবং পরিণামী জটিলতার জন্ম দেয়নি। বাদল গাঙ্গুলি সম্বন্ধে তার মনোভাবকে যদি বা এক ধরণের প্রেম বলাও যেতে পারে, তা তার চরিত্রের মূল প্রবর্তনা নয়।

এই মূল প্রেরণা বা প্রবর্তনার জায়গাটিতেই আশুতোষ বেশ অভিনবত্ব এনেছেন। সান্ত্বনার মূল সন্ধান—তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর তৃষ্ণা মিটুক, মড়াইয়ের বাঁধ রুক্ষ ভূখণ্ডে স্নিগ্ধ, শীতল গভীর জলাশ্রয়ের সৃষ্টি করুক, মাটি ও চারপাশের ওই মাটির মতোই শুষ্ক, জীবনের কাছে উঞ্ছবৃত্তি-করা মানুষগুলির জীবন সজল ও প্রাচুর্যময় হয়ে উঠুক। বস্তুতপক্ষে বাঁধ তৈরির বিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বাদল গাঙ্গুলি ও নরেন চৌধুরী যদি জড়িয়ে গিয়ে থাকে ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও চ্যালেঞ্জের সূত্রে, অন্য অনেকে যদি জড়িয়ে থাকে নিছক জীবিকার সূত্রে, সান্ত্বনা একে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নেয় আরও গভীর এক আত্মিক অন্বেষণ থেকে। মানুষের বাঁচার জন্য চাই বৃষ্টি, চাই জল—এক বৃষ্টিহীন জলবিরল শুষ্ক শৈশব যেন সান্ত্বনার মধ্যে সেই প্রবল এক আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছে, যার কাছে তার শরীরের অন্য সব আকাঙ্ক্ষাও তুচ্ছ হয়ে গেছে। তার এই শৈশবের একটি টুকরো লেখক আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন—

> "বুড়ী ঠাকুমা সকাল থেকে কি একটা যজ্ঞ শুরু করিয়েছে খোলা বাইরে। আকাশের নিচে কাঠফাটা রোদ্দুরে। কাঠ, শুকনো পাতা, ঘি, পুরনো কাপড়, সব এনে ফেলা হচ্ছে সেই আগুনে। দমবন্ধ ধোঁয়ায় একাকার হয়ে যাচ্ছে চারদিক। আর সেখানে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে বুড়ী। শাস্ত্রকারের ভাষ্য, ধোঁয়ার জ্বলুনিতে আর সেই সব-জ্বালানো সূর্যের তাতে চোখ দিয়ে যে জল ঝরবে তা মাটিতে ফেললে মাটি শীতল হবে। চোখের জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠবে, তারপর বৃষ্টি হয়ে মাটিতে ঝরবে।"

সান্ত্বনার মনে আছে শৈশবে শোনা ছড়া—

চোখের জল আকাশে যা,
যাগের ধোঁয়া আকাশে যা,
সেথায় গিয়ে মেঘ হ',
সূয্যি ঢেকে মেঘ হ'।

শুকনো মড়াইয়ের খাতকে নিয়ে নতুন আর-এক যজ্ঞ চলছে, বুলডোজার—ক্রাশার—ডিনামাইট—চার্নিং মেশিন—কংক্রিট মিক্সার—বাকেট—কেজ—ক্রেন—ব্লাস্টিং—সাইরেন—ট্রাক আর কোয়ার্টারের পৃথিবী, এবং চিফ এঞ্জিনিয়ার-ড্রাফ্টসম্যান-ওভারসিয়ার-কুলিকামিনের নতুন জগৎ এই যজ্ঞের আয়োজক। সান্ত্বনা সম্ভবত ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে এই যজ্ঞের অগ্নিশিখা, কিন্তু সে নিজে তা কতটা জানে সন্দেহ। সে এই কর্মযজ্ঞের আত্মা বলেই এতে বাধা ঘটাতে পারে এমন কিছু সে সহ্য করতে পারে না। বাদল গাঙ্গুলির "কাজের মোহ যাতে না ভাঙে শুধু সেই জন্যেই নীলাকে "মিছে কথা বলে" সে তাড়ায়। তাকে আমার খানিকটা 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর মতো মনে হয়, যে যক্ষপুরীতে এসে একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড শুরু করেছে, সকলকেই কোনো-না-কোনো ভাবে চঞ্চল করে তুলেছে, কেউ প্রকাশ্যে, কেউ প্রচ্ছন্নভাবে তার আকর্ষণের মায়ায় আন্দোলিত, কেউ-বা তাকে ধ্বংস করবার জন্য তৈরি হয়ে যায়। তার শারীরিক অস্তিত্ব নিয়ে কেউ চক্রান্ত সংকুল, কেউ তার আকাঙ্ক্ষাটিকে বুঝতে চায়, কেউ তার স্নিগ্ধ মনের প্রশস্ত আশ্রয়ে থাকতে বা ফিরে আসতে চায়। ফলে উপন্যাসের বাকি প্রায় সব চরিত্রই তাকে ঘিরে ব্যাপৃত, কিন্তু সে অন্য একটা স্বপ্নকে লালন করছে। আশুতোষের প্রথমদিককার এই প্রধান দুটি উপন্যাস, অর্থাৎ 'চলাচল' ও 'পঞ্চতপা'য় দুটি নায়িকাই যৌবনধর্মের দ্বারা আবিষ্ট বা আপ্লুত নয়, অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা বা 'মিশন' তাদের পৃথক করে দেয়। যে 'সেক্স' আশুতোষের শেষদিককার উপন্যাসগুলিতে একটা বড় জায়গা নিতে চেয়েছে তা এ দুটি উপন্যাসে প্রায় অনুপস্থিত, অন্তত প্রধান চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে সেটা তত তীব্রভাবে উপস্থিত নয়। সান্ত্বনার মধ্যে তার কোনো সচেতনতা নেই বললেই চলে, অন্য অন্য প্রধান চরিত্রের ক্ষেত্রে তা ব্যঞ্জনায় যতটা, ঘটনায় ততটা নয়, নরেনের মুহূর্তের বিচলনটি ছাড়া।

সান্ত্বনা ছাড়াও অবশ্য অনেক চরিত্র আছে উপন্যাসে। আছে বাদল গাঙ্গুলি-নীলার উপকাহিনী, যা অতীত থেকে এসে বর্তমানের উপর অভিঘাত নিক্ষেপ করে, আছে হোপুন আর চাঁদমণির বিষাদজনক গল্প, আছে ভিলেইন কন্ট্রাক্টর, সেই সঙ্গে সরল সাঁওতাল জীবনযাত্রা এবং 'সভ্যতা'-র আক্রমণে তাদের কেন্দ্রচ্যুত হওয়ার সমবেদনাপূর্ণ বিবৃতি। আমি মনে করি না অন্য সব ঘটনা, আখ্যান বা চরিত্র, বহুদর্শী লেখকের কলমে আকর্ষক হয়ে উঠলেও, সেভাবে অভিনব হয়ে উঠেছে এই গল্পে। বরং এ গল্পের মূল টান তৈরি করছে পটভূমি-বদ্ধ এর কর্মযজ্ঞ এবং সান্ত্বনা। বস্তুতপক্ষে একে অন্যের পরিপূরক, এবং কর্মযজ্ঞের আহুতি হয়েছে সান্ত্বনা, তারই আত্মদানে এ যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হয়েছে। সে একই সঙ্গে এই যজ্ঞের সমিধ ও শিখা।

এ উপন্যাসে লেখকের গল্প বলার ভঙ্গিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাটকীয় সংঘাত তিনি যথাসম্ভব পরিহার করতে চান, প্রবল কোনো নাটকীয়তার পরিস্থিতি হলে তা টপকে গিয়ে ইঙ্গিতে ঘটনাটা আগে ঘটে গেছে তা বোঝাতে চান, কিন্তু স্পষ্ট নাটকীয়তা সৃষ্টি করেন খুব কম। এমন অবশ্য নয় যে, তিনি প্রাবন্ধিকের মতো উপন্যাস লিখছেন, ঘটনার 'স্বাভাবিক' নাটকীয়তা এড়িয়ে যাচ্ছেন। উপন্যাসের প্রথম তিন-চারটি প্যারাগ্রাফেই ছোট ছোট বাক্যে পাহাড় ফাটানোর কর্মকাণ্ডের চমৎকার নাটকীয়তা

তিনি তুলে ধরছেন। ছোট ছোট বাক্য এই নাটকীয়তাকে ব্যাখ্যা করেছে, তার উপর মন্তব্য ও তুলনা এনেছে, এবং বাক্যের দৈর্ঘ্য কম বলেই নতুন নতুন সংবাদ বা information যেন পাঠকের উপর দ্রুত এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ; যেমন এই বর্ণনায়—

> "যুগ যুগ ধরে মরে আছে বলেই তো মড়াই। ঘরে সকলকে মারছে বলেই তো মড়াই! আগে কি একটা নাম ছিল যেন নদীটার। সেই নামও মরেছে।
>
> বর্ষার জল আসে বটে খানিকটা। আর দু'পাঁচ বছর অন্তর অন্তর দু'কূল ছাপিয়ে বন্যাও হয় এক একবার।"

এই যে কাটা-কাটা সব সংবাদ, ছ-টা বাক্যের প্রত্যেকটাতে শব্দের ভঙ্গিময় পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও আলাদা-আলাদা করে ছ-টা সংবাদ বা মন্তব্যই বসানো হয়েছে, তার জন্য ছ-টা বাক্য দরকার ছিল না। সংযোজক ব্যবহার করে একটা বা দুটো যৌগিক বাক্যেই সমস্ত সংবাদগুলি ঢেলে দিতে পারতেন। কিন্তু তাতে আশুতোষের নিজস্ব কথনভঙ্গিটি বজায় থাকত না, তা অন্য কারও লেখা হয়ে যেত।

কিন্তু বর্ণনার এই সহজ নাট্যিকতা থাকলেও ঘটনার নাট্যিকতাকে তিনি কী ভাবে আড়াল করেছেন তা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, সান্ত্বনার মৃত্যুটি কোনো লিখিত পঙ্‌ক্তিতে ধরে রাখেননি তিনি, পঙ্‌ক্তি ও অনুচ্ছেদের মধ্যবর্তী সাদা শূন্যতা থেকে তা আমাদের অনুমান করে নিতে হয়।

'বাজীকর'-এর পটভূমি সম্পূর্ণ আলাদা। তবে জ্যাঠামশায়ের কাছে মার খেয়ে বাড়ি থেকে পালানো এক গ্রাম্য কিশোরের অসাধারণ জাদুকর হয়ে ওঠার "rag-to-riches" আখ্যান এ নয়। সে ধরনের ক্রমোত্থানের বিষয়, যা এটিকে পিকারেস্ক্‌ উপন্যাসের চেহারা দিতে পারত, লেখক সংক্ষেপে সেরে দিয়েছেন, এবং আমি বলব একটি মূল্যবান আখ্যানের সম্ভাবনাকে অবহেলা করেছেন। জাদুকর গুণীডাটাকে আমরা এ উপন্যাসে যখন প্রথম দেখি তখনই সে রীতিমতো সুদক্ষ ও সফল মানুষ। তার দুঃখ দারিদ্র্য বিড়ম্বনার আখ্যান, এক গ্রাম্য কিশোরীর মুখের তিলের প্রতি তার দুর্বার হিংস্রতার গল্প আমরা পাই ফ্ল্যাশব্যাকে, তার বর্তমান গল্পের ফাঁকে ফাঁকে। 'পঞ্চতপা'তে বাদল-নীলার গল্পও এসেছে ফ্ল্যাশব্যাকে, এ উপন্যাসে যেমন এসেছে গুণেন্দ্রকিশোর-স্বর্ণ-জ্যাঠামশায়ের দূরাগত স্মৃতি। তারপর স্বর্ণ একরকম হারিয়েই গেছে গুণীর জীবন থেকে, কিন্তু স্মৃতি থেকে নয়। গুণীর শরীরও বহন করছে স্মৃতির এক নির্মম দাগ। পরে আমরা যখন ক্লান্ত স্বর্ণকে দেখি, তখন সে আমাদের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলে না। মনে হয় তাকে না আনলেও হত শেষে। গুণীর জীবনে এখন প্রধান হয়ে উঠেছে যে-গল্প, তা হল ক্রমান্বয়ে, আবার কখনও সমান্তরালভাবে, তিনটি মেয়ের সঙ্গে তার জটিল সম্পর্কের টানাপোড়েন—জুলি স্যান্ডারসন, শিরিন ও শেষে শ্রাবণী। তিনজনেই তাকে ভালোবেসেছে, তিনজনের ভালোবাসা তিন রকমের—যা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এ তিনজনের জীবন-পটভূমি, সংস্কার, অভিজ্ঞতা ও অনুভব তিন রকমের। আবার গুণীডাটাও এ তিনজনকে তিন রকমের ভালোবাসা দিয়েছে, যদিও সে-ভালোবাসার চরিত্র সবসময় আমাদের চেনা ভালোবাসার মতো নয়। জুলি, যে তাকে

উত্তাপ দিয়ে লণ্ডনের শীতল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সে প্রচ্ছন্ন এক মহীয়সী চরিত্র। সে ধরেই নিয়েছে গুণীর ভালোবাসার মূল অংশটা সে কখনও অধিকার করতে পারবে না। যদি গুণীর মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ কিছু থেকেও থাকে, কখনও কখনও সে জুলির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য চেয়েও থাকে, তার মধ্যে আবেগের উচ্চারণ নেই বললেই চলে। জুলি যেন তার কাছে ধরে-নেওয়া বা "taken for granted", ফলে জুলিও হাস্য-পরিহাস ও ছদ্ম উদাসীনতার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে। শিরিনের সঙ্গে জুলির সম্পর্কটি প্রায় মেয়ে ও মা-র সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিজের শরীর দিয়ে এডোয়ার্ডের আক্রমণের হাত থেকে শিরিনকে রক্ষা করার মধ্যে প্রায় অপার্থিব এক মহত্ত্বে পৌঁছে গেছে জুলি।

শিরিন চরিত্রটি রোমান্টিক সৌন্দর্যের এক প্রতিমা, লেখকের তৈরি এক তিলোত্তমা। সেইজন্যই তার সঙ্গে কারোরই কোনো স্পষ্ট মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, তবু সে আমাদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। বস্তুতপক্ষে গুণীর সঙ্গে তার সম্পর্কটি আর-একটু বিশদ করা হলে আমরা খুশি হতাম। সেও কি শেষ পর্যন্ত মা-এর ভূমিকা নিতে চেয়েছিল। —সে পালক পিতা চাঁদসাহেবকে মায়ের মতো শাসন করে মদ ছাড়িয়েছিল, গুণীকেও মদ থেকে সরিয়ে আনে। শিরিনকে গুণী আবার নিজের শিল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী নির্মাণও করে, তিল তিল সাধনার দ্বারা তাকে জাদুবিদ্যার অপ্সরী ভানুমতীর রূপ দেয়, পিগমেলিয়ন যেমন করে গ্যালাশিয়াকে তৈরি করেছিল। যদিও রক্তমাংসের কোনো প্রকট সম্বন্ধে সে গুণীর সঙ্গে আবদ্ধ হয়নি। তবু দূর থেকে সে গুণীকে অদৃশ্য এক বন্ধনে বেঁধে রেখেছিল বা রাখতে চেয়েছিল। শেষদিকে গুণীকে যখন সে ভয় দেখায় যে, সে মদ খেলে তাকে আর "পাবে না", তখন এই "পাওয়ার" চেহারাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সেইজন্যই শিরিন খানিকটা অপার্থিব প্রতিমা থেকে যায়, রাইডার হ্যাগার্ডের 'শি'-এর ধরনে। সাজানো আত্মহত্যাতেই একমাত্র বোঝা যায় যে, শিরিনেরও একটি নশ্বর দেহ ছিল।

শ্রাবণী অবশ্য অনেক কাছের মানুষ। তাকে আমরা চিনি। মুশকিল হল যে, কিশোর বয়সের প্রেমিকা স্বর্ণর চিবুকে তিলের প্রতি গুণীর প্রেম ও ঘৃণার যুগ্ম সম্পর্কই গুণীকে গালে জড়ুলযুক্ত অধ্যাপিকা শ্রাবণীর কাছে নিয়ে এসেছে, তার দুর্বার আকর্ষণে মজিয়েছে—এই সমাপতন খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। শ্রাবণীর ব্যক্তিত্ব, যা গুণীর উন্মাদনা ও আক্রমণে মাঝেমাঝেই বিপর্যস্ত হয়ে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে, তার আকর্ষণও নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এই নানাস্তরী আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও সুখদুঃখের গল্পকে নানা জটিলতার পাক ও মোচড় দিয়ে লেখক এমন নিপুণভাবে বলেছেন যে, ইচ্ছাপূরণের পুরো আনন্দ না পেলেও পাঠকের একটা তীব্র কৌতূহলকে শেষ পর্যন্ত লেখক নিজের নিয়ন্ত্রণেই রাখেন।

'বকুলবাসর' আবার একটি চমৎকার ইচ্ছাপূরক উপন্যাস। তার অর্থ এই নয় যে, এটি কোনো অর্থে 'মাইনর' বা খেলো উপন্যাস। আমি বরং 'বাজীকর'-এর তুলনায় 'বকুলবাসর'কে একটু বেশি মর্যাদা দেব, কারণ 'বকুলবাসর'-এর বিশ্বাস্য বাস্তবতার

ভিত অনেক শক্ত। এর চরিত্রগুলি আমাদের চেনাশোনার গণ্ডির খুব বাইরে কেউ নয়, এবং গল্পবয়নেও লেখক বিশেষ কোনো চেষ্টাকৃত জটিলতার অবতারণা করেননি। গল্পটি স্বচ্ছন্দভাবে এগিয়েছে এবং খুবই সাবলীলতার সঙ্গে প্রত্যাশিত সমাপ্তিতে এসে পৌঁছেছে।

লেখকের কৃতিত্ব এখানে যে, সোজাসুজি একটি boy-meets-girl গল্প তৈরি না করে, প্রেমের সরল উপাখ্যানকে একটি-দুটি চরিত্র দিয়ে জটিল করে তুলেছেন। এ উপন্যাসের উপাখ্যানের কৌতূহল-রেখাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দিকে মিষ্টিমাসির রুক্ষতার রহস্যটার মূলে কী আছে সেই সন্ধান পাঠককে বেশ খানিকটা ব্যস্ত রাখে, এবং সেই সময় দেবযানী-কমলেশের সম্পর্কের উন্মোচনও খানিকটা আড়ালে পড়ে যায়। মাসির রুক্ষতা ও উৎকেন্দ্রিকতা, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁর সম্পত্তি গ্রাস করবে সেই ভয়—তাঁর চরিত্রটিকে আমাদের কাছে আকর্ষক করে তোলে। অন্যদিকে দেবযানীর দাদা ও বউদির তাঁর সম্পত্তি গ্রাসের জন্য চক্রান্ত কখনোই নাটকীয় ভিলেইনি-র পর্যায়ে নিয়ে যান না লেখক, যেন সাংসারিক মানুষের সাধারণ দুর্বলতা ধরে নিয়েই যথাসম্ভব ক্ষমার সঙ্গে আঁকেন তাদের। কমলেশ-দেবযানীর সম্পর্কের ভূমিকাটিকে কমলেশই উদ্যোগ নিয়ে ধরে ধরে তৈরি করেছে। হয়তো মিষ্টিমাসির সুখী দাম্পত্যের প্রতীক ওই বকুলগাছটির আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা, সেই সঙ্গে দেবযানীর দৃঢ়তা, সততা ও সংযত সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করেছে। দেবযানীকে পাবার পরিকল্পনার সঙ্গে সে বকুলগাছটিকেও জড়িয়ে নিয়েছে, একটি নতুন বকুলের চারা পোঁতবার যে সূক্ষ্ম প্রকল্প সে তৈরি করেছে, তার কথা দেবযানীকেও সে বলেনি। বুঝতে পারি, কমলেশ যে শুধু বটানিতে পারঙ্গম তা নয়, সে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাতেও বিলক্ষণ পটু। দেবযানী ও সে পোড়ো জীর্ণ মরণশীল বকুলগাছের বদলে একটি নতুন বকুলচারা পুঁতছে পূর্ণিমার অম্লান জ্যোৎস্নায়, এই দৃশ্যটি খানিকটা স্টেজে-সাজানো দৃশ্যের মতো, উদ্দিষ্ট দর্শক ছিলেন মিষ্টিমাসি। এবং প্রত্যাশিতভাবেই তাঁর দেখার বর্ণনাটা লেখক আবেগময় করে তৈরি করেছেন—

> "দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে, সমস্ত আকৃতি এক করে তিনি শিশু বৃক্ষচারাটা দেখছেন। কি এক আবেগে, আবেশে, ভালো করে দাঁড়াতেও পারছেন না যেন। কিছু বলতে চাইছেন, ঠোঁট দুটো নড়ছে, দু চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে।"

এই একটি চিকিৎসায় তাঁর শারীরিক ও মানসিক বিকলতা সেরে গেল। একটি বকুলগাছের সঙ্গে জড়িয়েছিল আগেকার দুজনের স্মৃতি। তার একজনের মৃত্যু মিষ্টিমাসিকে অস্বাভাবিক করে তুলেছিল। নতুন একটি বকুলচারা নতুন দুজনকে, মিষ্টিমাসির আপন অন্য দুজনের জীবনকে, জুড়ে নিল। মিষ্টিমাসির চরিত্রের সূত্রে প্রাক্তন এক ভালোবাসা এসে নতুন এক ভালোবাসাকে আশীর্বাদ করল, আবার নতুন ভালোবাসা প্রাচীনকে সঞ্জীবিত করল—এ বড় তৃপ্তিদায়ক সৌন্দর্যময় গল্প। আমি বরং এই গল্পেই আশুতোষের কলমের জোর বেশি দেখতে পাই।

পবিত্র সরকার

পঞ্চতপা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমপূজনীয়েষু

আকাশ ফাটল !

না, এক জড় পাষাণস্তূপের পাঁজর ফাটল। একটা ভরাট স্তব্ধতার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। যুগ যুগ ধরে জড়ের সাধনা চলেছিল ওখানে। স্থিতি আর স্থাবরতার উপাসনা চলেছিল। নিঃশব্দ সমাহিত। শুকনো, মরুনীরস। পাথরের পর পাথর গেঁথে চলেছিল কে। উর্ধ্বপথে। সূর্যোদয়ের পথে।

প্রলয়ের ক্ষেতে বিধাতার সৃষ্টি। প্রলয়ের ক্ষেতে মানুষেরও সৃষ্টি। মৃত্যু থেকে জীবনকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে উদ্ধার করছে সেও। এমনি একটা উদ্ধার-সমারোহ সব প্রথম কল্পান্তক আঘাত হেনেছে ওই জড়দানবের বুকে। আকাশ ফাটে নি। ওটা তার অভ্রভেদী আর্তনাদ। খান খান হয়ে গেছে তার শিলামন্ত্রের গাম্ভীর্য। কড়কড় মড়মড় শব্দে খসে গেছে তার জড়-বাঁধন। শূন্যপথে ছিটকে উঠে মাটির বুকে মুখ থুবড়ে পড়েছে তার রাশি রাশি বিপুলায়তন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আকাশ ফাটে নি। ওটা দিগন্তের কাঁপুনি।

কিন্তু কেন গো, কেন ? কে বসে গো তোমরা ? পাহাড়গুলোর অমনধারা অঙ্গ চোটাচ্ছ কেন ? জঙ্গল কেটে, মাটি খুঁড়ে, সব নাড়ি-ভুঁড়ি বার করে দিচ্ছ কেন ? এমন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করছ কেন সব ?

বিজ্ঞান চেনে না এই মানুষেরা। বিজ্ঞানের দূত দেখে নি কখনো। ওদের কালো মুখ অবিশ্বাসে কালো হয়ে ওঠে আরো। ভয়ে আর সংশয়ে ধারালো হয়ে ওঠে ওদের চোখের দৃষ্টি।

নিগড় দিবি ? ওই মড়াইয়ের পায়ে ? কিন্তু মড়াই তো মরেই আছে। ধারা কই ? কাকে আটকাবি ? কাকে বাঁধবি ? জল পাবি কোথা ? তোরা কি পাগল ? তোরা দস্যু ?

মড়াইয়ের এপার ওপার দুপারে পাহাড়। পাহাড়ের একেবারে নিচে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে মড়াইয়ের বিশীর্ণ একটা রেখা মাত্র। তার হাড়পাঁজর বার করা জঠরের ক্ষীণ স্রোত শুকনো উপল-পথে ঠোক্কর খেতে খেতে ধারা হারিয়েছে সেই কোন্ যুগে। তার গতিপথের একটা টানধরা আভাস আছে শুধু মরেছে বলেই তো মড়াই ! যুগ যুগ ধরে মরে আছে বলেই তো মড়াই ! ঘরে সকলকে মারছে বলেই তো মড়াই ! আগে কি একটা নাম ছিল যেন নদীটার। সেই নামও মরেছে।

বর্ষার জল আসে বটে খানিকটা। আর দু'পাঁচ বছর অন্তর অন্তর দু'কূল ছাপিয়ে বন্যাও হয় এক এক বার।

কিন্তু বর্ষার জল। কলসীর জলে মরুভূমির 'তেষ্ণা' মেটে ? বর্ষা না ফুরোতেই মাটির আগুন টেনে নেয় সব বর্ষা। তারপর আবার যেই কে সেই।

আর বন্যা ? গড় করি গো তোর বন্যার পায়ে। আকাশের 'বজ্জ' আলো

দেয় না আঁধার বাড়ায় ? 'জেবন' দেয় না আগুন জ্বলায় ? গড় করি গো 'বজ্জের' পায়ে। গড় করি তোর বন্যার পায়ে। মড়াই শুকিয়ে মরুক। মড়াই শুকিয়ে মারুক। মড়াইয়ের ডুবে মরে কাজ নেই। মড়াইয়ের ডুবিয়ে মেরে কাজ নেই।

সেই 'দুগ্‌ঘটনার' পিত্যেশে বসে আছিস নাকি তোরা ? নয় ? তবে বাঁধবি কারে ? কার পায়ে নিগড় দিবি ? কার পায়ে 'ছেকল' পরাবি ?

পাথরের দেয়াল দিবি এপার ওপার দু'পাহাড়তক ? মড়াইয়ের বুক খুঁড়ে শতেক হাত তলা থেকে দেয়াল তুলবি এই দুই পাহাড়ের কাঁধতক্ ?

কিন্তু কেন ? কেন রে তোরা মরা মড়াইকে মারতে লেগেছিস ? কেন রে তোরা 'পিথিবী'র অঙ্গ চোটাচ্ছিস্ ? তোরা কি পাগল ? তোরা দস্যু ? কে বটে তোরা ? এমন 'পেলয়' কচ্ছিস কেন ? কি হবে ? কি করবি ? কি গড়বি ?

মুখে বলে না কিছু। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। বোবা জিজ্ঞাসায় চোখের পাতা পড়ে না।

ব্যাঙ্ক দেখেছ ? ব্যাঙ্ক ? যেখানে টাকা জমা রাখে গো, টাকা জমা রাখা হয় ! দেখ নি, কিন্তু বুঝেছ তো ? আচ্ছা, সেই জমানো টাকা কখন তুলি আমরা ? যখন অভাব হয়, যখন খরচ চলে না, যখন হাতের পুঁজি ফুরিয়ে যায়। এখানেও তেমনি জলের ব্যাঙ্ক হবে একটা। জল জমা করে রাখা হবে। বর্ষার জল, বানের জল, পাহাড়ী স্রোতের জল, সব বাড়তি জল। তারপর যখন জলের অভাব হবে, আকাল হবে, এখানকার এই জমানো জল খরচ করা হবে তখন। বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে আর জলের অভাব হবে না কখনো। চুপ করে দেখ দু'টি বছর। মরা মড়াই তোমাদের কূলে কূলে ভরে উঠবে, ফেঁপে উঠবে—যত দূর চোখ যায় জলে জলাকার হয়ে যাবে সব।

সঠিক বোঝে না। তবু কালো মুখে আশার আলো লাগে একটু। জলের অভাবটা বোঝে। জলের অভাব কাকে বলে বোঝে। জলের অভাবে তাদের নাড়ি শুকিয়েছে। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। ভাবে। মনের মত করে অর্থ করে নেয়। জল যাবে। যেখানেই আগুন মাটি খেয়েছে সেখানেই জল যাবে ! কথা দু'টোয় যেন যাদু আছে। আশাটুকুতে যেন যাদু আছে। জল যাবে ! কাছে ! দূরে ! দূরান্তে !

কর্মকর্তাদের কল্পিত নক্সা আর ছক্ ধরে জল কবে যাবে, সেটা দূর ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু সেই নক্সা আর ছক ধরে জল যাওয়ার খবরটা চলাচল হতে থাকে এই সদ্য বর্তমানেই। কাছের থেকে দূরে, দূর থেকে আরও দূরে।

মাসির বাড়িতে একদিন সান্ত্বনার কানেও এলো খবরটা।

ওভারসিয়ার অবনীবাবুর মেয়ে সান্ত্বনা। বছর চারেক আগেই এ-রকম একটা জল্পনা শুনেছিল সে। সাগ্রহে বুঝতেও চেষ্টা করেছিল কি হবে। কিন্তু সবারই আঠারো মাসে বছর হতে দেখে কৌতূহলে মরচে পড়ে গিয়েছিল। ভুলেও গিয়েছিল প্রায়।

এত দিন বাদে হঠাৎ আবার খবরটা শুনে ভিতরে ভিতরে কেমন একটা উত্তেজনা হতে লাগল। এবারে আর তোড়জোড় নয়, হাতে কলমে কাজ শুরু হয়ে গেছে নাকি।

কি কাজ ? কেমন ধারা কাজ ?

সে জবাব আর কে দেবে তাকে। যেটুকু শুনেছে তার বার্তাবহ ছোট মাসতুতো ভাই। শহরের হাইস্কুলে পড়ে। ভাসা ভাসা শুনে এসেছে সেও। এ-সব খবরে কান দেবার মত তার আগ্রহ বা কৌতূহল কিছুই নেই। খবরটা শুনলে দিদি খুশি হবে জেনেই বলা। কেন খুশি হবে তাও জানে না।

সামান্য একটা খবরের বদলে দশটা প্রশ্ন শুনে ফাঁপরে পড়ে যায় মাসতুত ভাই। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে, মানসম্ভ্রম আছে একটা। তাচ্ছিল্য করে জবাব দেয়, অত খবর কে রাখতে গেছে, জানার ইচ্ছে থাকলে কাগজ পড়লেই পারো, কাগজেই তো বেরোয় সব—বারো মাসে খবরের কাগজ ওল্‌টাবে না, জানবে কি।

খবরের কাগজ যে একটা পড়ার বস্তু, কোনদিন সান্ত্বনা তা উপলব্ধি করে নি সেটা যথার্থ। দুপুরের নিরিবিলি অবকাশে ঘরের দরজা বন্ধ করে একরাশ খবরের কাগজ নামিয়ে বসল সে। সকাল থেকে চুপি চুপি সংগ্রহ করেছে। দেখলে হাসাহাসি করবে শুধু মাসতুত ভাই-বোনেরা নয়, মাসি আর মেসোও হাসবেন মুখ টিপে।

মেঝেতে কাগজ ছড়িয়ে মহা নিষ্ঠা সহকারে প্রায় দু'তিন ঘণ্টা হাতড়ে বেড়াল জ্ঞাতব্য তথ্য। বিরক্তি ধরে গেল। খবর একটু আধটু যাও আছে সে শুধু খবরই। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে তার কোন হদিস পেল না। চুপিচুপি হাইস্কুলে পড়া মাসতুত ভাইয়ের শরণাপন্ন হল আবার।—দেখ খোকা, তোদের মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে খবরটা নে না কি হচ্ছে না হচ্ছে—যদি পারিস সিনেমা দেখার জন্য আস্ত একটা টাকা দেব তোকে।

প্রলোভনের ব্যাপার বটে এটা। আস্ত একটা টাকা যদি কেউ দেয় তো বাড়ির মধ্যে এই সানু দিদিই দিতে পারে। মাসে মাসে বাবার কাছ থেকে দশটা করে টাকা আসে সানুদির নামে, সেটা কারোরই অজ্ঞাত নয়। ভাই-বোনদের ওপর সানুদির অনেক প্রতিপত্তিও খাটে এই জোরেই।

কিন্তু মাস্টারমশাইদের কাছ থেকে খবর আনবে কি, তাদের জানার পরিধিটাও এমন কিছু বড় নয়। তবে চেষ্টাচরিত্র করে যেটুকু খবর সংগ্রহ করল তাই বেশ রঙ চড়িয়ে সান্ত্বনার কাছে পেশ করে দিল।—মড়াই নদী বাঁধা হচ্ছে, ডিনামাইট দিয়ে চারদিকের পাহাড় ভেঙে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি।

সান্ত্বনা অবাক, নদী বাঁধছে তো পাহাড় ওড়াচ্ছে কেন?

বাঃ রে। সংবাদদাতা বিব্রত মুখে জবাব দেয়, নদী বাঁধতে হলে পাথর দরকার। এন্তার পাথর দরকার, ওই জন্যেই পাহাড় ভাঙছে।

সান্ত্বনা দাঁতে করে নখ খুঁটতে খুঁটতে বুঝতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। দু চোখ সংবাদদাতার মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে এলো। আর কি শুনলি? এই মানে—আমাদের ওখান দিয়ে জল যাবে শুনলি?

টাকার আশা বড় আশা।—তা যেতে পারে, জল তো গড়ানে জিনিস, একবার গড়াতে শুরু করলে আর আটকাবে কে?

সান্ত্বনার গোপন অস্বস্তিটা আর চাপা থাকল না বেশি দিন। উড়ো খবর আসে একটা দুটো। আর সদা হাসিখুশি চঞ্চল মেয়েটা হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে ওঠে। শোনে

কান খাড়া করে। বুঝতে চেষ্টা করে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে মাসি আর মেসোকেই এসে জিজ্ঞাসা করে এটা সেটা। মনে মনে তাঁদের হাসির খোরাক হচ্ছে বুঝেও না জিজ্ঞাসা করে পারে না।

মাসির কথা কানে এলো সেদিন, মেসোকে বলছেন, আহা, এ নিয়ে কিছু বোলো না ওকে, জানই তো ওদের বংশের ধারা।

বংশের ধারা !

সান্ত্বনারই হাসি পায়। ঠাকুমার কথা মায়ের কথা মনে হতে শিউরে ওঠে। সে বিভীষিকা ভুলবে না কোন দিন। ভোলবার নয়। বিশেষ করে মায়ের কথা। কিন্তু তারা কোন বংশের থেকে এসেছিল ? অবশ্য ঠাকুরদার কথা শুনেছে, ঠাকুরদার বাবার কথাও—তাদেরও মাটির রোগ ছিল—তাদের না হয় বংশের ধারা বলা যেতে পারে, কিন্তু বাইরের মেয়ে ওর মা-ঠাকুমা—তাদের অমন হল কেন ? মনে মনে বলল, মাসিমার যেমন বুদ্ধি। বংশের ধারা ! কই তার বাবার তো কোন তাপ-উত্তাপ নেই ? আর ঠিক তেমন বাপেরই মেয়ে সান্ত্বনা, তার নিজেরও নেই কোন তাপ উত্তাপ। কেনই বা থাকবে ?

যা গেছে সে তো বরাবরকার মতই গেছে। গেছে বলে কোন দুঃখও নেই তার। গেছে ভালই হয়েছে। আর কি সেখানে থাকতে যাচ্ছে তারা ? জল গেলে ওদের নিজেদের কি আর লাভ, তবু জানতে ইচ্ছে হয় শুধু। যে আগুন বছরের পর বছর ধরে বুকে করে টেনে নিয়ে শুষে নিজে শেষ হয়ে গেছে ঘরে ঘরে কত মানুষ—সেখান দিয়ে জল যাবে শুনলে কার না জানতে ইচ্ছে হয় ? জল যাবে, আগুন নিববে এটুকুই আনন্দ তার। বংশের ধারা আবার কি।

হঠাৎ ছোটবেলার একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল সান্ত্বনার। খুব ছোটবেলার। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। বুড়ী ঠাকুমা সকাল থেকে কি একটা যজ্ঞ শুরু করিয়েছে খোলা বাইরে। আকাশের নিচে কাঠফাটা রোদ্দুরে। কাঠ, শুকনো পাতা, ঘি, পুরনো কাপড়, সব এনে এনে ফেলা হচ্ছে সেই যজ্ঞের আগুনে। দমবন্ধ ধোঁয়ায় একাকার হয়ে যাচ্ছে চারদিক। আর সেখানে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে বুড়ী। শাস্ত্রকারের ভাষ্য, ধোঁয়ার জ্বলুনিতে আর সেই সব-জ্বালানো সূর্যের তাতে চোখ দিয়ে যে জল ঝরবে তা মাটিতে ফেললে মাটি শীতল হবে। চোখের জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠবে, তারপর বৃষ্টি হয়ে মাটিতে ঝরবে। সূর্যের দিকে মুহুর্মুহু চেয়ে চেয়ে চোখে জল আনার তাগিদে প্রায় অন্ধ হতে বসেছিল বুড়ী। তার সেই ভাঙা গলার ছড়া পাঁচালিও ভোলে নি সান্ত্বনা।

চোখের জল আকাশে যা,
যাগের ধোঁয়া আকাশে যা,
সেথায় গিয়ে মেঘ হ',
সূয্যি ঢেকে মেঘ হ'।
আয় রে পবন ধেয়ে,
মেঘ করেছে ছেয়ে,

পবন-মেঘে মিতালি,
মাটি হল শীতালি।

শুধু এই? আরো কত কি করতে দেখেছে কত ঘরে। মায়ের কথা মনে পড়ছে আবারও। তাড়াতাড়ি অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করল সান্ত্বনা। কাজ নেই মায়ের কথা মনে পড়ে। ভালই হয়েছে তারাও জায়গা ছেড়ে এসেছে বরাবরকার মত। ভালই হয়েছে বাবা তার বাইরে বাইরে কাজ করে। ভালই হয়েছে মাসির বাড়িতে চলে এসেছে সে-ও। সবই ভাল হয়েছে। তবু কেবল একটুখানি জানতে ইচ্ছে করে কি হচ্ছে, কি হবে, কেমন করে হবে। আহা, এখনও তো লোক বাস করছে সেখানে, কত লোকই তো আছে, তাদের দুঃখ কষ্ট ঘুচবে কিনা জানতে ইচ্ছে করে না! কিন্তু ঘুচবে কী? জল তো আটকানো হচ্ছে সেই কোথায় কত দূরের কোন্ পাহাড়ের গায়ে!

কিন্তু গোড়ার দিকের এই আলোড়নে লম্বা একটা ছেদ পড়ে যায় আবার। আর কোন খবর-বার্তা পায় না সান্ত্বনা।

প্রথম প্রথম রাগ হত। লোকগুলো কি এখানকার! কোন কিছুতে যদি আগ্রহ থাকত। সেই থেকে রোজ দুপুরে খবরের কাগজ নিয়ে বসছে। কিন্তু খবর আর পায় না। উল্টে চোখে ব্যথা ধরে যায়। ঘুম পেয়ে যায়। কি সুখে যে লোকে পড়ে এই রাজ্যের ছাইভস্ম ভেবে পায় না। ক্রমশ ওর নিজের আগ্রহও একটু একটু করে চাপা পড়ে গেল আবার। বছর ঘুরে এলো।

ঘুম ভেঙে সেদিন কার মুখ দেখেছিল সান্ত্বনা! আনন্দে আর উত্তেজনায় ভেতরটা যেন একেবারে উপচে উঠতে লাগল তার। বাবার চিঠি এসেছে।

সেটা আনন্দের কারণ হলেও এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। বাবার চিঠি প্রায়ই আসে। ব্যতিক্রম হলে এখান থেকে এমন কিছু লেখে সান্ত্বনা, যাতে করে বেশ ভালো মতই টনক নড়ে তাঁর।

বাবা লিখেছেন, এখানে দু'তিন দিনের মধ্যেই আসছেন।

সেটা আরো আনন্দের কারণ বটে। কিন্তু বছরে এমন এক বার দু'বার এসেও থাকেন তিনি। সেই জন্যেই সান্ত্বনা এমন বিহ্বল হয়ে ওঠে নি আজ।

চিঠিতে আর একটা ছোট সংবাদ আছে। যা বাড়ির সকলকে ডেকে বলার মত। যা বিশ্বসংসারের সকলকেই ঢাক পিটিয়ে বলার মত।

বাবা লিখেছেন, মড়াইয়ের কাজে বদলি হয়েছেন তিনি। সেখানে যাওয়ার পথে এ জায়গা হয়ে যাবেন।

এমনিতেই সান্ত্বনার লাগাম-ছাড়া হাসিখুশির দাপটে বাড়িটা ভরাট থাকে সারাক্ষণ। মাসি সত্যি সত্যি রেগে ওঠেন এক এক সময়, দস্যি মেয়ে, বাইশ বছর বয়েস হল তোর খেয়াল আছে? বারো বছরের খুকিটির মত করে বেড়াস—বাপ তো ওদিকে খুব চাকরি কচ্ছে—যেন বিয়ে-থাওয়া আর দিতে হবে না মেয়ের—যেন এই করেই কাটবে চিরকাল, আসুক এবার!

আর আজ?

আজ আর কোন কথা বলারই ফুরসত পেলেন না তিনি। রান্নার কাজে ব্যস্ত

ছিলেন। সান্ত্বনা দৌড়ে এসে দু'হাতে জাপটে ধরে সরাসরি একেবারে শূন্যে তুলে ফেলল তাঁকে।

ছাড় ছাড়! কি হল? এঁটো-কাঁটায় সব একাকার করে দিলি!

আর ছাড়! চিঠিখানা তাঁর সামনে রেখেই সান্ত্বনা ছুটল আর এক দিকে।

স্নান করে যত্নসহকারে চুল বাঁধাটা প্রায় সেরে এনেছে মাসতুত বোন। প্রসাধনের ব্যাপারে বেশ একটু রুচি আছে তার। বয়সে প্রায় বছর চারেক ছোট সান্ত্বনার থেকে। কিন্তু সে শুধু ঠিকুজির বিচারে। ছোট যেন সান্ত্বনাই। ঝড়ের মত এসে একটানে তার চুল খুলে সব এলোমেলো করে দিয়ে রাগিয়ে হাসিয়ে অস্থির করে তুলল তাকেও। প্রসাধন-গাম্ভীর্য রসাতলে গেল। লুটোপুটি শুরু করে দিল দুই বোনে।

তারপর এক সময় ঠাণ্ডা হয়ে ভাবতে বসল সান্ত্বনা।

কিন্তু এ রকম একটা যোগাযোগ ভাবতেও পারছে না। বাবা যেন কি! কোথায় বেশ করে গুছিয়ে লিখবে দু লাইন, না এক কথাতেই শেষ। যেন জল গড়িয়ে খাচ্ছে এক গেলাস।

আজকের আনন্দের আঁচ খানিকটা মেসোও পেলেন।—সানুর আজ কি হল, এত খুশি কেন?

সমীহ যা একটু মেসোমশাইকেই করে সান্ত্বনা। মুখ আড়াল করে চার আঙুল জিব কাটল।

মাসি রাগ করে জবাব দিলেন, ওর বাবা মড়াইয়ের কাজে বদলি হয়েছে, খুশি এই জন্যে। একেবারে দিগ্বিজয় করে ফেলবে। যাওয়ার পথে এখানে হয়ে যাবে। আসুক, খুশি বার কচ্ছি!

মাসি এবং মেসো দু'জনেই সম্প্রতি সান্ত্বনার বাবার ওপর ক্ষুণ্ণ আছেন একটু। যথার্থ কারণও আছে। আর-সেই কারণে সান্ত্বনাকেই সুচক্ষে দেখার কথা নয় তাঁদের। শুধু তাঁদের কেন, মাসতুত বোনেরও হয়তো কিছুটা মনোবেদনার কারণ সে-ই! কিন্তু এক ঝলক আলোর পরে একঘর অন্ধকারের ক্ষোভই বা আর কতটুকু টেকে।

প্রত্যাশিত দিনেই সান্ত্বনার বাবা ওভারসিয়ার অবনী রায় এলেন।

সান্ত্বনার ইচ্ছে, তাঁকে নিজের ঘরে টেনে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করে জেরা করতে বসে। কিন্তু নিরিবিলিতে পায় তাঁকে সাধ্য কি।

প্রাথমিক যা কিছু সম্পন্ন হল। খাওয়াদাওয়া সারা হল ধীরেসুস্থে। ধৈর্য ধরে থাকা দায় সান্ত্বনার। কিন্তু এদের গপ্পই শেষ হয় না। মাসিটি বড় সহজ নন, এ-কথায় সে-কথায় ঠিক আসল কথায় চলে এলেন।

লোহা পিটবে তখন, দগদগে লাল যখন। বললেন, চাকরি তো খুব কচ্ছ নিশ্চিন্ত মনে, তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে কে?

ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল সান্ত্বনা। মাসি-মেসোর মনে যে ক্ষোভটুকু আছে বাবার ওপর, তার কারণটা এবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে বুঝি। অথচ বাবা বেচারী তার কিছু জানেন না, সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সকলের আগোচরে কলকাটিটা সে-ই ঘুরিয়েছে—একবার নয়, দু'বার। কিন্তু আবার রাগও হয়ে গেল মাসির ওপর। কোন

কিছুরই সময় অসময় নেই, ভিতরে ভিতরে একেবারে শান দিচ্ছিলেন যেন। অবনীবাবু কিছু জবাব দেবার আগেই সে বলে উঠল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না, নিজের মেয়ে আছে, ধরে বিয়ে দাও গে যাও না!

অবনীবাবু বিব্রত হলেন। অন্য সময় হলে মা-মরা আদরের বোনঝির কথা শুনে হয়তো হাসতেন মাসি, নয়ত ছদ্মরাগে ধমক দিয়ে বলতেন কিছু। সান্ত্বনাও সে রকম কিছুই প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল কেমন। মাসি স্বল্পক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তোকেও আমি নিজের মেয়ে বলেই ভাবতুম....তা তোরা বাপ মেয়ে দু'জনেই যখন অন্য রকম ভাবিস তখন আমার মাঝখানে পড়ে বার বার ঘ্যানর ঘ্যানর করা কেন। খুব ঘাট হয়েছে, আর বলব না।

হঠাৎ এ-রকম আবহাওয়ার পরিবর্তনে অবনীবাবু হকচকিয়ে গেলেন। মেয়েকে বললেন, তুই সবেতে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে আসিস কেন? মাসিকে বললেন, আপনিও যেমন, ওর কথা আবার শোনেন!—বড় হয়েছে, বিয়ে তো দিতেই হবে, তা আপনারা ছাড়া আর ওর কাছে কে, দেখেশুনে ঠিক করুন কিছু।

এরই প্রত্যাশায় ছিলেন যেন মাসি।—আমরা দেখেশুনে ঠিক করব কি রকম? আমাদের ওপর তোমার বিশ্বাস কতটুকু যে আমরা দেখেশুনে ঠিক করব? অমন দু'দুটো ভালো সম্বন্ধ পেয়ে চিঠি লিখলাম তোমায়, দু'বার করে লিখলাম—একটা চিঠিরও জবাব দেওয়া পর্যন্ত দরকার মনে করো নি তুমি, আবার আমরা দেখতে যাব কেন শুনি?

একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন অবনীবাবু। চিঠি! আমাকে? কবে—? কই আমি তো একটাও পাই নি!

মাসিও থতমত খেয়ে গেলেন কেমন। চিঠি পাও নি? সব চিঠি পাও আর এ দুটোই পেলে না, সে আবার কেমন কথা?

তাঁদের অগোচরে সান্ত্বনা পালিয়ে বাঁচল। আর সেখানে অবস্থান নিরাপদ নয়, সেটা তার থেকে ভালো আর কে জানে?

একটুখানি বিবৃতি প্রয়োজন।

মাসি ওর বিয়ের প্রসঙ্গ চার পাঁচ বছর আগেই উত্থাপন করেছিলেন। একাধিকবার করেছিলেন। কিন্তু অবনীবাবু সত্যিই তখন গা করেন নি। এ সম্বন্ধে ভাবার মত তখন তাঁর মনের অবস্থাও ছিল না খুব। যাই হোক, মাসিও শেষে এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন নি কিছু। যার দায় তারই যখন ভাবনা নেই তিনিই বা কাঁহাতক পিছনে লেগে থাকবেন? মাঝখানে এই ক'বছরের ব্যবধানে মাসির নিজের মেয়ে বড় হয়েছে। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ দেখা হতে লাগল। যে দু'টো সম্বন্ধের কথা একটু আগে উল্লেখ করলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল মাসির নিজের মেয়েকে উপলক্ষ্য করেই।

মাসতুত বোনকে দেখতে আসছে শুনে হেসে নেচে আটখানা হয়ে সান্ত্বনা সেই বেচারীকে প্রথমে নাস্তানাবুদ করে পরে পরিপাটি করে তাকে সাজিয়েগুজিয়ে দিল। জনা দুই ভদ্রলোক আর জনা তিনেক মহিলা এলেন মেয়ে দেখতে। ভদ্রলোক দু'জন

বাইরের ঘরে বসলেন, মেয়েরা ভিতরে। মাসতুত বোনকে বাইরের ঘরে চালান দেওয়া হল প্রথম। উচ্ছল কৌতূহলে আড়ি পেতে রইল সান্ত্বনা। সবেতেই তার অপার কৌতূহল, এ ব্যাপারে তো কথাই নেই। তাঁদের দেখা হতে মেয়েকে ভিতরে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা ছুটে এসে এক রকম জাপটে ধরে নিয়ে গেল মেয়েদের ঘরে। তাকে তাদের সামনে বসিয়ে দিয়ে নিজেও পাশে বসল গ্যাঁট হয়ে। যেন সে-ই মুরুব্বী।

মেয়েরা মেয়ে দেখলেন। যাকে দেখার কথা তাকেও, যাকে দেখার কথা নয় তাকেও। এটা সেটা জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি জিজ্ঞাসা করলেন তার পাশে যে বসে আছে তাকেই। মাসিকে গল্পগুজবের ছলে জিজ্ঞাসা করলেন এটা ওটা তাঁরা, কিন্তু মেয়ের সম্বন্ধে যত না বোনঝির সম্বন্ধে অনেক বেশি।

হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সান্ত্বনা। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন মাসিও।

দু'চার দিনের মধ্যেই পাত্রপক্ষ খবর পাঠালেন। ছেলের বয়স আন্দাজে মেয়ের বয়স একটু কম হয়ে যায়। সেদিক থেকে বোনঝিটিকে বিশেষ পছন্দ তাদের। অতএব, ইত্যাদি।

বোনঝিকে পছন্দ হয়েছে বয়সের জন্য কি কি জন্য, সে চোখ মাসির আছে। মায়ের মনে একটু লাগার কথা। কিন্তু যে মেয়ে পছন্দ তাঁদের, সেই মেয়ে সান্ত্বনা বলেই তেমন লাগল না। মেসোর মনে যাই থাক, তিনি মন্তব্য করলেন না কিছু।

কিন্তু লজ্জায় অস্বস্তিতে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল সান্ত্বনা।

ওদিকে মাসি এবং মেসোর টুকরো কথাবার্তা কানে এলো তার। মেসো বললেন, অবনীকে চিঠি লিখে দাও আজই, যদি হয়ে যায় তো হয়ে যাক।

মাসিও সায় দিলেন। দুপুরে নাকের ডগায় নিকেলের চশমা এঁটে চিঠি লিখতে বসেছেন তিনি, তাও দেখল সান্ত্বনা।

সেই দিনই চিঠি একটা সে-ও লিখল তার বাবাকে। এমনি সাদামাটা চিঠি। লিখে খামে এঁটে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

তারপর ছোকরা চাকর আধ মাইল দূরের ডাকবাক্সে কর্ত্রীর চিঠি ফেলতে গেল যখন, তখন তার হাতের ওই চিঠি সান্ত্বনার চিঠির সঙ্গে বদল হয়ে গেল কি করে, সে শুধু একমাত্র সান্ত্বনাই জানে। আর কেউ না।

পরের ঘটনাও প্রায় অনুরূপ।

এবারে যাঁরা মাসির মেয়েকে দেখতে এলেন, সান্ত্বনা আর ধারেকাছেও ঘেঁষল না তাঁদের। মাসিকে বলল, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব এবারে আমি দেখছি, তুমি ওদিক আগলাও গে যাও।

মাসি খুশিও হলেন না, দুঃখিতও হলেন না। খুশি হলেন না, কারণ এই বোনঝিটিও মেয়ের থেকে খুব কম নয় তাঁর কাছে। দুঃখিত হলেন না, কারণ মেয়েও কম নয়।

যথাপূর্ব মেয়ে দেখা হল। মোটামুটি মেয়ে পছন্দও হল বোধ হয়। কারণ মহিলারা

বিদায়ের আগে মেয়ের বাপের ঘর-বাড়িও দেখলেন। আর এই দেখতে গিয়ে রান্নাঘরে আটপৌরে গাছ-কোমর শাড়িপরা সান্ত্বনাকে দেখলেন তাঁরা। গরমের তাতে আর ঘামে তখন টুসটুসে লাল হয়ে উঠেছে সান্ত্বনার মুখ। থতমত খেয়ে হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে সে টিপ-টিপ প্রণাম সারল গোটা দুই তিন। আগন্তুকরা আবার প্রশ্ন শুরু করলেন মাসিকে। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদে বিব্রত করে তুললেন সান্ত্বনাকেও।

যথাসম্ভব সংক্ষেপে জবাব দিয়ে সান্ত্বনা একগাল হেসে ফস করে বলে বসল, আমার বোনকে কেমন দেখলেন বলুন?

একজন জবাব দিলেন, ভালোই তো—।

মহা খুশি হয়ে মাথা দুলিয়ে সান্ত্বনা বলে উঠল, পছন্দ হয়েছে তাহলে? হবে না তো কি, যে বাড়ি যাবে সেই বাড়ি আলো করবে, অমন কাজের মেয়ে ক'টা হয়? আপনারা নিশ্চিন্দি মনে নিয়ে যান।

সকল কথা সকলের মুখে ভালো শোনায় না। সেটা জেনেই বোধ হয় বলা। কিন্তু অনেকের মুখে আবার যা বলা হয় তাই শোনায়ও ভালো। সকলেই হেসে উঠলেন। মাসি বললেন, তুই থাম তো, বোনের হয়ে তোকে আর উমেদারি করতে হবে না।

সান্ত্বনা মুখরার মত ফড়ফড় করে বলল, বোনের জন্য আমি উমেদারি করব না তো কে করবে?

আগন্তুকদের একজন বললেন, তুমিও তো কম কাজের নও দেখছি?

ঠোঁট উল্টে সান্ত্বনা জবাব দিল, হ্যাঁঃ, ওর সঙ্গে আমার তুলনা! মাসিমা, ওঁদের এখানে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন, এখানটায় বেজায় গরম—

মাসিমা হেসেই জবাব দিলেন, তুই গরমে সেদ্ধ হয়ে কাজ করছিস আর ওঁদের একটু দাঁড়াতেও দিবি নে?

ভিতরে ভিতরে আবারও অস্বস্তি লাগছে সান্ত্বনার। আগন্তুকদের মধ্যে বর্ষীয়সী যিনি, তিনি মুখ ফুটে বলেই ফেললেন, আপন বলতে যখন শুধু আপনিই—এরও তো বিয়ে দেওয়া দরকার আপনার?

মাসিমা হাসিমুখেই বললেন, আপন হলেও ওর বিয়ে দেওয়ার সত্যিকারের মালিক তো আমি নই, ওর বাবাকে বলে বলে হয়রান হয়েছি।

সান্ত্বনার ইচ্ছে হল বেশ করে মুখের উপর দু-কথা শুনিয়ে দেয়। পারেও। কিন্তু মাসির জন্যেই সাহস হচ্ছে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্য দিকে চেয়ে।

দিনকতক বাদে চিঠি এলো এবারও। রান্নাঘরের সেই মেয়েটিকেই বিশেষ পছন্দ তাঁদের, তার বাবার কাছে যদি কথাবার্তা তোলা হয় তাঁরা খুশি হবেন।

একবার যেটা উড়িয়ে দেওয়া যায়, বার বার সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মেসো বিরক্ত হয়ে বললেন, মেয়ের বাবার যদি এখনো ঘুম না ভাঙে তো আমরা কি করব? একবার একখানা চিঠি লিখলে, তার জবাব পর্যন্ত দিলে না।

দুটো দিন একেবারে গুম হয়ে রইল সান্ত্বনা। অকারণ রাগে জ্বলতে লাগল

মনে মনে। সেটা লক্ষ্য করেই বোধ হয় হালকা হেসে মাসি এক সময় বললেন, তুই অমন করে আছিস কেন, লোকের তো চোখ আছে না কি—তুই থাকতে তোর বোনের বিয়ে হবে না।

সান্ত্বনা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তাহলে আমাকেই দূর করে দাও!

দেবই তো। এবারে তোকেই দূর করব আগে। বেশ ভালো হাতে মজা দেখাচ্ছি তোর বাবাকে।

মজাটা যে কি সান্ত্বনা জানে। আগের ব্যাপারটারই পুনরাবর্তন ঘটল। চুপি চুপি মাসির চিঠি বদল করতে হল আবারও।

পাঁচ-সাত দিন অপেক্ষা করে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন মাসি। বললেন, দেখেছ কাণ্ড! একটা জবাব দেওয়া পর্যন্ত দরকার মনে করে না সে!

তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা বাবাকে চিঠি লিখল আবার।—শীগগির মাসির কাছে চিঠি লেখো একখানা, আমি এখানে আছি, মাঝে-সাঝে তাঁদের খোঁজখবর করা তো উচিত তোমার, না কি—?

চিঠি পেয়েই অবনীবাবু বিনীত চিঠি লিখলেন গৃহকর্ত্রীর নামে। মাসি রেগে আগুন আরো। আসল কাজের কথার একটা উল্লেখ পর্যন্ত নেই! অর্থাৎ আমার মেয়ে নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাও কেন, কেমন—? আচ্ছা, এই আমি চুপ করলাম, আর যদি বলি তো...

আড়াল থেকে সান্ত্বনা এদিকের হাওয়াটা এক-একবার বুঝে যেতে লাগল। মাসির রাগ পড়েছে। পোস্ট অফিসের বিরুদ্ধে একযোগে দু'জনে খানিকটা অভিযোগ বর্ষণ করার পর অবনীবাবু সখেদে বললেন, এ রকম দু'দুটো ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে গেল, একবার জানতেও পারলুম না, যেমন বরাত—।

মাসি বললেন, তা'ছাড়া আর কি, নিয়তি-নির্বন্ধ না থাকলে কি করে আর কি হবে। কিন্তু তোমাকেও বলি, এ না হয় সেধে এসেছিল, কিন্তু তোমারও একটু চিন্তা-ভাবনা থাকা উচিত—অতবড় মেয়ে থাকলে চোখেপাতায় এক করতে পারতুম না আমি, তোমার কোন চিন্তাই নেই।

নীরব থেকে অবনীবাবু অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন বোধ হয়। মাসি আবার বললেন, অবশ্য মেয়ে তোমার পছন্দের মেয়ে, যে দেখবে সে-ই নিতে চাইবে—তবু চেষ্টাচরিত্র না করলে সবাই কি আর সেধে আসবে! তোমার বরাত ভালো অমন বাড়ন্ত গড়নেও বয়সের ছাপ পড়ে নি মেয়ের, আমার মণির থেকেও কচি দেখায়—তা'বলে সব কিছুরই একটা সময় আছে তো!

আড়াল থেকে মাসির উদ্দেশে বেশ করে মুখ ভেঙচালো বাড়ন্ত গড়নের পছন্দের মেয়েটি। চিঠি সংক্রান্ত অপকীর্তিটা পাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, সেই ভয়ে ধারে কাছে ঘেঁষছে না। নইলে বাবার সামনে মাসিকে আর এক দফা শুনিয়ে আসতে পারত অনায়াসে। অত লজ্জাশরমের ধার ধারে না, তা সে নিজের বিয়ের প্রসঙ্গেই হোক বা যারই হোক।

বাবাকে সান্ত্বনা হাতের মুঠোয় পেল সেই সন্ধ্যার পরে। কিন্তু মেয়ের কাছেও অবনীবাবু প্রথমেই চিঠি না পাওয়ার খেদ প্রকাশ করেই ফাঁপরে পড়ে গেলেন। একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল সান্ত্বনা।...ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্—বেশ হয়েছে চিঠি পাও নি, খুব ভাল হয়েছে, পোস্ট অফিসকে আমি একহাঁড়ি রসগোল্লা পাঠিয়ে দেব। এসে পর্যন্ত আর কোন কথা নেই, বিয়ে বিয়ে বিয়ে বিয়ে—!

বাবা-মেয়ের সম্পর্ক নয় তাদের। মা-মেয়ে সম্পর্ক বলা যেতে পারে। সান্ত্বনার মা মারা যাওয়ার অনেক আগের থেকেই তাই। ভালো হোক, মন্দ হোক, কোনো একটা ধারা থেকে অবনীবাবু মেয়েকে আড়ালে রাখতে চেয়েছেন সেই ছোটবেলা থেকেই। চেয়েছেন দুই বাহু বিস্তার করে আগলে রাখতে। বাবা-মেয়ের ব্যবধান ঘুচে গেছে এক যুগ আগে। সেই আদরেই সম্ভবত মেয়ের আজও বয়স বাড়ে নি।

অবনীবাবু বললেন, আমি কি করব, তোর মাসি বলছে একুশ-বাইশ বছর নাকি বয়েস হয়ে গেল তোর—

তবে আর কি, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই যাকে পাও গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে এসো, বিয়ে করে ফেলি—।

হেসে ফেলল। রাগ মিলিয়ে গেলে। অবনীবাবুও হাসলেন। সান্ত্বনা তাঁকে নিরীক্ষণ করে দেখল কিছুক্ষণ। বলল, তুমি একটু রোগা হয়ে গেছ বাবা।

অবনীবাবু হালকা হেসে জবাব দিলেন, তোর বিয়ের ভাবনাতেই তো।

হুঁ! তোমার একটা মেয়ে আছে তাই মনে থাকে কি না সন্দেহ, ভাবনা না ছাই।

আচ্ছা, থাকে না। তুই কেমন আছিস বল্।

খুব ভালো। দিব্যি খাচ্ছি-দাচ্ছি আর মাসির ওপর তম্বি করে বেড়াচ্ছি, কেমন মোটা হয়েছি দেখ না।

অবনীবাবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। কিন্তু সান্ত্বনার ভিতরটা তখন অন্য কিছু জানার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। ভাবল একটু। নীরবে দুই চোখ বাবার মুখের ওপর ঘুরে এলো এক প্রস্থ।

আচ্ছা বাবা, মড়াইয়ের কাজে তুমি নিজে বদলি হলে, না তোমাকে বদলি করা হল?

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিলেন না অবনীবাবু। চকিতে তাকালেন একবার মেয়ের দিকে।—কেন রে?

এমনি, বলোই না।

পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরেই তো চাকরি, এত বড় কাজ হচ্ছে সেখানে, কত পোস্ট খালি পড়ে আছে, চলে এলাম।

খুব সত্যি কথা বললেন না। বললেন না বলেই বিব্রত হলেন মনে মনে।

এত বড় কাজ হচ্ছে শুনে সান্ত্বনা সোৎসাহে বলে উঠল, খুব মস্ত কিছু হচ্ছে বাবা, তাই না? আচ্ছা, যেখানে কাজ হচ্ছে সেই জায়গাটা আমাদের ওখান থেকে কত দূর?

নিজের অজ্ঞাতেই আবার একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন অবনীবাবু। পরে

হেসে বললেন, তুইও যেমন, কোথায় মড়াইয়ের ড্যাম আর কোথায় আমাদের সে জায়গা!

নিমেষে ম্লান হয়ে গেল সান্ত্বনার মুখ। সব উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল যেন। বলল, তাহলে আর কি হল বাবা—সেখানে তো আর তাহলে জল যাবে না?

অবনীবাবু হেসে উঠলেন।—তুই বুঝি এই সব ভাবিস এখনো? জল যাবে না কেন, ড্যাম হলে ওর ডবল দূরেও জল যাবে—কিন্তু জল যাক না যাক আমাদের কি, আমরা কি আর সেখানে ফিরে যাচ্ছি, সব তো বেচে দিয়েছি।

সান্ত্বনার সমস্ত মুখ খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল আবার। বলল, যেতে বয়ে গেছে আর সেখানে, মা গো! সেখানে আবার কেউ থাকে! কিন্তু তুমি তো ভারী স্বার্থপর বাবা, নিজেরা থাকব না বলে এত কালের জলের কষ্টটা দূর হবে সেটা কিছু নয়? তুমি এখান থেকে যাচ্ছ কবে?

দাঁড়া, দুটো দিন জিরোই, আমি গেলেই কি তাড়াতাড়ি জল এসে যাবে?

লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল সান্ত্বনা।—না তা কেন, আমাকে তো সব গোছগাছ করে নিতে হবে, এরপর হুট করে তুমি বলে বসবে, চল—

দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল অবনীবাবুর। তোকে বলব! তুই কোথা যাবি?

ততোধিক বিস্ময়ে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল সান্ত্বনা।—আমি যাব না? এক বছর ধরে এত বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে সেখানে, এখন তুমি একলা যাবে আর আমি এখানে বসে থাকব? তুমি বল কি বাবা!

যেন এই এক বছরই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, এখনও সে গিয়ে পৌঁছতে না পারলে এত বড় একটা ব্যাপারের সব কিছুই পণ্ড। মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন অবনীবাবু। কণ্ঠস্বরে একেবারে উড়িয়ে দিতে চাইলেন সান্ত্বনার ইচ্ছেটা— হ্যাঁ, সাত-তাড়াতাড়ি এখন তোকে সুদ্ধু নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হই আমি—কোথায় থাকব কি ব্যবস্থা কিছুই ঠিক নেই! পরে না হয় এক সময় ঘুরে দেখে আসিস, এখনো দু'তিন বছর লাগবেই সেখানকার কাজ শেষ হতে।

না না না না না। আমি কিছুতেই থাকব না এখানে, আমি যাবই তোমার সঙ্গে—আজ তিন বছর ধরে আমাকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে করে ভোলাচ্ছ—তোমার শরীর খারাপ হয়েছে, তোমারও দেখাশুনা দরকার, যাবই আমি।

আলটিমেটাম দিয়ে এক ঝটকায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিপদগ্রস্তের মত বসে রইলেন অবনীবাবু। কিন্তু তবু সহজে রাজী হলেন না তাকে নিয়ে যেতে। মাসিও তাঁর দিকেই সায় দিলেন। মেয়ে নিয়ে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। দু'জনে মিলে অনেক বোঝালেন তাকে, পরে নিয়ে যাওয়া হবে বলে আশ্বাসও দিলেন। বাধ্য হয়েই হাল ছাড়লেন শেষে।

চলুক তাহলে। অবনীবাবু বললেন, মোটে তিন-চার ঘণ্টার পথ মোটরে—একটা কথা বলবারও লোক পাবে না যখন, নিজেই পালিয়ে আসতে চাইবে।

মাসির বাড়িতে শোকের ছায়া নামল যেন। মাসি তো মাসি, মনে মনে একটু বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে মাসতুত বোন....সে পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলাল। কিন্তু

একটুও কাঁদতে পারছে না, এতটুকু লোকদেখানো মনখারাপও করতে পারছে না শুধু সান্ত্বনাই। সেই জন্যেই বরং খারাপ লাগছে তার, অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। কেমন করেই বা পারবে সে মনখারাপ করতে! মাসির বাড়ি ভালো। খুব ভালো। এত ভালো হয় না।

কিন্তু সে যাচ্ছে কোথায়?

ওই দূর আকাশের গায়ে মেঘের মত মিশে আছে যে পাহাড়গুলো—যাচ্ছে তাদেরই একেবারে বুকের ডগায় বাস করতে। যাচ্ছে ওই দুর্বোধ্য বিরাট বিস্ময়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে। সেখানে বিজ্ঞানের যে কারিগরি চলেছে যুগযুগান্তরের মাটির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে, যাচ্ছে তাই দাঁড়িয়ে দেখতে। একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে দাঁড়িয়ে, মধ্যে দাঁড়িয়ে। যাচ্ছে মানুষের হাতেগড়া বিধাতার দণ্ডের এই সার্থক প্রতিবাদ দেখতে। যাচ্ছে মড়াই নদীর ড্যাম দেখতে। মনখারাপ সে কেমন করে করবে? শরতের খুশির আকাশে হালকা মেঘের নিরানন্দ কতটুকু?

॥ ২ ॥

রোমাঞ্চকর বটে। কিন্তু মড়াইয়ের এই বিগত একটা বছরের সকল বৃত্তান্ত অনুকূল নয় খুব।

গড়ার কাজে জড় বাধা দূর করার স্ফুলিঙ্গ আছে বিজ্ঞানের মশালে। সে বাধা উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখার করতে সময় লাগে না। কিন্তু আর একটা বাধাও আছে যা জড় নয়, কিন্তু অনেক বেশি নিটোল, অনেক দুর্ভেদ্য। শতাব্দী কালের সংস্কার আর অজ্ঞতায় তার ভিত নড়ে না। যুগ-যুগান্তের অবিশ্বাস আর অন্ধতায় ওতে আলো পড়ে না। অনাগত কালের আশ্বাসে তার বাঁধন টলে না।

এই জীবন্ত মানুষদের অসূর্যম্পশ্য আঁধার তপস্যা উদ্‌যাপনের মন্ত্র জানা নেই কারোরই। ওদের সম্মিলিত তমিস্র প্রাচীর বিদীর্ণ করার মত ছোট একখানি বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালাতে পারে এত আলো নেই বিজ্ঞানের আগুনে। সে প্রদীপ অন্তরের স্পর্শ-পিপাসু। বিজ্ঞানের নয়। কিন্তু এই হৃদয়ের স্পর্শ থেকে আজীবন বঞ্চিত ওরা।

মড়াইয়ের ধারে ধারে, পাহাড়ের গায়ে গায়ে, ঘন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত যে জনবসতি গড়ে উঠেছিল তার সংখ্যা কম নয়। প্রায় দেড়শ গ্রাম। প্রায় হাজার পনের নারী পুরুষ। গ্রামগুলো ছিল ছাড়া-ছাড়া, মানুষগুলোর অস্তিত্বের আড়ম্বর ছিল না খুব। সাঁওতাল বটে, কিন্তু শহর বা আধা শহরে বাঙ্গালী-ঘেঁষা সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের তফাত অনেক। তাদের হাবভাব চালচলন রীতিনীতিতে সমতলভূমির কমনীয় ছোঁয়া লাগে নি তেমন।

কিছু একটা হবে এখানে, অনেক দিন ধরেই তারা তার আভাস পাচ্ছে। তোড়জোড় দেখছে। সাজসরঞ্জাম দেখছে। মাতব্বর জাত-ভাইদের মুখে রূপকথা শোনার মত শুনছেও কিছু কিছু। কিন্তু সঠিক বুঝছে না। যারা বলছে রূপকথা তারাও না, যারা শুনছে তারাও না। তাই হঠাৎ একটা প্রলয় দেখল যেন তারা। আর সেটুকুই

বুঝল। এর থেকে সৃষ্টির হদিস ওরা পাবে কেমন করে? যা দেখল তারই আঁচ লাগল মনে। কানাকানি শুরু হল নিজেদের মধ্যে। ছোট থেকে বড় হতে লাগল কানাকানির গণ্ডি। বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা ছাড়াও রূঢ় প্রতিবাদের ছাপ পড়তে লাগল মুখে।

বিজ্ঞানের আসল দূতদের ওরা সামনাসামনি পায় না। চেনেও না। কিন্তু তাদের চেলাচামুণ্ডাদের সাক্ষাৎ পেতে লাগল। চিনতে লাগল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে এলো তারাই। কারণ, কাজ চালু করতে হলে ওদের চাই। ওদের বিশ্বাস চাই আর গতর চাই। মড়াইয়ের কাছ থেকে ওদের সরানো চাই।

কিন্তু এই সৃষ্টিমাহাত্ম্য ওদের বোঝানো পাকা কারিগরের পক্ষেও দুঃসাধ্য প্রায়।

মরা মড়াই তোমাদের কূলে কূলে ফুলে উঠবে, ফেঁপে উঠবে। যতদূর চোখ যায় মড়াইয়ের জলে সব ডুবে যাবে! আশপাশ থেকে, ধারকাছ থেকে তাড়াতাড়ি সব সরতে লাগো তোমরা।

তোমাদের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি?

কিচ্ছু ভাবনা নেই। সরকার দেবে। ক্ষতিপূরণ দেবে। নতুন করে ঘরবাড়ি তোলার খরচ দেবে। দেবে কেন, দিচ্ছেই। তোমরা নাও গে যাও। দূরে গিয়ে গ্রাম বসাও, ঘরবাড়ি তোলো। আর এখানে এসে মড়াই বাঁধার কাজে লাগো। মজুরি খাটো। ফি হপ্তায় টাকা পাবে। মেয়ে-পুরুষ সবাই এসো। যার গতর আছে সে-ই এসো।

জলের কথায় যাদের মন ভিজেছিল তারাও বিগড়ে গেল আবার।

ঘরবাড়ি ছেড়ে দিতে হবে!

ঘরবাড়ি ছেড়ে উঠে যেতে হবে!

এ প্রস্তাবের সঙ্গে ওদের আপস নেই কোন। সৃষ্টির ইতিহাস থেকে অদৃষ্ট ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এই মর্ত্যভূমির দিক্‌বিদিকে। অবশ্য মর্ত্যভূমি বলতে যেটুকু ওরা বোঝে তার গণ্ডি খুব বড় নয়। কিন্তু তাদের সেই পৌরাণিক অভ্যুদয়ের প্রথম অধ্যায় থেকে তারা শুনে আসছে এই ঘর-ছাড়ানি দেশ-খোয়ানি বিধিলিপির কথা। সৃষ্টি থেকে বনজঙ্গলের বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই করে মাটিকে বাসের উপযোগী করেছে নাকি তারাই। কিন্তু যাযাবর জীবনের অভিশাপ লেখা ওদের কপালে সেই আদি কাল থেকে। সেটা সত্যি কি মিথ্যে জানে না, কিন্তু বিশ্বাস করে। তাই বসতি ত্যাগের আভাস মাত্রে অসহিষ্ণু ক্ষোভে প্রায় হিংস্র হয়ে ওঠে ওদের মূর্তি।

এই বিক্ষোভের আর একটা কারণ আছে। আর সেটাই বোধ করি সব থেকে বড় কারণ।

অবিশ্বাস।

সভ্য মানুষের প্রতি অবিশ্বাস। সভ্যতার প্রতি অবিশ্বাস। বনের হিংস্র বাঘ ভালুককে তারা ভয় করে না। কিন্তু এই সভ্যতাকে করে।

তাদের এই নিকষকালো দেহের ভিতরে কোথাও এতটুকু কালোর আভাস মাত্র ছিল না। ওদের ওই কালো বুকের মধ্যেই ছিল খোলা আকাশের মুক্ত সরলতা। কিন্তু সেই সাদা বিশ্বাসের ওপর মাশুল চড়িয়ে চড়িয়ে সেটা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে

সভ্য বুদ্ধিজীবী মানুষ। হিংস্র নখদন্ত মেলে একদা যারা সর্বস্ব গ্রাস করতে চেয়েছিল। যারা সর্বস্ব গ্রাস করেও ছিল।

পূর্বপুরুষদের সেই রক্ত-ঝরা দিনের কথা ওরা আজও ভোলে নি। ওরা কোনদিন ভুলবে না বোধ হয়।

নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য দিয়েই একদিন ভরা প্রাচুর্যের মুখ দেখেছিল তারা। কারো প্রত্যাশায় বসে থাকে নি কোনদিন। কিন্তু সে প্রাচুর্যের প্রথম রাশ টেনে ধরেছিল একশ বছর আগের পরদেশী শাসনব্যবস্থা। তাদের চাষের জমির ওপর আশী হাজার টাকা মাশুল ধার্য করেছিল সেদিনের রাজপ্রতিনিধি।

সেখানেই শেষ নয়।

কোথা থেকে এলো তারপর এই সভ্য মানুষের দল। তাদের লোলুপ দৃষ্টির অর্থ তখন দুর্বোধ্য ওদের কাছে। ওরা সরল, ওরা কুটিলতা বোঝে না, তার মাশুলও দিতে হবে বৈকি! মহাজনের থলে নিয়ে বন্ধুর নামাবলী পরে আগমন ঘটতে লাগল তাদের। প্রলোভনের সামগ্রীতে তাদের আড়ত ভরা। সেই যূপকাঠে ওরা গলা বাড়িয়ে দেবে না তো দেবে কারা?

নুন চাই? নাও না গো, তোমাদের জন্যেই তো। তবে বড় দামী জিনিস...আচ্ছা এক গাড়ি ধানের বদলেই নিয়ে যাও ওই নুনের চাঙটা—কিন্তু বাপু পরের বারে অত সস্তায় পাচ্ছ নি, এক কলসী ঘি দিতে হবে এরপর।

—কি চাই, এই একজোড়া পায়রা? বদলে দেবে কি—এই একজোড়া বলদ মাত্র? আচ্ছা, নিয়ে যাও ভাই, নিয়ে যাও।

নিষ্ঠুরতার মাত্রা বাড়তে লাগল।

ঘি মাপার পাত্রটা তলায় ফুটো কিনা, সেরের বাটখারা পাঁচসেরী হয়ে গেল কিনা, সে ওদের কে বলে দেবে?

কিন্তু এ-ও তাদের যথাসর্বস্ব নয়, যথাসর্বস্ব চাই যে!

—কি চাই ভাই, টাকা? ধার নেবে? খুব ভালো খুব ভালো, দরকার হলে নেবে বৈকি টাকা ধার—ওই জন্যেই তো টাকা।

এই শেষেরটুকুর জন্যেই বসেছিল যেন।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। কিন্তু এই মহাজনেরা ছুঁলে কত ঘা? বংশ-বংশ ধরে সে ঘা আর শুকোয় না।

—দশ টাকা ধার নেবে? তাহলে পনেরো টাকা লিখতে হবে। টাকা শুধতে এসেছ? কত টাকা দেবে? পনেরো? দাও, আর সেই সঙ্গে সুদটাও দিও। সুদ কেন? এই যে পনের টাকায় টিপসই দিয়েছ ভাই। আসল দেবে, সুদ দেবে না?

না দিলে আদালত আছে। আর সেদিনের সেই আদালতের শরণাপন্ন হয়ে এই জীবগুলোর কাছ থেকে টাকা কি করে আদায় করতে হয়, সে ওরা ভালই জানে।

পঁচিশ টাকা একবার যে ধার নিলে, এই জীবনে সে আর তার ঋণ পরিশোধ করে যেতে পারল না। তার ছেলেও না, তাঁর ছেলেও না। এই করে ওদের জমি গেল, বাড়ি-ঘর গরু-বাছুর ছাগল-ভেড়া থালা-বাটি সব গেল। নিজেরাও বাঁধা পড়তে

লাগল তার পর। বাঁধা পড়তে লাগল চির দাসত্বের শিকলে। দুশ্চিন্তা আর হতাশা হল জীবনের সঙ্গী। অন্যত্র কাজ করে ঋণ পরিশোধ করবে তারও উপায় নেই—মহাজন সঙ্গে সঙ্গে নাকে দড়ি পরিয়ে আদালতে টেনে নিয়ে যাবে। আর সেখানে তাদের পরাজয়ের পরোয়ানা লেখাই আছে।

পালাবে ?

পালাবে কোথায় ?

কত দূরে ?

বাড়তেই লাগল এই দাসের সংখ্যা। আবর্তিত হতে থাকল তাদের মর্মছেড়া দীর্ঘনিঃশ্বাস।

এমন দিনে খবর এল, অদূরে 'লোহার ঘোড়া' চলার রাস্তা বসাচ্ছে সাদা চামড়ার সাহেবরা। অর্থাৎ রেলপথের মাটির কাজ শুরু হয়েছে। ভাগ্যক্রমে মহাজনের বেড়ি পায়ে পড়ে নি এমন যারা ছিল, মজুরি খেটে কোঁচড় ভরে টাকা নিয়ে আসতে লাগল তারা। শিশু নারী পুরুষ সকলেই। সাড়া পড়ে গেল একটা। শ্রম-কাতর নয় তারা।—চল্ চল্ চল্ তোরা সব—ঋণ শুধবি তো সবাই চল্ এবার !

কিন্তু ঋণ পরিশোধ হলে মহাজনদের চলবে কেন ? ঋণ-দায়ে আত্মবিক্রীত ক্রীতদাসেরা চলে গেলে এদিকের ক্ষেতমজুরি করে কে ? মহাজনদের শিকল হিংস্র হয়ে উঠল আরো।

ওদের এত কালের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ আর স্ফুলিঙ্গ দাবানলের মত জ্বলে উঠেছিল তার পর।

ওরা প্রতিবাদ করেছিল। প্রতিবাদ করেছিল মহাজনদের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করেছিল সেই শ্বেত-শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সে প্রতিবাদ রক্তের অক্ষরে লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়।

ওরা মরেছিল। আর মেরেছিল। ওরা রক্ত দিয়েছিল। আর রক্ত পান করেছিল।

রাক্ষসী বটের নিচে কপট দারোগায় দেহ উপদেবতা-প্রধান সূর্যদেব 'জমছিম বোঙ্গা'র উদ্দেশে বলিদান দিয়ে রক্ততর্পণ শুরু করেছিল তারা। 'রাখসী থানের বট'—এই একশ বছরেও নররক্তে ভেজা শিকড় কি তার শুকিয়েছে ?

এক লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণ দিয়েছে তার পর। পরাজিতও হয়েছে। কিন্তু তাতে কী ? বিদ্রোহী ভৃগুর পায়ের চিহ্ন ভগবানের বুক থেকে মুছবে কোন দিন ? সভ্যতার বুক থেকে এই বিদ্রোহী কালো মানুষদের পায়ের দাগও মিলাবে না কোন দিন।

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছে ওরা। ইতিহাসের সেটা স্থূল অধ্যায়। পরাজিত হয়েছে ওদের অবিনশ্বর নেতা সিদু আর কানু। জাতির উপাস্য দেবতা 'মারাং বুরু'র আবির্ভাব ঘটেছিল নাকি তাদের মধ্যে। তারা নিজেরাই সেদিন প্রচার করেছিল এ কথা। অন্ধ-বিশ্বাসীর বুকে বিপ্লবের আগুন জ্বালতে হলে এই বজ্রনির্ঘোষ ছাড়া আর গতি ছিল না কিছু। প্রাণ দিয়েছে সেই 'মারাং বুরু' প্রতীক সিদু কানুও। কিন্তু এই নিরক্ষর মানুষদের বুকে দেবতার আবির্ভাব সত্যিই কি ঘটে নি সেদিন ? দুরাচারীর

বিনাশ-সাধনে যুগে যুগে দেবতার আবির্ভাব মানুষের বেশে—সে তবে কী? সে তবে আর কেমন করে হয়?

সেই শতাব্দী কালের অবিশ্বাসের ধারা আজও তাদের ধমনীতে বইছে।

হঠাৎ একটা সাড়া পড়ে গেল। হঠাৎ একটা জাগরণ এলো। হঠাৎ একটা আলোড়ন এলো। ছাড়া-ছাড়া গ্রামগুলো একটা মিলিত স্বার্থের সংযোগে একসঙ্গে নড়েচড়ে উঠল যেন। স্বার্থে নয় ঠিক, আশঙ্কায়। আশঙ্কায় আর উদ্বেগে।

সমবেত উচ্ছেদের কথাটা শুনে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল যেন সকলে। তার পর একটু একটু করে সচেতন হতে লাগল তারা। কোনো প্রস্তাব নয়, কোনো দুঃস্বপ্ন নয়—সরকারের নোটিশ জারি হয়েছে একেবারে। রূঢ় কঠিন বাস্তব। মুগুরের ঘায়ে ঘুম ভাঙানোর মত।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল প্রতি গাঁয়ের 'মাঝি' আর 'পারাণিক'রা। উৎসবে ব্যসনে রোগে শোকে মাঝি গাঁয়ের মাথা। পারাণিক তার প্রধান সহকারী। একদা তারাই ছিল গাঁয়ের হর্তা-কর্তা বিধাতা। কিন্তু কালের পরিবর্তনে সে প্রতিপত্তি অনেকটাই স্তিমিত। তাই সুযোগ সুবিধে পেলেই নিজেদের অস্তিত্ব কড়ায় গণ্ডায় জাহির করে থাকে। কিন্তু এমন একটা গুরুতর ব্যাপারের তাড়া খেয়ে একেবারে যেন হকচকিয়ে গেল। পদমর্যাদার মুখোশ খসিয়ে নিজেদের মধ্যে, অর্থাৎ, বিভিন্ন গাঁয়ের মুরুব্বীদের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের জন্য ছোটাছুটি শুরু করে দিল তারা।

ঝড় যখন আসে শুধু তখনই মিতালি হয় বোধ হয় বনস্পতির সঙ্গে তুচ্ছ তৃণ-লতারও। এই ঢালা উচ্ছেদ সম্ভাবনার আঁচ লাগল আরো এক দলের গায়ে—যারা এদের দলগত নয় ঠিক। যারা শিক্ষিত এবং আধা-শিক্ষিত। যারা ভদ্রলোক এবং আধা-ভদ্রলোক। সমস্ত পরিবেশ জুড়ে এ রকম গৃহস্থ-বসতিও একেবারে কম নয়। ভিতর থেকে মুরুব্বীদের শলাপরামর্শ দিতে লাগল তারাই। একত্র বসবাসের ফলে এদের ওরা সন্দেহ করে না, অবিশ্বাস করে না। তারা বলল, একসঙ্গে রুখে দাঁড়াও তোমরা, কিছুতেই বাস্তুভিটে ছেড়ে যেতে রাজী হয়ো না।

রোজ সাড়ম্বরে মিটিং হতে লাগল এর পর। আজ এই হাটে, কাল ওই হাটে। বাঁধতে দেব না আমাদের মড়াই, মড়াইকে আমরা ভালোবাসি, ভক্তি করি—মড়াই বাঁধলে অধর্ম হবে আমাদের। কি উপকার হবে মড়াই বেঁধে? তোমরা কেউ কাজ করো না, কেউ তোমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিও না।

কিন্তু দিন গেছে।

যে রাজশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব-পুরুষেরা অস্ত্র ধরেছিল এক দিন, তার থেকে দিন অনেক বদলেছে। রক্ত ওদের অনেক বদলেছে। রক্ত ওদের অনেক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিজ্ঞান দুর্গমকে অনেকটাই সুগম করে আনার ফলে ওদের সেই অটুট বিচ্ছিন্নতার সুযোগ সুবিধে অনেকটাই ঘুচে গেছে। ওরা রাজনীতি বোঝে না, কিন্তু রাজনীতির অমোঘ গতি উপলব্ধি করে খানিকটা।

তাই গাঁয়ের মাঝি মাতব্বরেরা চিন্তিত। চিন্তিত সকলেই। কি হবে? ভাল হবে কি মন্দ হবে? গাঁ ছেড়ে যাব না বলছি, কিন্তু না গিয়ে পারব কেমন করে? বাধা

দেব, কিন্তু কেমন করে দেব?

আর চিন্তিত পাগল সর্দার।

পাগল বলতে পারে না, বলে পাগড় সর্দার। সর্দার পদবী নয় কিছু। ওটা. অমনি চলে আসছে। মাঝি নয়, মুরুব্বী নয়, পারাণিকও নয়—তবু সর্দার।

'মারাং বুরু' প্রতীক সেই সিদু কানুর ডান হাত ছিল নাকি তার কোন্ পূর্ব-পুরুষ। সেই পুরুষের বংশধর। ওপরঅলার রীতি বিচিত্র। সেই তমসাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসের যুগেও দুটি মানুষের বুকে জেগেছিল চেতনারূপী সূর্যসেনা! আজকের এই কর্তব্য-বিমূঢ় আলোড়নের মধ্যেও একটা শুভ চেতনা বার বার উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল যে মানুষটির অন্তস্তলে—সে এই পাগল সর্দার।

ভাবছে পাগল সর্দার।... ভাবছেই।

ওরা বলছে জল হবে। ওরা বলছে জলের অভাব ঘুচবে। হবে কি না কে জানে? ঘুচবে কি না কে জানে? ...কিন্তু চেষ্টা হবে। এই চেষ্টাই যদি না হয়, তাহলে? মাটি খাঁ-খাঁ করছে, তাই করবে। মাটির নীচে আগুন জ্বলছে, তাই জ্বলতে থাকবে। মাটির দানায় দুর্ভিক্ষ লেগে আছে, তাই লেগে থাকবে। মাটির ফাটলে উপোস বাসা বেঁধেছে, তাই বাঁধা থাকবে। তাহলে? তাহলে?

তাহলে কিছু করা দরকার। কিছু না করলে কিছু হবে কি করে? সেই কিছুই তো করতে চাইছে বাবুরা। সেই কিছুর চেষ্টাই করতে চাইছে। তবে আর বাধা দেব কেন? কি লাভ হবে বাধা দিয়ে? কি পাবে তারা? আজ পাবে না, কাল পাবে না, কোন দিনই কিছু পাবে না। ভরসা তো শুধু ঝরনার জল। কিন্তু সে ভরসা কতটুকু তা তো বছরের পর বছর হাড়ে হাড়ে বুঝছে। তবে আর তারা কেন দেবে বাধা?

অনুগতদের ডেকে এই কথাই বললে পাগল সর্দার।

এই সহজ কথাটাই বোঝালে। দলছাড়া স্বতন্ত্র মানুষ পাগল সর্দার। কিন্তু ভক্তের সংখ্যা কম নয়। বেশির ভাগই তারা ছেলে-ছোকরার দল। একদা ডাকসাইটে শিকারী ছিল মানুষটা। শিকারে বেরুনো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে। প্রৌঢ়ত্ব ছাড়িয়ে বার্ধক্যের দিকে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু শিকার করা ছেড়েছে তার অনেক আগেই। অসময়ে ছেড়ে দিয়েছে এই একমাত্র বিলাস। তবু তার শিকারেরর গল্প তরুণ উদ্যমীদের মুখে মুখে ফেরে আজও। তারা দেখে নি, কিন্তু শুনেছে। শুনে আসছে।

হঠাৎ একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল প্রায় সর্বত্র।

পাগল সর্দার ভিটেমাটি ছেড়ে দূর যেতে রাজী হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে রাজী হয়েছে আরো অনেকে। মাথার ওপর যাদের বয়স্ক অভিভাবক নেই বিশেষ করে তারা। শুধু তাই নয়, পাগল সর্দার এদের নিয়ে মড়াই বাঁধার কাজে লাগতেও নাকি রাজী হয়েছে।

3126

ভিটেমাটি ছাড়তে রাজী না হলেও জোর করে ছাড়ানো হবে হয়তো, এই ক'দিনে প্রায় সকলেই উপলব্ধি করেছে সেটা। কিন্তু তা বলে ওদের সঙ্গে গিয়ে কাজে লাগা! কারো কাছে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, মাঝির অনুমতি না নিয়ে!

No 3126
Commissio..
Fund

পাগল সর্দার বেইমান ? পাগল সর্দার বিশ্বাসঘাতক ! পাগল সর্দার অধার্মিক !

রক্তচক্ষু মাতব্বরেরা এলো কৈফিয়ৎ নিতে। পাগল সর্দার কৈফিয়ৎ দিল। তারা বলল, নদী বাঁধলে অনেক ক্ষতি হবে, অনেক লোক মারা পড়বে।

ও বলল, অনেক লাভ হবে, অনেক লোক বাঁচবে।

রুদ্ধ আক্রোশে ফিরে গেল তারা। মাঝির পঞ্চাতি বৈঠক বসল অবিলম্বে। একঘরে করা হল পাগল সর্দারকে। কাপড় চাল তেল সব বন্ধ। সমাজ বন্ধ।

কিন্তু এই করে পাগল সর্দারকে এঁটে ওঠা যাবে না। এও বোঝে মাতব্বরেরা। সরকারের কাছ থেকে সবই পাবে সে। অনেক বেশি পাবে। আর শায়েস্তাই বা করবে কি করে, সে একা নয়, একদল জোয়ান মরদ আছে তার দিকে।

মাঝির বিষম রাগ পাগল সর্দারের ওপর। এই ব্যাপারে নয়। অনেক আগে থেকেই।

কারণও আছে বিশেষ।

ও লোকটার জন্য ঘরের শান্তি মানসম্ভ্রম সবই নষ্ট হচ্ছে তার।

অশান্তির কারণ তার নিজের ছেলে হোপুন আর পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণি।

মরদের মত মরদ ছেলে মাঝির। অমন ছেলের গর্বে বাপের ছাতি ফুলে ওঠার কথা। কিন্তু তাকেও তুক করেছে লোকটা। আর তার মেয়েটা। ফুলমণির মেয়ে চাঁদমণি। 'ছাড়ুই কুড়ী' ফুলমণি। স্বামী ছেড়ে পালানো মেয়ে ফুলমণি। পরপুরুষের সঙ্গে 'আপাঙ্গির' হয়ে গেছে ফুলমণি। 'আপাঙ্গির কুড়ী'—ঘর ছাড়া মেয়ে। ওরা বলে, ঘর ছাড়া মেয়ে সবুজ বুলবুল, হাজার রকম ডাকে। ঘর ছাড়া মেয়ে ময়না পাখি, মাথায় কেবল বাহার। সেই ঘর ছাড়া ফুলমণির মেয়ে চাঁদমণি। যত গোলযোগ, যত আপত্তি, যত বাধা এইখানে। এসব ঘর ওদের সমাজে হেয়। আর মাঝির ছেলে হয়ে কিনা হোপুন ওই মেয়ের পিত্যেশে বসে আছে !

এককালে পাগল সর্দার শ্রদ্ধার পাত্রই ছিল সকলের। গাঁয়ের মাঝি না হোক, অল্প বয়সেই 'জগমাঝি' যে হোত কোনো সন্দেহ নেই। কাকে বলে জগমাঝি ? এক কথায় যুবক-যুবতীদের সর্দার। গ্রামে যাতে লজ্জার কোনো কারণ না ঘটে, সুনামের হানি না হয় সেটা দেখার গুরুদায়িত্ব জগমাঝির। ছেলেমেয়েরা তাই জগমাঝির কথায় ওঠে বসে, সর্বদা তাকে সন্তুষ্ট রাখে।

কিন্তু যার ঘরে অমন কলঙ্ক সে আর জগমাঝি হবে কেমন করে ? উল্টে সমাজচ্যুত হয়েছিল। নেহাৎ পাগল সর্দার বলেই অল্পের ওপর দিয়ে রেহাই পেয়ে গেল। 'জমজাতি' হল আবার, সমাজে উঠল। কিন্তু ওদের সমাজে 'ছাড়োয়া' পুরুষের ওপরও লোকে সন্তুষ্ট নয় তেমন। ছাড়োয়া মানে স্ত্রী-পরিত্যক্ত। বাপ-মা মেয়ের বিয়ে দেয় না এদের সঙ্গে। কুমারী মেয়েরাও চায় না এদের ঘরণী হতে। বলে, ছাড়োয়া পুরুষ চাখা হাতা, কে জানে কয় দিন !

কিন্তু সব নিয়মেরই আবার ব্যতিক্রম আছে। পাগল সর্দার সেই মূর্তিমান ব্যতিক্রম।

ব্যতিক্রম বলেই সমাজের রক্ষণশীল মুরুব্বীরা সহ্য করতে পারে না ওকে, বরদাস্ত করতে পারে না। ইচ্ছে করলেই আবার বিয়ে করতে পারত পাগল সর্দার। ছাড়োয়া

হওয়া সত্ত্বেও। কুমারী মেয়েই পেত। তালাক দেওয়া মেয়ের সন্ধান করতে হত না। শুধু তাই নয়, যে লোকের ঘরে এত বড় কলঙ্ক, সমাজে উঠলেও আজীবন তার মাথা নিচু করেই থাকার কথা। কিন্তু পাগল সর্দারের বেলায় সকলে যেন সেটা ভুলেই গেছে। জগমাঝি না হলেও সোমত্ত ছেলেমেয়েগুলো তার কথায় ওঠে বসে। লোকটা যাদু জানে না তো কী? ও ডান না তো কী? আগের দিনে ডানএর নাগাল পেলে মারপিট করে একেবারে শেষ করে দিত তারা। কিন্তু এখন সেটা করতে গেলে হাকিমের বিচারে উল্টে তাদেরই জেল হয়ে যাবে। হাকিমেরা সব বোঝে, কিন্তু ডান বোঝে না।

তবু সবই সহ্য হত মাঝির। সবই ক্ষমা করত, যদি না নিজের অমন ছেলেটার এমন সর্বনাশ করত ওই লোকটা আর তার নচ্ছার মেয়েটা। বাপ ছেলের এই নিয়ে বিবাদ লেগেই আছে। ছেলেকে মনে মনে ভয়ই করে সে। জোয়ান ছেলে, কালো পাথরেকোঁদা বুকচিতানো ছেলে—কথা বেশি বলে না, মরা চোখে মুখের দিকে চেয়ে থাকে শুধু। কিন্তু তাইতেই অস্বস্তি লাগে কেমন। যত নিষ্প্রাণ হয় ওর চোখ, তত বেশি অস্বস্তি।

বিয়ে এত দিনে হয়ে যেত। চাঁদমণিকে এত দিনে কবে ঘরে এনে তুলত হোপুন। কিন্তু কেন যে সেটা হয় নি সেটাই মাঝির বিস্ময়। কেন মত দেয়নি পাগল সর্দার? মাঝির মত নেই বলে? কিন্তু কার মতামতের ধার ধারে হোপুন! বিয়ে তো একরকম ঠিকঠাক হয়েই আছে। পাগল সর্দার নাকি বলেছে, তোমার বাপ এসে আমাকে বলুক, যথাবিধি মর্যাদা দিক—তার পর বিয়ে হবে। ওদের সমাজে মেয়ের বাপেরই মর্যাদা বেশি। কিন্তু কি প্রচণ্ড সাহস আর দেমাক লোকটার! আরো বলেছে। বলেছে, মত না দিলেও হবে বিয়ে, কিন্তু সবুর করো, অত তাড়া কিসের—নিজের তাহলে আলাদা ঘরবাড়ি তোলো, জোত-জমা করো—রোজগারপাতি করো।

সবুর করেই আছে হোপুন। এর বেলায় ছেলের অসীম ধৈর্য। ছেলের বাপ নিজে গিয়ে না বলুক, পরোক্ষে মত দিতেই হয়েছে। গাঁয়ের মাঝি সে, প্রধান কর্তাব্যক্তি, নিজের ঘর নিয়ে গণ্ডগোল হোক একটা, কথা বলুক পাঁচজনে, সেটা চায় না। কিন্তু তবু বিধিমত আজও মেয়ে দিচ্ছে না পাগল সর্দার। মাঝির ধারণা, কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে এর পিছনেও। নইলে এভাবে ওই সোমত্ত মেয়ে আগলে বসে আছে কেন? হোপুনের হাতে যা হোক করে মেয়ে গছাতে পারলে গাঁয়ের যে কোন লোক বর্তে যেত।

কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, এই লোকটাকেই এক দিন বেয়াই বলে ডাকতে হবে মাঝিকে। কুটুম্বিতা করতে হবে।

মড়াই বাঁধা নিয়ে এত বড় দুর্যোগ সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে একটু আশান্বিত হয়ে উঠল মাঝি। হয়তো এই সুযোগে সব বরবাদ হয়ে যেতে পারে। এ সুযোগ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে না মাঝি, ছেড়ে কথা কইবে না।

ঘা দেবার সুবর্ণ মুহূর্তও ঘটে।

অবিশ্বাস আর অনিশ্চয়তায় ছেলে বুড়ো নারী পুরুষ সবাই তখন বিচলিত।

সকলের মনেই সংশয়। সকলের মনেই ভয়। এরই মধ্যে একজন সরকারের দলে গিয়ে হাত মেলালো, সেটা সহ্য করা কারো পক্ষেই সহজ নয়। সহকর্মীদের কেউ ধর্মঘট ভাঙলে যেমন, তেমনি নির্মম হয়ে উঠলো সকলের মনের অবস্থা। ওরা বাধা দিচ্ছে সরকারকে। কিন্তু সে বাধাটা যেন প্রথম ফুটো করে দিলে পাগল সর্দার।

প্রতিশোধ চাই! নির্মম প্রতিশোধ!

ধমনীর রক্ত ওদের টগবগ করে ওঠে। কিন্তু প্রতিশোধ নিতেও পারছে না। একদঙ্গল ছেলে ঘিরে আছে ওকে। অনেকেই গিয়ে ভিড়েছে ওর দলে। শুধু দলে ভেড়া নয়। বাঁধের কাজেও লেগে গেছে দস্তুরমত। সপ্তাহে মোটা পয়সা রোজগার করছে। তবু চাই প্রতিশোধ! ওরা মন শানায় আর অস্ত্র শানায় আর সুযোগ খোঁজে।

ক্রমশ ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির।

ছক্-মত কাজ এগোচ্ছে না। যাবতীয় সরকারী বিধিব্যবস্থা সত্ত্বেও না। প্রথম প্রথম গায়ে মাখে নি। বিক্ষোভ একটু আধটু দেখা দেবে জানতই। নিজের ভালো যদি বুঝতে শিখত ওরা, তাহলে এতকাল ভুগতো না। সরকারী পরোয়ানার জোরেই এসব ছোটখাটো বাধাবিঘ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় নি সে।

কিন্তু না ওরা এসে কাজে লাগছে, না জায়গা-জমি ছেড়ে নড়ছে।

অবশ্য বাইরে থেকেও হাজারে হাজারে মজুর চালান হয়ে আসবে এখানে। কিন্তু সবার আগে স্থানীয় লোকেরই দরকার। বনজঙ্গল সাফ করে কুলি-কামিনের বসতির একটা ব্যবস্থা হলে তবে বাইরে থেকে যথেচ্ছ লোক চালান নিয়ে আসা যায়। দশ বিশ মাইল এদিক-ওদিক থেকে যারা আসছে তাদের সংখ্যাও খুব কম নয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তাছাড়া ঠিক নির্ভয়ে কাজও করতে পারছে না তারা, হামলার ভয়ে তটস্থ আছে।

গাঁয়ের মুরুব্বীদের প্রথমে ডাকা হল, বোঝানো হল, প্রলোভনও দেখানো হল অনেক। সরকারী নোটিসের ভ্রূকুটিও বাদ গেল না। তারপর, কর্মচারীদের ওপর আস্থা না রেখে বাদল গাঙ্গুলি নিজে গেল তাদের দরজায় দরজায়। স্থানীয় ভদ্রলোকদের অনুরোধ করল মধ্যস্থতা করতে। কিন্তু কিছুতে কিছু হয়ে উঠছে না।

মানুষটা নির্দয় নয় খুব। কিন্তু একটা যান্ত্রিক ঝোঁকে কাজ করে যায়। কাজের বেলায় তার আপস নেই কারো সঙ্গে কিছুর সঙ্গে। তাই ওদের এই অবুঝপনা বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে। কাজে বাধা পড়লে ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ওড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও নিঃশেষ করে দিতে পারে হয়তো। সম্ভব নয় বলেই মেজাজ চড়ছে আরও বেশি।

এমন দিনে দলবলসহ পাগল সর্দারের আগমনে বাদল গাঙ্গুলি ঠাণ্ডা হল কিছুটা। ভাবল, এই করে আস্তে আস্তে সকলেই বশীভূত হবে। আসা মাত্র মোটা মজুরিতে বাহাল করে নিল সর্দারকে এবং তার অধীনে আর সকলকে।

কিন্তু সেদিন লোকটাকে দেখে নি বাদল গাঙ্গুলি, তার আসাটাই বড় করে দেখেছে। দু'দিন না যেতে লোকটাকেও দেখল ভালো করে।

দিন দুপুর।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে কাজ করছে মাত্র শ'দেড়েক লোক। প্রথম বারের পাহাড়-টলানো পাথরগুলো নিচে গড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। কর্মকর্তারাও আছেন। তদবির-তদারক করছেন, মাপজোখ করছেন। ওই পাহাড়ের মাথায় সারি সারি কোয়ার্টার হবে বাবুদের, রাস্তা তৈরী হবে—তারপর আসল কাজ।

দূরে দূরে ঝাঁক বেঁধে এসে দাঁড়াল প্রায় তিন চার শ' গ্রাম্য লোক। চিৎকার চেঁচামেচি হট্টগোল শুরু করে দিল তারা দূর থেকেই। কাছে আসতে ভরসা পাচ্ছে না খুব। কি অস্ত্র আছে এদের কাছে জানে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এদিকের সকলে।

ওদের বিক্ষোভটুকু উপলব্ধি করছে বাদল গাঙ্গুলি, কিন্তু চিৎকার করে কি যে ওরা শাসাচ্ছে কিছুই বুঝছে না। ওদের নিজস্ব ভাষা আলাদা। কেবল পাগল সর্দারের নামটাই কানে আসতে লাগল বার বার। বায়নাকুলারে চোখ লাগালো বাদল গাঙ্গুলি। না, অস্ত্র নেই কারো সঙ্গে।

এ দলের একজন এসে জানালো, পাগল সর্দারকে পেলে ওরা ছিঁড়ে খাবে, সেই কথাই বলছে।

অদূরে যেখানটায় পাগল সর্দার কাজ করছে দলবল নিয়ে, বাদল গাঙ্গুলি পায়ে পায়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। কোদাল-শাবল-গাঁইতি হাতে তারাও দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। দেখছে চেয়ে চেয়ে। শুনছে।

ওদিকের চেঁচামেচি বাড়ছে।

হঠাৎ বাদল গাঙ্গুলি দেখল, এদেরই একজন ঠক্ করে হাতের কোদাল ফেলে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল বিক্ষোভকারীদের দিকে। অনেকটাই এগিয়ে গেল। তারপর বেশ উঁচু একটা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়াল সে। বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল পাথরের মতই।

হোপুন—!

প্রতিপক্ষের চেঁচামেচিতে আস্তে আস্তে ছেদ পড়ে গেল। কিছু একটা বিস্ময়ের কারণ ঘটল যেন তাদের। ক্রমশ একেবারেই চুপ করে গেল তারা। শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ....। নিজেদের মধ্যে কিছু একটা বলাবলি করতে লাগল তারা। তারপর ফিরে চলল।

হোপুন আস্তে আস্তে দলে ফিরে এলো আবার। কোদাল তুলে নিল।

দলের একজন বাদল গাঙ্গুলিকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। হোপনুকে এই দলের মধ্যে দেখে অবাক হয়েছে তারা। গাঁয়ের খোদ মাঝির ছেলে হোপুন। তাই ফিরে গেল। এবারে মুরুব্বীদের বৈঠক বসবে, পরামর্শ হবে, তার পর যা হয় ঠিক করা হবে।

বাদল গাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করে দেখল মাঝির ছেলে হোপুনকে। পরে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, এখন তোমরা কি করবে?

হোপুন খানিক চেয়ে থেকে ক্ষুদ্র জবাব দিল, কাম্নি—। অর্থাৎ কাজ করবে।

কিন্তু ওরা যে তোমাদের ভয় দেখিয়ে গেল?

আবার একটু চুপ করে থেকে হোপুন সাদাসিধে জবাব দিল, কুদালে করে উদের মাথা কুপায়ে দুব—।

দলের কমবয়সী জোয়ানরা সব হেসে উঠল। বাদল গাঙ্গুলির চোখ পড়ল সর্দারের ওপর। সর্দার চেয়ে চেয়ে হোপুনকেই দেখছে। তার কালো চোখে স্নেহ ঝরছে। কিন্তু এ কথায় নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না বাদল গাঙ্গুলির। এই লোকগুলো ফিরে গেলে কি হবে কে জানে? সর্দারের কাছে গিয়ে বলল, সর্দার কি করবে তোমরা?

পাগল সর্দার বাংলাটা আর একটু ভালো রপ্ত করেছে। হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল, কেনে, তোর ডর লেগেছে?

এরকম বাক্যালাপে অভ্যস্ত নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। কিন্তু এ তার কেতাদুরস্ত আপিসের পরিবেশ নয়। খারাপ লাগল না। বরং এ পরিবেশে এই যেন ভালো। বলল, তোমরা ফিরে গেলেই তো তোমাদের ধরবে আবার।

কিন্তু সে আর কোদাল দিয়ে ওদের মাথা কুপিয়ে দেবে বলল না। বলল, ধরে তো বুক চিতায়ে দুব।

বুক চিতিয়েই দিয়েছিল পাগল সর্দার।

আরো মাসখানেক পরের ঘটনা। এর মধ্যে প্রকাশ্য বিক্ষোভ আর কিছু দেখা যায় নি। বরং অনেকেই এসে যোগ দিয়েছে আরো। প্রতিদিনই নতুন লোক আসছে কিছু কিছু। মড়াই-সংলগ্ন জনবসতিও একটু একটু করে হালকা হয়ে আসছে। ভদ্রলোকেরা আধা-ভদ্রলোকেরা মুখে যে পরামর্শই দিক, মগজ তাদের পরিষ্কার। ক্ষতিপূরণ বুঝে নিয়ে তারাই সবার আগে সরে যাচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন গাঁয়ের মাঝিরা সব ভেবে সারা। আজীবন বাঁধাধরা শাস্ত্র আর সংস্কারগত পথ ধরে চলতে অভ্যস্ত তারা। কিন্তু এ সমস্যার সমাধানই বা কি, বিধানই বা কি? আর, তাদের বিধান মানবেই বা কারা? যে যার আত্মীয়-পরিজনকেই সামলাতে পারছে না, অন্যকে বোঝাবে কি করে? বংশগত নিদারুণ দারিদ্র্যের মাঝে কি করে ঠেকাবে এই কাঁচা টাকার আকর্ষণ?

তারা বিধান দিতে পারে, টাকা দিতে পারে না।

সে বরং পারে ওই পাগল সর্দার। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ব্যবস্থা করে দিতে পারে। দিচ্ছেও। একটা ঘর বসতি ছাড়ে তো পাঁচটা ঘর দুর্বল হয়ে পড়ে মনে মনে। ঘুরে ফিরে আবার সকল রাগ গিয়ে পড়ে ওই পাগল সর্দারের ওপর। নিজে সাত-তাড়াতাড়ি সর্দারী না করে গাঁয়ের মাঝি মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে যা হোক কিছু ঠিক করলেই তো হত!

কিন্তু পাগল সর্দারের নাগাল আর পাবে কেমন করে তারা! অনেক আগেই ঘর ছেড়ে মেয়ে নিয়ে নিরাপদ এলাকায় উঠে চলে গেছে সে। নতুন করে ঘর বেঁধেছে। সেই এলাকায় ওদের প্রতাপ খাটবে না। গাঁয়ের ঘরবাড়ি ছেড়ে যারাই মড়াইয়ের কাজে গিয়ে লেগেছে, তারাই ও এলাকায় গিয়ে দল ভারী করেছে।

মনে মনে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিল বাদল গাঙ্গুলিও। পরিবর্তনের গতিটা ধীর

বলে মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও ধৈর্য হারায় নি। সেই দল বেঁধে চড়াও করার ব্যাপারটাও ভুলে গেছে। আর তেমন গোলযোগের আশঙ্কা আছে বলেও মনে হয় নি।

কিন্তু আবারও এক দিন থমকে যেতে হল তাকে। নিজে উপস্থিত ছিল না। লোকমুখে আদ্যোপান্ত শুনল।

পাঁচ সাত জন মাত্র লোক নিয়ে কিছু দূরে একটা জায়গা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিল ড্রাফটস্‌ম্যান নরেন চৌধুরী। বলা বাহুল্য, পাগল সর্দারও সেই পাঁচ সাত জনের এক জন। এখানকার সব মাটি, সব পাথর চেনে সে।

হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হতে পারে কেউ ভাবে নি। তীরধনু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রায় জন পঁচিশকে লোক অদূরে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। কখন তাদের লক্ষ্য করেছে, কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে, কেউ খেয়াল করে নি।

এদিকে সম্বল মাত্র গোটাকয়েক কোদাল আর শাবল। নরেন চৌধুরীর গলায় একটা ক্যামেরা আর তার সহকারীর হাতে নোটবই, ফিতে পেন্সিল।

ওই কালো মানুষদের অটুট সঙ্কল্প আর প্রতিহিংসার একটা হিমস্পর্শে সহসা যেন একেবারে স্থির হয়ে গেল সকলে। বোবা-মৃত্যুর ছায়া পড়ল একটা। তার পরেই সচেতন হয়ে পাগল সর্দারকে ঘিরে দাঁড়াল তার সেই পাঁচ সাত জন সঙ্গী। নিজের ভাষায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, কি চায় ওরা?

দূর থেকে তারা জবাব দিলে, পাগল সর্দারকে চায়—তাকে ওদের হাতে ছেড়ে দিলে কাউকে কিছু বলবে না, বাকি সকলকে ফিরে যেতে দেবে। আর বাধা দেয় তো তীর মেরে সকলেরই কলজে ফুঁড়ে দেবে।

কালঘাম ছুটছে নরেন চৌধুরীর আর তার সহকারীর। পালাবার পথ নেই। পরিত্রাণও বোধ হয় নেই আর। হঠাৎ দেখা গেল, ক্ষিপ্ত পাগল সর্দার সঙ্গীদের ঠেলে চিৎকার করে কি বলতে বলতে প্রায় বিশ-ত্রিশ পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বুক টান করে। তারপর ওদের সেই প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় উন্মত্তের মত যা বলতে লাগল তার মর্মার্থ, নে কত তীর মারবি মার! আমার কলজে ফুটো করে সব রক্ত মড়াইকে দে! কিন্তু আরো অনেক, অনেক রক্ত খাবে মড়াই, তোদের সক্কলের রক্ত খাবে—তোদের গ্রামসুদ্ধ সকলকে কেটে মড়াইকে রক্ত দেওয়া হবে—এত রক্ত খেয়ে মড়াইয়ের জল ভালো হবে খুব—কত তীর মারবি মার, কত কলজে ফুটো করবি কর!

পাহাড়ে পাহাড়ে যেন গমগম করতে লাগল তার কণ্ঠস্বর। কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় হয়ে রইল কালান্তক যমের মত যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও। তার পরেই সচেতন হল। ধনুকে তীর লাগানোই আছে। এক পা দু'পা করে এগোতে লাগল তারা। চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ভদ্রলোক দু'টির দিকে। অর্থাৎ নরেন চৌধুরী আর তার সঙ্গীর দিকে। যাদের আক্রমণ করছে তাদের নাড়ীনক্ষত্র চেনে ওরা, বোঝে। কিন্তু এই এদেরই ঠিক চেনে না, ঠিক বোঝে না—তাই বিশ্বাসও নেই, কোন্ মুহূর্তে কি করে ফেলবে।

কথায় আছে, পরমায়ুর জোর থাকলে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধি যোগান। উত্তেজনার

বশেই নরেন চৌধুরী দু'চার পা দ্রুত এগিয়ে এসে গলায় ঝোলানো ক্যামেরাটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগালো। কেন লাগালো, কি হবে ছবি নিয়ে, সত্যি ছবি নেবে কি না নিজেও জানে না।

অকস্মাৎ হকচকিয়ে গিয়ে লোকগুলো পিছু হঠল খানিকটা। আর বিমূঢ় নেত্রে নরেনও ক্যামেরা নামালো চোখ থেকে। মাত্র মুহূর্তের জন্য। তারপরেই বিদ্যুৎঝলকের মত একটা চকিত উপলব্ধির বশে আবার ক্যামেরা তুলে নিল চোখে—এগিয়ে গেল আরো পাঁচ সাত দশ পা।

ছত্রভঙ্গ হয়ে দ্বিগুণ পিছনে সরে গেল ওরা। ভাবল, আওতার মধ্যে পেলেই বাক্স থেকে লোকটা ছুটন্ত আগুন ছাড়বে। গলায় ঝোলানো ওই কালো বাক্সটার ভয়েই এতক্ষণ তারা এত কাছে আসতে পারছিল না।

এদিকেও প্রাণের দায় বড় দায়। মুহূর্তে ওদের দুর্বলতার কারণটা বুঝে নিয়েছে সকলে। চিৎকার চেঁচামেচি তর্জন গর্জন করে উঠল সবাই একসঙ্গে—দে কত্তা দে, দে ছুটন্ত আগুনে সব ক'টার মাথার খুলি উড়িয়ে!

নরেন চৌধুরী চোখে ক্যামেরা লাগিয়ে পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে এগিয়ে চলল, হাঁকডাক ছেড়ে অনুসরণ করল অনুচরেরা।

বেগতিক দেখে ছুটছাট সরে পড়ল সামনের ক্ষুদ্র বাহিনীটি।

এলাকায় ফেরামাত্র খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। যে যার কাজ ফেলে এসে জড় হতে লাগল। এরকম একটা ব্যাপারে জটলা হবে না তো কি!

শুনল বাদল গাঙ্গুলিও। তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে কলগুঞ্জন বন্ধ হল ওদের। কিন্তু যে দৃষ্টিতে সকলে তাকালো তার দিকে, তার অর্থ সুস্পষ্ট। আমাদের কি সত্যি আশ্রয় দিতে পেরেছ তুমি? সত্যি কি আমরা নিরাপদ?

আবার এরকম একটা বিঘ্নের সম্ভাবনা কল্পনাও করে নি বাদল গাঙ্গুলি। জটলার মধ্যে পাগল সর্দারই বিচলিত হয় নি মনে হল। আর বিচলিত হয় নি হোপুন। মূর্তির মত এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেও।

বাদল গাঙ্গুলি তাদের কিছু বলা বা আশ্বাস দেবার আগেই আর একটি মূর্তির আবির্ভাব ঘটল সেখানে।

নারীমূর্তি। নিকষ কালো। স্বল্প আচ্ছাদন বিদীর্ণ করে সারা অঙ্গের উদ্ধত যৌবন উপচে পড়তে চাইছে।

পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণি।

নির্নিমেষ নেত্রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাপকে দেখে নিল আগে। কোথাও এতটুকু আঁচড় লেগেছে কিনা তাই দেখল। তারপর হোপুনের দিকে এক ঝলক তীব্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ভাঙা বাংলায় বাদল গাঙ্গুলিকে বলল, হেই বাবু, উই উকে ধর, উর বাপ ডাকু পেটাচ্ছে—রনখ্ করছে—উকে বল্ বাপের থানে যেয়ে নেবারণ কত্তে—ইখানে সঙটো হয়ে দেখতে লেগেছে কি—!

চাঁদমণি! গরজে উঠল পাগল সর্দার।

হোপুনের মুখের ওপর আর এক পশলা আগুন ছড়িয়ে যেমন এসেছিল তেমনি

দুমদাম পা ফেলে প্রস্থান করল চাঁদমণি।

নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল বিলেত জার্মানী ফেরত চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি!

ড্যামের কাজ এগোলেও তার মন্থর গতিই হয়তো পরোক্ষে একটু আশার কারণ হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। হয়তো বা শেষ পর্যন্ত সকলকেই যেতে হবে না, অনেকেই হয়ত বা থেকে যেতে পারবে। অন্তত কিছু দূরে বসতি যাদের, আশা তাদেরই বেশি। কি এমন হবে যার জন্য এই এত দূর থেকেও সরতে হবে। ওই তো ফিতের মত পড়ে আছে শুকনো মড়াই, তাকে আর ক'হজার গুণ ফোলাবে বাপু যার জন্য এত বাড়াবাড়ি তোমাদের? অতএব অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গটুকু জিইয়ে রাখো আর শেষ পর্যন্ত দেখো কি হয়—ষোল আনা চাইছে, যে ক'আনা রাখা যায়। তাই একটা কিছু করো, একটা কিছু করে ড্যামওয়ালাদের বুঝিয়ে দাও তোমাদের ভিতরের জ্বালা।

কি করবে?

কেন পাগল সর্দারকে দেখছ না? তার বিশ্বাসঘাতকতা দেখছ না? জাতি-দ্রোহিতা দেখছ না?

কিন্তু ফল বিপরীত দাঁড়াল। দ্বিতীয় বারের এই ঘটনার পর কর্তব্য স্থির করে ফেলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। দু'চার মাস পরে যা করত, সব কাজ বাতিল করে সেদিকেই আগে মন দিল।

ছোটখাটো একটা হিল ব্লাস্টিং দেখেছিল এখানকার লোক। ওটুকু ধ্বংসের রূপ দেখেই স্তব্ধ হয়েছিল। আর একবার তাই দেখবে তারা। তার থেকে অনেক বেশি দেখবে।

দিন স্থির হল। সপ্তাহ চারেক পরের একটা দিন। শহর থেকে পুলিস এলো, মিলিটারি এলো, কর্মচারী এলো। সর্বত্র ঘোষণা করা হল, চারিদিকে রাষ্ট্র করা হল ওই দিনটির কথা। ঘোষণার আড়ম্বরে হকচকিয়ে গেল দূরের গ্রামবাসীরাও। বিস্তৃত একটা গণ্ডি ধরে বিপদের লাল নিশানা পড়ল সারি সারি।

সরে যেতে হবে। ওই দিনের আগে এই গণ্ডি থেকে সকলকে সরে যেতে হবে। নয়তো গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যাবে সব, আর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। হিল্ ব্লাস্টিং হবে সেদিন, একবার যা হয়ে গেছে তার দশগুণ হবে। ওই দিনের আগে যে সরবে না সে মরবে। অবধারিত মৃত্যু।

একটা ত্রাস সঞ্চার করতে চেয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। তাই হল। ওই নির্দিষ্ট দিনটা যেন মগজে বসে গেল সকলের। প্রচার সমারোহে ওই দিনের বিভীষিকা দিনে দিনে বাড়তে লাগল।

শিথিল হয়ে গেল মাটির বাঁধন। যারা সরতে চায় নি, নড়তে চায় নি, এবারে তারা সরতে লাগল, নড়তে লাগল। কি হবে....কি না জানি হবে সেদিন। তুমি সরছ কেন, তুমি তো লাল গণ্ডির বাইরে? বাইরে হলেও কাছাকাছি তো বটে! বিপদ এলে কি আর ফিতে মেপে আসবে!

তারপর সেই দিন।

সমস্ত এলাকাটি পরিদর্শন করে দেখা গেল, জীবনের চিহ্ন দূরের কথা, যে

পেরেছে ঘরের ইটমাটিও তুলে নিয়ে গেছে।

সকাল থেকেই নিঃশব্দ উত্তেজনা। একটা গুমোট স্তব্ধতা। সমাজ ছাড়া হয়ে যারা ড্যামের কাজে এসে লেগেছে তারাও থমকে গেছে যেন। নির্দেশমত পাহাড়ে পাহাড়ে একের পর এক গর্ত করে চলেছে তারা। তারপর এই সব গর্তের মধ্যে কি সব গুঁজে গুঁজে দেওয়া হচ্ছে। পুরু ফিতের মত কি দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটার সঙ্গে আর একটা। ফিতের আর এক মাথা এসে থেমেছে মড়াইয়ের ধার ধরে আধ মাইল দূরের একটা তাঁবুর মধ্যে। ওখান থেকেই যা কিছু করা হবে। সময়ে ওখান থেকে পালাবার জন্যে গাড়ি মজুত রেখেছ বাবুরা।

বিকেল হতেই ছুটি হয়ে গেল সকলের। সন্ধ্যা পেরুলো। রাত্রি হল।

আকাশবাতাসের সমস্ত স্তব্ধতা একটানা একটা যান্ত্রিক আর্তনাদে খান খান হয়ে গেল।

সাইরেন বাজছে। অনভ্যস্ত কানে শব্দটা একেবারে হাড়ে গিয়ে লাগল।

একটানা দ্বিগুণ স্তব্ধতা তারপর। আধ ঘণ্টার ওপর কেটে গেল প্রায়। যেন আধ যুগ কেটে গেল।

তারপর বসুন্ধরা কেঁপে উঠল বুঝি।

ঘোষণার আড়ম্বরে অত্যুক্তি ছিল না খুব।

ভোর না হতে দলে দলে লোক আসতে লাগল দেখতে। সেই বিরাট ধ্বংসের সামনে একেবারে বোবা হয়ে গেল সকলে। তাদের 'বোঙ্গা' অর্থাৎ উপদেবতা পর্বত-দেবই হল তাদের 'মারাং বুরু'। এই উপদেবতার উপাসনা করে আসছে আজন্ম কাল। পর্বত-দেবের আসল নাম 'লিটা' অর্থাৎ শয়তান—যে তাদের আদি নারী-পুরুষ 'পিলচু বুড়ী' আর 'পিলচু হারাম'কে সর্বপ্রথম হাড়িয়া খাইয়ে তাদের মধ্যে পাপ ঢুকিয়েছিল, লজ্জা-ভয় ঢুকিয়েছিল। সেই লিটা যেন আজ নিজের দেহ থেকে সহস্র সহস্র অতিকায় পাথর খুলে খুলে পায়ের নিচের মড়াইকে মেরেছে ক্ষিপ্ত আক্রোশে। পাথরে পাথরে মড়াই ছেয়ে গেছে।

যথার্থ অনুমান করেছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

ওদের বাস্তু আগলে থাকার আশা একেবারে নির্মূল হওয়ার পরে আস্তে আস্তে বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ নিবেছে। এত বড় এক ভাঙনের পরেই যেন একটা গঠনের ছন্দ দেখা যেতে লাগল ধীরে ধীরে। বহু মজুর আসছে বাইরে থেকে। রোজই আসছে।

...এত সব হচ্ছে যখন, কিছু একটা হবেই বোধ হয়।

ভিতরে বাইরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল যারা, মলিন মুখে তারাই এসে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। কর্মপ্রত্যাশী। একরোখা হলেও দারিদ্র্যের সীমা-পরিসীমা নেই মানুষগুলোর। রোখ গেছে, এখন দারিদ্র্যটাই বড়। মনে মনে হাসলেও পাগল সর্দার নিরাশ করল না কাউকে। সকলকেই দু হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে নিল। যে এলো তাকেই। সবই সহজ হয়ে গেল। মাঝি পারাণিকরা পর্যন্ত নতুন করে সেই পুরানো সমাজেরই হাল ধরল আবার।

॥ ৩ ॥

সান্ত্বনার স্বপ্নরাজ্যের সঙ্গে মিল নেই।

তার থেকে অনেক স্থূল, অনেক বেশি অপরিচিত। পুরোপুরি এক অনাবিল সৃষ্টির ছবিই কল্পনা করেছিল। সৃষ্টির এ কঙ্কালও তাই বলে রমণীয় নয় খুব। যে পর্যন্ত হয়েছে, কঙ্কালের আভাসও নেই। শুকনো মড়াইয়ের একটা দিকে খুঁড়ে খুবলে দগদগে ঘায়ের মত করে চলেছে এরা।

একেবারে তলা থেকে দুই পাহাড়ের খানিকটা পর্যন্ত অতিকায় এক মাটির দেয়াল তুলে মড়াইকে দু'আধখানা করে ফেলা হয়েছে। ওই অদূরে পাথরের পাকা দেয়াল তোলা হলে এটা ভেঙে ফেলা হবে। মাটির দেওয়ালের ওধারে এক বর্ষার জল জমেছে খানিকটা। কিন্তু সেও কল্পনার মন্দাকিনী নয়। হাত ছোঁয়ালে গা ঘিনঘিন করার মত। কোথাও মাটি দেখা যাচ্ছে, কোথাও পাথর, কোথাও গাছ ভাসছে, কোথাও জঙ্গল পচছে, কোথাও বা ভাঙা আটচালার মাথা ভেসে উঠেছে জলের ওপর।

অন্য দিকটা খটখটে শুকনো। কাজ সেদিকটাতেই হচ্ছে। এদিক দিয়েই নাকি জল যাবে। কিন্তু সেদিকে চেয়েও সান্ত্বনার ভিতরটা শুকিয়ে যায় কেমন। যতদূর চোখ যায়, সেই হাঁ-করা মাটি, সেই পাথরের স্তূপ আর সেই জঙ্গলের অবরোধ। বন্ধ্যা, নীরস। ওখান দিয়ে জল চলা দূরের কথা, বাতাস চলাচলের অভাবে জায়গাটা যেন দমবন্ধ হয়ে পড়ে আছে কতকাল ধরে।

কিন্তু স্বপ্নরাজ্যের না হোক, এত বড় বাস্তবেরও আবেদন আছেই। উত্তেজনা আছে, রোমাঞ্চ আছে। তার থেকেও বেশি আছে দুর্বোধ্যতার বিস্ময়। একসঙ্গে কাজ করে প্রায় আট দশ হাজার লোক। এত উঁচু থেকে খুদে খুদে দেখায়। ওপরের পাথুরে জঙ্গল সাফ করে কুলিবসতি গড়ে উঠেছে একটা। এ-পাড় থেকে সারি সারি ব্যাঙের ছাতার মত দেখায় ওদের তাঁবুগুলো। সকাল না হতে যে যার সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে আসে পিলপিল করে।

যন্ত্রপাতির সমারোহও তেমনি। পাহাড়ের ওপর থেকে নয়, সান্ত্বনা সেই নিচে নেমে গিয়েই দেখে এসেছে। কড়কড় করে মাটি ফুঁড়ে চলেছে, না যেন জমাট-বাঁধা মাখনের তাল ফুঁড়ে চলেছে। বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ মণের এক একটা পাথর তুলছে না তো, যেন এক একখানা পলকা ইট তুলছে অবলীলাক্রমে। এরকম অজস্র ব্যাপার।

প্রথম দিনকতক স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখেই গেল সান্ত্বনা। তারপর একদিন বলে ফেলল, কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা, বিচ্ছিরি লাগছে।

অবনীবাবু তার বিচ্ছিরি লাগাটাই শুনলেন শুধু। বললেন, আমি তো আগেই জানি, তখন অত করে আসতে বারণ করলাম, না শুনলে কি করব। আর ক'টা দিন থাক, ফাঁকমত রেখে আসব'খন তোকে—

বেশ, আমি কি বললাম আর তুমি কি শুনলে। বললাম, কি দিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে কিছু বুঝছি না বলে ভালো লাগছে না—না ফাঁকমত রেখে আসব'খন তোকে। তুমি বললেই আমি গেলাম আর কি!

সকালের রাউণ্ডে বেরুবার তোড়জোড় করছিলেন অবনীবাবু। খুব খেয়াল করে শোনেন নি আগে। এবারে শুনলেন। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝছিস না?

সান্ত্বনা লজ্জা পেয়ে গেল একটু।—এই কি ক'চ্ছ না ক'চ্ছ তোমরা মাথামুণ্ডু তাই। দাঁড়াও, তোমার খাবারটা নিয়ে আসি—

প্রস্থান করল। মেয়ের বিচ্ছিরি লাগার হেতু শুনে অবনীবাবুর কি জানি কেন ভালো লাগল না খুব।

সান্ত্বনা তার দু'ঘরের ক্ষুদ্র গৃহস্থালি বেশ কায়েমী ভাবে গুছিয়ে নিল। মাসি চিঠিতে তাড়া দিলেন ফেরার জন্য। সান্ত্বনা উল্টে আমন্ত্রণ জানালো তাকে, চমৎকার লাগবে মাসিমা, দু'দিন এসে থেকে যাও—

বাঁধাধরা আপিস-টাইম বলে কিছু নেই এখানে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ চলছে। আপিস বা যাবতীয় কাজ সবই পাহাড়ের নিচে। ওপরে শুধু কোয়ার্টার। পায়ে হেঁটে ওপর নিচ করাটা রীতিমত পরিশ্রমের ব্যাপার। সারাক্ষণ একটা ট্রাক মজুত আছে এই জন্যে। দিনের মধ্যে কতবার ওটা লোক নিয়ে ওঠা-নামা করে ঠিক নেই। পাহাড় ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে পাকা রাস্তা চলে গেছে এক মাথা থেকে আর এক মাথায়। ট্রাকটা অবশ্য মজুত থাকে মেন কোয়ার্টারস্-এ। যে দিকটায় হোমরাচোমরা কর্তাব্যক্তিদের আবাস, যেখানে গেস্টহাউস ইত্যাদি। সান্ত্বনাদের কোয়ার্টার সেখান থেকে অনেক দূরে, অনেকটা বিচ্ছিন্ন। সাধারণ চাকুরেদের জন্য কিছু দূরে মাত্র তিন-চারটে কোয়ার্টার হয়েছে সেখানে, নতুন আরও দু'তিনটে হচ্ছে।

সকালে স্নানাদি সেরে অবনীবাবু মেন কোয়ার্টারে চলে আসেন। নিচে নামতে হলে এখান দিয়েই একমাত্র পথ। সেখান থেকে ট্রাকে করে নিচে নেমে যান। আর ওঠেন সেই সন্ধ্যায়। বেয়ারা এসে টিফিন-ক্যারিয়ার করে দুপুরের খাবার নিয়ে যায়। বাড়ি ফিরতে একেবারে রাতও হয় প্রায়ই। আপিসের পর গেস্ট-হাউসের হল-ঘরে কর্মকর্তাদের মিটিং বসে, নয়তো কিছু না কিছু আলোচনা থাকে।

অখণ্ড অবকাশ সান্ত্বনার।

দুর্বিষহ লাগার কথা। কাছাকাছি কোয়ার্টার ক'টাতে কোন মেয়েছেলের নামগন্ধও নেই। পাঁচ-ছ'জন করে পুরুষ কর্মচারী মেসের মত করে আছে। কিন্তু মাঝখানের মাসির বাড়ির ক'টা বছর বাদ দিলে এরকম অবকাশে সান্ত্বনা অনেকটাই অভ্যস্ত। আর অবকাশই বা কোথায়? চোখের খোরাক যেখানে অফুরন্ত আর মনের কৌতূহল যার এত সজাগ, সময় তার আপনি কাটে।

প্রথম প্রথম অবশ্য একলা ঘোরাফেরা করতে সাহস পেত না খুব। স্তব্ধ, নির্জন পরিবেশে দিনেদুপুরেও কেমন লাগত যেন। হাজার হোক অজানা অচেনা জায়গা। কিন্তু সে অস্বস্তি কাটতে ক'টা দিন আর। আজ এদিকে খানিক দূর উঁকিঝুঁকি দেয়, কাল ওদিকে। তা ছাড়া যে বেয়ারা দুপুরে বাবার খাবার নিতে আসে তার কাছ থেকে শুনেছে, ভয়ের নাকি কোথাও কিচ্ছু নেই। সাঁওতালরা সব মাটির মানুষ—ঘরদোর খোলা ফেলে রাখলেও কুটোটি সরাবে না। এই মানুষদের খবর বৃত্তান্ত সান্ত্বনা ভালই

জানত। তবু শুনলে সাহস বাড়ে।

মেয়েছেলে আছে মেন কোয়ার্টারস-এ। শাড়ির আভাস পেলেই সান্ত্বনা বিনা দ্বিধায় হানা দেয় একবার দু'বার। কিন্তু বয়স যাই হোক, কর্তাদের পদমর্যাদায় সকলেই বিশিষ্ট মহিলা এঁরা। পাশাপাশি বসবাসের ফলে নিজেদের মধ্যেই পাল্লা দিয়ে চলেন একটু আধটু। এই সাদাসিধে মেয়েটা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ঠিকই। ওভারসিয়ারের মেয়ে শুনে আশ্বস্ত হলেন তাঁরা।

—ও, অমুক ওভারসিয়ারবাবুর মেয়ে তুমি? জেনারেল কোয়ার্টারে থাকো বুঝি? আর কে আছেন? শুধু বাবা, আর কেউ না? তাহলে তো বড় কষ্ট তোমার...মাঝে মাঝে চলে এসো, গল্পসল্প করা যাবে।

কেউ না থাকার কষ্টটা সান্ত্বনার থেকে এঁদেরই বরং বেশি। কিন্তু ওভারসিয়ারের মেয়ের কাছে তো আর দুঃখ প্রকাশ করা চলে না। গল্পসল্পের আকর্ষণে ওভারসিয়ারের মেয়ে যদি মাঝেসাঝে আসতে শুরু করে, অপরাপরদের চোখে সেটা বিসদৃশ ঠেকবে কিনা, তাই বরং ভাববার কথা।

নাকের ডগায় এত বড় এক সৃষ্টির মহড়া চলেছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে এতটুকু কৌতূহল নেই তাঁদের। সাগ্রহে হয়তো সান্ত্বনা বলে উঠেছে, বাঃ, আপনাদের এখান থেকে তো সুন্দর দেখা যায় সব কিছু!

জবাব : আর বোলো না, দেখে দেখে চোখ পচে গেল। সকাল সন্ধ্যা তো ওই দেখছি।

নির্বাক নেত্রে চেয়ে থাকে সান্ত্বনা। দেখে দেখে চোখ পচে যায় কি করে বুঝে ওঠে না। বরং সকাল সন্ধ্যা দেখছে শুনে ঈর্ষা হয়।

মেন কোয়ার্টারস-এর মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হল না সান্ত্বনার। নিজেই কেটে পড়ল সে। কিন্তু এদিকটায় আনাগোনা বেড়ে গেল। মেন কোয়ার্টারস্ থেকে একটা রাস্তা এসেছে পাহাড়ের একেবারে শেষপ্রান্তে। দুপুরের নিরিবিলিতে যে কোনো একটা পাথর বেছে নিয়ে বসে পড়ো হাত পা ছড়িয়ে। নিচে মড়াই। আর তার ভাবী বন্ধন-সমারোহ। এত উঁচু থেকে ছবির মত দেখায়। যন্ত্রের কাছ থেকেও ওই কুলিকামিনদের কাজ দেখতে ভালো লাগে বেশি। পুরুষেরা মাটি কাটে, পাথর ভাঙে। মেয়েরা সেগুলো মাথায় করে বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এটুকুর মধ্যেই কোথায় যেন বেশ একটা ছন্দ আছে। মনে মনে আস্বাদন করার মত কিছু একটা।

এক একদিন নিজের কাছেই লজ্জা পেয়ে যায় সান্ত্বনা।...ভাবছে কি না, ওই মেয়েগুলোর মত সেও যদি অবাধে কাজে লেগে যেতে পারত! ওদের মত ওদের সঙ্গে! দৃশ্যটা কল্পনা করতে চেষ্টা করল। মাথায় মাটির ঝুড়ি বা পাথরের বোঝা। একা একাই হেসে কুটিকুটি তারপর। মা গো মা, কি বেয়াড়া সাধ!

সেদিন দুপুরে বেয়ারা বাবার খাবার নিতে এলে কি ভেবে সান্ত্বনা বলল, চলো আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

টিফিন-ক্যারিয়ার গুছিয়ে নিজেই সেটা হাতে করে বেরিয়ে পড়ল। এই পাহাড়ী পরিবেশে কিছুই যেন বেমানান নয়। এই মুক্তির আস্বাদনটুকুই সব থেকে ভালো

লাগে।

অবনীবাবু অবাক হলেন, তুই যে?

এলাম। রোজ রোজ এই লোকটাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি, মাঝে মাঝে আমিই তো নিয়ে আসতে পারি তোমার খাবার।

অবনীবাবু কি আর বলবেন। ঘরে আরো পাঁচ-সাতজন লোক আছে। আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছেও তারা। এই বৈচিত্র্যটুকু তাদের ভালো লেগেছে। কিন্তু বাবার এই খুপ্‌রি আপিস-ঘর সান্ত্বনার একটুও ভালো লাগে নি। বলল, এখানে বসে কাজ করো নাকি তোমরা?

ঘরের কাজ কমই। কিন্তু সে-কথা না বলে অবনীবাবু বললেন, হ্যাঁ। তোর পছন্দ হচ্ছে না?

না।

গায়ে গায়ে লাগানো ছোট ছোট টেবিলের সামনে সমাসীন লোক ক'টিকে সান্ত্বনা দেখে নিল একবার। এখানে এদের সামনে বসে বাবা খায় কি করে ভেবে পাচ্ছে না। মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ওদেরও খিদে পেয়েছে। দ্বিধা কাটিয়ে বলেই ফেলল, কোথায় বসে খাবে তুমি?

তার সমস্যাটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সকৌতুকে দেখতে লাগল সকলেই। বিব্রতমুখে টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল সান্ত্বনা। অবনীবাবু উঠে এক গ্লাস জল গড়িয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন। পরে ডাকলেন, আয়—।

বাইরে পাহাড়ের ছায়ায় বড় একটা পাথরের ওপর বসলেন তিনি।—বার কর্‌ কি এনেছিস!

এদিক ওদিক চেয়ে সান্ত্বনা ভারি খুশি হয়ে গেল। অমনি এক একখানা পাথরের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে অনেককেই নিবিষ্টচিত্তে 'লাঞ্চ' খেতে দেখা গেল। সান্ত্বনার ভালো লাগল খুব। নিজে খেয়ে এসেছে বেশিক্ষণ হয় নি, কিন্তু এরকম জায়গায় বসে খাবার লোভেই আর একবার বসে যেতে পারে বোধ হয়। সানন্দে টিফিন-ক্যারিয়ার থেকে খাবার বের করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, তোমার ঘরের ওই ভদ্রলোকেরা খাবে না বাবা?

ওদের খাবার এলেই খাবে। কিন্তু তুই যে নেবে এলি এখন, উঠতে কষ্ট হবে না? হেঁটে উঠে কাজ নেই, ট্রাক এলে বলে দেব'খন, তুলে নেবে—

পাহাড়ী রাস্তায় ট্রাকে চড়ার লোভ আছে। কিন্তু তাহলে আসাটাই পণ্ড। এক্ষুনি হয়তো হুস করে উঠে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি বাধা দিল, তোমার ট্রাকে কাজ নেই, পায়ে হেঁটেই খুব উঠতে পারব আমি। তুমি আস্তে ধীরে খাও বসে, আমি একটু ঘুরেটুরে দেখে আসি। খাওয়া হলে বেয়ারাকে সব গুছিয়ে রাখতে বোলো, আমি নিয়ে যাব'খন।

আসলে এই জন্যেই আসা।

আর কোনো কথার অপেক্ষা না রেখে সান্ত্বনা এগিয়ে চলল। এখান থেকেও মড়াইয়ের তলদেশ অনেক নিচে। পাথর ভেঙে নামতে লাগল। বেশ পরিশ্রমের ব্যাপার।

টাল সামলানো দায় এক এক জায়গায়। ওই লোকগুলো তরতর করে নেবে যায় কি করে, ভেবে অবাক হয়। মেয়েগুলো পর্যন্ত। কিন্তু মড়াইয়ের বুকের ওপর গিয়ে সেও আজ দাঁড়াবেই। অভ্যেস নেই বলে—কিন্তু অভ্যেস হতে ক'দিন আর।

সত্যিই ক'দিন আর! বেলা গড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উন্মুখ হয়ে ওঠে সান্ত্বনা। বাবার খাবারটা নিয়ে কতক্ষণে নিচে নেমে আসবে। অর্থাৎ কতক্ষণে তারপর মড়াইয়ের গহ্বরে অবতরণ করবে। ভয় তারও ভেঙেছে, এখন প্রায় দৌড়ে নেমে আসে সেও। তারপর যেদিকে খুশি পা চালিয়ে দাও, সর্বত্রই দেখার উৎসব।

সান্ত্বনা দেখে। আবার তাকেও ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সকলে। কালোর তরঙ্গে একটি মাত্র ব্যতিক্রমের দিকে আর চোখ না যায় কার? তাই এই নীরব অথচ সজীব কৌতূহলটুকু বেশ লাগে ওদের। মেয়েরা হাসে। সান্ত্বনাও হাসে। পুরুষেরা কোদাল শাবল থামিয়ে সোজাসুজি নিরীক্ষণ করে। নীরব চোখে সান্ত্বনা কৈফিয়ৎ দেয় যেন, তোমাদের বিরক্ত করতে চাই নে, একটু দেখছি শুধু—।

ফাঁকমত সেদিন আলাপ হয়ে গেল একজনের সঙ্গে। লোকটাকে অনেক সময়েই লক্ষ্য করেছে সান্ত্বনা। মাতব্বর গোছের একজন, বেশ বোঝা যায়। ছোট ছোট অনেকগুলো কুলি-কামিনের দল তার আদেশ-নির্দেশমত কাজ করে। মস্ত একটা পাথরের ওপর বসে বোধ হয় বিশ্রাম করছিল একটু। পাশ কাটাতে গিয়েও সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই এক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করে তার মেজাজ বুঝতে চেষ্টা করল হয়তো। তারপর বলল, এখানে বসি একটু?

অবাক হয়ে লোকটি চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। পরে মাথা নেড়ে অনুমতি দিল। অর্থাৎ বসতে পারো।

শান্তশিষ্ট মেয়েটির মত বসল সান্ত্বনা। লোকটি আবার খানিক দেখে নিয়ে বলল, কার বিটি বট্টে?

বলল।

একটু ভাবল সে। উ লয়া উবাসির বাবুর কুড়ী বট্টে তু?

কুড়ী কি? বাংলার বহর শুনে সান্ত্বনা হেসেই ফেলল।

জবাব না দিয়ে লোকটি হাসল অল্প একটু। পরে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল, লোতুন উবাসির বাবু খুব ভালো নোক্।

পাসপোর্ট পেল যেন। পাথরে পা গুটিয়ে বসল সান্ত্বনা।—তোমার নাম কী?

পাগড় সর্দার।

অর্থাৎ পাগল সর্দার। সান্ত্বনা আবার প্রশ্ন করল, তুমি বুঝি এই সব লোকদের সর্দার?

হেঁ।

এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তুমি সব জানো বুঝি?

পাগল সর্দার সকৌতুকে মাথা নাড়ল, জানে।

সোৎসাহে আবার কি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল সান্ত্বনা। থামতে হল। অসহিষ্ণু পদক্ষেপে এদিকে আসছে একটি মেয়ে। সান্ত্বনার দিকে ফিরেও তাকালো না। তড়বড়

করে সর্দারকে কি সব বলতে লাগল। বিষম রেগে গেছে এবং একটা কিছু নালিশ জানাচ্ছে, এটাই বোঝা গেল। কালো অঙ্গ ঘামে জবজব করছে। টানা দুই চোখে খরখরে রোষবহ্নি।

পাগল সর্দার গম্ভীর মুখে শুনে গেল। পরে হঠাৎ তারস্বরে হাঁক পাড়ল, ই হো-প্-পু-ন্— !

সেই বাজখাঁই হাঁক শুনে সান্ত্বনা চমকে উঠল একেবারে। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে দেখতে লাগল দু'জনকেই। দূর থেকে একটা লোক এদিকে এগিয়ে আসছে দেখা গেল।

ওই লোকটাকে আগে দেখেছে সান্ত্বনা। ছোটখাটো একটা দলের পাণ্ডা গোছের হবে। আর এই মেয়েটাকেও দেখেছে। কিন্তু কাজের মধ্যে তখন অন্য মূর্তি দেখেছে এর। মাথায় করে প্রায় দেড় মণ দু' মণ একটা পাথর বয়ে এনে ধুপ করে ওই জোয়ান লোকটার পায়ের কাছে ফেলছে। সান্ত্বনাকে দেখেই সম্ভবত ভাঙা বাংলায় রসিকতাও করেছে, লে কেতো বড় 'ধিরি' লিবি লে—তুর কলিজা থিকে উ 'ধিরি' অনেক লরমছে।

মেয়েটার ওই দুই চোখে তখন ঝিকমিক করে উঠেছিল যা, সেটা রাগ নয়, আর কিছু। এই হোপুন লোকটার মুখেই শুধু তখন কোনো ভাববিকার দেখে নি সান্ত্বনা, নইলে কাছাকাছি যারা ছিল, সকলেই হেসে উঠেছিল। দৃপ্ত ভঙ্গিতে দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়েটা, আর দুধ-সাদা দাঁত বার করে হাসছিল। সান্ত্বনা অদূরে দাঁড়িয়ে আড়ে আড়ে ওকে দেখেছে আর পাথরটাকে দেখেছে আর অবাক হয়ে ভেবেছে, ওই অত বড় পাথর মেয়েটা এমন অবলীলাক্রমে মাথায় করে বয়ে নিয়ে এলো কি করে!

হোপুন সামনে এসে দাঁড়াতে পাগল সর্দার কি যেন বলল তাকে। একবর্ণও বুঝল না সান্ত্বনা। কিছু শুনেই ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত গজরাতে গজরাতে প্রস্থান করল মেয়েটা। চলনের ঠমকে পায়ে পায়ে সমস্ত আক্রোশ ঝরে পড়তে লাগল যেন।

নিষ্প্রাণ দুই চোখ তুলে হোপুন সর্দারের দিকে তাকালো একবার। সান্ত্বনাকেও দেখল। তেমনি অলস গতিতে ফিরে চলল তারপর।

পাগল সর্দার বলল, উ আমার বিটি চাঁদমণি।

আগ্রহ আরো বাড়ল সান্ত্বনার। কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে পাগল সর্দার আবার বলল, আর উ হোপুন, বিটির সঙতে উর বিয়ো দুব—জাঁওয়াই কুরব।

মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ওকে জামাই করবে। শুনতে মজা লাগছে সান্ত্বনার। মেয়েটার এই রাগ-বিরাগের পিছনে মিষ্টি কিছু আছে নিশ্চয়—তোমার মেয়ে অমন করে এলো আর রাগ করে গেল কেন?

জবাবে পাগল সর্দার যা বলল তার মর্মার্থ, মেয়েটা ভয়ানক দুষ্টু, কাজকর্মে মন নেই, কেবল হাসাহাসি ফষ্টিনষ্টি করে। সেই জন্য সর্দার ওকে অন্যের দল থেকে ছাড়িয়ে হোপুনের তত্ত্বাবধানে কাজে লাগিয়েছে। হোপুনকে সকলে সমীহ করে, কিন্তু মেয়েটা এমন পাজী যে তাকেও পরোয়া করে না। তাই হোপুন খুব কষে খাটায় ওকে। রাগ করে মেয়ে তাই বাপের কাছে নালিশ জানাতে এসেছিল—হোপুনের দলে

কাজ করবে না। পাগল সর্দার হোপুনকে ডেকে চুলের মুঠি ধরে চাঁদমণিকে কাজে লাগাতে বলে দিল।

ভাবী জামাইয়ের ওপর শ্বশুরের টান দেখে সান্ত্বনা অবাক হল, খুশিও হল। এরকম নিরপেক্ষতা দুর্লভ। দূরের দিকে চেয়ে চাঁদমণিকে খুঁজল একবার। বাপের সাদাসাপটা বিচারের ফলটা কি রকম দাঁড়াল না জানি। কিন্তু এতদূর থেকে সঠিক চোখে পড়ে না।

শীগগিরই ওদের বিয়ে দেবে বুঝি?

মনে হল, শোনেই নি। কারণ দূরের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পাগল সর্দার। পরে ক্ষুদ্র জবাব দিল, দুব, সময় আসলে দুব।

খুব প্রাঞ্জল ঠেকল না। সময়ের আর বাকি কি তাও বুঝল না। হোপুনের দীর্ঘায়ত পাথুরে মূর্তিটি চোখে ভাসল একবার। আর যৌবনোচ্ছল চাঁদমণির মূর্তিও। হঠাৎ নিজের কাছেই লজ্জা পেয়ে অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো সান্ত্বনা।

এই পাগল সর্দারের সঙ্গে তার হৃদ্যতা বেড়েছে ক্রমশ। সে ওকে ডাকে দিদিয়া বলে। সান্ত্বনার ভারী মিষ্টি লাগে শুনতে। সর্দারের গোষ্ঠীর সঙ্গেও আলাপ না হোক জানাশুনা হয়ে গেল বেশ। সর্দারের দিদিয়া সকলেরই দিদিয়া। সকলেরই কৌতূহলের পাত্রী। সর্দারের মেয়ে চাঁদমণির সঙ্গেও আলাপের চেষ্টা করেছে সান্ত্বনা। কিন্তু মেয়েটার বেজায় দেমাক। আর মুখেরও আগল নেই। গভীর অবজ্ঞায় সান্ত্বনার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করেছে। তারপর ফিক করে হেসে বলেছে, তু ওজ ওজ মড়াইয়ে লামিস কেনে, তুকে দেখে যে মরদগুলোর পেরাণে অঙ লাগে।

লাল হয়ে সেই যে ফিরে এসেছে সান্ত্বনা আর তার ধারে-কাছে ঘেঁষে নি। আর এড়িয়ে চলে হোপুনকে। চাঁদমণির ভয়ে কিনা কে জানে। তবে তার ওই ষণ্ডমূর্তি আর মরা চাউনি দেখেও কেমন অস্বস্তি লাগে। মুখের দিকে তাকালে লোকটা যেন ভেতর সুদ্ধু দেখতে পায়।

গল্প জমে পাগল সর্দারের সঙ্গে ছুটির দিনে আর অবকাশকালে। শিকারের গল্প, পূর্বপুরুষদের বীরত্বের গল্প, মড়াই-বাঁধা নিয়ে সেই গোড়ার বিভ্রাট—কি হয়েছিল, কি হচ্ছে, কি হবে—সব। দিদিয়ার মত এমন শ্রোতা পাগল সর্দার আর পাবে কোথায়? তার সবেতে কৌতূহল, সবেতে বিস্ময় আর সবেতে বিশ্বাস।

প্রথম যেদিন পাগল সর্দার ওদের বাড়ি এলো, সান্ত্বনা খুশিতে আটখানা। যেন মস্ত গণ্যমান্য কেউ এসেছে। কোথায় বসাবে, কি খেতে দেবে—বাবাকেই তাড়া দিল তিনবার করে। পাগল সর্দার এসেছে, শীগগির এসো বাবা।

সে চলে যেতে অবনীবাবু বললেন, ওদের সঙ্গেই আজকাল বুঝি খুব ভাব তোর?

চোখ বড় বড় করে ফেলে সান্ত্বনা।—পাগল সর্দার কম লোক ভাবো নাকি। কত বড় একটা সর্দার ও জানো? ও না থাকলে তোমাদের মড়াইয়ের কাজ হত কিনা সন্দেহ।

প্রতিবাদ না করে অবনীবাবু মুখ টিপে হাসেন শুধু।

সেদিন সন্ধ্যায় একজন অপরিচিতকে সঙ্গে করে অবনীবাবু বাড়ী ফিরলেন।

অচেনা লোক দেখে সান্ত্বনা ভিতরের ঘরে চলে যাচ্ছিল, অবনীবাবু বাধা দিলেন, যাচ্ছিস কোথায়, দাঁড়া—এঁকে চিনলি ?

লোকটিকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে সান্ত্বনা ঈষৎ বিব্রত মুখে বাবার দিকে তাকালো।

চিনলি নে তো ?—বোসো তুমি বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ! আগন্তুকের দিকে একটা বেতের চেয়ার ঠেলে দিয়ে অবনীবাবু মেয়েকে বললেন, দেশের চৌধুরী-বাড়ির কথা মনে নেই তোর ?—কি করেই বা থাকবে, তোর বয়স তখন পাঁচ বছরও নয় বোধ হয়—তোমরা কত বছর হল দেশ ছেড়েছ নরেন ?

নরেন চৌধুরী। ড্রাফট্‌স্‌ম্যান। হেসে জবাব দিল, পনের-ষোল বছর হবে বোধ হয়, বছর চোদ্দ বয়স আমার তখন। সোজাসুজি তাকালো এবার সান্ত্বনার দিকে। বলল, না চিনলেও আমার কিন্তু মনে আছে ঠিক, ফ্রকপরা এতটুকু দেখেছি। অবনীবাবুর উদ্দেশে বলল, তা ছাড়া আপনিও বিশেষ বদলান নি, দেখেই চেনা-চেনা লাগছিল।

অবনীবাবু আর একটা চেয়ার টেনে বসলেন।—তুমি না বললে আমি চিনতেই পারতুম না, আজ বলতেই তোমার ছেলেবেলার চেহারাসুদ্ধ মনে পড়ে গেল—অথচ এত দিন দেখছি, একবারও মনে হয় নি কিছু।

নবাগতকে লক্ষ্য করে সান্ত্বনা এবারে হালকা সুরে বলল, এতদিন একসঙ্গে কাজ করার পর আজ সবে পরিচয়টা বেরুলো !

জবাব দিলেন অবনীবাবু।—একসঙ্গে কি রে, নরেন হল পাস করা ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফট্‌সম্যান—কত বড় চাকরি ! ওর নেহাত চোখ আছে বলেই চিনেছে। আমার মত কতজনকে দেখছে রোজ, মনে রাখা সহজ নাকি !

সান্ত্বনার ভালো লাগল না কথাগুলো। এ বয়সে তার বাবার ওপরে কাজ করে শুনেই বোধ হয়। না, দেশের চৌধুরী-বাড়িটার কথা তার কিছু মনে নেই। একেও কখনো দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। ওপরঅলাদের ওপরে মনোভাব খুব প্রসন্ন নয় সান্ত্বনার। তাদের না দেখুক, তাদের বাড়ির মেয়েদের দেখেছে। মাটিতে পা পড়ে না। বাবার সামনে পাগল সর্দারের শ্রদ্ধাবনত মূর্তিটি বরং ভালো লেগেছিল।

ভাবান্তরটুকু নরেন চৌধুরী লক্ষ্য করল কিনা বলা যায় না। সান্ত্বনার দিকে চেয়েই বলল, আপনার বাবা কিন্তু আমাকে চা খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন।

অবনীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ রে সান্ত্বনা, তাই তো—একটু চা দে, আর দেখ, নরেনের বোধ হয় ক্ষিদেও পেয়েছে—

নরেনই গম্ভীর মুখে জবাব দিল, বোধ হয় নয়, নিশ্চয় পেয়েছে।

অবনীবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। সান্ত্বনাও হাসিমুখে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে এলো। কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে ভাবল দু'চার মুহূর্ত।

বড় চাকরি করলেও লোকটা দেমাকী নয় বোধ হয় তেমন। মুখের আদলেও ভালোমানুষ-ভালোমানুষ ভাব আছে। নামটাও শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। কোথায় শুনল ? পাগল সর্দার—হ্যাঁ, পাগল সর্দারের মুখেই শুনেছে। তাকে ছাড়া আর কাকে

চেনে সে। মনে পড়তে নীরব আগ্রহ পরিস্ফুট হ'ল মুখে।

আনন্দে চোখ বড় বড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরেন চৌধুরী। হাত বাড়িয়ে সান্ত্বনার হাত থেকে ডিস দু'টো নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল নিজেই, রসনায় একটা সিক্ত শব্দ বার করে বসে পড়ল আবার।

সান্ত্বনা হেসে ফেলল।

হাসছেন কি। এই ঘোড়ার ডিমের জায়গায় না খেয়েই মারা গেলাম। এগুলো কি—বেসন দিয়ে আলু-বেগুনের কাটলেট? মার্ভেলাস—আর এটা মাছের ফ্রাই? মাছ পেলেন কোথায়?

তার হাবভাব দেখে সংকোচ প্রায় কেটেই গেল সান্ত্বনার। হেসে জবাব দিল, চৌবাচ্ছায় পুষছি।

লোকটি ভোজনরসিক বটে। অবনীবাবু নিলেন কি নিলেন না। একাই সে সানন্দে এবং সাড়ম্বরে প্লেট দু'টি খালি করে ফেলল। পরে বড় একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার তাহলে খাবার কষ্ট নেই কিছু?

স্মিতহাস্যে অবনীবাবু মাথা নাড়লেন, না—এ বিদ্যেটা ও পাকা গিন্নীর মত শিখেছে।

মহাবিদ্যে শিখেছেন, আমাদের ভুতুবাবুকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব, তাকে একটু আধটু শিখিয়ে দেবেন।

সান্ত্বনা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল, ভুতুবাবু কে?

ভুতুবাবুকে চেনেন না। ওই যে পাহাড়ের নিচে যার অলফাউণ্ড স্টল—স্নো পাউডার থেকে মাংস ভাত পর্যন্ত সবই নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যায়। তাব ওখান থেকেই তো রোজ আমার খাবার আসে—দু'বেলা ভাত-ডাল-মাংস—এর বাইরে কিছু চেয়েছেন কি দশ মাইল দূরে যাতায়াতের নামমাত্র খরচটা সুদ্ধ ধরে নেবে—এখানকার বেশির ভাগ লোকেরই ভুতুবাবু ভরসা।

ভুতুবাবুর স্টল সান্ত্বনা দেখেছে। নামটাই জানত না। অবনীবাবু ঠাট্টার ছলে বললেন, তোমাদের ভুতুবাবু ছাড়া গতি কি। পাগল সর্দারের সঙ্গে তো আর ভাব হয় নি তোমাদের—তার লোক প্রায়ই বাড়ি বয়ে মাছ পর্যন্ত দিয়ে যায়। শীগগিরই আবার গরুও যোগাড় করে দেবে বলেছে।

নরেন চৌধুরী সবিস্ময়ে তাকালো সান্ত্বনার দিকে। গোরু। গোরু কি হবে?

অবনীবাবুই জবাব দিলেন, একটু খাঁটি দুধ না পেয়ে আমার শরীর দিনকে দিন কত খারাপ হয়ে যাচ্ছে, দেখছ না?

হাসতে লাগলেন তিনি। নরেন চৌধুরীও। সান্ত্বনা বলল, বেশ যাও, ওই ভুতুবাবুর হোটেল থেকে দু'বেলা মাংস ভাত আনিয়ে খেও এবার থেকে। হেসে ফেলল, মাগো কি নাম, ভুতুবাবু।

হাসিখুশি আমোদপ্রিয় মানুষ নরেন চৌধুরী। পদমর্যাদায় চালচলনে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। দেখছে চেয়ে চেয়ে। সেই ফ্রকপরা মেয়েটির সঙ্গে বাইরে মিল নেই

বটে, কিন্তু ভিতরে যেন আছে। বলল, না, আমাদের ভুতুবাবুর থেকে আপনার পাগল সর্দার অনেক ভালো, মাছের ফ্রাই খাওয়ার পরে সে কথা আমি একবাক্যে বলব। মড়াইয়ের ওদের মধ্যে প্রায়ই আপনাকে ঘোরাঘুরি করতে দেখি, ওরাই আপনার ফ্রেণ্ড-স্টাফ বুঝি সব?

তাই। অবনীবাবু সায় দিলেন, তুমি আর ক'জনকে চেনো, ও সক্কলকে চেনে।

চিনিই তো। সান্ত্বনা জোর দিয়ে বললে, ওদের অত অহংকার নেই ভদ্রলোকদের মত, ওরা খুব ভালো।

সত্যি কথা। নরেন চৌধুরী সমর্থন করল, আর ওই সর্দারটি ভারি খাঁটি লোক।

পাগল সর্দারের প্রশংসা শুনে সান্ত্বনা খুশি হল। বলল, তার মুখে আপনারও খুব সুখ্যাতি শুনেছিলাম একদিন। প্রথম দিকে মড়াই বাঁধার গণ্ডগোলের সময় কারা সব চড়াও করেছিল ওকে, আপনি নাকি তখন 'ফুটুক' তোলার যন্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে ওদের তাড়িয়েছিলেন।

নরেন চৌধুরী হাসতে লাগল।—সে একটা দিন গেছে, বাদল তো শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে চলেই যাবে কিনা ভাবছিল।

বাদল কে? সান্ত্বনা উৎসুক হল।

অবনীবাবু বললেন, বেশ, এখানকার চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির নাম শুনিস নি?

শুনেছে। অনেক শুনেছে। মানুষটির প্রতিও বিশেষ একটা সম্ভ্রম-মেশানো কৌতূহল আছে। এত বড় এক দায়িত্ব যার, এত অজস্র লোক কাজ করছে যার নির্দেশে, কত বড় একজন সে না জানি! তাকে দেখে নি, কিন্তু দেখার আগ্রহ অপরিসীম। তার কাজের গল্প শুনেছে, তার গুরু-গাম্ভীর্যের কথা শুনেছে। বাবাকেও কতদিন হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে দেখেছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডাকছে শুনে। সেই বাদল গাঙ্গুলিকে কালু-ভুলুর মত শুধু বাদল বললে সান্ত্বনা চট করে ধরবে কি করে?

অবনীবাবুই বললেন আবার, বাদল গাঙ্গুলি নরেনের খুব বন্ধু জানিস নে বুঝি? সেই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ওরা একসঙ্গে পড়েছে, একসঙ্গে কাজও করেছে তারপর। উনিই তো চেষ্টাচরিত্র করে নরেনকে নিয়ে এসেছেন এখানে।

ছন্দপতন ঘটল যেন। সান্ত্বনা নরেনের মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—ওমা, তাহলে তাঁর বয়স কত?

মনে মনে সান্ত্বনা যে চোখ দিয়ে কল্পনা করেছিল সেই লোকটিকে, তাতে তার বয়সের হিসেব কোন সংখ্যাতেই হয় না বোধ হয়। দু'জনকেই হেসে উঠতে দেখে লজ্জা পেয়ে গেল। একটু বাদে নরেন বলল, আপনার নিরাশ হবার কারণ নেই, ও লোকটার আসল বয়সের কোনো গাছপাথর নেই।

সঠিক বুঝল না সান্ত্বনা। চেয়ে রইল। অবনীবাবু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেললেন।—এসব কথা থাক এখন, এ ও সারারাত বসে শুনতে পারে। কিন্তু তুমি সেই থেকে ওকে আপনি আপনি বলছ কি, ও কত ছোট—তুই কি রে সান্ত্বনা!

ফ্রক-পরা দেখেছে, আপনি করে বলতে নরেনের কেমন লাগছিল সত্যিই। কিন্তু

তুমিও বলে উঠতে পারছিল না চট করে। অবনীবাবুর কথায় এবার সকৌতুকে তাকাল সান্ত্বনার দিকে।

বাবার অনুযোগে বিব্রত হাস্যে সান্ত্বনা জবাব দিল, ডাকলে কি করব—বেশ লাগছিল শুনতে, তুমি দিলে বোধ হয় পণ্ড করে।

জোর হাসিতে ঘর ভরে তুলল নরেন চৌধুরী।—বেশ লাগলে সেটুকু আর পণ্ড করি কেন, আপনি-আজ্ঞে করেই বলব'খন তাহলে।

সান্ত্বনা টেনে টেনে জবাব দিল, নাঃ, এর পর আর কি করে হয়—

যাবার আগে নরেন জিজ্ঞাসা করল, আলু-বেগুনের কাটলেট খেতে আবার কবে আসছি?

ভারী তো, রোজই আসুন না।

রোজ না হোক, মাঝে মাঝেই এর পর পদার্পণ ঘটতে লাগল নরেন চৌধুরীর। আসলে এই আশাতেই তার প্রথম দিন আসা।

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটি মেয়ে মড়াইয়ের বুকে এক দঙ্গল কালো মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, কে না দেখেছে?

শুভ্রশ্রী গিরিকন্যার মতই পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক মেয়েকে অবাধে বিচরণ করতে কে না দেখেছে?

পাহাড়ী পথের উঁচু-নিচুতে দিনের মধ্যে ক'বার করে নারীদেহবন্দিনী এক যৌবন-তরঙ্গের ওঠা-নামাই বা কে না দেখেছে?

এই দেখার খবর শুধু সান্ত্বনাই রাখে না। নরেন চৌধুরীও আর সকলের মতই দূরে থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে অনেক দিন। ওই রুক্ষ, নীরস পরিবেশে সে দৃশ্য যেন এক মস্ত রিলিফ। অন্যথায় যোগসূত্র পেয়েই ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফটসম্যান নরেন চৌধুরী সাধারণ ওভারসিয়ার অবনীবাবুর সঙ্গে এত আগ্রহে পুরানো পরিচয় ঝালিয়ে নিত কিনা বলা যায় না।

ভিন্ন ভিন্ন গাছেরও সবুজ পত্রালীতে একটা মিল চোখে পড়ে। সেটা পাতার নয়, সবুজের। নরেন আর সান্ত্বনার মধ্যেও তেমনি মিল আছে খানিকটা। সেটা বয়সের নয়, মনেরও নয়, সজীব তারুণ্যের। সেদিক থেকে দু'জনেই এরা অনেকটা সমগোত্রীয় ছেলেমানুষ।

পরিবেশও অনুকূল। এই পাহাড়ী রুক্ষতায় আর যাই থাক, সংকীর্ণতা কম।

অবনীবাবু ঠাট্টা করেন, এবারে যত খুশি ড্যামের গল্প শোন।

সান্ত্বনা মুখে আগ্রহ দেখায় না কিছু। বরং ঠোঁট উল্টে বলে, ভারী তো হচ্ছে, তার আবার গল্প।

নরেন জবাব দেয়, কি হচ্ছে বুঝলে মেয়েরাই ইঞ্জিনিয়ার হত।

সান্ত্বনা বলে, মেয়েরা ইঞ্জিনিয়ার হলে ভুতুবাবুরা রান্নাঘরে ঢুকত।

ছদ্মত্রাসে শিউরে ওঠে নরেন, বাপ রে বাপ।

এই ভোজনরসিকতার ভিতর দিয়েই এমন অল্প সময়ে এত অন্তরঙ্গ একজন হয়েছে সে। কখনো এসে হাত পা ছড়িয়ে বসে পড়ে এমন, সে মূর্তি দেখে হেসে

ফেলে সান্ত্বনা। নরেন চৌধুরী হাত-মুখের ইশারায় জানায়, রসদ কিছু না পড়লে নাড়ী ছেড়ে গেল বলে। কখনো নিজেই আবার হাতে করে নিয়ে আসে কিছু। বিশেষ করে ছুটির দিনে। বলে, এটা করো, ওটা রাঁধো—।

প্রথম প্রথম সান্ত্বনা অনুযোগ করেছে, পরে রাগ দেখিয়েছে।—কিছুই করব না, এসব নিয়ে ভুতুবাবুর কাছে যান, রেঁধে দেবে।

বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলে নরেন চৌধুরী।—ওই একটা লোককে মাঝে মাঝে আমার খুন করতে সাধ যায়।

ভিতরের দাওয়ায় মোড়া পেতে দেয় সান্ত্বনা। নরেন গ্যাঁট হয়ে বসে খাবার তৈরী করা দেখে তার। আর নীরব প্রতীক্ষায় সিগারেট টানে। অবনীবাবুর জন্যে পাঁচবার করে লুকোতে হয় একটা সিগারেট। ইঞ্জিনিয়ার নরেন চৌধুরী লুকাতো না, দেশের ছেলে নরেন লুকোয়। ভদ্রলোক আড়াল হলে সান্ত্বনাকে শুনিয়ে টিপ্পনীও কাটে তাঁর উদ্দেশে। সান্ত্বনা কখনো হাসে, কখনো শাসায়, দাঁড়ান বাবাকে বলছি!

সান্ত্বনার হালকা তর্জন হয়ত অবনীবাবু শুনে ফেলেন। আবার এসে দাঁড়ান তিনি।—কি বলবি?

জবাবে সান্ত্বনা আবারও হেসেই ফেলে। নয়তো বলে, এই ক'টি খাবার আবার তিন ভাগ হবে বলে নরেনবাবু দুঃখ ক'চ্ছিলেন।

অবনীবাবু হেসে বলেন, তা ওকে দে না বেশি করে—।

চলে গেলে নরেন ভুরু কুঁচকে তাকাল সান্ত্বনার দিকে। আমাকে কি ভেবেছ শুনি? আমি রীতিমত উপোস পর্যন্ত করতে পারি জানো?

জানি।

জানো কি রকম? নরেন ঘাবড়ে যায়।

মরুভূমির পেটে জল ঢাললেই কি আর মরুভূমি ঠাণ্ডা হয়! উপোস তো করেই আছেন--।

বৃথাই জুৎসই জবাব হাতড়ে বেড়ায় নরেন।

মানুষটার আর এক অভ্যাস দেখে হেসে কুটি কুটি হয় সান্ত্বনা। হাতীর দাঁতের কান-কাঠি দিয়ে তার কান সুড়সুড়ির আয়াস উপভোগ করা। সারাক্ষণ সঙ্গেই থাকে ওই কান-কাঠি। স্পেশাল অর্ডার দিয়ে করানো নাকি। হাতে যখন সিগারেট নেই তখন ওটা আছে। সন্তর্পণে কানের রন্ধ্রে চালান করে দিয়ে একটু একটু নাড়ে, আর গলা দিয়ে কুড়কুড় শব্দ বার করে একটা—আমেজে চোখ বুজে আসে।

সান্ত্বনা এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা কম করে নি। শাড়ির আঁচলে কোণ পাকিয়ে সেটা নিজের কানে গুঁজে দিয়ে অনুকরণ করেছে তারই সামনে। গলা দিয়ে ওর মত শব্দ বার করতে গিয়ে হেসে গড়িয়েছে।

নরেন বলে, খুব হাসো, অভ্যাসটা হলে দেখবে কত মজা।

কি মজা?

একটুখানি কানের তদ্‌বির করেই দুনিয়াটাকে দার্শনিক চোখে দেখার মজা।

দার্শনিক চোখ মানে?

দর্শন বোঝ ?

দু চোখ টান করে সান্ত্বনা তাকায় তার দিকে।—এই আপনাকে দর্শন করছি।

দর্শনতত্ত্ব আর বোঝানো হয় না নরেন চৌধুরীর। অজ্ঞাতে নিজেও সে স্থূল দর্শনেরই পাঠ নেয়।

কিন্তু ড্যামের কর্মপরিবেশে এই মেয়েরই আবার আর এক ধরনের অবিচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা এবং কৌতূহল দেখে নরেন চৌধুরী বিস্মিত হয়েছে। গঠন-যান্ত্রিকতার প্রতি কোন মেয়েরই এরকম আগ্রহ থাকার কথা নয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে। বুদ্ধির অগম্য কিছু দেখলে না জেনে নেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এই ঘনিষ্ঠতার পরে সান্ত্বনা শুধু সাঁওতালদের এলাকাতে নয়, সর্বত্রই ঘুরে বেড়ায়। হাঁ করে চেয়ে চেয়ে অতিকায় বুলডোজারের মাটি সরানো দেখে, ড্রেজার দিয়ে মাটি ঠেলে ঠেলে লেভেল করার প্রক্রিয়াও নীরস নয় তার চোখে। নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বক্ষে হয়েস্ট দিয়ে তিন-চারতলা সমান উঁচুতে অতিকায় এক একটা পাথর তোলা দেখে। ওই দড়ির মত বস্তুটা ছিঁড়ে গেলে কি মারাত্মক ব্যাপার হতে পারে ভেবে কণ্টকিত হয় মনে মনে। নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে তার পর, যাক ছেঁড়ে নি।

কিন্তু আবার নেমে আসছে ওটা, আবার একটা তুলবে। প্রত্যেক বারই রীতিমত ভয় তার। চার্নিং মেসিনে করে জল দিয়ে সিমেন্ট বালি আর পাথরকুচি মেশানোর ব্যাপারটাও যেন এক সকৌতুক পর্যবেক্ষণের বস্তু। আরও অবাক লাগে, আর্থবোরাব দিয়ে মাটি ফোঁড়া দেখে। নদীবক্ষেরও আশি নব্বুই একশ ফুট পর্যন্ত খুঁড়ে পাথরের স্তর বার করতে হবে। সেই স্তরের ওপর দাঁড়াবে পাকা পাথবের দেয়াল। নরেনের মুখে সেই দেয়ালের ফিরিস্তি শুনে সান্ত্বনার বিস্ময়ের শেষ নেই। নদীর নিচে থাকবে একশ ফুট, ওপরেও প্রায় তাই—চওড়া হবে পঞ্চাশ-ষাট ফুটের মত। ওপরের দিকে সেই দেয়ালের ভিতর দিয়ে চলাচলের পথ থাকবে এপার ওপার—যন্ত্রপাতি থাকবে অজস্র, এক একটা সুইচ টিপলে এক একটা লক গেট উঠবে, নামবে—।

লক গেট কী?

আগাগোড়া নিটোল দেয়াল দিয়ে জল আটকে বসে থাকলে আর জল পাবে কেমন করে লোকে। গেট থাকবে পনেরো-বিশটা। গেট খুলে দিলে জলে জলময় হয়ে যাবে অন্য দিক, আবার গেট ফেলে দিলেই সব বন্ধ।

সান্ত্বনার যেন বিশ্বাস হয় না। দেয়ালের এদিকে অবরুদ্ধ হয়ে জল উঠবে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর ফুট উঁচুতে। তারপর এক একটা গেট খুলে দিলে রুদ্ধ জল আছড়ে পড়বে অন্য দিকের শুকনো অতলে—তার মুখে পড়লে একসঙ্গে হাজার হাতীর হাড়গোড়ও নাকি গুঁড়িয়ে যাবে পলকা খেলনার মতই। নালা কেটে কেটে সেই জল নিয়ে যাও যেখানে খুশি, যেখানে দরকার। তাই শুধু নয়, ওই শুকনো দিকেরই একধারে আবার বিদ্যুৎ তৈরীর ব্যবস্থাও হবে নাকি। জল থেকে বিদ্যুৎ হয় এরকম কথা অবশ্য শোনা ছিল সান্ত্বনার। কিন্তু শোনা কথায় আর চোখে দেখা রোমাঞ্চে রাত-দিনের পার্থক্য।

সান্ত্বনা ভাবতে পারে না সবটা। এ যেন এক আজব কারীগরির রূপকথা। স্বপ্ন-সম্ভবের মহড়া। ওরা কাজ করে, সান্ত্বনার মনে হয় বিশ্বকর্মার দূত বুঝি ওরা।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথাও মনে হয়। এই গঠন সমারোহের সর্বপ্রধান যে। এই গঠন অভিযানের নায়ক যে মানুষ। চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। দূর থেকে মাত্র একটিবার তাকে দেখার লোভ যে কত, সে শুধু সান্ত্বনাই জানে। হিরো ওয়ারশিপের যুগ নয় এটা। কিন্তু বড় দুনিয়ায়ও বড়র অর্ঘ্য আছেই। সান্ত্বনার ছোট পরিসরে এত বড় আর কে? কলের মানুষ, কলের মতই অবিশ্রান্ত কাজ করে নাকি। পরিচিত জনেরা বলে। তার বাবা, নরেনবাবু, এমন কি পাগল সর্দারও প্রায় ওই কথাই বলে। তাদের চোখে দেখা কাছে দেখা মানুষ। সাদা কথা সাদা অর্থেই বলে তারা। কিন্তু শুনে সান্ত্বনার সম্ভ্রম বাড়ে আরো। নৈষ্ঠিক দূরত্ব বাড়ে।

এই ড্যামের কাহিনী শুরু থেকে শুনতে বসলে, বিশেষ করে পাগল সর্দারের মত একজনের মুখ থেকে শুনতে বসলে শুনবে যা, এক কথায় তাকে অ্যাডভেঞ্চার বলা যায়। সান্ত্বনা তাই শুনেছে। বিশ্বাস করেছে। রোমাঞ্চিত হয়েছে। পাগল সর্দারের অ্যাভভেঞ্চারে অত্যুক্তি খুব না থাকুক, আবহাওয়া সৃজনের মালমসলা কিছু থাকাই স্বাভাবিক। দিদিয়ার বিস্ময়বিহ্বল দুই বড় বড় চোখের দিকে চেয়ে তার বলার ঝোঁকে সেই অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক বাদল গাঙ্গুলি মড়াই কোন ছার, সাত সাগরের পায়েও শেকল পরাতে পারত।

কিন্তু সদ্য বর্তমানে নিজের অগোচরে এই পাগল সর্দারের মনেই একটুখানি খেদ আছে বোঝা যায়। এখন রাস্তা হয়েছে, কোয়ার্টার হয়েছে, আপিসঘর হয়েছে, জিপ ট্রাক এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধানও এসেছে খানিকটা। বর্তমানের এই আপিসি-আবহাওয়াটাই সর্দারের পছন্দ নয়। পাহাড়ে-পাথরে, জলে-জঙ্গলে বিঘ্ন উত্তরণের একাত্মতায় মড়াইয়ের নায়ক ছিল তাদেরই একজন। কিন্তু সে অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক আজ আপিসের বড় সাহেব। বড় সাহেব কথাটার তাৎপর্য একটু একটু যেন বুঝতে শিখেছে। তার সাক্ষাৎও বড় একটা পায় না আজকাল। হুকুম আসে কাগজে কলমে পাঁচ হাত ঘুরে। নীরস একটা ছকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে বলেই পাগল সর্দারের কাছে কলের মানুষের মতই হয়ে উঠেছে বাদল গাঙ্গুলি। সান্ত্বনা ভাবে, কলের মত কাজ না করলে যন্ত্রযুগের সৃষ্টির অ্যাডভেঞ্চার যে অচল হয়, সে আর ও বুঝবে কি করে?

কিন্তু নরেনের কথা শুনে সান্ত্বনা তটস্থ। তার আগ্রহ দেখে ভাতের সঙ্গে ডাল মাখার মত করেই বলল, বেশ তো চলো না, বাদলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি আজই—এখন বোধ হয় কোয়ার্টারেই পাওয়া যাবে তাকে।

আলাপ করিয়ে দেবেন! আমার সঙ্গে?

বিস্ময় দেখে নরেনও অবাক হয় একটু। হেসে বলে, কেন, সে বাঘ না ভালুক!

বাঘ ভালুক নয়, তবু শুনেই আড়ষ্ট প্রায়। সামনে গিয়ে দু পায়ের ওপর ভর করে সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। হ্যাঃ, আমি যাব তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে, আপনি যেন কি!

এ রকম অনেক সময় অনেক কথা হয়েছে আরো। সান্ত্বনা ছেলেমানুষের মতই জিজ্ঞাসা করেছে, আচ্ছা আপনিও তো তাঁর সঙ্গে একত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছেন, আপনিও তাঁর মত হলেন না কেন?

নরেন হালকা জবাব দেয়, সবাই তো স্কুল-কলেজে পড়ে, সবাই প্রাইম-মিনিস্টার হয় না কেন?

বুঝতে চেষ্টা করে সান্ত্বনা বলে, ভিতরে খুব একটা কিছু থাকা দরকার, না— ?

ছদ্মগাম্ভীর্যে নরেন চৌধুরী জবাব দেয়, হ্যাঁ, হিমালয়ের মত বড় কিছু।

যান, আপনার কেবল ঠাট্টা।

এবারে কিছুটা আন্তরিক ভাবেই বলে নরেন চৌধুরী।—পাস করার পরেও ও হাতে কলমে কত কাজ করেছে, তা ছাড়া বিলেতে গেছে জার্মানীতে গেছে।

আপনি গেলেন না কেন?

গেলে কি হত?

বেশ হত।

কি বেশ হত, আর না গিয়েই বা কতটুকু হয়েছে, সে সম্বন্ধে সান্ত্বনার সুস্পষ্ট ধারণা নেই কিছু। প্রথম আলাপের সময় বাবার মুখে তার বড় চাকরির কথা শুনেছিল, এ ক'দিনের ঘনিষ্ঠতায় তার গুরুত্ব গেছে। বড় মানে আর কত বড়। তাই সত্যিই ও ভাবছিল, বেশ হত নরেন চৌধুরীও তেমন বড়র মতই বড় একজন হলে। আর বেশ হত, তখন তার সঙ্গে যদি সহজ আলাপ পরিচয় থাকত এরকম।

এই সাদাসিধে মনোভাব জ্ঞাপনের ফলে নরেন চৌধুরীর একটু ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা। কিন্তু স্পষ্ট সহজতার একটা দিকও আছে। যা মনকে বিরূপ করে না, বরং টানে। হেসেই জবাব দিল, দুর্ভাগ্য আমার। কিন্তু এখন দেখছি, বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে তোমার আলাপ করতে না যাওয়াই ভালো।

কেন? না যাক, সান্ত্বনার আগ্রহ কম নয়।

তারও মাত্র দুটো হাত, দুটো পা, একটা মাথা, দুটো চোখ—

প্রায় আপনার মতই? নিরীহ অভিব্যক্তি।

ভুরু কুঁচকে ফেলে নরেন চৌধুরী। প্রায় মানে? আমার কি ওগুলো ঠিক ঠিক নেই নাকি?

জব্দ করতে পেরেই সান্ত্বনা খুশি।

ছদ্ম কোপে নরেন মাটির কাছে হাত এনে বলল, তোমাকে এতটুকু ফ্রকপরা দেখেছি, জানো?

প্রচ্ছন্ন কৌতুকে সান্ত্বনা কয়েক মুহূর্ত দেখল তাকে। পরে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, সেই আপনিও হাফপ্যান্ট পরতেন যখন?

মৃদু মৃদু হাসতে থাকে নরেন। হাফপ্যান্ট তো এখনো পরি।

আপনার হাফপ্যান্টের বয়স তাহলে পেরোয় নি এখনো। আমার ফ্রকপরার বয়স অনেককাল গেছে।

আবারো জব্দ। খুশিভরা চোখে চেয়েই থাকে নরেন চৌধুরী। পরে বলে, জিভের ডগায় যে সরস্বতী ঠাকরোন বসেই আছেন দেখি। লেখাপড়া শিখলে খুব ভালো করতে তুমি।

সান্ত্বনা যথার্থ লজ্জা পেয়ে যায় এবার। লেখাপড়ার প্রসঙ্গ উঠলে মাসির বাড়িতেও

রান্নাঘরে পালিয়ে বাঁচত। এ ব্যাপারে তার যত লজ্জা তত সঙ্কোচ। অবনীবাবুর সামনে নরেন আর একদিনও কি কথায় ওর লেখাপড়ার প্রসঙ্গ তুলেছিল। সান্ত্বনা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেছে সেখান থেকেও। কিন্তু বাবা ওদিকে উৎফুল্ল মুখে তার ছেলেবেলার পড়াশুনার গল্প ফেঁদে বসেছেন তাও কানে এসেছে। এক এক সময়ে হিড় হিড় করে টেনে এনে পিঠে গুমগুম কিল বসিয়ে ওর মা পড়তে বসাতেন ওকে। কিন্তু তিনি আড়াল হলেই চুপি চুপি ও উঠে আসত বাবার কাছে। মুখখানা যতটা সম্ভব করুণ করে বাবার একখানা হাত তুলে নিজের কপালে ঠেকাত। অর্থাৎ দেখো তো, গা-টা গরম লাগছে কিনা। নয়ত জিভ বার করে দেখাত বাবাকে—কোন রোগের উপসর্গ যদি বার করা যায়। রোগ ঠিক না হোক, রোগ-সম্ভাবনার উপসর্গ অবনীবাবুও অবধারিত দেখতে পেতেন। পড়াশুনার অনুশাসন তার পরেও আর শিথিল না করে উপায় কি! কিন্তু সান্ত্বনাই বিপদ বাধাতো আবার সব ভুলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দু চোখ লাল না হওয়া পর্যন্ত পুকুরে ডুবে উঠে। মায়ের খপ্পরে পড়তে হত আবারও। বহ্নি-উদ্‌গিরণ থেকে রেহাই পেতেন না অবনীবাবুও।

আড়াল থেকে শুনতে শুনতে সান্ত্বনা লাল হয়ে ওঠে এক একবার। আবার রাগও হয় বাবার ওপর। খুব গল্প করা হচ্ছে এখন! তখন অমন আদর না দিলে আজ এরকম হত!

পরে খেতে বসে নরেন বলে, পড়াশুনার নিকুচি করেছে, রান্নার বিদ্যেয় তোমাকে ডক্টরেট দেওয়া উচিত।

প্রায় রাগ করেই সান্ত্বনা জবাব দেয়, আর খাওয়ার বিদ্যেয় আপনাকে মহামহোপাধ্যায় দেওয়া উচিত।

মেঘের ফাটলে রোদের ঝলকের মত রাগের মুখেই হাসি ছলকে ওঠে আবার।

॥ ৪ ॥

হোটেলের মালিক ভুতুবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল সান্ত্বনার।

আলাপের পরামর্শ দিয়েছিল পাগল সর্দার। দিদিয়ার অনুরোধ মত একটা দুধলো গোরু সংগ্রহ করতে না পেরে একেবারে অকর্মণ্য মনে হচ্ছিল নিজেকে। বেচারীর সময় কম, খোঁজ করে কখন। মড়াইয়ের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাতে হাড়িয়া টেনে সুপ্তির কোলে ঢলে পড়ে। শুধু ও নয়। দলকে দল। মেয়ে পুরুষ সকলে। আর মড়াইয়ে যারা কাজ করে না, অর্থাৎ যাদের সময় আছে, গায়-গতরে প্রায় স্থবির তারা। তবু এদের অনেককেই বলে রেখেছে সর্দার। সপ্তাহের ছুটির দিনে নিজেই যতটা সম্ভব খোঁজখবর করে। কিন্তু পছন্দমত পেয়ে ওঠে না। নিজের মেয়ে চাঁদমণিকেও বলেছিল। পাঁচ জায়গায় ঘোরে, পাঁচ ঘরের খবর রাখে। যদি কোন সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু হতচ্ছাড়ি মেয়ে এমন জবাব দিয়েছিল যে হাতের কাছে পেলে আচ্ছা করে দু ঘা কষিয়ে দিত। গম্ভীর মুখে বলেছে, গোরুটোরুর খবর সে রাখে না, তবে তার সন্ধানে একটি বলদ আছে বটে, হলে সেটাই দিদিয়াকে দিয়ে দিতে পারে। আঙুল

দিয়ে ঘরের তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখিয়ে দিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে।

তৃতীয় লোকটি হোপুন।

এদিকে দেখা হলেই সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করে, আমার গোরু কি হল সর্দার?

সর্দার মুখে আশ্বাস দেয় বটে, গোরুর মত গোরু পেলেই এনে দেবে। কিন্তু মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে।

পরে এক ছুটির দিনের সকালে উঠেই হঠাৎ গোরুর কথা আর ভুতুবাবুর কথা একসঙ্গেই মনে হল তার। এতদিন মনে হয় নি বলে নিজের ওপরেই রুষ্ট হল সে। সময় নষ্ট না করে সোজা চলে এলো দিদিয়ার কাছে।

ভুতুবাবু গোরু যোগাড় করে দেবে। সান্ত্বনা অবাক।

তু টুকচি চল না কেনে আমার সঙতে, উ ঠিক দেবে। পাগল সর্দার নিঃসংশয় প্রায়।

সান্ত্বনা মুশকিলে পড়ল একটু। সকালের দিকটায় রান্নাবান্নার কাজ থাকে। ছুটির দিন নরেনের এখানে খাওয়া বরাদ্দ বলে একটু বেশিই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তারই জন্য এত আগ্রহ নিয়ে লোকটি এসেছে, ফেরাতে মন সরল না। ওদিকে এই রোদে নিচে নামব শুনলেও বাবার কাছেও বকুনি খেয়ে মরতে হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে। চুপি চুপি রান্না ঘর বন্ধ করে চলে এলো সে। বাবা আপিসের কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন, টের না-ও পেতে পারেন।

শীগগির পা চালিয়ে চলো, চট করে ঘুরে আসতে হবে।

কিন্তু ভুতুবাবুর আপ্যায়ন এড়িয়ে চট করে ঘুরে আসাটা অত সহজ নয় জানত না।

কালো বেঁটেখাটো গোলাকৃতি মানুষ। হাত-পা চোখ-মুখ সবেতেই ফোলা ফোলা গোলাকার ভাব। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, গায়ে বগলছেঁড়া আধময়লা নেটের গেঞ্জি।

সর্দারের সঙ্গে সান্ত্বনাকে দেখেই হাঁটুর কাপড় যতটা সম্ভব টেনে নামিয়ে ভুতুবাবু ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল। আনত অভিবাদন জ্ঞাপন করল দু হাত জুড়ে। —আসুন, আসুন, কি সৌভাগ্য, বসুন। ত্রস্তে ময়লা ঝাড়ন এনে একটা বেঞ্চি ভালো করে ঝেড়েমুছে দিল। বসুন, এইখেনটায় বসুন।

তার ব্যস্ততায় আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে সান্ত্বনা বসে বাঁচল।

প্রবেশ পথের ধুলো-বালির ওপরেই সর্দার বসে পড়ল। দেয়াল সংলগ্ন হুঁকোর মুখ থেকে কলকেটা তুলে নিয়ে ভুতুবাবু তার হাতে দিল। নাও তামাক খাও।

হৃষ্টচিত্তে সর্দার দু হাতে কল্কে বাগিয়ে ধরে মুখে ঠেকালো। ভুতুবাবু সবিনয়ে এবং সহাস্যে সান্ত্বনার সামনে এসে দাঁড়াল—আপনি এলেন, পরম সৌভাগ্য আমার—আপনি তো আমাদের ওভারসিয়ারবাবুর মেয়ে—চিনি চিনি, সক্কলকে চিনি আমি এখানকার। আর আপনাকে তো সবাই চেনে, এই ড্যামের যত্রতত্র আপনার মত অত আর কে ঘোরে—বড় ভালো লাগে দেখতে।

লজ্জায় আর গরমে সান্ত্বনা রাঙিয়ে উঠেছে প্রায়। তামাকের কল্কেয় পাগল

সর্দারের নিবিষ্টতা দেখে মনে হল, কি জন্যে এসেছে তাই বোধ হয় ভুলে গেছে ও। হেসে বলল, আপনার কাছে কিন্তু একটা কাজের জন্য এসেছি আমি। সর্দার বলল, আপনি ছাড়া আর কেউ যোগাড় করে দিতে পারবে না।

অমায়িক হাসিতে ভুতুবাবুর গোল মুখ ভরে উঠল প্রায়—ওরা আমাকে জানে যে। দরকার হলে এই রাজ্যে এই ভুতুই বাঘের দুধও যোগাড় করে দিতে পারে। আপনি সেজন্যে কিছু ভাববেন না, আগে একটু চা হোক।

না, না, এখন আর চা নয়।

হাত জোড় করে ফেলল ভুতুবাবু। মা-লক্ষ্মী শুধুমুখে ফিরে গেলে ভুতুর দোকানে ঘুঘু চরবে—এই শীগগির চা দে না এখানে—সর্দারকেও একটু দিস্। কর্মচারীকে আদেশ দিয়ে ভুতুবাবু একটা টুল টেনে নিয়ে বসল।

নিরুপায়। সান্ত্বনা ভুতুবাবুর হোটেল আর দোকান পর্যবেক্ষণে মন দিল। দুটো ছাপরা ঘর। মাঝে দরজা। যেখানে তারা বসেছে সেটাকে হোটেল এবং রেস্তোরাঁ বলা চলে। তিন-চারটে তেলচিটে বেঞ্চি পাতা। সামনে ততোধিক মলিন একটা কাচের আলমারিতে কিছু খাবার সাজানো। কোণের দিকে মস্ত একটা মাটির উনুনে বড় এক হাঁড়ি ভাত চড়ানো হয়েছে। ওদিকের ঘরটায় মণিহারী এবং মশলাপাতির দোকান। দেয়ালের দিকে একটা খাটিয়ার ওপর বিছানা গোটানো। একজন ছোকরা চাকর বিবর্ণ দুটো ছোট কাচের গ্লাসে কেটলি থেকে চা ঢালার ব্যবস্থা করছে। ওই গ্লাসে চা খেতে হবে ভেবেই সান্ত্বনার অবস্থা কাহিল। আমতা আমতা করে বলেই ফেলল, গেলাস দুটো একটু গরম জলে ধুয়ে নিলে হ'ত—

বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। টুল ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল ভুতুবাবু। ওরে এই ব্যাটা মুখখু—গরম জলে গেলাস না ধুয়েই তুই চা ঢালছিস? শীগগির ধুয়ে দে ভালো করে। আচ্ছা, দাঁড়া—

তাড়াতাড়ি এক টুকরো সাবান এনে নিজেই গ্লাস দুটো ধুয়ে রঙ ফেরালো, পরে গরম জলে আর একপ্রস্থ ধুয়ে বলল, নে এইবার ঢাল চা—একটু স্নানগম্যি যদি থাকত, যেন ওর মতই কেউ খাবে।

সঙ্কোচ সত্ত্বেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সান্ত্বনা। চায়ের গ্লাস এলো। আর একটা গেল পাগল সর্দারের হাতে। কল্কে যথাস্থানে রেখে দিয়ে সাগ্রহেই চায়ের প্রতীক্ষা করছিল সে।

ভুতুবাবু টুলে ফিরে এসে সবিনয়ে বলল, একটু মিষ্টি বা নোনতা কিছু দিই?

সান্ত্বনা ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল, না না, এখন আর কিচ্ছু না—

গ্লাস ধোয়ার ব্যাপার থেকেই ভুতুবাবু বুঝে নিয়েছে আর কিছু চলবে না। তাই জোর করল না। ওই চাকরটার ওপরেই ক্রুদ্ধ হল মনে মনে। দিলে ব্যাটা দোকানের প্রেস্টিজটাই নষ্ট করে। অথচ এরই মধ্যে মনে কত কথাই না ভেবে ফেলেছে ভুতুবাবু। 'জেন্টলম্যান' তার দোকানে অনেক আসে। কিন্তু 'লেডি'র পদার্পণ এই প্রথম। দেখাদেখি যদি কিছু কিছু মহিলার সমাগম হয় এমনি করে, তাহলে পর্দার আড়ালে টেবিল আর বেঞ্চি ফেলে একটা ক্যাবিনের মত করা যায় কি না ভাবছিল। কানের টানে

মাথা আসে। মা-লক্ষ্মীদের টানে রেস্তোরাঁ জমে উঠতে কতক্ষণ।

বেশ চা! ভুতুবাবুকে খুশি করার জন্যেই বলল সান্ত্বনা।

খুশিই হল। লজ্জাবিনম্র হাসি।—একটুখানি ভালো জিনিস সংগ্রহ করার জন্য খেটে খেটে হয়রান হতে হয় আমাকে। আমার পরিবার তো সারাক্ষণই বলে তোমাকে দিয়ে ব্যবসা হবে না, তুমি আশ্রম খোলো। আমি বলি এ-ও তো আশ্রমই, নেহাত দুটো পয়সা নিতে হয় বলেই নেয়া।

হাসি চেপে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, কাছেই আপনার বাড়ি বুঝি?

বাড়ি এখান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে। সপ্তাহে কি পনের দিন অন্তর হট করে এক আধ দিন ঘুরে আসি। আসলে এই আমার ঘর বাড়ি হয়ে গেছে—এক পা নড়ার উপায় আছে? দেখলেন তো, একটু কথা বলছি আপনার সঙ্গে, অমনি গরম জলে গেলাস না ধুয়েই চা ঢালতে বসে গেল হাঁদারাম।

গ্লাস ধোয়ার ব্যাপারে লোকটি বেশ আহত হয়েছে বুঝে সান্ত্বনা অপ্রস্তুত হল একটু। পাগল সর্দার ওদিকে তার কোন্ চেনা লোকের সঙ্গে গল্প শুরু করেছে। ডেকে বলল, আমরা কি জন্য এসেছি এখনো বললে না তো সর্দার?

ভুতুবাবু বাধা দিলে, আপনি কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না, যে জন্যেই আসুন, এসেছেন যখন পেয়েই গেছেন। এই ভুতুর কাছে কেউ এখনো না শোনে নি। চা-টুকু খেয়ে নিন আগে—আর একটু চা দিক?

বাকি চা-টুকু তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করে গ্লাসটা সরিয়ে রাখল সান্ত্বনা। না, আর না। আতিথেয়তা-প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যই জিজ্ঞাস করল, আপনি এখানে গোড়া থেকেই আছেন বুঝি?

জাঁকিয়ে বসল ভুতুবাবু। ছুটির দিনে দোকানের খুচরো খদ্দের থাকেই না প্রায়। ঢালা অবকাশ। জবাব্ দিল, এক্কেবারে গোড়া থেকে। হিল্ ব্লাস্টিং-এর পর নগদ পাঁচশ টাকায় এ জায়গা নিতে সক্কলে হেসেছে। বলেছে, শুকনো পাথর ধুয়ে জল খেতে হবে—এখানে নাকি আবার ব্যবসা হয়। উৎফুল্ল নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। ভুতুর হোটেল না থাকলে কি যে হত এখন সকলেই বুঝছে সেটা।

অর্থাৎ এই হোটেল বিহনে এখানে ড্যামের পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হত বললেও অত্যুক্তি হবে না। এর ওপর সান্ত্বনা উসকে দিল আরো।—নরেনবাবুর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি, তাঁর দু বেলার খাবারও তো আপনার এখান থেকেই যাচ্ছে?

খুশিতে ভুতুবাবুর গোলাকার দেহ দুলে উঠল যেন। আমাদের ড্রাফট্সম্যান নরেন চৌধুরী সাহেব? বলেছেন বুঝি?—অতি মহাশয় ব্যক্তি, খুব স্নেহ করেন আমাকে।

পাছে হেসে ফেলে, সেই ভয়ে মুখ বুজে থাকে সান্ত্বনা।

ভুতুবাবু বলে গেলেন, শুধু খাওয়া। প্রথম দিকে এই ড্যাম দেখতে এসে বিপাকে পড়ে কত গণ্যমান্য লোক রাত কাটিয়েছে এই হোটেল-ঘরে ঠিক নেই। দোকানপাট গুটিয়ে রাত্রিতে তাদের শোয়ার জায়গা করে দিতে হয়েছে এই ভুতুকেই। বলতে তো পারি নে, না জেনেশুনে এসেছ যখন রাতভোর থাকো ওই আকাশের নিচে পাথরের ওপর বসে।

নিজের বদান্যতায় নিজেই গলে গলে পড়তে লাগল ভুতুবাবু। বেশ লাগছে সান্ত্বনার। কিন্তু আর বসা চলে না। বাড়ির কথা মনে হতেই এবারে বেঞ্চি ছেড়ে দাঁড়াল।—অনেক দেরি হয়ে গেল, সর্দার আমি চললাম কিন্তু—

তাড়া খেয়ে সর্দার গাত্রোত্থান করল। কাছে এসে সান্ত্বনাকেই জিজ্ঞাসা করল, ভুতুবাবু 'ডাংরা' মিলায়ে দিবে তো?

তার ধারণা আগমনের উদ্দেশ্য সান্ত্বনা এতক্ষণে নিশ্চয় ব্যক্ত করেছে। কিন্তু ভুতুবাবুর সুগোল দুই চোখ সেই অবলা জীবটির মতই হয়ে উঠল প্রায়। ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, ডাংরা—মানে আপনার কি গোরু চাই নাকি?

সান্ত্বনা মাথা নাড়ল, তাই বটে।

সর্দার জোর দিয়ে বলল, দিদিয়ার 'বেঁজায়' দরকার, তু একটো 'বেশ ডাংরা' লিয়ে আয়, দিদিয়া কিনে লিবে। আমি দিদিয়াকে বুলেছি ভুতুবাবু ঠিক মিলায়ে দিবে।

ভাবনায় পড়ল ভুতুবাবু। এখানে হোটেল ফেঁদে বসার পর থেকে গোপনে এবং প্রকাশ্যে অনেককে অনেক কিছুই সংগ্রহ করে দিতে হয়েছে তাকে। হচ্ছেও। কিন্তু তা বলে গোরু! বোকার মত জিজ্ঞাসা করল, গোরু কি হবে?

বাবার জন্যে সব সময় ঠিকমত দুধ পাই নে, তাই ভাবছিলাম বাড়িতে একটা গোরু রাখতে পারলে সুবিধে হত।

ভাবতে লাগল ভুতুবাবু। একটু আগে নিজের মুখে যে বড়াই করেছে তাতে আর পারব না বলা সাজে না। তার থেকেও বড় কথা, যে এসেছে তাকে নিরাশ করতে মন সরে না। তাছাড়া পারলে দু পয়সা লাভের দিকটাও ফেলনা নয়। কিই বা এমন শক্ত কাজ, গোরু কি রাজ্যে নেই নাকি? বলল, আচ্ছা দেখি, এখানে তো আর পাওয়া যাবে না, সেই শহর থেকে আনতে হবে—কিন্তু খরচ তো একটু বেশি পড়ে যাবে।

সান্ত্বনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, খুব বেশি?

গেরস্থ বাড়ি থেকে পেয়ে গেলে তত বেশি পড়বে না—আচ্ছা সে যা হয় হবে, খোঁজ পেলে আপনার বাবার সঙ্গে না হয় কথা বলব'খন।

ব্যস্ত হয়ে বাধা দিল সান্ত্বনা, বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে না, পেলে আমাকে জানাবেন, সর্দারকে দিয়ে খবর দিলেই হবে। আচ্ছা, আমি যাই আজ, কেমন?

চড়াইয়ের পথে যতক্ষণ দেখা গেল তাকে, ভুতুবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। দিনগত পারম্পর্যের মধ্যে আজকের বৈচিত্র্যটুকু নিঃশব্দে রোমন্থন করতে লাগল।

পাগল সর্দার তার নিজের কাজে চলে গেছে। পাহাড়ী রাস্তা ধরে সান্ত্বনা একাই উঠে আসছে হন্ হন্ করে। এত দেরি হয়ে যাবে কে জানত! সর্দারের ওপরেই তার রাগ হচ্ছে এখন। একটু যদি সময়ের জ্ঞান থাকত। নরেনবাবু এতক্ষণে এসে গেছে নিশ্চয়ই। বাবার বকুনির হাত থেকেও রেহাই নেই আজ।

চড়াইয়ের পথে তাড়াহুড়ো করে উঠতে গেলে হাঁফ ধরে যাবেই। তার ওপর কড়া রোদ। সান্ত্বনার সমস্ত মুখ তেতে উঠেছে।

পিছনে গাড়ির শব্দে ফিরে তাকালো সান্ত্বনা। জিপ আসছে একটা। পথ ছেড়ে

এক পাশ ধরে চলতে লাগল। জিপ পাশ কাটিয়ে গেল। চালক এবং তার পাশে আর একজন কে।—ইস, ওকে যদি তুলে নিত....এখনো কতটা পথ—।

বিশ-পঁচিশ হাত এগিয়ে গিয়ে ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল জিপটা। চালকের আসনের লোকটি ঝুঁকে পিছন দিকে তাকালো। নীল সান্‌গ্লাসে চোখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার দিকেই চেয়ে আছে বোঝা যায়।

সান্ত্বনা ভড়কে গেল। কি সর্বনাশ ! ওর মনের কথা শুনেছে নাকি ! কাছাকাছি হতে লোকটি জিজ্ঞাসা করল, আপনি ওপরে যাচ্ছেন তো ?

সান্ত্বনার পা থেমে গেল। হাঁ না কিছুই বলল না।

প্রশ্ন অবান্তর। কারণ এ রাস্তা ধরে ওপরে ছাড়া আর কোথায় যাবে—আসুন, আমরাও যাচ্ছি, রোদ্দুরে আর হেঁটে কষ্ট করবেন কেন ?

তার পাশের লোকটি আসন ছেড়ে টপকে পিছনে গিয়ে বসল। জিপগাড়িতে মেয়েদের পক্ষে পিছনে গিয়ে বসার থেকে সামনে বসা সহজ বলেই বোধ হয়।

সান্ত্বনা বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে রইল তবু। বলতে চাইছে, আপনারা যান, আমি হেঁটেই যাব। কিন্তু বলা হল না। লোকটি আবার ডাকল, আসুন, আমরা তো যাচ্ছিই ওপরে।

দ্বিধা কাটিয়ে উঠেই বসল সান্ত্বনা। মরুক গে, পাহাড়ের মাথায় উঠে তো নেমেই পড়বে। আলাপ না আছে না-ই আছে।

পাহাড়ী রাস্তায় এঁকেবেঁকে জিপ চলল আবার। বাঁকের মাথায় ভদ্রলোককে এক একবার ঝুঁকতে হচ্ছে তার দিকে। কিন্তু নীল চশমায় চোখের দৃষ্টি ঠাওর করা যাচ্ছে না। সান্ত্বনা আড়চোখে বার-কতক দেখে নিল তাকে। পিছনের লোকটির দিকেও তাকালো একবার। না, কখনো দেখেছে বলে মনে হল না।

কিন্তু মনে হতে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল সান্ত্বনা। চীফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি নয় তো ! সেও তো জিপে ঘুরে বেড়ায় শুনেছে। সান্ত্বনা ঘেমে উঠল একেবারে। ঘাড় না ফিরিয়ে যতটুকু দেখা যায় দেখল আবার। চকচকে চেহারা, ঝকঝকে বেশবাস, হাতে সোনার ঘড়ি, সোনার ব্যাণ্ড, দু হাতের আঙুলে একটা করে হীরের আংটি। নীল চশমা সত্ত্বেও এবার চোখাচোখি হয়ে গেল। সান্ত্বনা কাঠ হয়ে বসে রইল অন্য দিক ঘেঁষে। আর দু-তিনটি বাঁক পেরুলেই মেন কোয়ার্টারস্। নামতে পারলে বাঁচে এখন।

কিন্তু জিপ মেন কোয়ার্টারস্ ছাড়িয়ে যেতেই সান্ত্বনা অস্ফুটস্বরে বলল, আমি এখানে নেমে যাই।

নীল চশমা ফিরে তাকালো আবার। কিন্তু রাস্তাটা বেঁকে গেছে বলেই সামনের দিকে লক্ষ্য করতে হল তখুনি।—আপনি অবনীবাবুর মেয়ে তো ?

মাথা নাড়ল, তাই বটে।

পৌঁছে দিচ্ছি।

সান্ত্বনা চুপ আবার। স্টিয়ারিং ধরা দুই হাতের হীরের আংটি থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। ইচ্ছে করছে, ঘুরে বসে লোকটার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নেয়।

কিন্তু মুখ তুলে তাকাতেও পারছে না।

দোড়গোড়ায় জিপ থামতেই বাইরের ঘর থেকে নরেন চৌধুরী গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল। সান্ত্বনাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে বিস্মিত নেত্রে দরজার কাছে এগিয়ে এলো সে।

নমস্কার মিঃ চৌধুরী, ভালো তো?

নমস্কার, কি আশ্চর্য, আপনি কোত্থেকে?

সহাস্যে জবাব এলো, আপনাদের মেন কোয়ার্টার্স-এ যাচ্ছিলাম, ইনি রোদে কষ্ট করে উঠে আসছেন দেখে পৌঁছে দিলাম। চলি, কেমন—?

জিপ ঘুরিয়ে নিল। প্রত্যাবর্তন। সান্ত্বনা এতক্ষণে সহজ হল যেন। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কে এঁরা?

নরেন অবাক, তুমি চেনো না?

না তো!

চেনো না, অথচ গাড়ি চেপে চলে এলে?

পাহাড় ভেঙ্গে উঠে আসছি দেখে গাড়ি থামিয়ে ডাকলেন তো কি করব! বলুন না কে?

কন্‌ট্রাকটার ঘোষ-চাকলাদার— একজন রণবীর ঘোষ, পিছনের জন দ্বিজেন চাকলাদার।

সান্ত্বনা মহা অপ্রস্তুত। একেবারে যেন বোকা বনে গেছে। বলেই ফেলল, ধেৎ ছাই!

নরেন চৌধুরী নিরীক্ষণ করে দেখছিল তাকে।—তুমি কি ভেবেছিলে?

সান্ত্বনা আরও লজ্জা পেল একটু। কে ভেবেছিল বললে এক্ষুনি ঠাট্টা শুরু হবে। কিন্তু গাড়িতে আসার আনন্দটাই মিছিমিছি মাটি হল। কে না কে, না জেনেই একেবারে কিনা কাঠ হয়ে বসে রইল সারাক্ষণ! কিন্তু আশ্চর্য, ওকে কিন্তু ঠিক চেনে ভদ্রলোকেরা।

এতক্ষণ বাদে বাড়ি ফেরার কথাটা মনে হতেই সচকিত হল। সিঁড়ির কাছ থেকেই ভিতর দিকে উঁকি দিল একবার। পরে প্রায় ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায়?

ভিতরে। যাও এক হাত হবে'খন আজ।

ছোট মেয়েরই মত ভয়ে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, খুব রেগে গেছে বুঝি!

খু-উ-ব। তোমার মাসিমা না কারা এসেছেন—সেই থেকে সকলে অস্থির তোমার জন্য।

মা-সি-মা! মুহূর্তের বিমূঢ় বিস্ময় ভাব কাটিয়ে নরেনের গায়ের উপর দিয়েই ছুটল ভিতরের দিকে। বাবার বকুনির ভয়-ভাবনা রসাতলে গেল।

নরেন গিয়ে চেয়ারে বসল আবার। অন্যমনস্ক। ভিতরের হৈ-হুল্লোড় কানে আসছে, কিন্তু তার থেকে বেশি কানে লেগে আছে কন্‌ট্রাক্টার ঘোষ-চাকলাদারের জিপের ঘড়ঘড় শব্দটা।

সত্যিই মাসিমা!

সঙ্গে মাসতুত ভাই আর বোনও। ছুটে গিয়ে সান্ত্বনা গলা জড়িয়ে ধরল মাসির। আচমকা আক্রান্ত হয়ে অবস্থা সঙীন তাঁর। বললেন, খুব দরদ বুঝেছি, ছাড়—এতক্ষণ ছিলি কোথায় তুই?

জবাব না দিয়ে উৎফুল্ল আনন্দে সান্ত্বনা মাসিকে ছেড়ে ভাই-বোনকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করল একপ্রস্থ। তার কাণ্ড দেখে অবনীবাবুরও হাসি চাপা দায় হচ্ছে। কিন্তু হাসলে আর শাসন করা যায় না। বললেন, এই চনচনে রোদে সকাল থেকে কোথায় টো-টো করে ঘুরছিলি শুনি?

মাসির কোল ঘেঁষে বসে এই সব অপ্রিয় প্রসঙ্গ একেবারে বাতিল করে দিতে চাইল সান্ত্বনা।—কোথাও না, যাও। দেখলে মাসিমা, কোথায় তুমি এলে, না বাবা আমাকে বকার ফিকির খুঁজছে।

অর্থাৎ মাসি যখন এসেছে, যা-ই করে থাকি আর বকাবকির প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু মাসিমাই উল্টো সুর ধরলেন।—হ্যাঁ রে, তুই নাকি দিনরাত কাঠফাটা রোদ্দুরে আর হিমের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াস, অসুখ-বিসুখ হলে তখন?

সান্ত্বনা তাচ্ছিল্য করে জবাব দিল, হ্যাঁ, অসুখ হলেই হল—

অবনীবাবু বললেন, আমি বলে বলে হায়রান হয়ে গেছি, আপনি ওকে নিয়ে যান এবার—বিদেশ-বিভুঁইয়ে ও একটা কিছু বাধিয়ে বিপদে ফেলবে আমাকে।

কিন্তু বোনঝির দিকে চেয়ে চেয়ে অসুখ-বিসুখের কোনো সম্ভাবনার কথা মনে হল না মাসির। বরং দেখলেন, ফর্সা রঙের ওপর কচি শ্যামলের ছোপ লেগেছে। চোখে মুখে হাসিতে খুশিতে নিটোল গ্রাম্য প্রাচুর্যের ছাঁদ এসেছে একটা।

প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যেই সান্ত্বনা বলল, তুমি সত্যি সত্যি এত শীগগির চলে আসবে মাসিমা, আমি একবারও ভাবি নি।

মাসিমা জবাব দিলেন, অত করে আসতে লিখেছিলি তাহলে অমনি বুঝি? কি দিয়ে কি করছিস সেই থেকে ভাবছি....। কিন্তু তোর বাবা যে তোকে নিয়ে যেতে বললে শুনলি?

আবার সেই কথাই এসে পড়তে সান্ত্বনা হতাশ নয়নে তাকালো তার বাবার দিকে। তুমি যাও না বাবা ও-ঘরে, নরেনবাবু একলা বসে আছেন মুখ বুজে, গল্প করোগে।

সকরুণ অনুনয়ে সকলে হেসে উঠতে উৎফুল্ল মুখে নিজেই উঠে দাঁড়াল সে। দাঁড়াও আমিই ডেকে আনছি ভদ্রলোককে, লজ্জায় আসতে পারছে না—

চলে গেল এবং প্রায় জোর করেই নরেন চৌধুরীকে এ ঘরে নিয়ে এলো। তড়বড় করে বলে গেল, এই আমার মাসিমা—এই মাসতুত বোন—বোনের বিয়ের ভাবনায় মাসির চোখে ঘুম নেই—আর এই হল মাসতুত ভাই—খুব ভালো ছেলে, ক্লাসে একদিনও পড়া পারে না।

বাড়িতে পদার্পণ করেই মাসিমা একে দেখেছেন। অবনীবাবু আলাপও করিয়ে দিয়েছেন। এবারে অন্তরঙ্গতাটুকু চোখে পড়ল মাসির। পড়ল বলেই কয়েক নিমেষ নিরীক্ষণ করে দেখলেন তাঁকে। নরেন হাসছে মুখ টিপে।

খুব পরিচয় করিয়ে দিয়েছিস, বোন আর ভাই দেখাবে'খন পরে তোকে—এঁকে একটা কিছু পেতে বসতে দে।

তকতকে মেঝের ওপরেই সমাসীন সকলে। নরেন চৌধুরীও খাঁকি ট্রাউজার টেনে অবনীবাবুর কাছাকাছি পা গুটিয়ে বসে পড়ল। পরে মাসির দিকে চেয়ে হেসে বলল, আপনি আসায় সান্ত্বনার আনন্দ বোধহয় মড়াই থেকেও শোনা যাচ্ছে।

যাবেই তো! সান্ত্বনার পরিচয় করানো শেষ হয় নি এখনো, তুমি একদিন রাগ করে আমাকে বাবাকে মাকে দাদুকে সক্কলকে নিয়ে কি একটা গাল দিয়েছিলে না মাসিমা—পঞ্চতপার গুষ্টি? এই দেখো মূর্তিমান পঞ্চতপা। খুশিভরা দুই চোখ নরেনের মুখের ওপর সংবদ্ধ হল।—বুঝলেন না তো? মাথার ওপর সূর্যের তাপ, চারদিকে পৃথিবীর তাপ—এই পাঁচ তাপের মধ্যে বসে—এই! মেরুদণ্ড সোজা করে দু চোখ বুজে যোগাসনের একটা নমুনা দেখাতে গিয়ে হেসে ফেলল। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে বলল, শুধু ইনি নয় মাসিমা, এঁদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে পাগল সর্দার পর্যন্ত সব্বাই তাই—সাধনার চোটে এই পাহাড়ী মরুভূমির ওপর দিয়েও তরতরিয়ে জাহাজ চলবে দেখো'খন।

আর একপ্রস্থ হাসি।

অবনীবাবু বললেন, নে খুব হয়েছে এখন, বেলা কত হল খেয়াল আছে, খাওয়া-দাওয়া নেই আজ?

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা। সত্যিই একেবারে ভুলে বসেছিল। কিন্তু নরেন মাঝখানে ফোড়ন কাটল আবার। নিরীহ মুখেই অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, সান্ত্বনার খাওয়া হয়েছে?—মানে, বকুনি খাওয়া? সকাল থেকে এ পর্যন্ত কোথায় ঘুরছিলে—

সান্ত্বনা তর্জন করে উঠলো, ভালো হবে না কিন্তু!

ঘর ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান করল সে।

মাসতুত বোন আর ভাইও অনুসরণ করল। উঠতেন মাসিমাও, কিন্তু ছেলেটির প্রতি কৌতূহলবশত উঠলেন না। এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। গ্রামের কথা, বাড়ির কথা, চাকরির কথাও দু'চারটে।

রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সান্ত্বনা একবার আসছে এ ঘরে। শেষে বাবাকে স্নানে পাঠিয়ে মাসির রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। বলল, আমার রান্নাতেই এই, মাসিমার হাতের রান্না খেলে একেবারে দ্রৌপদীর শোক উথলে উঠবে আপনাদের।

মাসি হেসে ফেলেও প্রায় ধমকের সুরেই বললেন, মেয়ের কথার ছিরি দেখো!

নরেন টিপ্পনী কাটল, এ কথা বলে আসলে রান্নার ব্যাপারটা আপনার ওপর চাপাতে চাইছে বোধ হয়।

সান্ত্বনা চাক্ বা না চাক্ যে দুদিন ছিলেন রান্নার ভার তিনিই নিলেন আর নরেনও যথাবিধি দু'দিনই নিমন্ত্রিত হ'ল। হৈ-চৈ-এর মধ্যে কাটল সে দিনটা। পরদিনও প্রায় তাই। আপিস-ফেরত নরেন চৌধুরীকে বাহন করে সান্ত্বনাই মহা উৎসাহে মাসি এবং ভাইবোনদের ড্যামের কার্যকলাপ দেখাল শোনাল এবং বোঝাল। পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠানামা করিয়ে পায়ে ব্যথা ধরিয়ে দিল সকলের।

কিন্তু পরদিন রাত্রিতে সান্ত্বনার আনন্দ-প্রাচুর্যে একটা ছেদ পড়ে গেল যেন হঠাৎ।

একটু আগে সকলকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নরেন চলে গেছে। রাতের নামমাত্র রান্না সেরে নেবার জন্য সান্ত্বনা রান্নাঘরে ঢুকেছে। ওদিকের ঘর থেকে বাবা এবং মাসির কথাবার্তা কানে এলো। ইতিমধ্যে সাংসারিক আলাপের অবকাশ বড় পেয়ে ওঠেন নি মাসি। পরের দিন তাঁর যাওয়ার কথা। তাই অবনীবাবুর সঙ্গে দুটো কথাবার্তা কইতে বসেছেন।

তাড়াহুড়ো করে হাতের কাজ করছিল সান্ত্বনা। আর ভাবছিল, কাল মাসির যাওয়া বন্ধ করতে হবে। কাল কেন, পরশুও যেতে দেবে না।

ওদিক থেকে মাসির একটা মন্তব্য কানে এলো।—ছেলেটি বেশ, দিব্বি হাসিখুশি, একেবারে আপনার জনের মত।

খুব ভালো, ভারী ভালো। অবনীবাবু বললেন—এই বয়সে কত বড় চাকরি করে, একটু অহঙ্কার নেই, একেবারে ছেলেমানুষ।

কিন্তু ওরা চৌধুরী না কি শুনলাম, বামুন তো?

বামুন—? কি জানি। ভাবলেন একটু, বামুন নয় বোধ হয়...

কণ্ঠস্বর বদলে গেল মাসির। একটু চুপ করে থেকে ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে বললেন, কোন্ জগতে যে বাস করছ তোমরাই জানো বাপু।

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে একেবারে অন্য প্রসঙ্গ তুললেন তিনি।—তুমি তো আপাতত এখানেই থাকবে বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এখানে বসেই তুমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে, মনে করো নাকি?

বিব্রত মুখে অবনীবাবু বললেন, তাই তো ভাবছি।

কিছুই ভাবছ না, ভাবলে আর অমন নিশ্চিন্তে কাটাতে পারতে না। ভালো চাও তো মেয়েকে কালই আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও, আমি চেষ্টা-চরিত্র করে দেখি। আর....এখানে এসব আমার ভালও লাগছে না।

কি ভাল লাগছে না, সেটা অবনীবাবুর বোধগম্য হল না ঠিক। চেষ্টাও করলেন না বুঝতে। চিন্তিত মুখে বললেন, ও কি যাবে এখন, আপনিই বলে দেখুন না।

এদিকে সান্ত্বনার হাতের কাজ থেমে গেছে। ভুরুর মাঝে কুঞ্চনরেখা পড়েছে। দুই চোখ শূন্যের মধ্যে এক-একবার ঘুরে এসে থেমে যাচ্ছে।

হঠাৎ সমস্ত ভিতরটাই যেন তিক্ত হয়ে গেল তার। মাসতুত বোনের একটু আধটু চপল ইঙ্গিতের তাৎপর্যও সুস্পষ্ট হল এতক্ষণে। মনে হল মহুয়াইয়ের এই উন্মুক্ত মুক্তির মধ্যে মাসিকে মানায় না, মাসতুত বোনকে মানায় না। তারা ভিন্ন গণ্ডির মানুষ, তার মধ্যে নিয়ে পুরতে চাইছে ওকেও। ওর এই মুক্তি কেড়ে নিতে এসেছে। নরেনবাবুর প্রসঙ্গে কই তার তো কোন দিন কিছু মনে হয় নি। সান্ত্বনা নিজের অধর নিজেই দংশন করতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর মাসি কথা পাড়লেন। কাল দুপুরেই কিন্তু যাচ্ছি রে সান্ত্বনা, তুইও এবার যাবি তো আমার সঙ্গে?

সান্ত্বনা প্রস্তুত ছিল। একরাশ বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, আমি! তুমি বলো কি মাসিমা, আমি গেলে বাবাকে দেখবে কে?

তোর বাবাকে তুই চিরকাল আগলে রাখবি ভেবেছিস নাকি?

ভেবেছি মানে? রাখবই তো।

ভগবান করুন রাখিস'খন। এখন তো চল, তোর বাবাই নিয়ে যেতে বলছে।

সান্ত্বনা বাবার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জবাব দিল, আমাকে বলে দেখুক একবার।

কিছু বলা দূরে থাক, মেয়ের কথায় বাপকে হাসতে দেখে অসন্তুষ্ট হলেন মাসি। আদর দিয়ে মেয়েকে একেবারে মাথায় তুলেছে। বললেন, বেশ, তোমাদের ভালো তোমরা বোঝো, আমি আর কিছুতেই নেই।

সান্ত্বনাকে প্রথম দেখেই মাসি উপলব্ধি করেছিলেন ওকে নড়ানো যাবে না এখান থেকে। এ ক'মাসে ওর চেহারা নয়, ভেতরসুদ্ধ যেন বদলে গেছে।

পরদিন মাসি চলে গেলেন।

আর দুটো দিন থাকার জন্য সান্ত্বনা মৌখিক অনুরোধও করতে পারল না একবার। উল্টে যেন স্বস্তির মত লাগছে। এত দিন এত আদরে কাটিয়েছে মাসির কাছে, ভারী অকৃতজ্ঞ মনে হতে লাগল নিজেকে। কিন্তু যা হচ্ছে তা হচ্ছেই। হচ্ছে বলেই স্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে অত অস্বস্তিও।

মাসি যাওয়ার পরেও কটা দিন গুম হয়ে কাটালো সান্ত্বনা। অকারণ বিরক্তিতে মন ছেয়ে রইল। আগের মত নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া আর ছড়িয়ে দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল।

কিন্তু শীগগিরই এই গুমোট অসহিষ্ণুতা কেটে গেল আবার। কাটল পাগল সর্দার আর ভুতুবাবুর কল্যাণে। অপ্রত্যাশিত বৈচিত্র্যে মাঝের এই কটা দিন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যেন। নিজেকে ফিরে পেল সান্ত্বনা।

সেও ছুটির দিন। তার বিগত কটা দিনের আচরণে মনে মনে বিস্মিত হচ্ছিল নরেন চৌধুরী। অবনীবাবুর সামনেই হালকাভাবে বলেছিল, মাসি চলে গেলেন বলে একেবারে যে মুষড়ে পড়লে দেখছি।

সান্ত্বনা ফস্ করে জবাব দিয়েছে, আনন্দে হাততালি দেব?

ওব্ বাবা! তা তুমিও তো গেলেই পারতে মাসির সঙ্গে—দিনকতক না হয় তোমার ড্যাম্ সুপারভিশান বন্ধই থাকত।

আগে এ ধরনের ঠাট্টায় অনেক হেসেছে সান্ত্বনা। কিন্তু এই লোকের সম্বন্ধেই বিচ্ছিরি ভাবে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে তাকে। আগের মত হাসতে পারা সহজ নয়। পারলও না।

এমন সময় দরাজ গলায় হাঁক শোনা গেল বাইরে।—দিদিয়া! ই-দিদিয়া—

সান্ত্বনা বাইরে এসে দাঁড়াতেই উল্লসিত পাগল সর্দার বলে উঠল, দিদিয়া, ভুতুবাবু ডাংরা লিয়ে আসলো—আরাঃ ডাংরা—ভাগে ডাংরা—নাওয়া ডাংরা—নাওয়া তোয়াদিবে—!

আনন্দাতিশয্যে অনেকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ বলে ফেলল পাগল সর্দার। অর্থাৎ

ওই গোরু নিয়ে আসছে ভুতুবাবু, রাঙা গোরু, খাসা গোরু, নতুন গাইয়ের নতুন দুধ পাবে গো তুমি।

অদূরে বাঁকের মুখে চোখ পড়তেই সান্ত্বনাও সপুলকে বলে উঠল, ওমা তাই তো।

দশ বারো বছরের একটা গ্রাম্য ছেলে দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে গোরুটাকে। রাঙা গোরুই বটে। পিছনে একটা খড়ের বাছুর বুকে করে থপ থপ চরণে আসছে গোলাকৃতি ভুতুবাবু।

এক দৌড়ে ভিতরে চলে গেল সান্ত্বনা।—শীগগির এসো বাবা, কি সুন্দর গোরু এনেছে দেখে যাও।

তক্ষুনি বাইরে চলে এলো আবার। গোরুটাকে অভ্যর্থনা করে আনার আগ্রহেই এগিয়ে গেল খানিকটা। কিন্তু খুব কাছে যেতে সাহস হল না চট করে। কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল।

এত পরিশ্রম সার্থক হল যেন ভুতুবাবুর। ঘামদরদর মুখে একগাল হেসে বলল, ভুতুর অসাধ্য কম্ম নেই মা-লক্ষ্মী, দেখলেন তো? পছন্দ হয়েছে?

হাসিমুখে দুই চোখের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে থমকে গেল সান্ত্বনা। —আ-হা, ওর বাছুরটা মরে গেছে বুঝি?

হ্যাঁ তাতে কি, এটাকে কাছে পেলেই ও খুশি, ভারী ভালো গোরু। নামও খাসা—সুন্দরী।

ওদিকে নরেন চৌধুরী বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পিছনে অবনীবাবু। মেয়ে গোরু আনাবে করে করে শেষে সত্যিই এনে হাজির করবে এতটা ভাবেন নি বোধ হয়। ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে লাগলেন তিনি।

বক্ষসংলগ্ন খড়ের বাঁছুর মাটিতে নামিয়ে দু'জনেরই উদ্দেশে বিনয়াবনত হ'ল ভুতুবাবু। পরে সিঁড়ির ছায়ায় ধপ করে বসে পড়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, মা-লক্ষ্মী নিজে গিয়ে বলে আসতে সেই থেকে খুঁজছি—তা গোরুর মত গোরুই পেয়ে গেলাম বটে—সাক্ষাৎ যেন ভগবতী আশ্রয় করেছেন ওর মধ্যে।

নরেন হাসছে। অবনীবাবু চুপ। এই নতুন ঝামেলায় বিরক্ত হয়েছেন বোঝা যায়। টাকা কত গুনতে হবে সেটাও ভাবছেন।

জিজ্ঞাসা করতে হল না। ভুতুবাবুই বলল, অনেক ঝকাঝকি করে একশ পঁচিশে রাজী করিয়েছি, দিতে কি চায়—সবে প্রথম বিয়ান, এখন তো জীবনভোর দুধ দেবে। প্রসন্ন বদনে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে বলল, খুব শস্তায় পেয়ে গেলেন মা-লক্ষ্মী।

কিন্তু মা-লক্ষ্মী তখন শঙ্কিত নেত্রে বাবার মুখভাব পর্যবেক্ষণে রত। খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। একশ পঁচিশ বেশি হ'ল কি কম হ'ল ধারণা নেই। শুধু মনে হ'ল একশ পঁচিশ অনেকগুলো টাকা।

মেয়ের মুখের দিকে চেয়েই বোধ হয় কিছু আর বললেন না অবনীবাবু। টাকা আনতে ভিতরে চলে গেলেন। উৎফুল্ল আনন্দে সান্ত্বনা এবার গোরুটার কাছে এগিয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকেই গোরু নিয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। ভয় বিশেষ নেই।

চিনলে দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। তবু এই মুহূর্তে ওর গায়ে পিঠে একটুখানি হাত দেবার লোভ সামলায় কি করে। গোরুটা একটু আধটু নড়েচড়ে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর গায়ে পিঠে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সান্ত্বনা। নরেনকে বলল, কি ঠাণ্ডা চাউনি দেখেছেন?

নরেন আর যাই হোক, গোরুর সমঝদার নয়। তবু ভালোই লাগছে। ওকে খুশি করার জন্যেই গোরুটার বেশ কাছে গিয়ে দাঁড়াল সেও। হাত বাড়িয়ে একটু আদর করতে গেল তারপর।

কিন্তু ঝামেলা বাড়ছে দেখেই হোক বা বেশি আপ্যায়ন পছন্দ নয় বলেই হোক, হঠাৎ সিং নেড়ে অসন্তোষ জ্ঞাপন করে উঠল গাভীকন্যা।

বাব্‌বা! এক লাফে প্রায় হাত তিনেক সরে এলো নরেন চৌধুরী।

খিল খিল করে হেসে উঠল সান্ত্বনা। হাসতে লাগল পাগল সর্দার আর ভুতুবাবুও।

সান্ত্বনা টিপ্পনী কাটলো, দেখলেন, ও লোক চেনে!

পাল্টা জবাব দিল নরেন চৌধুরী, চিনবেই তো, মা-লক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবতীর আর তফাত কতটুকু?

পাগল সর্দার বুঝল না। কিন্তু প্রায় চার আঙুল জিভ বার করে ফেলল ভুতুবাবু। নিরুপায় রোষের অভিব্যক্তি সান্ত্বনার চোখে।

পথ-খরচা সমেত টাকা বুঝে নিয়ে ভুতুবাবু প্রস্থান করতে অবনীবাবু এবার বললেন, মাসির সঙ্গে তোকে পাঠিয়ে দিলেই ভাল হ'ত দেখছি—তুই একেও গিয়ে ধরেছিলি গোরুর জন্যে?

এখন কোন জবাব দেবে, এত বোকা নয় মেয়ে। নিরীহ মুখে দাঁড়িয়ে রইল। পরে ইশারায় নরেনকে বলল, বাবাকে নিয়ে ঘরে যান না।

তাঁরা আড়াল হতে পাগল সর্দারকে তাড়া দিল, ওর ঘর ঠিক না করে দিয়ে যেতে পাবে না কিন্তু সর্দার।

সর্দার এক পায়ে প্রস্তুত। বলল, হেঁ আখুনি দুব—

ঘর এক রকম ঠিক করেই রেখেছিল সান্ত্বনা। পিছনের দিকে ছাপরা ঘরের মত আছে একটা। হয়তো চাকর-বাকর থাকার জন্য করা হয়েছিল। গৃহ-সংলগ্ন হলেও বিচ্ছিন্ন, পাশের সরু রাস্তা দিয়ে আলাদা প্রবেশ-পথও আছে।

গোয়াল-ঘরে পরিণত হ'ল ওটাই। সর্দার খুঁটি পুঁতে দিল। তারপর পয়সা চেয়ে নিয়ে দড়ি টব বালতি খোল ভুষি ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলো। নতুন আলয়ে গৃহপ্রবেশ সম্পন্ন হ'ল সুন্দরীর। যে ছোকরা ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল, গোরুর জন্যে অবনীবাবু তাকেই বহাল করলেন। দু'বেলা দুইয়ে দেবে, গোয়াল-ঘর পরিষ্কার করবে, চরাতে নিয়ে যাবে। সান্ত্বনার মতে কিছুই দরকার ছিল না, ও নিজেই পারে সব। কিন্তু এখন এ নিয়ে বাবার কথার ওপর কথা কইলে নির্ঘাত বকুনি আছে কপালে। পরে ভেবে দেখল, লোক একজন দরকারও, গোরুর খাবারদাবার তো আর নিজেই বয়ে আনতে পারবে না।

কিন্তু অদৃষ্টে বকুনি আছেই। প্রথম দিনকতক প্রায় আহার-নিদ্রাই ঘুচে গেল।

ফাঁক বুঝে ছোকরাটাও ফাঁকি দিতে শুরু করল। কিন্তু সান্ত্বনা ওর পরোয়া করে ভারি। চরাতে নিয়ে যাওয়ার সময়েও সে সঙ্গে থাকে। তার নির্দেশমত কিছু দূরে পিছনের দিকের একটা খোলা জায়গায় খুঁটিতে বাঁধা হয় গোরুটাকে। ঘাস খুব নেই। কাজেই জাবনার বালতিও আনতে হয় সঙ্গে। ভদ্রলোকের বিশেষ আনাগোনা নেই এদিকটায়। গ্রাম্য পথচারীরা শুধু এই পথে পাহাড় ডিঙিয়ে যাতায়াত করে। সঙ্কোচ এমনিতেই কম, সেটা আরো গেল। ছোকরাটা সময়মত না এলে গোরু আর বালতি নিয়ে সান্ত্বনা এক-একদিন নিজেই বেরিয়ে পড়ে।

ফলে জল ঘাঁটাও বাড়ছে, রোদের ধকলও যাচ্ছে। অবনীবাবু রীতিমত রেগে গিয়ে বলেন, একটু শরীর খারাপ হয়েছে কি তোকে আমি ঠিক পাঠিয়ে দেব এখান থেকে।

দু'চার দিন সমীহ করে চলে সান্ত্বনা। তার পর যেই কে সেই। আবার একদিন বকুনি খায়।

কিন্তু অদৃষ্ট-বিড়ম্বনায় ব্যাপারটা ঘটল উল্টো রকম। অবনীবাবু হঠাৎ নিজেই পড়লেন অসুখে। দিন দুই সর্দি এবং জ্বরভাব, তারপর একেবারে শয্যাশায়ী।

সান্ত্বনা শাসন করল, নিশ্চয় ঠাণ্ডা লাগিয়ে আর রোদ লাগিয়ে অসুখটা এনেছ।

অবনীবাবু আর বলবেন কি। হেসে ফেলেন।

কিন্তু ভোগালে বেশ। জ্বর সহজে ছাড়তে চায় না। এসব কাজে বেশি দিন ছুটি নিয়ে বসে থাকাও চলে না। আবার না নিয়েই বা উপায় কি। সরকারী ডাক্তার রোজ এসে দেখে যান। নরেন নিয়ে আসে সঙ্গে করে। ওষুধপত্রও এনে দেয়। বাবার মুখেই সান্ত্বনা শুনেছে, ছুটিছাটা বেশি চাইলে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নাকি মেজাজ বিগড়োয়। কিন্তু নরেন থাকতে এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে হ'ল না কিছু।

সেরে উঠলেন অবনীবাবু কিন্তু বেশ কাহিল তখনো। বিকেলের দিকে সেদিন সান্ত্বনাকে বললেন, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আয়গে যা না—একেবারে ঘরে বন্ধ হয়ে আছিস। নরেনের উদ্দেশে বললেন, ওর সুন্দরী পর্যন্ত সময়মত দেখা না পেয়ে অস্থির, খালি ডাকে।

নরেন আর একপ্রস্থ রঙ চড়ালো।—ড্যামের কাজও এ কদিন প্রায় বন্ধ বললেই চলে। একবার সুপারভাইজ করে আসবে চলো তা হলে—

যাব না যান। ঝাঁজ দেখায় সান্ত্বনা, তার থেকে সুন্দরীকে নিয়ে বেরুব আমি।

নরেনের চোখে চোখ পড়তেই মা-লক্ষ্মী আর ভগবতীর ঠাট্টাটা মনে পড়ে বোধ হয়। তার চোখে আবার সেই ঠাট্টারই আভাস দেখে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

দশ-পনের দিন নয়, সান্ত্বনার মনে হল যেন এক যুগ পরে বেরিয়েছে। পাহাড় থেকে নেমে নিরিবিলি গাঁয়ের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেল।

কিন্তু নরেন অত হাঁটায় অভ্যস্ত নয়। বার বার ফেরার তাড়া দিতে লাগল। অগত্যা প্রত্যাবর্তনের পথ ধরে সান্ত্বনা বলল, আপনি এক নম্বরের কুঁড়ে, মোটে হাঁটতে চান না।

এইতেই বাড়ি পৌঁছে বাবার কাছে তাড়া খেতে হবে দেখো'খন।

সান্ত্বনা হালকা ভাবেই জবাব দিল, যাই বলুক, অসুখ করার কথা বাবা আর মুখেও আনবে না, খুব জব্দ হয়ে গেছে।

তাকে রাগাবার জন্যেই নরেন ঠেস দিল, ওঁর এই ছোটখাটো অসুখটায় তোমার তাহলে কিছুটা সুবিধেই হয়েছে বলো ?

কিন্তু সান্ত্বনার মেজাজ অন্যরকম এখন। রাগ-বিরাগের ধার দিয়েও গেল না। শুধু বলল, হ্যাঁ হয়েছে, আপনার যেমন বুদ্ধি !

ফেরার পথে ভুতুবাবুর হোটেলের পাশ কাটানো গেল না। নত অভিবাদন জ্ঞাপন করে একগাল হেসে পথরোধ করে দাঁড়াল। নরেনের দিকে চেয়ে সবিনয়ে বলল, একটু বসবেন না স্যার, একটুখানি চা—কাল সবে ফ্রেশ মাল এনেছি—

গম্ভীর মুখে নরেন চৌধুরী মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানাতে থেমে গেল। সান্ত্বনা একা থাকলে টেনে এনেই বসাতো। কিন্তু এই হোমরা-চোমরা মানুষগুলোর ধাত বুঝে চলতে হয় ভুতুবাবুকে।

নিস্পৃহ প্রত্যাখ্যানে লোকটার জন্য কেমন মায়া হ'ল সান্ত্বনার। মিষ্টি করে বলল, আজ দেরি হয়ে গেছে, আর একদিন এসে খাব, কেমন ? আপনার গোরু কিন্তু চমৎকার হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে, একবারটি গিয়ে দেখে এলেন না তো ?

ভুতুবাবু বিগলিত।—খুব ভালো হয়েছে ? আমি ভাবছিলাম কেমন না জানি হ'ল। সবাই বলে আর জন্মে ভুতু খালি ভালো খোঁজার তপস্যা করেছিল। যাক, নিশ্চিন্দি হলাম, হোটেল ছেড়ে এক দণ্ড নড়তে পারিনে তো, তবু নিশ্চয় যাব।

দু'দশ পা এগিয়ে নরেন চৌধুরী মন্তব্য করল, ব্যাটা ঘুঘু।

সান্ত্বনা বলল, খুব ভালো লোক। কি মনে পড়তেই হেসে সারা তারপর।—সেদিন বলছিল, আপনি নাকি খুব স্নেহ করেন ওকে—অতি মহাশয় ব্যক্তি আপনি।

নরেনও হেসে ফেলল। বলল, ব্যাটা বাস্তুঘুঘু. তোমার গোরুর একশ পঁচিশ টাকার অন্তত পঁচিশ টাকা ওর গহ্বরে গেছে।

কক্ষনো না, আপনি মিছিমিছি বাড়িয়ে বলেন, বেশ ভালো লোক।

সে কথার আর জবাব না দিয়ে সামনের চড়াইয়ের রাস্তাটার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল নরেন চৌধুরী—ট্রাকটাও যদি ছাই আসত এখন।

শুনেই কি মনে পড়ে যায় সান্ত্বনার। উৎফুল্ল মুখে বলে, ওই ঘোষ-চাকলাদার না কি কণ্ট্রাক্টারদের জিপটা এলেও তো হ'ত—।

ভুরু কুঁচকে নরেন তাকাল একবার ওর দিকে। এলেও সঙ্গে আমাকে দেখে নিরাশ হয়ে জিপ আর থামাতো না।

ধেৎ, আপনার খালি ইয়ে ! তেমনি হেসেই বলল, কি না জানি ওঁরা ভেবে গেলেন সেদিন, হঠাৎ এমন ঘাবড়ে গেলাম যে একটা কথাও বেরুল না মুখ দিয়ে।

সেটাও ওদের খুব অপছন্দ হয় নি বোধ হয়।

ফের ! ভ্রূকুটি করে কয়েক পা এগিয়ে গেল সান্ত্বনা।

জিপ বা ট্রাক কিছুই নয়। মাঝামাঝি পথে দু'টি নারীমূর্তি। পাহাড়ের ধার-ঘেঁষা একটা বড় পাথরে সমাসীন। দৃষ্টি মড়াইয়ের দিকে। আবছা অন্ধকারে দূর থেকে

ঠিক ঠাওর হ'ল না। কাছে আসতে চেনা গেল। নরেন চৌধুরী অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, এই সেরেছে।

বর্ষীয়সী মহিলাটিকে সান্ত্বনাও চেনে। অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসারের স্ত্রী মিসেস চ্যাটার্জী। সঙ্গের মেয়েটি সান্ত্বনারই সমবয়সী হতে পারে, কিছু বড়ও হতে পারে।

কাছাকাছি হতে দু'জনেরই চোখ পড়ল এদিকে। মহিলা দাঁড়িয়ে সানন্দে বলে উঠলেন, আপনার কোয়ার্টারেই যাব ভাবছিলাম মিঃ চৌধুরী—আপনার সঙ্গেই দেখা। সান্ত্বনার দিকে কটাক্ষপাত করে নিয়ে আবার বললেন, বেড়াতে বেরিয়েছিলেন নাকি? কত দূর গেলেন? আমি নিচে নামলে আর একবারে উঠতেই পারিনে, হাঁপিয়ে পড়ি।

নরেন দাঁড়িয়ে সবিনয়ে হাসতে লাগল শুধু।

কই রে ঝরনা এদিকে আয়, আলাপ করিয়ে দিই। আমার মেয়ে ঝরনা, এম-এ পড়ে কলকাতায়—ছুটিতে এসেছে।—ইনি এখানকার ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফট্স্ম্যান নরেন চৌধুরী—এঁর কাছেই যাব বলছিলাম তোকে।

যথারীতি নমস্কার বিনিময়। সান্ত্বনা মেয়েটিকেই দেখছে চেয়ে চেয়ে। ছিপছিপে, চকচকে। চশমার নিচে ঝকঝকে চকিত দৃষ্টি।

ঝরনা মাকেই জিজ্ঞাসা করল, আর ইনি?

ও—এই এখানকারই একজন ওভারসিয়ারের মেয়ে—কি নাম যেন তোমার?

—সান্ত্বনা।

মেয়েটি এম-এ পড়ে শুনে গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না প্রায়। দু হাত তুলে মিষ্টি হেসে ওকেও যে নমস্কার জানাবে ভাবে নি। তাড়াতাড়ি হাসি টেনে কোন প্রকারে প্রতিনমস্কার করল সান্ত্বনা।

কাল বিকেলে আপনাকে চায়ের কথা বলতে আপনার কোয়ার্টারে যাচ্ছিলাম মিঃ চৌধুরী। মিসেস চ্যাটার্জী বললেন, আসতে হবে—মিঃ গাঙ্গুলিও কথা দিয়েছেন আসবেন।

শুনে নরেন চৌধুরী হতাশার ভঙ্গি করল একটা। কাল? কি দুর্ভাগ্য, কাল যে এক বিশেষ কাজে আটকে আছি।

সে কি! না না—সন্ধ্যের দিকে আসুন তাহলে, তখন তো আর কাজ নেই? মোলায়েম আন্তরিকতা।

আর বলেন কেন, কাজ একেবারে সেই রাত পর্যন্ত। তাতে কি, আর একদিন হবে'খন। ঝরনা দেবীর তো ছুটি আছেই এখনো, যে কোনদিন গিয়ে চড়াও হব। চলি, নমস্কার, নমস্কার—আপনি বসুন, একেবারে অতটা ওঠা কারো হার্টের পক্ষেই ভালো নয় খুব। এসো সান্ত্বনা—

অপেক্ষা না করে হাঁটতে শুরু করে দিল। খানিকটা এগোবার পর সান্ত্বনার বোবা মুখ খুলল। চিফ ইঞ্জিনিয়ার ওঁর বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্নে যাবেন কাল?

নেমন্তন্ন হলে আর যাবে না কেন?

আর আপনি যাবেন না? বিস্ময় এবং হতাশা।

কি করে যাই, শুনলে তো কাজ আছে।

ছাই কাজ, কি এমন কাজ আছে শুনি?

প্রথম কাজ, রায় মশাই কেমন থাকেন না থাকেন খবর নেওয়া, দ্বিতীয়, তোমার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া—কাল আর বেরুনো হবে না, বাড়ি বসেই আড্ডা দিতে হবে, হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি।

পা থেমে গেল সান্ত্বনার। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেও পারল না বোধ হয়। আপনি তাহলে মিছে কথা বলে এলেন ওঁকে?

কেন, এগুলো কাজ নয়? দাঁড়ালে কেন, এসো—

কি যাচ্ছেতাই লোক আপনি! দাঁড়ান দেখা হলে বলে দেব। নেমন্তন্ন নিলেন না কেন?

নিলে কি হ'ত?

আমি শুনতে পেতাম সব।

নরেন হেসে বলল, সেটা নেমন্তন্নে না গিয়েও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাকে ঠিক ঠিক শুনিয়ে দিতে পারি।

ছাই পারেন, আপনি একটি মিথ্যে কথার জাহাজ। দেখা হোক না, ঠিক বলব আমি—ভদ্রমহিলা অত করে বললেন।

জেনারেল কোয়ার্টারের বাঁকা পথে পা বাড়িয়ে নরেন চৌধুরী সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, ভদ্রমহিলা মনে মনে খুশিই হয়েছেন।

কেন?

মাথাটি তোমার নীরেট না হলে বুঝতে, চায়ের উদ্দেশ্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করানো। একলা একজনকে নেমন্তন্ন করলে সদিচ্ছাটা বড় বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই আমাকে বলা। এখন সব দিক বজায় রইল, বাদল এলেই প্রথমে জানাবেন, মিঃ চৌধুরীকে অত করে বললাম, তিনি আসতে পারলেন না। ব্যস্, নরেন চৌধুরী ওখানেই শেষ—তারপর অখণ্ড অবকাশ। কিন্তু সুবিধে হবে না—চিফ ইঞ্জিনিয়ারটিকে ঠিকমত জানলে আর এগোতেন না মহিলা।

আভিজাত্যের এদিকটা সান্ত্বনার জানা নেই খুব। ঘাড় ফিরিয়ে হাঁ করে চেয়েই রইল নরেনের মুখের দিকে। শেষের কথাগুলো কানেই গেল না বোধ হয়।

এই মতলব?

বাড়ি ফিরে কাজের ফাঁকে ফাঁকেও বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করছে সান্ত্বনা। ভারী মজা লাগছে ভাবতে। হাতের কাজ ভুলে পার্টির প্রহসনটা সকৌতুকে কল্পনা করতে চেষ্টা করছে এক-একবার। কিন্তু মানুষটাকে তো চোখেই দেখে নি, পারবে কি করে। মেয়েটা তেমন সুন্দরী না হলেও বেশ কিন্তু। আবার বিপরীত অনুভূতিও জাগছে থেকে থেকে। এত কালের এত বড় এক মরু-অভিশাপ দূর করতে বসেছে যে মানুষ—তার সঙ্গে ওই মেয়ে—

নাঃ। সেও আবার কেমন লাগছে যেন।

॥ ৫ ॥

ওপরের মেন্ কোয়ার্টারস্-এর মতই অনেকটা জায়গা জুড়ে নিচের আপিস কোয়ার্টারস। হালফেশানের বড়সড় আপিস-বাড়ি বলতে যা বোঝায় তেমন নয়। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দালান গোটাকতক। দু-তিনটে করে ঘর। পদমর্যাদা অনুযায়ী সেই সব ঘরের আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম। বিচ্ছিন্ন হলেও দালানগুলি মেন্ কোয়ার্টারস-এর মত অতটা দূরে দূরে নয়। প্রয়োজনে সব সময়েই কর্মচারীদের এক দালান থেকে অন্য দালানে আনাগোনা করতে হয়।

সকালের আপিস শুরু হবার আগে সাধারণ কর্মচারীদের আড্ডা বসে একপ্রস্থ। সব একসঙ্গে নয়। এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন ভাবে। দাওয়ার ওপর এবড়ো খেবড়ো পাথুরে মাটিতে, ছোট ছোট ঝোপের ছায়ায় অথবা শিলাসনে।

কিন্তু প্রায়ই ব্যতিক্রমও ঘটে আবার। মাঝপথে জটলা থামিয়ে যে যার কাজে বসে যায় চুপচাপ। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক। তখনই, যখন একেবারে ওই কোণের দালানটিতে একজনের উপস্থিতির আভাস পায়।

কারো কোনো অনুশাসন নেই এর পিছনে। কোনো ভ্রূকুটি নেই কারো। কিন্তু এমনি হয়ে আসছে। শুধু আপিস-পরিবেশে নয়, আউট-ডোরেও। মড়াইয়ের বুকেও। দলে দলে কোদাল শাবল চালাচ্ছে মাটিকাটা কুলিরা, একটু আধটু মস্করা করছে মাটির ঝুড়ি বা পাথর মাথায় কামিনরা, তদ্‌বির-তদারকের ফাঁকে ফাঁকে তাদের খোলা বুকের উপর একটু আধটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে কুলিবাবুরা। এরই মধ্যে হয়তো দেখা গেল, প্রায় কোনো দিকে না তাকিয়েই লোকটি চলে যাচ্ছে একপাশ দিয়ে। কুলিরা সচেতন হ'ল একটু, ঝুড়ি মাথায় কামিনরা ফিরে ফিরে দেখে নিল, মুখের বিড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তৎপর হ'ল কুলিবাবুরা। যন্ত্র-সমাবেশের দিকেও তাই। লোকটি হয়তো দাঁড়াচ্ছে একটু কোথাও, কোথাও বা পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে কর্মচারীদের একটুখানি বাড়তি নিবিষ্টতা চোখে পড়বে।

....চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি।

কোণের দালানের স্বতন্ত্র ঘরটিতে কর্মমগ্ন। কাগজপত্র দেখছে। সই করছে। ফাইল ঘাঁটছে। টেবিলে ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম ছড়ানো। দেয়ালে দেয়াল-চার্ট, ম্যাপ। ঘরে ঢুকলে প্রথমেই সমস্ত পরিকল্পনার নক্সাটা চোখে পড়ে।

টেবিলের গায়ের বোতাম টিপতে প্যাঁ—ক্ করে শব্দ হ'ল একটা। বেয়ারার আবির্ভাব।

ওভারসিয়ার রায় বাবু।

বেয়ারা চলে গেল। খানিক বাদে অল্পবয়স্ক একটি লোক হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এলো।—রায় বাবু তো এখনো জয়েন করেন নি স্যার।

ইঞ্জিনিয়ারের মুখে বিরক্তির রেখা।—স্পিল্‌ওয়ে সারভে ফাইল কে ডিল করছে নিয়ে আসতে বলুন।

আগন্তুক বেশ একটু বিব্রত মুখে বেরিয়ে গেল।

সামনের উঠোন ডিঙোলেই আর একটা দালান। তেমনি একটা বড় ঘরের মেঝেতে দেয়ালে টেবিলে সর্বত্র ড্রইংয়ের ছড়াছড়ি। আঁকার সরঞ্জামেরও। টেবিলে ছড়ানো ড্রইংয়ের ওপরেই দু পা চালিয়ে দিয়ে চেয়ারে মাথা রেখে সিগারেট টানছে নরেন চৌধুরী। বাঁ হাতে হাতীর দাঁতের কানকাঠি দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে আর গলা দিয়ে সেই পেটেন্ট শব্দ বার করছে।

ফাইল-হাতে সেই লোকটি ঘরে প্রবেশ করল। নরেন চৌধুরী সিগারেটের ধোঁয়ার জটিলতা সৃষ্টি করতে করতেই অলস নেত্রে তাকালো তার দিকে।

ফাইলবাহক একটু ইতস্তত করে বলল, বড় সাহেব ডেকেছিলেন—

ধূম্র রচনা বন্ধ হ'ল। ঈষৎ কৌতূহলে তাকালো নরেন চৌধুরী। পরে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, যাচ্ছি।

না, মানে—আপনাকে নয়—স্পিল্ওয়ে ফাইল নিয়ে আমায় যেতে বলেছেন।

ব্যাপার বুঝে নিতে আর সময় লাগল না একটুও। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নরেন চৌধুরী যে কাগজটার ওপর ছাই ঝাড়ছিল তাতে ভুক্তাবশিষ্ট সিগারেটটা টিপে টিপে নেবাল। তারপর ছাইসুদ্ধ কাগজটা মুড়ে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দেয়ালের গায়ে ওলটানো একটা কার্ডবোর্ড সোজা করে দিল। বড় বড় হরফে তাতে ঘরে ধূমপান নিষেধ বাণী লেখা। ফিরে বসল।

দুশ্চিন্তা ভুলে ছেলেটি হাসতে লাগল মিটিমিটি। এই লোকটির সঙ্গে একটা সহজ অন্তরঙ্গতা আছে সকলেরই।

তোমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে যেতে হলে আমি কি মাঝপথের হল্টিং স্টেশান?

কি করব, অবনীবাবুর তো অসুখ—এসব কখনো করেছি যে হুট করে ফাইল নিয়ে গিয়ে হাজির হব? ফাইল তো যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

হুঁ। তবু তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। খুব কড়া করে তাঁকে দু'কথা শুনিয়ে এসো গে যাও—যাও যাও—দেরি কোরো না।

অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলল ছেলেটি। কিন্তু হাসলে চলবে না, ব্যবস্থা কিছু করতে হবে এক্ষুনি। ফাইল তার টেবিলের ওপর রেখে বলল, আপনি যা করার করুন, আমি চললাম—।

দ্রুত প্রস্থান।

ফাইল তুলে নিয়ে নরেন চৌধুরী নেড়ে-চেড়ে দেখল একবার। হাতীর দাঁতের কানকাঠি পকেটে ফেলল। পরে ফাইল হাতে হালকা মৃদু শিস দিতে দিতে বাইরে এসে উঠোন ডিঙিয়ে গন্তব্যস্থানে চলল।

গুড মর্নিং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল।—এই নাও তোমার স্পিলওয়ে ফাইল।

বোসো, তুমি যে?

আমি ছাড়া ওই সাদা ফাইল নিয়ে কে আর তোমার কাছে এগোবে? সারাক্ষণ মুখখানা যা করে থাকো, ওপরঅলার ভয়েই অস্থির সব।

মৃদু হেসে বাদল গাঙ্গুলি তাকালো তার দিকে। সেই রকমই দেখছি বটে।

হা হা করে হেসে উঠল নরেন চৌধুরী—দুঃখ থাকে তো বলো, হুজুর-টুজুর জুড়ে দি—। সবার সব কিছু নিয়ে তোমার কাছে আসতে হয় বলে আমার একটা আল্লাদা এলাওয়েন্সের জন্য লেখা উচিত তোমার।

লিখব'খন। কিন্তু এ ফাইলের কি হ'ল?

কি আর হবে, অবনীবাবু সেরে উঠুন।

মনঃপূত হ'ল না স্পষ্টই বোঝা গেল।—অবনীবাবু যদি এখন ছ'মাসে সেরে না ওঠেন, ও ফাইল অমনি পড়ে থাকবে?

বড় সাহেবের কথার পিঠে কথা বলতে একমাত্র নরেনই পারে। মাথা নেড়ে সায় দিল সে, ঠিক কথা, ছ'মাসে কেন, অবনীবাবু আর যদি সেরে না-ই ওঠেন—স্পিলওয়ে কি বন্ধ হয়ে যাবে?

বাদল গাঙ্গুলি হার মানল প্রায়—ওরা বুঝি এই করতেই ফাইল দিয়ে তোমাকে পাঠিয়েছে?

কি করবে, ওদের তো বাঁচতে হবে। যাক, কিছু ভেবো না, ফাইল তোমার দু'দিনেই ঠিক করিয়ে দিচ্ছি।....হঠাৎ কি একটা মতলব এলো যেন মাথায়। উঠতে গিয়েও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়ল আবার। মন্দ হয় না, সান্ত্বনা আকাশ থেকে পড়বে একেবারে। বলল, তুমি তো আচ্ছা বড় সাহেব, রোদে জলে সারা হয়ে ভদ্রলোক অসুখে পড়ে গেলেন, আর এখান থেকে তুমি একটি বার দেখতেও গেলে না তাঁকে?

বিব্রত করাই উদ্দেশ্য। বিব্রত হ'লও—উনি তো এখন ভালো আছেন শুনেছি—।

তাহলেও একবার যাওয়া উচিত তোমার। তুমি হলে ড্যাম-ফ্যামিলির মাথা—

হেসে উঠল দু'জনেই। বাদল গাঙ্গুলি বলল, গালাগালিটা ভালই দিলে, আচ্ছা আমি যাব'খন।

যেও, আজই যেও। অবশ্য ভালই আছেন এখন তিনি, তবু আশাও তো করে লোকে।

তার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎই কিছু যেন মনে পড়ে গেল বাদল গাঙ্গুলিরও। মৃদু হেসে বলল, আশা যার করে সে তো রোজই যাচ্ছে বোধ হয়—। পরক্ষণে গম্ভীর মুখে হাতের কাজে মন দিল সে।

মুচকি হেসে নরেন চৌধুরী চেয়ে রইল তার দিকে। কিন্তু না। আর আশা নেই। দ্বিগুণ একাগ্রতায় কাগজপত্র দেখছে--প্রায় রূঢ় মনোযোগে।

চলি। হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল নরেন চৌধুরী। একটা কাজ মন্দ হ'ল না। সান্ত্বনার চিফ ইঞ্জিনিয়ার দর্শন ঘটবে আজ। ওর তখনকার মুখখানা দেখার লোভ হচ্ছে খুব। কিন্তু দেখতে গেলে সব পণ্ড। পরে বরং শোনা যাবে। কিছু একটা দৃশ্য কল্পনা করেই হয়তো হাসছে আপন মনে।

কিন্তু ভবিতব্য অন্য রকম।

সান্ত্বনার সেদিন মেজাজ চড়া। ছোকরা চাকরটার দেখা নেই তিন দিন। গোরুটার খাবার পর্যন্ত ফুরিয়ে এসেছে। মেজাজ আরো বিগড়েছে অন্য কারণে। পাহাড়ের

পিছন দিকেও নতুন রাস্তা বার করা হচ্ছে একটা। যেখানে গোরু বাঁধা হয় তার থেকে অনেকটাই দূরে অবশ্য। বড় একটা পাথরের চাঙ্ ভূমিসাৎ করা হচ্ছে সেখানে। আর থেকে থেকেই সেই বিস্ফোরণের গুরুগর্জনে ভয়ে ত্রাসে এদিকে সেদিকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করছে গোরুটা।

ওদিকটা একবার পরিদর্শন করে আপন মনে আসছিল বাদল গাঙ্গুলি। অনতিদূরের নারীকণ্ঠে থমকে দাঁড়াল। খুঁটির সঙ্গে একটা গোরু বাঁধা। মেয়েটি তাকে বোঝাচ্ছে, গোরু বলে গোরু, আচ্ছা গোরু তুই, সেই থেকে শুনছিস ওই শব্দ, তবু তো তোর ভয় গেল না! ওখানে শব্দ হচ্ছে তো তোর তাতে কী? ঘুরে ঘুরে দিব্বি খাবি-দাবি মোটা হবি, না ভয়েই ম'লো।

শান্তনেত্রে কথাগুলি শুনে গাভীকন্যা ভারী আশ্বস্ত হ'ল যেন।

চল্ বাড়ি চল্, আমি তো আছি, ভয় কি?

এক হাতে বালতি এবং অন্য হাতে খুঁটি থেকে দড়ি তুলে নিল সান্ত্বনা। অদূরের মানুষটির সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হ'ল একবার। চেহারাপত্র বেশভূষা এমন কিছু নয়, যাতে করে এই মেজাজ সত্ত্বেও কৌতূহল জাগতে পারে। ও রকম হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখাটাই বরং বিরক্তিকর আরো। লোকগুলোর স্বভাবই ওই।

ঠিক অমনি সময় আচমকা আবার সেই শব্দ একটা। ভয় পেয়ে গোরুটা দিল ছুট। হাত থেকে দড়ি ফসকে গেল সান্ত্বনার। বালতিটাও ছিটকে পড়ল। আর সামলাতে না পেরে নিজেও হুড়মুড় করে আছাড় খেল একটা।

বাদল গাঙ্গুলি দড়িটা ধরে ফেলে টেনে-হিঁচড়ে ভীতত্রস্ত গোরুটাকে থামালে কোন প্রকারে। তারপর ফিরে চেয়ে দেখে ওই অবস্থা। সান্ত্বনা মাটি ছেড়ে উঠতে পারে নি তখনো।

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল শেষে। বেশ লেগেছে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। কাপড় সামলাতে সামলাতে অগ্নিমূর্তিতে গোরুটার সামনে এসে হাত নেড়ে ঝাঁজিয়ে উঠল, চলো বাড়ি চলো আজ, তোমাকে দেখাচ্ছি মজা—পাজী হতচ্ছাড়া ভীতু গোরু—ঘাস খাস কি সাধে!

সামনের লোকটিকে দেখল। শক্ত হাতে গোরুর দড়ি ধরে নিষ্পলক নেত্রে তার দিকেই চেয়ে আছে। অসহিষ্ণু রাগে সান্ত্বনা ভূপতিত বালতিটার কাছে গেল। ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতায় ত্রস্ত বেশবাস সম্বৃত করে নিল একটু। বালতিটা হাতে তুলে নিল তারপর। সামনে এসে বলল, ওটাকে ধরে একটু এগিয়ে দিতে পারবেন? ওই সামনেই বাড়ি—

নিজের অজ্ঞাতে সামনে পিছনে একবার দেখে নিয়ে বাদল গাঙ্গুলি ঘাড় নাড়ল, পারবে।

হন হন করে ক'পা এগিয়ে গেল সান্ত্বনা। পিছনে দড়ি ধরে গোরু আগলে চলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি!

আবারও সেই বিস্ফোরণ।

থমকে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা পিছন ফিরে দেখল। ভয় পেলেও গোরু হাতছাড়া হয় নি। রাগে গরগর করে বলে উঠল, ওঃ ঘটা কত! জল আনছে না তো, একেবারে

সমুদ্দুর নিয়ে আসছে সব। ভ্রুকুটি করে তাকালো, আপনি ওই ওখানে কাজ করেন?

প্রশ্ন অবান্তর, নিজেই জানে। ড্যামের কাজ ছাড়া আর কোন কাজ নেই এখানে। কিন্তু রাগের মাথায় অতশত খেয়াল নেই সান্ত্বনার।

বাদল গাঙ্গুলি ঘাড় নাড়ল, করে।

ওদের বলে দেবেন মাটির নীচে এত্তার জল আছে, মিথ্যে আর এত হাঁকডাক করা কেন, অমনি করে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেই জলে জলময় হয়ে যাবে সব।

মেয়েটি কে, অনেকক্ষণই চিনেছে বাদল গাঙ্গুলি। বলল, জলের জন্য নয়; ওখানে একটা রাস্তা হচ্ছে।

কোমরের ব্যথায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, হাঁটু বোধ হয় ছেড়ে গেছে। প্রত্যুত্তর সহ্য হ'ল না।—হ্যাঁ, দলে দলে লোক গিয়ে জলের মধ্যে সাঁতার কাটবে সেই জন্য রাস্তা হচ্ছে।

কেন যে বাদল গাঙ্গুলি একটু বোঝাবার লোভ সংবরণ করতে পারল না সে-ই জানে। মৃদু হেসে বলল, রাস্তা হলে তবে তার পাশ দিয়ে নালা কেটে এখানকার গাঁয়ের দিকে জল পাঠানো যাবে, নইলে—

থাক থাক থাক—আপনাকে আর বোঝাতে হবে না, অষ্টপ্রহর এই জলকীর্তন শুনছি।

আবার সে হনহন করে এগিয়ে গেল। অর্ধবিস্মিত কৌতুকে বাদল গাঙ্গুলি অনুসরণ কবল তাকে। আনাড়ি হাত বুঝেই গোরুটা যেন এদিক ওদিক যেতে চাইছে। কোন রকমে সে সামলে চলেছে ঠিকই, কিন্তু পায়ে পায়ে অনভ্যস্ততাও প্রকাশ পাচ্ছে।

সান্ত্বনা দাঁড়ায় আবার। নিস্পৃহ অবহেলায় দেখল একবার। দৃষ্টি বিনিময়। এই তো মুরোদ, ড্যাব-ড্যাব করে মেয়েদের দিকে চেয়ে থাকতে ওস্তাদ। বলল, একটা গোরু ঠিকমত চালিয়ে নিয়ে আসতে পারেন না, কোন কাজ হয় আপনাদের দিয়ে তাও বুঝিনে। অতটা দড়ি ছেড়ে দিয়ে ধরলে ও তো এদিক ওদিক যেতে চাইবেই, দড়িটা গুটিয়ে নিন আগে।

বেশ একটা বৈচিত্র্য অনুভব করছে বাদল গাঙ্গুলি। নির্দেশমত দড়ি গুটিয়ে গোরুটাকে কাছাকাছি আনা হ'ল।

বাড়ি। পাশের সেই-প্রবেশ-পথ দিয়ে সান্ত্বনা আগে-আগে চলল। পিছনে গোরু নিয়ে বাদল গাঙ্গুলি। গোয়াল-ঘর। সান্ত্বনার মেজাজ সপ্তমে চড়া তখনো। ঝুপ করে বালতিটা রেখে তার হাত থেকে দড়িগাছা নিয়ে খুঁটিতে গলিয়ে দিল।

কিন্তু এই বন্দী-দশাও গোরুটার খুব পছন্দ নয়। পিছু হটতে চেষ্টা করে মানুষটার গা ঘেঁষে এলো প্রায়। একটু ব্যবধান বজায় বাখতে গিয়ে তাকেও সরতে হ'ল। ফলে এবার তারই পায়ে লেগে বালতি ওলটালো। ভিতরের আহার্য পদার্থ কিছুটা ছড়িয়ে পড়ল। আবার বকুনির ভয়েই হয়তো বাদল গাঙ্গুলি তাড়াতাড়ি মাটি থেকে সেই জলে-খোলে মেশানো পদার্থ দু'হাতের আঁজলায় তুলে নিল খানিকটা।

সান্ত্বনা মুখ ফিরিয়ে দেখল একবার। কিছু না বলে গড়ানো বালতিটা তুলে নিয়ে গোরুর মুখের কাছে নতুন করে খাবার যোগান দিতে লাগল।

মাটি থেকে যা তুলেছিল তাই নিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাতে বাদল গাঙ্গুলি দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। বাড়ির ভিতর থেকে অবনীবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, সান্ত্বনা এলি—।

এদিক থেকে অসহিষ্ণু জবাব গেল, যাই বাবা যাই! জল আনার যা ঘটা তোমাদের, ভগীরথও গঙ্গা আনতে অত তোড়জোড় করে নি, ভয়ে সুন্দরীটা একেবারে আধমরা হয়ে গেছে।

ওদিক থেকে আবার শোনা গেল, কি বলছিস কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

কিছু শুনে কাজ নেই, ওখানে চুপ করে বসে থাকো, আমি আসছি।

সামনের লোকটার দিকে তাকালো একবার। অনেক নাজেহাল হয়েছে। হাঁ করে চেয়ে থাকবার সাধ মিটেছে হয়তো। ঈষৎ সদয় কণ্ঠে বলল, আপনি আর দাঁড়িয়ে আছেন কেন, ওই ওদিকে জল আছে হাত ধুয়ে ফেলুন গে, তার পর বাবার কাছে বসুন গে যান, আমি আসছি—।

ধারণা, ড্যামে কাজ করে যখন—তার বাবাকে চেনেই। হাতের কাজ সেরে না হয় দুটো মিষ্টি কথা বলা যাবে।

হুকুমমত হাতের সেই বস্তু বালতিতে ফেলে বাদল গাঙ্গুলি বাইরে এসে জলের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। গোয়ালঘরে কণ্ঠস্বর শুনল, গোরুর উদ্দেশে বলছে, তুমি হাড়বজ্জাত হয়েছ, বুঝলে? আছাড় খাইয়ে আমার হাড়গোড় ভেঙ্গে দিয়েছ—নাও গেলো এখন—।

জলের সন্ধানে এসে বাদল গাঙ্গুলি যাঁর সামনে পড়ে গেল তিনি অবনী রায়। ঘর-সংলগ্ন বারান্দার ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান। মুখ খবরের কাগজের আড়ালে। কোন দিক থেকে কে এলো টের পান নি। কাছাকাছি হতে খবরের কাগজ সরালেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠলেন একেবারে।—স্যার আপনি! এদিকে আসুন স্যার, এদিকে। ভারী সৌভাগ্য আমার।

ওদিকে গোয়ালঘর ছেড়ে সবে বেরিয়েছে সান্ত্বনা। শোনামাত্র স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল সে। একখানি নির্বাক পুতুল যেন। মাথায় ঢুকছে না কিছু।

বাদল গাঙ্গুলির হাত ধোয়া হ'ল না আর। হাত দু'টো পিছনে নিয়ে সপ্রতিভ মুখে হাসল একটু।

আসুন স্যার আসুন, ওরে সান্ত্বনা, একটা চেয়ার দিয়ে যা না শীগগির—আপনি এখানে বসুন স্যার—

ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন—আমি আপনাকেই একবার দেখতে এলাম, বসুন আপনি, বসুন।

চেয়ার নিয়ে আসবে কি, মাটির সঙ্গে পা আটকে আছে সান্ত্বনার। কোনরকমে একটা বেতের চেয়ার নিয়ে পিছনে এসে দাঁড়ালো। দেখল, বাবা অনেকটা যেন আত্মাভিভূত হয়েই আবার ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন।—চেয়ারটা এগিয়ে দে—এই আমার মেয়ে সান্ত্বনা।

বাদল গাঙ্গুলি ফিরে দেখল তাকে। হকচকিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা বলল, ন-ন-মস্কার—। কণ্ঠস্বর নয়, যেন কান্না বেরিয়ে আসছে গলা বেয়ে।

দু'হাত তুলতে গিয়ে হাতের অবস্থা দেখেই আবার যথাপূর্ব দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি মাথা নাড়ল শুধু। সান্ত্বনা চেয়ার নিয়ে আর এগোতে পারছে না।

থাক চেয়ারের দরকার নেই। হাত দু'টো তেমনি পিছনে রেখেই অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কেমন আছেন এখন?

আমি তো সেরেই গেছি, আপনি মিছিমিছি কষ্ট করে এতটা পথ এলেন...

পিছন থেকে লোকটির দুই হাতের অবস্থা দেখে সান্ত্বনার দুই চক্ষু আরো স্থির। চেয়ার রেখে প্রস্থান করে বাঁচল।

বাদল গাঙ্গুলি বলল, না কষ্ট কি, আগেই আসা উচিত ছিল, আজ নরেন বলতে খেয়াল হ'ল।

আড়াল থেকে সান্ত্বনা কাঠ হয়ে দেখছে আর শুনছে। অবনীবাবু বললেন, নরেনের কাণ্ড—আমি তো দু'চার দিনের মধ্যেই কাজে যাব ভাবছি, আপনি বসুন না একটু, এক পেয়ালা চা অন্তত—

না, এখন চা নয়, আমার তাড়া আছে। আপনি বেশ সেরে উঠুন আগে, এখনি কাজে বেরুবার দরকার নেই। ভালো বোধ করলে দুই একটা ফাইল বরং এখানে আনিয়ে নেবেন। আচ্ছা—

উঠে দাঁড়িয়ে অবনীবাবু নমস্কার জানালেন। বাদল গাঙ্গুলি চলে এলো। বাইরে সিঁড়ির কাছে জল সাবান তোয়ালে নিয়ে সান্ত্বনা অপেক্ষা করছে। দাঁড়াতে হ'ল। দেখল একটু। কে বলবে খানিক আগে এই মেয়ে অমন মেজাজে গোরু আর মানুষ দুইই একসঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ঢুকেছে। লজ্জা দেবার জন্যই জিজ্ঞাসা করল, পড়ে গিয়ে আপনার তখন লেগেছিল বোধ হয় খুব?

জলের ঘটি তুলে নিয়ে সান্ত্বনা মাথা নাড়ল, লাগে নি।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে সান্ত্বনা জল ঢালতে লাগল। ওর বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে আছে বাদল গাঙ্গুলি। বেশ কৌতুক অনুভব করছে।

প্রায় মরীয়া হয়েই সান্ত্বনা বলে ফেলল, আমি...আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

কি বুঝতে পারেন নি?

ঢোঁক গিলল সান্ত্বনা। কথা যোগাতে না পেরে তোয়ালে এগিয়ে দিল।

এখন বুঝতে পেরেছেন?

সান্ত্বনা তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল, পেরেছে।

আচ্ছা। হাসি চেপে তোয়ালে তার হাতে ফেরত দিয়ে বাদল গাঙ্গুলি প্রস্থান করল।

সেদিকে চেয়ে সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। বিভ্রান্ত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। গোয়াল-ঘর থেকে গোরুটার হাম্বা-রব কানে এলো। হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল সান্ত্বনার। বেদম হাসি। অফুরন্ত। হাসতে হাসতে সেখানেই বসে পড়ে মুখে তোয়ালে চাপা দিল।

ভিতর থেকে অবনীবাবু ডাকলেন।

হাসি সামলে কোন প্রকারে সাড়া দিল, যাই বাবা!

কিন্তু বাবার কাছেও আসতে পারছে না চট করে। তাঁর সামনেও হেসেই ফেলবে হয়তো। তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুখ মুছে দমটম নিয়ে উঠল সে।

দেখলি আমাদের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারকে?

সান্ত্বনা নিরীহ মুখে মাথা নাড়ল। মুখে যাই বলুন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেখতে আসায় অবনীবাবু মনে মনে খুশি খুব। প্রশংসায় মেতে উঠলেন।—এতটুটু অহঙ্কার নেই, শুধু কাজটি হলেই খুশি, আর কাজ বোঝে কত! তুই যদি চট করে একটু চা করে এনে দিতিস!

যেমন স্বভাব, সান্ত্বনা ফস করে বলে বসল, বেশ করে ঘোল খাইয়ে দিয়েছি।

ঘোল! ঘোল কি রে? কার কথা বলছিস?

সামলে নিল সান্ত্বনা।—ওই সুন্দরীর কথা, ভীতুর একশেষ, আজ আমায় নাজেহাল করেছে একেবারে! বড় রকমের জিভ কাটল, এই গো বাবা, তোমার ওষুধের সময় পেরিয়ে গেল, নিয়ে আসি আগে।

চপল পায়ে সরে পড়ল সেখান থেকে।

নিজের মধ্যে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না সান্ত্বনা। কাউকে না বলা পর্যন্ত ভেতরটা ফুলছে যেন। কাকে বলবে? বাবাকে? ও ব্বা-বা! একজনকেই শুধু বলা যেতে পারে। উন্মুখ আগ্রহে নরেনের প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু আসবেই এমন কোন কথা নেই। সকালে আপিসে নামার আগে বাবাকে দেখে গেছে, না আসাই সম্ভব।

বাড়ি বসে থাকতেও ভালো লাগছে না আর। কোন ছোট্ট পরিসরে ওকে কুলোবে না এখন। বাইরের উন্মুক্ততা যেন টানছে। বাবাকে বলে বেরিয়ে পড়ল। কোন্ দিকে যাবে? যে দিকে লোক নেই। চলল। গোড়া থেকে ভাবতে চেষ্টা করল একবার ব্যাপারটা। কিন্তু ভাববে কি, মনে পড়ে আর নিজের মনেই হেসে সারা। লোকজন নেই এদিকটায় রক্ষা।

এই চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি! কি কাণ্ড! কিন্তু একেবারে হালকা লাগছে ভিতরটা। কিসের একটা আবিষ্টতা যেন কেটে গেছে। মোহগ্রস্ততাও বলা যেতে পারে। বাবা বাবা—অদেখা মানুষ দেখা মানুষকে কতই না ছাড়িয়ে যায়! এরই সামনে পড়ে যাওয়ার ভয়ে কত দিন সে কিনা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। অবশ্য লজ্জায় মরে যাচ্ছিল আজও। কিন্তু সে ওই বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ডটা ঘটে গেল বলে। নইলে, হুঁঃ—!

পাকা রাস্তা ছেড়ে এবড়োখেবড়ো সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ ধরে চলেছে। কতটা এসেছে খেয়াল নেই। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের এম. এ. পড়া মেয়ে ঝরনার কথা মনে পড়ল। আর সেদিনের সেই পার্টির কথাও। এখন আর বেমানান মনে হচ্ছে না একটুও। ওই ভোঁতা চেহারার লোকটির তুলনায় মেয়েটাই বরং বেশি ঝকঝকে। কি হ'ল সেদিন আজ আরো বেশি জানতে ইচ্ছে করছে। নরেনবাবুর সবেতেই বেশি

বেশি, গেলেই পারত—

অদূরে মেয়ে-গলায় খিলখিল হাসির শব্দে সচকিত হয়ে থেমে গেল সান্ত্বনা। পাহাড়ের ওধারে বিদায়ী সূর্য গা-ঢাকা দিয়েছে। পাহাড়ের রঙ আর আকাশের রঙ এক হয়ে আসছে। এরই মধ্যে নারীকণ্ঠের উচ্ছল হাসিতে আসন্ন প্রদোষের স্তব্ধতা ফেটে চৌচির হয়ে গেল যেন।

পায়ে পায়ে এগলো সান্ত্বনা।—স্বেচ্ছায় নয়। দুর্বার কৌতূহলে। অদূরে একটা বড় পাথরের আড়াল পেরুতেই একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। পালাতে পারলে পালাতো। কিন্তু আর সুযোগ নেই আড়াল হবারও।

পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণি। আর মাঝির ছেলে হোপুন। চাঁদমণির বুকের কাছে ঝুঁকে ছিল। চকিত উঠে দাঁড়াল।

—ই-ই-দিদিয়া। খুশির মাত্রা যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল চাঁদমণির। একটা ছোট পাথরে গা ঢেলে দিয়েছিল। সোজা হয়ে বসল। —ই-দিদিয়া। আঁই রে দিদিয়া। মারাংবুরুর রাণীপানা দেখতে লাগছে তুকে—ইদিকে আয় না কেনে!

কি কববে সান্ত্বনা? সম্ভব হলে উল্টো দিকে ছুটতো। সম্ভব নয়। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করল, তুই কি করছিস এখানে?

বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল চাঁদমণি। কালো চোখের বিদ্যুৎকটাক্ষ নিক্ষিপ্ত হ'ল হোপুনের ওপর। চোখে মুখে দাঁতের আভাসে তড়িত চপলতার ঝিলিক। ভরাঃ চালাঃ কানাইং—ঘরপানে যেতে লেগেছিলাম—মরদটোর 'দিল' দেখ কেনে—সনঝে কালে লুব্‌-ভির মতন পাছু নেছে—লাজ ডর নাই।

কি কুক্ষণে এই ফ্যাসাদের মধ্যে এসে পড়েছে। হতচ্ছাড়ী মেয়েটার জিভ যেন সাপের ছোবল। তবু হোপুনের দিকে একবার না তাকিয়ে পারল না সান্ত্বনা। যে ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন একটা অপরাধ হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। বিব্রত, সঙ্কুচিত। মড়াইয়ের পাথরে-কোঁদা পাণ্ডা নয়। নিরস্ত্র বিহ্বল দেউলে মূর্তি।

চাঁদমণির আলো-ঠিকরনো কালো চোখের তারা দুটো বারকতক নেচে বেড়ালো সান্ত্বনার মুখের ওপর। উচ্ছলকণ্ঠে খিলখিল করে হেসে উঠল তারপর। তীক্ষ্ণ পাহাড়চেরা হাসি। দেখে লে রে, দেখে লে, দিদিয়ার আঙ্‌গা মুখ দেখে লে—চান্দো মুখে আগ লেগেছে দেখ।

এবারে সোজা পৃষ্ঠপ্রদর্শন। পিছনে হাসির দমকে ভেঙে পড়ছে চাঁদমণি। হাসি নয় তো, বরফ-গলানো জল। গায়ে কাঁটা দেয় আর অবশ করে ফেলে।

অনেকটা পথ এসে হাঁপ ফেলে বাঁচে সান্ত্বনা। হাঁপিয়েই গেছে। অজানা অনুভূতির স্পর্শ আছে মেয়েটার হাসির মধ্যে। দূরে আসা সত্ত্বেও সেটার অস্বস্তি যেন জড়িয়ে আছে গায়ের সঙ্গে। ধুপ করে বসে পড়ল এক জায়গায়। বড় বড় দম নিল দু'চারটে। হাতের কাছের একটা পাথর কুড়িয়ে নিল। নিজের অজ্ঞাতে হাতের মুঠোয় বারকতক নিষ্পেষণ করতে চাইল ওটা।

তারপর সুস্থ হ'ল, সহজ হ'ল।

কেন মরতে গিয়েছিল ওখানে। ভাবল; জেনেশুনে তো আর যায় নি। কিন্তু

নিজের ভিতর থেকেই যেন খোঁচা খেল একটা। জেনেশুনে নয়? ওই নিরিবিলি নির্জন কি একজনের জন্য নাকি? না একা কেউ ওখানে বসে এমন করে হাসে?

রাগ করে পাথরটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সান্ত্বনা।

মুখে হার-মানা হাসির আভাস।

কিন্তু কেনই বা বিয়ে দিচ্ছে না পাগল সর্দার ওদের? লোকটা মেয়েকে যত না হোপুনকে ভালবাসে তার থেকে বেশি। তবু বিয়ে দিচ্ছে না কেন? জিজ্ঞাসা করলে আনমনা হয়ে কি যেন ভাবে পাগল সর্দার। সেই এক কথাই বলে তারপর। দেবে। সময় হলে দেবে। সময়ের আর বাকি কত, সে তো দেখছে। মড়াই বাঁধার আগে পর্যন্ত গাঁয়ের মাঝি হোপুনের বাবার প্রতিপত্তি কম ছিল না। দিনকাল বদলালেও এখনো ফেলনা লোক নয় সে, মুরুব্বীই বটে। মড়াইয়ের গোলযোগ মিটে যেতে আপস-স্বরূপ সে নিজেই এসে ছেলের জন্য চাঁদমণিকে চেয়েছে। কিন্তু পাগল সর্দার সেই কথাই বলেছে তাকেও। বিয়ে দেবে। কিন্তু এখন নয়। পরে। বেশ অসন্তুষ্ট হয়েই ফিরে গেছে হোপুনের বাবা। হোপুনও খুশি হয় নি।

পাগল সর্দার নিজেই গল্প করেছে সান্ত্বনার কাছে।

হোপুনের বাবার মত সান্ত্বনার একবারও মনে হয় নি, মেয়ে নিয়ে মাঝির ছেলেকে খেলাচ্ছে পাগল সর্দার। বরং মনে হয়েছে, লোকটার বুকের কোথায় যেন মস্ত ক্ষত। কিন্তু বিয়ে যখন দেবেই ঠিক করেছে দিচ্ছে না কেন? যে দজ্জাল মেয়ে ওর। হেসেই ফেলল সান্ত্বনা। পাজী হতচ্ছাড়ী মেয়ে।

বাড়ি ফিরে সান্ত্বনা দেখে নরেনবাবু বসে আছে বাবার কাছে। অপ্রত্যাশিত নয়। আসতে আসতে ভাবছিলও।

মড়াইয়ে নেমে অনেকদিন পরে আবার সেই পুরানো দিকেই পা বাড়ালো সান্ত্বনা। যন্ত্র-সমাবেশের দিকে নয়। ওর মনোযন্ত্রেরও নতুন কিছুর আমদানি ঘটেছে। তাই চোখ যেদিকে টানছে সেদিকে না গিয়ে মন যেদিকে টানছে সেদিকে এগলো।

দূরে এক জায়গায় হোপুন কাজ করছে। কিন্তু ওর দলের মধ্যে চাঁদমণি নেই। নিজের অজ্ঞাতে সান্ত্বনার দুই চোখ চারিদিকে ঘুরল একপ্রস্থ। হয়তো তার বাবার সঙ্গে আছে, হয়তো বা আর কারো দলে গিয়ে ভিড়েছে। কেন জানি ভালো লাগল না সান্ত্বনার। ঠিক এমনটি প্রত্যাশা করে আসে নি। ওই হোপুন লোকটার দিকেই চোখ গেল আবার। দুই হাতের কোদাল উঠছে মাথার ওপর। লৌহখণ্ডের ধারালো দিকটা সূর্যছটায় ঝকমকিয়ে উঠছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চকচক করছে ঘামে ভেজা কালো দেহের পেশল রেখাগুলি। তেমনি ঋজু, কঠিন। আর তেমনই নির্বিকার, নিরাসক্ত।

কে বলবে, বিগত প্রদোষের অতনু-নির্জনে এই সেই ধরা-পড়া বিড়ম্বিত মূর্তি।

সান্ত্বনাকে সেও দেখল, কিংবা দেখেও দেখল না...।

অনেক দূরে ঘড়ঘড় ঝমর ঝমর শব্দ হচ্ছে একটা। চার্নিং মেসিন চলেছে। সান্ত্বনা এগলো। মাটি থেকে ক্রমশ ওই ওপরে উঠে গেছে চার-পাঁচতলা সমান উঁচু কনভেয়ার। আগাগোড়া এক হাত প্রমাণ চওড়া পুরু চামড়ার বেল্ট ফিট করা। অনবরত

ঘুরছে। এ মাথা থেকে বেল্ট-এর ওপর পাথরকুঁচি ঠেলে দাও। সড়সড় করে ওপরে চলল। ওপরে ঘূর্ণ্যমান এক বিশাল ইস্পাতের চৌবাচ্ছায় কংক্রীট মিক্‌শ্চার তৈরির ব্যবস্থা। চার্নিং হয়ে গেলে সেটা ক্রেনে করে ঢেলে দিয়ে এসো অতিকায় বাল্‌তির আকারের লোহার 'বাকেট'-এ। এদিক থেকে দেখলে মনে হয়, বেল্টের ওপর দিয়ে মাটি থেকে পাঁচতলা উঁচু একসারি পাথরকুঁচির অবিরাম শোভাযাত্রা চলেছে। মইয়ের মত একটা খাড়া সিঁড়ি দিয়ে সেখানে ওঠা যায়, কিন্তু একটা পা ফসকালেই সব শেষ। আর ওঠা যায় ক্রেনের সঙ্গে 'কেজ্‌' ফিট করে। কর্মচারীরা সচরাচর কেজ্‌-এ করেই ওঠে। সান্ত্বনার ভিতরটা উসখুস করে সেখানে উঠে সব দেখার আগ্রহে। ওই মইয়ের মত খাড়া সিঁড়ি বেয়েই অনায়াসে উঠতে পারে সে। লোকজন হাঁ হাঁ করে উঠবে তাহলে। কিন্তু সুযোগ সুবিধে পেলে ওখানে একদিন উঠবেই ও। ঠিক উঠবে।

নমস্কার !

এত কাছে, সান্ত্বনা চমকে উঠল প্রায়। নীল চশমা, হীরের আংটি, খাকী ট্রাউজার, সিল্কের বুশ শার্ট।

ঘোষ-চাকলাদারের রণবীর ঘোষ।

প্রত্যাভিবাদন। প্রথম সাক্ষাতের সেই আড়ষ্ট সঙ্কোচ ভোলে নি সান্ত্বনা। যেমন ওর বুদ্ধি। আজ তো মুখের দিকে এক নজর চেয়েই বুঝেছে কম করে বছর চল্লিশ বয়স হবে ভদ্রলোকের। হেসে বাক্যালাপ শুরু করে দিল সান্ত্বনা।—এদিকটায় বুঝি আপনার কাজকর্ম ?

হ্যাঁ, আজ একেবারে আমার রাজত্বে এসে পড়েছেন।

আগেও এসেছি। উঁচু সেই ঘরের মত এলিভেটারের দিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ওখানটায় ওঠা যায় না ?

কেন যাবে না, ওই তো উঠছে ওরা। আপনাকে কেজ্‌-এ করে একদিন তুলব'খন।...আপনি আমার গোডাউনও দেখেন নি বোধ হয় ?

না তো, কোথায় সেটা ?

মাইল দুই হবে এখান থেকে। জিপে যেতে হবে, চলুন একদিন—মস্ত মস্ত সিমেন্ট আর বালুর পাহাড় দেখতে পাবেন।

সান্ত্বনা সাগ্রহে রাজী। কবে নিয়ে যাবেন ?

যেদিন খুশি, আজই চলুন না।

দু'দশ পা এগিয়েছে। মনে মনে সান্ত্বনা জল্পনা করে নিচ্ছে আজ যাওয়া চলে কিনা। কাছেই একটা এবড়োখেবড়ো নিচু জায়গার ওপর চোখ পড়ল। আরো এগোল খানিকটা। ছোট একটা পাম্প বসিয়ে জল ছেঁচছে জনা-দুই লোক। আর ঝুড়িতে পাথরের নুড়ি বোঝাই করে করে দূরে ফেলে দিয়ে আসছে পনের বিশটি মেয়ে। এদের কারোরই বয়স বেশি নয়। এখানে চাঁদমণিকেও দেখা গেল।

পাশ থেকে রণবীর ঘোষ জানালো কাটাকুটিতে জল উঠছে, ওখান থেকে পাথর না সরালে হাত-পা ভাঙ্গার ভয় আছে বলে মেয়েগুলোকে এ কাজে লাগিয়ে দেওয়া

হয়েছে।

কানে গেল না সান্ত্বনার। ঝুড়ি হাতে চাঁদমণি নিষ্পলক চেয়ে আছে এদিকেই। তার কালো চোখে যেন সাদা আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

তদারককরত কুলিবাবু তাড়া দিল, দাড়িন পড়লি কেনে, গপাগপ তুলে লে।

চাঁদমণি ঝাঁজিয়ে উঠল তাকেই, ধমকাইছিস কিসের লেগে, হাকোপাকো (মুহূর্ত) বিরাম লিব নাই?

এক পাও নড়ল না। জ্বলন্ত দুই চোখ এদিকেই নিক্ষিপ্ত হ'ল আবার। চলতে চলতে পিছন ফিরে তাকালো সান্ত্বনা। চাঁদমণি দাঁড়িয়েই আছে। সান্ত্বনা অবাক। কাল কি দেখেছিল আজ কি দেখছে। কাল বরং রাগতে পারত। উল্টে হাসির বন্যায় নাকানি-চোবানি খাইয়েছে ওকে। কিন্তু আজ কি হ'ল—?

যাবেন নাকি আজ গোডাউন দেখতে?

অ্যাঁ। আত্মস্থ হয়ে সান্ত্বনা তাকালো তার দিকে। অভ্যস্ত অন্ধকারে হঠাৎ একটা জোরালো আলো জ্বলে উঠলে যেমন হয়, চোখে চোখ পড়তে তেমনি একটি ধাক্কা খেল সান্ত্বনা।

নীল চশমাটা রণবীর ঘোষের হাতে। চেয়ে আছে। চেয়েই ছিল। সান্ত্বনা লক্ষ্য করে নি এতক্ষণ। চাউনি নয়, অজ্ঞাত একটা নগ্নতার স্পর্শ লাগল যেন ওর চোখে মুখে সর্বাংগে। দৃষ্টি নয়, লেহন।

না আজ না, আর একদিন যাব'খন। সবলে সেই পিচ্ছিল দৃষ্টিরজ্জু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল সান্ত্বনা। পাশাপাশি ব্যবধান বাড়ল।

আজ কাজ আছে বুঝি?

বাবার শরীর খারাপ—বাড়ি যেতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে তিনি অসুস্থ। অন্তরঙ্গ দুশ্চিন্তা রণবীর ঘোষের, তিনি সেরে ওঠেন নি এখনো?

উঠেছেন—

আচ্ছা, আজ থাক তাহলে, তাড়া কি। চলুন, আমারও ওদিকেই কাজ আছে একটু।

দৃষ্টি বিনিময় ঘটল আবারও। ঘটবে জেনেও না তাকিয়ে পারল না সান্ত্বনা। অসহায় বোধ করছে কেমন। দিন দুপুর। এত বড় মড়াইয়ে এত লোক কাজ করছে। তবু—। পুরুষের চোখে কামনার দাহ এ বয়স পর্যন্ত একেবারে দেখে নি এমন নয়। কিন্তু এ সেরকম নয়। অস্বস্তিকর সিক্ত অনুভূতি একটা। না তাকিয়েও তার চাউনিটা যেন উপলব্ধি করছে সান্ত্বনা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ওকে। খুঁটিয়ে আস্বাদন করার মত। যেটুকু বস্ত্র গায়ে জড়িয়েছে এ দৃষ্টির সামনে সেটুকু যেন যথেষ্ট নয়।

বাঁচা গেল।

ওই অদূরে পাগল সর্দার দাঁড়িয়ে। একলা নয়, দলের সঙ্গে। সান্ত্বনাকে দেখেছে। দেখে হাতের কাজ থামিয়ে এদিকে চেয়ে আছে। অবশ ভাবটা নিমেষে কেটে গেল সান্ত্বনার।

আপনি যান, আমি একটু পরে যাব।

হন হন্ন করে একেবারে সর্দারের কাছে গিয়ে থামল সে। হাঁফ ধরে গেছে। ভিতরে ভিতরে ঘেমেও গেছে।

কিন্তু সর্দারের দিকে চেয়ে বিব্রত বোধ করছে আবার। নিরক্ষর বৃদ্ধের একজোড়া সন্ধানী প্রাজ্ঞ চোখ বারকতক যেন শিথিল ভাবে বিচরণ করে ফিরল ওর মুখের ওপর। তারপর, অদূরে রণবীর ঘোষ যেখানে দাঁড়িয়ে এখনো, সেইদিকে। তার নীল চশমা চোখে উঠেছে।

সান্ত্বনা বিমূঢ় আবারও। দৃষ্টি নয়, অকস্মাৎ যেন ছোট দুটো কয়লার টুকরো ধক্‌ধকিয়ে উঠেছে পাগল সর্দারের চোখের কোটরে। ধীরেসুস্থে আবার চলতে শুরু করেছে রণবীর ঘোষ। পাগল সর্দার চেয়েই আছে।

ফিরে তাকালো খানিক বাদে। ঠাণ্ডা হয়েছে। স্নেহসিক্তও যেন। সামনের ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে বলল, টুকচি বসে লিই—।

দু'জনেই এসে বসল মাটির ওপর। সর্দার জিজ্ঞাসা করল, উবাসীর বাবুর শরীল আরাম হ'চ্ছে ;

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল, হয়েছে।

তু ইদিকে কোথা যেয়েছিলি ?

কোথাও না, এমনি ঘুরছিলাম।

একটু থেমে সর্দার জিজ্ঞাসা করল, উ কন্‌টাটর বাবুর সঙতে ?

চকিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা জবাব দিল, না, ওখানে দেখা হ'ল।

তু আমার থানে ছুটটে আসলি কিসের লেগে, উ কি বুলল বটটে ?

আবার তাকালো সান্ত্বনা।—ছুটে আবার কোথায় এলাম ? তোমাকে দেখেই তো এলাম। কি ভেবে পরের প্রশ্নটার জবাব দিল।—উনি বলছিলেন আমাকে একদিন তাঁর গোডাউন দেখাতে নিয়ে যাবেন।

চুপচাপ কিছুক্ষণ।—তু যাস না দিদিয়া, আমি একটো দিন তুকে সেটো দেখিয়ে লিয়ে আসব...।

যাবে না তো বটেই। কিন্তু সান্ত্বনা উন্মুখ আরো কিছু শোনার জন্য।

রেখে ঢেকে কথা বলতে জানে না ওরা। নিজে থেকেই সর্দার জানালো অনেক কথা।—খুব 'ভদ্দ মুনিষ' নয় ওই বাবুটি, 'চি-লোকের' মান মর্যাদা রাখতে জানে না—ফাঁক পেলেই সোমত্ত মেয়েগুলোকে বিগড়ে দেয়—এই নিয়ে খুব গণ্ডগোলও পাকিয়ে উঠেছিল একবার, ইত্যাদি—।

সান্ত্বনার লজ্জা গেছে। উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, ওর নামে মুরুব্বীদের কাছে নালিশ করো না কেন তোমরা ?

পাগল সর্দার সখেদে জানায়, তাও করা হয়েছিল, কিন্তু মুরুব্বীদের কাছে ও অন্যায় অন্যায় নয়, বড় সাহেব শুধু কাজই বোঝে, মেয়েদের দাম বোঝে না।

বড় সাহেব অর্থাৎ চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সর্দারের ক্ষোভ সান্ত্বনাকে স্পর্শ করল

যেন। গা-ঝাড়া দিয়ে সর্দার তার বক্তব্যটুকুই ফিরে বলল আবার।—উনি সঙুতে তু যাস-না দিদিয়া, বোঝলি?

মুখ ফুটে সান্ত্বনা বলতে পারল না কিছু। কিন্তু মাথা নেড়ে সায় দিল তৎক্ষণাৎ। বুঝেছে, যাবে না—।

মড়াইয়ের গহ্বর থেকে ওপরে পা দিয়েই সান্ত্বনা আড়ষ্ট হয়ে গেল আবারও। জায়গাটা এমন নয় যে কাউকে পরিহার করে চলতে চাইলেই চলা যায়। পাঁচটা পথ নেই আনাগোনা চলাফেরার।

অদূরে রণবীর ঘোষ দাঁড়িয়ে কথা বলছে কার সঙ্গে।

সান্ত্বনা ধরে নিল লোকটা ইচ্ছে করে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে। এতেই কাজ হ'ল। আড়ষ্টতা গেল। দ্বিতীয় পথ নেই যখন, পাশ কাটাতে হবে। ভয়টা কিসের!

এবারও সহাস্যেই আপ্যায়ন করল রণবীর ঘোষ।—এই ফিরছেন নাকি?

হ্যাঁ-না সান্ত্বনা কিছুই বলল না।

আমিও আটকে গেলাম, চলুন। এক মিনিট, এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয় নি, আমার পার্টনার দ্বিজেন চাকলাদার।

সান্ত্বনা দেখল। চিনল। জিপের সেই দ্বিতীয় লোকটি, যে তাকে সামনের আসন ছেড়ে দিয়ে পিছনে গিয়ে বসেছিল। কিন্তু এদের কারো সঙ্গেই আর আলাপ করার জন্য ব্যগ্র নয় সে। প্রতি-নমস্কারে হাত তুলল কি তুলল না।

পড়ন্ত রোদে রণবীর ঘোষের নীল চশমা বুক-পকেট আশ্রয় করেছে। কলমের ক্লিপের মত তার একটা ডাঁটি পকেটের বাইরে ঝুলছে। ওভাবে তখন হঠাৎ ওই সর্দার লোকটার কাছে চলে যাওয়ায় বা এখানকার এই নির্বাক পরিবর্তনে কিছু উপলব্ধি করেছে কিনা সে-ই জানে। চোখের সেই নগ্ন দৃষ্টি গেছে। বেশ হাসিখুশি মেজাজেই সঙ্গ নিয়ে বলল, বাবার শরীর খারাপ, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবেন বলেছিলেন তখন—এই তাড়াতাড়ি?

সান্ত্বনা নিরুত্তর। কিছু বলতে পারলে বলত। একটু হাসতে পারলে হাসত অন্তত। কিন্তু কিছুই পারল না। ওদিকে দ্বিজেন চাকলাদারও নীরব। রণবীর ঘোষ বলল আবার, চলুন, ওই সামনেই জিপ রয়েছে।

সামনেই মানে বাঁকের মুখে ভুতুবাবুর দোকানের সামনেই।

মনে মনে আবারও যেন বাঁচল সান্ত্বনা। ভয় না হোক অস্বস্তি যাবে কোথায়! নারী-চেতনার অস্বস্তি। এভাবে ও-চেতনার মুখোমুখি আর বড় হয় নি কখনো। কিন্তু জবাব না দিলে নয় এবার। বেশ সহজ ভাবেই বলল, আমার যেতে ঢের দেরি এখনো, আপনারা যান।

রণবীর ঘোষ একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল ওকে। দু'চার মুহূর্তের বিশ্লেষণী দৃষ্টি।—এখানে আবার কোথায় যাবেন?

কাজ আছে। মনে মনে নিজেই বিস্মিত হ'ল সান্ত্বনা। হাসতেও পারল যতটুকু হাসা দরকার।

দোকানের বাইরে দাঁড়িয়েছিল ভুতুবাবু। তার স্থির চোখ দু'টো আরো বেশি গোল দেখাচ্ছে। চেয়েছিল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে। এদের সঙ্গে দেখবে সান্ত্বনাকে ভাবে নি যেন। আরো কাছাকাছি হতে এদেরও চোখে চোখ পড়ল বোধ হয়। তাড়াতাড়ি আড়ালে চলে গেল ভুতুবাবু।

তারা জিপের দিকে এগোতে সান্ত্বনা ঘুরে দাঁড়াল। রণবীর ঘোষও থেমে গেল। ও, এইখানে আপনার কাজ বুঝি?

ঘাড় নেড়ে, সান্ত্বনা রাস্তা পার হয়ে ভুতুবাবুর দোকানের দিকে চলল। খুব নিশ্চিন্ত নয় এখনো। ভুতুবাবুর দোকান সকলেরই জন্য খোলা। আড়াল হলেও ভুতুবাবু লক্ষ্য করছিল ঠিকই। থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল। মা-লক্ষ্মী! আসুন, আসুন—

ভিতরের দিকে কোণের একটা বেঞ্চ-এ ধুপ করে বসে পড়ল সান্ত্বনা।—কই, চা দিতে বলুন।

বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! সাবান দিয়ে তাড়াতাড়ি ভুতুবাবু নিজেই একটা গেলাস পরিষ্কার করতে বসে গেল।

আড়চোখে সান্ত্বনা দূরে শালগাছের নিচে জিপটাকে দেখছে। উৎকর্ণ।—স্টার্ট শোনা গেল। জিপ চড়াই ভেঙে চলল।

নিশ্চিন্ত। ফিরে দেখে চা তৈরি শেষ ভুতুবাবুর। হেসে বলল, পয়সা নেই কিন্তু সঙ্গে, কাল এনে দেব।

পানখাওয়া পুরু কালো জিভ বার করে মাথা ঝাঁকালো ভুতুবাবু। সান্ত্বনার কথাগুলি ঝেঁকেই কান থেকে বার করে দিল যেন। চায়ের গেলাস তার সামনে রেখে বলল, আপনাদের চাট্টি খেয়ে-পরেই বেঁচে আছি মা-লক্ষ্মী, তা'বলে এ রকম বললে ভুতু ছেড়ে ভূতেও লজ্জা পাবে—।

নরেনবাবু শুনলে বলতো 'ঘুঘু'। কিন্তু এর মুখে মা-লক্ষ্মীটুকু শুনতে বেশ লাগে। আজ এই মুহূর্তে তো রীতিমত আপন জন মনে হচ্ছিল সান্ত্বনার। চায়ের প্রয়োজন ফুরোলেও গেলাসটা সাগ্রহেই টেনে নিল।

দ্বিধা কাটিয়ে ভুতুবাবুই প্রশ্ন করল প্রথম।—এনাদের সঙ্গে বুঝি আলাপ-পরিচয় আছে মা-লক্ষ্মীর?

কাদের সঙ্গে? চায়ের রূপ নিরীক্ষণ করছে সান্ত্বনা।

এই ঘোষবাবু আর চাকলাদারবাবুর কথা বলছিলাম, একসঙ্গে আসছিলেন মনে হ'ল—

একটু-আধটু। দু'চার চুমুকে গলা ভিজল। আপনিও চেনেন বুঝি ওঁদের?

বিলক্ষণ! ভুতু আর কাকে না চেনে এখানে? আর ওঁদের তো—থেমে গেল—তা বেশ লোক, লাখো লাখো টাকা কামাচ্ছেন, খরচেও অকেপণ—বিশেষ করে ওই ঘোষবাবুটি যাকে বলে দিলদার মানুষ।

শুনলে নরেনবাবু যা বলত ভেবে এখন একটু খটকা লাগছে। দূর থেকে ওই দু'জনের সঙ্গে ওকে দেখে লোকটার সেই নিষ্পলক বিস্ময় ভোলে নি সান্ত্বনা। তার আড়াল হওয়াটুকুও নয়। চা নিঃশেষ হ'ল। যে প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলার কথা সেদিকেই

ঝুঁকল সান্ত্বনা। উনুনের ছাই খুঁচিয়ে আঁচ তোলার মতই ফস্ করে ভুতুবাবুকেও একপ্রস্থ খুঁচিয়ে দিল যেন।—কিন্তু আপনাদের পাগল সর্দারের মুখে তো শুনলাম ওই ঘোষবাবুটি মোটেই ভালো লোক নন!

নড়েচড়ে কিছুটা টান হয়ে বসল গোলগাল ভুতুবাবু। আল্‌গা স্তুতির ছাই কিছু ঝরেও পড়ল নিজের অগোচরে। গলা নামিয়ে সাগ্রহে বলল, বলেছে বুঝি? কবে? আজ? তার পরেও আপনি—ব্যাপারটা কি জানেন, অঢেল পয়সাওলা লোকের একটু-আধটু যেমন হয়ে—

কি বলবে আর কি বলবে না ঠিক না পেয়ে হাঁসফাঁস করে থেমেই গেল। থেমে গিয়ে মনে হ'ল, যেটুকু বলেছে বলা উচিত হয় নি। মেয়েটাকে বেশ হাসিমুখে এদের সঙ্গে আসতে দেখেছিল—কোন্ কথা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ঠিক কি! গলা চড়িয়ে দিল।—তা ও ব্যাটারা তো বলবেই, নিজের ঘর সামলাতে পারিস না, যত দোষ বাইরের লোকের! নিন্দে করিস, দুধের মেয়ে রেখে সেই কোন্ যুগে তোর নিজের বউ পালায় নি ঘর ছেড়ে? আর তোর মেয়েটাই বা কি, একসঙ্গে দশটা লোকের মুণ্ডু চট্‌কে বেড়াচ্ছে—সেবারে বাপের হাতে হাড়ভাঙা পিটুনি খেয়ে ঢিট হয়েছে, নইলে ওই বাহাদুর জমাদারটার সঙ্গেই তো প্রায়, যাক্‌গে—

পাগল সর্দারের জীবনে গভীর অঘটন কিছু আঁচ করেছিল সান্ত্বনা। কিন্তু বাহাদুর সংশ্লিষ্ট চাঁদমণির প্রসঙ্গটা প্রচণ্ড বিস্ময়। স্থান কাল ভুলে হাঁ করে চেয়ে রইল ভুতুবাবুর মুখের দিকে। লজ্জা বা সঙ্কোচের অবকাশও নেই।

ভুতুবাবু বলে গেল, ওদের পূর্বপুরুষেরা হাঁসের লোভে পায়রার লোভে খেলনাপাতির লোভে ঘর বাড়ি বিকিয়েছে জাত কে জাত—সেপাই বেয়ারা পাহারাওয়ালার সঙ্গে আজতক তিন-তিনটে মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে এই দেড় বছরের মধ্যেই। সেই মেয়েগুলো ঠিক ওদের জাতের নয় অবশ্য, কতই তো আছে এখানে—রঙচঙে শাড়ি আর ঠুনকো গয়না পেলে দু'চারখানা, অমনি চলল ঘর-বাড়ি ছেড়ে। আর পেত্যেক বারই পেথমে দোষ চাপাবে বাবুদের ঘাড়ে—যেন ওই কত্তেই আছে বাবুরা! গেল বার এই নিয়ে গোল পাকিয়ে উঠতে বড় সাহেব কশে ধমকে দিয়েছে সক্কলকে—সমঝে চলতে না পারলে মেয়েদের ঘরে আটকে রেখে দাও গে যাও, কাজ করতে হবে না—বড় সাহেবের কাছে ও সব মেয়েটেয়ের কোন খাতির নেই, বুঝলেন?

তড়বড় করে এতগুলো কথা বলেও ভুতুবাবু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারত না বোধ হয়। সান্ত্বনার নির্বাক মুখের ওপর দুই গোল চক্ষু সংবদ্ধ হ'ল আবার—এই ভুতু কারো নিন্দের মধ্যে নেই, বুঝলেন? নিজেরা সামলে-সুমলে থাক না যে ভাবে খুশি, কে তোদের বারণ করেছে—মিথ্যে নিন্দে কত্তে যাস কেন—যা বলব হক্ কথা বলব, নিন্দে কেন করব, কি বলেন মা-লক্ষ্মী? এই এতগুলো কথা হ'ল, একটা নিন্দের কথা কারো নামে বলেছি—আপনিই বলুন?

এত কথার সার কথাটা এতক্ষণে স্পষ্ট হ'ল। সান্ত্বনা মাথা নেড়ে নীরবে আশ্বাস দিল তাকে, নিন্দে কারো করা হয় নি বটে। কিন্তু ভালও লাগছে না আর। উঠে

পড়ল। নিশ্চিন্তে এবার বাড়ি ফেরা যাবে বোধ হয়।

চড়াইয়ের মাঝামাঝি এসে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে অতল মড়াইয়ের দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। দূরে দূরে ওই মানুষেরা কাজ করছে। আর ওদের মেয়েরা। এত উঁচু থেকে মেয়ে-পুরুষের তফাত বোঝা যায় না খুব। পাগল সদারের ক্ষোভটুকু সান্ত্বনার মন থেকে মোছে নি তখনো। ভুতুবাবুর মুখে বড় সাহেবের অনুশাসনের কথা শুনে বরং বেড়েছে আরো। নিবিড় মমতায় সেই দূরের দিকে দৃষ্টি পড়ে রইল। —ওই মানুষদের রীতি আলাদা। নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করে। ঘরেবাইরে, পাশাপাশি, কাছাকাছি। ওদের এই আনন্দ, এই বিনিময়টুকু বিশেষ করে স্পর্শ করে তাকে। লোভের বিষ ছড়িয়ে কলুষিত করা যেমন জঘন্য অপরাধ, নিস্পৃহ অনুশাসনের ভ্রূকুটিতে তাকে ব্যাহত করাও তার থেকে কম নিষ্ঠুরতা নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্তত সেই রকমই মনে হ'ল সান্ত্বনার।

॥ ৬ ॥

ছুটিব দিন নয়। তবু মস্ত একটা মাছ এনে হাজির নরেন চৌধুরী। এই বেখাপ্পা জায়গায় টাটকা মাছ কমই জোটে। রেফ্রিজারেটারের কল্যাণে একবারের চালান পাঁচ-সাত দিন চালায় এখানকার মাছের কারবারী। তাই সামনা-সামনি লোভনীয় কিছু পেয়ে গেলে ছুটিব দিন হোক আর যেদিন হোক নরেন চৌধুরীর পক্ষে লোভ সামলানো দায়।

নতুন নয়। এ রকম আরো হয়েছে। সান্ত্বনা খুব একপ্রস্থ বকাবকা করে দাওয়ায় বসে সেই মাছ কোটা প্রায় শেষ করে এনেছে। অবনীবাবু সকালের আপিসে বেরুবার উদ্যোগ করছিলেন। তাঁর সঙ্গে আপিস সংক্রান্ত কিছু দরকারী কথাবার্তা সেরে ফিরে এসে নরেন বলল, যাক, তোমার পিতৃদেবকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া গেল, এখন বাবা নিশ্চিন্দি।

আপনার ইস্কুল নেই?

হতাশ নেত্রে তার দিকে চেয়ে থেকে নরেন বলল, এট্ ট্যু ব্রুটাস! তোমার বাবাকে বলে দিলাম একটু বাদে যাব—এই মাছ রেখে এক্ষুনি যাই কি করে বলো।

আ-হা, তা তো বটেই। চুপটি করে এবার ওই মোড়ায় বসে থাকুন, আমায় কাজ করতে দিন, নয়তো আপনার মাছ আবার জলে গিয়ে সাঁতার কাটবে।

হৃষ্টচিত্তে মোড়ায় আসন পরিগ্রহ করল নরেন চৌধুরী।—বেশ। কিন্তু আমি তা হলে মুখ বুজে বসে এখন কি করব?

কান কুড়কুড় করুন।

মস্ত এক সমস্যার সমাধান হ'ল যেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে নরেন হাতীর দাঁতের কানকাঠি বার করল। তারপর সন্তর্পণে সেটা কর্ণপটহে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গোটাকতক সেই অদ্ভুত শব্দ বার করল গলা দিয়ে। হাসতে হাসতে সান্ত্বনা বঁটির ওপরেই পড়ে আর কি। কি বিচ্ছিরি স্বভাব, মা গো!

এই! এই মেয়ে! কেটে এক্ষুনি রক্তগঙ্গা হবে যে! থাক বাবা, এই আমি রেখে

দিচ্ছি কানকাঠি। সাধে কি সবাই ছেলেমানুষ বলে।

চক্ষু-কোপে সান্ত্বনা তাকালো তার দিকে, কে বলে?

ওই ওরা—

কারা?

ওই ড্যাম কলোনাতে যারা কাজ করে, যারা মাট কাটছে, যারা ইট চুন সুরকি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তারা—তাদের সবাই বেশি আর কিনা তোমার।

মিথ্যাবাদী। আবার মাছ কাটায় মন দিল সান্ত্বনা।

নরেন দেখছে—সেদিনের মত সে মাছ হবে তো?

হুঁ।

আর মাছের পোলাও?

হবে।

আর মাছের চপ?

হবে হবে হবে—বাবা রে বাবা, একেবারে পেটুকরাম গোস্বামী। নামকরণের ফুর্তিতে নিজেই হেসে উঠল খিলখিল করে।

হাসির ধার দিয়েও গেল না নরেন। গম্ভীর মুখে প্রস্তাব করল, একটা ছুতোনাতায় আজ তাহলে আপিসটা কামাই করে দিই, কি বলো

তা হলে কিচ্ছু হবে না। সেবারের মত ঠিক একটায় গাছতলায় বসে লাঞ্চ খাবেন।

কিন্তু নরেন চৌধুরীর এই অবসর-বিনোদনের আনন্দে ছেদ পড়ল একটু পরেই। কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল বাইরে।

সান্ত্বনা উঠে দেখতে গেল।

ভৃত্যশ্রেণীর একজন লোক দাঁড়িয়ে। সান্ত্বনা চেনে তাকে। অনেকদিন তার পিছনে পিছনে অথবা আগে আগে টিফিন-ক্যারিয়ার করে মনিবের খাবার নিয়ে নামতে দেখেছে। লোকটার ভাবভঙ্গী চালচলনে একটা গুরুগম্ভীর আত্মমর্যাদার ভাব দেখে ডেকে আলাপ করে নি কখনো। সকৌতুকে নিরীক্ষণ করেছে শুধু। বড় সাহেব অর্থাৎ চিফ ইঞ্জিনিয়ারের খাস চাকর নিধুরাম। নরেনের মুখে গল্প শুনেছে সান্ত্বনা। বহুকাল ধরে আছে এবং প্রভুর হাবভাব চালচলন সযত্নে অনুশীলন করে আসছে।

নরেনবাবু এখানে আছেন দিদিমণি?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নিধুরাম।—সায়েবের চিরকুট নিয়ে আমি তামাম রাজ্যি উঁয়াকে খুঁজতেছি। একবার ডেকে দেন।

সান্ত্বনা হাত বাড়াল, আমায় দাও, আমি দিচ্ছি।

ফিরে এসে সেটা নরেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নিন আপনার।

কে দিলে?

ভগীরথবাবুর চাকর নিধু।

কিছু না বুঝেই নরেন চিরকুটটা নিয়ে পড়ল। ঘড় করে একটা নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস

ফেলতে গিয়ে থেমে গেল। বিস্মিত নেত্রে তাকালো, ভগীরথবাবু মানে?

নিরীহ মুখে ফিরে তাকাল সান্ত্বনা। নরেন চৌধুরী হা হা করে হেসে উঠল।—তোমার সাহস তো কম নয়। বিলেত জার্মান ফেরত চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে সেদিন ওই কাণ্ড করলে, আজ আবার তাকে বলছ ভগীরথবাবু।

সেদিনও বলেছিলাম। সান্ত্বনা হেসে ফেলল, আমার কি দোষ, আমি কি গুনে জানব উনি বড় সাহেব—কোট-প্যান্টের যা ছিরি, ওঁর থেকে আপনাকেই অনেক বড় সাহেব মনে হয়।

ঠাট্টা হচ্ছে। কিন্তু সেদিনের কথাবার্তায় তো মনে হ'ল বড় সাহেব ওই রকম বলেই বেশি পছন্দ তোমার।

সান্ত্বনাও ছাড়বার পাত্রী নয়। স্বীকার করে নিল, পছন্দই তো। সুন্দরীর জন্য ওঁকেই রাখব ভাবছি, এ ছোঁড়াটা বেজায় ফাঁকি দেয়। হাত অবশ্য কাঁচা, তা হলেও গায়ে জোর-টোর আছে, পারবে'খন।

যাকে নিয়ে এই হাসি-ঠাট্টা, তার চিরকুটের তাগিদটুকু তা বলে ভোলা চলে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নরেন চৌধুরীকে উঠতে হ'ল।—যাই বাবা, এক্ষুনি হয়তো আবার দ্বিতীয় দফা পেয়াদা এসে হাজির হবে।

সান্ত্বনা হালকা নিঃশ্বাস ফেলল একটা। এই মানুষটির আচরণে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখে নি কখনো। ভালো লাগতো। এখনো লাগে। কিন্তু কোথায় যেন তফাত একটু। এতক্ষণ তার এই বসে থাকাটা শুধু মাছের আকর্ষণে কি না আগে একবারও মনে হ'ত না। কিন্তু এখন হয়। তফাত এখানেই। সব-প্রথম মাসি ওকে সমঝে দিয়ে গেছে। তারপর চাঁদমণি আর হোপুনের নিভৃত বিনোদনের ছাপটা চেষ্টা করেও তাড়াতে পারে নি মন থেকে। আর নিজের সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি ওকে সচেতন করেছে মড়াইয়ের বুকে কণ্ট্রাক্টর রণবীর ঘোষের সেই নগ্ন দৃষ্টিলেহন। সব মিলিয়ে সান্ত্বনার ভিতরে ভিতরে পরিবর্তন হয়েছে একটু। এই পরিবর্তনের উপলব্ধিটুকুই অস্বস্তির কারণ।

একটা বাজার কিছুক্ষণ আগে সান্ত্বনা দুই হাতে টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কাঁধেও একটা থলে ঝুলছে। মেন কোয়ার্টারস্ ছাড়িয়ে একটু নেমে আসতেই হঠাৎ চোখে পড়ল অদূরে টিফিন ক্যারিয়ার হাতে আর একটি লোকও হেলেদুলে চলেছে। নিধুরাম।—ডাকল, ও নিধু, বাবুর খাবার নিয়ে যাচ্ছ?

ডাক শুনে নিধুরাম দাঁড়িয়ে পড়ল। সান্ত্বনা কাছে আসতে একগাল হেসে জবাব দিল, হ্যাঁ গো দিদিমণি, তুমিও খাবার নিয়ে যাচ্ছ?

যেন একই কাজ দু'জনার। খুশি মুখে সান্ত্বনা বলল, হ্যাঁ, বাবার আর নরেনবাবুর। ভালোই হল, চলো তোমার সঙ্গে যাই।

অত বড় বড় দুটো টিফিন-কার নিয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে না? একটা বরং আমায় দাও—

সান্ত্বনা জবাব দিল, কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না, নামার সময় ভারী হলেও টের পাওয়া যায় না।

দু পা এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবুর রান্না তুমিই কর বুঝি?

নিধু সগর্বে জবাব দিল, শুধু রান্না ! সব কাজেই এই নিধুরাম—নিধু ছাড়া বাবু অচল।

কি ভাবল সান্ত্বনা। নিছক মেয়েলী কৌতূহল। আগেও হয়েছে। কিন্তু আগে সুযোগ মেলেনি। পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ে বলল, এখানে বসি দু মিনিট, একেবারে অত হাঁটতে পারিনে। আচ্ছা দেখি নিধু কি রাঁধলে তুমি—।

জবাবের প্রতীক্ষা না করে হাত থেকে টিফিন ক্যারিয়ার টেনে নিল। ক্যারিয়ারের হ্যাণ্ডেলে একটা তোয়ালে জড়ানো। খুলে যা দেখল, সান্ত্বনার চক্ষু স্থির।

ভাত যে ঠাণ্ডা কড়কড়ে হয়ে আছে নিধু।

বাবুর ওই রকমই খাওয়া অব্যেস, আমি গরম ভাত ছাড়া খেতে পারিনে।

বাটি তুলে সান্ত্বনা দেখছে। এক বাটিতে একটু তরকারি, পরের বাটিতে একটু মাছ। দেখে মুখে কুঞ্চন-রেখা পড়ল গোটাকতক। নিধু বলল, তলার বাটিতে বিলিতি বেগুনের চাটনিও আছে।

এই দিয়ে খাবেন তোমার বাবু ?

আত্মপ্রত্যয়ে মাথা দুলিয়ে হাস্যবদন নিধুরাম বলল, হ্যাঁ, একেবারে তৃপ্ত হয়ে খাবেন। আমার বাবু বড় ভালো গো দিদিমণি—যা রেঁধে দিই মুখটি বুজে খেয়ে নেন।

খাসা। সান্ত্বনা হঠাৎ রেগেই গেল যেন। কিন্তু নিধুর কাছে সেটা প্রকাশ পেল না। বাটিগুলো আবার গুছিয়ে টিফিন ক্যারিয়ার বন্ধ করল সান্ত্বনা। এক মুহূর্ত ভেবে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, ওই শালতলা থেকে দুটো পাতা কুড়িয়ে আনো তো, হাতে লেগে গেছে।

নিধু বলল, এই তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেল না।

আঃ, যা বলছি শোন না, ওই তো কত পাতা পড়ে আছে।

থতমত খেয়ে নিধু তাড়াতাড়ি পাতা আনতে গেল। ফিরে এসে দেখে দু হাতে দুই টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে। বলল, থাকগে দরকার নেই, মুছে নিয়েছি।

পাতা ফেলে তোয়ালে জড়ানো টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে নিধুরামও অগ্রসর হ'ল। কিন্তু সান্ত্বনা থামল পরক্ষণেই।—তুমি যাও নিধু, আমার একটা জিনিস আনতে ভুল হয়ে গেছে, চট করে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

হন হন করে সে ফিরে চলল আবার।

হতভম্বের মত নিধুরাম দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। খেয়াল করলে তফাত কিছু খেয়াল হবারই কথা। কিন্তু এই মর্মগ্রাহী যোগাযোগ এবং নারী-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তার কথা ভাবতে ভাবতেই নিধু গন্তব্যপথে অবতরণ করতে লাগল।

আর, সেটুকু যথাযথ উপলব্ধি করল যখন, দুই চক্ষু স্থির একেবারে।

আপিস ঘরে বসেই মধ্যাহ্নের আহারপর্ব সমাধা করে থাকে বাদল গাঙ্গুলি। টিফিন ক্যারিয়ার থেকে একে একে আহার্য সামগ্রী নামাচ্ছে আর অবাক হচ্ছে। আর ততোধিক বিস্ফারিত হয়ে উঠছে অদূরে দণ্ডায়মান নিধুরাম।

কি রে, করেছিস কি এসব—এ আবার তুই কবে রাঁধতে শিখলি ?

টেবিলের ওপর তোয়ালের পাশে টিফিন ক্যারিয়ারের হ্যাণ্ডেলের দিকে তাকালো

নিধুরাম। অবাক বিস্ময়ে দেখল তোয়ালেটা তাদের বটে, কিন্তু টিফিন ক্যারিয়ারটা তাদের নয়। আহাররত মনিবের দিকে তাকালো। কি বলতে গিয়েও ভোজ্য পদার্থের দিকে চেয়ে রসনা সিক্ত হয়ে ওঠায় আর বলা হ'ল না। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল শুধু।

খেতে খেতে বাদল গাঙ্গুলি বলল, এমন যদি রাঁধতে পারিস হাঁদারাম, বারোমাস ওই একঘেয়ে ছাইভস্ম খাওয়াস কেন শুনি?

ঢোঁক গিলে নিধুরাম হাসতে চেষ্ট করল শুধু। চোখের দৃষ্টি মাছ আর পোলাওয়ের ওপরেই আটকে আছে। বাবুর খাওয়ার নমুনা দেখে কিছুমাত্র আশা আছে বলে মনে হ'ল না। বাটির শেষ মাছের টুকরোটাও প্লেটে নামিয়ে নিয়েছে...।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করুণ নেত্রে আহার পর্যবেক্ষণ করতে লাগল নিধুরাম।

ওদিকে বাড়ি ফিরে আবার টিফিন ক্যারিয়ার ভরে নিয়ে আসতে আসতে ভাবছে সান্ত্বনা। কাজটা ভালো হ'ল না। ভদ্রলোক জানবেই। জানুক, কিন্তু ওই দিয়ে খায় কি করে! তবু ভালো হ'ল না কাজটা। কি ভাববে কে জানে। হয়তো হাসবে মনে মনে আর মজা করে খাবে। মেয়েদের ওপরে লোকটার বিষম অবজ্ঞা শুনেছে। একে একে তিনজনের মুখে শুনেছে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের স্ত্রী মিসেস চ্যাটার্জির চায়ের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে নরেনবাবু বলেছিল প্রথম। তারপর সেদিন মড়াইয়ে বসে পাগল সর্দার সখেদে বলেছিল। বলেছিল, বড়সাহেব শুধু কাজই বোঝে, মেয়েদের দাম বোঝে না। আর ভুতুবাবুও সেদিন বড়সাহেবের অনুশাসন প্রসঙ্গে প্রকারান্তরে সেই কথারই সমর্থন করেছে।

ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল সান্ত্বনা। আজ বিরক্তি বাড়ল আরো। যা খুশি খাক, যেমন খুশি খাক, ওর তাতে কি। কোন খোশামোদ তোষামোদের ধার ধারে না। কিন্তু লোকটা তাই ভাবছে হয়তো....।

বাবার নির্দিষ্ট শিলাসনে খাবার রেখে সান্ত্বনা বলল, নাও বাবা, তুমি বসে যাও, আমার একটু দেরি হয়ে গেল আসতে, নরেনবাবুকে আমি খুঁজে বার করে নিচ্ছি।

খিদের মুখে অবনীবাবু আর দ্বিরুক্তি করলেন না। দ্বিতীয় টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে সান্ত্বনা নরেনের আপিস ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে কেউ নেই। বেরিয়ে এলো। দালানের পিছনের গাছতলায় নরেন ধ্যানী বুদ্ধের মত বসে আছে চুপচাপ। সান্ত্বনা হেসে ফেলল।—কি, ঘুমুচ্ছিলেন নাকি?

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে নরেন জবাব দিল, খেতে দেবার লোভ দেখিয়ে এ ভাবে শাস্তি দিতে বোধ হয় মেয়েরাই পারে।

সত্যি বড় দেরি হয়ে গেল। পরিপাটি করে আহার্য গুছিয়ে দিল তার সামনে। নিন্, এবারে শুরু করুন।

নরেন বলল, আগে দেরি হ'ল কেন তাই শুনি?

নিজে দিব্যি করে খেয়ে-দেয়ে ঘুমুচ্ছিলাম বলে। আরম্ভ করুন, নয় তো সব আবার টিফিন ক্যারিয়ারে তুলে নোব এক্ষুনি।

ত্রস্তে আহারে মন দিল নরেন চৌধুরী। গো-গ্রাসে। সান্ত্বনা হাসতে লাগল।

মড়াইয়ের অন্য ধারটা দেখা যায় এখানে বসেও। লোকজন তেমন নজরে আসে না। যন্ত্রপাতি বা গঠন-সমারোহ কিছু কিছু চোখে পড়ে। একটা দুটো করে কন্‌ক্রিটের ব্লক উঠছে প্রায় পাতাল-গর্ভ থেকে। এরকম বহু ব্লক একসঙ্গে জুড়ে দিলে তবে মড়াইকে বরাবরকার মত প্রাচীন অবরোধে দ্বিখণ্ডিত করা সম্পূর্ণ হবে। সান্ত্বনার মনে পড়ল কি। সেদিন ব্যাপারটা ঠিক মত বুঝতে পারে নি। বলল, আচ্ছা, ওই ব্লকের নিচে যে লোহার ঘরের মত কি একটা তৈরি হচ্ছে, ওটা কী?

দাঁড়াও বাপু, এখন তোমার কথার জবাব দিতে গেলে আমার খাওয়া পণ্ড।

আঃ বলুন না কি ওটা—লোহার ঘরের মধ্যে একরাশ লোহালক্কড় দরজা-ঢাকা হ্যাণ্ডেল-ম্যাণ্ডেল—কি হচ্ছে ওখানে?

অটোমেটিক প্রেসার গেট হচ্ছে। বুঝলে?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল, না। কি হবে ওতে?

বরাবর জলের নিচে থাকবে, জল বাড়লে তার প্রেসারে আপনি যন্ত্রপাতি চলবে, আর কমলে আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

সান্ত্বনা উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তারপর?

তারপর পোলাওয়ের সঙ্গে কালিয়া মিশিয়ে তাতে চপ ভেঙে একেবারে উদরে চালান। আচ্ছা আমাকে এখন বকাচ্ছ কেন, দেখছ না ব্যস্ত আছি।

কিন্তু সান্ত্বনার মন তখন অন্য রাজ্যে ধাওয়া করেছে। সাগ্রহে বলল, চলুন তাহলে ওর ভিতরে একদিন গিয়ে ঘুরে আসি।

কেন?

আপনি তো বলছেন, বরাবর ওটা জলের নিচে থাকবে। কেউ জানতেও পারবে না ওখানে এ রকম একটা জিনিস আছে, আর সান্ত্বনা বলে একটা মেয়ে সেখানে ঘোরাঘুরি করত—বেশ মজা না?

বড় রকমের একটা গরাস মুখে তুলে নরেন বলল, হুঁঃ। তোমার তো সবেতেই মজা।

বাস্তবে ফিরে এলো সান্ত্বনা। তেমনি জবাব দিল, না তা কেন, যত মজা আপনার ওই পোলাও-কালিয়ার মধ্যে।

ওর এ ধরনের আগ্রহের কারণ কিছু কিছু জেনেছে নরেন চৌধুরী। কিছু একটা জিজ্ঞাসা করার জন্যই মুখ তুলল এবার। কিন্তু সান্ত্বনা কেমন যেন বিব্রত হয়ে উঠেছে হঠাৎ। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিরে তাকালো। পায়ে পায়ে এদিকে আসছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। কাছে আসতে নরেন হেসে ফেলল।—আবার তুমি এসে গেলে, নিরিবিলিতে খাচ্ছিলাম চাট্টি।

মৃদু হেসে বাদল গাঙ্গুলি দু'জনকেই নিরীক্ষণ করল একবার। পরে সান্ত্বনার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, অষ্টপ্রহর জলকীর্তন শোনেন বলছিলেন সেদিন—এঁর কাছে শোনেন?

সান্ত্বনা জবাব দিল না। এক গাল মুখে নিয়েই নরেন চৌধুরী দুচোখ কপালে

তুলে বলল, আমি জলকীর্তন করি ! ওর কাছে !...আর জন্মে ও-ই বরং চাতক পাখি ছিল, জল আসবে শুনেই মনে মনে অষ্টপ্রহর সাঁতার কাটছে তাতে।

সান্ত্বনা বড় রকমের একটা ভেংচি কাটল তাকে।—হ্যাঁ কাটছে সাঁতার, আপনাকে বলেছে।

বাদল গাঙ্গুলি সকৌতুকে চেয়ে রইল। সশব্দে হেসে উঠল নরেন চৌধুরী। পরে বলল, বোসো না, দাঁড়িয়ে কেন, দেখ কি খাচ্ছি, এ রাজ্যে এ রকম জোটে না সচরাচর, সান্ত্বনা আর একটা ডিশ—

শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা। অনেক দেরি হয়ে গেল, বাবা অপেক্ষা করছে, আমি—আমি চলি, খাওয়া হয়ে গেলে ওগুলো বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

যাবার জন্য পা বাড়াল।

বাদল গাঙ্গুলি জিজ্ঞাসা করল, ওই...ও ভালো আছে ?

সান্ত্বনা থামল।—কে ?

ওই কি যেন ওর নাম—আপনার সুন্দরী ?

বিব্রত হোক আর যাই হোক, উষ্ণতার আঁচটুকু যায় নি। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, হ্যাঁ ভালো আছে, আপনার খোঁজ করছিল।

দ্রুত প্রস্থান করল। ঝাঁজ মিটেছে একটু। বড়সাহেব হোক আর যাই হোক, খাবার পাঠাক আর যাই করুক, ও কেয়ার করে না কাউকে—সেটা বুঝবে।

এরকম কথা চিফ ইঞ্জিনিয়ার শুনতে অভ্যস্ত নয়। বিস্মিত নেত্রে চেয়ে রইল যতক্ষণ দেখা গেল।

মনে মনে বিব্রত একটু নরেনও হয়েছে। হেসে বলল, কিছু মনে করো না হে, ওর চালচলন কথাবার্তা সব ওই রকম। ....তোমাকে দেখার আগে তো একেবারে ভগবান গোছের একজন ঠাওরেছিল।

তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি হালকা জবাব দিল, আর দেখার পরে গোপাল ভেবে গোরু টানিয়ে ছেড়ে দিল।

নরেন সশব্দে হেসে উঠল।—না হে, ভয়ানক লজ্জা পেয়েছে সেদিন, সে যদি দেখতে...

সেদিন না হোক, আজ লজ্জার বহর স্বচক্ষেই দেখল বটে। সে কথা বলেই টিপ্পনী কাটতে যাচ্ছিল আবারও। কিন্তু তার আগেই ছড়ানো আহার্যসামগ্রীর দিকে চোখ আটকে গেল। সেই মাছের পোলাও আর কালিয়া, সেই মাছের ফ্রাই আর চপ।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল সে।

কি হ'ল ? নরেন বুঝে উঠছে না।

কিছু না, খাও তুমি। আত্মস্থ হয়ে নিজের আপিস ঘরের দিকে পা বাড়ালো আবার।

বাবার কাছে যাবার কোন তাড়া নেই সান্ত্বনার। তাঁর টিফিন ক্যারিয়ারও বেয়ারাই নিয়ে যাবে। মেজাজ এখন প্রসন্ন একটু। ভুতুবাবুর দোকানের উদ্দেশে চলল। যাবে

ঠিকই করেছিল। সেদিনের চায়ের পয়সা ক'টা দেওয়া হয় নি।

কিন্তু এসে দ্বিগুণ বিস্ময় আর দ্বিগুণ বিপন্ন অবস্থা।

এক কোণে, বাইরে থেকে দেখাও যায় না এমনি এক কোণের বেঞ্চিতে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসে চা খাচ্ছে আর হেসে গল্প করছে একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ। মেয়েটিকে চেনে সান্ত্বনা। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরনা। আর লোকটিকেও যেন দেখেছে কোথায়...। টেবিলের ওপরেই ছোট একটা স্যুটকেস।

ভুতুবাবু তার ক্যাশবাক্সের সামনে বসে নিরাসক্ত মুখে একটা পুরানো কাগজ নাড়াচাড়া করছে। তার চোখ-কান অন্যত্র, অর্থাৎ সেই কোণের দিকে। হঠাৎ সান্ত্বনাকে দেখে উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, এই যে, আসুন মা-লক্ষ্মী, আসুন!

কোণের দু'জনের কলগুঞ্জনে ছেদ পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে তারা তাকালো এদিকে। ঝরনা মেয়েটি নিজের অজ্ঞাতেই যেন সঙ্গীর কাছ থেকে সুশোভন ব্যবধানে সরে বসল একটু। এদিকে মা-লক্ষ্মী রাঙিয়ে উঠেছে।

বসুন মা-লক্ষ্মী, চা দিই? সানন্দে ভাবছে ভুতুবাবু, একটুখানি আব্রু দিয়ে আলাদা ক্যাবিন এবারে একটা না করলেই নয়।

সান্ত্বনা অস্ফুট আপত্তি জানিয়ে বলল, না এখন চা নয়। পয়সা ক'টা বাড়িয়ে দিল, সেদিনের সেই....

আঁতকে উঠে হাত গুটিয়ে নিল ভুতুবাবু। কিন্তু কিছু বলার আগেই কাঠের বাক্সের ডালার ফুটো দিয়ে পয়সা ক'টা তাড়াতাড়ি ফেলে দিল সান্ত্বনা। তারপর যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই বাধা পড়ল আবার।

চললেন যে? আমায় চিনতে পারলেন না? ঝরনা বলল।

বিব্রতমুখে ঘাড় নাড়ল সান্ত্বনা, চিনতে পেরেছে।

তাহলে পালাচ্ছেন যে বড়? আমরা বুঝি কেউ নই? উঠে এসে একেবারে হাত ধরে বেঞ্চির ওপর বসিয়ে দিল তাকে। সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, আমাদের এখানে একাধারে গিরিকন্যা আর মড়াইকন্যা আছেন একজন, তোমাকে বলেছিলাম না? এই ইনি—সাইনোশিওর অফ দি স্পট—লক্ষণীয় নক্ষত্রবিশেষ—আর ইনি এই...আমার একজন বন্ধু, কলকাতায় থাকেন, এখন ফিরে চলেছেন। কই ভুতুবাবু, এঁকে চা দিলেন না?

আর এক পেয়ালা চা নিয়ে হাজির হ'ল ভুতুবাবু।

সোনালী চশমার পুরু লেন্সএর ওধারে ঝিকিমিকি হাসি এবং আর একজনের নীরব কৌতূহলের মধ্যে পড়ে সান্ত্বনা যেন হাবুডুবু খেতে লাগল। বিনিময়ে নমস্কারও করতে পারল না। কিন্তু তবু বন্ধুটিকে যেন চিনেছে সান্ত্বনা। ওদের অগোচরে মেন কোয়ার্টারস্এ ঝরনার সঙ্গেই দেখেছিল আর একদিন। ভেবেছিল, আত্মীয়পরিজন কেউ হবে। প্রথম দিনের প্রথম দর্শনে ভালো লেগেছিল ঝরনাকে। কিন্তু আজ ভালো লাগল না তেমন। একটা অবিশ্বাসের কারণ দেখলে যেমন লাগে তেমনি লাগল।

ঝরনা জিজ্ঞাসা করল, ওপরে যাচ্ছেন তো? চলুন একসঙ্গে যাই। সঙ্গীর দিকে তাকালো, তোমার গাড়ির সময় হয়ে গেল বোধ হয়?

হ্যাঁ, এইবার উঠব। হাতঘড়ি দেখা এবং জবাব।

তিনজনেই উঠল একটু বাদে। স্যুটকেস হাতে বন্ধু বিদায় নিল। ওরা দু'জন চড়াইয়ের পথ ধরল।

রয়ে-সয়ে উঠলে বড় জোর আধঘণ্টা লাগে সান্ত্বনার মেন কোয়ার্টারস পর্যন্ত উঠতে। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল সেখানে। কিন্তু এই একঘণ্টা সান্ত্বনার এক জীবনের বিস্ময় যেন। মেয়েটার মাথায় গোলমাল আছে কিনা তাও সন্দেহ হচ্ছিল মাঝে মাঝে। ঝরনাই কথা বলে গেল। অনর্গল কথা। যে সব কথা একদিনের আলাপে কেউ বলে না, তেমন ধরনের কথাও। আর অজস্র হাসি। সান্ত্বনা বোবা সারাক্ষণ।

—সান্ত্বনাদের বাড়ি একদিন সে যাবে অনেকদিন ভেবেছে। সেই প্রথম দেখার পর থেকেই। হয়ে ওঠে নি।—কি করে হবে? ও বাবা। মায়ের যা ছাঁটাই বাছাই। তা এবার একদিন ঠিক যাবে। এখানে যে বাড়িতেই যায়, মেয়েরা, মানে মহিলারা সবাই বলে সান্ত্বনার কথা। বলে মানে টিপ্পনী কাটে। হিংসা, সোজা হিংসা—বুঝলেন না, অ্যারিস্টোক্র্যাট কি না ওরা—ওমা, আপনি আপনি করে বলছে কেন সে সান্ত্বনাকে? বয়স কত? যতই হোক, সাতাশ তো নয়। ওর সাতাশ—মা অবশ্য....যাকগে, আর আপনি বলবে না। ঝরনা কলকাতায় কবে যাবে? কেন? এম-এ ক্লাস!....ও, মা বলেছিল বুঝি সেই প্রথম দিন—হ্যাঁ, এম-এ পড়ে বৈ কি, পাঁচ বছর ধরেই পড়ছে। কবে যে শেষ হবে পড়া কে জানে! না, হোস্টেলে থাকে না। দাদার কাছে থাকে। দাদা বৌদি ঠিক মায়ের মনের মত হয়েছে। অ্যারিস্টোক্র্যাট হয়েছে। কি মজা জানো—ওই জন্যেই আবার বৌদির ওপর মা মনে মনে একটু ইয়ে—নিজের বোনদের মধ্যে মায়েরই মনমত কিছু হ'ল না কিনা—বাবা তো এতদিনে ঘষে মেজে মোটে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার—বোনেদের ওঁরা সব মস্ত মস্ত দিকপাল এক একজন। না, এখন সে চট করে যাচ্ছে না, মা যেতে দিলে তো! নতুন নতুন কত হোমরাচোমরা লোকের সঙ্গে বলে আলাপ পরিচয় হচ্ছে এখানে। নরেন চৌধুরী লোকটি বেশ—আলাপ হয়েছে, দিব্বি হাসিখুশি আর তোমার প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ। কিন্তু ওই গোমড়ামুখো চিফ ইঞ্জিনিয়ারটিকে দেখলে গায় জ্বর আসে, রসকস-শূন্য নিরেট একেবারে, প্রথম দিন পার্টিতে ওকে এনটারটেন করতে গিয়ে মায়েরই হিমশিম অবস্থা, আমার মজা লাগছিল বেশ। আচ্ছা, এই যে লোকটা গেল, গাড়ি পাবে তো? আর একটু আগে উঠলেই পারত—মাস্টারী বুদ্ধি আর কত হবে—মা বলে, মাথায় সাদা দ্রব্য থাকলে কেউ আর প্রাইভেট কলেজে ছেলে পড়ায় না—কিন্তু লোকটা ভালো, বুঝলে—মা বলে বোকা, কিন্তু আসলে ভালো বলেই একটু বোকা বোকা দেখায় আর কি।

সারাক্ষণ সান্ত্বনা স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়েই উপরে উঠে এলো। নিজে বোধহয় দশটা কথাও বলে নি, কিন্তু ঝরনা থামতে মনে হ'ল ও নিজেই যেন হাঁপিয়ে গেছে বেশি। মেন কোয়ার্টারসএ পৌঁছেই হাসতে হাসতে বিদায় নিল ঝরনা। কিন্তু সোনালী চশমার ওধারে তার চকচকে দুই চোখে শুধু হাসিই চিকচিক করছিল কিনা তাও যেন বুঝে উঠছিল না সান্ত্বনা।

বাড়ি ফিরে বাদল গাঙ্গুলি সামনে নিধুকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ রে, আমার

দুপুরের খাবার আজ কোথা থেকে এসেছে?

ফাঁপরে পড়লো নিধুরাম। বলত তখনই। কিন্তু সেই আহার্যসামগ্রী দেখে জিব নেড়ে কথা বলা শক্ত হয়ে পড়েছিল বলেই বলা হয়ে ওঠে নি। কোন প্রকারে জবাব দিল, আঁজ্ঞে...বাড়ি থেকেই তো এসেছিল, পথের মধ্যে ওই...ওভারসিয়ার দিদিমণি কি রেঁধেছি দেখতে চাইলে...তারপর কেমন করে কি হয়ে গেল!

প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস বাদল গাঙ্গুলির মুখে।—যা পালা, আর শোন্, এখন কিছু খাব না।

দুপুরের খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে। কাপড়-জামা বদলে হাতমুখ ধুয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

ক্লান্ত লাগছে। রাজ্যের অবসাদ। কাজের মধ্যে ডুবে থাকে সারাক্ষণ, কিন্তু আজ কিছু ভালো লাগছিল না। অন্যদিনের থেকে একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছে, ঘরের আলো নিবিয়ে আরাম-কেদারায় গা ছেড়ে দিয়েও আরাম কিছু পাচ্ছে না।

কাজে ডুবে থাক আর যাই করুক, বিস্মৃতির কবরের তলায় সব কিছুর নির্বাসন অত সহজ নয়, আজ সেটাই আবার নতুন করে উপলব্ধি করছিল বোধ হয়। হাল ছেড়ে দিল বাদল গাঙ্গুলি।...আসুক ওরা। আসুক ব্যথার দূতেরা। আসুক খুশির দূতেরা। ভিড় করে আসুক নিভৃত অতল থেকে ব্যর্থতার যত বোঝা আর যত কিছু...।

এবারে যেন সহজ হ'ল একটু। টানধরা স্নায়ুগুলি শিথিল হ'ল অনেকটা। ওভারসিয়ারের ওই মেয়েটার আজকের এই খাবার বদলে পাঠানো থেকে সেই আর একদিনের আর এক মেয়ের টিফিন ক্যারিয়ার পাঠানো মনে পড়ছে। এক নয়। এক রকমও নয়। বরং একেবারের উল্টো। তবু মনে পড়ছে। আজ ছিল পূর্ণতার বিস্ময়। সেদিন ছিল শূন্যতার বিস্ময়।...সেদিন সেও ভালো লেগেছিল বাদল গাঙ্গুলির। কিন্তু সেদিনের সেই ভালো লাগাটুকুও বুকের ভিতরে টনটনিয়ে উঠছে যেন। ওর নতুন দিনের সেই ভরা-প্রাচুর্য অমনি এক শূন্যতার দেউলে উজাড় করে দিয়ে বসে আছে আজও, সেই ব্যথাটাই যেন নতুন করে জাগিয়ে দিল একজন সামান্য ওভারসিয়ারের এক অতি সাধারণ মেয়ের ভরা টিফিন ক্যারিয়ার।

...ঠিক একটার সময় সেদিন মোটর-হর্ন বেজে উঠেছিল নেশান বিলডার্স লিমিটেডের দোরগোড়ায়।

উঁচু-নিচু আপিসসুদ্ধ লোক চিনত এই মোটর-হর্ন। তারা বলত শ্যামের বাঁশি। সাত সুরে মেশানো মার্কামারা হর্ন। কিন্তু একটার সময় কেউ শুনতে অভ্যস্ত নয় এ হর্ন। ওটা বেজে উঠত কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। ঘড়ির দিকে না চেয়েও অন্য কর্মচারীরা বুঝতে পারত, পাঁচটা বাজল। জানত, এইবার পড়ি মরি করে ছুটবে একজন। যত কাজ থাক, আর যত ফাইলই জমে উঠুক। সত্যি তাই। বাদল গাঙ্গুলি তখন কলের মানুষ নয় আজকের মত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হয়তো শেষ ফাইলের কাজ শেষ করে নিত সেই মুহুর্মুহু হর্নের তাগিদে। নয়তো ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখত পরের দিনের জন্য। তারপর একে ঠেলে, ওকে ধাক্কা দিয়ে তরতর করে নেমে আসত সিঁড়ি বেয়ে।

এরই মধ্যে তাক বুঝে একমাত্র নরেন চৌধুরীই এসে পথ রোধ করে দাঁড়াত মাঝে মাঝে। শ্যামের বাঁশি কথাটা তারই মস্তিষ্কজাত। গলা ছেড়েই একদিন বলে উঠেছিল, শ্যামের বাঁশি শুনে গোপিনীকুলই আকুল হ'ত, লোক হাসালে তুমি।

তাকে ঠেলে দিয়ে বাদল গাঙ্গুলি জবাব দিয়েছিল, কলিতে সব উল্টো বন্ধু ; সব উল্টো—

তবু সে পথ আগলালে থামতে হত। নরেন কখনো বলত, এ ফাইলের কাজ শেষ করে দিয়ে যাও, নয় তো খেসারত দিতে হবে।

কি খেসারত ?

আমিও যাব সঙ্গে।

বাদল গাঙ্গুলি কখনো হিড়হিড় করে তাকে সুদ্ধ টেনে নামাতো সিঁড়ি দিয়ে। কখনো আবার এক ধাক্কায় তাকে ফিরে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে একাই ছুটত। একগাল হেসে মোটরাসনার সামনে এসে দাঁড়াত। কে বলবে বাদল গাঙ্গুলি একজন ক্লাস ওয়ান ইঞ্জিনিয়ার, আর কে বলবে ও ঝকঝকে তকতকে মোটর গাড়ি এক দ্রুতগতির যান্ত্রিক সরঞ্জাম মাত্র। ওই মোটর গাড়িতে নীলাকে গা এলিয়ে বসে থাকতে দেখলে কাব্যের রোমাঞ্চ জাগত ক্লাস ওয়ান ইঞ্জিনিয়ারের মনোযন্ত্রের মধ্যিখানে।

যতক্ষণ না নেমে আসে, থেকে থেকে ততক্ষণই হর্ন বাজে। দেরি হলে ছদ্মকোপে নীলা ঝাঁজিয়ে উঠত, কানে তুলো গুঁজে বসে থাকো নাকি, একধার থেকে হর্ন বাজাচ্ছি।

দরজা খুলে ধুপ করে তার পাশে বসে পড়ে জবাব দিত, শুনেছি, সব ক'টাই শুনেছি—তোমার ওই মিষ্টি হর্ন শুধু আমার নয়, আপিসসুদ্ধ লোকেরই কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে গিয়ে বেঁধে, কিন্তু সখি, কাজ বড় বিষম গরল।

তবে নাবো, কাজই কর গে যাও।

কখনো আবার কোনো জবাব না দিয়ে সেই ভরা দিনের খোলা রাস্তায় মোটরের ভিতর হঠাৎ একেবারে তার প্রগল্ভ সান্নিধ্যে ঝুঁকে আসত বাদল গাঙ্গুলি।

—এই। স্টিয়ারিং ছেড়ে যথাসম্ভব দরজার দিকে সরে বসত নীলা।—রাস্তার মধ্যে ইয়ারকি করতে হবে না। রাগ দেখাত সত্যি, কিন্তু ঠোঁটের হাসিটুকু একেবারে গোপন থাকত না। গাড়িতে স্টার্ট দিত তারপর। কমল-কলি হাতে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালাত—বাদল গাঙ্গুলি দেখত চেয়ে চেয়ে। গাড়িটা যেন ওর দাসানুদাস।

কখনো পার্টিতে যেত, কখনো নাচগান বাজনার আসরে, কখনো ক্লাবে বা থিয়েটার-বায়স্কোপে। আবার কখনো কোথাও না—শুধু পাশাপাশি যাওয়াটাই উপলক্ষ।

রোজ, প্রত্যহ।

কিন্তু দিনেদুপুরে বেলা একটায় সেদিন ওই মোটরের হর্ন কেন ?

দোতলার বিশাল হলেরই একধারে সারি সারি চেম্বার পদস্থ অফিসারদের। ওরই একটা থেকে স্প্রিং-আঁটা দরজা ঠেলে এক্ষুনি একজন বেরিয়ে এসে হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে ধাওয়া করবে এবার, সেটাই প্রত্যাশিত ছিল হলের কর্মমগ্ন কর্মচারীদের। কিন্তু কেউ এলো না। যার উদ্দেশে হর্ন, তার চেম্বার থেকে বেয়ারার উদ্দেশে প্যাঁক্ করে

একটা শব্দ হ'ল শুধু।

বাদল গাঙ্গুলি জানত এ সময়ে এই হর্ন বাজবে, কিন্তু বাজলেও ব্যস্ত হওয়ার মত কিছু নয়। বেয়ারা ছুটে আসতে তাকে বলল, দেখো, ওই নিচের গাড়িতে আমার খাবার এসেছে, নিয়ে এসো।

বেয়ারা প্রস্থান করল।

দুপুরে সেদিন লাঞ্চের নেমন্তন্ন ছিল নীলার ওখানে। প্রায়ই থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কাজে ব্যস্ত খুব। একবার উঠলে তো আর অল্প সময়ে হবে না। তাই বলে দিয়েছিল তার খাবার আপিসে পাঠিয়ে দিতে।

কেন, তোমার আসতে কি? নীলার বিরস প্রশ্ন।

বেজায় চাপ কাজের, তোমার বাবাই বিষম তেতে আছেন, ছুটি মিলবে না।

নেশান বিলডার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিপুল বাড়ুরী। নামডাকের ছড়াছড়ি। সরকারী বেসরকারী এক্সপার্ট কমিটিতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডাক পড়ে যখন তখন। নীলার বাবা। বাদল গাঙ্গুলির ভাবী শ্বশুর। হলে কি হবে, কাজের সময় কোন সম্পর্কের ধার ধারেন না। একটু এদিক-ওদিক হলে ছাড়ন-ছোড়ন নেই। নেই বলেই ধাপে ধাপে এত অল্প সময়ে অতটা উঠতে পেরেছিল বাদল গাঙ্গুলি। কারণ, এদিক-ওদিক বড় হ'ত না তার কাজ। হলেও ভালর জন্যেই হয়েছে। অনেকবার সেটা বুকটান করেই প্রমাণ করে এসেছে সে।

ভুরু কুঁচকে নীলা চেয়ে ছিল তার দিকে। অর্থাৎ, চালাকি পেয়েছ? হাত ধরেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল পাশের ঘরে।—বাবা, কাল ও লাঞ্চে আসতে পারবে না বলেছে, এত কাজ তুমি নাকি ছুটি দেবে না—খাবার আপিসে পাঠিয়ে দিতে হবে।

পাইপ মুখে বিপুল বাড়ুরী হেসেছিলেন। বাদল গাঙ্গুলির পদমর্যাদায় দু ঘণ্টা ছুটি দেওয়া না-দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কাজের চাপটা মিথ্যে নয়। আর শ্রীমান কাজ ছেড়ে একবাব বেরুলে খেয়েদেয়ে সুবোধ ছেলেটির মত আবার আপিস করবে সে আশাও রাখেন না। বলেছেন, কাজটা আগে না তোর খাওয়া আগে? তুই তো তোর বন্ধুদের কম্প্যানী পাচ্ছিসই—ওর খাবারটা পাঠিয়েই দিস।

পছন্দ হয় নি। নীলারও না, নীলার মায়েরও না। মিসেস বাড়ুরী বলেছেন, কতক্ষণই বা লাগবে—তোমার কাজ একেবারে উল্টে যাবে ওটুকুতে!

ওল্টাবে কি না সে তো ও-ই ভালো জানে। কাজ আছে যখন বলছে নিশ্চয়ই কাজ আছে—ওটা তো আপিস একটা না কি! বিপুলবাবুর সাফ জবাব।

—থাক বাবা থাক, আপিসেই পাঠাব'খন সব খাবার। ফিরে যেতে যেতে রাগ করে নীলা বলেছে, আমারও যেমন—তোমার কাছে এসেছি বলতে!

দরজা ঠেলে অতিকায় টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে বেয়ারার আবির্ভাব। টেবিল থেকে ফাইল সরিয়ে গ্লাস ডিস সাজালো সে। তারপর টিফিন ক্যারিয়ার খুলে একেবারে হাঁ। প্রথম বাটিতে কিছু নেই, শুধু এক লাইন লেখা কাগজ একটা। বেয়ারার সামনেই অপ্রস্তুতের একশেষ সে। নীলা বড় বড় করে লিখেছে, খাওয়ার ইচ্ছে থাকে তো পত্রপাঠ চলে এসো। ওদিকে দ্বিতীয় বাটিটাও খুলে ফেলেছে বেয়ারা। তাতেও স্লিপ

একটা। বাদল গাঙ্গুলি ইশারায় বেয়ারাকে বলল চলে যেতে। সব ক'টা বাটিতেই ওই একটুকরো করে কাগজ। লাঞ্চের মেনু কি, কারা কারা অপেক্ষ করছে, কতক্ষণের মধ্যে না এলে মেনুটা শুধু মুখেই শুনতে হবে, ইত্যাদি।

টিফিন ক্যারিয়ার দেখেই খিদেটা বেশ চাড়িয়ে উঠেছিল। ...হাসিও পেয়েছে, আবার রাগও হয়েছে। রাগ হয়েছে বেয়ারার সামনে অপ্রস্তুত হয়েছে বলে। বোতাম টিপে তাকে ডাকল আবার। নির্দেশমত সে টিফিন ক্যারিয়ার ইত্যাদি গুছিযে নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু জব্দ বাদল গাঙ্গুলিও করতে জানে। কাজ মাথায় উঠল। বসে আছে, অপেক্ষা করছে। টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিল।

কি, এলে না?—ওধার থেকে।

এধার থেকে।—এক্ষুনি যাবো, একেবারে মুখ তুলতে পারছি না। তোমরা অপেক্ষা কোরো না।

না, ওরা তোমার জন্যে বসে আছে।

সেই জন্যেই তো আরো যাবো না। আমার জন্যে তুমি একা বসে থাকবে।

চালাকি করতে হবে না, এসো শীগগির।

যাচ্ছি, তোমরা শুরু করো। হাতের কাজটুকু সেবে না গেলে তোমাব বাবাই চাকরি খতম করে দেবেন। অপেক্ষা কোরো না কিন্তু, হ্যাঁ—ঠিক যাবো।

ঠিকই গিয়েছিল। ঠিক পাঁচটায় আপিস থেকে বেরিয়েছে। তার পর যেতে যতক্ষণ লাগে।

নীলা চটেছিল। তার থেকে বেশি চটেছিল নীলার মা। কেন জানি স্বামী বা মেয়ের মত ওকে অতটা সুচক্ষে দেখতে পারেননি মহিলা। যেভাবে জামাইকে হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছিলেন, সেভাবে ঠিক পাওয়া যাবে কি না তেমন একটা সংশয় ছিল বলেই বোধ হয়। এত বড় বাড়ি, দুটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেদের তো ইস্কুলের বয়স পেরোয় নি। বিয়ের পর জামাই অনায়াসে এখানেই থাকতে পারে। এখন থেকেই থাকতে পারে। সে মনোভাব অনেকবারই ব্যক্ত করেছেন তিনি। কিন্তু গেঁয়ো মা-ই বেশি হ'ল ওর। আর যে ছিরি ওর বাড়ির। মেয়ের সেখানে গিয়ে থাকার সম্ভাবনার কথা ভাবতেও শিউরে ওঠেন।

বিকেল পাঁচটা না বাজতে মেয়ে সেজেগুজে সাত-তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে যায় কোথায় জানেন। বিরক্ত হন। মেয়ের বাবার উদ্দেশে অনেকদিন বলেছেন, যেমন তুমি তেমনি তোমার মেয়ে, দু'জনেই তোমরা দিনকে দিন ওকে বাড়িয়ে তুলছ। ঘড়িতে চারটে বাজলেই মেয়ের আর তর সয় না, ছুটবে গাড়ি নিয়ে। কেন, গ্যাঁট হয়ে বসে থাক, ও আপনি আসবে'খন সুড়সুড় করে।

আড়াল থেকে নীলাও শোনে। বিপুল বাড়রীর মেজাজ ভাল না থাকলে জবাব দেন না। ভালো থাকলে বলেন, তা ওদের বিয়েটা দিয়ে দাও না, মিছিমিছি দেরি করে লাভ কী?

থামো বাপু তুমি, হেসে খেলে দু'দিন বেড়াচ্ছে মেয়েটা বেড়াক, তার পরে

আছেই বিয়ে, বিয়ে পালাচ্ছে নাকি ?

ভদ্রলোক ঠাট্টা করেন, কিন্তু তোমার মেয়ে যে পালাচ্ছে।

এসব খবর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নীলাই আবার যথাস্থানে জানিয়েছে। মায়ের এ অনুযোগ অভিযোগ ওদের দু'জনের কাছেই হাসির ব্যাপার।

বিপুল বাড়রী সেদিন বাড়ি ফেরা মাত্র মহিলা অগ্নিমূর্তিতে ভাবী জামাইয়ের লাঞ্চে না আসার দাম্ভিকতাটাই বড় করে বিস্তার করতে বসলেন।—মেয়েটা সেই থেকে প্রায় না খেয়ে মন খারাপ করে আছে। বলেছিলাম না, যেভাবে চেয়েছিলাম ঠিক সেভাবে পোষ মানে নি ও, আর মানবেও না কক্ষনো!

বিপুলবাবু বললেন, কিন্তু ওর তো খাবারটা আপিসে পাঠিয়ে দেবার কথা ছিল।

কেন, ও আসবে না কেন? টেলিফোনে বলল আসবে, তার পরেও এলো না কেন?

আসামী আসার পর তার কাছেও মেয়ের ধকলটাই ফেনিয়ে তুললেন মিসেস বাড়রী। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার না পাঠবার ব্যাপারে তাঁরও পরোক্ষ সায় ছিল বলেই রাগ চাপতে পারছিলেন না।

কিন্তু মেয়ের সঙ্গে আপসটা ওর সহজেই হয়ে গেল। কারণ কাজটা আর যাই হোক ভালো হয় নি খুব, সেটা নীলা উপলব্ধি করেছিল।

দুপুরের খাওয়াটা বেশ ভালো ভাবে উশুল করে নিয়ে ওরা বেড়াতে বেরিয়েছিল তারপর। গাড়ি চালাতে চালাতে মায়ের মেজাজ কতখানি বিগড়েছে নীলা তারই ফিরিস্তি দিচ্ছিল একটা।

সে থামলে বাদল জিজ্ঞাসা করল, আর কি বললেন তোমার মা?

আর বললেন, ছেলেটা এখনো ঠিক পোষ মানে নি।

তোমাদের টমি কুকুরের মত?

তোমার যা বুনো স্বভাব,ওতে কুলোবে না, আরো শক্ত শেকল দরকার। সন্ধ্যার সময় একটা নিরিবিলি পথ ধরে নীলা গাড়ি চালাচ্ছিল। স্টিয়ারিং থেকে হাত তোলার উপায় নেই। আচমকা অধরস্পর্শে গাড়ির টাল সামলানো দায় হয়েছিল প্রায়। ছদ্ম কোপে ঝাঁজিয়ে উঠেছিল শুধু, অ্যাক্সিডেন্ট হলে তখন?

জবাবে আবার। এবং তেমনি আচমকা।

ভালো হবে না বলছি, এক্ষুনি দোব কিন্তু স্টিয়ারিং ছেড়ে।

বাদল গাঙ্গুলি হেসেছে, বলেছে, একে বুনো স্বভাব, তায় ছাড়া আছি—আমার কি দোষ!

কিন্তু মধ্যাহ্নের এই আহার-প্রসঙ্গ বাড়িতে ওর নিজের মায়ের কাছে প্রকাশ হয়ে যেতে একেবারে অন্যরকম দাঁড়াল ব্যাপারটা। রাত্রিতে খাবে না শুনে মা খবর করতে এসেছিলেন, সেই দুপুরে নেমন্তন্ন খেয়েছিস এখনো খিদে পায় নি?

মায়ের কাছে হাসতে হাসতে সবিস্তারে জ্ঞাপন করেছিল দুপুরের মজার ব্যাপারটা। ওকে জব্দ করতে গিয়ে উল্টে নিজেরাই কেমন জব্দ হয়েছে সেই কথা।

কিন্তু মা এর মধ্যে মজা কিছু দেখলেন না, আর জব্দ হওয়া বা করার আনন্দও

কিছুমাত্র উপভোগ করলেন বলে মনে হ'ল না। শোনা মাত্র মুখ যেন সাদা হয়ে গিয়েছিল মায়ের। বলে ফেলেছিলেন, খালি টিফিন ক্যারিয়ার পাঠিয়ে তারা তোকে সমস্ত দিন না খাইয়ে রাখলে!

সামলে নেবার জন্য ছেলে তারপরে অনেক কথাই হয়তো বলেছিল। কিন্তু মা তার একবর্ণও শুনেছেন বলে মনে হয় নি। আর একটি কথাও না বলে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছিলেন তিনি।

মনে মনে মায়ের ওপর সেদিন একটু বিরক্তও হয়েছিল। মায়ের চোখের সামনে ওর সমস্ত ভিতরসুদ্ধু এমনি খোলাখুলি ধরা পড়ে যায় বলেই বোধ হয়। মায়ের ধারণা মিথ্যে নয় খুব। কিন্তু যোগ্যতা তো তারও আছে। নেশান বিলডার্সএর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রী হাজার গণ্ডা লোক চরান, ওর মত তো আর পাঁচজনকে বেছে নেন নি তিনি। যোগ্যতা না থাকলে, বরাবর স্কলারশিপ না পেলে, ওর মত গরীবের ছেলের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াটাই স্বপ্ন। অবশ্য এই পড়ার মধ্যে মা অনেকখানি। ছেলেবেলা থেকে মায়ের সবল ইচ্ছাশক্তি যেন ঘিরে থাকত ওকে। চাকরিতে ঢুকে ও চট করেই নাম করেছিল। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রী কোম্পানী থেকে ওকে ট্রেনিংএর জন্য বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ রকম একটি ছেলেকে বড় হবার সুযোগ দেওয়াও সহজ। আর সুযোগ দিয়ে কিনে রাখাও সহজ। বিপুল বাড়রীর স্বার্থ সেদিনও অবিদিত ছিল না বাদল গাঙ্গুলির। নীলাকে কাছাকাছি পাওয়ার পর থেকে সে স্বার্থের পাকে পাকে জড়িয়ে যেতে আপত্তিও ছিল না তার। গরীবের ছেলে এত বড় ভাগ্যের সম্ভাবনা কখনো ভাবে নি। কিন্তু ওর অস্থিমজ্জার আর একদিকে মিশে আছে মায়ের গড়া সত্তাবোধ। বিপুল বাড়রীর স্বার্থে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছে, কিন্তু কেনা হয়ে থাকতে চায় নি তাঁদের। অনেক সময় সেটা নিজেই সে বরদাস্ত করতে পারত না। কিন্তু এ ব্যাপারে মায়ের দুশ্চিন্তা বা ইঙ্গিত-কটাক্ষও খুব ভালো লাগত না তা বলে।

...কিন্তু সব শেষে একদিন সব কিছুর সেই কল্পান্তক অবসান।

আলো-নেবানো ঘরের নিভৃতে বসে থাকতে থাকতে বাদল গাঙ্গুলির হঠাৎ মনে হ'ল ঘরের বাতাস যেন কমে যাচ্ছে। একটা অব্যক্ত শূন্যতা চেপে বসছে ক্রমশ। ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সামনের টেবিলে নীলার ফোটো আছে একখানা। অনেকদিন ধরেই আছে। রাখার কোন অর্থ হয় না। তবু রেখেছে।

সামনে এসে দাঁড়াল। দু'হাতে তুলে নিল ফোটোখানা। আরো অনেক ছিল। সব নির্মূল করেছে। এটাও করত—।

—হ্যাঁ রে, এত বুঝিস আর এটুকু বুঝিস নে, জ্বর হলে গায়ে জল ঢেলে গা ঠাণ্ডা করা যায়?

সচকিতে ঘুরে দাঁড়াল বাদল গাঙ্গুলি। ঘরের মধ্যে, শূন্য ঘরের মধ্যে, তার খুব কাছে, একেবারে কাছে, কোথায় বুঝি মা এসে দাঁড়িয়েছেন। তার মা। তার মায়ের কথা! সেই সবশেষে সব শেষ করার জন্যই ও যখন ফোটো ছিঁড়ছিল একে একে—ওর মা বলেছিলেন। সেই কথাগুলি আজ আবার নিবিড় স্পর্শ হয়ে কানের

ভিতরে, বুকের ভিতরে পৌছুল হঠাৎ। অব্যক্ত যাতনায় শূন্য ঘরের মধ্যে একমাত্র সেই মাকেই যেন খুঁজে বেড়ালো মড়াইয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। মা, মাগো!

কে? হাতের ফোটো রেখে দিল। নিভৃত রোমন্থনে ছেদ পড়ে গেল।

আমি নিধু, রাত্তিরের খাবার।

ঘরের আলো জ্বেলে দিল বাদল গাঙ্গুলি। ঘড়ি দেখল। ছোট টেবিলে খাবার রেখে অপেক্ষা করতে লাগল নিধু। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে পারম্পর্যহীন নিস্পৃহতার আবরণ নেমে এসেছে ভিতরে বাইরে।

চেয়ার টেনে আহারে বসল কলের মানুষ চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি।

॥ ৭ ॥

সান্ত্বনা দু'চারবার অনুরোধ করতে নরেন রাজী হয়ে গেল।

ইতস্তত করেছিল প্রথম। কিন্তু আনন্দ জিনিসটাও ছোঁয়াচে কম নয়। চাকরির বাইরেও শুকনো পদমর্যাদার শিকলে আটকা পড়ে থাকবে সে মন নয় নরেন চৌধুরীর।

বাদনা উৎসবে নেমন্তন্ন করে গেছে পাগল সর্দার।

সান্ত্বনা শুনেছে সে এক মস্ত পর্ব।

বারো মাসে তেরো ছেড়ে তেত্রিশ পার্বণের অজস্রতাই ছিল একদিন ওদের। সেদিন গেছে। পৌষে ধান কাটার উপলক্ষও আর নেই বড়। মেয়ে-পুরুষের প্রধান জীবিকা এখন চাকরি। ক্ষুধার দায়ে পেশা বিকিয়েছে। সে পেশার লাগাম অন্যের হাতে। তবু দুই একটা উৎসবে লাগাম ছেঁড়ে ওদের। বাদনা উৎসবে বেশ ভালো করেই ছেঁড়ে। উপর্যুপরি পাঁচটা দিন একটি সাঁওতাল নারী-পুরুষকেও আর মড়াইয়ের ধারে কাছে দেখা যাবে না।

ওদের এই ক'টা দিনের অনুপস্থিতি মড়াইয়ের কর্মকর্তাদেরও মেনে নিতে হয়। বিভিন্ন জাতের সহস্র সহস্র কুলিকামিনের মধ্যে মাত্র ক'টা দিনের জন্য এই একদলের অনুপস্থিতি লক্ষণীয় নয় এমন কিছু। উৎসবের ব্যাপারটা নরেন চৌধুরী কিছু কিছু জানে। গতবার আভাস পেয়েছে। সান্ত্বনা দেখে নি কখনো। শুনেছে। শোনার পরেও আর চুপচাপ ঘরে বসে থাকে কি করে।

যেতে হবে ওদের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা ধরে নিচে নেমে, গোটা দুই গ্রাম ছাড়িয়ে শালমহুয়ার বন পেরিয়ে তারপর।

অদ্ভুত ভালো লাগছে সান্ত্বনার। এ পথে আর আসেনি কখনো। মহুয়া বনে রসে টইটম্বুর মহুয়া ফলের মিষ্টি মাতাল আতপ আতপ গন্ধে কি একটা সাড়া জাগছে যেন চেতনার তলায় তলায়। আসন্ন বসন্ত বাতাসে শালপিয়ালের ঝরঝরানি যেন গানের মতই কানে বাজছে। নরেন এটা সেটা টিপ্পনী কাটছে মাঝে মাঝে এ পরিবেশ নীরবতাও প্রায় স্পর্শবাহিনী। তাই কথা বলতে হচ্ছে ওকে। নইলে চুপচাপ ওই যৌবন-প্রাচুর্যের দিকে চেয়ে থাকা বেশি লোভনীয়।

কিছুটা পথ বাকি তখনো। দূর থেকে ঢোল মাঁদলের শব্দ কানে আসছে। সামনের

বাঁকে একজন লোক দাঁড়িয়ে। অবাঙ্গালী। সেপাই বা দারোয়ানের কাজটাজ করে বোধহয়। নরেন চৌধুরী মন্তব্য করল, ব্যাটা এখানেও এসে জুটেছে আবার।

কে ও—সান্ত্বনা ফিরে তাকালো।

জবাবা দেওয়া হ'ল না। কাছাকাছি এসে পড়েছে। লোকটা আগে দেখে নি ওদের। দেখে বেশ বিব্রত হয়েছে বোঝা গেল। তাড়াতাড়ি আনত অভিবাদন জ্ঞাপন করল নরেন চৌধুরীর উদ্দেশে।

কেয়া বাহাদুর, দেখ্‌নে আয়া? নরেনের হিন্দী।

জবাবে লোকটা লজ্জায় ঠোঁট দুটো একবার নাড়ল শুধু। তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। নামটা শোনা-শোনা লাগছে সান্ত্বনার। নরেনকে মুখ টিপে হাসতে দেখে আবার জিজ্ঞাসা করল, কে লোকটা বলুন না?

যাকে দেখবে তাকেই চিনে রাখতে হবে তোমার?

সান্ত্বনা লজ্জা পেয়ে বলল, তবে হাসছেন কেন?

অল্প থেমে নরেন জবাব দিল, একটুখানি কাব্যকথা মনে পড়ে গেল, ওই ফুলের লোভে লোভে কারা সব আসে...সেই কথা। ওর নাম বাহাদুর, জমাদার—একেবারে বাহাদুর জমাদার। হেসে উঠল।

....জমাদার ....বাহাদুর—

কার মুখে শুনেছিল? কোথায় শুনেছিল? মনে পড়তে একেবারে ঘুরে দাঁড়াল সান্ত্বনা। দেখা গেল না। কিন্তু লোকটা আড়াল নিয়েছে। ভুতুবাবুর মুখে শুনেছিল এ নাম। পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণির সঙ্গে জড়িয়ে ভুতুবাবু বলেছিল কিছু। বলে নি, বলতে যাচ্ছিল...

কি হ'ল?

অপ্রতিভ মুখে সান্ত্বনা এগলো আবার।—কিছু না, এই লোকটা ভয়ানক পাজী শুনেছি।

আর একটু বিব্রত করার উদ্দেশ্যেই নরেন লোকটাকে সমর্থন করে বলল, ওর দোষ কি? ফুলের লোভে লোভে ওই কারা সব না এলে ফুলের জীবনই ব্যর্থ শুনেছি।

যা-ন আপনাকে আর কাব্য করতে হবে না। বলল বটে, কিন্তু হেসেই ফেলল সেও। দিনকতক আগেও পাগল সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার। কথায় কথায় সান্ত্বনা বিয়ের কথা তুলেছিল। সর্দারের কথা শুনে বেজায় হেসেছিল সেদিন। মনে পড়তে জোরেই হেসে উঠল এবার।

সর্দারের ওই মেয়েটার সঙ্গে হোপুনের বাপলা হবে শিগগির জানেন? বাপলা বুঝলেন না? বিয়ে—।

বুঝলাম, তা তোমার এত হাসি কেন? তোমাকেও নেমন্তন্ন করবে?

করবেই তো। হাসছি ওই সর্দারের কথা শুনে। ঠিক করেছে এই চৈত্র মাসে বিয়ে দেবে ওদের—কিন্তু ওদের কিছু বলে নি এখনো—ঠিক করেছে শুধু। চৈত্র মাস শিবরাত্রি পার হলে দিয়েই দেবে বিয়েটা—শিব হল বাবা—আগে বাবার বিয়ে না হলে ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে কি করে। সে রকম নিয়ম নেই ওদের। মুখে আঁচল চাপা

দিয়ে হাসতে লাগল সান্ত্বনা।

নরেনের সমস্যা মন্দ নয়। হাসবে, না হাসি দেখবে...।

সুরে বাঁধা জমাট আসর নয় কিছু। সুরে আর বেসুরে, গানে আর গর্জনে, তালে আর তাণ্ডবে একটা একাকার ব্যাপার। আবালবৃদ্ধবনিতার উৎসব। মাঝি পারাণিক জগমাঝি, জগপারাণিক নায়েক প্রভৃতি গণ্যমান্যদের সমাবেশ। ছেলেমেয়েদের হৈ-হুল্লোড়ে তারা সরাসরি যোগ দিচ্ছে না বটে, কিন্তু চোখে-মুখে তাদেরও প্রশ্রয়ের আভাস। জোয়ানেরা অনেকে কালিঝুলি মেখে সং সেজেছে। অনেকে আবার ময়ূরের পেখম পরেছে বা মাথায় চুড়ো বেঁধেছে। বাসন্তী রংএ শাড়ি ছুপিয়েছে মেয়েরা, কপালে টিপ পরেছে, কালো চুলে গুঁজেছে মহুয়া ফুল।

মন্ত্র পড়ে নায়েক অর্থাৎ পুরোহিত। বলে, ওগো পীঠস্থানের ঠাকুর, ওগো 'জাহের এরা', তোমাকে প্রণাম। তোমার নামে আজ আমরা ছোট বড় সকলে এসে মিলেছি। 'জাহের এরা' আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিও। তোমায় প্রণাম বাবাঠাকুর, আমাদের ব্যারাম পীড়া দুঃখজ্বালা সব দূর কোরো, প্রাচীনকালের মত ধনে-ধান্যে সমৃদ্ধ কোরো আমাদের 'জাহের এরা', আমাদের আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু-স্বজন ছোট বড় সকলের মঙ্গল হোক, আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ নাশ-বিনাশ যেন সৃষ্টি না হয় ঠাকুর, নেচে গেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে যেন আমরা থাকতে পারি। ওগো বাবাঠাকুর, ওগো 'জাহের এরা', প্রণাম তোমাকে।

মাঝি সকলকে আশীর্বাদ করে বলে, ঝগড়াঝাঁটি কোরো না, লোভলালচ কোরো না, পাঁচ দিন পাঁচ রাত্রি ভাই-বোনেরা মিলে ফুর্তি করো।

এই ফুর্তির আমেজ লাগে ছেলেবুড়ো সকলের মনে। মুরগী উৎসব হয়। সাদা রঙের আর বাদামী রঙের। সুরুয়া পোলাও রান্না হয়। আর নাচ আর গান, গান আর নাচ। ঢাক বাজে মাদল বাজে নাগরা বাজে, মোষের শিঙের বাঁশি ফোঁকা হয়। একটা শব্দতরঙ্গের উত্তাল আনন্দের আরতি হতে থাকে দেহের প্রতি রন্ধ্রে।

সান্ত্বনা এবং নরেন চৌধুরীর পদাপর্ণে সব থেকে খুশি পাগল সর্দার। এমনিতে অতিথিবৎসল ওরা। তার ওপর দিদিয়া এসেছে, সাহেব এসেছে। আনন্দ ধরে না। কিন্তু আর সকলের ওদের দিকে তাকাবার অবকাশ নেই খুব। নিজেদের নিয়ে নিজেরাই বিহ্বল।

বিহ্বল সান্ত্বনাও। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রচুর হেসেছে। কিন্তু এই মত্ত আনন্দের ছোঁয়ায় উজাড় করে দেবার একটা ইশারাও আছে যেন। অস্বস্তি লাগে। দেহের রক্তে সব-বিলানো নাচনের ছোঁয়া। থেকে থেকে মুখ রাঙিয়ে উঠছে, চোখে ঘোর লাগছে কিসের। বাতাসে মহুয়ার গন্ধ ভেসে আসছে এক একবার।

এখানে চাঁদমণিও আছে, হোপনও আছে। এত লোকের মধ্যে দুজনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার জায়গা নয় বলেই সান্ত্বনা বিশেষ করে দেখার সুযোগ পাচ্ছে ওদের। মত্ত মাতাল খুশির নেশায় যেন ঢলে ঢলে পড়ছিল মেয়েটা।

কিন্তু খানিক বাদেই কি হ'ল যেন। ফিরে ফিরে তাকায় সান্ত্বনার দিকে। সান্ত্বনার হাসির সঙ্গে ওর হাসি আর মেলে না তেমন। এই মেয়েটার প্রতি বরাবর একটা

প্রচ্ছন্ন আকর্ষণ সান্ত্বনার। ভেবেছিল চাঁদমণি কাছে আসবে, কথা বলবে, আর হাসবে। যেমন করে কথা বলে ও, আর যেমন করে হাসে।

কিন্তু সান্ত্বনার হাসি দেখে ওর হাসি কমে এলো আস্তে আস্তে। আড়ে আড়ে দেখে, চলনে চাউনিতে একটা সর্পিল কাঠিন্য দেখা দেয় কেমন। হোপুনের কাছে এসে কানে কানে বলে কি। হোপুন ওদের দিকে ফিরে তাকায় একবার। ওর চাউনিটাও দুর্বোধ্য মনে হয় সান্ত্বনার।

নরেন তাড়া দিল, এইবার পালাই চলো, একটু বাদেই মদ গিলতে বসবে সব।

সভয়ে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা। এতক্ষণে মনে হ'ল, ওদের এত ফুর্তির উৎসটা খুব যেন স্বাভাবিক নয়। মদ খেয়েই বোধ হয় আসরে নেমেছে সব। আসর শেষ হলে আবারও খাবে। পাগল সর্দার এলো। জিজ্ঞাসা করল, আখুনি যাবি তুরা?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল।

সর্দার বলল, কাল আসিস দিদিয়া, কাল ডাংরা লিয়ে জোর নাচ হবে।

সান্ত্বনা জবাব দিল না। দূর থেকে চাঁদমণি চেয়ে চেয়ে দেখছে ওকে। হোপুনও। ওদের মুখভাব খুব যেন সদয় নয়। মনে মনে অবাক হ'ল সান্ত্বনা। ...কিন্তু দু'চার মুহূর্তের জন্যে শুধু। তার পরেই ভুলে গেল ওদের কথা। বিস্মৃতিরই আসর এটা। অনেকটা আচ্ছন্নের মতই নরেনের পাশে পাশে চলতে লাগল সে।

....ভাবছে। ভাবতে চেষ্টা করছে। এ ভদ্রলোকই বা এমন চুপচাপ কেন। হালকা হাসি ঠাট্টা কিছু করতে পারলে এ ভাবটা কাটে হয়তো। কিন্তু মুখ তুলে চাইতেও পারছে না। কি যেন হচ্ছে ভিতরে ভিতরে।

হঠাৎ সচকিত হ'ল সান্ত্বনা। সম্ভবত নরেন চৌধুরীও। অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ ঘটল আর একজনের সঙ্গে। একজন নয়, দুজনের সঙ্গে। শাল মহুয়া পেরিয়ে দুজনেই থমকে গেল অদূরের জিপ গাড়িটা দেখে। ঘোষ-চাকলাদারের জিপ। শুকনো মড়াইএর ধারে পাশাপাশি বিচরণ করছে রণবীর ঘোষ আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরনা চ্যাটার্জি।

ওদের দেখে হর্ষোৎফুল্ল মুখে এগিয়ে এলো দুজনেই। রণবীর ঘোষ বলল, উৎসব দেখতে গিয়েছিলেন নাকি? ওয়াণ্ডারফুল, না?

নরেন কিছু জবাব দেবার আগেই ঝরনা বলে উঠল, এ মা, দেখব বলে এতদূর এলাম, আর দেখা হ'ল না। অনুযোগ করল রণবীর ঘোষকেই, আপনার জন্যেই তো, কেন নিয়ে গেলেন না?

নরেন বলল, জিপ রয়েছে সঙ্গে, এখনো যেতে পারেন।

ঝরনা সাগ্রহে তাকালো তার সঙ্গীর দিকে, চলুন যাই তাহলে। এগোতে গিয়েও সান্ত্বনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল, কি গো মেয়ে, আমাকে যেন চিনতেই পারছ না—তোমার মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না উৎসব দেখে এলে।

চশমার ওধারে চোখ দুটো তার হেসে উঠল। ও ধরা পড়ে নি, সান্ত্বনাই ধরা পড়ে গেছে যেন।

নরেন বলল, ওদের ওই আসুরিক আনন্দ দেখে সান্ত্বনার মাথা ধরে গেছে। আপনারা যাবেন তো যান তাড়াতাড়ি—সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর কি দেখবেন, এসো সান্ত্বনা—আচ্ছা, নমস্কার।

এগিয়ে চলল আবার। পাহাড়ী রাস্তা। উঠতে লাগল। এই মেয়েটার সঙ্গে ওই লোকটার এই অন্তরঙ্গতা সান্ত্বনা কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারছে না। যদিও মেয়েটা কেমন খুব বুঝেছে। সেদিন ওর সঙ্গে সেই পাহাড়ে উঠতে উঠতেই বুঝেছিল। আজ আরো বেশি বুঝল।

ওদের এখন ওখানে যেতে বললেন যে?

নরেন ফিরে তাকালো তার দিকে। হাসল একটু। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, বললেও ওরা যাবে না, গেলে আগেই যেত।

এতটা হাঁটার পর চড়াইয়ে ওঠাটা কষ্টকর বেশ। তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সান্ত্বনা বাড়ি যেতে পারলে বাঁচে এখন। মন বললে, আসা উচিত হয় নি। এমন জানলে আসত না। কিন্তু ভিতর থেকে আর একটা অনুভূতি যেন দ্বিগুণ বিব্রত করে তুলছে তাকে। এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা অনাকাঙ্ক্ষিত নয় খুব।... বেদনাদায়ক, কিন্তু অবাঞ্ছিত নয় যেন।

এইখানে বসা যাক একটু। নরেন একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল।

চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করল সান্ত্বনা। বসতে চায় না, তবু বসতে হ'ল। আপত্তি করতে গেলেই এই লোকটার চোখে আরো যেন ধরা পড়ে যাবে ও। কিন্তু কাউকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না, নিজেকেও না।

কি হ'ল বলো দেখি তোমার, অমন চুপ মেরে গেলে কেন? নরেন চৌধুরী প্রায় ঘুরে বসল তার দিকে।

বড় পাথরটাও খুব বড় মনে হচ্ছে না সান্ত্বনার। বলল, ওদের ওই অত ঢাকঢোল শুনে মাথাটা সত্যি ঝিম ঝিম করছে কেমন।

বাড়ি যাবে?

সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ, হ্যাঁ চলুন, বাবা হয়তো ভাবছে।

বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অবনীবাবু উল্টো কথা বললেন। এরই মধ্যে ফিরে এলে যে তোমরা, ভালো লাগল না বুঝি?

মায়ের কোলে বসে শিশু যেমন জাহির করে নিজেকে, বাড়ি ফিরে সান্ত্বনাও সেই চেষ্টাই করল প্রায়। হেসে বলে উঠল, ভালো আবার লাগবে না, খুব ভালো লাগল, লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি, নরেনবাবুকে ধরে রাখাই দায়।

হাসতে হাসতে ভিতরে চলে এলো। স্বতোৎসারিত নয়, ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাসি মিলিয়ে গেল।

রাত্রি।

ঘুম নেই সান্ত্বনার চোখে। এপাশ ওপাশ করছে খালি। আর যাবে না কক্ষনো। জীবনে আর ও-মুখো হবে না। অবশ লাগছে, ক্লান্ত লাগছে। অস্বস্তি একটা। কোথায়

যেন। কিসের যেন। চোখের সামনে, কানের পরদায় আর মনের অতলে কি সব আনাগোনা করছে। এলোমেলো দেখা, টুকরো টুকরো কথা, আর আবোল-তাবোল অনুভূতি। মাসতুত বোনের চপল ইঙ্গিত আর মাসিমার কথা। পাহাড়ের নির্জনে চাঁদমণি আর হোপুন আর চাঁদমণির হাসি। মড়াইয়ে রণবীর ঘোষ আর রণবীর ঘোষের সেই ক্লেদাক্ত চাউনি। সর্দারের কথা আর ভুতুবাবুর কথা আর বাহাদুর জমাদার। সর্দারের উৎসব আর ওই মেয়ে পুরুষদের নাচন মাতন আর মহুয়ার গন্ধ। ঝরনা আর ঝরনার সেই বন্ধু আর ঝরনা আর রণবীর ঘোষ। আর ও নিজে আর নরেনবাবু আর সেই পাথরে বসা আর সেই ভয় আর সেই...

আর সেই কি?

অন্ধকারে অধর দংশন করে নিজেকেই যেন চোখ রাঙালো সান্ত্বনা।

আর সেই যাতনা.... আর সেই ভয়-মেশানো প্রত্যাশা।

না, আর সে যাবে না, কক্ষনো যাবে না। কোন দিন না।

পরদিন ঘুম ভাঙলো খুব সকালে। হালকা লাগছে, ভালো লাগছে। আর একটু নতুনও লাগছে যেন। রাতের সেই অবসাদের বোঝা ভোলে নি। কিন্তু আজ আর সেটা তেমন সঙ্কোচের কারণ বলে মনে হচ্ছে না। তা বলে আজ আর যাবে না কোথাও। আজ কেন, কোন দিনই যাবে না। যাক, কিন্তু ভালো লাগছে।

বেলা গড়িয়ে গেল। বেয়ারার হাতে বাবার খাবারটা পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সেলাই নিয়ে বসল একটা।

...কিন্তু এখন আবার তেমন ভালো লাগছে না। পাগল সর্দার বলেছিল ডাংরা, অর্থাৎ গোরু নিয়ে নাচ হবে আজ। গোরু নিয়ে নাচ! সে আবার কি? কতই জানে ওরা। যাই হোক, কিছুতেই আজ আর ও পথ মাড়াচ্ছে না সে।

কিন্তু ক্রমশ কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল। থেকে থেকে মন টানছে কোথায়।

কোথায়?

সেই শাল মহুয়ার বন পেরিয়ে, সেই দুটো গ্রাম ছাড়িয়ে সেই নাচ আর সেই আনন্দ আর সেই বিস্মৃত ঘন মহুয়ার গন্ধ। নেশাগ্রস্তের নেশা ছাড়ার পণ না ভাঙা পর্যন্তই যত বিড়ম্বনা। সান্ত্বনারও সেই অবস্থা প্রায়। কেন, যাবে না-ই বা কেন? কোথায় বাধা? কিসের বাধা? অন্যায় তো কিছু করছে না; তবে—?

এই তবের সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণের একটা জমাটবাঁধা প্রতিরোধ সঙ্কল্পবিচ্যুতির এক পলকা হাওয়ায় উড়ে গেল। দিনের আলোয় যাবে আর দিনের আলোয় ফিরে আসবে।

শান্তি আর মুক্তি।

বৃদ্ধ মাতব্বরেরা তখনো আসেনি। পুরুষ ও মেয়েরা পৃথক পৃথক রঙ্গরসে মেতে আছে। পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে একজনকে মরা সাজিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। মেয়েরা গান গাইছে ঃ

বনেরো গুড়ুরি, কি খাঁয়ে আছে বেচারি।
শিকারী তো আছে বেনা বুদা আহড়্।
শিকারী তো বেনা বুদা আহড়ে,
গুড়ুরি তো চরি চরি বেড়ায়।

বনের গুড়গুড়ে পাখি বেচারী কি খেয়েই বা আছে। গুড়গুড়ে পাখি তো খুব চরে চরে বেড়ায়, এদিকে শিকারী তো বেনাঝোপের আড়ালে।

কিন্তু ওদের মধ্যে আসল গুড়গুড়ে পাখিটিকে দেখতে পেল না সান্ত্বনা। পুরুষের মধ্যে হোপুন আছে। বসে বসে ঝিমুচ্ছে যেন। হুঁকো হাতে জগমাঝি এসে মাঝে মাঝে ঘুরে যাচ্ছে। এ ক'টা দিন বিষম দায়িত্ব তার। কোনও ছেলেমেয়েদের মধ্যে গর্হিত কিছু ঘটলে সে দায় তার।

আসর আজও জমল খুব। কিন্তু কালকের মত লাগলো না সান্ত্বনার। আজকের ব্যাপারটা যেমন আসুরিক তেমনি স্থূল। খুঁটি পুঁতে গোরু বাঁধা হয়েছে ক'টা। তাদের তেল-সিঁদুর দেওয়া হয়েছে। ঘণ্টি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়েছে বেশ করে। তারপরে হৈ-হুল্লোড়। হঠাৎ এক একবার মাদল নাগরা ভেঁপু বেজে ওঠে, ভয় পেয়ে লাফিয়ে ওঠে গোরুগুলি। তার দ্বিগুণ লাফায় ওরা। মাতব্বরেরা দেখে আর হাসে। গোরু যত ভয় পায়, যত লাফায়, ওদের ততো ফুর্তি। গতকাল থেকে মদ খেয়ে সব অন্যরকম হয়ে আছে, যা করছে তাতেই আনন্দ।

চাঁদমণি কখন এসেছে খেয়াল করে নি। চোখে চোখ পড়তে আজ আরও বেশি অবাক হ'ল সান্ত্বনা। এই আনন্দ মাতামাতির সঙ্গে তার তেমন যোগ নেই যেন। কালকের থেকে আজ আরো বেশি রুষ্ট মনে হচ্ছে তাকে। সান্ত্বনা ভাবল উঠে গিয়ে কথাবার্তা বলবে ওর সঙ্গে। কিন্তু রকমসকম দেখে ভরসা পেল না। শুধু হোপুন নয়, আরো দু'পাঁচ জনের কানে কানে বলছে কি। আর তারা ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে ওকে। সে দৃষ্টিতে আর যাই থাক, হৃদ্যতা আছে বলে মনে হ'ল না সান্ত্বনার।

সুবিধে পেলে সর্দারকে হয়তো জিজ্ঞাসা করত কি ব্যাপার। কিন্তু বুড়ো একধার থেকে হুঁকো টানছে আর ঝিমুচ্ছে। এবার আর একটা আনন্দপর্ব দেখে সান্ত্বনা হেসে উঠল খুব। গান আর নাচের ভেতর দিয়ে পুরুষ আর মেয়েরা পরস্পরের নিন্দাবাদে মেতে উঠেছে খুব। সান্ত্বনা ঘাবড়ে গিয়েছিল প্রথম, ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দেবে নাকি রে বাবা। কিন্তু না। পুরুষেরা হাত ধরে নাচতে রাজী নয় মেয়েদের সঙ্গে, বলে তোদের হাত ভাঙা। আর মেয়েরাও পা মিলিয়ে নাচতে রাজী নয় পুরুষদের সঙ্গে, বলে তোদের পা গোদা। তারপর হাসির হাট এবং নাচ। ওদের এই আপসের রঙ্গ দেখে সান্ত্বনাও হেসে সারা।

কিন্তু হাসি থেমে গেল আবার চাঁদমণির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই। তার চোখে খুশির লেশমাত্র নেই কোথাও। দর্শকদেরও অনেকেই নাচ ছেড়ে বার বার নিরীক্ষণ করছে তাকে।

কিন্তু এ নিয়ে আর ভাববারও সময় পেল না। বেলা পড়ে এসেছে। বাড়ি পৌছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আজ আর সঙ্গে কেউ নেই। চিন্তিত মুখে যাবার জন্য

উঠে দাঁড়াল সে। হুকো হাতে পাগল সর্দার কাছে আসতে বলল, যাই সর্দার, ভয়ানক দেরি হয়ে গেল, একা একা যাব।

ঘুম-ঘুম চোখেও সর্দার ওর দুশ্চিন্তাটুকু উপলব্ধি করল যেন। কি ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়ে হোপুনকে ইশারায় ডাকল কাছে। দিদিয়াকে বাড়ি পৌছে দিতে বলল সে।

না না না, কিছু দরকার নেই। ব্যস্ত হয়ে উঠলো সান্ত্বনা, এই তো, কতক্ষণ আর লাগবে যেতে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল।

কিছুদূর এসে পিছন ফিরে তাকাতেই দেখে, অলস মন্থর গতিতে হোপুন আসছে পিছনে পিছনে। সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে পড়ল। বিরক্তও হল মনে মনে। হোপুন কাছে আসতে বলল, আমার সঙ্গে আসতে হবে না, তুমি ফিরে যাও, আমি একলা খুব যেতে পারব।

ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ চোখে হোপুন চেয়ে রইল শুধু।

সান্ত্বনা জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল আবার। অনেকটা দূরে এসে পিছনে ফিরে তাকালো আর একবার। আর মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

হোপুন ফিরে যায় নি। তেমনি নির্বিকার পদক্ষেপেই অনুসরণ করছে তাকে।

না থেমে সান্ত্বনা দ্রুত চলতে লাগল আবার। কি মতলব লোকটার? চিন্তিত হ'ল এবারে। পর পর দু'দিনই কেমন কেমন লেগেছে। চাঁদমণির কানে কানে কথা বলা আর এদের চাউনি। দু'দিন ধরে সমান মদ টেনে চলেছে মনে পড়তে বেশ ভয়ও ধরল। রেগে গেল পাগল সর্দারের ওপর। কি দরকার ছিল সর্দারী করে ওকে সঙ্গে যেতে বলার।

বেশ জোরেই পা চালিয়েছে সান্ত্বনা। শাল মহুয়ার বন পেরোলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ওধারে দু'পাঁচজন লোকজনের যাতায়াত আছে।

কিন্তু নিশ্চিন্ত জায়গায় এসেই পা যেন একেবারে স্থাণুর মত আটকে গেল মাটির সঙ্গে। পাহাড়ী চড়াইয়ের ধারে রণবীর ঘোষের সেই জিপ। সঙ্গে সঙ্গিনী নেই আজ। জিপে ঠেস দিয়ে একলাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে। সামনের দিকে চেয়ে আছে, এখনো দেখে নি ওকে।

ত্রিশঙ্কুর অবস্থা।

ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে তাকালো সান্ত্বনা। যথাপূর্ব হোপুন আসছে ঠিকই। নিজের অজান্তে দু'চার পা পিছিয়েই গেল। হোপুন কাছে এসে দাঁড়াল। সান্ত্বনা প্রায় অসহায় দৃষ্টিতেই তাকালো ওর দিকে। হোপুন দেখল ওকে ; দেখল দূরের জিপটাকেও। কিন্তু কিছু উপলব্ধি করেছে কি করে নি, মুখের দিকে চেয়ে বোঝা গেল না কিছুই, পাশাপাশি এগিয়ে চলল তারা।

নীল চশমা নেই। খুশিতে একবার ঝকঝকিয়ে উঠেছিল বুঝি রণবীর ঘোষের মুখ। কিন্তু সান্ত্বনার মনে হ'ল পরক্ষণেই যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল হঠাৎ।

কি, আজও এসেছিলেন নাকি?

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল শুধু। জিপে করে বাড়ি পৌছে দেবার আহ্বান প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে সে। ঘোষ বলল, আপনার আগ্রহ তো খুব। আমি এখানটায়

প্রায়ই আসি বেড়াতে। নিরিবিলিতে বেশ লাগে।

ওই পর্যন্তই। জিপে পৌঁছে দেবার আমন্ত্রণ এলো না। সান্ত্বনা মনে মনে অবাকই হ'ল একটু।

চড়াই। আর এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল না সান্ত্বনা। হোপুনের পাশেপাশে চলতে লাগল। আড়চোখে ওকে দেখলও বারকতক। ইচ্ছে হ'ল, যা হোক কিছু কথা বলে ওর সঙ্গে। ইচ্ছে হ'ল, চাঁদমণির সঙ্গে এই চৈত্র মাসেই ওর যে বিয়ে দেবার কথা ভাবছে পাগল সর্দার, সেই সুসমাচারটা জানিয়ে দেয়। কিন্তু একটা কথাও বলা সম্ভব হ'ল না।...সঙ্গে আসছে বটে, কিন্তু ঠিক যেন জ্যান্ত মানুষ নয়।

ভয় গেছে। পাহাড়ের মাথায় উঠে এসেছে তারা। আর মিনিট পনেরও লাগবে না বাড়ি পৌঁছুতে। সান্ত্বনা দাঁড়াল। খুব মিষ্টি করে বলল, এবারে তুমি ফিরে যাও হোপুন, এখন আমি ঠিক যেতে পারব।

ঠাণ্ডা দুই চোখ তুলে হোপুন তাকালো ওর দিকে। মাথা নেড়ে বলল, সর্দার তুকে ঘরতক্ এখে আসতে বুলেছে।

ওর সুবিধে-অসুবিধের কথা ভেবে সঙ্গে আসছে না সে, আসছে সর্দার বলেছে বলে। চুপচাপ পথ চলা আবার। সান্ত্বনার আনন্দ হচ্ছে একটু। চাঁদমণি যে জন্যেই ওর ওপর চটুক, আর দলের লোকের কানে কানে যাই গুজগুজ করুক, ওর জোরটা কোথায় সেটা এরা বেশ ভালো করেই জানে।

একেবারে বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত ওকে পৌঁছে দিয়ে তেমনি মন্থর পদক্ষেপে আবার ফিরে চলল হোপুন।

পরদিন আর নয়। আর যাওয়ার সম্ভাবনাটা সান্ত্বনা চিন্তা থেকে বাতিল করে দিল।

কিন্তু তার পরদিন আবার....।

ভোরের আলোয় ঘুমন্ত পাখির ডানা যেমন উসখুস করে ওঠে, তেমনি এক বাঁধনছেঁড়া মুক্তির ছোঁয়ায় ওর এই একদিনের অবকাশ-আচ্ছন্ন মনের তলায় তলায় একটা টান পড়তে লাগল। মনের জোরও বেড়েছে। বিগত একদিনের আচরণে রণবীর ঘোষও তুচ্ছ হয়ে গেছে ওর কাছে।

গত দিনের থেকে আজ আবার অনরকম লাগছে সান্ত্বনার। প্রায় প্রথম দিনের মতই। নরেনবাবু পাশে থাকার অস্বস্তিও নেই। হাতের ফাঁকে হাত গুঁজে নাচছে একদল মেয়ে-পুরুষ। নাচছে না, নিজেদের একেবারে সমর্পণ করে দিচ্ছে যেন। অন্য একদিকে গোল হয়ে বসে একদল মেয়ে গান ধরেছে। ভাত মাংস পরিবেশন করা নিয়ে যে সমস্যায় পড়েছে তারা ঃ

থোড়া থোড়া মুরগী শূকর।
বহু বহু কুটুম
ভাত কিম্বা ঝোল
আমি বাবা না পারি বাটতে।

কিন্তু সান্ত্বনা আসার মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে লাগল কেমন। আসর ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। সান্ত্বনা প্রথমে ভাবলে, চারদিন ধরে ক্রমাগত মদ খেয়ে খেয়ে ওদের এই অবস্থা বোধ হয়।

কিন্তু না।

আজ আর শুধু চাঁদমণি নয়। শুধু হোপুন বা আর পাঁচ সাত জন নয়। ওই নারী-পুরুষেরা আজ এক প্রতিকূল স্তব্ধতায় বার বার নিরীক্ষণ করছে তাকে। আগে খেয়াল করে নি সান্ত্বনা। শুধু চাঁদমণিকেই দেখেছিল। তার রাগ-বিরাগের ধার ধারে না, সেটা বোঝাবার জন্যে আর ফিরেও তাকায় নি। রোজ কাঁহাতক ভাল লাগে। একটা দিন না আসার দরুন চোখ-কান-মন দিয়ে ওই নাচগানে বুঝি মেতে উঠেছিল সান্ত্বনা। একটু বেশিই হাসছিল বোধ হয় আজ। কিন্তু হঠাৎ একসময় মনে হ'ল যারা নাচছে আর যারা গাইছে তাদের সঙ্গে খুব যেন একটা যোগ নেই বাকি নারী-পুরুষদের। থেকে থেকে যেন একটা শিথিল ছেদ পড়ছে। হ্যাঁ, ওকেই দেখছে ওরা। মাতব্বরেরা অনেকে। নিজেদের মধ্যে কি ফিস ফিস করছে মাঝে মাঝে। ওদের চার দিনের মদ খাওয়া ঘোলাটে চোখে প্রীতির আমেজ নেই।

সান্ত্বনা অবাক। প্রথমে সঙ্কোচ, তারপর অস্বস্তি, তারপর ভয়-ভয় একটু। নাচ গান করছে যারা, সাড়া না পেয়ে তারাও ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে এদিকে। ক্রমেই অন্যরকম লাগছে। ওদের মুখের ভাব কঠিন হচ্ছে ক্রমশ। একটা অজানা আশঙ্কায় সান্ত্বনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল সকলের দিকে।

এরা এমন করছে কেন?

এ ভাবে দেখছে কি?

চাঁদমণি কোণের এক দিকে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন শাণ দেওয়া অস্ত্র একখানা।

হোপুনের চোখ দুটোও তার মুখের ওপর সংবদ্ধ—আরো মরা, আরো নিষ্প্রাণ। এমন কি জগমাঝির চাউনিও অনুকূল নয়। অন্তত সেইরকম মনে হল সান্ত্বনার।

ভয়ে বিস্ময়ে হকচকিয়ে গেল একবার। তারপরেই ওর ব্যাকুল দুই চোখ বিশেষ করে খুঁজে বেড়ালো কাকে।

সর্দার কই...পাগল সর্দার...।

পাগল সর্দারও তাকেই দেখছিল।

দৃষ্টি বিনিময় হতে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার পাশে বসল। সশঙ্ক ভীরু চোখে সান্ত্বনা তাকালো তার দিকে।

সামনের নারী-পুরুষের দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাগল সর্দার হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল যেন—বেঁজায় বুল আকানাথ? চেৎ হোয় এনা? এনেঃ ই মে। সেরিং সেরিং মে—।

বেজায় নেশা হয়েছে বুঝি? হ'ল কি সব? নাচ্ না। গান কর না।

যেটুকুও নাচগান হচ্ছিল থেমে গেল।

সর্দার সান্ত্বনাকে বলল, চল দিদিয়া, তুকে ঘর পানে ছেড়ে আসি।

যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়ালো সান্ত্বনা। অজ্ঞাতসারে চাঁদমণির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হ'ল আবারও। হিংস্র ধারালো মূর্তি, পারলে সান্ত্বনার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এক্ষুনি।

অনেকটা পথ এসে পাগল সর্দারই কথা বলল প্রথম। তু উদের মাজ্জনা করে লে দিদিয়া। আতভর হাঁড়িয়া খেয়ে উদের মাথার ঠিক লাই।

কাতর আবেদন কথাগুলির মধ্যে। সান্ত্বনা আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকালো। মদ পাগল সর্দারও কিছু কম খায় নি। শুধু এ জন্যেই নয়। কারণ আছে কিছু। কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কেঁপে গেল সান্ত্বনার। বলল, কিন্তু ওরা সবাই আমার ওপর রেগে গেল কেন? আমি কি করেছি?

বারকতক ঘাড় নাড়ল সর্দার। পরে বলল, তু কিছু করিস লাই, তু ওজ এসে খুব হাসিস, উ-সব ভাবল উদের লিয়ে তু 'সিরোগ' (ঠাট্টা) করতে লেগেছিস। ভদ্দনোক সিরোগ করলে পেচণ্ড রপমান হয়।

সান্ত্বনা হতভম্ব।—কিন্তু আমি তো একটুও ঠাট্টা করে হাসি নি সর্দার।

সর্দার বারকতক মাথা নাড়ল আবারও। অর্থাৎ, সেটা সে খুব ভালো করেই জানে। বলল, দিদিয়া যেন কিছু মনে না করে, দিদিয়া যেন 'আগ' না করে, নেশা টুটে যাক, ও ওদের সবকটাকে দেখে নেবে, সবকটাকে টেনে এনে দিদিয়ার পায়ের কাছে গড় করাবে।

চুপচাপ চলতে লাগল তারপর। কিন্তু ভিতরটা চুপ করে নেই সান্ত্বনার। কেন? কেন ওরা এমন করল আজ?

চাঁদমণি সকলকে উসকে দিয়েছে, উত্তেজিত করেছে তাই।

কিন্তু কেন?

কেন মড়াইয়ে চাঁদমণি সেদিন কাজ থামিয়ে অমন জ্বলন্ত চোখে ভস্ম করতে চেয়েছিল তাকে? কেন এখানেও এমন হীন মিথ্যে কৌশলে এই নেশাগ্রস্ত নারী-পুরুষদের তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে ছিল চাঁদমণি? প্রত্যেক দিনই সান্ত্বনা স্বচক্ষে দেখেছে সেটা, উপলব্ধি করেছে। কিন্তু কেন? কেন?

বলবে নাকি পাগল সর্দারকে, সকলকে টেনে আনতে হবে না, নিজের মেয়েকে শুধু জিজ্ঞাসা করে দেখো, তার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ নাও।

কিন্তু বললে এর জের অনেক দূর গড়াবে। কিছুই বলল না। বলতে পারল না। নিঃশব্দে বাড়ি পৌঁছলো। নিঃশব্দে বিদায় দিল পাগল সর্দারকে। সচরাচর যা হয় না, তাই হয়ে গেল তারপর, রাগে দুঃখে অপমানে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আর কোনদিন ওদের সংস্রবে যাবে না, আর কোনদিন কাছে টানতে চাইবে না ওদের।

কিন্তু পরের ক'টা দিনের মধ্যে এই ছোট পরিসরে আচমকা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল একটা। এরকম বিপর্যয় এখানকার বাসিন্দারা হয়তো আর দেখে নি কখনো। মানুষ ছেড়ে মড়াই ঘেরা শুকনো পাহাড়টা পর্যন্ত যেন নাড়া খেল একপ্রস্থ।

সান্ত্বনা জানত না কিছুই। গত দশ পনের দিন বাড়ি থেকেও বেরোয় নি বড়। সেদিনের সে অপমান তখনো ভোলে নি। খবরটা দিল ওর গোরুর জন্য বহাল আছে যে ছোকরা সে। জানালো, পাহাড়ের নিচে দোকানের রাস্তায় শ'য়ে শ'য়ে লোক জমছে আর ডাল ফেরাচ্ছে।

সান্ত্বনা অবাক।—ডাল ফেরাচ্ছে কি রে!

হঁ গো দিদিয়া, পাগল সর্দারের 'বিটলা' হবে। উকে মেরে কেটে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে এক্কেবারে।

শুনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল সান্ত্বনা। বুঝল না কিছু, কিন্তু বিষম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে পাগল সর্দারের—এটাই বুঝল শুধু। ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন? কেন রে?

ছোকরাটা ততক্ষণে আরো কিছু জানার উত্তেজনায় একটু খবর দিয়েই আবার ছুটেছে। বিমূঢ় ভাবটা কাটতেই অস্থিরচিত্তে ঘরবার করতে লাগল সান্ত্বনা। বাবাও নেই, সকালে নিচে নেমে গেছে, একটা খবর করারও উপায় নেই।

স্থির থাকতে না পেরে ঘরের শিকল তুলে দিয়ে পারে পায়ে মেন কোয়ার্টারস্-এর পথে চলে এলো। কিন্তু সেখান থেকেও বোঝা যাচ্ছে না কিছু। প্রায় নিচে নেমে আসার পর থমকে দাঁড়ালো। ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে অনেক লোকজনের একটা জটলা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তার থেকে বেশি দেখা যাচ্ছে তাদের হাতে হাতে পাতা সমেত ছোট ছোট শালের ডালগুলো। ভেতরটা কাঠ হয়ে আসছে সান্ত্বনার।

দুই-একজনকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার। তারাও ব্যাপার দেখতেই চলেছে। বলল শুধু, বিটলা হবে পাগল সর্দারের।

কেন হবে?

বা রে—ওর মেয়েটা যে ঘর ছেড়ে বেজাতের সঙ্গে পালিয়েছে!

তাই ডাল ফেরাচ্ছে ওরা, গাঁয়ে গাঁয়ে খবর পাঠাছে।

সান্ত্বনা স্তম্ভিত।

আস্তে আস্তে ভুতুবাবুর দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ব্যতিব্যস্ত এখন ভুতুবাবুও। দোকানের সামনে বিভিন্ন জাতের দর্শক। নারী পুরুষদের ভিড়। রাস্তার ওপরেই চা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হচ্ছে তাদের। তফাতে দাঁড়িয়ে ইশারায় সান্ত্বনা একজনকে বলল, ভুতুবাবুকে ডেকে দিতে।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে ভুতুবাবু এসেই বলল, দেখুন কাণ্ড মা-লক্ষ্মী, ওই সর্দারটাকে একেবারে শেষ করে ছাড়বে সব—ওদের বিটলা বড় সাংঘাতিক ব্যাপার।

ভুতুবাবুর কথা থেকে ব্যাপারটা মোটামুটি বুঝল সান্ত্বনা। বুঝে শরীরের রক্ত আরো জল হয়ে গেল। বিটলা অর্থাৎ সমাজচ্যুতি। তেমন বড় রকম কিছু না ঘটলে বিটলা সচরাচর হয় না আজকাল। কিন্তু বড় রকমেরই ব্যাপার এটা। খোদ মাঝির ছেলের বউ হবে বলে বাগদত্তা হয়ে আছে, সে পালিয়েছে বেজাতের সঙ্গে—সোজা কথা নাকি? ওই সর্দারের জন্যই এরকমটা হয়েছে, নইলে হোপুন তো আজ দু'বছর

ধরে হাঁ করে বসে আছে চাঁদমণিকে বিয়ে করার জন্যে। সর্দারই ইচ্ছে করে দেয় নি বিয়ে। মাঝি-মাতব্বরদের বরাবরই বেজায় রাগ সর্দারের ওপর—ছেলেটার জন্যেই করতে পারছিল না কিছু—এবারে ছেলেই বিগড়েছে সব থেকে বেশি—কাজেই এখন পোয়া বারো, আগের রাগও সুদে আসলে ঝালিয়ে নেবে সব। শ'য়ে শ'য়ে লোক দল বেঁধে যাবে, বাড়িঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবে, উঠোন কুপিয়ে ঝাঁটাবাঁশ পুঁতবে। আর সর্দার?

সর্দারকে আর পাবে কোথায়? বিটলা যায় হয়, সে কি বাড়িতে বসে থাকে? তাকে পালাতেই হয় কোথাও না কোথাও। নইলে একেবারে ছালচামড়া ছাড়িয়ে তাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলে দেবে না! কেউ আটকাতে পারবে না, কেউ আসতেই সাহস করবে না এ সব ব্যাপারে। পাগল সর্দার নিশ্চয় এতক্ষণে সরে গেছে কোথাও। মিটিং করে বিচার না হওয়া পর্যন্ত তাকে কেউ আটকাচ্ছে না। পরে ফিরে আসতে পারে আবার। তখন প্রাণে আর কেউ মারবে না বটে, কিন্তু সমাজ তার কাছে একেবারে বন্ধ।

নিস্পন্দের মতই সান্ত্বনা ফিরে এলো। কিন্তু বাড়ি এসে ছটফটানি চতুর্গুণ বাড়ল। কি করবে এখন? কি করা যায়? কি করার আছে? ছোকরা চাকরটা এসেছে দেখে তৎক্ষণাৎ তাকে পাঠাল বাবাকে সংবাদ দিতে। তিনি ওপরেই যেন খেতে আসেন আজ, আর খুব তাড়াতাড়ি আসেন যেন। কি ভেবে ডাকল তাকে আবার। আর শোন্, নরেনবাবুকে খবর দিবি একটা, বলবি ট্রাকে করে এক্ষুনি যেন একবার আসেন, বিশেষ দরকার।

পাগল সর্দার বিপন্ন। এতবড় বিপদ বোধ করি কারো হয় না কখনো। কিন্তু থেকে থেকে এই অপরিসীম দুশ্চিন্তার মধ্যেও মনের তলায় আর এক প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ভুতুবাবুর সঙ্গে কথা বলার সময়েও মনে হয়েছিল, কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। পাগল সর্দার বিপন্ন কারণ তার ওই দজ্জাল পাজী মেয়েটা ঘর ছেড়ে চলে গেছে কারো সঙ্গে....।

....কার সঙ্গে?

এই মেয়ের দ্বারা সবই সম্ভব। তবু এতটা কল্পনাতীত। চালচলন যেমনই হোক, ওই হোপুন লোকটার প্রতি অন্তত...যাকগে, গেল কার সঙ্গে?

অবনীবাবুই বাড়ি ফিরলেন আগে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তিনিও। ট্রাক এবং লোকজন দিয়ে নরেনকে পাগল সর্দারের খোঁজ করতে পাঠিয়েছেন। বাড়িতে পাওয়া যায় নি তাকে। পেলে অন্তত বিশ তিরিশ মাইল দূরে কোথাও রেখে আসতে হবে।

অধীর প্রতীক্ষা আবার। অবনীবাবু ফিরে আপিসে বেরুবার আগেই নরেন এলো।

সর্দারের দেখা মেলেনি। ব্যাকুল হয়ে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, কি হবে তাহলে?

কি আবার হবে, মার খেয়ে মরার জন্যে ও এখানে বসে আছে নাকি, নিশ্চয় গেছে কোথাও।

যথাসময়ে আবার আপিস করতে বেরিয়ে গেল তারা। সান্ত্বনার মন মানছে না। যদিই সর্দারকে ওরা ধরে ফেলে! যদিই খুঁজে বার করে! হিংস্র প্রতিশোধ নিতে

এবার সবার আগে এগিয়ে আসবে মাঝির ছেলে হোপুন। যতবার মনে হয় সেকথা, ততবারই কন্টকিত হয়ে ওঠে। একটা অব্যর্থতার বর্ম আঁটা হোপুনের চোখে-মুখে চালচলনে। লোকটা সহায় হলে ভয় নেই, শত্রু হলেও রক্ষা নেই।

ডু ডু ডুম! ডু ডু ডুম! ডু ডু ডুম!

আঁতকে উঠল সান্ত্বনা। দুপুর গড়ায় নি তখনো। নাগরা বাজানোর শব্দ আর কোলাহল একটা। বাইরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল সে। এই পথেও পাহাড় ডিঙিয়ে দলে দলে লোক চলেছে পাগল সর্দারের ঘর বাড়ি উচ্ছেদ করতে। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠল সান্ত্বনার। বসে পড়ল সেখানেই।

সন্ধ্যোর আগেই নরেন চৌধুরী এলো আবার। কিন্তু সান্ত্বনা তখন কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহসও হারিয়ে ফেলেছে প্রায়।

নরেন বলল, পাগল সর্দার যায় নি কোথাও, সে বাড়িতেই ছিল।

অ্যাঁ—! অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সান্ত্বনা।

ভেবো না কিছু, সে ভালো আছে।

এইটুকুই নয় শুধু। বিস্ময়ে অভিভূত হবার মতই শোনার ছিল আরো কিছু।

লাঠিসোঁটা কোদাল শাবল নিয়ে প্রায় হাজার লোক নাকি গিয়েছিল পাগল সর্দারের ভিটে-মাটি নির্মূল করতে। সকলের আগে ছিল গাঁয়ের মাঝি হোপুনের বাবা আর অন্য মাতব্বরেরা। তাদের ইঙ্গিত মাত্রে নিষ্ঠুর উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত সকলে।

কিন্তু মাঝি মাতব্বরদের পিছনে পটে-আঁকা ছবির মতই দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল সকলকে।

পাগল সর্দারের ভিটে আগলে পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে একজন। হাতে তীরধনুক, পিঠে তীরের বোঝা।

হোপুন।

আদিম হিংসায় আজ সকালেও যে হোপুন তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে পাগল সর্দারকে! মড়াইয়ের সমস্ত ইঁট পাথর উপড়ে ফেলে যে খুঁজে বার করতে চেয়েছে ওই বাপ-মেয়েকে! যে ছেলের এত বড় প্রতিহিংসা ঠিক তত বড় করে চরিতার্থ করার জন্যই বিটলার আয়োজন মাঝির!

দূরের জনস্রোত দেখেই পাষাণ-মূর্তি হোপুনের হাতের ধনুক বেঁকে গেছে গোল হয়ে, ছিলায় পড়েছে নির্মম টান। ওই একটা তীর এক উদ্যত বাজের মত সহসা এক সহস্রের গতিরোধ করে দিল যেন।

বিমূঢ়, বিভ্রান্ত সকলে।

বাপের উদ্দেশে একবার মাত্র হুঙ্কার শোনা গেছে ছেলের।—ওদের ফিরে যেতে বলো, হোপুন বেঁচে থাকতে একটা লোকও যেন তার তীরের আওতায় না আসে। সর্দার এখানেই আছে, যায় নি কোথাও, কিন্তু তাকে মারতে হলে দু'জনকেই মারতে হবে, আর অনেককে মরতে হবে। তাদের যেতে বলো। ওদের বলে দাও, বিটলা হবে না।

মাঝি কি করবে? কি হ'ল, কেন হ'ল, ভাবার সময়ও নেই। ছেলের হিংসা মেটাতে এসে ছেলেকেই মারবে সকলের আগে? পাগল সর্দারও পালায় নি, মরবার জন্য বসে আছে প্রস্তুত হয়ে, এও এক অভিনব খবর! শুধু মাঝি নয়, বিভ্রান্ত সকলেই।

মাঝি ঘুরে দাঁড়াল।

মাতব্বরেরাও।

বোবা পুতুলের মতো সেই সংস্কারাচ্ছন্ন সহস্রের উদ্দেশে মাঝি বলল, চলো ভাই, বিটলা হোক মারাংবুরুর ইচ্ছে নয়। পরে শুনব, পরে ভাবব।

অনুক্ষণ ছবিটা যেন চোখের সামনে ভেসেছে সান্ত্বনার। পর পর তিন দিন অধীর আগ্রহ নিয়ে মড়াইয়ে এসেছে তার পর, কিন্তু সর্দারের দেখা পায় নি। হোপুনকে দেখেছে। তেমনি উঠছে হাতের কোদাল, তেমনি নামছে।...কিন্তু ঠিক তেমনি নয়। আঘাতে আঘাতে ঝরে পড়ছে যেন অন্তস্তলের পুঞ্জীভূত যত ক্ষোভ। সাহস করে কাছে যেতে পারে নি সান্ত্বনা।

কার সঙ্গে ঘর ছেড়েছে আর এই মানুষটাকে ছেড়েছে চাঁদমণি, সেও আর অজানা নয় কারো। মড়াই থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে আরো একজন। বাহাদুর জমাদার। এ খবর শুনে কেন জানি সান্ত্বনার উত্তেজনা কমেছে অনেকখানি।

আরো দিন দুই পরে পাগল সর্দারের বাড়ি গিয়েছিল সান্ত্বনা।

...মানুষটা পাথর হয়ে গেছে।

বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেন একাকার হয়ে গেছে সান্ত্বনার। বলতে পারলে বলত, সর্দার, চেয়ে দেখো—এখনো তোমার একজন মেয়ে আছে সর্দার।

...একদিন। দু'দিন...।

মুখ ফুটে সর্দার কথা বলেছে তার পর। বলেছে, হোপুন মরদ ছে দিদিয়া, জমছিম বোঙ্গর (সূর্যদেবের) ব্যাটা আছে উ...

আরো কয়েকদিন গেছে তার পর।

সর্দার মেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপনও করে নি একবার। শুধু বলেছে, আগের দিন হলে, ইতিহাসের দিন হলে, রক্তে ভেসে যেত মড়াই। ইতিহাসের যুগে, সিধু কানুর যুগেও প্রথম রক্তের বান ডেকেছিল গোরা সাহেবরা ওদের তিনটে মেয়ে চুরি করার পরেই।

সান্ত্বনা বলতে গিয়েছিল, তার মেয়েকে তো চুরি করে নি কেউ, আর কোন ভদ্রলোকেরও কাজ নয় এ। কিন্তু সাদা আগুন সর্দারের শুকনো চোখে। ভয়ে চুপ করে গেছে সান্ত্বনা।

কিন্তু সর্দারের চোখের ও আগুন নিবতেও দেখেছে আবার।

হোপুনই বাঁচিয়েছে তাকে। আগেও বাঁচিয়েছিলো। কিন্তু আগে সর্দারও বাঁচতে চেয়েছিল। এবারে কোন দরকার ছিল না। তবু বাঁচিয়েছে। মারতে এসেও বাঁচিয়েছে।

পালাতে গিয়েও ফিরে এসেছিল সর্দার। বিটলার আয়োজন হচ্ছে জেনেও নিঃশব্দে ফিরে এসেছে। এই সংস্কারাচ্ছন্ন উন্মত্ত জনতাই সব নয়, তারও শুভার্থী সংখ্যা আছে কিছু। কিন্তু কাউকে ডাকে নি সে। হোপুন নেবে প্রতিশোধ, ডাকবে

কেন কাউকে!

চুপি চুপি একজনকে দিয়ে শুধু হোপুনকেই খবর পাঠিয়েছিল সর্দার।

হোপুন এসেছিল।

নিরস্ত্র আসে নি। অস্ত্র নিয়ে এসেছিল। জিঘাংসা নিয়ে এসেছিল।

সর্দার বললে, এসো হোপুন, আমাকে মারতে চাও তো? সেইজন্যেই ফিরে এসেছি আমি। সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি।

হোপুন দেখেছে তাকে। সেই খুন-চোখে হাড়-পাঁজরা সরিয়ে সরিয়ে দেখেছে একেবারে। তার পর কথা বলেছে।—চাঁদমণির সঙ্গে এত দিন আমার বিয়ে দাও নি কেন?

দিই নি, তুমি 'ছাড়ুই' হতে বলে। ছাড়ুই হয়ে আমার মতো চিরকাল জ্বলতে বলে।

আরো বলেছে সর্দার। বলেছে, বিয়ে দেয় নি নিজের মেয়েকে সে চিনত বলে, আর ওই মেয়ের মাকে চিনত বলে—আর ওই মেয়ে কারো ঘরে থাকবে না জানত বলে।

কিন্তু এসব বলোনি কেন কখনো? নিষ্পলক চোখে চেয়ে হোপুন জিজ্ঞাসা করেছিল।

বলে নি চাঁদমণি যেমন মেয়েই হোক নিজের মেয়ে বলে, আর.... একদিন শুধরে যেতেও পারে, মনে মনে এই আশা না করে পারত না বলে।

কিন্তু বিয়ে হলে শুধরে যেতেও পারত। চোখ থেকে খুন সরে যাচ্ছে হোপুনের।

পাগল সর্দার জবাব দিয়েছে, হোপুনের বয়সে সেও কম জোয়ান, কম মরদ, কম প্রিয় ছিল না মেয়েদের। কিন্তু তবু চাঁদমণির মা ফুলমণি তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। হোপুন তার বুকের পাঁজর। সে পাঁজর সে ভেঙে দিতে চায় নি বলেই অপেক্ষা করছিল আর আশা করছিল।

হোপুন দেখছিল চেয়ে চেয়ে। নির্নিমেষে দেখছিল আর চোখ থেকে খুন সরে যাচ্ছিল।

তার পরে, অনেকক্ষণ পরে, পারে পায়ে হোপুন বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

আবার ফিরেছে।

ধনুক নিয়ে। আর তীর নিয়ে।

॥ ৮ ॥

মড়াইয়ের চেহারা বদলে যাচ্ছে একটু একটু করে, সেটা বেশ বোঝা যায় এখন। প্রতিরোধের এক-একটা সাদা পাষাণ অঙ্কুর গজাচ্ছে এখানে সেখানে। দিনে দিনে বাড়ছে সেগুলো। শুকনো গৈরিকের মাধুরী বিদীর্ণ করা শ্বেতকায় স্ফীত স্তম্ভগুলো পরস্পরের সঙ্গে এসে মিলবে একদিন, বাতাস চলাচলেরও ফাঁক থাকবে না মাঝে, সেটা এখনো অবশ্য বোঝা যায় না। ওগুলোকে এরা বলে ব্লক। যে যার পৃথক

সত্তায় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এখন। ওর প্রত্যেকটার পিছনে যে এত জল্পনা-কল্পনা, এত কারিগরি, এত অসংখ্য ছোট বড় প্রয়াস পাষাণবন্দী হয়ে আছে, চোখে দেখেও ঠাহর করা শক্ত।

ঋজু কঠিন এক প্রকাশের তপস্যায় বসেছে মড়াই, তার আভাস সর্বত্র। মড়াইয়ের বুকের এক-একটা অতিকায় গহ্বর যেন অমনি করে নিটোল পাষাণ-প্রাচীরে ভরে ওঠার জন্য উন্মুখ তাগিদ দিচ্ছে নিঃশব্দে। কাজ বাড়ছে। কাজের তাগিদে বাড়ছে। মাশুলও দিতে হচ্ছে এক এক সময় বড় কম নয়। ছোটখাটো অঘটন ঘটে যাচ্ছে মাঝে মাঝেই। গোড়ায় গোড়ায় এত হয় নি। কিন্তু এত বড় সৃষ্টির বেদিতে এটুকু অর্ঘ্য না দিলে নয়, এও যেন মেনে নিয়েছে সকলে। দুর্ঘটনা হয়, জীবনের অবসান ঘটে দু'টো চারটে। কেন হ'ল বা কার দোষে হ'ল সেটা পরের ব্যাপার, নথিপত্রের ব্যাপার। মড়াইয়ে বোবা শঙ্কার ছায়া নামে কিছুক্ষণের জন্য বা কিছুদিনের জন্য। তার পর আবার কাজ, আবার কাজের তাগিদ। তুমি চাও বা না চাও। ওই সৃষ্টির সঙ্গে তোমার সকল গ্রন্থির অমোঘ বাঁধন পড়ে গেছে একটা।

কিন্তু সেদিনের অঘটনটা অন্য রকমের। যেমন ঘটে সচরাচর, তেমন নয়।

ছোট্ট এক দূষিত ক্ষত যেমন পারে গোটা একটা দেহ বিষিয়ে পঙ্গু করে ফেলতে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির চোখে তেমনি হঠাৎ এক ধ্বংসকীট বুঝি গোচর হ'ল এত বড় সৃষ্টি-সমারোহের মর্মস্থলে। কিন্তু খুব সহজে নির্মূল করার মত ক্ষীণায়ু নয় সেই ধ্বংসকীট। ফলে অনাগত এক কালবৈশাখীর শঙ্কা জাগল অনেকের মনে।

ঘুরে ঘুরে মড়াইয়ের কাজ দেখছিল। আরও জনা-দুই অফিসার ছিলেন সঙ্গে। কথায় কথায় একজন অফিসার খবর দিলেন, অমুক ব্লকএ বড় রকমের একটা ফাটল দেখা গেছে, মাটির নিচে যা আছে আছে—ওপরের এক দিক ভেঙে আবার নতুন করে জুড়তে হবে। মাটির ওপর সামান্যই তোলা হয়েছে, কাজেই অসুবিধে হবে না খুব।

শুনে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মনে খটকা লাগল কেমন। বলল, চলুন দেখে আসি।

দেখে খটকাটা বাড়ল আরো। আড়াআড়ি ফাটল একটা। অনেক কারণে হতে পারে। পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া দেওয়ালের সেই ফাটলের দিকটা ভেঙে আবার মেরামত করে নেওয়া কঠিন কিছু নয়। কিন্তু ভিতরটা খুঁতখুঁত করতে লাগল বাদল গাঙ্গুলির। ভাবল কিছুক্ষণ। ল্যাবরেটারী অ্যাসিস্ট্যান্টদের ডেকে পাঠালো।

নির্দেশমত তার পর সিমেন্ট কনক্রীট তুলে নিয়ে যথাবিধি পরীক্ষ-পর্ব। ফিজিক্যাল টেস্ট কেমিকেল টেস্ট প্রেসার টেস্ট। পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়ালো আরো। মিক্‌শ্চারে সিমেণ্টের অংশ নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে অনেক কম। এক ফাঁক খুঁড়তে তিন ফাঁক বেরুলো। কনক্রীট তৈরী হচ্ছে যেখানে সেখান থেকে সিমেণ্টের স্যাম্পল্‌ এনে নিজে সামনে দাঁড়িয়ে একে একে আবার যাবতীয় পরীক্ষা করালে বাদল গাঙ্গুলি। পাথরগুঁড়ো আর জমাটবাঁধা সিমেণ্টও মেশানো তাতে।

মাথাটা ঘুরে উঠল কেমন।

মিক্‌শ্চারে সিমেণ্টের পরিমাণ পরীক্ষা করার কথা নিজেদের তরফ থেকেও।

মাঝে মাঝে করাও হয়। কিন্তু নিয়ম যাই হোক, এত বড় কাজে হামেশা সম্ভব নয় সেটা। বিশ্বাসের ওপরেই ছেড়ে দিতে হয় বেশির ভাগ। আর এ ধরনের অঘটনও হয় না বড়। বিশেষ করে ঘোষ-চাকলাদারের মত এতদিনের এত বড় ফার্মকে অবিশ্বাস করার কারণ নেই কিছু। সরকারের কাছ থেকেই সিমেন্ট কিনে বরাবর সরকারী কাজ চালিয়ে আসছে তারা।

পায়ে পায়ে মড়াইয়ের দিকে চলল আবার বাদল গাঙ্গুলি। সঙ্গে নরেনকে ডেকে নিল।

কী ব্যাপার? নিষ্প্রভ মূর্তি দেখে নরেন অবাক।

এসো। ব্লকটার কাছে এসে আঙুল দিয়ে ফাটলটা দেখিয়ে দিল।

ফেটে গেছে? তেমন না ভেবেই নরেন বলল, তা ভালো করে একটু প্লাস্টার করে দিলেই তো হয়।

থামো। নিস্পন্দ-মূর্তি মানুষটা ঝাঁজিয়ে উঠল হঠাৎ। তারপর সংক্ষেপে বলল ব্যাপারটা।

চুপচাপ অনেকক্ষণ। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে সরে যাচ্ছে বাদল গাঙ্গুলির। অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে চোখের তারা দুটো। ওই হাঁ-করা ফাটলটা বড় হয়ে হয়ে যেন সমস্ত মড়াই জুড়ে বসছে, আর এত বড় ড্যাম কনস্ট্রাকশন নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে।

সব শুনেও ব্যাপারটা অত বড় করে দেখে নি নরেন চৌধুরী। তবু নীরব সেও। এই অসহিষ্ণু বিক্ষোভের হেতু জানে। নিজের হাতে গড়া যে সৃষ্টি-সমারোহ ভেঙে গুঁড়িয়ে খান খান হয়ে গেছে একদিন, মানুষটার ভিতরে সেই ফাটল মিলায় নি আজও। এখানকার এত বড় এই সৃষ্টির কণায় কণায় একদিনের মর্মচ্ছেদী পরাজয়ের নিখুঁত একটা পাল্টা জবাব লিখে রাখতে চায়। এই অমরতার আয়োজন দিয়ে দ্বিগুণ নিটোল করে ভরে তুলতে চায় সেদিনের সেই ব্যর্থতার ফাটলটা। ব্লকের ফাটল দেখে সেই পুরনো স্মৃতিই মুখব্যাদান করে আসছে আবার।

চলো, কি এমন হয়েছে, আপিসে বসে যা হয় ভেবেচিন্তে ঠিক করা যাবে'খন। হালকা করে দিতে চাইল নরেন চৌধুরী।

কিন্তু আপিসে ফিরেই যে ব্যবস্থা করল চিফ ইঞ্জিনিয়ার তাতে অন্য সকলেই উতলা হয়ে পড়ল বেশি। অফিসার এবং কর্মচারীদের ডাকিয়ে সোজা হুকুম দিল, ঘোষ-চাকলাদারের সিমেন্ট দিয়ে যেখানে যা কাজ হচ্ছে সব বন্ধ করে দিতে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে তলব করে পাঠালো তার পর।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, অর্থাৎ ঝরনার বাবা মিঃ চ্যাটার্জী। স্ত্রী টি-পার্টি দিন আর যাই করুন, ভদ্রলোক অনুকূল আশা পোষণ করেন না খুব। ওপরঅলাটিকে মনে মনে বরং সমীহই করেন একটু।

বসুন। শুনেছেন সব?

মিঃ চ্যাটার্জী মাথা নাড়লেন, শুনেছেন।

কি করবেন এখন?

চিন্তিত মুখে ভদ্রলোক ভাবলেন একটু।—কি আর করা যাবে...গ্রাউণ্ড ওয়ার্কএর কাজে লাগিয়ে দিতে বলি এ লটের মেটিরিয়াল, আর ঘোষ-চাকলাদারকেও নোটিস দিই একটা, কেন এরকম হ'ল...

কিন্তু না জানতে পারলে ওই দিয়েই আমরা ইরেকশনের কাজ করতাম, তার পরের কথা ভাবুন।

নিরুপায় মিঃ চ্যাটার্জী হাসলেন একটু। বললেন, কিছুকাল বাদে ক্র্যাক্ হ'ত, রিপেয়ারের হাঙ্গামা লেগে থাকত...এরকম অবশ্য হওয়া উচিত নয়, কিন্তু দেখলাম তো অনেক...

চেয়ার ছেড়ে উঠে স্বল্প-পরিসর ঘরের মধ্যেই বারকতক পায়চারি করে নিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল তারপর।—শুনন, হেড অফিসে ইণ্টিমেশন পাঠান, আর ঘোষ-চাকলাদারকে এক্ষুনি নোটিস দিন মাল তুলে নিয়ে যাক। হেড অফিস থেকে ইনস্ট্রাকশন এলেই বলে দেবেন, সাত দিনের মধ্যে গো-ডাউনও খালি করে দিতে হবে।

ভদ্রলোক মহা ফাঁপরে পড়লেন যেন। নরেন একটা কথাও বলে নি এতক্ষণ। নির্দেশ শুনে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল সেও। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দুর্ভাবনাটা প্রকাশ না করে পারলেন না শেষ পর্যন্ত।—একেবারে এতটা কি ঠিক হবে?

যা বললাম করে পাঠিয়ে দিন, আমি সই করছি।

চেয়ারে বসে অসহিষ্ণু হাতে একটা ফাইল টেনে নিল সে। আর বাক্যব্যয় না করে সোজা প্রস্থান করলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।

নরেন তেমনি চুপচাপ বসে রইল আরো কিছুক্ষণ। হালকা শিস দিল একটু। হাসলও।

বেশ।

সাড়াশব্দ নেই।

বলব কিছু, না সরে পড়ব?

হুঁ। ফাইলে নিবিষ্ট।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার, না বাদল গাঙ্গুলি...কাকে বলি?

খট্ করে বন্ধ হয়ে গেল হাতের ফাইল। সোজা তাকালো মুখের দিকে। খুব স্পষ্ট করে জবাব দিল, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে।

বিরূপ না হয়ে হাসি মুখেই বলল নরেন, তাহলে আর হ'ল না আপাতত, পরে হবে'খন কথা—।

পরদিন গো-ডাউনও দ্বিজেন চাকলাদারের হাতে পড়ল নোটিসটা। রণবীর ঘোষ কাছাকাছি গেছে কোথায়। তক্ষুনি লোক পাঠালো তাকে ডেকে নিয়ে আসতে।

এসব ঝামেলা পছন্দ নয় দ্বিজেন চাকলাদারের। লাভ যত বাড়াতে পারবে বাড়াও, সে জন্যে যা করা দরকার করো, কিন্তু গোলযোগে পড়ার সম্ভাবনা আছে এমন কিছু কোরো না। যদিও অর্থে-সামর্থ্যে যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে আজ ঘোষ-চাকলাদার ফার্ম, তাতে অল্পবয়সী এক ইঞ্জিনিয়ারের এরকম চোখরাঙানিকে খুব একটা পরোয়া করে না দ্বিজেন চাকলাদারও। দু-পুরুষের ব্যবসা, সরকারী কাজও কম করল না

আজ পর্যন্ত, এখানেও এত বড় কাজ নিয়েছে, বাদল গাঙ্গুলির সুপারিশে নয়, হেড অফিসের দাক্ষিণ্যে। তবু এসব ঝামেলা কে চায়! আর কিছু না হোক দুর্নাম তো একটা। কিন্তু দ্বিজেন চাকলাদারের পক্ষে রণবীর ঘোষকে সামলানো শক্ত। এই সাতসকালেই কোথায় কার পিছনে ঘুরছে ঠিক কি—। ব্যবসায় কুশাগ্র বুদ্ধি, কিন্তু যা হচ্ছে দিন-কে-দিন, ব্যবসা করাবে কাকে দিয়ে।

রণবীর ঘোষ এলো। নোটিস পড়ল। ঠোঁটের ফাঁকে বক্ররেখা।—ও বাবা! একেবারে বাতিল। নোটিসটা ফেরত দিয়ে হাঁটুর ওপর পাইপ ঠুকল বারকতক।—ছেলে-ছোকরার হাতে এত বড় কাজের ভার, ওরা যুধিষ্ঠিরের ভায়রাভাই-ই হয়ে থাকে প্রথম প্রথম। চলো, পিঠ চাপড়ে আসি।

প্রথম যোগাযোগে রণবীর ঘোষের ওপর মনে মনে প্রসন্ন ছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। তার ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসে নি কখনো। তবু হৃদ্যতা ছিল কিছুটা।

সেটা কর্মগত।

মড়াইয়ের কাজে প্রথম দিকের বিঘ্নোত্তরণের সময় রণবীর ঘোষের সহায়তা ছিল কিছু। গোড়ায় গোড়ায় কুলি আমদানির ব্যাপারে সাহায্য করেছে। একটা সময় গেছে যখন একসঙ্গে পঞ্চাশজন কুলির আবির্ভাবও শুভ সূচনা বলে ভাবত। রণবীর ঘোষের কাজের অন্তর্গত নয় সে কাজ। নয় বলেই এই সহযোগিতায় তার কর্মক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে।

নিজের স্বার্থের দিক থেকে মানুষকে যাচাই করার এবং খুশি করার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে রণবীর ঘোষের। প্রথম সংযোগে কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে তার সুপটু বিশ্লেষণ। খুশি হতে সকলেই চায়। পরিতোষণের ভক্ত নয় কে? শুধু জেনে নাও, খুশি করার যাদু-নীতিটি কার বেলায় কি?

মড়াইয়ের এই সর্বাধিনায়কটিকে বুঝে নিতে সময় লাগে নি একটুও। এজন্য কোনরকম দুরূহ জটিলতার আবরণও ভেদ করতে হয় নি তাকে। সিমেন্টের সঙ্গে বালু মেশানোর মত কাজের সঙ্গে কাজের আড়ম্বরটুকুও নিপুণ সমতায় বেশ করে মিশিয়ে দিতে পারলে নির্বিঘ্ন আস্থার ভিতটা পাকাপোক্ত হবে এটুকুই বেশ করে বুঝে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল রণবীর ঘোষ। কাজের বাইরে এই জন্যেই আর কোনরকম ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টাও করে নি সে। করলে, ভুল হবে জানত। দেখা হয় প্রায়ই, যে যার 'নড়' করে শুধু। আলোচনা উঠলে সপ্রতিভ অথচ সপ্রশংস চোখে কনস্ট্রাকশনের কাজের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে, এ চোখ জহুরীর চোখ মিঃ গাঙ্গুলি...এই মরা জায়গায় প্রাণ আসছে সেটা বোঝা যাচ্ছে বেশ।

সেই গোড়া থেকেই তার জহুরীর চোখ বাদল গাঙ্গুলির সামনে এই মরা জায়গায় প্রাণসঞ্চারের সূচনা দেখে আসছে।

ব্যক্তিগত তোষামোদে নয়, এ ধরনের কর্মগত তোষণে চিফ ইঞ্জিনিয়ার তুষ্ট হ'ত বৈকি।

পার্টনারের কাছে সবিদ্রূপে এই পিঠ চাপড়ানোর কথাই বলেছে রণবীর ঘোষ।

সকালে রাউণ্ডে বেরিয়ে বাদল গাঙ্গুলি মড়াই থেকে সরে উপরে উঠে এসে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল জনা-দুই কর্মচারীকে। সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, নরেন আছে। জিপ থেকে নেমে টক্ টক্ করে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রণবীর ঘোষ।—গুড মর্নিং, স্যার, গুড মর্নিং, ভালো আছেন?

বাদল গাঙ্গুলি ফিরে তাকালো। চোখে চোখ রেখে সামান্য মাথা নাড়াল শুধু। কর্মচারীদের সঙ্গে কথা শেষ করে বলল, আসুন।

ওপর থেকেই একাগ্র নিবিষ্টতায় নিচের কনস্ট্রাকশনের দিকে চোখ রেখে অগ্রসর হ'ল রণবীর ঘোষ। ঘ্রাণে বাতাস বোঝে। জহুরী আজ মরা-জায়গায় প্রাণসঞ্চারের বিপুল উচ্ছ্বাস মুখে ব্যক্ত না করে চোখেই ফোটালে।

নীরবে আপিসের দিকে চলেছে বাদল গাঙ্গুলি। পিছনে নরেন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। রাস্তার পাশে দ্বিজেন চাকলাদার জিপে বসে। ইশারায় তাকে অপেক্ষা করতে বলে রণবীর ঘোষ হাসিমুখে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পাশে পাশে চলল।

অফিসঘরে সকলে বসল। ঘোষ বাদল গাঙ্গুলির সামনে, মুখোমুখি। দু'চার মুহূর্তের নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়।

বলুন—

ঘোষ হাসল।—আপনার নোটিস পেলাম।....আই অ্যাম সারপ্রাইজড্...ব্যাট্ ইট্‌স ওয়ানডারফুল..আই মাস্ট্ সে ইট ইজ্ ওয়ানডারফুল! এরকম শক্ত হওয়াই দরকার—

বাদল গাঙ্গুলি চেয়ে আছে। প্রতীক্ষা করছে।

রণবীর ঘোষ আবার বলল, আপনি ঠিকই করেছেন, তবু একটা কথা কি জানেন মিঃ গাঙ্গুলি, সিমেন্ট তো আমরা নিজে তৈরি করিনে, কিনে নিয়ে আসি মাত্র, কি করে জানব বলুন এই কাণ্ড হয়ে আছে!

এবারে জবাব দিল বাদল গাঙ্গুলি। শান্তমুখে বলল, আপনার তো জহুরীর চোখ--জহুরীর চোখ শুধু খাঁটি চেনে না মিঃ ঘোষ, নকলও চেনে।

ঘোষ থমকে গেল। সজোরে হেসে উঠল তারপর।—ওয়ানডারফুল! ঘাট মানছি আপনার কাছে, কিন্তু এ ভুলটা সত্যি ভুল।

মিক্‌শ্চারে যে প্রোপোরশন সিমেন্ট মেশাবার কথা, মেশানো হয় নি—

নিশ্চয় হয় নি। শেষ করতে দিল না ঘোষ।—হলে আর আপনি লিখবেন কেন?...কথা হ'ল, আপনাদের যেমন লোক আছে প্রোপোরশন যাচাই করে নেবার জন্য, অথচ দেখা হয়ে ওঠে না সব সময়, তেমনি আমারও নিজের চোখেই দেখার কথা সব, কিন্তু আসলে নির্ভর করতে হয় দশ জনের ওপর। যাক, সেদিকটা ভালো করেই দেখছি এবার আমি।

কর্তৃপক্ষের গলদের কথাটাও পরোক্ষে স্মরণ করিয়ে আরো ভুল করল রণবীর ঘোষ। ধীর কণ্ঠে বলল বাদল গাঙ্গুলি, কিন্তু আপনার সিমেন্টেও স্টোন ডাস্ট পাওয়া গেছে—জমাট বাঁধা সিমেন্টও গ্রাইণ্ড করে মেশানো হয়েছে।

বললাম তো, এ ব্যাপারে আমাদের হাত কোথায়, সরকারের কাছ থেকে যেমন পাই কিনে নিয়ে আসি...

তাহলে তাদের দায় তারা বুঝবে, আপনার আর কি! আমি ও দিয়ে কাজ

হতে দেব না।

ব্যাপার কি জানেন, ঘোষের মুখে অমায়িক হাসিটুকু লেগে আছে, এ ভুলের দায় শেষ পর্যন্ত আমাদের কাঁধেই চাপবে, মাল যখন একবার বুঝে নিয়েছি, ঠিক জিনিস পাই নি প্রমাণ করব কি করে! কিন্তু এতদিনের এত বড় ফার্ম আমাদের, তাদের কাছ থেকে খাঁটি নিয়ে আমরা গণ্ডগোল করেছি এ তো আর আপনি বলবেন না...এখন কি করতে পারি তাই বলুন।

ক্রমে ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। তবু ক্ষুদ্র জবাব দিল, মাল তুলে নিয়ে যান, আর গো-ডাউন খালি করে দিন।

এ কথা শোনার জন্য আসে নি ঘোষ। সুন্দর হতাশার ভঙ্গি করল একটা।—এ তো মশা মারতে একেবারে কামান—যাক্ গে। দু'চার মুহূর্ত ভেবে একটা সমাধান বার করল যেন, বলল, এ মালটা আপনি না হয় ভিত-টতএর কাজে লাগিয়ে দিন, এর পরে আমি দেখছি।

কি আর দেখবেন? অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে বলল বাদল গাঙ্গুলি, আমাদের চরিত্রের ভিতটাও ভেজাল মিশে মিশে এমন হয়েছে যে ওর ওপর আর পাকা কিছু টেকে না। যাক, গণ্ডগোল আরো বাড়ার আগে যা বললাম তাই করুন—এদিকে হেড অফিসকে যা ইনস্ট্রাকশন দেবার আমি দিয়েছি।—

হেড অফিস...! সপ্রতিভ ভাবটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ঘোষের মুখ থেকে। বলল, দেখুন মিঃ গাঙ্গুলি, দু'পুরুষের এত বড় ফার্ম আমাদের, লাখ দু'লাখ গেলেও খুব যায় আসে না, কিন্তু এতে গুড-উইলটা যাচ্ছে....সেটা ঠিক...। বুঝতে পারছেন। হেড অফিসের ব্যবস্থা আমি করছি, আপনি শুধু আপনার অর্ডারটা তুলে নিন। একেবারে নিখুঁত আর কোন্ জিনিসটা হয় বলুন?

বাদল গাঙ্গুলি বলল, আপনার ওই দু'পুরুষের গুড-উইলেও খুঁত একটু থাকুক তাহলে। আপনি বলতেন, মরা জায়গায় প্রাণ আসছে—কিন্তু আমি নিখুঁত প্রাণই আনতে চাই, বিকল প্রাণ নয়!

পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল তারা। ঘরের বাকি দু'জন নির্বাক মূর্তির মতো বসে আছে। কন্ট্রাক্টারের চোখে মুখে বিদ্বেষ, বিদ্রূপ, কৌতুক। হাতের পাইপ আস্তে আস্তে টেবিলে ঠুকল দু'চার বার।

আর তাহলে আপাতত কোন কথা নেই?

আপাতত নেই, আর এ সম্বন্ধে পরেও নেই।

পরের কথা ভবিষ্যতের কথা, চেয়ার ছেড়ে উঠে সহাস্যেই বলল ঘোষ, কে আর জোর করে বলতে পারে বলুন, হতেও পারে আবার কথা, বাট্ ইউ আর রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল! ভারী খুশি হলাম।

ঝকঝকে চকচকে এক জোড়া চোখ সকলের মুখের ওপরে বুলিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে।

ভেজালকে নিখুঁত করার জন্য ওই সিমেণ্টের সঙ্গে একটা অন্তত জ্যান্ত মানুষকে চটকে মিশিয়ে দিতে পারলে দিত।

সন্ধ্যার পর বাদল গাঙ্গুলির কোয়ার্টার থেকেই ফিরছিল নরেন। ভেবেছিল বলবে কিছু। কিছু বোঝাবে। কিন্তু সে চেষ্টা আর করে নি। মাটির কণায় আকর্ষণ, বালুর কণায় বিচ্ছেদ। মাটির আভাস পেলে চেষ্টা করে দেখত।

অবনীবাবুর বাড়ির বাইরের ঘরে পা দিয়েই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এরকম আগুন-গালানো কণ্ঠস্বর আর বড় শোনে নি।

কেটে কুচি কুচি করে ওকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলে না কেন তোমরা? সান্ত্বনা বলছে।

কি বকছিস রে তুই পাগলি আবোল-তাবোল! অবনীবাবু বললেন।

সান্ত্বনা বলতে যাচ্ছিল আবার কি। পায়ের শব্দে থেমে গেল। এ ঘরে এসে নরেন বাপ মেয়ে দু'জনকেই দেখল একবার। পরে সান্ত্বনার উদ্দেশে বলল, কি ব্যাপার, ধান ফেললে যে খই ফোটে! অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, কাকে কেটে কুচি কুচি করছে?

অবনীবাবু হেসে জবাব দিলেন, কন্ট্রাক্টার রণবীর ঘোষকে।

হা হা শব্দে হেসে উঠল নরেনও। ফলে তার ওপরই রেগে গিয়ে ভেঙচি কেটে উঠল সান্ত্বনা, হা হা হা হা—যেন কি একটা মজার কথা হ'ল।

মনে মনে এ সময় এমনি হালকা অবকাশ-বিনোদনই চাইছিল বোধ হয় নরেন। জাঁকিয়ে বসল অবনীবাবুর কাছাকাছি।—বেশ, মজার কথা না হয় নাই হ'ল, ধরা যাক কেটে কুচি কুচি করা হ'ল লোকটাকে, কিন্তু গঙ্গায় ভাসাবে বলছিলে, এখানে গঙ্গা পাবে কোথায়?

বাবার অলক্ষ্যে আবার বড় রকমের একটা ভেঙচি কাটতে যাচ্ছিল সান্ত্বনা, কিন্তু তার আগেই অবনীবাবু বললেন, তুই এবার তোর কাজে যা দেখি, খবর শুনতে দে এদিকের। নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হ'ল, বুঝিয়ে বললে তাঁকে?

নাঃ। বলেও লাভ নেই কিছু।

কিন্তু এ তো ভালো কথা নয়। এত বড় প্রতিপত্তিশালী লোক...কত কুলি মজুর পর্যন্ত তার মুখের কথায় ওঠে বসে, কি ফ্যাসাদ যে বাধায়...তা ছাড়া হেড অফিসেও তো তার জোর কম নয়।

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল সান্ত্বনা। নরেন কিছু বলার আগে সে-ই অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, কি যে তুমি বলো বাবা ঠিক নেই, প্রতিপত্তিশালী বলে যা খুশি তাই করবে। আর পাঁচজন নেই? নাকি হেড আপিসের চোখ কানা?

নরেন এবারে নিজের মাথার ওপর এক চক্কর আঙুল ঘুরিয়ে টিপ্পনী কাটল, তোমার এই হেড অফিসের সঙ্গে সে হেড অফিসের কিছু তফাৎ আছে।

সান্ত্বনা চটে গেল।—আর আপনার হেড আপিসের সঙ্গে সে হেড আপিসের পরম মিল আছে।

এক রকম রাগ করেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নরেনের সঙ্গে সঙ্গে অবনীবাবুও হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু হাসি থেমে গেল।...ভাবছেন কিছু। ভদ্রলোকের এ ধরনের বিস্মৃতি নরেন আগেও দেখেছে।

সেই পুরানো কথাই ভাবছেন ওভারসিয়ার অবনী রায়। ভাবনাটা প্রকাশ করেই ফেললেন আজ। বললেন, নিজের আগ্রহে বদলী হয়ে এসেছিলাম এখানে...কিন্তু প্রায়ই মনে হয়, কাজটা বোধ হয় ভালো করি নি।

কনট্রাক্টার রণবীর ঘোষের সমস্যা আপাতত সরে গেছে মন থেকে। নরেন চুপচাপ চেয়ে রইল তাঁর দিকে। এই জল নিয়ে বা ড্যাম নিয়ে এত আগ্রহ কেন সান্ত্বনার—এতদিনে অনেকটাই জেনেছে। কিন্তু ভদ্রলোক আজ হঠাৎ এ কথা বললেন কেন বুঝে উঠল না।

এত বড় কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের এক ব্যর্থ অপমানকে পেরিয়ে চলছিল বাদল গাঙ্গুলি।

অনেক দিন হয়ে গেল কী। ....কিন্তু মাত্র সেদিন যেন।

অল্প সময়ের মধ্যে এক আটতলা ম্যানসন তুলে দেওয়ার কন্ট্রাক্ট নিয়েছে নেশন বিলর্ডাস লিমিটেড। এত বড় দায়িত্ব ও কোম্পানী নিতে পারে অবলীলাক্রমে।

সেই প্রথম নিজের হাতে বড় কাজের ভার পেয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। হোক বিলেত জার্মান ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, হোক পদস্থ কর্মচারী, হোক ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ভাবী জামাই—বাসনার ভরা জোয়ারে সেই ওর প্রথম অবগাহন আর প্রথম রোমাঞ্চ...।

প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সুসম্পূর্ণ। দিনে পাঁচবার করে গিয়ে 'সাইট' দেখে আসছে। কাজ আরম্ভ করলেই হয় এবার। করতেও হবে।

কিন্তু মনে খটকা বাধল একটা।

ছোট কাঁটার মতো কি যেন একটা খচ খচ করতে লাগল ভিতরে ভিতরে। বিল্ডিংয়ের ডিজাইন করেছেন স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। খাতিরের পার্টি, খাতিরের তাগিদ। পাকা হাতের পাকা ডিজাইন। বলার নেই কারো কিছু। বাদল গাঙ্গুলিরও না। কিন্তু তার দুশ্চিন্তার হেতু অন্য।

সর্বপ্রথম নরেন চৌধুরীর কাছে সন্দেহটা ব্যক্ত করেছিল।—কেমন যেন লাগছে হে, আগে একবার সয়েলটা টেস্ট করে নিতে পারলে হ'ত, ওরকম জমিতে এত বড় কনস্ট্রাকশন যদি না টেকে?

সাড়ম্বরে নিজেই দুই কান চাপা দিয়েছে নরেন।—সর্বনাশ। তুমি না হয় জামাই হতে চলেছ, আমার চাকরিটা খাবে? আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই। পরে পরামর্শ দিয়েছে, উড-বি ফাদার-ইন-ল'কে বলেই ফেল না চোখকান বুজে।

সেটা পেরে উঠছে না বলেই যত অস্বস্তি। আপিসের দু'চার জন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করল এ নিয়ে। কিন্তু সুরাহা হ'ল না কিছু, একেবারে নিঃসংশয় হওয়া গেল না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ওকে ঘরে ডেকে পাঠালেন সেদিন। জিজ্ঞাসা করলেন, সব রেডি তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ। রাইট আর্নেস্টলি কাজ আরম্ভ করে দাও, পার্টির জোর তাগিদ, দেখতে

দেখতে কাজ শেষ করে দিতে হবে। বাট্ বি ভেরি কেয়ারফুল, কোথাও গলদ না থাকে।

সে ঘাড় নাড়ল। একটু ইতস্তত করে বললেই ফেলল তারপর।—সাইট দেখে এসে আমার একটু খটকা লাগছে...ওরকম জমিতে এত বড় ডিজাইন...আগে সয়েলটা অন্তত একবার টেস্ট করে নিলে হ'ত...

শুনে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ভুরু কোঁচকালেন প্রথম। ঠোঁটে বাঁকাহাসির মতো দেখা গেল একটু। ওর দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন বার দুই।—অনেক শিখে ফেলেছ বলেই সতের ঝামেলার কথা মনে আসে তোমার, নট ব্যাড—।

বক্রোক্তি শুনে দু কান লাল হয়ে গেল। আবারও বলতে যাচ্ছিল কি, ম্যানেজিং ডাইরেক্টার থামিয়ে দিলেন। এ সুর ভিন্ন।

—ওয়েট মাই বয়...কথাটা ডিপার্টমেন্টের আরো কাকে যেন তুমি বলেছ শুনেছি। তা কোম্পানীর একটু বিশ্বাস-টিশ্বাস আছে আমার ওপর, ওই দু চোখের সাদা অভিজ্ঞতায় তোমাদের ওই সব টেস্টই ঠিক ঠিক হয়ে আসছে। তোমার কাজের সুনাম খুব, কিন্তু সেটা টেনে বাড়াতে যেও না, ও আপনি আসবে—নাউ গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর জব।

কিন্তু বিপুল বাড়রী সেখানেই থামেন নি। বাড়ি এসে স্ত্রীর কাছেও বলেছেন কথাটা। কিছুদিন হ'ল ভাবী জামাইয়ের ওপর একটু তেতো আছেন মহিলা। বাদলের মা কিছুদিনের জন্য দেশে গেছেন শুনেই সাগ্রহে তাকে এ বাড়ি এসে থাকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। আশা ওর মা সেটা শুনলে দেশেই থেকে যেতে পারেন বরাবর। কিন্তু ভাবী জামাই প্রস্তাবটা একবার ভেবে দেখে নি পর্যন্ত। মেয়ে বা মেয়ের বাবার কাছে ক্ষোভ চাপা থাকে নি মিসেস বাড়রীর। এভাবে ওকে মাথায় তোলার ফল ভুগতে হবে, সে ভবিষ্যদ্বাণী অনেকবারই করেছেন তার পর।

তাঁকে খুশি করার জন্যেই সেদিনের কড়া শাসনের খবরটা ব্যক্ত করলেন বিপুল বাড়রী। শুনে একেবারে যেন হাঁ হয়ে গেলেন মিসেস বাড়রী। এবং সেই হাঁ হওয়া বিস্ময়টুকু পঞ্চপল্লবে সাজিয়ে মেয়ের কাছেও প্রকাশ না করে পারলেন না।

সারাক্ষণই মনটা খারাপ হয়ে ছিল বাদল গাঙ্গুলির। এরকম কটূক্তি কখনো শুনতে হয় নি। সেদিন পাঁচটার হর্ন বাজতে নরেন এসে পথরোধ করে দাঁড়াল যখন, তাও ভালো লাগে নি। বরং বিরক্ত হয়েছে। অথচ, অন্যান্য দিনের মতো পড়িমরি করে যে ছুটেছে তাও নয়।

নীলার প্রথম কথাতেই মেজাজ যেন আরো বিগড়ে গেল। চুপচাপ কিছুক্ষণ গাড়ি চালিয়ে নীলা বলল, এরকম অবস্থা কেন মুখের, বাবার কাছে বকুনি খেয়েছ বলে?

বাদল গাঙ্গুলি ঘুরে বসল আস্তে আস্তে। চুপচাপ চেয়ে রইল শুধু।

আবার বলল নীলা, বেশ করেছে বকেছে, বকবে না তো কি। বাবাকে পর্যন্ত রাগাতে সাহস করো তুমি, বাবা ডিজাইন করে দিলেও নিঃসন্দেহ হতে পার না এত গুমোর তোমার—ক'দিনের ইঞ্জিনিয়ার হে তুমি?

খানিক চুপ করে থেকে জবাব দিল, এসব আলোচনা আমার ভালো লাগছে না নীলা।

তা তো লাগবেই না। হাসি আর রাগ মেশানো কটাক্ষ। তেতো কথা কার আর ভালো লাগে। মুখখানা অমনি হাঁড়িপানা করে বসে থাকবে, না যাবে কোথাও ?

সব কিছু মন থেকে ঝেড়ে ফেলেই হাঁড়িমুখে হাসি ফুটিয়ে বাদল গাঙ্গুলি ওর দিকে মন দিতে চেষ্টা করেছিল তার পর।

কিন্তু নেশান বিলডার্স-এর ওই আটতলা ম্যানসন আর ওঠে নি।

তার আগেই থামতে হয়েছে।

সমস্ত কোম্পানীর সজাগ দৃষ্টি পড়েছে এদিকে। ছোট বড় সকলের। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দলের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরাও মাথা নেড়ে গেছেন। একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠেছে অফিসময়। আটতলা বাড়ির সঙ্কল্প ছ'তলায় শেষ, কে কার মুখ চাপা দেবে। কারো মতে কোম্পানীর গুড-উইলটি গেল এবার, কারো বিস্ময় বাদল গাঙ্গুলি কাঁচা ছেলে নয়—এরকমটা হল কেন। কারো জবাব, ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের ওই প্ল্যান আর ডিজাইনের গোলমাল আছে শুনে রাখো, বিশ লাখ টাকার কনস্ট্রাকশনে কম করে দেড় লাখ টাকা পেয়েছে ডিজাইন করে—অভ্যেস নেই, লোভ করতে গেছে, বেশ হয়েছে।

এই থামার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের স্পন্দন থেমে গেছে যেন বাদল গাঙ্গুলির। ধমনীর রক্ত চলাচল থেমে গেছে। দিনের আলোর রং ঘুচে গেছে চোখ থেকে। রাতের নির্জনতা যাতনামুখর। পরিত্যক্ত বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে।

বাড়ি নয়, বাড়ির কঙ্কাল। মানুষ নয়, নিষ্প্রাণ মূর্তি।

বোঝাপড়ার ডাক এলো।

কৈফিয়ৎ থাকলে এত বড় বিপর্যয়ও কিছু নয়। বিপুল বাড়রীর কাছে অন্তত নয়। বড় জোর দু'পাঁচ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কোম্পানীকে। কিন্তু ঝড় উঠল এই কৈফিয়ৎ দেওয়া এবং কৈফিয়ৎ নেওয়ার ব্যাপারেই।

সাউণ্ড-প্রুফ ঘর তাঁর। বাইরে থেকে কিছু শোনা গেল না, কিছু বোঝা গেল না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফেটে পড়লেন, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।—ননসেন্স। রিডিক্‌লাস। প্রিপস্‌টরাস।

বাদল গাঙ্গুলি নীরব, নিশ্চল।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এত বড় ইঙ্গিত বরদাস্ত করে উঠতে পারছিলেন না বিপুল বাড়রী। পায়চারি করছিলেন ঘরের এমাথা ওমাথা। রাগে সমস্ত মুখ সাদা।—তোমারই ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য এত বড় দায়িত্ব দিয়েছিলাম, তার বদলে মুখে একেবারে চুনকালি দিয়েছ তুমি। কোথায় লজ্জিত হবে তা না...। কোথায় না ভুল হতে পারে ? প্লিন্‌থ-এ ভুল হতে পারে, কনস্ট্রাকশনে ভুল হতে পারে।...

জ্ঞানত এসবে কোন ভুল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

জ্ঞানত—জ্ঞানত—জ্ঞান। কতটুকু জ্ঞান তোমার ? ক'টা ম্যানসন তুলেছ আজ

পর্যন্ত ? নাকি একবার ওই বাইরে ঘুরে এসেছ বলেই জ্ঞানের আর বাকি নেই কিছু ?

বাদল গাঙ্গুলি উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। কোন মীমাংসা হবার নয় জানাই ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন আবার। সিট্ ডাউন প্লীজ অ্যাণ্ড লেট মি থিঙ্ক্!

নিজেও চেয়ারে বসলেন আবার। খানিকক্ষণ দম নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্তমুখে বললেন, এত বড় ক্ষতিপূরণ দিয়ে কোম্পানী তো আর চুপচাপ বসে থাকবে না। বোর্ড বসবে, তোমার কৈফিয়ৎ নেবে, রীতিমত বিচার করবে।...বেশ ভেবেচিন্তে আনফোরসিন রিজন্স-এ কিছু একটা গোলযোগ হয়ে গেছে বলে রিপোর্ট দাও।

তার মানে, খুব শান্ত খুব সংযত কণ্ঠে বাদল গাঙ্গুলি বলল, আমারই কোথাও ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে নেব ?

টেবিল চাপড়ে বিপুল বাড়রী বলে উঠলেন, হ্যাঁ নেবে নেবে—তোমার ওপর দায়িত্ব ছিল আর ভুলটা কি স্বীকার করবে বাইরের লোক এসে ? রিপোর্ট দাও, তারপর দেখা যাক—

নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়। সমস্ত জড়তা কাটিয়ে বাদল গাঙ্গুলি আবার উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। স্পষ্ট জবাব দিল, কিন্তু আমি তাতে রাজী নই। বিল্ডিংয়ের পাশের জমি থেকে এখনো সয়েল টেস্ট্ করে নেওয়া যেতে পারে। ওই জমিতে আর ওই ডিজাইনের ফাউণ্ডেশনে এত বড় কনস্ট্রাক্শন দাঁড়ায় কিনা—আমার স্টেটমেণ্ট-এ সেটাই আগে আমি পরীক্ষা করে দেখতে বলব। তাতে কোন গলদ না থাকলে বোর্ডের বিচার আমি মাথা পেতে নেব।

শান্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

পাশবদ্ধ দোর্দণ্ডকেশরীর নিরুপায় স্তব্ধতায় ভদ্রলোক স্থির হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সর্বাঙ্গে গলিত দাহ্য অনুভূতি একটা। অফিসে বসে থাকা সম্ভব হ'ল না আর। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে বাড়ি ছুটলেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিপুল বাড়রী।

....পরিত্যক্ত বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়েছিল বাদল গাঙ্গুলি। সামনে যেন ওরই হাড়-পাঁজরাগুলো দেখছিল চেয়ে চেয়ে। সন্ধ্যার ছায়ায় দিনের আলো ধূসর হয়ে হয়ে যেন মিলিয়ে গেল একসময়। ক্লান্ত, মন্থর গতিতে ফিরে চলল।

নিধু দরজা খুলে দিল। কিছু বলতে চাইল বোধ হয়। কিন্তু বলা হ'ল না। ক'দিন ধরেই মনিবের কবরের মত থমথমে মুখ দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। বাদল গাঙ্গুলি সোজা নিজের ঘরে চলে গেল। থমকে দাঁড়াল তার পর।

নীলা বসে আছে শান্ত মুখে।

ওর ওপর দিয়েও ঝড় গেছে একটা। জানা নেই, কিন্তু অনুমান করা কঠিন হ'ল না। তার আভাসও পেল। নীলাই কথা বলল প্রথম, আশা করোনি দেখছি...

না।...তুমি এ সময়ে ?

নীলা মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক।—আগে তো যে কোন সময়ে আসতুম, এখন তাহলে সময় ধরে আসার মতো কিছু একটা হয়েছে !

জবাব না দিয়ে গায়ের কোটটা খুলে আলনায় রাখল বাদল গাঙ্গুলি। নীলা

বিছানার ওপরেই বসে। খানিকটা ব্যবধানে বসল সেও।—বলবে কিছু?

নীলা তেমনি নিরীক্ষণ করছিল তাকে।—বলব কিছু, কিন্তু শুনতে হয়তো তোমার খুব ভালো লাগবে না।

জোর করেই বাদল গাঙ্গুলি এবারে হাসতে চেষ্টা করল একটু। শয্যায় শরীর ছেড়ে দিল খানিকটা। হালকা জবাব দিল, তার থেকে শুনতে ভালো লাগে এমন কিছুই না হয় বলো।

যা বলার স্পষ্ট বলবে বলেই এসেছে নীলা। আর জানেও স্পষ্ট বলতে। কিন্তু তবু বলার আগে খুব ভালো করে দেখে নিতে চায় যেন।—বাবার বিরুদ্ধে যাবার দুঃসাহস তোমার হ'ল কি করে? নিজেকে তুমি কি ভেবেছ? আজ পর্যন্ত উনি যা করেছেন তোমার জন্য—সব ভুলতে পারলে?

আমার জন্য কিছু করেন নি, নিরুত্তাপ জবাব, করেছেন তাঁর মেয়ের জন্য.. এখন দেখছেন, যা করেছেন সবই ভুল করেছেন।

শুধু বাবা নয়, সকলেই তাই দেখছে। অনুচ্চ কণ্ঠে নীলা ঝাঁজিয়ে উঠল প্রায়, ভুল না হয় হয়েছে, ভুল মানষেরই হয় কিন্তু সে দায়টা বাবার ওপর চাপাতে লজ্জা হ'ল না তোমাব? সঙ্কোচ হ'ল না?

ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে গেল মানুষটার সমস্ত মুখ। সামলে নিয়ে শান্ত মুখেই জবাব দিল আবার, ভুলের দায় আমি কারো ওপর চাপাতে চাইছি না নীলা, সত্যি নিজে ভুল করেছি কি না সেটুকুই বুঝে নিতে চাইছি। ওই জমিও আছে আর তোমার বাবার ডিজাইনও আছে—এ দুটো একবার তিনি এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছেন না কেন? তাতে কোন গলদ না থাকলে, ভুল আমার তো বটেই!...কিন্তু তোমার বাবা তা করবেন না, কারণ তাঁর মনে সন্দেহ আছে।

কি বলছে, খানিক চুপ করে থেকে বুঝতে চেষ্ট করল নীলা। কিন্তু বোঝা অসম্ভব। বিশেষ করে যেখানে ভালো করে কিছু বোঝবার জন্যেই এখানে আসা। উল্টে রেগে গেলো আরো। শান্ত ধৈর্যটুকুও তিরোহিত হ'ল।—বলিহারি আস্থা তোমাব নিজের উপর। বাবার কাজ ঠিক আছে কি না অন্য এক্সপার্ট ডেকে সেটা যাচাই করতে হবে?

নিরুত্তর।

অতশত আমি বুঝিনে, তোমার আমার ভালোর জন্য বাবা যা বলছেন তাই তোমার করা উচিত, আর তাই তুমি করবে, অন্তত আমার জন্যেও করবে।

কিন্তু তোমার বাবা যা বলেছেন তাই করলে যেখানে আমায় নেমে আসতে হবে, তাতে তোমার আমার কারোরই ভালো হবে না।

হবে হবে হবে। নীলার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে এসেছে। আরো সামনে ঝুঁকে এলো। বলে গেল, হয়তো তোমার দুর্নাম হবে কিছু, হয়তো বা উন্নতিও বন্ধ থাকবে কিছুকাল, কিন্তু বাবা ঠিক আবার টেনে তুলবেন তোমায়। তার বদলে তাঁকে অপদস্থ করতে গেলে তাঁর নাগালও পাবে না তুমি, উল্টে সবই যাবে—তার অর্থটা ভেবে দেখছ?

স্তব্ধ গুমোট একটা। একটানা। দুঃসহ।

আগে দেখি নি। এখন দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে আরো কেউ যাবে, সব ছেড়ে নিজেকে আর আমার সঙ্গে জড়ে দিতে পারবে না, এই তো?

সোজা হয়ে বসল নীলা। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করে উঠল তার পর, ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে কাব্য করলেই তো পারো। তুমি কি ভাবো এ পর্যন্ত তোমায় টেনে তোলা হয়েছে তোমার ভাবের ঘোরে বৈরাগী হবো বলে? সে রকম লোকের কি খুব অভাব ছিল?

এর থেকে স্পষ্ট আর বোধ হয় কিছু শোনার ছিল না বাদল গাঙ্গুলির।... ওকে টেনে তোলা হয়েছে। ইচ্ছে হ'ল বলে, আভিজাত্যের ফাঁস পরিয়ে টেনে যাকে তুলছ, উঠলে এবারে একটা মরা মানুষই উঠবে। বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে একখানা হাত রাখল শুধু কাঁধে।—নীলা...।

বলো। হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন মূর্তির মতো বসে রইল নীলা।

তোমার আমার সম্পর্কটা এর বাইরে আর কিছু নয় তা হলে?

তোমার এত বড় ঘা খেয়েও সেটা ভাঙবে না এমন কিছু নয়। বাবাকে তুমি অপমান করেছ, তাঁর মানসম্ভ্রম নষ্ট করতে বসেছ। নিজের ভুল স্বীকার করে নাও, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, তাঁর ক্ষমতা তুমি ভালই জানো।

কিছুক্ষণ।...অনেকক্ষণ। একটা আচ্ছন্নতার ঘোর কাটল যেন।—এই তাহলে তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ। হাতঘড়ি দেখে নীলা উঠে দাঁড়াল।—আচ্ছা, কালকের মধ্যে তোমার জবাব পাব আশা করি, গুড নাইট–।

....আর দেখা হয় নি।

কিন্তু জবাব নীলা পরদিনই পেয়েছিল। নীলা ঠিক নয়, বিপুল বাড়রী পেয়েছিলেন।

নীলা চলে যাওয়াব পর সে রাত্রিরও অবসান হয়েছিল বৈকি। এত বড় জবাবের দুর্বহ বোঝা বহন করে নিঃশব্দে কেটেছে সে রাত। তিলে তিলে, পলে পলে। আবার সকাল হয়েছে। আবার অফিসের সময় হয়েছে। আবার অফিসে এসেছে...।

শেষবার।

স্টেটমেন্ট লিখেছে। যেমন চেয়েছিলেন বিপুল বাড়রী তেমনি। যে জবাব নীলা আশা করে গেছে তেমনি। স্টেটমেণ্টে সই করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আর সেই সঙ্গে পদত্যাগ পত্রও দাখিল করেছে নিজের।

ওটুকু কাজ শেষ করেই ফিরে এসেছে আবার। একটা বোবা শূন্যতায় ধড়ফড় করে উঠেছে থেকে থেকে। তার পরেই মনে হয়েছে মা নেই এখানে। অনেকদিন নেই। ...মায়ের কাছে যাবে।

নরেন এসেছিল তার আগে।

তেমনি হাসি। তেমনি খুশি। আরো বেশি হাসিখুশি যেন। অফিস কামাই করে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেছে ওকে। অনর্গল কথা বলেছে। কতক কানে গেছে, কতক যায় নি।

...মুক্তিটা যেন ওরই। কেননা ওকেও ভালবাসত এত, সেটা যেন ভারী সহজে

চোখে পড়েছিল সেদিন।

মা অবাক হয়েছিল বৈকি। অবাক নয়, ভয়ই পেয়েছিল। একসঙ্গে এত কথা জিজ্ঞাসা করেছিল ঠিক নেই।—এমনি চলে এলি কি রে !...তা বেশ করেছিস।...কিন্তু এরকম হঠাৎ...শরীর ভালো আছে তো? হ্যাঁ রে? এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

অত হাসছিল তাও ওই কথা !...তার পর আস্তে ধীরে মা শুনেছে সব। শুনেও মন্তব্য করে নি কিছু। কিন্তু মায়ের ভিতরটা যেন দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ কি মনে পড়ে গেছে তাঁর দিকে চেয়ে। খুশিতে বলেই ফেলেছিল।—আসার দিন নরেন সারাক্ষণ সঙ্গে ছিল মা, গাড়ি ছাড়ার আগে আমাকে বলল, ওদের অতবড় অবিচার মাথা পেতে নিলে তোমার মুখের মা ডাকও আর ভালো লাগত না তোমার ওই মায়ের—গিয়ে দেখো।

শুনে মা হেসেছিল। নরেনের উপর মায়ের নীরব আশীর্বাদ ঝরেছিল দুই চোখে।—তা তো হ'ল, কিন্তু তোর মুখ-চোখের এ অবস্থা কেন, অত বড় চাকরিটা গেল বলে?

মিথ্যেই অত হাসছিল। অত হাসতে চেষ্টা করেছিল।

একদিন নয়। আরো একদিন ধরা পড়েছে।

খাঁচা ভেঙে এসেছিল। কিন্তু বড় অভ্যস্ত খাঁচা। মুক্তিটা ঠিক মুক্তির মতো লাগছিল না। নীলার ফোটো ছিল ট্রাঙ্ক-ভরতি। অনেক সপ্রগল্‌ভ হাসিখুশি মুহূর্তকে বন্দী করেছিল একে একে। একা ঘরে সেগুলো বার করে বসেছিল সেদিন। ছিঁড়ছিল একটা একটা করে। ঠাণ্ডা মাথায়। শান্ত মুখে। স-মনোযোগে। মনের আনাচেকানাচে ঘুর ঘুর করে আশার আলেয়ারা। উঁকিঝুঁকি দেয় আকাঙ্ক্ষার নটীরা। কে জানে সেদিনের সেই একরাতের তিলে তিলে পলে পলে দাহ করা ভস্ম থেকে আবার তারা উঠে আসবে কিনা। আবার তারা হাতছানি দেবে কিনা। আবার তারা সোনার ফাঁস ওর গলায় পরাবে কিনা।

মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করে নি। মৃদু ভর্ৎসনায় চমকে উঠেছিল।—এই করে কি কিছু সুবিধে হবে?

অপ্রস্তুতের একশেষ। শেষে হেসেই ফেলেছিল। নাঃ, তোমাকে লুকিয়ে-চুরিয়ে কিছু করারও জো নেই।

খণ্ড ছিন্ন ফোটোগুলোর দিকে খানিক চেয়ে থেকে ভারী অদ্ভুত কথা বলেছিল মা তার পর। বলেছিল, হ্যাঁ রে এত বুঝিস আর এতটুকু বুঝিসনে, জ্বর হলে গায়ে জল ঢেলে গা ঠাণ্ডা করা যায়? ও যেমন আছে থাকতে দে, আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে।

ছেলের অনেকক্ষণ আর বাক্‌স্ফুরণ হয় নি তার পর। চেয়েই ছিল শুধু। তার পর বলেছিল, এত বুঝি, কিন্তু তোমার মত যদি সব কিছু এত সহজ করে বুঝতাম মা...।

থাক, খুব হয়েছে! তেমন সাদাসিধে কথা তাঁর। কি করবি এবারে ঠিক করে ফ্যাল্। কাজের মানুষ তুই, দিনরাত এমন শুয়ে বসে ভালো লাগবে কেন? কোথায়

যাবি চল্, আমিও না হয় যাই তোর সঙ্গে।...

মড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে। মড়াই ঘেরা পাহাড়গুলো ঘুমিয়েছে। মড়াইয়ের রাত্রিও ঘুমিয়েছে। নিটোল ঘুম সর্বত্র। মাথার ওপর ওই আকাশভরা তারাগুলো জেগে আছে শুধু। খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে মড়াইয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি তাদের দেখছে চেয়ে চেয়ে।...ছেলেবেলায় গল্প শুনত জীবনের শেষে নাকি ওই তারা হয়ে থাকার জীবন।

তাই যদি হয়, কোন্‌টি তার মা?

॥ ৯ ॥

মড়াইয়ের কাজে এখন পর্যন্ত বিঘ্ন ঘটে নি কোথাও।

যেমন চলছিল তেমনি চলেছে। ঘোষ-চাকলাদারই এখানকার একমাত্র কনট্রাক্টার নয়। ছোটবড় আরো আছে, ছোটবড় কাজ নিয়ে আছে। একজনের বিপর্যয়ে আর একজনের সুদিনের সম্ভাবনা। তবু প্রতিকূল আবর্তের ছায়া পড়ে একটা। অনাগত উৎকণ্ঠার মতো কিছু একটা দুর্যোগ যেন থিতিয়ে আছে। শুরু থেকেই ঘোষ-চাকলাদারকে সকলে স্বতন্ত্র চোখে দেখে এসেছে বলেই হয়তো এরকম লাগছে।

বাবা বা নরেনবাবুর দুশ্চিন্তা দেখে সান্ত্বনা মুখে যাই বলুক, মেজাজ ঠাণ্ডা হতে ভিতরে ভিতরে একটু দমে গেল সেও। যাই হোক না কেন, সূচনা শুভ নয় তো বটেই।

অনধিত এক জীবনের অধ্যায়ও তার পর শুনল একদিন। নরেনই বলেছে। যেভাবে বলে সচরাচর, সেভাবে নয়। সান্ত্বনার শোনার দরদ তারও ভেতরটাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল বোধ হয় সেদিন। সান্ত্বনা তন্ময় হয়ে শুনেছে।

শেষ হতে নরেন নিজেই যেন থমকে গেল একটু। সারাক্ষণ সান্ত্বনা ওরই দিকে চেয়েছিল বটে, ওরই কথা শুনছিল। কিন্তু তার কথার বুনটে দেখছিল যাকে সে অন্য মানুষ। দেখছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ারের খোলস থেকে যাকে উদ্‌ঘাটন করে দেখাল, তাকে। হালকা হেসে নরেন বলল, কি হ'ল, কেঁদে-টেঁদে ফেলবে নাকি?

নিজের স্তব্ধতায় নিজেই একটু লজ্জা পেল সান্ত্বনা। বলল, না, বড় দুঃখের জীবন তো ভদ্রলোকের।

দুঃখের বলেই তো এমন একটা নিখুঁত জিনিস গড়ে উঠছে, নরেন ঠাট্টা করল আবারও, ওর ভেতরটা যত জ্বলবে, লোকে ততো বেশি আলোর আশ্বাস পাবে, মন্দ কি?

যান্, আপনি ভারি নিষ্ঠুর।

অন্যমনস্কের মতো নরেন ভাবল কি। পরে বলল, নিষ্ঠুর নয়, ওর জীবন থেকে নীলা গেছে ভালই হয়েছে...কিন্তু একেবারে গেছে কি না ভেবেই ভয় হয় মাঝে মাঝে।

সান্ত্বনার জিজ্ঞাসু চোখে চোখ রেখে বাকিটুকুও না বলে পারল না।— মানুষটাকে যত শক্ত দেখো ততো শক্ত নয়, আমার বিশ্বাস ওই মেয়ে সামনাসামনি এলে আবারও

পারে ওর জীবনে সব কিছু ওলটপালট করে দিতে, ওর এই কাজ এই নিষ্ঠা সব কিছু তছনছ করে ফেলতে।

শোনা মাত্র মুখভাব বদলাতে লাগল সান্ত্বনার। একজন গেলেও সরকারী কাজ বন্ধ থাকবে না—সে কথা মনে হ'ল না। ওলটপালট হয়ে যাওয়া এবং নিষ্ঠায় ছেদ পড়ার সঙ্গে ড্যামের কাজে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনাটা এক করে দেখল কিনা সে-ই জানে। মেয়েটার আবার সামনাসামনি আসার প্রসঙ্গ কল্পনা করে সমস্ত মুখে কঠিন ছায়া পড়ল একটা।

রণবীর ঘোষের ব্যাপারটা স্থগিত আছে এখনও। কতকাল থাকবে তারও ঠিক নেই। হেড অফিস থেকে নির্দেশ আসে নি এখনো কিছু। কেন আসে নি তাও অনুমান করতে পারে বাদল গাঙ্গুলি। ঘোষ-চাকলাদার নিশ্চেষ্ট বসে নেই।

এ ব্যাপারের ফলে কাজের ধারা একটু বদলেছে বাদল গাঙ্গুলির। বিশ্বাসের শান্তিভঙ্গ হয়েছে একবার। ঘোষ-চাকলাদারকে সসপেণ্ড করুক আর যাই করুক, ভিতরে চিড় খেয়ে গেছে একটা। দিনের মধ্যে দু'তিন বার মড়াইয়ে নামে। সন্ধানী চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সব। ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করে।

ফলে মড়াইয়ে সান্ত্বনার সঙ্গেও আজকাল দেখা হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

সান্ত্বনার ইচ্ছেও হয় সামনে গিয়ে দুটো কথা বলে। গাছতলায় সেই লাঞ্চের পর্ব মনে পড়তে রাঙিয়ে ওঠে নিজেই। রাগের মাথায় কি যাচ্ছেতাই না বলেছিল ; বড়সাহেবের প্রতি পাগল সর্দারের সেই অভিযোগ মুছে গেছে মন থেকে, ভূতুবাবুর কথাগুলোও। একটা মেয়ের কাছ থেকে অত বড় ঘা খেয়েও মেয়েদের ওপর ভদ্রলোক বীতস্পৃহ হবে না তো কি ! সব শুনে ওর নিজেরই রাগ ধরে গিয়েছিল মেয়ে জাতটার ওপর।

সামনাসামনি পড়ে গেলে নমস্কার বিনিময় হয় বড় জোর। ইচ্ছে থাকলেও কাছে ঘেঁষে না সান্ত্বনা। পারেও না।

কারণ সান্ত্বনা বদলেছে।

মাসির বাড়িতে বাবার সঙ্গে ঝকাঝকি করে যে মেয়ে মড়াইয়ে এসেছিল, সে বদলেছে। একটু একটু করে বদলেছে। দশ জনের চোখে নিজেকে দেখে বদলেছে। সেই হাসিখুশি আছে, সেই কৌতূহল-প্রাচুর্যও আছে, কিন্তু ভরা জোয়ারের মধ্যে চেতনার রাশটাও তেমনি সজাগ আজকাল। ওভারসিয়ারের মেয়ে, সেটাই একমাত্র পরিচয় নয় এখন। স্ব-মহিমায় স্বতন্ত্র, স্বয়ংবিকশিত। নিজের পরিপূর্ণতার রহস্য নিজে জানে। ওই যে এত বড় চিফ ইঞ্জিনিয়ার মড়াইয়ের, ঘা-খাওয়া পোড়-খাওয়া মানুষ—দেখলেও যে না দেখার ভান করে কত সময়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারও বিমনা দৃষ্টি উধাও হয়ে আসতে দেখেছে ওর কাছ পর্যন্ত।

অন্য রকমের যোগাযোগ ঘটল একটা সেদিন।

বিকেলে মেন কোয়ার্টারস-এর দিকে ছিল সান্ত্বনা। বড় বড় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল হঠাৎ। অসময়ের জল। অন্যমনস্ক ছিল, থমকে দাঁড়াল। তার পর আকাশের

দিকে চেয়ে দিল ছুট।

অদূরের সব ক'টা কোয়ার্টারই চেনা। একটার খুব কাছে নয় আর একটা। চকিতে ভেবে নিয়ে যে দিকে এগোলো, একা কোনদিন সেখানে যাবে ভাবে নি। ভদ্রলোক তো আর বাড়ি নেই এখন, শুধু নিধু আছে...।

কিন্তু জলটা চেপে এলো যেন। যতটা ভিজবে ভেবেছিল তার থেকে বেশি ভিজে গেল। একেবারে বাড়ির গায়ে এসে সেই চেতনার রাশে টান পড়ল আবার। না, যাবে না। আগে হলে ভাবত না, সরাসরি ঢুকে পড়ত। এখন মন চাইছে বলেই যাবে না। তাছাড়া ভিজেছে একেবারে কম নয়। হলই বা নিধু...

বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছাতের আলসেয় মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করল। কি যাচ্ছেতাই জল রে বাবা! কতক্ষণে ছাড়বে ঠিক কি। ভদ্রলোক যদি এসেই পড়েন এর মধ্যে। অস্বস্তিতে আকাশ বিশ্লেষণ করতে লাগল সান্ত্বনা।

ওদিকে মাথার ওপর জানালা খুলে যে লোকটা গলা বাড়িয়েছে সে স্বয়ং নিধুরাম।

দিদিমণি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছ! এসো এসো ভিতরে এসো!

চমকে উঠেছিল সান্ত্বনা। পরে নিস্পৃহ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, এটা তোমাদের বাড়ি নাকি নিধু?

বহুবচনে প্রীত হ'ল নিধুরাম। হৃষ্ট কণ্ঠে জবাব দিলে, হ্যাঁ দিদিমণি, আমাদের বাড়ি, আমার আর বাবুর। কিন্তু তুমি ভিজে যাচ্ছ যে, ছুট্‌টে ভেতরে চলে এসো না!

এভাবে গা বাঁচানো সম্ভব নয়। কিন্তু পা যেন আটকে আছে এখন মাটির সঙ্গে। বলল, ভিতরে যাব...তোমার বাবু রাগ করবে না তো?

নিধু অবাক।—বিষ্টিতে ভিজছ, রাগ করবে কেন? আর বাবু তো এখন আপিস ঠ্যাঙাচ্ছে—

ভিতরে প্রবেশ করে সান্ত্বনা শাড়ির আঁচলে হাতমুখ মুছে ফেলল। কটাক্ষে নিধুকে দেখে নিল একবার। দিদিমণি আসার আনন্দই তার চোখে মুখে।

দিদিমণিকে সক্কলে চেনে, সক্কলে জানে আর সক্কলে ভালোবাসে।

দাঁড়াও, একটা তোয়ালে এনে দিই তোমাকে।

না-না, তোয়ালের কিছু দরকার নেই, সান্ত্বনা শশব্যস্তে থামালো তাকে, এই তো একটুখানি ভিজেছি মোটে।

কতটা ভিজেছে নিধু তাই দেখে নিল একবার। শাড়ির আঁচলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সান্ত্বনা সকৌতুকে ভিতরের দিকে উঁকি দিল। নিধু বলল, সব ঘুরে ঘুরে দেখো না দিদিমণি, আমি তো আছি, ভয় কি!

সান্ত্বনা মাথা নাড়ল। আশ্বস্ত হ'ল যেন। কিন্তু এগোবার আগেই সাগ্রহে আর একটা প্রস্তাব করে বসল নিধুরাম। নিজের যা কিছু অন্যের চোখ দিয়ে আস্বাদন করে নেওয়ার বৃত্তিটা শাশ্বত। দিদিমণির মতো এমন সমঝদার আর পাবে কোথায়? সবিনয়ে বলল, আগে আমার ঘরখানা দেখে যাও, হ্যাঁ? বাবুর ঘর থেকে আমার ঘর ঢের ভালো, দেখবে এসো, কাউকে দেখাইনে।

সানন্দে আগে তারই ঘর দেখতে চলল সান্ত্বনা। সত্যই দেখার মতো ঘর। নিধুর নিজস্বতা আছে একটা। যেখানে যা কিছু পছন্দই সবই ঘরে এনে পুরেছে। চৌকি, হাতলভাঙা চেয়ার, খবরের কাগজে ঢাকা কেরোসিনকাঠের টেবিল। টেবিলে রাজ্যের জিনিস। রঙ-ওঠা টাইমপীস্, ফাটা আয়না, রোঁয়া-ওঠা বুরুশে দামী চিরুনি, সস্তা ফাউন্টেন পেন, কালি, চকচকে অ্যাশ-পট একটা, দামী তেলের শিশি, দুটো একটা অন্য ফাইল পর্যন্ত। আলনায় আধময়লা কাপড় জামা আর ছেঁড়া টার্কিশ তোয়ালে, নিচে দু'তিন জোড়া পুরানো জুতো। সামনেই দেয়ালে মহাদেবের ছবি আর তার পাশেই স্রস্তবসনা নারীমূর্তির বিলিতি ক্যালেণ্ডার।

বাঃ সুন্দর! সান্ত্বনা হেসেই ফেলল, এত সব তুমি কোথায় পেলে?

একটু যেন বিব্রত হয়ে পড়ল নিধুরাম। জবাব দিল, পাবে আবার কোথায়, এ সব তো তারই। কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারল না তবু। একটু সতর্ক করে রাখা ভালো। বলল, আমার ঘরে এত সব আছে তুমি যেন বাবুকে বোলো না দিদিমণি।

সান্ত্বনা মাথা নেড়ে আশ্বস্ত করল তাকে, বলবে না। খুশি হয়ে নিধুরাম নিচু গলায় বলল আবার, তোমাকে তাহলে বলি দিদিমণি, বাবুর তো কিছু মনে থাকে না, যখন যা ভালো কিছু নিয়ে আসে, কিছুদিন গেলেই সেটা আমার হয়ে যায়। যদি কখনো খোঁজ পড়ে, বলি খুঁজে দোব'খন—ব্যস্, তার পর আর মনে থাকে না, কি করে থাকবে, সারাক্ষণ তো মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করে ড্যাম্ ঘুরছে।

দিদিমণিকে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে কিছু বোধ হয় খেয়াল হ'ল নিধুরামের। অতঃপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে মনোভাবটুকু জ্ঞাপন করল, তার সার কথা, দিদিমণি ভাবছে চুরি, চুরি নয়, চুরি কেন হতে যাবে! এমনিই নেয় সে, তেমন বেশি খোঁজ পড়লে চুপি চুপি তো আবার ফিরিয়েই দেয়। আর তাছাড়া সে তো আর বিয়ে-থাওয়া কিছু করে নি, ঘর-সংসারও নেই—এ সব তো এখানেই থাকবে বরাবর, কোথায় আর যাবে।

কোনরকমে হাসি দমন করে তার কথায় সায় দিতে দিতে বাইরে এলো সান্ত্বনা। নিধু বলল, বাবুর আসার সময় হয়ে গেল, আমি চট্ করে চায়ের জল চাপিয়ে আসি।

নিধুর পাল্লায় পড়ে এভাবে এখানে এসে পড়ার অস্বস্তি অনেকটা কেটেছিল। গৃহস্বামীর প্রত্যাবর্তন-সম্ভাবনায় সঙ্কোচ বাড়তে লাগল আবার। বাইরে অঝোরে জল পড়ছে তেমনি। ওর সঙ্গে আড়ি করে নেমেছে যেন। এত জলে কেউ বেরোয় না এই যা ভরসা। একটু ধরে এলে ও নিজেই আগে পালাবে এখান থেকে।

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে নিধুর মনিবের ঘরে উঁকি দিল সান্ত্বনা। অবিন্যস্ত অগোছালো ঘরের ছিরি দেখে ওর হাসি পেয়ে গেল। যেটার যেখানে খুশি পড়ে আছে। সব ছাড়িয়ে চোখ গেল ঘরের কোণের টেবিলটার দিকে। টেবিলের দামী ফোটোস্ট্যাণ্ডের ওপর।

এরই কথা শুনেছিল নরেনবাবুর মুখে। ফোটেখানার কথাও শুনেছিল। পায়ে পায়ে এগোলো সান্ত্বনা। কাছে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল। ঝকঝকে চকচকে চেহারা। সুশ্রী। শৌখিন বেশবাস। সুপরিস্ফুট আভিজাত্য।

এই তাহলে নীলা! সামনাসামনি এলে যে এখনো পারে সব ওলটপালট করে দিতে, এই কাজ এই নিষ্ঠা সব তছনছ করে ফেলতে!

চেয়ে চেয়ে দেখছে সান্ত্বনা।

পারে বোধ হয়। নইলে এ ছবি এখনো এখানে কেন? হাতে তুলে নিল ছবিখানা। কাছে দূরে এপাশে ওপাশে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল আবার। আয়নায় চোখ পড়ে নি, নইলে দেখত নিজের এই দেখাটার মধ্যে প্রীতি ছিল না খুব।

নিধুর সাড়া পেয়ে ফোটো যথাস্থানে রেখে দিল আবার। নিধু চুপি চুপি পরিচয় করিয়ে দিল, উটি নীলা দিদিমণি, বাবুর সঙ্গে খুব ইয়ে ছিল একসময়, কি রকম সব গণ্ডগোল হয়ে গেল, নইলে বাবুর তখন ফূর্তি ছিল কত!

সান্ত্বনা জানে সবই। কিন্তু জানুক বা না জানুক নিধুর মুখে কিছু শুনতে যাওয়া বিড়ম্বনা। বেরিয়ে এসে বাইরের ঘরে বসল সে।

নিধুর ভদ্রলোক হওয়ার সরঞ্জাম সংগ্রহে বিশেষ একটা অভিলাষ অপূর্ণ থেকে গেছে বলেই নীলা দিদিমণির প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। গোপনে বাসনাটা ব্যক্ত করে ফেলল সান্ত্বনার কাছে।—কাউকে যদি না বলো তো একটা কথা বলি দিদিমণি, হ্যাঁ?

কোনরকম প্রতিশ্রুতি না দিয়েই সান্ত্বনা আবার কিছু শোনবার সম্ভাবনায় শঙ্কিত নেত্রে তাকালো তার দিকে।

আমাকে অমনি রূপোর খাপে বাঁধানো ছবি দেবে একটা দিদিমণি? টেবিলে রাখতুম—

নিবেদন শুনে দুই চক্ষু প্রথমে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সান্ত্বনার। উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে স্থির বসে থাকা দায় হ'ল তার পর। এই নিয়ে ওর সামনে বসে হাসাটাও বিসদৃশ। আবেদন পেশ করে ফেলেই নিধুও লজ্জায় অধোবদন। দিদিমণি অত হাসবে জানলে বলত না।

সান্ত্বনা বলল, আমার কাছে তো নেই, পেলে দেব'খন। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যই জিজ্ঞাসা করল, তোমার চা হয়ে গেল?

না, সবে জল গরম হ'ল, এবারে খাবারটা আগে তৈরী করব, তুমি বসো।

মনে মনে নিধুও একটু আড়াল হবার ফিকির খুঁজছিল হয়তো। ব্যস্ত হয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

কিন্তু দিদিমণির মতো একজনকে চুপচাপ বসিয়ে রেখে কতক্ষণ আর ভালো লাগবে। তার ওপর একটা প্ল্যানও এসে গেছে মাথায়। এবারের প্রস্তাবে নিশ্চয় খুশি হবে। সেই টিফিন ক্যারিয়ার বদলানোর ব্যাপারটা নিধু জীবনে ভুলবে না। বাবু অবাক হয়ে কেমন চেটেপুটে খেয়েছিল এবং পরে জেনে ফেলে আরো কত অবাক হয়েছিল, সে সব ফিরিস্তি দিদিমণির কাছে অনেক দিন আগেই বলা হয়ে গেছে।

গামছায় হাত মুছতে মুছতে কাছে এসে দাঁড়াল আবার। দিদিমণি, নতুন খাবার কিছু তৈরী করে দেবে? দাদাবাবু খেয়ে ভারি খুশি হবে সেবারের মতো—

ঝোঁকের মাথায় এখানে এভাবে এসে আটকে পড়ার অস্বস্তি ক্রমেই বাড়ছিল

সান্ত্বনার। ভুরু কুঁচকে জলের বহর দেখছিল। ওকে জব্দ করার জন্যেই যেন সব কিছু। যার কথা ভেবে এত সঙ্কোচ, এর ওপর তাকে খুশি করার এই প্রস্তাব শুনে প্রায় রেগেই গেল। বলল, রোজ কচ্ছ তুমিই করোগে যাও, আমি এখন পারব না—তোমাদের ছাতাটাতা আছে কিছু?

হঠাৎ এই বিরাগের সুরটা কানে বাজতে থতমত খেয়ে গেল নিধু। মাথা নাড়ল, নেই—। ফিরে গেল।

ছাতা থাকলেই বা এ জলে যেত কি করে। সাদা মনে এসেছিল লোকটা, এভাবে না বললেই হ'ত। ভাবল সান্ত্বনা। নেমন্তন্ন করে তো আর ডেকে আনে নি, বরং এসেছে বলে খুশিতে আটখানা হয়েছে। উসখুস করতে লাগল।... নীলার মতো মোটর হাঁকায় নি কখনো, ঝরনার মতো এম. এ. পড়ে নি—কিন্তু এই একটি জায়গায় তার হাত পড়লে তেমন কিছু করে তুলতে পারে, সে অবস্থা পুরোপুরি আছে। আর একটু পাবার আকর্ষণও কম নয় ওর কাছে।

উঠল। পায়ে পায়ে নিধুর রন্ধনশালার দরজায় এসে দাঁড়াল। কাগজে জড়ানো বড় একটা পাঁউরুটি আর গোটাকতক ডিম সামনে রেখে গম্ভীর মুখে নিধু পেঁয়াজ কুচোতে বসেছে।

কি খাবার কচ্ছ নিধু?

জবাব না দিয়ে ডিম-পাঁউরুটির দিকে একবার তাকালো শুধু। বড় সাহেবের আপনার লোক প্রায়, তারও একটা মানমর্যাদা আছে। নেহাত দিদিমণি বলেই ভুলেছিল আর অমন অনুরোধ করেছিল।

সান্ত্বনা আবার জিজ্ঞাসা করল, আপিস থেকে এসে এই শুকনো ডিম-রুটি খাবেন তোমার বাবু?

নিধু সাফ জবাব দিল, খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করে তখন, খাবে না তো কি।

জবাব শুনে বিমর্ষ হ'ল সান্ত্বনা। কিন্তু ওর দিকে চেয়ে বেশ একটু কৌতুকও অনুভব করল।—জল ছাড়ার তো কোন লক্ষণ নেই, তোমার বাবু আসবেন কি করে?

আঁটা-পুরুফ আছে, বিষ্টির জল ভেতর সেঁধোয় না, ঠিক আসবে।

সান্ত্বনা দু'চার মুহূর্ত ঘরের ভেতরটা দেখে নিল চুপচাপ। তেমনি হালকা করেই বলল আবার, তোমার আছে তো দেখছি শুধু ডিম আর রুটি, এ দিয়ে আবার নতুন কি করতে চাইছিলে তুমি?

জবাব না দিয়ে নিধু ঘরের কোণে তরকারির ঝুড়িটার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল।

সান্ত্বনা হাসল একটু।—আচ্ছা সরো, দেখি কি করতে পারি।

এতক্ষণে নিধুর ফুর্তি ফিরে এলো আবার। একগাল হেসে তরকারির ঝুড়িটা টেনে আনলো। অন্যান্য সরঞ্জাম হাতের কাছে গুছিয়ে দিতে লাগল। চৌকাঠের ওপর বসে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগল তার পর।

নিধু অরসিক নয়। তার মনে হল, দুখানি যোগ্য হাতের তৎপর ছোঁয়া পেয়ে ঝিমন্ত রান্নাঘরটাই যেন নড়েচড়ে জেগে উঠেছে। তরকারি শেষ, আদা-পেঁয়াজের রস সহযোগে সেদ্ধ আলুর কাটলেট শেষ, এবারে ডিম আর রুটি একসঙ্গে করে ভেজে

নামাচ্ছে। কথাবার্তা থেমে গেছে নিধুরামের, সব ক'টিরই সুঘ্রাণে রসনা সিক্ত।

বাইরে খটাখট্ কড়া নাড়ার শব্দ।

নিধু ছুটল। হাত থেমে গেল সান্ত্বনারও।

গৃহস্বামীর পদার্পণ ঘটেছে। জলঝরা ওয়াটার-প্রুফ খুলে নিধুর হাতে দিল। ভিজে জুতো বদলে ঘরে ঢুকলো। তোয়ালে দিয়ে আধভেজা হাতমুখ মুছে ফেলে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল খানিকক্ষণ। নিধু দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

খানিক বাদে আপিসের বেশভূষা বদলে এবং হাত মুখ ধোয়া শেষ করে আবার ইজিচেয়ারে এসে বসল, বলল, খুব ভালো করে চা কর্—

এরই প্রতীক্ষায় ছিল নিধুরাম। নির্দেশ শোনার আগেই রান্নাঘরে এসে হাজির। সান্ত্বনা গুছিয়ে রেখেছে সব। একটি কথাও না বলে তার হাতে তুলে দিল। খেয়াল করে ওর মুখের দিকে তাকালে নিধুরামও ভড়কে যেত হয়ত। কিন্তু তার চোখ অন্যদিকে। নিজেদের জন্য কতটা আছে না আছে দেখে নিয়ে খাবার হাতে দ্রুত প্রস্থান করল আবার।

রোজকার মতই খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে মনিব। খাবারের ডিশে হাত বাড়াল। তার পরেই তফাৎটা বুঝতে পারল। কাগজ কোলে নামিয়ে ভালো করে দেখল চেয়ে। তার পর অবাক হয়ে তাকালো নিধুর দিকে। কিছু স্মরণ হ'ল বোধ হয়।

নিধু প্রস্থানোদ্যত।

ডাকল, এই শোন্ তো—

প্রত্যাবর্তন।

এ খাবার তুই তৈরী করেছিস না কেউ পাঠিয়েছে?

নিধু জবাব দিল, এ বৃষ্টিতে আবার পাঠাবে কেমন করে, ঘরে বসেই তৈরী করেছে দিদিমণি।

দিদিমণি!

স্মরণ করিয়ে দিতে চেষ্টা করল নিধু, সেই ওভারসিয়ার দিদিমণি—সেই সেবারে রাস্তায় যার সঙ্গে পোলাও-কালিয়া বদল হয়ে গেছল। বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজছিল, আমি ধরে নিয়ে এলাম—আসতে কি চায়, বলে, তোমার বাবু রাগ করবেন না তো?

চায়ের সরঞ্জাম হাতে সান্ত্বনা সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ল। তেপায়ার ওপর রাখল ঠক্ করে। বলল, অত জেরার কি আছে, খেতে ভালো না লাগে সরিয়ে রেখে দিন। নিধু ওমলেট আর পাঁউরুটি নিয়ে আসুক, চিবোন বসে বসে।

বাক্য শুনে নিধু হতভম্ব। বাইরের জলের দরুন ঘরে আলো কম হচ্ছিল। আলোটা জ্বেলে দিল। মনিবের মুখে রাগের চিহ্নমাত্র না দেখে আশ্বস্ত। উল্টে হাসির মতোই দেখল যেন। তক্ষুনি রান্নাঘরের কথা মনে পড়ে গেল তারও। তাড়াতাড়ি সেদিকেই চলল সে।

বসুন।

বন্ধ দরজা-জানালার কোনো এক ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা যদি এসেই পড়ে সেটা উপলব্ধি না করে উপায় নেই। চাক বা না চাক, ভালো লাগার আভাস লাগল

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মুখে।

এ রকম পরিবেশে সান্ত্বনার একমাত্র সোজা রাস্তা সহজ হওয়া। এই সহজ হওয়ার দায়েই সরাসরি ঘরে এসে ঢোকা। বলল, হ্যাঁ বসবে, বাড়িতে ওদিকে বাবা কত ভাবছেন।

জানালা দিয়ে বাইরের জলঝরা আকাশ নিরীক্ষণ করে বাদল গাঙ্গুলি হালকা জবাব দিল, তাহলে বাড়ি যান।

বিস্মিত নেত্রে তাকালো সান্ত্বনা, এই বৃষ্টিতে যাব কি করে।

তাহলে বসুন।

সান্ত্বনা সকৌতুকে দেখল আবারও। পরে বলল, আমার নাম সান্ত্বনা। আমাকে আপনি বসুন বলতে হবে না।

খেতে খেতে বাদল গাঙ্গুলি মুখ তুলে হাসল একটু।—নাম জানি।

সকলেই জানে।

অর্থাৎ সকলেই যখন জানে, তার জানাটাও এমন কিছু নয়। এই নিস্পৃহ অভিব্যক্তির পিছনে আয়াস কতটুকু বুঝতে দিতে রাজী নয় সান্ত্বনা। বলল, কতক্ষণে যে ধরবে এ ছাইয়ের জল কে জানে, সেই কখন থেকে আটকে আছি।

নরেনবাবু হলে এই অকালবর্ষণের সুবিবেচনার কথা বলে খাবারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠত। আহার-রত মানুষটা সে দিক দিয়েও গেল না। ক্ষুদ্র প্রশ্ন করল, আজ এদিকে রাউণ্ড ছিল বুঝি?

এবারেও সেই একই কথার টোপ ফেলল সান্ত্বনা।—ছিলই তো, আপনার ডিম-রুটি চিবুনো বরাতে নেই বলেই ছিল বোধ হয়। ওই নিধুর জন্যে, নইলে কবে এতক্ষণে ভিজেই বাড়ি চলে যেতাম।

এবারেও সুতোটা ছেড়ে দিয়ে গেল বাদল গাঙ্গুলি। মৃদু হেসে পেয়ালায় চা ঢেলে নিয়ে আবার আহারে মনঃসংযোগ করল।

জানালার কাছে গিয়ে একবার আকাশটা দেখে এলো সান্ত্বনা। তারপর দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। ভুরুযুগলে কুঞ্চনরেখা মিলিয়ে গেল। এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, আগের থেকে শুকনো দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। মড়াইয়ে বিগত গোলযোগের দরুন বোধ হয়। কিন্তু শুকনো হলেও সঙ্কল্পের কাঠিন্য আছে তাতে। আর আছে প্রায়-রূঢ় স্বাতন্ত্র্যবোধ। ভেবেছিল এই নিয়ে কথাবার্তা হবে, মড়াইয়ের ভালোমন্দ মিশে আছে তারও মনের সঙ্গে, জানিয়ে দেবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভয়ানক গায়ে-পড়া শোনাবে। এরকম নির্বিকার অভ্যর্থনায় সান্ত্বনাও অভ্যস্ত নয় আজকাল।

কি হ'ল, বসতে আপত্তি আছে নাকি? চায়ের পেয়ালা রেখে বাদল গাঙ্গুলি মুখ তুলল আবার। আপনি বা তুমি দুইই এড়িয়ে গেল।

সান্ত্বনাও লক্ষ্য করল সেটুকু। ঘরের মধ্যে বসবার দ্বিতীয় জায়গা শয্যা বিছানো খাটখানা। খাটের পাশেই টেবিল। টেবিলের ওপর নীলার ফোটো। ফোটোর মধ্যে মেয়েটা যেন একেবারে মুখোমুখি হাসছে তার দিকে চেয়ে চেয়ে। পাল্টা জবাবেই যেন সান্ত্বনা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি সহকারে দেখতে লাগল তাকে। আর তার এই দেখাটা

অনুসরণ করে অন্য লোকটির নীরব চাঞ্চল্য না তাকিয়েও উপলব্ধি করতে পারল।

বাদল গাঙ্গুলির দু চোখ ওর দিকেই সংবদ্ধ। ভিতরে একটা নাড়াচাড়া পড়ল হঠাৎ। গুরুগম্ভীর পদমর্যাদার আবরণ সরিয়ে অনেকদিনের আহত মানুষটাই জেগে উঠল যেন। নিছক কৌতূহলে ভিতরের একটা দুর্বল ক্ষত কেউ উল্টেপাল্টে দেখতে থাকলে যেমন লাগে তেমনি লাগছে। অস্বস্তিকর, যন্ত্রণাদায়ক।

হঠাৎ বেদম হাসি পেয়ে গেল সান্ত্বনার। হাসতে হাসতে খাটের কোণ ঘেঁষে বসে পড়ল এবার। মানুষটার চোখের দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠেছে দেখেও হাসি থামে না কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই থামতে দিল না সেটা।

এত হাসির কি হ'ল? নীরস ঠাণ্ডা প্রশ্ন।

সান্ত্বনার সামলে নিতে সময় লাগল তবু। শাড়ির আঁচলে চোখ মুখ মুছে নিয়ে বলল, শুনলে আপনি রেগে না যান। আপনার নিধুরও ভারি শখ এইরকম একখানা ঝকঝকে ফোটো ওর টেবিলে রাখে, আমাকে বলছিল যদি একটা যোগাড়-টোগাড় করে দিতে পারি।

হাসির কারণ শুনে অন্তস্তলের একটা ছায়াভয় মুহূর্তে অপসৃত হয়ে গেল যেন। ইচ্ছে না থাকলেও যেখানে সহজ হওয়া যায়, সহজ হতে হয়, তেমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে মেয়েটার জুড়ি নেই বোধ হয়। মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো বাদল গাঙ্গুলি। বলল, তা তুমি ইচ্ছে করলে এর থেকে অনেক ভালো ফোটোই তো নিধু পেতে পারে, বলছিল যখন দিয়েই দাও একখানা।

বুঝল সান্ত্বনা। বুঝেও দুর্বোধ্যতার ভান করতে হ'ল তাকে।—আমি কোত্থেকে দেব?

তোমার নিজের ফোটোই একখানা দিয়ে দিতে পারো....।

চকিত কটাক্ষে সান্ত্বনা তাকালো একবার তার দিকে। পরিণত অজ্ঞতায় ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, আমার ফোটোই নেই—। কি মনে পড়তে আর এক ঝলক হাসল আবার। মুখোমুখি জাঁকিয়ে বসল।—জানেন, মাসিমা একবার তো আমায় সাজিয়েগুজিয়ে ফোটো তোলানোর সব ঠিকঠাক করলে। ফোটোগ্রাফারের সামনে যেই গিয়ে দাঁড়ানো, অমনি ভদ্রলোক সেই কালো ঘোমটা মাথায় দিয়ে যা শুরু করে দিলে—সোজা হোন, বেঁকে দাঁড়ান, মুখ তুলুন, মুখ নামান, গম্ভীর হোন, ওয়ান—টু—হাসুন। আমার আগেই হাসি পেয়ে যাচ্ছিল, তার ওপর যেই না বলা হাসুন, আমি হেসে একাকার—কালো ঘোমটা সরিয়ে ভদ্রলোক এমন চেয়ে রইল—আমার হাসি আর থামলই না, একেবারে দে ছুট।

নিজের অজ্ঞাতে ভালো লাগছে বাদল গাঙ্গুলির। কল খুলে দিলে যেমন ঝরঝরিয়ে জল পড়ে, এ মেয়ের হাসির উৎসে নাড়া পড়লে তেমনি ঝরঝরিয়ে হাসি ঝরে।

তোমার সুন্দরী কেমন আছে?

আর একদিন আর এক জায়গায় এই একই প্রশ্ন করে যে জবাব পেয়েছিল বিলক্ষণ মনে আছে। আছে বলেই আজ আবারও জিজ্ঞাসা করল।

সান্ত্বনা যথার্থই লজ্জা পেল এবার।—তবু বলল, ওর ওপর আপনার খুব টান

দেখছি।

যে টানা টানিয়েছিলে, টান হবে না?

আরক্ত হয়ে উঠল সান্ত্বনা—আমি কি জানতুম আপনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার এখানকার।

জানলে কি করতে?

স্যালুট-ট্যালুট করতাম বোধ হয়।

গোরু ছুটে যেতে যেভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল বাদল গাঙ্গুলির। সে কথা বলে লজ্জা না দিয়ে বলল, কিন্তু তার পরেও তো অনেকবার দেখা হয়েছে, পরোয়া কর নি তো?

অম্লান বদনে উল্টো জবাব দিল এবার, আমি পরোয়া করতে যাব কেন, আমি আপনার চাকরি করি?

বাদল গাঙ্গুলি হাসছে।

ঘরের আলোয় বাইরের দিকটা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি কেউ। অধ্যবসায়ী ছাত্রের দুরূহ কোন আঁকের ফল মিলে গেলে যেমন হয় তেমনি একটা তৃপ্তির আস্বাদন নিয়ে সান্ত্বনা উঠে জানালার ধারে জল থেমেছে কিনা দেখল। জিব কামড়ে বলল, এই যা, জল কখন ছেড়ে গেছে, বাবা দেবে'খন, আমি চলি—।

ঘাড় ফিরিয়ে বাদল গাঙ্গুলিও তাকালো বাইরের দিকে। সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমেছে। বলল, নিধুকে ডেকে দিই, সে সঙ্গে যাক।

অস্ফুট হেসে উঠল সান্ত্বনা, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার—নিধুকে ডাকতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব।

লঘু চরণে ঘর থেকে দ্রুত নিস্ক্রান্ত হয়ে গেল।... বাদল গাঙ্গুলি চুপচাপ বসে। রাত্রিচেরা বিদ্যুৎঝলক বিবরাশ্রয়ীদের সাড়া পেয়ে হঠাৎ সচেতন হ'ল যেন। এ বিস্মৃতি চায় নি, চায়ও না। চোখ দুটো আবার শুকনো খরখরে হয়ে উঠতে লাগল আগের মতোই।

কিন্তু তবু ঘরের আলোটা এমন নিষ্প্রভ লাগছে কেন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টার থেকে সান্ত্বনা বেরিয়ে এলো বিজয়িনীর মতোই। অন্তর্তুষ্টিতে ভরপুর। কাউকে বলা যাবে না, নরেনবাবুকেও না।...বলতে পারলে কিন্তু বেশ হ'ত। কলের মানুষ নাকি। কলের মানুষের কলকব্‌জাগুলো একটু নাড়াচাড়া করে দেখে আসতে পারে বোধ হয় ইচ্ছে করলে।

কিন্তু মেন কোয়ার্টারস-এর বাঁধানো রাস্তায় এসে দাঁড়াতেই সমস্ত নারীবিক্রম ঠাণ্ডা। কোয়ার্টার থেকে পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে রাস্তার আলোর নীচে দাঁড়িয়ে রণবীর ঘোষ কথা বলছে নিধুর সঙ্গে। মড়াইয়ের সোসাইটি বলতে মেন কোয়ার্টার্স। দেখা এখানে সকলের সঙ্গেই হতে পারে। কিন্তু জলঝরা রাস্তায় লোকজন নেই আজ, এখানে এ সময়ে নিধুর সঙ্গে কথা বলাটা শুধুই যোগাযোগ নয় নিশ্চয়। সেই বাদনা উৎসবের পর এই ক'মাসের মধ্যে লোকটাকে আর সামনাসামনি দেখে নি সান্ত্বনা।

মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিল। সোজা নিধুর সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে অনুশাসনের সুরে বলল, তুমি এখানে আর ওদিকে ডেকে সারা এতক্ষণ। আমাকে

পৌঁছে দেবে চলো।

কিন্তু নিধুর মনে রয়েছে অন্য চিন্তা। বলে উঠল, এই যাঃ, তুমি চলে এলে দিদিমণি, তোমার খাবার যে রান্নাঘরে ঢাকা পড়ে থাকল। আমি অপিক্ষে করে করে ভাবছিলাম...

তুমি আসবে না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্‌বক্‌ করবে? যথার্থ রেগে উঠল সান্ত্বনা।

নিধু হকচকিয়ে গেল। সান্ত্বনা ভ্রূক্ষেপ করুক বা না করুক, রণবীর ঘোষ নিজে থেকেই অমায়িক হেসে বললে, আপনার যাবার তাড়ায় বেচারীর দরদটুকু মাঠে মারা গেল, খবর সব ভালো তো?

জবাব না দিয়ে সান্ত্বনা পলকের জন্য শুধু মুখ তুলে তাকালো একবার। সেই হাসি ভেজানো ঝকঝকে মুখ আর চকচকে চোখ। বিগত গোলযোগের আঁচ লেগেছে কোথাও মনে হয় না, একটুও বদলায় নি।

পা বাড়াবার আগেই দ্বিতীয় দফা বাক-নিঃসরণ হ'ল রণবীর ঘোষের।—সেই দু মাস আগে আমার গো-ডাউন দেখতে যাবেন বলেছিলেন, এতদিনের মধ্যে কই একবারও গেলেন না তো?

আপনার গো-ডাউন এখনো আছে নাকি?

বলবে ভাবে নি, বলতে চায়ও নি। মুখ দিয়ে আপনিই যেন বেরিয়ে গেল হঠাৎ। সচকিত হয়ে ডাকল, নিধু এসো—

সায়েবকে বলে আসি দিদিমণি...

বলতে হবে না, এসো তুমি। ঝাঁঝিয়ে উঠে সান্ত্বনা হনহন করে এগিয়ে গেল।

রমণী-বিরাগে অনভ্যস্ত নিধুরাম শশব্যস্তে অনুসরণ করল তাকে। মনটাই খারাপ হয়ে গেছে। দিদিমণি এ রকম বললে বলে নয়, নিজের হাতে সব করে না খেয়ে চলল বলে। বেচারীর দোষ নেই। জিজ্ঞাসা করতে এসেও মনিবের ঘরের আবহাওয়া দেখে রসভঙ্গ করতে মন সরে নি। বাবুর অমন হাসিমুখ দেখে নি অনেককাল।

সামনের বাঁক না পেরনো পর্যন্ত সান্ত্বনা আর এদিক-ওদিক চাইতেও পারছে না। না তাকিয়েও পিছনে রণবীর ঘোষের দুই চোখ উপলব্ধি করতে পারছিল। নিধু পাশে আসতে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে না তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল?

নিধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল একবার। বলল, দাঁড়িয়ে এদিকপানে চেয়ে আছেন। বাবুর সঙ্গে আজ আর দেখা করবেন না তো উনি।

সান্ত্বনা বলল, দেখা করবেন না তো তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এত কি কথা হচ্ছিল?

যেন সে-ই মনিব নিধুর। নিধুর বক্তব্য, দেখা করার জন্য লোকটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে ঠিক করেছে অত রাত্রে আর দেখা করবে না, আর একদিন আসবে।

জবাবদিহি শুনে আরো রেগে গেল।—অপেক্ষা করছিল তো তুমি তোমার বাবুকে খবর দাও নি কেন?

তাই বা কি করে দেবে নিধু! লোকটা যে নিষেধ করল, সাহেব দিদিমণির

সঙ্গে গল্প করছে যখন আর বিরক্ত করে কাজ নেই, বাড়িতে কখন কি রকম ফুরসত থাকে সাহেবের, তাই জেনে নিচ্ছিল।

নিধুর আত্মসমর্থনে কিছুমাত্র খুশি না হয়ে নিজের মনে গজগজ করতে করতে এগোলো সান্ত্বনা।

নিধু মিথ্যে বলে নি খুব। তা বলে নির্জলা সত্যিও বলে নি একেবারে। দিদিমণির মেজাজ দেখে চেপে গেল। নইলে কথা উঠতে আরো অনেক কথাই বলে ফেলেছে সে। দিদিমণির কথা। যত বড় সাহেবই হও, দিদিমণির সামনে সব জল। প্রকারান্তরে এ কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে রণবীর ঘোষকে। তার পর দিদিমণির রান্নার প্রশংসাও করেছে বৈকি। আর তাই যখন করল, সেবারের সেই 'টিপিনকার' বদলে দেওয়ার মজার খবরটাই বা না বলে পারে কি করে।

কিন্তু সান্ত্বনার মন থেকে রণবীর ঘোষ মুছে গেল একটু বাদেই। তাব আগের অধ্যায়টুকুই জুড়ে বসল আবার। ...নরেনবাবু মিথ্যে বলে নি বোধ হয়। আসলে ওই মেয়েটাকে ভুলতে পারে নি বলেই একটা শোকের অহঙ্কার চোখের সামনে সর্বদা জিইয়ে রাখতে চায় মানুষটা। নইলে ও ছবিটা ওভাবে ওখানে থাকত না। থাকুক, সান্ত্বনার আপত্তি নেই। কিন্তু কোনো এক নারী-বিষে জ্বলছে বলে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে একজন তার গ্লানি ছড়িয়ে সমস্ত মেয়ে জাতটাকে কালো করে দেখবে, সেখানেই যত আপত্তি। ওতে যেন তাদের সক্কলের অপমান। থেকে থেকে কেবলি মনে হতে লাগল, একটা কাজের মতো কাজ হয়েছে আজ। ওপর ওপর দেখতে গেলে কিছুই নয়, কি আর এমন বলে এসেছে কিন্তু মনের কারিগরী অন্য রাস্তায়। ও যেন জানে, বলাটাই সব নয়। বলে হোক, না বলে হোক, ওই লোকটার ওই কালোর শোক কিছুক্ষণের জন্য অন্তত ঘুচিয়ে এসেছে।

নিধুকে আগেই বিদায় দিয়েছে। বাড়ি ঢুকে দেখে, বাবা চিন্তিত মুখে ঘরবার করছেন। দেখেই বলে উঠলেন, ঝড়জল দেখে বেরোস না, না কি—?

অপ্রস্তুত হয়েও জবাব দিল, জল এসে গেল তার আমি কি করব?

বিরস বদনে অবনীবাবু কাছে এসে হাত দিয়ে তার গা মাথা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন, ভিজেছে কি না।

কেমন, ভিজেছে?

অবনীবাবু হেসে বললেন, না, খুব বাহাদুরি—সেই থেকে ভাবছি আমি, ছিলি কোথায় তুই?

তোমার তো কাজ না থাকলেই ভাবা, রোসো এদিকের ব্যবস্থা দেখে আসি আগে। সরে এলো সান্ত্বনা। ব্যবস্থার জন্য নয়, ছিল কোথায় এতক্ষণ সেটাই এড়াতে চায়। কিন্তু কেন?

এই কেনটাই ভালো লাগছে না কেন জানি। নিজের পরিবর্তন জানে, উপলব্ধি করে। আগে হলে বাবার সামনে জাঁকিয়ে বসত, বলত সব। আজ বলতে পারল না। পারল না, কারণ জলটা হঠাৎ এসেছে বটে, কিন্তু বাদল গাঙ্গুলির বাড়িতে ওর যাওয়াটা আকস্মিক কিছু নয়। জলের সুযোগে ভিতরের একটা আগ্রহ ওকে ঠেলে

পাঠিয়েছে।

তিন চার দিন পরে বাড়ি ঢুকেই নরেন হৈ-চৈ করে উঠল প্রায়, তোমার ব্যাপারখানা কি বল তো! অমন একটা অ্যাডভেঞ্চার করে এলে অথচ আমাকে বলই নি কিছু?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখে এক ঝলক রক্ত নেমে এলো সান্ত্বনার। কাজের অছিলায় উঠে গিয়ে একটু বাদে ফিরে এলো আবার।—কি হয়েছে বুঝলাম না।

বুঝলে না? সেদিনের জলে কোথায় আটকে পড়েছিলে?

ও, এই কথা। সে আবার বলার মতো কি?

বলার মতো কি! জবাব শুনে নরেন আরো অবাক। যেন নির্ঝরিণী বলছে, ঝরার মতো কি।

যথাসম্ভব নিস্পৃহতা বজায় রেখে সান্ত্বনা সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, কার কাছে শুনলেন?

নিধুরাম দি গ্রেট।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ওর কথা ভুলেই গিয়েছিল। এবারে রাগও হ'ল বেশ। ঠেস দিয়ে বলল, নিধুরামের সঙ্গে খুব ভাব বুঝি আপনার?

খুব। নিধু হ'ল আমার দশ বছরের শাকরেদ।

কান কুড়কুড় শেখে? হেসে উঠল। ঠাট্টা করতে পেরে নয়, প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য।

অ্যাডভেঞ্চারের কথাটা চাপা পড়ে গেল ঠিকই। এর পরেও ও কিছু বলল না দেখে নরেনও তুলল না কথা। মনে একটা জিজ্ঞাসার আঁচড় পড়ল কি পড়ল না। ব্যতিক্রমটুকুই উপলব্ধি করল শুধু। কিছুদিন ধরেই করছে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ওকে লক্ষ্য করল অনেকবার।...উচ্ছলতা নয়, সম্প্রতি খুশির জোয়ারটা ওর ভিতরে এসে থেমে আছে যেন।

ড্যামের সকলেই ব্যস্ত ইদানীং। আর একটা বছর ঘুরে আসছে। কাজের গতি লক্ষ্যের নিশানায় পৌঁছয় নি। নতুন বছরের ছক কাটা হচ্ছে। সন্ধ্যায় মিটিং বসছে রোজই। আরো লোকজন আরো সাজসরঞ্জাম আরো তৎপরতা বাড়ানোর জল্পনা-কল্পনা।

অবনীবাবুর বাড়ি ফিরতে রাত হয় প্রায়ই। নরেনেরও ক'দিনের মধ্যে দেখা নেই। আগে এ ধরনের বাড়তি অবকাশে সান্ত্বনা নিজেকে আরো বেশি করে বাইরে ছড়িয়ে দিত। কিন্তু পর পর ক'টা দিন বাড়ি বসেই কাটছে একরকম। বাইরের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর অশান্ত তাগিদে ছেদ পড়েছে। বেশ লাগছে এই ভরা ভরা অলস মুহূর্তগুলো।

দিদিয়া!

হঠাৎ পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন কাঁটা দিয়ে উঠল সান্ত্বনার। ভিতরের দাওয়ায় বসে বাইরের আলোর রংবদল দেখছিল চুপচাপ। উঠবে, আলো জ্বালবে, সন্ধ্যে দেখাবে। আঁধার ঘনিয়ে আসছিল, কিন্তু উঠি উঠি করেও ওঠা হচ্ছিল না। এরই মধ্যে অনতিদূরে

কোথায় চাপা গলার অতিপরিচিত ফিস ফিস ডাক শুনে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। সহসা প্রেতের ডাক শুনল যেন।

ই দিদিয়া।

সান্ত্বনার সারা অঙ্গে হিমস্রোত বইছে একটা। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। আকুল হয়ে বলতে চাইল, কোথায় রে, কোথায় তুই? ব্যাকুল নেত্রে এদিকে ওদিকে তাকাল শুধু।

দি-দি-য়া!

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল এবার। সুন্দরীর ঘরের দিক থেকে আসছে অস্ফুট কণ্ঠস্বর। এগিয়ে গেল। আড়ষ্ট কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তার পর। গোয়ালঘরের দেওয়াল ঘেঁষে অন্ধকারে আব্‌ছা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

চাঁদমণি।

অস্ফুট হাস্যধ্বনি।—আমাকে চেনতে পারিস লাই দিদিয়া?

সান্ত্বনা সামলে নিয়েছে খানিকটা, মৃদু গলায় ডাকল, আয়।

উবাসীর বাবু কুথা?

নেই, আয়। হাত ধরে তাকে ভিতরের দাওয়ায় নিয়ে এসে আলো জ্বেলে দিল। তারপর আর মুখে কথা সরল না একটাও।

চাঁদমণি কিন্তু হাসছে। যেমন হাসতো আগে তেমন নয়, তবু হাসছে। সান্ত্বনার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, তুকে একটোবার দেখতে আলাম, আরো অনেক সোন্দরপানা দেখতে লাগছে তুকে।

সোজাসুজি সান্ত্বনা তাকাতেও পারছে না। মড়াইয়ে চাঁদমণি বলে মেয়ে ছিল একটা পাগল সর্দারের। অনেকদিন পর্যন্ত তার মূর্তি আর তার কথা সকলেরই মনে হয়েছে। অন্তত সান্ত্বনার তো হয়েছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও প্রেতের প্রত্যাবর্তন যেমন কাম্য নয়, তেমনি বিষম এক অস্বস্তিতে স্তব্ধ হয়ে রইল যেন।...কালোর ওপর আলগা কালো ছাপ পড়েছে আর একটা, ঢলঢলে প্রাচুর্যে শুকনো টান ধরেছে, যে কালো চোখ কারণে অকারণে জ্বলতে দেখেছে কতবার, তার নিচে যেন কালো দীঘির ছায়া। চকচকে মুখে পুরুষ-নির্যাতনের রুক্ষতা, আর....আর...মেয়েটা একলা নয় এখন, ওর দিকে তাকালেই সেই অনাগত সম্ভাবনাটা চোখে পড়ে।

চাঁদমণি দাওয়ার ওপরে বসল।

সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে তেমনি। কি করবে, কি বলবে বুঝে উঠছে না। কেন এলো মেয়েটা। এলো যদি, এমন লুকিয়ে তার কাছেই বা এলো কেন। অস্ফুট প্রশ্ন করল, এতদিন ছিলি কোথায় তুই?

ছেলাম? হাসিতে দাঁতগুলি আগের মতো ঝকঝকিয়ে উঠল না আর।...ছেলাম—কেতো লয়া জায়গায় ছেলাম।

তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে? সান্ত্বনাও বসল আস্তে আস্তে।

সভয়ে চাঁদমণি ফিরে তাকালো তার দিকে। বলল, উ দেখলে তো ভুঁয়ে পুঁতে ফেলাবে।

বেশ করবে, হঠাৎ রাগে দপ করে উঠল সান্ত্বনা, আঁশবঁটি দিয়ে কুটবে তোকে, আমি খবর পাঠাচ্ছি তাকে।

চাঁদমণি অনেকক্ষণ শুধু চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর হাসল আবার। সেই হাসি দেখে গা আরও জ্বলে গেল সান্ত্বনার, মড়ার হাসি-রোগ যায় নি এখনো। কিন্তু পর-মুহূর্তে হকচকিয়ে কাঠ হয়ে গেল একেবারে। সহসা উবুড় হয়ে তার দু পা আঁকড়ে ধরে মাথা গুঁজে রইল চাঁদমণি। নড়ার ক্ষমতা নেই, সর্বাঙ্গ অবশ সান্ত্বনার। এক পাহাড়প্রমাণ জমাট বেদনা যেন কেঁদে কেঁদে তার পায়ের ওপর গলিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা।

নিস্পন্দ পুতুলের মতো বসে আছে সান্ত্বনা। কিন্তু ওই কান্নার স্পর্শে চোখ দুটো তারও ভিজে উঠেছে বার বার।

নিজেই উঠল চাঁদমণি। শান্ত হয়ে আঁচলে চোখ মুছে নিল অনেকক্ষণ ধরে। আবারও হাসল তারপর। জানাল, দিদিয়ার সঙ্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গেই দেখা করতে সাহস করে নি। দিদিয়ার ও ক্ষতি করতে চেয়েছে কতবার, তবু। ও চলে যাচ্ছে, এখান থেকে অনেক দূর চলে যাচ্ছে, আর কোনদিন দেখা হবে না কারও সঙ্গে, কিন্তু সক্কলকে একবারটি দেখতে ইচ্ছে করে খুব—সকলকে আর কি করে দেখবে, লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু বাবাকে দেখবে একবার, দেখে চলে যাবে।

কোথায় যাবি? কার সঙ্গে যাবে, সে প্রশ্ন আর মুখে এলো না।

কে জানে কোথায় যাবে। কে জানে কতদূর নিয়ে যাবে তাকে। বাবাকে একবার দেখা হলেই যেখানে হোক যাবে, আজ ক'দিন ধরে চেষ্টা করছে তাকে লুকিয়ে দেখতে, কিন্তু মড়াইয়ে তো আর যেতে পারে না, গাঁয়ের দিকে গেলেও সকলে চিনে ফেলবে! দিদিয়া কি আর বাবাকে দেখেছে? ক'দিন দেখেছে? কোথায় দেখেছে?

আবার উষ্ণ হয়ে উঠছে সান্ত্বনা। সেই নির্মম বিচারের মহড়া ভেসে উঠল। কি না হ'** পারত! নিজের জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যে লোকটা এত বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করল তার বাবাকে, তার প্রসঙ্গ আভাসেও জিজ্ঞাসা করল না একবার। সান্ত্বনা নীরস কণ্ঠে বলে উঠল, নিজের দেশ ছেড়ে সক্কলকে ছেড়ে ওই জমাদার লোকটাই বেশি হ'ল যখন, তখন আবার দরদ কিসের এত?

কোন্ জমাদার? বাহাদুর? হঠাৎ চাঁদমণির দুই চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। যেমন মড়াইয়ে জ্বলত আগে। চেয়ে রইল সান্ত্বনার দিকে। শুধু ওকে নয়, ওর ভিতর দিয়ে সকলের ধারণাটাই উপলব্ধি করে নিতে চাইলে বোধ হয়। তারপর আস্তে আস্তে নিবে গেল আবার। শান্ত হ'ল। ঠাণ্ডা জবাব দিল, বাহাদুর লয়।

সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো একটা ঝাঁকুনি খেলো সান্ত্বনা। বাহাদুর নয়! বাহাদুর না হলে যে আর কে সেটা বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হ'ল না তার।

চাঁদমণি জানাল, সেই থেকে কলকাতায় ঘোষবাবুর আড়তে কাজ করছে বাহাদুর। ঘোষবাবু অনেক টাকা দিয়েছে তাকে, আরো দেবে। টাকার লোভে বাহাদুর ওকে দেশে নিয়ে যেতে রাজী হয়েছে, বলেছে বিয়ে করবে। কিন্তু বিয়ে করবে না চাঁদমণি

জানে, কেউ করে না...কিন্তু যেতেই যখন হবে কোথাও, ভয়ডর নেই আর, ওর সঙ্গেই যাবে।

মুখ তুলে সান্ত্বনা চাইতেও পারছে না আর। নির্বাক, বিমূঢ়, অধোবদন

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চাঁদমণি উঠে দাঁড়াল একসময়। বলল, যাবার আগে পারলে দিদিয়ার সঙ্গে আর একবার দেখা করে যাবে।

তবু একটি কথাও বলতে পারল না সান্ত্বনা। মুখ ফুটে একবার জিজ্ঞাসাও করতে পারল না, কোথায় যাচ্ছে এখন ও, কোথায় থাকবে।

দিদিয়া—

ডাক শুনে এবারে চমকে তাকালো ওর দিকে। কিছু একটা বলবে চাঁদমণি, স্থিরনেত্রে দেখছে তাকে, চোখ দুটো চকচক করছে প্রায় আগের মতোই।

হঠাৎ অস্ফুট কণ্ঠে একটু হেসে উঠল চাঁদমণি। বলল, দিদিয়া, আখুন তুকে আরো ঢের ঢের সোন্দর দেখতে লাগছে। তু টুকচি সামলে চলিস, বোঝলি?

পিছনের গোরু ঢোকা সরু পথ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

সান্ত্বনা স্থাণুর মতো বসে আছে তেমনি। কতক্ষণ ঠিক নেই। আজ বুঝতে পারছে, অনেক কিছুই বুঝতে পারছে। কেন মড়াইয়ে রণবীর ঘোষের সঙ্গে প্রথম দিন ওকে দেখে অগ্নিদৃষ্টিতে ভস্ম করে ফেলতে চাইছিল চাঁদমণি, বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে, কেন আদিম ঈর্ষায় বাদনা উৎসবে ওই মেয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছিল ওকে। আর বুঝতে পারছে, শাল-মহুয়ার ধারে কোন প্রতীক্ষায় জিপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত রণবীর ঘোষ।

কিন্তু আজ ওর কাছেই এলো কেন চাঁদমণি? এলো কোন বিশ্বাসে? সহানুভূতির জন্যে নয়, নালিশ জানাতে নয়। শুধু ওর বাবাকে দেখার ইচ্ছেয় এসে থাকলে তাকে দেখেই ফিরে যেত। এত বড় মর্মঘাতী বেদনা নিয়ে ওর কাছে আসত না। এসেছে শুধু এই জন্য, এসেছে শুধু এই শেষের কথাটি বলে যেতে। এসেছে নারীমাংসলোলুপ এক পুরুষদানবের সম্বন্ধে ওকে সচেতন করে দিয়ে যেতে।

মড়াইয়ের বাতাস পর্যন্ত দুঃসহ বিষাক্ত হয়ে উঠল যেন। কিছু ভালো লাগছে না, কিছু না। কাউকে বলবে কিছু? কি বলবে?

এক এক করে তিন চার দিন কেটে গেল।

অধীর আগ্রহ। দুরু দুরু প্রতীক্ষা, চাঁদমণি আবার একদিন আসবে বলে গেছে। সন্ধ্যায় বাড়ি ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্য বেরুতে পারে না। নবেন বা তার বাবা সেই সময় বাড়ি থাকলেও অধীর হয়ে ওঠে।

অস্থিরতা বাড়ে। দুপুর হতে সোজা মড়াইয়ে চলে এলো সেদিন। পাগল সর্দারের দেখা পেল না। প্রায়ই কামাই করে আজকাল। কিন্তু সেদিন আরো একটা লোককে দেখল না সান্ত্বনা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাছে দূরে সর্বত্র খুঁজল। হোপুন। অক্লান্ত নির্মম যান্ত্রিক আঘাতে শক্ত কঠিন পাথুরে মাটির বুকে শুধু ক্ষতচিহ্ন আঁকে যে।

ফিরে চলল আবার। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসে নি পাগল সর্দারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু অষ্টপ্রহরের যাতনাব সঙ্গে একটা ভীতিও মিশে আছে কেমন।

বাড়িতেই পাওয়া গেল সর্দারকে। মাটির ঘরের মেঝেয় বসে পাতার নলে তামাক খাচ্ছে। অদূরে হোপুনও চুপচাপ বসে।

আই রে দিদিয়া, আয় আয়। মহা খুশি হয়ে পাগল সর্দার তামাক খাওয়া বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে একটা মোড়া টেনে বসতে দিল তাকে।—বসো দিদিয়া, আজ সোমকাল হতে তুকে ভাবতে ছেলাম, অনেক দিন দেখি লাই।

দ্বিতীয় মানুষটার উপস্থিতি বরাবরই অস্বস্তির কারণ সান্ত্বনার। ও যে এসেছে সেটা যেন টেরই পায় নি লোকটা। তবু পাগল সর্দারের খুশির আপ্যায়নে ভিতরের একটা দুর্ভর বোঝা যেন হালকা হয়ে গেল অনেকটা। মোড়াটা তার কাছে টেনে বসে অন্তরঙ্গ ভ্রূকুটি করে বলল, বাড়ি বসে থাকলে দেখবে কি করে, কাজে যাও নি কেন আজ?

শরীলটা আরাম দেল না, জ্বর আসল, ভাবলাম—

তোমার তো রোজই জ্বর আসছে আজকাল। জ্বর এলে কেউ খালি গায়ে বসে থাকে? কপালে পিঠে হাত দিয়ে তার গা পরীক্ষা করল সান্ত্বনা।—কোথায় জ্বর, গা তো ঠাণ্ডা পাথর। তুমি বড় শুধু শুধু কামাই কর আজকাল।

ওর হাতের এই স্পর্শ আর অনুশাসন সমস্ত বুক দিয়ে অনুভব করে নিল সর্দার। তার পর হেসে তাকাল হোপুনের দিকে, বলল, উকেও জ্বর লেগেছে, আমো সঙতে দু'দিন কামাই দেল—জ্বরপানা মূর্তিটা দেখে লে দিদিয়া।

সত্যিই এবার না তাকিয়ে পারল না সান্ত্বনা, আর হেসেও ফেলল। ওর ভিতরকার ঠাণ্ডার আঁচ দশ হাত দূর থেকেও উপলব্ধি করা যায়। মুখ তুলে হোপুন দু'জনের দিকেই তাকালো। তারপর উঠে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। প্রায় আগের মতোই, কোন তারতম্য নেই।...একদিন শুধু অন্যরকম দেখেছিল। চাঁদমণির সঙ্গে সেই পাহাড়ের নির্জনে...

পাগল সর্দার কি বলে চলেছে ঠিক যেন কানে যাচ্ছে না, তার মুখের দিকেই চেয়ে আছে সান্ত্বনা। ক'টা মাসে সর্দারের বয়স যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। কালো মুখে নিষ্প্রভ জরা নেমেছে একটা। পাগল সর্দার বুড়িয়ে গেছে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদমণির খবর কিছু পেলে সর্দার?

এক মুহূর্ত। সর্বাঙ্গের স্থবিরতা মুহূর্তে বিলীন হয়ে গেল বুঝি। ক্ষীণদ্যুতি চোখের কোটরে লক্ষ্যভ্রষ্ট ব্যাধের ক্রূর পরিতাপ চিকচিকিয়ে উঠল। সময় লাগল সামলে নিতে। অবসাদাচ্ছন্ন মৃদু জবাব দিল তার পর, উ আক্ষুসীর লাম তু আর ইখেনে লিস না দিদিয়া—

নাম আর নেয় নি সান্ত্বনা। যা বোঝবার ওটুকুতেই বুঝে নিয়েছে। বাইরের দিকে চোখ পড়তে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিকেলের আলো কমে আসছে। চাঁদমণি যদি আসে...এসে যদি ফিরে যায়।

আর বসতে পারল না এক মুহূর্তও। ভিতর থেকে কিছু যেন ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

কিন্তু দিন যায়, চাঁদমণি এলো না।

হোপুন আর পাগল সর্দারের ক্ষতি কিছুতে আর বড় করে দেখতে পারছে না সান্ত্বনা। রাগ হয় ওর বাবার ওপর, কেন এতদিন বিয়ে দেয় নি। রাগ হয় হোপুনের ওপর, কেন জোর করেই বিয়ে করে নি এতদিন। নিদারুণ ভয়ে নিজের বাবার কাছে গিয়েও দাঁড়াত পারে নি মেয়েটা। শুধু ওকে বিশ্বাস করেছে, ওর কাছে এসেছে। আশ্চর্য। কিন্তু আবার এলে বলে দেবে, তোর বাবাকে দেখে কাজ নেই চাঁদমণি, তুই পালা শিগগির, যেখানে হোক পালা। কিন্তু পালাবেই বা কোথায়, এত বড় পৃথিবীতে কোথাও আর আশ্রয় নেই...। বীভৎস শকুনির ছায়া নেমেছে ওর জীবনে।

ধড়ফড় করে ওঠে সান্ত্বনার বুকের ভিতরটা। কাঁপুনি ধরে সর্বাঙ্গে। দিনে অস্বস্তি। রাতে ঘুম নেই। সেই পা-ভেজানো কান্নার স্পর্শ ভুলতে পারছে না কিছুতে, চোখের কোণে এসে জমছে। মন বলছে চাঁদমণি আর আসবে না। যে জন্যে এসেছিল বলে গেছে। তবু সন্ধ্যার ছায়া নামার সঙ্গে সঙ্গে উতলা হয়ে ওঠে। অন্ধকার গাঢ়তর হতে নিজের অজ্ঞাতে আনাচে কানাচে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এক একবার। কোথায় বুঝি কালো মেয়ের কালো ছায়া পড়ে একটা। উৎকর্ণ, কখন বুঝি ভীত ত্রস্ত ফিস ফিস ডাক কানে আসে চাঁদমণির, দিদিয়া। ই দিদিয়া।

॥ ১০ ॥

কনট্রাক্টার ঘোষ-চাকলাদার যেমনটি আশা করেছিল, তেমনি হ'ল না।

ক্রমশ ভিতরে ভিতরে একটু উতলা হতে থাকল তারা। রণবীর ঘোষ না হোক দ্বিজেন চাকলাদার বটেই। সপ্তাহে দু'তিনবার পালা করে হেড অফিসে আনাগোনা করছে। আশ্বাস পাচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু সেটা খুব জোরাল লাগছে না এখন। চড়া মাশুলে এমন নিষ্প্রভ আশ্বাস সর্বত্র মেলে। হেড অফিস থেকে লেখালেখি চলছে। এখান থেকেও জবাব যাচ্ছে। এই মামুলী অফিসি চালের রীতি জানে।

নিরুপায় বিক্ষোভ আর অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা। এ ছাড়া পথও নেই আর। ইচ্ছে করলেই একটা শোরগোল তুলতে পারে তারা, হেস্তনেস্ত করতে পারে। কিন্তু তাতে করে যে জালে জড়িয়েছে, সেটা আরো জটিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। যাতে যেতে অভ্যস্ত নয় বলেই প্রথম গর্জে উঠেছিল। কিন্তু তলিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল একটু। অনবধানে ওই ঘা সুদূরঘাতী হতে পারে। কারণ সন্দেহের দায়ে কনট্রাক্টারি বাতিল করাটাই শেষ অস্ত্র নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে। অপটু চালে তাকে ঘাঁটাতে গেলে যে ব্যবস্থায় এগোতে পারে সে, তার রাস্তা সোজাসুজি গারদের দিকে।

অবশ্য এ ধরনের ভাবনা শুধু দ্বিজেন চাকলাদারেরই। রণবীর ঘোষ অত ভাবে না। ভেজালের দায় তারও জানা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে টাকার যাদুও জানা আছে। তা ছাড়া গো-ডাউনে এখনো আর ভেজাল নিয়ে বসে সেই সে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী চৌকস হলে গো-ডাউনে পাহারা বসাতো সর্বাগ্রে। তবু চুপ করে আছে সেও। কারণ, ব্লকের সেই ফাটলটা তো এখনো হাঁ করেই আছে তেমনি। চালে ভুল হলে ওটা যা গ্রাস করেছে, তার থেকে অনেক বেশি উগরে দিতে পারে।

হোপুন আর পাগল সর্দারের ক্ষতি কিছুতে আর বড় করে দেখতে পারছে না সান্ত্বনা। রাগ হয় ওর বাবার ওপর, কেন এতদিন বিয়ে দেয় নি। রাগ হয় হোপুনের ওপর, কেন জোর করেই বিয়ে করে নি এতদিন। নিদারুণ ভয়ে নিজের বাবার কাছে গিয়েও দাঁড়াত পারে নি মেয়েটা। শুধু ওকে বিশ্বাস করেছে, ওর কাছে এসেছে। আশ্চর্য। কিন্তু আবার এলে বলে দেবে, তোর বাবাকে দেখে কাজ নেই চাঁদমণি, তুই পালা শিগগির, যেখানে হোক পালা। কিন্তু পালাবেই বা কোথায়, এত বড় পৃথিবীতে কোথাও আর আশ্রয় নেই...। বীভৎস শকুনির ছায়া নেমেছে ওর জীবনে।

ধড়ফড় করে ওঠে সান্ত্বনার বুকের ভিতরটা। কাঁপুনি ধরে সর্বাঙ্গে। দিনে অস্বস্তি। রাতে ঘুম নেই। সেই পা-ভেজানো কান্নার স্পর্শ ভুলতে পারছে না কিছুতে, চোখের কোণে এসে জমছে। মন বলছে চাঁদমণি আর আসবে না। যে জন্যে এসেছিল বলে গেছে। তবু সন্ধ্যার ছায়া নামার সঙ্গে সঙ্গে উতলা হয়ে ওঠে। অন্ধকার গাঢ়তর হতে নিজের অজ্ঞাতে আনাচে কানাচে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এক একবার। কোথায় বুঝি কালো মেয়ের কালো ছায়া পড়ে একটা। উৎকর্ণ, কখন বুঝি ভীত ত্রস্ত ফিস ফিস ডাক কানে আসে চাঁদমণির, দিদিয়া। ই দিদিয়া।

॥ ১০ ॥

কনট্রাক্টার ঘোষ-চাকলাদার যেমনটি আশা করেছিল, তেমনি হ'ল না।

ক্রমশ ভিতরে ভিতরে একটু উতলা হতে থাকল তারা। রণবীর ঘোষ না হোক দ্বিজেন চাকলাদার বটেই। সপ্তাহে দু'তিনবার পালা করে হেড অফিসে আনাগোনা করছে। আশ্বাস পাচ্ছে না এমন নয়। কিন্তু সেটা খুব জোরাল লাগছে না এখন। চড়া মাশুলে এমন নিষ্প্রভ আশ্বাস সর্বত্র মেলে। হেড অফিস থেকে লেখালেখি চলছে। এখান থেকেও জবাব যাচ্ছে। এই মামুলী অফিসি চালের রীতি জানে।

নিরুপায় বিক্ষোভ আর অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা। এ ছাড়া পথও নেই আর। ইচ্ছে করলেই একটা শোরগোল তুলতে পারে তারা, হেস্তনেস্ত করতে পারে। কিন্তু তাতে করে যে জালে জড়িয়েছে, সেটা আরো জটিল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। যাতে যেতে অভ্যস্ত নয় বলেই প্রথম গর্জে উঠেছিল। কিন্তু তলিয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল একটু। অনবধানে ওই ঘা সুদূরঘাতী হতে পারে। কারণ সন্দেহের দায়ে কনট্রাক্টারি বাতিল করাটাই শেষ অস্ত্র নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে। অপটু চালে তাকে ঘাঁটাতে গেলে যে ব্যবস্থায় এগোতে পারে সে, তার রাস্তা সোজাসুজি গারদের দিকে।

অবশ্য এ ধরনের ভাবনা শুধু দ্বিজেন চাকলাদারেরই। রণবীর ঘোষ অত ভাবে না। ভেজালের দায় তারও জানা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে টাকার যাদুও জানা আছে। তা ছাড়া গো-ডাউনে এখনো আর ভেজাল নিয়ে বসে সেই সে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী চৌকস হলে গো-ডাউনে পাহারা বসাতো সর্বাগ্রে। তবু চুপ করে আছে সেও। কারণ, ব্লকের সেই ফাটলটা তো এখনো হাঁ করেই আছে তেমনি। চালে ভুল হলে ওটা যা গ্রাস করেছে, তার থেকে অনেক বেশি উগরে দিতে পারে।

গো-ডাউনে বালুর পাহাড়, পাথর-কুঁচির পাহাড় আর সিমেন্ট-বস্তার পাহাড়গুলো যেন নিঃশব্দ অনাদরের বোঝা বইছে একটা। বিরাট অপচয়ের সম্ভাবনায় স্তব্ধ। বোবা নিঃশ্বাস ছাড়ছে যেন। সর্বত্র পরিত্যক্ত শূন্য অনুভূতি একটা। কর্মতৎপরতার সাড়াশব্দ নেই কোথাও। রণবীর ঘোষ সেখানে এসে দাঁড়ায় এক-এক সময়। দুর্জয় ক্রোধে দেহের প্রতি রন্ধ্র ভরাট হতে থাকে।

চিঠি পড়ছে। কলকাতার আড়ত থেকে চিঠি। নতুন বারতা কিছু নেই। হেড অফিসের প্রীতিবদ্ধ শুভানুধ্যায়ীদের নির্দেশ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার নরম না হলে তদবির তদারক করে বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না। অতএব, ইত্যাদি।

অস্ফুট কটূক্তি করে বসে বসে পাইপ টানতে লাগল। তেলতেলে মুখে লালচে আভা। দ্বিজেন চাকলাদারও চিঠি পড়ে ভুরু কোঁচকালো। চিঠিখানা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল তার সামনে।

পাইপ মুখে রণবীর ঘোষ অনেকটা যেন নিজের মনেই বলল, চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নরম করবার পরামর্শ দিয়েছে।

বিরক্ত মুখে দ্বিজেন চাকলাদার জবাব দিল, তা তো দিয়েছে, কিন্তু লোকটা যে নিরেট পাথর একখানা, তাকে নরম করবেন কি করে?

ঠিক কানে গেল না বোধ হয়। অথবা শুনেও শুনল না। ঘোষ ভাবছে কিছু। আব পাইপ টানছে। অনেকক্ষণ বাদে বলল, কিন্তু সেরকম চেষ্টাও তো করি নি।

লোকটার এ ধরনের ভাব ব্যতিক্রম চেনে দ্বিজেন চাকলাদার। মগজে নতুন কিছু মতলব এসেছে বা আসছে। ও মগজের প্রতি আস্থাও প্রচুর। অবশ্য যদি সেটা নারী-বিবর্জিত পথে চলে। মুশকিল আসানের ঘ্রাণ পেল যেন।

নিজের অজ্ঞাতে চিঠিটা দুই হাতের চেটোয় তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে রণবীর ঘোষ। তালগোল পাকিয়ে চলেছে আরো। সামনে দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি আটকে আছে স্থাণুর মতো। চোখ পড়ল। নিশানা করল। ছুঁড়ে মারল ঠক করে। ঢ্যাপ করে শব্দ হ'ল একটা। টিকটিকিটা মাটিতে পড়ল। গায়ে লাগে নি, আচম্কা আক্রান্ত হয়ে থাবা ফসকেছে।

সেই এক কথাই বলল আবার রণবীর ঘোষ, সে রকম চেষ্টাও তো করি নি আমরা তাকে নরম করার, করেছি?

জবাবের প্রত্যাশায় নয়। নিজের মনেই পর্যালোচনা করছে কিছু। ভুল হয়েছে বৈকি। সুপারিশ করতে গিয়েও উপেক্ষা দেখিয়ে এসেছিল। নত হয় নি বরং একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে এসেছে। গোড়ায় গোড়ায় হ'ত না এমন ভুল। ভিতরের দম্ভ বিনয়ের আঁচে তরল করে নিতে পারত যখন তখন। মর্যাদার শিখরে বসে ড্যামের ওই অল্পবয়সী ওপরঅলাটিকে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মান না দিয়ে ভুল করেছে। নইলে ফন্দিফিকির জানে বৈকি। পাথর নরম করারও ফন্দিফিকির জানে।

এবারে মনভিজানো আবেদন নয় আর। নিরভিমান সমর্পণ। সেও লক্ষ্যস্থলে নয় সরাসরি। মাটি চুঁইয়ে শিকড়ে পৌঁছানোর মতো এই সমর্পণের ধারাও চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দরবারে পেশ করল নরেন চৌধুরীর মারফৎ। বলল, ফাঁসির আসামীও

নিজের হয়ে দুটো কথা বলতে চায়, আমরা কি তাও পাব না?

বিব্রত বোধ করল নরেন চৌধুরী। মাসের পর মাস এরকম নিরুপদ্রবে কেটে যাবে ভাবে নি। উতলা ভাবটা একেবারে যায় নি তবু। স্বচ্ছ জলের নিচে খানিকটা পঙ্কিলতা জমে থাকার মতো এই অনাবিল কর্মস্রোতের তলায় তলায় একটা গোলযোগের আশঙ্কা থিতিয়ে আছে সেই থেকে। কখন বুঝি ঘুলিয়ে ওঠে। কিন্তু তার বদলে ক'মাসের এই শান্ত প্রতীক্ষা আর তার পর এই নতি স্বীকার।

এতটা আশা করে নি নরেন চৌধুরী। আশা করে নি বলেই আবেদনও যথাস্থানে পৌঁছুল।

সময় অনেক ভোলায়। কোন রকম বাধা না পেয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সেই রূঢ়তা গেছে। তা ছাড়া মেজাজও অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আজকাল। জবাব দিল, কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বলো?

নরেন বলল, কি বলতে চায় শুনতে বাধা কি। গোড়ার দিকে লোকটা উপকারই করেছিল। এ ব্যাপারে শাস্তিও যথেষ্ট হয়েছে—এর পর কিছু করা সম্ভব হলে করবে, নয়তো সেটাই বুঝিয়ে বলে দেবে।...কার ভিতরে কি আছে বাইরে থেকে বোঝা শক্ত, দেখই না কি বলে।

বাদল গাঙ্গুলি আপত্তি করে নি আর। দিন স্থির করে নরেন রণবীর ঘোষকে জানিয়ে দিল।

শুনে মনে মনে আর একদফা কটূক্তি বর্ষণ করল রণবীর ঘোষ নিজের উদ্দেশ্যে। স্থূল দম্ভের বশে মিথ্যেই এই ক'টা মাস এভাবে নষ্ট। যেখানে মাটি তেতে আছে সেখানে জল না ঢেলে ছুটল কি না ঠাণ্ডা হেড অফিসকে আরো ঠাণ্ডা করতে।

দিনে দিনে খুশির মাত্রা বাড়ছে নরেন চৌধুরীর। নিজেরই ভিতরে কোথায় যেন অনেকদিন ধরে একটা খুশির আলো জ্বেলে বসে আছে সে। মনের আনাচে কানাচে সর্বত্র খুশির ঝলক। বাদে শুধু সেই খুশি প্রদীপের নিচটুকু। সেখানে কি যেন এক আলো-আঁধারি সংশয়।

কিন্তু মানুষটাই ভিন্ন ধাতুতে গড়া। ভাবনাশূন্য উচ্ছলতায় ভরপুর। যেদিকে তাকালে সংশয় সেদিকে তাকিও না। ঠিক সময়ে ঠিক লগ্নটির প্রতীক্ষা করো শুধু।

গোড়ায় গোড়ায় কি মড়াই ভালো লেগেছিল এত? কাজের হাওয়ায় প্রজাপতির মতো এমন পাখা মেলেছে মন? কি জানি। কিন্তু এখন ভালো লাগার মাত্রাটা প্রায় দুর্বহ হয়ে ওঠে এক-একদিন। মড়াইয়ের ওধারে ধূসর পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যখন সূর্য ওঠে তখন থেকে শুরু হয় ভালো লাগা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মড়াইয়ের জল বাঁধার কর্মস্রোতে মিশে থাকে সেই ভর-ভরতি ভালো লাগার উদ্দীপনা। বিকেলে যখন গলানো সূর্যের রঙ আটকে থাকে পাহাড়ী মেঘের ফাটলে ফাটলে, ওর ভালো লাগার সঙ্গে তখনকার সেই রঙটাও ভারি মেলে যেন। তার পরে ভালো লাগে মড়াইয়ের আকাশ আর মড়াইয়ের বাতাস আর মড়াইয়ের সমাহিত পাহাড় আর মড়াইয়ের তমস্বিনী রাত্রি।

যে লগ্নের প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা, তার আভাস এখন মনোগোচর খানিকটা। অন্তত সেই রকমই ধারণা। চোখের সামনে এক মেয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে একটুখানি। করছেও। প্রথম উপলব্ধি করেছে পাগল সর্দারের বাদনা উৎসবের নেমন্তন্ন রাখতে গিয়ে। তার পর ফেরার পথে পাহাড়োর ওপর সেই পাথরটায় বসে। তার পর অনেকদিন। চেতনার আলোয় হঠাৎ থমকে যাওয়ার মতো সেই পরিবর্তন। তার পর থেকে একটু যেন ব্যবধান বাড়ছে, একটু যেন আড়ালে রাখছে, একটু যেন আগলে রাখছে। নরেন বোঝে। বুঝেও না বোঝার ভান করে। নিজেকে দেখছে দেখুক। ওই দেখাটাই লগ্নের সূচনা।

কি ব্যাপার! দিক্‌বিদিক ভুলে অমন হন্ হন করে চলেছেন কোথায়?

সামনের বড় পাথরটার আড়ালে ঝরনা একটা শুকনো গাছের ডাল দিয়ে পাহাড়ের দেয়াল থেকে পাহাড়ী ফুল চয়নের চেষ্টা করছিল। পাথরটার পাশ কাটিয়ে নরেন আর তাকায় নি বলেই দেখতে পায় নি।

ঝরনা হেসে উঠল খিলখিল করে। হাতের শুকনো ডাল ফেলে এগিয়ে এলো। সোনালি ফ্রেমের পুরু লেন্সের ওধারে দুই সাদাটে চোখে কৌতুক উপচে তুলে বলল, দিলাম তো বাধা? চলেছেন কোথায় এভাবে?

ঝরনার হাসি আর সপ্রগল্‌ভ কৌতুক নরেন চৌধুরীর ভালো লাগে নি প্রথম থেকেই। অনেক দিন দেখা হয়েছে, অনেক দিন হালকা আলাপ করেছে। ঝরনা কথা বলেছে অনর্গল আর হেসেছে অজস্র। কিন্তু নরেনের মনে হয়েছে মেয়েটা কোথায় যেন ঠিক সুস্থ নয় খুব। সেই অসুস্থতা ক্ষয় করার চেষ্টা তার এই হাসিখুশিতে আর চলনে বলনে। সেটা স্বতোৎসারিত নয় বলেই খানিক বাদে উজাড় করা শূন্যপাত্রের মতই রিক্ত দেখায় ওকে।

জবাব এড়িয়ে নরেন ঠাট্টা করল, পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ফুল চুরি করছেন, দেখব কি করে?

হায় রে কপাল! ঝরনা বড়সড় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা, যান কোথায় যাচ্ছেন, এর পর এত বড় রাস্তাটাই হয়তো গা-ঢাকা দিয়েছে মনে হবে।

যা বললে খুশি হবে জানে, এর পর তাই বলল নরেন।—আপনি আছেন, এতটা নাও মনে হতে পারে।

ঝরঝরিয়ে হেসে উঠল ঝরনা। নরেন জানতো হাসবে। এমনি হাসতে হাসতে হঠাৎ এক সময় হাসি যেন ফুরিয়ে যাবে মেয়েটার। পুরু লেন্সের ভিতর দিয়ে দেউলে হাসির আভায় তবু চিকচিক করবে চোখের কোণ দুটো। সচকিত হয়ে সোজা প্রস্থান করবে তার পর।

হাসির মধ্যেই ঝরনা ভেবে নিল বোধ হয় কিছু। জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই যাচ্ছেন কোথায়?

অবনীবাবুর কাছে। নরেন গম্ভীর মুখেই জবাব দিল।

ঝরনা বলল, তাহলে অ্যাবাউট-টার্ন করুন, মেন কোয়ার্টারস্-এর রাস্তা আবার নাক বরাবর হেঁটে যান সোজা—আমি গেস্ট হাউসের দিকে দেখে এসেছি তাঁকে।

নরেন বেকায়দায় পড়ে গেল। উৎফুল্ল মুখে ঝরনা বলল, সাধে বলে কেষ্টঠাকুর ছাড়া সবাই মেয়ে, যাচ্ছেন তো মড়াইকন্যা দর্শনে—বেচারী অবনীবাবুকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন? যান, আর আটকাবো না আপনাকে।

জবাবে নরেনও গোটাকতক টিপ্পনী কাটতে পারত। কিন্তু পাল্টা রসিকতার আঁচ পেলেই চকচকিয়ে উঠবে আবার। তাছাড়া অবনীবাবুর বাড়ি না থাকার প্রসঙ্গেও গোপন দুর্বলতায় একটু ঘা পড়েছে। জেনারেল কোয়ার্টারের দিকে ওর পা বাড়ানোর সময়ের সঙ্গে অবনীবাবুর বাড়ি থাকার সময়টা প্রায়ই মিলছে না আজকাল। মিলছে কি মিলছে না আগে একবারও মনে হত না। এখন হয়।

আমন্ত্রণ জানালো, আপনারই বা এমন কি কাজ, চলুন না একসঙ্গে যাই গল্প করতে করতে।

খুব আগ্রহ ঝরনার। কিচ্ছু কাজ নেই আমার, কিন্তু সত্যি বলছেন? আসব সঙ্গে? চলুন তাহলে, সান্ত্বনাকে একদিন বলেও ছিলাম যাব। সানন্দে কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল আবার। বলল, থাক গে, মিছিমিছি, আপনি যান—

যেভাবে বলল, সাদা অর্থ যাবার ইচ্ছে ষোল আনা, কিন্তু উপর-পড়া হয়ে গিয়ে কারো আনন্দবিনোদনে আবার ব্যাঘাত ঘটাই কেন। নরেন বিব্রত এবং বিরক্ত হল মনে মনে। আচ্ছা ছেলেমানুষ তো আপনি। যাবেন তো চলুন—

উচ্ছল হেসে ঝরনা বলে উঠল, আমায় কেউ ছেলেমানুষ বললেই মা তাকে সন্দেশ না খাইয়ে ছাড়ে না। উৎফুল্ল নিঃশ্বাস ফেলল একটা, বলছেন যখন যাই চলুন।

জেনারেল কোয়ার্টার্সএর রাস্তা ধরে পাশাপাশি চলল তারা। ছোট মড়াইয়ে নিতান্ত ঘরবন্দী হয়ে না থাকলে সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে। অন্তত এই মা-মেয়েকে চিনতে বাকি নেই কারো। ভিতরে ভিতরে অবিরাম একটা টাগ-অব-ওয়ার চলছে যেন মা-মেয়েতে। মা চান টেনে রাখতে, মেয়ে চায় ছিটকে বেরিয়ে আসতে। মায়ের টেনে রাখাটাও যেমন বিসদৃশ, বিপরীত ঝোঁকে মেয়ের বেরিয়ে আসার সপ্রগল্‌ভ আতিশয্যও তেমনি অশোভন মনে হয় অনেকের চোখেই। চলতে চলতে নরেন জিজ্ঞাসা করল, আপনি তাহলে এ বছরটা ড্রপ করছেন?

ড্রপ করছি মানে?

এ বছর এম. এ. পরীক্ষা দিচ্ছেন না।

ও, তাই বলুন। কি করে দেব, শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন দেখছেন না? শরীর আগে না পরীক্ষা আগে?—হাসতে লাগল, মায়ের কাছে শোনেন নি এসব কথা?

বেগতিক দেখে নরেন চুপ। শুধু পরিহাস নয়, পুঞ্জীভূত খানিকটা ক্ষোভের মুক্তি। সব জেনেও বিস্মিত হ'ল মনে মনে। ব্যাধি মায়ের না মেয়ের!

অবনীবাবুর বাড়িতে পা দিয়েই আরো যেন বোবা হয়ে গেল সে। বাইরের ঘরে বসে অবনীবাবু পড়ছেন কি। নীরব বিস্ময়ে নরেন তাকালো ঝরনার দিকে। চশমার ওধার থেকে চাপা হাসি উপচে পড়ছে।

অবনীবাবু তাড়াতাড়ি উঠে এলেন। ঝরনা বলল, আমাকে আপনি চেনেন না বোধ হয়, তবু আপনার বাড়ি চড়াও করেছি, আপনার মেয়ে চেনে অবশ্য—

আমিও চিনি, অবনীবাবু ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, ওরে সান্ত্বনা, দেখে যা কে এসেছেন—

একটু আগে ছোকরা-চাকর সুন্দরীকে নিয়ে ফিরেছে। সান্ত্বনা তার তত্ত্বাবধান করছিল। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে যেমন ছিল তেমনি বেরিয়ে এলো।

অতি অন্তরঙ্গ জনের মতো ঝরনা একেবারে জড়িয়ে ধরল তাকে।—কেমন? ভাবো নি তো? বলেছিলাম না আসব—এসে গেলাম। এখন খুশি হয়েছ কি হও নি তুমিই জানো।

বাবার সামনে নরেনবাবুর সামনে এই আচমকা উচ্ছ্বাসে সান্ত্বনা হকচকিয়ে গেল প্রায়। যে ভাবে জড়িয়ে ধরেছে, ছাড়ানো শক্ত। ভিতরে এনে দাওয়ায় মাদুর পেতে বসালো তাকে। নিজেও বসল। ভাবে নি তো বটেই। খুশি হয়েছে কি হয় নি তাও জানে না!

ঝরনা দু'চার মুহূর্ত নীরবে নিরীক্ষণ করল তাকে। কি ক'চ্ছিলে এসময় বাড়ি বসে?

তার চোখে চোখ রেখেই হালকা হেসে সান্ত্বনা জবাব দিল, গোয়ালঘরে ছিলাম।

গোয়ালঘর! চশমার ওধারে দুই চোখ বড় বড় দেখালো ঝরনার। যেখানে গোরু থাকে? তোমার আছে? সাগ্রহে একেবারে উঠে দাঁড়াল সে, চলো তো দেখি!

এবার বিস্ময়ের পালা সান্ত্বনার। হাত ধরেই টেনে আবার বসালো তাকে। আচ্ছা দেখবেন'খন পরে, বসুন। আসার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে আপনাকে নিয়ে ঢোকালে বাবার কাছে বকুনি খেয়ে মরতে হবে।

আগ্রহটুকু এভাবে অগ্রাহ্য হতে ঝরনা বড় নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বাবাকে বুঝি ভয় করো খুব?

সান্ত্বনা হেসে মাথা নাড়ল, খু-উ-ব। পাশের ঘরের দিকে তাকালো একবার। কানে গেলে দু'জনেই হেসে উঠবে।

চশমার ওধারে ঝরনার চোখে হাসির ছটা কমে আসছে। দেখছে চেয়ে চেয়ে।...সেই কবে দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, আর আজ। সেই যে সাঁওতালদের কি উৎসব দেখতে গিয়েছিলে তোমরা—বনের ধারে নদীর পারে দেখা হ'ল মনে নেই?

সান্ত্বনা জবাব দিল না। মনে আছে। আর তার পরেও ঝরনা ওকে না দেখুক, ও দেখেছে। রণবীর ঘোষের জিপে চড়ে হাওয়া খেতে দেখেছে আরো অনেকবার, ভুতুবাবুর দোকানের কোণে তেমনি ঘেঁষাঘেঁষি বসে গল্পগুজব করতে দেখেছে কলকাতার সেই প্রাইভেট কলেজের মাস্টারের সঙ্গে—ওর মা যাকে বোকা ভাবে, অথচ বোকা নয়। ঝরনার মতে আসলে ভালো বলেই বোকা দেখায় যাকে।

থেকে থেকে ঝরনা তেমনি নিরীক্ষণ করছে তাকে। কিছু একটা বিশ্লেষণ করার মতোই।—সেই তখন যা দেখেছিলাম তার থেকে আরো ঢের ঢের সুন্দর লাগছে এখন তোমাকে! অস্ফুট হাস্যে ঝরনা একেবারে গায়ের কাছে ঘেঁষে বসল তার।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারল না সান্ত্বনা। দিনকতক আগে চাঁদমণিও এই কথাই বলেছিল। কিন্তু সেদিন অন্তত তার চোখে নারীসুলভ প্রশংসাই ছিল। কিন্তু এ যেন ঠিক তা নয়! খানিকটা যেন পুরুষ-চোখে যাচাইয়ের দৃষ্টি। বিশ্লেষণ করে দেখা। সরে বসতে পারলে একটু সরে বসত সান্ত্বনা।

ঝরনা কথা শুরু করল আবার। নানা কথা। অবান্তর কথা। কতদিন ভেবেছে আসবে, কি রকম বিচ্ছিরি লাগে এক এক সময়, কি করে সময় কাটায় সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির—মায়ের কত ঝক্কি তার জন্য, ইত্যাদি।

এক বর্ণও শুনছে না সান্ত্বনা। এই ফাঁকে দেখে নিচ্ছে সেও। সঙ্গোপনে যা দেখতে চাইছে। চাঁদমণির মুখে যা দেখেছিল। যে পরুষ-নির্যাতন দেখেছিল। এরকম কৌতূহল নিজের কাছেই বিড়ম্বনা। লজ্জাকর। তবু কৌতূহল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চাঁদমণি হতচ্ছাড়ীটা প্রসাধনপটু নয় এমন।

হাঁ করে দেখছ কি?

নড়েচড়ে বসে সান্ত্বনা তেমনি জবাব দিল, দেখছি কোথায়, শুনছি তো—আপনি এ সময় এলেন কোত্থেকে?

জবাব না দিয়ে ঝরনা হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁক দিল, নরেনবাবু, ও নরেনবাবু!

নরেন এসে দাঁড়াতে বলল, ওখানে ক'চ্ছেন কি, এখানে বসুন। সরে বসে মাদুরে জায়গা করে দিল।—সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করছে এসময় কোত্থেকে এলাম, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটল কি করে। বলব নাকি?

সান্ত্বনা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল তার দিকে। মাদুরে যোগাসন হয়ে নরেন হালকা জবাব দিতে যাচ্ছিল কি। কিন্তু তার আগেই আবার এক ঝলক হেসে ঝরনা বলল, জানো, নিয়ে আসতে কি চায় আমাকে, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে পড়ে তবে এসেছি।

আবার সেই চোখে মুখে সাদাটে উচ্ছলতা। নরেন বলল, এ রকম সত্যবাদিনীর দেখা পেলে যুধিষ্ঠির মহারাজ হয়তো একেবারে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তুলতেন।

মুখে বিরস ছায়া ফেলে ঝরনা তাকালো তার দিকে। বলল, কলকাতায় দাদার বাড়ির চাকরটার নাম যে যুধিষ্ঠির।

সান্ত্বনা সুদ্ধ এবারে হাসল অনেকক্ষণ ধরে। সেই প্রথম দিন তার মায়ের সঙ্গে দেখে ভালো লেগেছিল। আর এই এখন লাগল। মাঝখানের যত কিছু সব মুছে গেলে আরো ভালো লাগতো।

আতিথেয়তার কথাও স্মরণ হ'ল এতক্ষণে। ওঠার উপক্রম করতে ঝরনা বাধা দিল, ও কি, যাচ্ছ কোথায়?

আপনাকে চা করে দিই একটু।

বোসো! ধমকে উঠল প্রায়। তার পরেই মনে পড়ল বোধ হয় কিছু। বলল, চা খেতে যাব কেন, তোমার রান্নার যা প্রশংসা শুনি, ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হব একদিন, দেখো।

ঈষৎ বিস্ময়ে সান্ত্বনা নরেনের দিকে তাকালো একবার। কিন্তু নরেনও যথার্থই কোনদিন ওকে বলেনি কিছু। সে-ই জিজ্ঞাসা করল, প্রশংসাটা কার কাছে শুনলেন?

লোকের অভাব! এই মড়াইসুদ্ধ লোক তো ওর ভক্ত, মেয়েটা যাদু জানে—! যাদু জানে কিনা ঝরনা সেটাই যেন নিরীক্ষণ করে দেখল একটু। পরে বলল, এর মধ্যে সেরা ভক্ত দুজন।

নরেন জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল। সান্ত্বনা আশঙ্কায় দুরু দুরু।

ঝরনা বলল, একজন ভুতুবাবু, আর একজন নিধুরাম।

নরেন হেসে উঠল। সান্ত্বনাও হালকা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ঝরনা বলে গেল, ভুতুবাবু মা-লক্ষ্মী বলতে অজ্ঞান, নতুন কোন মেয়ে চা খেতে গেলে আগে মা-লক্ষ্মীর পাঁচালি শুনতে হবে তবে চা পাবে। আর ওদিকে নিধু বলে, এমন রান্নার রান্না, খেয়ে তার গুরুগম্ভীর বাবু সুদ্ধ কাবু।

হাসিভরা দুই চোখ আলতো করে নরেনের মুখের ওপর বুলিয়ে নিল একপ্রস্থ। কিন্তু নরেন খেয়াল করে নি। নিজের অগোচরে সান্ত্বনার সঙ্গেই দৃষ্টি বিনিময় ঘটল তার। চকিতে অন্যদিকে মুখ ফেরালো সান্ত্বনা। বিরক্ত এবং আরক্ত।

ওদিক থেকে অবনীবাবু এসে দাঁড়ালেন সামনে। ঝরনা বলল, কেমন হাট বসিয়ে দিয়েছি আমরা দেখুন। তার পরেই সোজা উঠে দাঁড়াল একেবারে।—আপনার সঙ্গে আলাপই হ'ল না, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন চলুন—গল্প করতে করতে যাব।

বেশ তো, বেশ তো।

বেশ তো না, এখুনি যাব, রাত হয়ে গেল।

তাড়া খেয়ে অবনীবাবু জামা বদলাবার জন্য ঘরে গেলেন আবার। ঝরনার দু চোখ যেন খলখলিয়ে হেসে উঠল নরেনের মুখের ওপর। তার অর্থ শুধু প্রাঞ্জল নয়, অস্বস্তিকরও।

সান্ত্বনাও লক্ষ্য করল সেটুকু। না করলে অস্বাভাবিক লাগত না কিছু। করল বলেই বাবাকে এভাবে টেনে নিয়ে যাওয়ার পিছনে স্থূল রসিকতার আভাস পেল। এতক্ষণের ভালো লাগাটুকুর ওপর যেন কালির ছিটে পড়ল একপ্রস্থ। বিরক্তিতে মুখ লাল হয়ে উঠল সান্ত্বনার।

অবনীবাবুকে নিয়ে ঝরনা চলে গেল। আর যাবার আগে ওদের দুজনার মাঝে বেশ খানিকটা অস্বস্তি ছড়িয়ে দিয়ে গেল। সেটা কাটানোর তাগিদে নরেনের পকেট থেকে সিগারেট বেরুলো, দিয়াশলাই বেরুলো, হাতীর দাঁতের কানকাঠি বেরুলো, নাকমুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বেরুলো, আর সব শেষে কর্ণ-পটহ তোয়াজ-সুলভ গলা দিয়ে সেই পেটেন্ট শব্দ বার হ'ল গোটাকতক।

সান্ত্বনা চেয়েছিল দরজার দিকে। যে দরজা দিয়ে তার বাবা আর ঝরনা বেরিয়ে গেল। মুখ না ফিরিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলল, অদ্ভুত!

আমি? না, ওই যে গেল? নরেনের মুখে উৎকণ্ঠার কারুকার্য।

সান্ত্বনা হেসে ফেলে তাকাল তার দিকে।—দুজনেই, নইলে ও আপনার সঙ্গে এসে জুটল কি করে?

বরাত। দীর্ঘনিঃশ্বাস।

মেয়েটার মাথায় ছিট আছে।

তা আছে। নরেন সায় দিল, ও এক ধরনের রোগ—বিষম রোগ।

শোনামাত্র আবার অন্যদিকে চোখ ফেরাল সান্ত্বনা। লাল হয়ে উঠছে, নিজেই বুঝছে।

নরেন অবাক। ঠিক তামাশা করে বলে নি। যেটুকু বলেছে তাও সুস্পষ্ট নয় খুব। কিন্তু ঝরনার রোগের স্বরূপ সান্ত্বনাও যে যথার্থই উপলব্ধি করে বসে আছে, একবারও ভাবে নি।

মনে মনে কি জানি কেন আবার সেই অকারণ খুশির স্পর্শ লাগল। কিন্তু আর মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাঁটাঘুঁটির দিকে এগোলো না। ঝরনা-প্রসঙ্গ সরাসরি ধামাচাপা দিল।—যেতে দাও ওসব, সুখবর ছিল, মেয়েটার পাল্লায় পড়ে তোমার বাবাকে বলা হ'ল না।

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো সান্ত্বনা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ঘোষ-চাকলাদারের এবারে একটা ফয়সালা হতে পারে বোধ হয়, ব্যবস্থা করে এলাম।

কি ব্যবস্থা? ঠাণ্ডা প্রশ্ন।

রণবীর ঘোষের আবেদন এবং বাদল গাঙ্গুলির কাছে সুপারিশের বৃত্তান্ত জানাল।

অকস্মাৎ দপ করে জ্বলে উঠল যেন একমুঠো নিরুত্তাপ ছাই।—কেন, কেন আপনি সর্দারি করে এ ব্যবস্থা করতে গেলেন? কে আপনাকে করতে বলেছিল? ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বলল, আর গলে জল হয়ে অমনি ছুটলেন সুপারিশ করতে।

নরেন হতভম্ব। এমন আর দেখে নি।—কি হ'ল?

উত্তেজনায় অধর দংশন করে রইল সান্ত্বনা। নরেনের বিস্ময়ের শেষ নেই। কি ব্যাপার? পাছে কিছু গোলমাল হয়, সেই জন্যেই তো—

মেজাজ চড়লো আরো।—ওঃ, একটা লোক এত বড় কাজের মধ্যে গোলমাল করে তো একেবারে উল্টে দেবে সব—সেই ভয়েই গেলেন আপনারা। আর ওদিকে বুক ফুলিয়ে যা খুশি করে বেড়াবে সে। কত বড় পাজী ও লোকটা জানেন? পাগল সর্দারের ওই মেয়েটাকে পর্যন্ত একেবারে—

রাগে ক্ষোভে লজ্জায় শেষ করতে পারল না। অন্যদিকে ঘাড় গোঁজ করে বসে রইল।

বিহ্বল বিস্ময়ে নরেনের মুখে কথা নেই আর। মড়াইয়ের বুক থেকে এক ভরাপ্রাণ কালো মেয়ের অন্তর্ধান হঠাৎ একটা স্থূল রহস্যের পরদা ঠেলে একেবারে চোখের সামনে তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

শুধু তাই নয়। সান্ত্বনা জানল কি করে? সর্দার বলেছে? মন বলছে, না। ওদের বলার রীতি এরকম নয়। বললে সরাসরি রণবীর ঘোষকেই বলত। আর সে বলায় মড়াইয়ের পাঁজরে ত্রাসের কাঁপুনি জাগত।

রাগ কমে আসছে সান্ত্বনার। অস্বস্তি বাড়ছে। এ নীরবতা শুধু বিস্ময়াহত নয়।

জিজ্ঞাসা-মুখরও। কিন্তু মানুষটার বিবেচনার প্রশংসা না করে পারল না। আভাসেও কোন প্রশ্নের দ্বারা বিব্রত করল না ওকে। বিড়ম্বনাটুকু উপলব্ধি করেই যেন উঠে চলে গেল একসময়।

রাগ গেছে। উত্তেজনা কমেছে। পুরুষ-সন্নিধান-জনিত সঙ্কোচও নেই। চুপচাপ খানিক বসে থেকে বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সান্ত্বনা। কিন্তু খুব আরামের নয় যেন। তলায় তলায় একটা অন্যায় বোধ জাগছে। অকারণে এত কথা বলল, এত কথা শোনালো। ভদ্রলোক যা করছে যা করতে গেছে সবটাই ভালোর জন্যে। তা ছাড়া ভিতরের এ সব ব্যাপার জানতোও না। কিন্তু রাগের মাথায় কি বলতে কি না বলে বসল।

শুধু অনুতাপ নয়। একটুখানি আশঙ্কাও। ওর কথা শুনে সব আবার নাকচ করে দেবে না তো! জানাজানি হবে না তো কিছু? ড্যামের কাজে নতুন কিছু বিভ্রাট বাধবে না তো আবার? ছেলেমানুষির জন্য নিজের উপরেই মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হ'ল সান্ত্বনা। তবে গোলযোগের আশঙ্কাটা থাকল না বেশিক্ষণ। নরেনবাবু না হয়ে আর কেউ হলে ভাবত। বাদল গাঙ্গুলি হলেও নিশ্চিন্ত হতে পারত না।

স্বয়ং চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কোয়ার্টারে এক নাটকীয় প্রহসন ঘটে গেল সেদিন।

যেদিন রণবীর ঘোষ এলো নিজের হয়ে সওয়াল করতে। ভেজালের ফাটল জুড়তে।

নরেনকে সঙ্গে থাকতে বলেছিল বাদল গাঙ্গুলি। সময়মত আসে নি সে। স্মরণও করিয়ে দেয় নি কিছু। তাই প্রতিদিনের মত সকালের রাউণ্ডের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের প্রতীক্ষা করছিল। কি একটা কাজে তাঁরই আসার কথা।

নরেন চৌধুরী ভোলে নি। কিন্তু তার আগ্রহ স্তিমিত। ড্যামের স্বার্থে আপসের প্রয়াস। সে প্রয়োজন আছেই। তবু...। রণবীর ঘোষকে ভালই জানত। ভালই জানে। তবু...। একজনের ক্ষোভ আর বেদনা কখনো এমন করে স্পর্শ করে নি তাকে। তাই নিরুৎসাহ। আবার এর পর ও লোকটার সংস্রবে আসতেও বিতৃষ্ণা। যা করেছে ভালোর জন্য করেছে। ভালো ভেবে করেছে। এর পর যার দায়িত্ব সে বুঝুক।

কিন্তু মন বলছে তারও উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। বাদল গাঙ্গুলির রাগ জানে। কি থেকে কি হয় আবার ঠিক কি। তা ছাড়া নিজ-মুখে থাকতে বলেছিল ওকে। ঘড়ি দেখল। বেশ দেরি হয়ে গেছে। তবু বেরিয়ে পড়ল।

ওদিকে রণবীর ঘোষ এসেছে ঘড়ির কাঁটা ধরে। হাতে অবিকল বইয়ের আকারের বোতাম-আঁটা চকচকে কালো লেদারকেস একটা। চামড়া মোড়ানো শৌখীন বড় ডায়েরির মত। দ্বিজেন চাকলাদারকে অদূরে বসিয়ে রেখে সহাস্যে সাড়া দিল, গুড মর্নিং স্যার, ভিতরে আসব?

আপিস-সংক্রান্ত কাগজপত্র উল্টে দেখছিল বাদল গাঙ্গুলি। মুখ তুলে তাকালো। মনে পড়ল। আজই আসার কথা বটে। ঘড়ি দেখল। সম্ভবত নরেনের আসার কথা

ভেবেই।

আসুন।

নমস্কার, ভালো আছেন বেশ?

হ্যাঁ, বসুন।

রণবীর ঘোষ বসল। তেমনি হাসিখুশি, তেমনি সপ্রতিভ।—আপনি বেরুচ্ছিলেন নাকি?

হ্যাঁ, আজই আপনি আসবেন খেয়াল ছিল না, নরেনবাবুরও আসবার কথা ছিল, আসেন নি...

দুর্ভাগ্যজনিত একটা বিরস ছায়া নামল ঘোষের মুখে। পরে হাসল অল্প একটু।—বরাত। যাক, আপনার শরণার্থী বটেই, তবু আজ আমি কিন্তু কোন ব্যবসার তাগিদে আসি নি আপনার কাছে।

বাদল গাঙ্গুলি নীরব, জিজ্ঞাসু।

কিভাবে ব্যক্ত করবে মনের কথাটা রণবীর ঘোষ ঠিক করে উঠতে পারছে না যেন। স্বীকৃতির বাসনার সঙ্গে অনভ্যাসজনিত সঙ্কোচ মিশলে যেমন হয়। সলাজ হাসি। বলল, এসেছি একরকম প্রাণের তাগিদে। বড়র আকর্ষণ ভারী বিচিত্র ব্যাপার।

বলতে না পারলে কটু শোনাতো। বিরক্তির কারণ হ'ত। কিন্তু রণবীর ঘোষ নিপুণ কথক।

অন্য দিকে গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম ঘটল না খুব। শুধু বিস্ময়ের আভাস একটু।—আপনি কি বলবেন বলুন।

কত কি বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু কি যে বলি, ইট্ ইজ্ অলসো ওয়াণ্ডারফুল। মুখের ভাব নয় শুধু, গলার স্বর পর্যন্ত বদলে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে কাচের সার্শির ভিতর দিয়ে দূরে মড়াইয়ের দিকে চেয়ে রইল ক্ষণকাল। ফিরে এলো আবার। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বসল চেয়ারে। হাসল একটু।—আপনি বিশ্বাস করুন, মিঃ গাঙ্গুলি, কি যে হ'ল সেদিন থেকে নিজেই বুঝতে পারছি না। এত বড় এক লোকসান, তার থেকেও বড় জিনিস, এত বড় একটা দুর্নাম কাঁধে চাপলে অনেক কিছুই করবার কথা আমাদের—আর কিছু না হোক, বড়দরের একটা গোলমাল অন্তত পাকিয়ে তুলতে পারি স্বচ্ছন্দে।

হেসে চোখে চোখ রাখল, আরো মৃদু, আরো সাদাসিধে, নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল, কিন্তু মন বলছে, তার থেকে অনেক বড় পারা হবে সোজাসুজি আপনার কাছে এসে প্রাণ খুলে হার স্বীকার করা। এ লাভটুকুর কাছে ওই লোকসান কিছুই নয়।

দম্ভ নয়, প্রার্থীর দৈন্যও নয়, আহত মর্যাদার অভিব্যক্তি। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের ঋজু গাম্ভীর্য তরল হয়ে এলো। এরকম সমর্পণে বিব্রত বোধ করতে লাগল প্রায়।

ঘরে নরেন চৌধুরীর পদার্পণ। বাদল গাঙ্গুলি ঘড়ির দিকে তাকালো একবার। ঘোষ দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো। হেসে বলল, আপনি কিন্তু অনেক লেট।

ঠাণ্ডা চোখে নরেন একবার শুধু তাকালো। প্রতিনমস্কার না, কিছু না। একটা চেয়ার টেনে শরীর ছেড়ে দিয়ে বসল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে

চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরালো একটা। বন্ধুর দিকে না চেয়েই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করল, বেরোতে দেরি আছে নাকি তোমার?

না। তার অমন নিস্পৃহ হাবভাব দেখে বাদল গাঙ্গুলি অবাকই হ'ল একটু। আর তেমনি বিস্মিত রণবীর ঘোষ। প্রয়োজনে এর শরণাপন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু তা বলে এ লোকটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনে নি কখনো। বক্র কটাক্ষে দেখল দুই একবার। চেয়ারের কাঁধে মাথা রেখে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে, যেন ঘরে দ্বিতীয় মানুষ নেই কেউ।

আগের কথাপ্রসঙ্গে এবারে বাদল গাঙ্গুলি সদয়কণ্ঠে বলল, আপনার সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই মিঃ ঘোষ, সিমেণ্টের ব্যাপারে যা করেছি বাধ্য হয়েই করেছি—কিন্তু সত্যি এরকম করে যদি ভাবতে পারেন তাহলে তো আনন্দের কথা।

উৎফুল্ল মুখে ঘোষ জবাব দিল, ভাবতে পারতুম না কখনো, এখন শিখেছি। আপনি শিখিয়েছেন।—পরিবেশ যেন তারই আয়ত্তাধীন।—ওই ভেজালের অপকাণ্ডটি যে-ই করে থাক, দায়িত্ব যখন সব আমার দায়ীও আমিই বৈকি।— আমি—আমার মত আরো পাঁচজন। এতকাল সবাই পার পেয়ে এসেছে তেমন শক্ত কৈফিয়তের তলব পড়ে নি বলে—পড়লে ব্যাঙের ছাতার মতই সব—

শেষ না করে অস্ফুট কণ্ঠে হেসে উঠল। চকিতে নরেনকে দেখে নিল আবার। তেমনি নির্বিকার মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে হাল্‌কা বিনয়ে বলল আবার, যাক কাজের সময় আর আপনাকে বিরক্ত করব না...

হাতের লেদার কেস্‌টা তার দিকে বাড়িয়ে দিল, এটা দয়া করে রেখে দিন, অবসরমত খুলে দেখবেন একটু—

নিপুণ স্তুতিতে দুর্বাসাও ঘায়েল হয়। আরো অনেকটাই নরম হয়ে এসেছিল বাদল গাঙ্গুলি। এবারে বিস্মিত হ'ল। কেস্‌টা উল্টেপাল্টে দেখে জিজ্ঞাসা করল, এতে কি আছে?

ও বোষ্টুমি-বিস্ময় খুব চেনে ঘোষ। সঙ্কোচ-বিনম্র হাসি। যেমনটি দরকার। বলল, ও কিছু নয়, আমার জবানবন্দি...।

কিন্তু এ দেখে আমি কি করব?

কিছু না, কিছু না—আপনাদের মনে দাগ ফেলতে পারে এমন কিছু নয়। শুধু আমার নিজের মনের সান্ত্বনা একটু....নইলে আপনাদের কাছে ওর আর কি দাম...এতবড় এক অভিজ্ঞতার মূল্য স্বীকার না করলে...যাক, সময়মত শুধু দেখে রাখবেন একটু—

তৃতীয় লোকটির বেখাপ্পা নীরবতা প্রায় অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করল ঘোষ।

বাদল গাঙ্গুলি বলল, কিন্তু এখন আর এসব দেখে আমি কি করব?

অবিমিশ্র প্রশংসাভরা দুই চোখে ঘোষ যেন সিক্ত করল তাকে দু'চার মুহূর্ত।—ইউ আর রিয়েলি ওয়াণ্ডারফুল! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কিছু আপনাকে করতে হবে না। ওই সিমেণ্টের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর পর যেদিন আপনি বলবেন

সেদিনই আপনার সামনে ওই গুদোম ভরা সিমেণ্ট আমি মড়াইয়ের জলে ঢালব। আগেই ঢালতুম, পাছে আপনার অবিশ্বাস হয় সেইজন্য অপেক্ষা করছি।—হাসল। যদিও ওতে আর ভেজাল নেই এক কণাও, তবু যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব।

বাদল গাঙ্গুলি বিব্রত আবারও। নরেনের দিকে চোখ ফেরাল। চোখাচোখি হ'ল বটে, কিন্তু তেমনি নিরুৎসুক সে। একটু থেমে বলল, ও সিমেণ্ট এখন যেমন আছে থাক, ভেবে দেখি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেহের অণুতে অণুতে আচমকা এক বিদ্যুৎ-শিহরণ। সবেগে চেয়ার ছেড়ে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠল বাদল গাঙ্গুলি। দুই চোখে ভয়ার্ত বিভীষিকা।

কথা বলতে বলতে বইয়ের আকারের লেদার কেস্‌এর বোতাম টেনে খুলেছে। তার ভিতরে রণবীর ঘোষের জবানবন্দি।

খাতাপত্র নয় কিছু। তিন তাড়া নোট। সব একশ' টাকার।

দেহের সব রক্ত মুখে এসে জমাট বাঁধতে লাগল। নরেন চৌধুরীও বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই উঠে বসেছে। বিস্ময়ে তারও দু চোখ বিস্ফারিত।

এত বিস্ময় খুব যেন অনুকূল মনে হচ্ছে না রণবীর ঘোষের। আনাড়ীদের রকম-সকম অস্বস্তিকর।

নির্বাক বিমূঢ় বিস্ময়ের ঘোর কাটল বাদল গাঙ্গুলির। লেদার কেস্ হাতে তাকালো নরেনের দিকে। নরেনের দু চোখও তার মুখের ওপরই সংবদ্ধ। বাদল গাঙ্গুলি ওর দিকে চেয়েই আছে। দেখছে। অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে যেন। সহসা তার এই দেখাটুকু উপলব্ধি করল নরেন চৌধুরী। আপসের সুপারিশ সে-ই করেছিল। আর এতক্ষণ তার বসে থাকাটাও ও-চোখে বিকৃত সন্দেহ জাগিয়েছে। এবার এক ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হ'ল সেও।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ল। ঘোষের মুখোমুখি।

সে দাঁড়ানোর মধ্যে বোধ হয় কিছু ছিল। কারণ নিজের অজ্ঞাতে ঘোষও উঠে দাঁড়াল।

হাত বাড়িয়ে নরেন বাদল গাঙ্গুলির হাত থেকে চামড়ার কেস্‌টা নিল। নোটের তাড়া ক'টা দেখল। চামড়ার কেস্ থেকে খুলে নিল সেগুলি। খুব মোলায়েম গলায় বলল, আপনার অভিজ্ঞতার মূল্য—যে অভিজ্ঞতায় টাকার ভেজালে ভেজাল সিমেণ্ট খাঁটি হয়ে যায়, কেমন ?

এমন পরিস্থিতি কল্পনা করে নি রণবীর ঘোষ। এ সাক্ষাৎ-ব্যবস্থার পিছনে একটা অর্থই জানে। একটা অর্থই জেনে অভ্যস্ত। কিন্তু খদ্দের যে এদিকে এত কাঁচা বোঝে নি। রণবীর ঘোষও না, দ্বিজেন চাকলাদারও না।

আরো মৃদু আরো মোলায়েম ব্যঙ্গের মত শোনাল নরেনের কণ্ঠস্বর। এতকাল সবাই আপনারা পার পেয়ে এসেছেন তেমন শক্ত কৈফিয়তের তলব পড়েনি বলে, হুঁ— ?

বাদল গাঙ্গুলি নির্বাক দ্রষ্টা।

ঘোষ সামলে নিয়েছে কিছুটা। পরিস্থিতি উপলব্ধির ফলে বিনয়ের মুখোশ খসেছে। নগ্ন রূঢ়তার ছাপ সেখানে।

নির্মম বিদ্রূপ-ছটায় নরেন যেন হাসছে।—কিন্তু কৈফিয়ত যারা তলব করে তাদের জাত আলাদা। আপনার এ জবানবন্দি তারা নেবে না—মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে এমনি করে—আর এমনি করে—আর এমনি করে!

তিনবার তিন তাড়া নোট এবং চতুর্থবার চামড়ার কেস্। দু হাতে মুখ বাঁচিয়ে ঘোষ একেবারে ঘরের বাইরে এসে পড়ল। জিপ থেকে ছুটে এলো দ্বিজেন চাকলাদার। নিধু আড়ালে ছিল। আর আড়ালে থাকা সম্ভব হ'ল না। ওদিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন কখন।

চিত্রার্পিত সকলে।

ঘোষ-চাকলাদারের জিপ চলে গেছে অনেকক্ষণ। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। নিধু আড়াল নিয়েছে আবার। ঘরের মধ্যে গুম হয়ে বসে আছে নরেন চৌধুরী।

আর বাদল গাঙ্গুলি? তার বাড়িতে, তার ঘরে, তার সামনে এরকমটা হবার কথা নয়। কিন্তু তারও সন্দেহ করার কথা নয় চৌধুরীকে। টাকা দেখে তাই তো করেছিল। আড়ে আড়ে দেখছে বাদল গাঙ্গুলি। ছেলেবেলা থেকে এর বিপরীতই দেখে এসেছে। এরকম আর দেখে নি কখনো। দেখবে ভাবেও নি।...রাগ চণ্ডাল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, জায়গা বিশেষে সুন্দরও।

হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে নরেনের সিগারেটের প্যাকেটটা টেনে নিল সে। সিগারেট ধরাল। কিন্তু ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না তবু। জানালার ভিতর দিয়ে দূরে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে নিস্পন্দ মূর্তির মত। দু-চার পলক দেখল। প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করল। পরে নিজের সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে অন্যটা হাতে নিয়ে মৃদু একটা খোঁচা দিল তার কাঁধে।

এবার নরেন চৌধুরী ফিরে তাকালো। বাদল গাঙ্গুলি নীরবে অন্য সিগারেটটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগল মৃদু মৃদু।

নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময়। হাত বাড়িয়ে নরেন চৌধুরী তার হাত থেকে সিগারেট নিল। স্বচ্ছ, নির্মেঘ!

ছোট মড়াইয়ে ঘটনাটা চাপা থাকল না।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার তাঁর স্ত্রী এবং অন্তরঙ্গ দু'চারজন সহকর্মীকে বললেন। মিসেস চ্যাটার্জী ফিস ফিস করলে সমমর্যাদার গিন্নীদের কাছে। বেশ খোলাখুলি ভাবেই কানাকানি শুরু হ'ল একটা। বিস্ময়-কণ্টকিত নিধুরাম সেদিনই দুপুরে সবিস্তারে পল্লবিত করতে বসল দিদিমণির কাছে।...নরেনবাবুর কাণ্ড সর্বাগ্রে এখানে বলবে না তো কোথায় বলবে! এই বলে বেড়ানো স্বভাবের জন্য ইদানীং সান্ত্বনা মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না ওর ওপর। কিন্তু শুনল যা, দুই চক্ষু বিস্ফারিত। অধীর প্রতীক্ষা তার পর। কিন্তু লোকটার আর পাত্তা নেই পর পর ক'দিন। বাবার মুখেও সাদামাটা ঘটনাটাই শুনেছে শুধু।

রণবীর ঘোষ ঘুষ দিতে এসেছিল আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেনি নরেন চৌধুরী, ইত্যাদি। এই মেজাজ ঠিক রাখতে না পারার পিছনে আরো যে কারণ, সে শুধু সান্ত্বনাই জানে। ভদ্রলোককে সেদিন ওভাবে বলার জন্য মনে মনে অনেক অনুতাপ করেছে। কিন্তু এই কাণ্ড ঘটবে কে জানত। ভাবল, বাবাকেই জিজ্ঞাসা করবে ভদ্রলোকের দেখা নেই কেন ক'দিন ধরে। কিন্তু বলি বলি করেও হ'ল না বলা। ছোকরা চাকরটাকে পাঠিয়ে খবর নেবে ভেবেছিল। তাও পেরে উঠল না।

ওর এই আগ্রহটুকুই অদৃশ্য বাধার মত।

প্রথম দেখে নিজের চোখ দুটোকেই সহসা যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না সান্ত্বনা।

রণবীর ঘোষের জিপ উপরে উঠে গেল হুস করে। একটা বড় পাথরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসেছিল সান্ত্বনা।

ওকে কি দেখেছে? বোধ হয় না। দেখলে নীল চশমা ঘাড় ফেরাতই। তার পাশে বসে আর একজন। বিচিত্র একজন।

হোপুন...।

চড়াই উৎরাইয়ের পথে এ এমন কিছু অভাবনীয় ব্যাপার নয়। জিপে হোক, ট্রাকে হোক হরদম নামতে উঠতে দেখা যায় ওদেরও। বিশেষ করে উপরে ওঠার সময়। জায়গা থাকলে সরাসরি চেপে বসে তারা। সঙ্কোচের বালাই নেই কোনো, মাঝপথেও ডেকে থামায়, বাবু টুকচি তুলে লে না কেনে—

কিন্তু সান্ত্বনার চোখে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুন...প্রায় ঝাঁকুনি লাগার মতই অপ্রত্যাশিত।

হোপুনের স্বভাব বদলানো একটা কালো পাথরের রং বদলানোর মতই। ভাবা যায় না। লোকটার সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞাতে সান্ত্বনার তেমনি একটা ছাপ পড়েছিল মনে। কিন্তু দিনকতক আগেও কেমন একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছিল। লক্ষ্য ঠিক নয়, উপলব্ধি করা। পর পর দু দিন।

প্রথম মড়াইয়ে। সেদিন মাটি কাটছিল হোপুন। সহস্রের সঙ্গে, সহস্রের মতই। এরই মধ্যে তফাৎ কোথায়, সে শুধু সান্ত্বনাই দূরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছে অনেক দিন। সেদিনও করছিল। এদিন ওদিক চেয়ে পাগল সর্দারকে না দেখে ওর কাছেই খোঁজ করতে এসেছিল তার পর।—সর্দারকে দেখছি নে, সে কাজে আসে নি?

কোদাল থেমে গিয়েছিল। মাটি কাটার ঝোঁকে আনত দেহে আস্তে আস্তে টান হয়েছিল। শ্রান্ত দেহপঞ্জর ভরাট করে বাতাস টেনেছিল হাপরের মত। তার পর জবাব না দিয়ে নিষ্পলক চেয়েছিল তার দিকে। থতমত খেয়ে সান্ত্বনা আবার জিজ্ঞাসা করেছে, সর্দার ভালো আছে তো?

এবারও মুখে জবাব দেয় নি কিছু, একটা হাত তুলে আঙুল দিয়ে দূরের এক দিকে দেখিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ ওই দিকে আছে সর্দার। কিন্তু চোখের পাতা পড়ে নি একবারও, আত্মবিস্মৃতের মত হাতটা আপনি উঠেছিল যেন।

তাড়াতাড়ি ওর কাছ থেকে দু'দশ পা সরে বেঁচেছিল সান্ত্বনা। সর্দারকে দরকার নেই কিছু। দেখে নি বলেই খোঁজ করেছিল। যেখানে আছে জানল, সেও কাছাকাছি নয়। হোপুন কাজ শুরু করেছিল আবার। কিন্তু একটু বাদেই মাটি কাটার সেই হিংস্র তন্ময়তায় ছেদ পড়তে দেখেছিল সান্ত্বনা। একাধিকবার তার পর সম্পূর্ণ। কোদাল হাতে হোপুন চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছিল ওকে। সেই প্রথম ব্যতিক্রম। সান্ত্বনা অবাক। আর কখনো এমন হয় নি। ওর নির্বিকার নিস্পৃহতায় এতটুকু ফাটল দেখে নি কখনো। প্রথম ভেবেছিল কিছু বলতে চায় বুঝি।.. কিন্তু তা নয়। ওকে দেখার মধ্য দিয়ে দুই নিস্পলক কালো চোখ যেন কোন্ দূরে সমাহিত।

ইচ্ছে হচ্ছিল সামনে এসে দাঁড়ায় আবার। জিজ্ঞাসা করে কিছু বলবে কি না। ভরসা পায় নি। এই এক কালো মানুষের প্রতি সম্ভ্রমের শেষ নেই। দিনে দিনে সেটা বেড়েছে। পাগল সর্দারকে আপনজন মনে করে। চাঁদমণির আকর্ষণও সেই প্রথম থেকেই। সেই সুবাদে এই লোকটার সঙ্গেও একটা সহজ সংযোগ অবাঞ্ছিত ছিল না। কিন্তু ওর সান্নিধ্যে সহজ হতে পারল না কোন দিন। সেদিনও পায়ে পায়ে প্রস্থানই করেছিল।

কিন্তু ওর সেই নীরব আচরণ ভোলে নি।

দ্বিতীয়বারের ব্যতিক্রম এর কিছুদিন পরে। সুন্দরীর, অর্থাৎ সান্ত্বনার গোরুর অপরাহ্ণ-রোমন্থনের সেই নিরিবিলি পরিবেশ। ছোকরা চাকর সবে গোরু ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। সান্ত্বনাও উঠবে উঠবে করছিল। মড়াইয়ের ওধারে পাহাড়ের উপর ঠিক তেমনি একটা ধূসর মেঘের দিকে চোখ আটকে গিয়েছিল। পড়তি সূর্যের গলানো সোনায় ঠাসা জমকালো মেঘের বর্ণচ্ছটা।

বিষম চমক তার পর। বিশ তিরিশ হাত দূরে হোপুন। কাজের শেষে ঘরে চলেছিল সম্ভবত। ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে। কখন এসেছে, কখন দাঁড়িয়েছে সান্ত্বনা লক্ষ্য করে নি। এ পথেও পাহাড় পেরিয়ে গাঁয়ে যাওয়া চলে। তবু এ সাক্ষাৎ শুধুই যোগাযোগ বলে মনে হয় নি সান্ত্বনার। তাহলে আর কোনদিন অন্তত চোখে পড়ত।

...তেমনি নিশ্চল, নিস্পলক চাউনি...তেমনি দূর বিস্মৃতির পথে উধাও।

চুপচাপ থাকা বিড়ম্বনা। অস্বাচ্ছন্দ্যের বোঝা ঠেলে সান্ত্বনা উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমায় কিছু বলবে হোপুন?

হঠাৎ যেন আত্মস্থ হ'ল মানুষটা। চোখ থেকে দূরের ঘোর কেটে গেল। পাষাণ-মুখে চেতনার সাড়া জাগল। সঙ্গে সঙ্গে রূঢ় কঠোর ছাপ পড়ল একটা।

সেই চিরাচরিত নিস্পৃহতা নয়।

তার পর চলে গেল।

বিমূঢ় বিস্ময় কাটতে সময় লেগেছিল সেদিনও। পরে মনে হয়েছে, এ বিরূপতা হয়তো চাঁদমণির স্মৃতিবিজরিত। চাঁদমণির রাগ ছিল সান্ত্বনার ওপর, ওটুকুই জানে। পরের খবর তো জানে না। জানানো সম্ভব নয়। হলে বলে দিত।

বিগত ওই দুদিনের ঘটনা মন থেকে মোছে নি। সর্দারের কথা ভাবতে গেলে একটা বোবা শূন্যতার নিপীড়ন। চাঁদমণির কথা ভাবতে গেলে বুকের ভিতরে এক

নিটোল স্তব্ধতা, সে স্তব্ধতার পিছনে নারীর অপরাধ....। তাই সঙ্কোচ, তাই ভয়ও একটু।

তবু এমন নয়, যা কোন অনাগত সংশয়ের ছায়া ফেলে মনে। অথবা বিভ্রমের মুগুরে অতর্কিত ঘা বসিয়ে দেয় একটা। কিন্তু আজ দিনেদুপুরে জিপে রণবীর ঘোষের পাশে ওই জমাট থমথমে মূর্তি দেখে তাই হ'ল যেন। সহসা স্থান কাল ভুল হয়ে গেল। বিভ্রান্তি আর কেমন যেন অস্বস্তি। নীল চশমার পাশে ওই কালো মূর্তি, নিষ্ঠুরতার পাশে কালো ত্রাসের মতই।

অতিকায় গহ্বরের পাশ থেকে ডাম্পার মাটির স্তূপ বয়ে নিয়ে ঢেলে দিয়ে আসছে যেখানে দরকার। বুলডোজার ঠেলে ঠেলে সমান করে দিচ্ছে সে মাটি আর মাটি কাটছে আর্থ-কাটার। সান্ত্বনা শুনেছিল, নতুন মডেলের বিশাল বিশাল দু-তিনটে মাটিকাটা যন্ত্র এসেছে আরো। সে নাকি এক ভয়ানক ব্যাপার!

শোনামাত্র সবুর সয় নি আর।

অনেক দূরে একদিকে চলেছে সেই মাটিকাটা যন্ত্র। ভয়ানক ব্যাপারই বটে। হিংস্র গর্জনে সেই যন্ত্রদানবের অস্ত্র-বিভীষিকা স্তরে স্তরে শুকনো কঠিন মাটি চেঁছে নিয়ে আসছে, খুলে নিয়ে আসছে অবলীলাক্রমে। মাটির বুক কুরে নিয়মের মধ্যে এক একটা গাড়ি বোঝাই করে ফেলছে। নিঃশব্দ আর্তনাদে মাটির বাঁধন আলগা হয়ে খুলে আসছে। ট্রাকের গহ্বরে মাটি পড়ছে না, ধরণী যেন আপনাকে উজাড় করে অঞ্জলি দিচ্ছে অজস্রধারে।

অদূরে এক জায়গায় বসে তন্ময় হয়ে দেখছে সান্ত্বনা। যন্ত্রমুখর, সৃষ্টিমুখর। দেখছে আর নিজের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে কোথায়। ধূ ধূ অতীতের ওধারে। এর পাশাপাশি আর এক যুগের আর এক মানুষদের সেই চেষ্টার ছবি। বুড়ী ঠাকুমার চোখের জলে সূর্য-ভেজানো টোটকা, পণ্ডিতদের মন্ত্রবাণে মেঘ জমানো, চাষী প্রতিবেশীদের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ। সান্ত্বনা ঝাপসা দেখছে সব কিছু। চোখের কোল টলমল।

তন্ময়তায় ছেদ পড়ে গেল। অপ্রস্তুতের একশেষ। পাঁচ সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

কি ব্যাপার, এ ভাবে বসে?

মুখ ঘুরিয়ে নিতে হ'ল চট করে। বাহুতে চোখ রগড়ে নিল তাড়াতাড়ি। হেসে উঠে দাঁড়াল তার পর। হালকা জবাব দিল, আপনার ওই যন্ত্রগুলির কেরামতি দেখছিলাম, বাবা রে বাবা, এক একটা যেন মাটিগেলা রাক্ষস!

এদিকটায় এই যন্ত্রের কাজ দেখতে এসেছিল বাদল গাঙ্গুলিও। কিন্তু সেখানে এমন এক দৃশ্যও দেখবে ভাবে নি। তদারক সেরে ফিরে যাবে যাবে করেও না দাঁড়িয়ে পারে নি। এমন বিস্মৃতি-বন্দিনী মূর্তি আর দেখে নি। এখন আর তার চিহ্নমাত্র নেই। বরং বিপরীত এবং সচেতন মুখরতায় ভরপুর। ক্ষণপূর্বের দৃশ্যটা মনের কোথাও জমা হয়ে থাকল তবু।

পাশাপাশি আসছে। এভাবে এই লোকের সামনে ধরা পড়বে সান্ত্বনা স্বপ্নেও ভাবে নি।

কিছু একটা রোমাঞ্চকর সঙ্কোচ এড়ানোর তাগিদ। আর কেমন এক অকারণ খুশির বিড়ম্বনা। নিরুপায়, তাই বেপরোয়া। প্রায় প্রগল্‌ভা।—ডাম্পারগুলোকে দেখাচ্ছে যেন শুকনো ডাঙায় মস্ত এক একটা কচ্ছপ। নতুন আর্থকাটারের মাথায় স্টিয়ারিং হাতে মূর্তির মত বসে আছে ঐ যে টুপিমাথায় লোকটা—মুখখানা দেখলে মনে হয় জন্ম জন্ম ধরে কলের মত শুধু এই করে আসছে। ফাঁকা মড়াইয়ে সাদা ব্লকগুলোকে উঁচু থেকে বেদেদের তাঁবুর মত মনে হয় অনেক সময়। আর্থড্যামের ঐ ওদিকটায় কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে বসা হাতীর পিঠের মত লাগে দেখতে। অনর্গল উপমা আর অনর্গল হাসি সান্ত্বনার।

সেদিন যেমন আজও তেমনি। মড়াইয়ের সর্বাধিনায়ক তো ওর কি ! ও পরোয়া করে না। অন্তত দেখাতে চায় যে পরোয়া করে না। অস্বস্তিতে ঘেমে উঠছে ভিতরে ভিতরে। উঠলেই বা। বাইরে অটুট সহজ। দ্বিগুণ সহজ।

বাদল গাঙ্গুলি দেখছে। হালকা লাগছে। ভালো লাগছে। জিজ্ঞাসা করল, সেদিন আমার বাড়ি থেকে ওভাবে চলে এলে যে ?

ঠিক বুঝে উঠল না। কি ভাবে চলে এলাম ?

খাবার-টাবার তৈরি করে খাওয়ালে, তার পর নিজে না খেয়ে চলে এলে—নিধু দুঃখ করছিল।

হেসে উঠল সান্ত্বনা—আর নিধুর মনিব ?

নিধুর মনিবও।

আবার সেই খুশির বিড়ম্বনা। ফলে আবার সেই উচ্ছলতা। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। আহা, মরে যাই মরে যাই, নিধুর দুঃখ তার ওপর আবার নিধুর মনিবের দুঃখ—একেবারে জোড়া কুমীর-কান্না। আর এক দিন গিয়ে রেঁধে দিয়ে আসব !

হাসছে বাদল গাঙ্গুলিও। নিজের অজ্ঞাতে হাসছে। বলল, দিলে তো ভালোই, নিধুর রান্নার কথা মনে হলে গায়ে জ্বর আসে। তুমি এত ভালো রাঁধতে শিখলে কি করে !

গম্ভীর মুখে সান্ত্বনা জবাব দিল, ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে প্ল্যান করিয়ে ড্রাফটসম্যান দিয়ে ছক আঁকিয়ে, ওভারসিয়ার দিয়ে সারভে করিয়ে, কণ্ট্রাক্টার দিয়ে—। নিজের মুখরতায় নিজেই লজ্জা পেল।

দিনে বার দুই অন্তত মড়াইয়ে টহল দিতে দেখা যায় চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। নিঃশব্দে আসে কখন, নীরব পর্যবেক্ষণ করে, সকলের মধ্য দিয়েই সকলের পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু আজ যারা দেখল বা দেখছে তারা তফাৎ কিছু উপলব্ধি করছে। গুমোট ছায়া পড়ে নি কোন। বিশ্লেষণী গাম্ভীর্যের দূরত্ব নেই।

মড়াইয়ের উপর থেকে দেখছে আর একজন। রণবীর ঘোষ। দিনের মধ্যে ক'বার তূর্যগতিতে তার জিপ ওঠানামা করছে ঠিক নেই। অকারণে। ক্ষোভে আর আক্রোশে। লাঞ্ছনার ক্ষত মুছে ফেলার তাড়নায়। দ্রুতগতির মাথায় ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল জিপটা।

এত উঁচু থেকেও মড়াইয়ের গহ্বরে চোখে পড়েছে কিছু। দুই মূর্তি। একজনের শাড়ির আভাস।

ঝুঁকে পিছনের আসন থেকে বায়নাকুলার হাতে নিল। কি কাজে লাগে এটা এখানে? এখন না হোক, আগে লাগত। মড়াইয়ে নিজের এলাকায় বসে দৃষ্টিসান্নিধ্য পেত। যখন খুশি, যার খুশি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখে উঠত ওটা। বেছে বেছে নজরবন্দী করত কাউকে।

চোখ থেকে নীল চশমা নামল। বায়নাকুলার উঠল। ব্যবধান ঘুচল। দৃষ্টিবন্দী দুই মূর্তি। চিফ ইঞ্জিনিয়ার আর সান্ত্বনা।

নারী আর পুরুষ আর প্রসন্নতা।

কঠিন চোখে পলক পড়ে না। যতক্ষণ দেখা যায়। তার পর বিচ্ছিন্ন হ'ল ওরা। বায়নাকুলারের আওতা থেকে একজনকে ছাড়তে হয় এবার। অস্ফুট কটূক্তির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকে জাহান্নমে পাঠাল। নারী-প্রাচুর্য সামনে এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

উঠে আসছে। কাছে আসছে। প্রায় হাতের কাছে যেন। তবু রণবীর ঘোষ জানে খুব কাছে নয়। চোখ থেকে যন্ত্রটা সরালে কাছের মোহ ভেঙে যাবে।—

...থমকে দাঁড়াল...জিপটা দেখেছে এবং চিনেছে। নিরীক্ষণ করছে চোখ টান করে। চোখাচোখি হ'ল বায়নাকুলারের ভিতর দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত। যন্ত্রটা সরালো রণবীর ঘোষ। বেশ দূর এখনো।

এর পরে কি হবে জানা আছে। ওই বাঁক পেরোলে আবার দেখা যাবে উঠে আসছে। উঠে আসবে। তারপর সরাসরি ঢুকে পড়বে ওই দোকানে। ভুতুবাবুর দোকানে।

স্থাণুর মত জিপে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। মড়াইয়ের মিয়াদ ফুরিয়েছে তার। বোঝাপাড়া হয়ে গেছে দ্বিজেন চাকলাদারের সঙ্গে। এখানে তার এ চালচলন আর বরদাস্ত করতে রাজী নয় পার্টনার। স্পষ্ট জানিয়েছে। কলকাতার আড়ত নিয়ে থাকতে হবে তাকে। আর হেড অফিস থেকে এনকোয়ারির ব্যবস্থা করতে হবে। মড়াইয়ে শুধু দ্বিজেন চাকলাদার থাকবে।

ঘাড় ফেরাল। দেখা যাচ্ছে। যা ভেবেছিল তাই। বিচলিত দৃষ্টি। ক্ষণিক দ্বিধা। তারপর ভুতুবাবুর দোকান।

রণবীর ঘোষের চকচকে মুখে হাসির আভাস। ভুতুবাবুর মা-লক্ষ্মী!

সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল ভুতুবাবুকে। সেই জলের দিনে সন্ধ্যায় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তার সামনাসামনি পড়েছিল যখন। গোডাউন দেখতে আসার আমন্ত্রণের জবাবে মেয়েটা যা বলেছিল ভোলে নি। তবু সেদিন অবাক যত হয়েছিল, অপ্রসন্ন হয় নি তত। হালকা আভাসে জিজ্ঞাসা করেছিল ভুতুবাবুকে। কার বরাতে ঝুলছে? বাদল গাঙ্গুলি? নরেন চৌধুরী?

ভুতুবাবু এত জানে আর এটুকু জানে না। আধ হাত জিব কেটে সারা। কিন্তু সেদিনের সে মেজাজ গেছে রণবীর ঘোষের।

জিপ থেকে নামল। চলল ধীরেসুস্থে।

দোকান জমে উঠেছে ভুতুবাবুর। পর্দা দিয়ে ক্যাবিন করেছে মেয়েদের জন্য। নিটোল পর্দা নয় মোটেই, দৃষ্টি চলে অনায়াসে। তাও আবার অর্ধেক গোটানো। ভুতুবাবুর গোল মাথার বুদ্ধি গোল নয়।

মেন কোয়ার্টারস্-এর আর একটি মেয়ের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল ঝরনা চ্যাটার্জী আর হাসি ছড়াচ্ছিল। আসলে হাফ-গোটানো পর্দার ওদিকে ছেলে ক'টার মুখের কারুকার্য উপভোগ করছিল। তারা চলে যেতে মুখে একটা বিষণ্ণ ক্লান্তির ছায়া পড়ছিল সবে। সান্ত্বনাকে দেখামাত্র কলকলিয়ে উঠল একেবারে। ভুতুবাবুর ফোলা গাল হাসি-টসটসে হয়ে উঠল চিরাচরিত অভ্যর্থনায়।—আসুন মা-লক্ষ্মী আসুন, আমি ভাবছিলাম ভুতুর দোকান ভুলেই গেলেন!

ঝরনা হেসে উঠল আবার। এদিকে, সোজা এদিকে চলে এসো মা-লক্ষ্মী!

এক বিপদ এড়াতে গিয়ে আর এক ফ্যাসাদ। কিন্তু ঝরনার অভ্যর্থনায় সাড়া দেবে কি ভুতুবাবুর কাছেই দাঁড়াবে ঠিক করার আগেই আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটল আবার। নীল চশমা হাতে দোলাতে দোলাতে রণবীর ঘোষ ভিতরে এসে দাঁড়াল।

সান্ত্বনা ঘাড় ফেরাল। দৃষ্টি বিনিময়। চিত্রার্পিত নিশ্চল কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই চকিত সাড়া জাগল। সবিনয়ে ভুতুবাবু তার আসন ছেড়ে মাটিতে অবতরণ করল। কলহাস্যে ঝরনাও এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। কৌতুকছটা তার পার্শ্ববর্তিনী তৃতীয় মেয়েটির মুখেও। ঝরনা বলল, ভুতুবাবুরই ভাগ্য আজ, মা-লক্ষ্মীর পা পড়তে না পড়তে একেবারে কুবেরের আবির্ভাব!

ভুতুবাবু বিনয়-বিগলিত। পলকের জন্য ঝরনা থমকে গেল। সান্ত্বনাকে দেখল। রণবীর ঘোষকে দেখল। অজগরের অমোঘ আকর্ষণী আওতায় অসহায় পশুর অব্যক্ত ধড়ফড়ানি দেখল। নির্মম উচ্ছলতায় সমস্ত ভিতরটা খলখলিয়ে উঠল যেন। সান্ত্বনার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল একটা, কি গো মড়াইকন্যা, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে! অনেকদিন আগে এই ভদ্রলোক দুঃখ করছিলেন, তুমি নাকি সুনজরে দেখো না—এসো আজ বোঝাপড়া করে ছাড়ব তোমার সঙ্গে। ভুতুবাবু, আমাদের চা দিন, আসুন মিঃ ঘোষ, ভুতুবাবুর লেডিজ ক্যাবিনেই চলে আসুন।

আহ্বান কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনার বিভ্রান্ত আচ্ছন্নতা কেটে গেল যেন। সবলে এক লোলুপ গ্রাস থেকে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। বলল, না, আমাকে এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে। ভুতুবাবুর দিকে এগিয়ে এলো একটু।—সর্দারের সঙ্গে দেখা হলে একবার আমাদের বাড়ি যেতে বলবেন তো, দরকার আছে।

কোনদিকে না চেয়ে বেরিয়ে গেল। ভুতুবাবুর গোল চোখে গোলমেলে বিস্ময়। রণবীর ঘোষ নিজের অজ্ঞাতে ঘাড় ফিরিয়েছে বাইরের দিকে। চাপা হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠেছে ঝরনার সমস্ত মুখ। মানুষটাকে দেখছে না, তার ইচ্ছাটাকে দেখছে। দেখছে আর কৌতুকে উঠছে উপচে।—আসুন তাহলে, আমরাই আর একটু চা খাই, কি আর করা যাবে!

রণবীর ঘোষ সচকিত। ভুতুবাবুও। ছোকরা চাকরকে হাঁকডাক করে চায়ের

অর্ডার দিল তাড়াতাড়ি।

হনহনিয়ে উপরে উঠছে সান্ত্বনা। বিকেলের মিষ্টি বাতাসে আরো বহু লোক উঠছে নামছে। কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অসহিষ্ণু ক্ষোভে ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। মেন কোয়ার্টারস্ ছাড়িয়ে জেনারাল কোয়ার্টারস্‌এর দিকে পা বাড়িয়ে কিছুটা সুস্থ হ'ল। বেজায় হাঁপিয়ে গেছে। বসলে হ'ত একটু। কিন্তু বাড়ি পৌঁছানো অকারণ তাগিদে বসা হ'ল না।

পাগল সর্দারকে আসার জন্য বলে এলো ভুতুবাবুকে। কেন বলল? কে জানে কেন, শুধু কিছু একটা বলার জন্যেই বলা। সঙ্গে সঙ্গে হোপুনের কথাও মনে পড়ে। জিপে রণবীর ঘোষ আর তার পাশে সেই কালো পাথর মূর্তি। ভিতরে ভিতরে আবার জ্বলে উঠল সান্ত্বনা। খুব তো জিপে করে বসে ঘুরিস, তোর চাঁদমণির খবর রাখিস? পাগল সর্দার এলে বলে দেবে, ওই লোকটার সঙ্গে যেন কক্ষনো না মেশে হোপুন। সেদিন জিপে ওদের দুজনকে পাশাপাশি দেখার বিস্ময় এবং অস্বস্তি ভুলতে পারে নি সান্ত্বনা।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন খুশি। বাবা আর নরেনবাবুতে বসে গল্প করছে। সেই কটূক্তি শুনে গিয়েছিল ভদ্রলোক, আর এই এলো। অবনীবাবু ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, কোথায় থাকিস সমস্ত দিন? নরেন সেই কখন এসেছে অফিস থেকে, ওর বোধ হয় খিদে পেয়ে গেছে, দেখ্ কি আছে।

কি আছে দেখার বদলে সান্ত্বনা নরেনকে দেখতে লাগল। খুব চেনা মানুষের মধ্যে অচেনা কিছু দেখলে যেমন করে দেখে। চোখে মুখে কৌতুকাভাস।

নরেন অল্প অল্প পা দোলাচ্ছে আর হাসছে।—খিদে পেয়েছে কিনা দেখছ নাকি?

জবাব না দিয়ে হাসিমুখে ভিতরে চলে এলো সান্ত্বনা। গুমোট কেটেছে। হালকা লাগছে।

কিছুদিন হ'ল হালকা লাগছে অবনীবাবুরও।

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছেন তিনি। সান্ত্বনা জানে না। নরেনও কিছু আভাস পায় নি। সকলের অগোচরেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছেন অবনীবাবু। একলার জীবনে এক ধরনের দার্শনিক নির্লিপ্ততা এসেছে তাঁর মধ্যে। সংস্কারের বাঁধন শিথিল হয়েছে অনেক। সামাজিক ভ্রূকুটির অর্থ গেছে কমে। মেয়ে সুখে থাকবে। ভালো থাকবে। এইটেই বড় কথা আর সার কথা। নরেনই কথা পাড়বে হয়তো। সঙ্কোচে যদি না পারে, তিনিই বলবেন। এ ঘর থেকেই হাঁক দিলেন, আমি বেরুলাম, বুঝলি?

বিকেলে লম্বা একপ্রস্থ হাঁটা অভ্যাস তাঁর।

সান্ত্বনা হাতমুখ ধুয়ে দাওয়ায় এসে বসে ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবার কথা কানে এলো। তিনি বেরিয়ে গেলেন টের পেল। ভাল লাগল না। খারাপও লাগল না। মনে মনে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল এ ক'দিন। নিধুর মুখে আর বাবার মুখে রণবীর ঘোষের নাকাল হওয়ার ব্যাপারটা শোনার পর থেকেই। নিধু বলেছিল, তাড়া তাড়া

নোট দিয়ে অমন পিটুনি জন্মেতক দেখেনি। বাবা চিন্তিত হয়েছেন, কি ভাবে শোধ নিতে চেষ্টা করবে ওই কন্‌ট্রাক্টার ঠিক কি। সে চিন্তা সান্ত্বনাকেও স্পর্শ করে নি এমন নয়। কেমন মনে হয়েছে, তার জন্যই এতটা হয়েছে। হঠাৎ আবার জিপে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুনের মূর্তি স্মরণ হতেই ভয়ের ছায়া নামল মুখে।

নরেন এসে দাঁড়াল। মোড়া টেনে দাওয়ায় বসল, যেমন বসে। সহজ ভাবেই বলল, আমার খাবার তাড়া নেই কিছু, খেয়ে এসেছি।

সান্ত্বনা সকৌতুকে তাকালো তার দিকে। বলল, নতুন নতুন লাগছে শুনতে।

যে ভাবে তাকাচ্ছ, মনে হচ্ছে নতুন নতুন লাগছে দেখতেও।

লাগছেই তো। আপনার আবার এত রাগ জানতুম না।

কোন্ প্রসঙ্গে বলছে বুঝে নরেন হাসতে লাগল তার দিকে চেয়ে।....এ ছাড়া আমার আর যা কিছু সব জেনে ফেলেছ বোধ হয়?

হেসে ফেলল সান্ত্বনা, খুব ফট ফট করে কথা শোনাচ্ছেন যে—এ ক'দিন আসেন নি কেন?

অনেকবার স্থির করেছিল, দেখা হলে বলবে, সেদিন ওরকম বলাটা তার অন্যায় হয়েছে খুব। বলে উঠতে পারল না। কিন্তু যা বলল, নরেনের কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছুলো বোধ হয়। নিস্পৃহ মুখে জবাব দিল, না এসে দেখছিলাম পেয়াদা পাঠাও কি না, আশা নেই দেখে শেষে চলে এলাম।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল সান্ত্বনা। সেখানেই বসল। চেষ্টা করেও হালকা কথা কিছু যোগালো না। বাইরের দিকে মুখ ফেরাতে হ'ল। ভদ্রলোকের কথাবার্তার ধরনধারণ সুবিধের ঠেকছে না।

প্রসঙ্গ বদলে নরেনই জিজ্ঞাসা করে বসল আবার, মড়াইয়ে বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে খুব গল্প করছিলে দেখলাম—

হঠাৎ একেবারে থতমত খেয়ে গেল সান্ত্বনা। সচকিত বর্ণান্তর। নরেনের চোখ এড়ালো না কিছুই। চেয়েই আছে। হাসছে একটু একটু।

লঘু বিস্ময়ে সান্ত্বনা পাল্টা প্রশ্ন করল, ওমা, আপনি আবার কোত্থেকে দেখলেন?

গা-ঢাকা দিয়ে তো আর ঘুরছিলে না, সব জায়গা থেকেই দেখা গেছে...তা কি কথা হ'ল?

আবার লাল হয়ে উঠছিল সান্ত্বনা, শেষের প্রশ্নটার আশ্রয় নিয়ে বাঁচল। ছদ্ম গাম্ভীর্যে বলল, কথা হ'ল আমি খুব ভালো রাঁধি আর নিধুর রান্নার কথা মনে হলে গায়ে একেবারে জ্বর আসে। আচ্ছা কেপ্পন আপনাদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার—এত টাকা মাইনে পায়, দেখেশুনে একজন রাঁধুনী রাখলেই হয়!

শুধু টিপ্পনী নয়। নিজে এ বিদ্যেয় পটু বলে করুণাও। নিধুর রান্নার বহর স্বচক্ষে দেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে নরেন ঠাট্টা করল, তা পছন্দমত রাঁধুনীর খোঁজে যদি এ বাড়ির দিকেই চোখ দেয়, তাহলে?

ধেৎ, আপনি যাচ্ছেতাই লোক। ভ্রূকুটি সত্ত্বেও আরক্ত হয়ে উঠল। এ কথার

জবাবে ভদ্রলোক এরকম ঠাট্টাই করবে জেনেও বলা। তবু বিকেলে মড়াইয়ের অনুভূতিটুকু নিজের অজ্ঞাতে মিষ্টি আনন্দের মত যেন ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে আছে। সেই খুশিটুকুই প্রকাশ পেল আবারও। হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করল, ভদ্রোলোককে সবাই এত ভয় করে কেন বলুন তো? ক'দিন তো কথা বলে দেখলাম, মেজাজপত্র দিব্যি ঠাণ্ডা!

নরেন চুপচাপ চেয়ে ছিল। মুচকি হেসে বলল, তোমাকে সে মেজাজ দেখাতে যাবে কেন?

অন্য লোককে? হালকা আগ্রহ।

অন্য লোককেও মেজাজ ঠিক দেখায় না, তবে কাজের বাইরে নিজের মনে একা থাকতে থাকতে এমন হয়েছে যে ভরসা করে কেউ বড় ঘেঁষে না কাছে।

বলার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। একটুখানি বেদনার ছায়া পড়ল সান্ত্বনার মুখে। কিছু না ভেবেই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ভদ্রলোকের আপন বলতে আর কেউ কোথাও নেই, না?

আবার হাসতে লাগল নরেন চৌধুরী। নিঃশব্দ হাসি আর সকৌতুক নিরীক্ষণ। সান্ত্বনা বিব্রত বোধ করতে লাগল কেমন। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে নরেন জবাব দিল, আছে, তেমন কেউই আছে, তবে ভদ্রলোক সেটা এখনো ঠিক জানে না বোধ হয়।

এক ছলক রক্ত উঠে আসছে সান্ত্বনার মুখে। সেটা টের পেয়েই জিজ্ঞাসু বিস্ময়ের ভান করতে হ'ল যথাসম্ভব। কিন্তু সেও আর কতক্ষণ। ভদ্রলোকের চোখেমুখে গা-জ্বালানো হাসি।

উঠে চট করে রান্নঘরে চলে গেল। সেদিকে চোখ রেখে নরেন তেমনি হাসছে মৃদু মৃদু।

সান্ত্বনার সামলে নিতে সময় লাগল বেশ একটু। ওই ভাবে না তাকালে আর ওই ভাবে না হাসলে সেও রাগ দেখাতে পারত বা যাহোক কিছু বলতে পারত। রান্নঘর থেকে বেরিয়ে করতেও হবে সেরকম কিছু—বা বলতে হবে। কিন্তু আয়না ছাড়াও নিজের মুখের অবস্থা অনুমান করতে পারছে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সুন্দরীর ছোকরা চাকর উনুন ধরিয়ে রেখে গেছে। বেশ শব্দ করে কেটলি ধুয়ে চায়ের জল চড়ালো। শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলো তার পর। বিমূঢ় পরক্ষণে।

নরেন চৌধুরী চলে গেছে।

শ্লথ পায়ে যেন কোয়ার্টারস-এর দিকে চলেছে নরেন চৌধুরী। অনেকটা নিরুদ্দিষ্টের মত। অল্প অল্প হাসিটুকু মুখে লেগে আছে তেমনি।...হাসি ঠিক নয়। তবু হাসি বৈকি!

মূর্তির মত দাওয়ায় বসে আছে সান্ত্বনা। রান্নাঘরে কেটলির জল ফুটে উনুন নিবেছে, খেয়াল নেই।

॥ ১১ ॥

অন্ধকার শাল গাছের নিচে সাইকেল হাতে নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করে ভুতুবাবু দেখছে আর দরদর করে ঘামছে।

তারই দোকানের এক ঘরে টিম টিম করে আলো জ্বলছে একটা। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে খাটিয়ার ওপর বসে আছে লোকটা আর ক্রমাগত পাইপ টানছে। পাইপ নিবে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। দেশলাই জ্বেলে পাইপ ধরাচ্ছে আবার। তার আভায় চকচকে মুখ লাল দেখাচ্ছে থেকে থেকে। ভুতুবাবুর চোখ জানে, সে লালিমা সুরাসিক্ত।

ভুতুবাবু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর দেখে চেয়ে চেয়ে। মনে হয় তারই দোকানে বাসা নিয়েছে এক মূর্তিমান বিভীষিকা। মড়াইয়ের বাতাসে গাছের পাতা মড়মড়িয়ে ওঠে। ভুতুবাবুর কানের ভিতর দিয়ে একটা অজ্ঞাত শঙ্কার স্রোত পা বেয়ে নামতে থাকে।

রাতের পর রাত কাটিয়েছে দোকানে, কখনো এমন হয় নি।

শলাই জ্বলে উঠল পাইপের মুখে। তেলতেলে লাল মুখ ঢুলু ঢুলু টুসটুসে দেখালো আবার। দোরগোড়ায় মেঝেতে দ্বিতীয় মূর্তি। অন্ধকারের মতই কালো আর থমথমে। ক্রমাগত মদ গিলছে সেও। ঘরের টিমটিমে আলোয় বাইরের দিকে বিরাট একটা ছায়া পড়েছে তার। সেই ছায়ার নড়াচড়া দেখে ভুতুবাবু বুঝতে পারে, থেকে থেকে বোতল উবুড় করে গলায় ঢালা হচ্ছে।

পর পর চারদিন...। ভুতুবাবু ভয়ে কাঠ। আরো এগারো দিন বাকি।

কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল এখনো যেন ঠাওর করতে পারছে না। কেন রাজী হ'ল ? টাকার লোভে ? এক পাঁজা নোট যখন লোকটা নাড়তে লাগল তার চোখের সামনে, ভুতুবাবুর পায়ের নিচে মাটি দুলছিল। একেবারে গোল আর স্থির হয়ে গিয়েছিল তার গোল গোল দুই চোখ। নাকের ডগায় টাকার বাতাস লেগে গোটা শরীরটাই সিড়সিড় করে উঠেছিল। তবু টাকার লোভেই শুধু রাজী হয় নি। রাজী হয়েছে ভয়ে। অজ্ঞাত ভয়ে। কি করে যেন বুঝেছিল রাজী না হলে তার দোকানের পাট বরাবরকার মত তুলতে হবে এখান থেকে। লোকটা তার নাকের ডগায় টাকা দুলিয়েছে মতামতের প্রত্যাশায় নয়। মুখ বন্ধ করার জন্য আর কৌতূহল দমন করার জন্য। টাকার দোলানিতে সেটা সম্ভব না হলে আরো উপায় আছে হাতে। সে উপায়টিও আড়ে আড়ে দেখেছে ভুতুবাবু, উপলব্ধি করেছে।

নোটের তাড়া দুলছিল রণবীর ঘোষের হাতে আর ড্যাবডেবে মড়া চোখে নির্নিমেষে চেয়েছিল হোপুন।

কেউ তারা ভয় দেখায় নি। তবু ভয় পেয়েছিল ভুতুবাবু। রণবীর ঘোষের হাতে টাকা আছে, টাকায় না হলে হোপুন আছে। একবার টাকার দিকে তাকাও। তার পরে হোপুনের দিকে। ওই ঠাণ্ডা মড়া চোখের সঙ্গে দ্বিতীয়বার আর চোখোচোখি করার সাধ হবে না। চেয়ে থাকো টাকার দিকে। নাকের ডগায় টাকার বাতাস মিষ্টি লাগবে। টাকা নাড়ার ফরফর শব্দ মিষ্টি লাগবে কানে। বিহ্বল হাত বাড়িয়ে টাকা

নাও তার পর। মড়া চোখের দিকে তাকিও না আর।

হাত বাড়িয়ে টাকাই নিয়েছে ভুতুবাবু।

কিন্তু ওই টাকাই অস্বস্তির কারণ, ভয়ের কারণ, বিভীষিকার কারণ। এত টাকা না পেলে অত ভাবত না ভুতুবাবু, অত ভয়ও পেত না। অত টাকা পেয়েছে বলেই গোলমেলে ঠেকছে সব কিছু। গোলমেলে ঠেকছে বলেই ভাবছে। আর যত ভাবছে তত ভয় বাড়ছে।

দুদিনের মধ্যে সব কিছু যেন ওলটপালট হয়ে গেল ভুতুবাবুর চোখের সামনে। অথচ ব্যাপার সামান্য। গোড়ায় গোড়ায় তো টাকা নিয়ে দু'পাঁচ জনের এক-একটা দলকে এমন ঘর ছেড়ে দিয়েছে কতবার। বিদেশে বেঘোরে এসে পড়েছে। রাতে মাথা গোঁজার আস্তানা নেই। টাকা ফেলো, থাকো এক রাত দু' রাত। ভুতুবাবু অন্য ঘরে সব পুরে তালাবন্ধ করে সাইকেল ঠেঙিয়ে চলে যাবে চৌদ্দ মাইল দূরে নিজের বাড়ি। ভাঙা কাচের আলমারি তেলচিটে আসবাবপত্র বা ব্যবহার করা হাঁড়ি কড়াই চুরি করার জন্য অত টাকা দিয়ে দল বেঁধে রাত্রিবাস করতে আসবে না কেউ ভদ্রলোক সেজে। মুখ দেখে লোক চিনতে পারে ভুতুবাবু। তাছাড়া ছুটকো চুরির ভয়ও নেই কিছু। আদিবাসীরা আর যাই হোক, চুরি শেখে নি।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটাই অসম্ভব ত্রাস সঞ্চার করেছে ভুতুবাবুর মনে। পনের দিনের জন্য তার দ্বিতীয় ঘরটি দখল করেছে রণবীর ঘোষ। দিন নয়, শুধু রাতের জন্য। মড়াই ছেড়ে চলে যাচ্ছে বরাবরকার মত। দিনকতক থাকা দরকার এখনো। পার্টনারের সঙ্গে বনছে না বলেই এই ব্যবস্থা নাকি। পনের রাত্রির জন্য হলেও যে কোনদিন চলে যেতে পারে।

কিন্তু পনের রাত্রির জন্য অত টাকা কেন ? এর পনের ভাগের এক ভাগ হলেও তো ভুতুবাবু রাজী হয়ে যেত। অত টাকা কেন আর অত থমথমে গোপনতা কেন ? সেই গোপনতার সঙ্গী এই মড়া-চোখো লোকটা কেন ?

দোকানের শুরু থেকেই হোপুনকে চেনে ভুতুবাবু। তার আসুরিক কীর্তিকলাপ জানে। মনে মনে সমীহ করে। কিন্তু এরকম ভয় কখনো করে নি। কিছুদিন ধরেই লোকটার কথা ভাবছিল ভুতুবাবু। বিগত ক'টা দিনের মধ্যে ওর সঙ্গে নীরব যোগাযোগ ঘটেছে বারকতক।

নিরিবিলিতে ফস ফস করে আনকোরা নোট বার করছে দুটো তিনটে করে। মুখ ফুটে কখনো বলে নি বিশেষ কিছু। সামান্য ইঙ্গিতে ভুতুবাবু বুঝে নিয়েছে। হাড়িয়া বা পচাই নয়, খাঁটি বিলিতি চাই। হাড়িয়া পচাই তো ওদের ঘরে সর্বদাই মজুত থাকে। ওর মুখের দিকে চেয়েই ভুতুবাবু পরিষ্কার বুঝতে পারে, লেবেল-আঁটা বিলিতির স্বাদ লোকটা ভালো করেই জেনেছে।

ভুতুবাবু কি এই ব্যবসা করে নাকি ? মোটে না। বিশ মাইল দূরে শহরের দোকান সকলের জন্যেই খোলা। তুমি গেলে তুমিও নিয়ে আসতে পারো। কিন্তু তোমার যাওয়ার ফুরসত নেই বা সঙ্গতি নেই। আমি এনে দিই তোমার হয়ে। বোতলের দাম নিই আর পরিশ্রমের দাম নিই। ব্যাস, বিবেকের কাছে পরিষ্কার ভুতুবাবু। যার

দরকার, যেমন করে হোক আনাবেই সে, ভুতুবাবু উপলক্ষ মাত্র।

কিন্তু তা বলে হোপুন! হোপুনের জন্য! ভুতুবাবু অবাক! অবশ্য এ অর্থের যোগানদার কে ভুতুবাবু অচিরে জেনেছে। কিন্তু জেনে বিস্ময় চতুর্গুণ বেড়েছে। তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারে নি কিছু। জিজ্ঞাসা করবে কাকে। লোকটার বোবা চাল-চলনের ব্যতিক্রম নেই কিছু। বরং আরো শান্ত আরো নিষ্প্রাণ মনে হয়েছে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে এই জমাট কালো পাথর মূর্তি যে ভাবে মুখের দিকে চেয়ে থাকবে সে অস্বস্তি। ভুতুবাবু জিনিস এনে দিয়ে খালাস।

তার পর সরাসরি এই ঘর ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব, নাকের ডগায় রণবীর ঘোষের টাকা দোলানো এবং সেই সঙ্গে হোপুন! ভুতুবাবু ভড়কে গেছে, ভাবনা-চিন্তার অবকাশ বড় পায় নি।

দূরে শালগাছের নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে ভুতুবাবুর। যেতে পারলে বাঁচে। কিন্তু পা যেন পাথর হয়ে গেছে। নড়তেও পারছে না।

সন্ধ্যে হতে না হতে মড়াইয়ের হট্টগোল থেমে যায়। কর্মচারীরা ওপরে উঠে যায়। আদিবাসীরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরের দিকে ছোটে হাড়িয়ার টানে। ভিনদেশি কুলীকামিনের আস্তানা এদিকে নয়। একটু রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুতুবাবুর দোকানের আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন বড় থাকে না। রাত আটটা বাজতে না বাজতে দু'দশ ঘর বাঁধা খদ্দেরের রাতের খাবার উপরে চলে যায় শেষবারের ট্রাকে। তার পরেই রাত্রির স্তব্ধতা। ধীরেসুস্থে তখন দোকান গোটাবার ব্যবস্থা করে ভুতুবাবু। আর ছোকরা কর্মচারী দুটোর সঙ্গে গল্পগুজব করে।

কিন্তু দু দিন ধরে রাতের খাবার উপরে পাঠিয়েই ওদের বিদায় দিতে হচ্ছে। একটা ঘর তালাবন্ধ করে ফেলে দুরু দুরু প্রতীক্ষা। জিপে করে রণবীর ঘোষ আসে এক সময়। বাক্যব্যয় না করে সাইকেল নিয়ে প্রস্থান করে ভুতুবাবু। দূরে অন্ধকারে শালগাছের নিচে এসে দাঁড়ায় তার পর। খাটিয়ায় বসে পাইপ ধরায় রণবীর ঘোষ। ক্রমাগত পাইপ টানে। পাইপ নিবে যায়। দেশলাই জ্বেলে ধরায় আবার। পিচ্ছিল লালিমায় চকচকিয়ে ওঠে গোটা মুখ।

সাইকেল হাতে ভুতুবাবু দাঁড়িয়ে থাকে নিস্পন্দের মত। কতক্ষণ ঠিক নেই।

তার পরে, অনেক পরে শ্লথ গতিতে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসে হোপুন। খানিকটা নিটোল অন্ধকারের মত।

ভুতুবাবু জানে, অর্থ দিয়ে সহজে কেনা যায় না ওদের। কিন্তু মদের বশ প্রায় সকলেই।

সমস্ত রাত তা বলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না এভাবে। কতদূর যেতে হবে ঠিক নেই। গোলগাল দেহ সত্ত্বেও সাইকেলে চেপে অনায়াসে চলে যাওয়া অভ্যেস আছে। কিন্তু ক'দিন ধরে শরীরটা যেন কাঠ। নড়তে-চড়তে সঙ্কট।

আরো এক রাত। একই ব্যাপার দেখল ভুতুবাবু।

সিমেন্ট ভেজাল সংক্রান্ত সমস্ত অঘটন জানে। প্রথমে ভাবল, সেই ব্যাপারেই প্রতিশোধের চক্রান্ত কিছু। কিন্তু ভুতুবাবু নির্বোধ নয়। হঠাৎ মনে হ'ল তা নয়।

একেবারেই নয় তা। আর কেউ না জানুক, ভুতুবাবু তো জানে ঘর দখলের কথা। জানে যখন, ওখানে মারাত্মক কিছু সংঘটনের সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া প্রতিশোধ নিতে হলে এভাবে ঘর দখলের দরকারই বা কি?

তাহলে কি? তাহলে কেন?

ভুতুবাবুর গোল চোখে পলক পড়ে না প্রায়। দম বন্ধ করে ভাবতে থাকে...তাহলে এমন কিছু, যার জন্য ঘর দরকার। এমনি নির্জনে, এমনি গোপনে। কোনো একজনের আসার প্রতীক্ষা। কেউ একজন আসবে।

...যেই হোক সে, পুরুষমানুষ নয়।

একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনায় হঠাৎ যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল ভুতুবাবু। সঙ্গে সঙ্গে এক উচ্ছল চপল মেয়ের মূর্তি ভেসে উঠল চোখের সামনে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরনা। ভারী ভাব দেখেছে এই লোকটার সঙ্গে। যখন তখন যেখানে সেখানে ঘোরে জিপে করে। মেয়েটাকে ভালো মনে হয় নি কোন দিন। তবু খুশি ছিল মনে মনে। দোকানের খদ্দের বাড়িয়েছে অনেক। একবার এসে চা খেতে বসলে টানে টানে অনেকে আসে।

কিন্তু তা বলে এই ব্যাপার! খাপ্পা হয়ে উঠতে লাগল ভুতুবাবু। কিন্তু সেই সঙ্গে এক ধরনের নির্মম উষ্ণতাও উপলব্ধি করছে যেন। পরিবেশটা নিজের দোকানঘর না হলে....

কিন্তু সহসা যেন বিদ্যুতের ঘায়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেল আবার। সমস্ত চেতনাসুদ্ধ বুঝি পুড়ে ছাই হয়ে গেল এক নিমেষে। দেহের সব রক্ত জল।

—তাই যদি হবে, সঙ্গে এ হেন অনুচরটি কেন? এই চক্রান্ত কেন? মদে এই দুর্দম লোকটাকে বশীভূত করা কেন?

দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল ভুতুবাবুর। সাইকেলটা পড়ে যাবার মত হ'ল হাত থেকে। রণবীর ঘোষের চালচলন অনেক দিন লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করছে।...এবারে সব বুঝেছে ভুতুবাবু। সব জেনেছে। ঝরনা চ্যাটার্জী নয়। আর কেউ, যে স্বেচ্ছায় আসবে না। জোর করে আনা হবে। সেই জন্যে এই চক্রান্ত। সেই জন্যেই হোপুন। সেই জন্যেই তাকে মদ গেলানো।

সাইকেল নিয়ে টলতে টলতে প্রস্থান করল ভুতুবাবু।

মনে মনে এক ধার থেকে জল্পনা-কল্পনা করে চলেছে সান্ত্বনা। এক-একবার এক-একটা যুক্তির জাল বুনছে। কিন্তু খানিক বাদেই সেটা জোরালো লাগছে না তেমন। আবার ভাবছে। কোন অজুহাতেই জুতসই লাগছে না খুব।

মাসির চিঠি এসেছে। মাসতুতো বোনের বিয়ে। অবিলম্বে তাকে যেতে হবে। বিয়ের প্রায় মাসখানেক দেরি এখনো। কিন্তু মাসির জোর তাগিদ, ওর বাবা যেন পত্রপাঠ দুই-একদিনের ছুটি নিয়ে ওকে রেখে আসে। সান্ত্বনা বেশ বুঝছে, একবার গিয়ে পড়লে দু'তিন মাসের ধাক্কা।

বেরোবার আগে অবনীবাবু চিঠি পড়ে গেছেন। ফিরে এসে যা হয় ভেবে ঠিক

করবেন বলেছেন। সান্ত্বনা খুব জানে বাবাও রেখে আসতে চাইবে। কারণ মড়াইয়ে এসে পর্যন্ত আর একবারও যায় নি, তাতেই মাসি ক্ষুণ্ণ মনে মনে।

সান্ত্বনা যাবে তো নিশ্চয়ই। এত দিনে সেই মাসতুতো বোনের বিয়ে। আনন্দও কম নয়। মেয়ে দেখা নিয়ে সেই দু'দুবারের বিভ্রাট। বোনের বদলে ওকেই নিতে চাওয়া। রাগ আর সঙ্কোচে ওর সেই কেঁদে ফেলার উপক্রম। মনে পড়লে এখন কিন্তু খারাপ লাগে না খুব। বরং কেমন যেন খুশির আমেজ লাগে একটু।

সান্ত্বনার যেতে আপত্তি নেই। দু'চার দিনের জন্য গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে আসার আগ্রহই বরং ষোল আনা। কিন্তু ওই দু'চার দিনের জন্য। সময়-সময় কালে বাবার সঙ্গে যাবে আর বাবার সঙ্গে ফিরে আসবে। কিন্তু মাসি দূরের কথা, বাবাও রাজী হবে না তাতে। ওই জন্যেই রাগ হয় বাবার ওপর। লিখে দিলেই হয়, সান্ত্বনা না থাকলে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে—আরো কত কি অসুবিধে। কিন্তু সে বেলায় ঠিক উল্টো বলবে। যেন ওর কোন দরকার নেই। তা ছাড়া ও না থাকলে ছোকরা চাকরটার হাতে সুন্দরীর কি হাল হবে কে জানে। আসলে মড়াই ছেড়ে যাওয়ার চিন্তাটাই প্রায় দুঃসহও।

বাইরে কড় নাড়ার শব্দ। বিস্মিত হ'ল সান্ত্বনা, এই ভরা দুপুরে আবার কে! কণ্ঠস্বর শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে।—মা-লক্ষ্মী আছেন নাকি, আমি ভুতু।

তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিল সান্ত্বনা। খুশি হয়ে বলল, কি ব্যাপার, আসুন, ভিতরে আসুন—এতকাল বাদে সুন্দরীর কথা মনে পড়ল বুঝি?

ভুতুবাবুর ঘামে-ভেজা ফোলা গাল অমায়িক হাসিতে টসটসে দেখালো। কাপড়ের খুঁটে ঘাম মুছতে মুছতে কাঠের চেয়ারে বসে বড় একটা দম নিল।— আসতে তো মন চায়, সময় পাই কোথা মা-লক্ষ্মী, আপনাদের আশীর্বাদে দোকান ছেড়ে নড়তেই পারি নে মোটে। তা ভালো আছেন তো?...ক'দিন দেখি নি, দোকানেও তেমন লোকজন নেই এখন, ভাবলাম এই ফাঁকে টুক্ করে মা-লক্ষ্মীকে দেখে আসি একবার।

দু চোখ গোল করে মা-লক্ষ্মী দর্শনে মন দিল ভুতুবাবু। হাসি চেপে সান্ত্বনা পাশের ঘর থেকে একখানা হাতপাখা এনে তার হাতে দিয়ে অদূরে বসল।

ভুতুবাবুর হাতে পাখা নড়তে লাগল আর মুখে কথা ঝরতে লাগল। এলোমেলো কথা। রাজ্যের কথা। গোরুর প্রসঙ্গ তুলল না মোটে। সান্ত্বনার মনে হ'ল শুধু দর্শনাভিলাষে আসে নি লোকটা, কিছু দর্শনতত্ত্বালোচনার বাসনাও আছে। কথার তোড়ের মাঝখানে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে এক একবার, দেখছে ওকে নিরীক্ষণ করে, আবার সচেতন হয়ে যে কোন একটা প্রসঙ্গ ধরে নতুন করে দর্শনপথ পাড়ি দিচ্ছে একটা। সান্ত্বনা মনে মনে অবাক হ'ল একটু। শ্রোতা পেলে ভুতুবাবু বক্তা ভালো জানে। কিন্তু সে বক্তৃতায় সব সময়েই আত্মগত বা স্বার্থগত সুর থাকে একটা। অথচ আজ প্রায় দুর্বোধ্য লাগছে। সান্ত্বনা শুনছে মন দিয়ে, সেটা বোঝাবার জন্যেই মাঝে মাঝে মুখ টিপে হাসছে একটু, আর সকৌতুকে চেয়ে আছে।

হাতপাখা হাঁটুর ওপর রেখে ভুতুবাবু অনর্গল বলে চলেছে। এবারের প্রসঙ্গ বোধ হয় আবহাওয়াগত।—বেজায় গরম পড়েছে, আবার এ সময়ে প্রচণ্ড জলও

হয়ে গেল বার দুই। জল হয়ে গেল অথচ গরম কমল না। আকাশ সারাক্ষণ মেঘে থম-থম, ওদিকে বাতাসের দেখা নেই। মড়াইয়ের সমস্ত বাতাস যেন পাহাড়ের ভিতর গিয়ে সেঁদিয়েছে। মড়াইয়ের সবই উল্টোপাল্টা ব্যাপার এখন। কখন যে কি হবে কিছু ঠিক নেই। কিছু একটা হবেই এ বছরটা, আকাশের দিকে চাইলেই বোঝা যায় কিছু হবে। মা-লক্ষ্মীর কি মনে হয়, হবে না কিছু?

জবাব এড়িয়ে সান্ত্বনা হাসে তেমনি।

—মড়াইয়ের মানুষগুলোও কেমন যেন উল্টোপাল্টা রাস্তায় চলেছে এখন। মা-লক্ষ্মী কি সেটা লক্ষ্য করেছে? করে নি তো? কিন্তু ভুতু লক্ষ্য করেছে। ভুতু দোকান নিয়ে থাকে সারাক্ষণ কিন্তু চোখ এড়ায় না কিছু। বাতাস শুঁকে হালচাল বলে দিতে পারে। না, মানুষগুলোও এখন সোজা রাস্তায় চলছে না ঠিক। সবাই নয়, কেউ কেউ। শরীরের কোথাও একটা ফুসকুড়ি হলে গোটা দেহে যন্ত্রণা। তেমনি কেউ-কেউ সোজা পথে না চললে সমস্ত পথই ঘুলোতে কতক্ষণ? দুনিয়ায় ভালো পড়ে আছে, মন্দও পড়ে আছে। যার সঙ্গে যার যোগ, তেমনি হবে। ওই যোগটুকু না হলে ভালো মন্দ কোনোটারই কোন দাম নেই। তীর আর ধনুক আলাদা পড়ে থাকলে তার পাশ দিয়ে হরিণ লাফিয়ে বেড়াবে—ও দুটো একসঙ্গে হলে তবেই না কিছু ঘটতে পারে।

সান্ত্বনার হাঁপ ধরে যাচ্ছে প্রায়, আর উপমার বহরে বিস্ফারিত হয়ে উঠছে থেকে থেকে।

—ওই অত বড় মেঘটার গায়ে হাওয়া লাগছে না বলেই না গরমে সেদ্ধ। আবার তেমন হাওয়া লাগলে প্রলয় হতে কতক্ষণ? যেমন যোগ তেমনি। কথার ঝোঁকে ভুতুবাবুকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে প্রায়।—শুকনো মড়াইয়ে ভালো যোগাযোগ ঘটেছিল বলেই ড্যাম হতে চলেছে। অমনি ভালো যোগাযোগ হলেই নিশ্চিন্দি। কিন্তু না হলে? উল্টো হলে? তখন? তখন সমঝে চলা ছাড়া আর উপায় কি? উল্টে যোগাযোগ কি হচ্ছে না? খুব হচ্ছে। যার সঙ্গে যার মেলার কথা নয় তার সঙ্গে সে মিলছে। যার সঙ্গে যার মেশার কথা নয় তার সঙ্গে সে মিশছে। ওই যেমন ধরুন, সাঁওতাল মাঝির ওই আধক্ষ্যাপা ছেলেটা আমাদের কনট্রাক্টার ঘোষবাবুর সঙ্গে এসে ভিড়েছে। ঘোষবাবুর পয়সায় মদ গেলে, তার জিপে করে ঘুরে বেড়ায় আর সকাল-সন্ধ্যে গুজগুজ করে। আমি নিন্দে কারু কচ্ছি না মা-লক্ষ্মী, দুজনে আলাদা আলাদা থাকলে নিন্দেরই বা কি ভয়েরই বা কি। কিন্তু দুজনে একসঙ্গে হয়েছে বলেই না মেয়েদের যত দুর্ভাবনা। সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির এখন তাদের বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে হলেই দশবার ভাবতে হবে। ঝড় এলে তার আর সময় অসময় কি, সব সময়ই সমঝে চলতে হয়। অবশ্য দশ পনেরো দিনের মধ্যেই ঘোষবাবু চলে যাচ্ছে মড়াই ছেড়ে—কিন্তু দশ পনেরো দিনই বা কি কম কথা? কখন কার বরাতে অভিশাপ লাগে ঠিক কি। পা বাড়িয়ে অভিশাপ কুড়োনোর থেকে ঘর-বন্দী হয়ে থাকাও ভালো। ভালো নয় মা-লক্ষ্মী? আপনিই বলুন—অভিশাপের ভয় কে না করে, অভিশাপের ভয়ে স্বয়ং অমন লক্ষ্মী ঠাকরুণকেই বলে সমুদ্দুরের গর্ভে আশ্রয়

নিতে হয়েছিল, হুঁঃ... !

মস্ত একটা দম নিল ভুতুবাবু। জোরে জোরে হাতপাখা চালালো কিছুক্ষণ। ঘামে জবজবে হয়ে গেছে থলথলে মুখ।

কার অভিশাপে বা কোন অভিশাপের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে বন্দিনী দশা ঘটেছিল লক্ষ্মী ঠাকরুণের, ভুতুবাবু যেমন জানে, সান্ত্বনাও তেমনি জানে প্রায়। কিন্তু সবটুকু শোনার সঙ্গে সঙ্গে নিস্পন্দ কাঠ একেবারে। কি বলতে চায় বা কি বলতে এসেছে আর অস্পষ্ট নয় একটুও। স্থান কাল ভুলে বিমূঢ়নেত্রে সান্ত্বনা চেয়ে রইল ভুতুবাবুর মুখের দিকে।

ভুতুবাবু হাসতে চেষ্টা করল এতক্ষণে।—যাক, অনেক গল্প করা গেল মা-লক্ষ্মী। মন খুলে দুটো কথা বলি তার জো আছে, দোকানের ভাবনা ভেবেই অস্থির। তা বলে গল্প করতে বসলে ভুতুর মনে আগল নেই, যা ভাববে তাই বলবে! চলি এবার মা-লক্ষ্মী, ওই ভূত দুটো এতক্ষণে কি দিয়ে কি করছে ঠিক নেই—ভালো করে গেলাস না ধুয়েই হয়তো চা দিয়ে বসেছে কাউকে...।

থপ-থপ চরণে তরতর করে পাহাড় থেকে নেমে আসছে ভুতুবাবু। এবারের ঘাম ঝরাটা কায়িক পরিশ্রমের দরুন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা মুখে একটা প্রসন্নতার তৃপ্তি।

গোটা হৃৎপিণ্ডটাই হঠাৎ বুঝি স্তব্ধ হয়ে গেছে সান্ত্বনার। লজ্জা নয়, ঘৃণা নয়। অনুভূতিশূন্যতা। সেটা গেল একসময়। ভুতুবাবুর কথাগুলো তলিয়ে ভেবে দেখতে লাগল আবার। আরো স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করল। বরাবরই ভয় করত হোপুনকে। কিন্তু সে ভয়ের মধ্যে আর যাই থাক, অবিশ্বাস ছিল না। দুর্বোধ্যতার বিস্ময় ছিল, সম্ভ্রমের শুচিতা ছিল। ওই কালো মূর্তিতে কালিমার আভাসমাত্র দেখে নি কখনো। কিন্তু আজ এক মুহূর্তে সব বিশ্বাস সব সম্ভ্রম এক নগ্ন পঙ্কিলতার স্পর্শে একেবারে বিকৃত হয়ে গেল বুঝি। জিপে রণবীর ঘোষের পাশে হোপুনের সেই নিশ্চল পাষাণ মূর্তি ভেসে উঠল চোখের সামনে। শুধু ভুতুবাবু কেন, সান্ত্বনাও দেখেছে। শিউরে উঠল। মড়াইয়ের গহ্বরে বা সুন্দরীর অপরাহ্ণ রোমন্থনের পরিবেশে লোকটার সেই বিসদৃশ চাউনি, বিসদৃশ আচরণের মধ্যে আজ যেন বিভীষিকা দেখতে পেল।

কিন্তু সেদিনই আর একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সান্ত্বনা আরো বিহ্বল, আরো বিভ্রান্ত।

বিকেলে পাগল সর্দার এসে হাজির। চাঁদমণি নিখোঁজ হবার পরে এতদিনের মধ্যে এই প্রথম পদার্পণ। ভাবনা-চিন্তা স্থগিত রেখে সান্ত্বনা এগিয়ে এলো। কিন্তু খুশির অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠতে পারল না আগের মত।

খানিক তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সর্দারই কুশল প্রশ্ন করল প্রথম, তু ভালো আছিস দিদিয়া?

ভালো আছি সর্দার। তুমি ভালো তো? এসো ভেতরে এসো।

সর্দার দাওয়ায় এসে বসল। অদূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সান্ত্বনা। দেখছে। আরো শীর্ণ শুকনো দেখাচ্ছে লোকটাকে। বার্ধক্যের স্পষ্ট ছাপ পড়েছে।

কিন্তু সব থেকে আগে চোখে পড়ে একটা কর্কশ রুক্ষতা। কোটরাগত দুই চোখে খরখরে অসহিষ্ণুতা কেমন। চোখে চোখ রাখাও সহজ নয় খুব।

উবাসির বাবু ঘরে নাই?

এখনো ফেরেন নি। তুমি কাজ থেকে এলে?

সর্দার ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ কাজে যায় নি আজ। অন্য দিন বা অন্য সময় হলে সান্ত্বনা এই নিয়ে পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করত বা অনুযোগ করত। কিন্তু ভুতুবাবু ওকে বোবা করে দিয়ে গেছে একেবারে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। মনে হ'ল, পাগল সর্দার এতদিন বাদে হঠাৎ এমনি আসে নি, কিছু যেন বলবে বলবে করছে।

তু ব'স দিদিয়া, দাঁড়িন থাকলি কেনে?

সান্ত্বনা দেয়াল ঘেঁষে বসল উবুড় হয়ে। দেয়ালে ঠেস দিল তার পর।

সর্দার আবার বলল, তুর সঙতে দুটো কথা ছেল।

দু'টো ছেড়ে আস্তে-ধীরে অনেক কথাই বলতে লাগল তার পর। অনেকটা নিজের মনে। সান্ত্বনা চুপচাপ চেয়ে আছে। শুনছে। আর অবাক হচ্ছে। ভুতুবাবুর গোড়ার দিকের বক্তৃতার মত এও প্রায় দার্শনিক গোছের শোনাচ্ছে। তবে অত ঘুরিয়ে বা রেখে ঢেকে বলতে জানে না। যা বলে মোটামুটি সোজা এবং স্পষ্ট।—কত যুগ বাদে মড়াইয়ে পুণ্যির যুগ এসেছে। সেই পুণ্যিতে শুকনো মড়াইয়ে জল হবে। কিন্তু সেই পুণ্যির সঙ্গে কিছু পাপও এসেছে। 'মুনিষের মূর্তিতে' পাপ এসেছে, পুণ্যিকে 'খুঁতো' করে দেবার মতলব আঁটছে। গোটা 'গেরামে' সে পাপের হলকা লেগেছে, গোটা মড়াইয়ে সে পাপের 'ছেঁয়া' পড়েছে। কিন্তু ওরা 'ধম্ম' মানে 'শাস্ত' মানে। যত 'ভেষণ' যত 'পেচণ্ড' হোক সে পাপ, তার 'পিতিবিধেন' হবেই, 'মিত্যু' হবেই। কিন্তু যতক্ষণ না তা হচ্ছে ততক্ষণ হুঁশিয়ার থাকা দরকার। খুব দরকার। নইলে 'রনথ' হতে পারে, 'দুগগতি' হতে পারে। পাগল সর্দার সেই জন্যেই এসেছে, দিদিয়াকে সাবধান করতে এসেছে। হোপুন বলেছে। হোপুন কখনো বাজে কথা বলে না—'তু আতবিরেতে একা কুথাও যাস না দিদিয়া, দিনদুকুরেও না। ও পাপ বড় স্যায়না, চি-লোকের দিকে তার লজর।' পাপ 'নেবারণ' হয়ে গেলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, আবার সকলে হেসেখেলে বেড়াবে। পাপে 'আশ্চয়' আর ক'দিন? 'ভগবানের কোধে' সে ছারখার হবেই হবে।

অনুচ্চ একটানা বলে গেল পাগল সর্দার। ঠাণ্ডা একটা যান্ত্রিক রেশে খানিকক্ষণ যেন আচ্ছন্ন হয়ে রইল সান্ত্বনা। সচকিত হয়ে তাকালো তার পর। হোপুন বলেছে! হোপুন সাবধান করেছে। সান্ত্বনা ঠিক শুনল কি? ঠিক বুঝল কি? সে যে নিজের চোখে দেখেছে তার বিসদৃশ চাউনি, বিসদৃশ আচরণ। নিজের চোখে দেখেছে তাকে জিপে রণবীর ঘোষের পাশে। তাছাড়া ভুতুবাবুও দেখেছে। অনেক কিছুই দেখেছে। পরোক্ষে ওই লোকটার ত্রাসই ভুতুবাবু বিশেষ করে ছড়িয়ে রেখে গেছে ওর মনে।

কিন্তু বলতে গিয়েও বলা হ'ল না কিছু। বিমূঢ় নেত্রে চেয়েই রইল শুধু। কেমন করে যেন উপলব্ধি করে নিল, ওই লোকটার সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের আঁচে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে পাগল সর্দারের সমস্ত ভিতরটা। শোনামাত্র মরীয়া হয়ে ছুটবে

ভুতুবাবুর কাছে, ছুটবে হোপুনের কাছে। হোপুন দু'দুবার প্রাণ দিয়েছে ওকে, ওর সহ্য হবে কেমন করে? মেয়ে হারিয়ে আরো নিবিড় করে পেয়েছে ওকে, কেমন করে হবে সহ্য?

কিন্তু হোপুনই বা সর্দারকে বলতে গেল কেন? সর্দারের মুখ দিয়ে দিদিয়াকে সাবধান করতে গেল কেন?

ছলনা? চাতুরী? ষড়যন্ত্র?

সান্ত্বনা বোবা। পাগল সর্দার উঠলে বাঁচে এখন। নিঃসঙ্গ হতে পারলে বাঁচে। হোপুনের প্রশ্নটা বড় নয় এখানে। বড় যেটা, তার লজ্জা আর ধিক্কার অপরিসীম।

কেন এসেছিল ভুতুবাবু?

ওকে সাবধান করতে।

কেন এসেছে পাগল সর্দার?

ওকে সাবধান করতে।

দুজনের কেউ ওর কথা বলে নি বিশেষ করে। সাধারণ ভাবে বলেছে। সাধারণ ভয়ের কথাই বলেছে। সে ভয় মড়াইয়ের সব মেয়েরই। কিন্তু এরই মধ্যে বিশেষ ইঙ্গিতটুকু অপ্রচ্ছন্ন নয়। সান্ত্বনা বুঝতে পারে কাকে নিয়ে দুজনেরই ভয় এদের। অন্যথায় ভুতুবাবুর মত মানুষ দোকান ফেলে আসত না। পাগল সর্দারের বুকে আবার এক মেয়ে হারানোর ঝড় উঠত না।

চোখে চোখ পড়তেই নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ দু চোখ যেন ছল ছল করে উঠল সান্ত্বনার।

সর্দার চলে গেল।

সান্ত্বনা উঠল একসময়। সমস্ত দে'' বিষাক্ত জ্বালা। অশুচি স্পর্শ। দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়াল চুপচাপ। দেয়ালের ধারে আকাশ দেখা যাচ্ছে এক ফালি। আকাশ নয়, আকাশ ঢাকা ঘন মেঘ খানিকটা। হঠাৎ মনে হ'ল, চাঁদমণির জীবনেই বীভৎস শকুনির ছায়া পড়ে নি শুধু। সমস্ত মড়াইয়ের ওপর পড়েছে। ওর ওপরেও। মন মেঘের তলা থেকে পড়ন্ত সূর্যের লাল আভা যেন ঠিকরে বেরুতে চাইছে খানিকটা জায়গা জুড়ে। দগদগে একটা ঘায়ের মত লাগছে দেখতে।

রাত্রিতে বাবার কাছে সরাসরি প্রস্তাব করল কালই মাসির বাড়ি যাবে, তাকে রেখে আসতে হবে।

অবনীবাবু অবাক। মুখের দিকে চেয়ে একবারও মনে হ'ল না বোনের বিয়ের আনন্দে যাবার জন্য মন নেচে উঠেছে। বললেন, বেশ তো যাবি'খন, এত তাড়া কিসের, বিয়ের তো এখনো ঢের দেরি।

না বাবা, যাব ঠিক করেছি—কালই যাব, তুমি রেখে এসো আমাকে। কতকাল যাইনে, মাসি কি ভাবছে ঠিক নেই, এর পর দেরি করলে কথা শুনতে হবে। ক'দিন আগে যাওয়াই ভালো।

মেয়ের এ ধরনের সুমতি বিস্ময়ের কারণ। মুখের দিকে চেয়ে বুঝে উঠলেন না ঠিক। কিন্তু এই এক বেলার মধ্যে ওর মনে বিশেষ কিছু একটা পরিবর্তন ঘটেছে

সুস্পষ্ট। কিছু একটা যাতনা যেন চেপে আছে। তবু জিজ্ঞাসাবাদ করতে ভরসা পেলেন না খুব। ওর যাওয়া নিয়ে তাঁরই বরং দুর্ভাবনা ছিল। ভেবেছিলেন যেতে চাইবে না সহজে। গেলেও থাকতে চাইবে না। যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে যখন, মতিগতি বদলাবার আগে রাজী হওয়াই ভালো। তবু বললেন, আগে যাওয়া তো ভালই, কিন্তু কালই কি করে হয়, অফিস থেকে ছুটি নিতে হবে তো, পরশু যাস।

না বাবা না, প্রায়ই অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সান্ত্বনা, যাব তো কালই যাব নইলে যাবই না বলে দিলাম। ভারি তো একদিনের ছুটি, ও তুমি কাল সকালে গিয়ে ব্যবস্থা করে এসো।

ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো। বাবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত হচ্ছিল। ভিতর থেকে একটা উদ্‌গত কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সকলের ওপর ক্ষোভ সকলের ওপর অভিমান। যেতে চায় না তবু যেতে হবে বলে। কারো ওপর ভরসা করে এখানে থাকতে পারছে না বলে।

রাত্রির মধ্যেই গোছগাছ করল সব। নিজের নয়, যিনি থাকবেন এখানে তাঁর। ওর বাবার। বাক্স-বিছানা জামা-কাপড় থেকে কুকার পর্যন্ত। নিজের ব্যবস্থায় অনভ্যস্ত নয় তার বাবা। থেকে থেকে তবু টন টন করে উঠছে সান্ত্বনার ভিতরটা। ভয়ে সব ফেলে-ছড়িয়ে এভাবে এখান থেকে পালাতে হচ্ছে....।

পরদিন সকাল থেকেই মনে মনে একটা আশা পোষণ করেছিল সান্ত্বনা। বাবার মুখে নরেনবাবু তাদের যাবার কথা শুনবে। শুনে একবার আসবে। সেই যে গেছে আর আসে নি। সাত আট দিন হয়ে গেল। লজ্জার সীমা পরিসীমা ছিল না এ ক'দিন। সেদিনের কথা যখনই মনে হয়েছে, লাল হয়ে উঠেছে সান্ত্বনা। কি করে এর পর ভদ্রলোককে মুখ দেখাবে ভেবে পায় নি। কিন্তু আজ ভাবছে অন্য কথা। আসুক। পারতপক্ষে ও কথাই বলবে না। ওকে যেতে হচ্ছে বলে ক্ষোভ আর অভিমান তার ওপরেই বেশি যেন। কথা বলবে না কথার জবাব দেবে না—তবু আশা করছে। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ছে আরো এক জনকে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলিকে।

ছোকরা চাকরকে দশবার করে সুন্দরীর সম্বন্ধে আর বাড়ির সম্বন্ধে সব ব্যবস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। একটু এদিক ওদিক হলেই বাবার কাছ থেকে সে খবর পাবে, সে কথাও বার বার করে সমঝে দিচ্ছিল। এমন সময় বাবা ফিরলেন।

সঙ্গে আর কেউ না।

এখান থেকে দশ বারো মাইল দূরে স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেন। স্টেশন পর্যন্ত ট্রাক যাবে। আপিসের ট্রাক নিয়েই এসেছেন অবনীবাবু।

ট্রাক মেন কোয়ার্টারসএ পড়তেই উৎসুক নেত্রে চারদিকে তাকালো সান্ত্বনা। নিচে নামছে ট্রাক। মড়াই দেখা যায়। মড়াইয়ের কর্মস্রোত দেখা যায়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে একটা কান্না যেন গুমরে উঠতে লাগল। ইচ্ছে হ'ল চিৎকার করে বলে, ট্রাক থামাতে বলো বাবা, আমি যাব না।

নিশ্চল বসে রইল মূর্তির মত।

ওই ভুতুবাবুর দোকান দেখা যাচ্ছে....গোলগাল লোকটা বসে আছে ক্যাশ বাক্স

সামনে নিয়ে। সাগ্রহে সান্ত্বনা আবার তাকালো সেদিকে। ট্রাক থামিয়ে তার সঙ্গে অন্তত দেখা করবে একটিবার। দেখা করে বলবে, ভুতুবাবু আমি চলে যাচ্ছি এখান থেকে। ভুতুবাবুর টাকার লোভ। ভুতুবাবুর দোকানে সব কিছুর দাম বেশি কিন্তু সান্ত্বনার মনে হ'ল, ভুতুবাবু ভারি আপন লোক তার। এই মুহূর্তে এত আপন বুঝি আর কেউ নয়। তার মা-লক্ষ্মী ডাকটা আর একবার শুনে গেলে হয় না?

ট্রাক ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে গেল।

সান্ত্বনার মনে হ'ল আর কিছুই থাকল না। নিজের অজ্ঞাতে চোখে জল এসেছে কখন টের পায় নি। বাবার কথায় সচকিত হ'ল। অনেকক্ষণ ধরেই নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিলেন তিনি।—কি হ'ল বল্ দেখি? এভাবে সাত তাড়াতাড়ি কে তোকে আসতে বলেছিল?

সান্ত্বনা বাইরের দিকে ঘুরে বসল প্রায়।

না যাস তো বল্, গাড়ি ঘোরাতে বলি।

সান্ত্বনা ঘাড় নাড়ল, না—

এইটুকু তো পথ এখান থেকে, ভালো না লাগলে চলে আসতে কতক্ষণ। ক'টা দিন আর, বিয়েটা হয়ে গেলে যখনই লিখবি আমি গিয়ে নিয়ে আসব'খন—মন খারাপের কি আছে।

ভিজে চোখেও সান্ত্বনা বাবার দিকে ফিরে না চেয়ে পারলো না। ঠিক এই মুহূর্তে এই সান্ত্বনাটুকুই মস্ত সম্বল যেন।

সকালে দোকানে এসে ভুতুবাবুর চক্ষু স্থির। ঘরের দরজা হাঁ করা খোলা। লোক নেই। সমস্ত ঘর জলে জলমগ্ন। জলে কাদায় সপ সপ করছে মেঝে। জলের ড্রামের মুখ খোলা, ড্রাম প্রায় খালি। ত্রস্ত চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখে নিল ভুতুবাবু। আসবাব তছনছ হয়ে আছে। কিন্তু যায় নি কিছু, সবই আছে। এমন কি খোলা দরজার গায়ে তালাচাবিও ঠিকঠাক ঝুলছে। কিন্তু ঘরের দুর্দশা দেখে রাগে দুঃখে ভুতুবাবুর চোখে জল আসার উপক্রম। নিশ্চয় ওই দুজনের একজন মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে এমন যে, অন্যজনকে ঘড়া ঘড়া জল ঢালতে হয়েছে মাথায়।

নিজের মনে সমানে গালাগাল দিয়ে চলল ভুতুবাবু। সাতপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল দুজনেরই। আর কক্ষনো ঘর ছাড়বে না, এই শেষ। মিয়াদ শেষ হতে এখনো সাত আট দিন বাকী। এই সাত আট দিনের টাকা সে ফেরত দেবে। ওই মড়াচোখো ডাকাতটাকে বলতে পারবে না কিছু। বলা নিরাপদও নয়। কিন্তু রণবীর ঘোষকে বলবেই। বলবে আর টাকা ফেরত দেবে। দু'তিনটে দিন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পেরেছিল ভুতুবাবু। সান্ত্বনার সঙ্গে দেখা করে আসার পর থেকেই আর চিন্তা-ভাবনা ছিল না। গাছতলার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আর দেখেওনি মাতাল দুটো কি করছে না করছে। মনে মনে ভেবেছে, ওরকম মোটা টাকা পেলে পনেরো দিন ছেড়ে এখন আরো পনেরো দিনের জন্য ছেড়ে দিতে পারে ঘর। কারণ আসল উদ্দেশ্যে ওদের ছাই দিয়ে এসেছে।

কিন্তু আবার? মিয়াদ বাড়ানো দূরের কথা, এই বাকি সাত দিনও দেবে না

সে থাকতে। এরকম মাতালের পাল্লায় পড়লে সর্বস্বান্ত হতে কতক্ষণ!

ঘর-দোর সংস্কার হ'ল। দৈনন্দিন দোকানপর্ব। সকাল গেল, দুপুর গড়ালো বিকেল পেরুল। সন্ধ্যা। তারপর রাত্রি। উষ্ণতা কমছে ভুতুবাবুর। কড়া কথা বলতে গেলে কি হতে কি হবে কে জানে। বরং বুঝিয়ে-সুজিয়ে বলবে রণবীর ঘোষকে। আর যেন দোকানপাট খোলা রেখে দুজনেই চলে না যায় ওরকম। আর, ঘরের দুরবস্থা না করে। তবু যত রাত বাড়ছে তত অস্বস্তি বাড়ছে। ছোকরা চাকর দুটোকে আজ আর ছাড়ে নি। বুঝিয়ে বলতে গেলেও অনর্থ বাধবে কি না বিশ্বাস কি।

রাত বাড়ছে। মড়াই নিস্তব্ধ নিঝুম আবার। কিন্তু দুজনের একজনেরও দেখা নেই। না রণবীর ঘোষের, না হোপুনের। কি করবে ভুতুবাবু বুঝে উঠছে না। কখন চৌদ্দ মাইল সাইকেল ঠেঙিয়ে বাড়ি যাবে এর পর? চাকর দুটোকেই বা আর কতক্ষণ ধরে রাখবে? বসে বসে ঝিমুচ্ছে ওরা। ঝিমুনি আসছে ভুতুবাবুরও। সমস্ত দিনের পরিশ্রম আর ক্লান্তি।

হঠাৎ উঠে বসে দু চোখ রগড়াতে লাগল ভুতুবাবু। বিস্ময়, বিভ্রম। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল চারিদিকে। না ঠিকই দেখছে। সকাল হয়েছে। পাখি ডাকছে দূরে। মুরগী ডাকছে কোথায়। চাকর দুটো মেঝেতে পড়েই ঘুমুচ্ছে অঘোরে।

কি কাণ্ড! খাটিয়া থেকে নেমে ভুতুবাবু গজগজ করতে লাগল আবার। চাকর দুজনকে ডেকে তুলল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে কেউ না আসার দরুন মনে মনে খুশি হবে কি হবে না ঠিক বুঝে উঠছে না।

সেদিন রাত্রিতেও এল না কেউ। তার পরদিন শুনল, রণবীর ঘোষ পাততাড়ি গুটিয়েছে মড়াই থেকে। যে কোনদিন চলে যেতে পারে শুনেছিল। তবু যথার্থ গেছে জেনে ভুতুবাবু খুশিতে আটখানা। আর ঘর ছাড়তে হবে না, টাকাও ফেরত দিতে হবে না।

একদিন একদিন করে দেড়মাস কেটে গেল মাসির বাড়িতে।

যত খারাপ লাগবে ভেবেছিল সান্ত্বনা, প্রথম প্রথম তত খারাপ লাগে নি। এক আচমকা ত্রাসের বিভীষিকা থেকে ঢালা নিশ্চিন্ততার মধ্যে এসে দিনকতক বরং হাঁফ ফেলে বেঁচেছিল। তাছাড় হঠাৎ সে এসে পড়ায় বিয়ে-বাড়িও জমে উঠেছিল অনেক আগে থেকেই।

বিয়ের মেয়ে মাসতুত বোনের মুখ খুলেছে আরো। এখন আর আভাসে ইঙ্গিতে ঠাট্টা নয়। সান্ত্বনাকে একলা পেয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছে, তোমার সেই নরেনবাবুর খবর কি সানুদি?

আগের মত সান্ত্বনা আর ভেতরে ভেতরে উত্যক্ত হয় নি এতটুকু। বরং হাসিঠাট্টার এদিকটাকে যেন মেনে নিয়েছে খুশি মনে। উল্টে টিপ্পনী কেটেছে, সে খোঁজে তোর দরকার কি, তুই বরং তোর গঙ্গারামবাবুর খোঁজখবরটা ভালো করে নেওয়া শেষ কর আগে।

ভাবী জামাইয়ের নাম শুনেছে গঙ্গাপদ।

তারপর বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে-বাড়ি শান্ত হয়েছে আবার। মাসতুত বোন শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। দিন কাটছে একটা দুটো করে। এবারে যেন একটু একটু করে হাঁপিয়ে উঠছে সান্ত্বনা।

অবনীবাবু আগেও একদিন এসেছিলেন। বিয়ের দিনও এসেছেন। কিন্তু খুব বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করার অবকাশ তেমন পায় নি সান্ত্বনা। তবু এরই মধ্যে পাঁচবার করে সুন্দরীর খোঁজ করেছে। বাবার সুবিধে অসুবিধের কথা জিজ্ঞাসা করেছে। পাগল সর্দার, ভুতুবাবু, এমন কি নিধুরামের প্রসঙ্গও তুলেছে। কিন্তু তার পর বোবা।

বাবার চিঠিপত্র পায়। মোটামুটি সংবাদও। কিন্তু তাতে মন ভরে না। মড়াইয়ের পাহাড় ধূসর মেঘের মত দেখা যায় এখান থেকে। চেয়ে থাকে। মড়াই যেন ডাকছে তাকে। ক্রমাগত ডাকছে।

সুন্দরী কি করছে এখন? ভরা দুপুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঝিমুচ্ছে নিশ্চয়। ছোকরাটার হাতে ওর কি হাল হয়েছে কে জানে? বাবাকে ফাঁকি দিতে আর কি?....পাগল সর্দার কি জানে ও চলে এসেছে? আর ভুতুবাবু? নরেনবাবু জানেই।...কিন্তু কি ভাবছে? আর যদি ফিরে না-ই যায় সান্ত্বনা ওখানে, তাহলে? তাহলে যে কি নিজেও উপলব্ধি করতে পারছে না। কিন্তু সংগোপনে চেষ্টা করছে অনুভব করতে।..আর সেই ভদ্রলোক? চিফ ইঞ্জিনিয়ার? সে কি টের পেয়েছে ও ওখানে নেই? মড়াইয়ে সেই থেকে আর দেখা যায় নি ওকে, লক্ষ্য করেছে? করে থাকলেও বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না নিশ্চয়ই। ইচ্ছে থাকলেও করবে না—চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দেমাকে বাধবে। ভারি তো...মানুষ খুব চিনেছে সান্ত্বনা তবে, নরেনবাবুর কাছে জেনে থাকতে পারে বা নিধুর মুখেও শুনতে পারে। সচকিত হয়ে ভাবনার লাগাম থামিয়ে নিজেকেই চোখ রাঙায় এক-একসময়। কি লাভ এসব জেনে? হেসেও ফেলে আবার নিজের মনেই। লাভ-লোকসান আবার কি? জানতে ইচ্ছে করছে তো করছে, ব্যস—

অবনীবাবু আবার একদিন এলেন মেয়েকে দেখতে। বিয়ে-বাড়ি এখন একদম ফাঁকা। বাবাকে এবার অনেকটাই নিরিবিলিতে পেল সান্ত্বনা।

সেই ভেজাল সিমেন্টের কি হ'ল বাবা, সব মিটে গেছে?

জবাবে অবনীবাবু জানালেন, গোলযোগের সম্ভাবনা বরং বেড়েছে। কলকাতা থেকে বে-সরকারী কমিটি আসবে ড্যাম দেখতে। তারা ড্যাম দেখবে আর সেই সঙ্গে সিমেন্টের ব্যাপারও ফয়সালা করে যাবে। এই সব কিছুর তলায় তলায় ঘোষ-চাকলাদারের কারসাজি কিছু আছে বলেই অবনীবাবুর ধারণা। অবশ্য কবে পর্যন্ত আসবে কমিটি ঠিক নেই কিছু।

বাবার মুখের ওপর সান্ত্বনার দু চোখ ঘুরে এলো এক চক্কর।—ওই কনট্রাক্টাররা এবারে খুব উঠে পড়ে লেগেছে বুঝি?

তা লাগবেই তো, যার যেখানে স্বার্থ। ওদের একজন এখানে আছে আর একজন তো সেই সব কাণ্ড করে কবেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

সান্ত্বনা অবাক। কাণ্ড করে! কই সে তো কিছুই জানে না! বাবার মুখের

ওপর আর একপ্রস্থ বিচরণ করে স্থির হ'ল দু চোখ। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, দুজনের কে আছে ওখানে?

ঘোষের পার্টনার—দ্বিজেন চাকলাদার।

সন্তর্পণে একটা রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল যেন। শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল আবার, আর ওই লোকটা কি করে গেছে বলছিলে....?

একটু থমকে গেলেন অবনীবাবু। বিব্রত মুখে তাকালেন মেয়ের দিকে। খেয়াল হ'ল, সান্ত্বনা আগেই মাসির বাড়ি চলে এসেছিল বটে, জানার কথা নয়। দু'চার কথায় সমাচার যা বললেন, শুনে কিছুক্ষণের জন্য সান্ত্বনার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেল যেন। রণবীর ঘোষ মড়াই ছেড়ে গেছে সেও প্রায় মাস দেড়েক হ'ল, সান্ত্বনা চলে আসার পরেই। ঠিক তার তিন দিন বাদে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের মেয়ে ঝরনা নিখোঁজ হয়েছে। আজ পর্যন্ত তার কোন খবর নেই। মড়াইয়ে এই নিয়ে মন্দ গণ্ডগোল হয় নি। কলকাতায়ও খোঁজখবর করা হয়েছে অনেক। দুজনের কারো পাত্তা মেলে নি। এমন কি দ্বিজেন চাকলাদারও রণবীর ঘোষের কোন হদিস দিতে পারেননি। হয়তো বা জেনেও ইচ্ছে করেই দেননি।

আত্মস্থ হওয়া মাত্র সান্ত্বনা চলে এলো বাবার সুমুখ থেকে। যা শুনল দুঃখের কথা, লজ্জার কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর ভিতরের একটা কালো ত্রাসও যেন অপগত। লোকটা বিদায় হয়েছে। আর হয়তো মড়াইয়ে আসবেও না। ঝরনার জন্য দুঃখ করবে? করা উচিত। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে না, ও তার কি করবে? বরং হঠাৎ এক মুক্তির আনন্দ উপচে উঠছে। সেটা গোপন করার জন্যই বাবার কাছ থেকে চলে আসা। দেড় মাস মড়াই ছেড়ে এসেছে। দেড় মাস? দেড় বছর। দেড় যুগ।

পরদিন বাবার সঙ্গে মড়াইয়ে রওনা হ'ল সে। মাসি অবাক, বাবা অবাক। প্রথমবারেও যেমন কেউ ধরে রাখতে পারে নি ওকে, এবারেও কারো নিষেধ বা অনুরোধে কান দিল না।

...মড়াই।

দূর থেকে চোখ পড়ামাত্র উচ্ছল আনন্দে ট্রাকের ধারে ঝুঁকে পড়ল প্রায়। ছেড়ে আসার সময় মনে হয়েছিল ভিতরটা বোবা শূন্যতায় ভরে উঠেছে। আজ তার উল্টো। এত আনন্দ ধরছে না। নির্নিমেষে দেখছে। এই দেড় মাসের পরিবর্তন যাচাই করে নিচ্ছে। এ সৃষ্টি-সমারোহে দেড় মাস দেড় পলকের মতই। তার ওপর শুনেছিল, অসময়ে প্রায়ই বৃষ্টি হওয়ার দরুনও কাজ-কর্মে ছেদ পড়েছে। তবু যাও হয়েছে তাই উপলব্ধি করার একাগ্রতায় উন্মুখ হয়ে উঠল। পারলে আজই একবার মড়াইয়ে নামে। কিন্তু বাবা তাহলে দেবে'খন। ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ কৌতুকে বাবাকে একবার দেখে নিল।

অফিস কোয়ার্টারস।

উৎসুক চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সান্ত্বনা। কিন্তু এই ভরা দুপুরে কে আর বাইরে বসে আছে? ওই দূরে কোণের ঘরটা একজনের। আর উঠোনের এদিকেরটা আর একজনের। ঘরে বসে কাজ করছে না মড়াইয়ে নেমেছে কে জানে। মনে মনে

লজ্জা পেল একটু। ভিতরে ভিতরে ভাবছে কি না, সে যে এসেছে যদি ওই দুজনকে এক্ষুনি জানানো যেত।

ভুতুবাবুর দোকান।

বাবা, ট্রাক থামাতে বলো একবারটি। এই, থামাও একটু। নিজেই বলে উঠল ড্রাইভারের উদ্দেশে। অবনীবাবু কিছু বলার বা বোঝার আগেই গাড়ি থামল এবং সান্ত্বনা নেমে পড়ল।

তুমি ট্রাক নিয়ে বাড়ি চলে যাও বাবা, আমি আসছি একটু বাদেই।

অন্তর্ধান। অবনীবাবু দেখলেন, মড়াইয়ে প্রথম আসার আগে যা ছিল, রাতারাতি তার থেকেও যেন মেয়ের বয়স কমে গেছে অনেক।

মা-লক্ষ্মী।

খালি গায়ে কাঠের ক্যাশবাক্সের সামনে বসে ঝিমুচ্ছিল ভুতুবাবু। সহসা চোখের সামনে তার আবির্ভাবে বিস্ময় আর আনন্দে উদ্ভাসিত। দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসতে লাগল সান্ত্বনা।

এস মা-লক্ষ্মী, এসো। জিব কাটল, আসুন মা-লক্ষ্মী আসুন—বসুন—কবে এলেন ?

সান্ত্বনা হালকা জবাব দিল, এখনো ভালো করে আসি নি, ট্রাক থেকে এখানে নেমে পড়েছি।

উঠে ভুতুবাবু একমাত্র টিনের চেয়ারটা ঝেড়েমুছে বসতে দিল।—ভুতুর ভাগ্য, বসুন মা-লক্ষ্মী, ওরে এই ছোঁড়ারা, চা কর না ভালো করে, বেশ করে সাবান-জলে গেলাস ধুয়ে নিস্ আগে।

হুকুম দিয়ে হৃষ্ট বদনে ক্যাশবাক্সের সামনে সমাসীন হ'ল আবার, আপনি ছিলেন না এতদিন, গোটা মড়াই অন্ধকার।

সান্ত্বনা মুখ টিপে হাসছে তেমনি। কোনদিনই খারাপ লাগে নি, আজ তো কথাই নেই।

বোনের বিয়ে হ'ল ?

মাথা নাড়ল।

মাসির বাড়ি এবং বোনের বিয়ের খবরাখবর নিতে লাগল ভুতুবাবু। সংক্ষেপে একটা ফিরিস্তি দিয়ে সান্ত্বনা জিজ্ঞাসা করল, তার পর এখানকার সব খবর বলুন।

পা গুটিয়ে আঁটসাট হয়ে বসল ভুতুবাবু।—খবর খুব ভালো মা-লক্ষ্মী, কিছু গণ্ডগোল নেই আর, খালি জল-বিষ্টি একটু বেশি হচ্ছে এই যা। এদিক ওদিক চেয়ে কণ্ঠস্বর একেবারে সমে নামিয়ে আনল হঠাৎ, সেই যে সেই বলেছিলাম মা-লক্ষ্মী, মনে আছে ? আপদ বিদেয় হয়েছে একেবারে, আর আসতে হচ্ছে না বাছাধনকে—যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন গা-ঢাকা—তিন দিন বাদেই ওদিকে আর এক মেয়েও মড়াই থেকে একেবারে যেন উবে গেল—চ্যাটার্জী সাহেবের সেই মেয়েটা মা-লক্ষ্মী—সাট ছিল আগের থেকেই, বুঝলেন না ?

সান্ত্বনা বুঝেছে আগেই। বুঝে চায়ের গেলাসে মনোনিবেশ করেছে।

তেমনি নিচু গলায় সোৎসাহে বলে গেল ভুতুবাবু, সে এক হৈ-হুলুস্থুল ব্যাপার

মা-লক্ষ্মী, ওই তো শরীর ভদ্রমহিলার, নড়তে চড়তে কষ্ট, তায় আবার সেজেগুজে থাকেন অষ্টপ্রহর—তা কোথায় গেল সাজপোশাক কোথায় কি—দিনে সাত বার করে ওই দেহ নিয়ে ওপর নিচ করা—যাকে দেখেন তার কাছেই কি কান্না কি কান্না—আমার মেয়েকে খুঁজে বার করে দাও তোমরা— তা খুঁজতে কি বাকি ছিল কোথাও। কোলকাতায় পর্যন্ত ঝেঁটিয়ে খোঁজা হয়েছে—ভদ্রমহিলার কথা ভাবলে রীতিমত কষ্ট হয় এখন।

মুখের দিকে চেয়ে কষ্টের কোন লক্ষণ দেখল না সান্ত্বনা। মহিলা, অর্থাৎ ঝরনার মায়ের দুঃখ ওর মনেও যে রেখাপাত করল খুব, তাও নয়।

বাড়ি ফিরেই সুন্দরী-দর্শনে গোয়ালঘরে ঢুকল সর্বাগ্রে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল আগে। অনেক দিনের অদর্শনের পর মা যেমন করে ছেলেকে দেখে। গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। মাথা নেড়ে শিং দুলিয়ে প্রকাশ করতে লাগল গোরুটা। সান্ত্বনার মনে হ'ল, আনন্দ করছে আর সেই সঙ্গে অভিমানও জানাচ্ছে।

পরদিন কথায় কথায় বাবার মুখে শুনল, নরেনবাবু নেই এখানে, আপিসের কি কাজে কোলকাতায় গেছে পাঁচ-সাত দিনের জন্য। ভালো লাগল না। এ ক'দিনে ওর আসাটাই খানিকটা পুরানো হয়ে যাবে।

দুপুরে বাইরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে সান্ত্বনা মড়াইয়ের উদ্দেশে পা চালিয়ে দিল। এরই প্রতীক্ষায় ছিল। দিনটাও ভালো। মেঘলা, ছায়া-ছায়া।

কাল লক্ষ্য করে নি। কিন্তু উপর থেকে আজ মড়াইয়ের দিকে চোখ পড়তেই অবাক। পরিবর্তন হয়েছে বৈ কি। মড়াইয়ের এক দিকের রূপ বদলে গেছে একেবারে। মাটির দেয়ালের ওদিকটা। সেই কোন্ তলায় পড়েছিল নোংরা দু'চার হাত আবর্জনা-গোলা জল। তাকালেও গা ঘিন ঘিন করত। সেই জল কি করে এরই মধ্যে ওই বিশাল উঁচু মাটির দেয়ালের প্রায় আধাআধি উঠে এসেছে। আর সেখান থেকে পিছনের দিকে যতদূর চোখ যায়, জল আর জল। বর্ষার লাল জল। গাঢ়-গৈরিক। থকথকে অপরিশ্রুত, তবু অপরূপ। মেঘলা আকাশ, ধূসর পাহাড়, আর পারিপার্শ্বিক সবুজের সঙ্গে ঠিক যেমনটি মেলে।

চোখে পলক পড়ে না সান্ত্বনার। এত বড় সাময়িক মাটির দেয়াল তোলার অর্থ এখন বুঝছে।

মড়াই। সান্ত্বনা নেমে এলো। আগের মত তরতর করে নয়। জলে জলে পিছল হয়ে আছে। নিচে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাতাস, সেই মুক্তি আর সেই রোমাঞ্চ। গঠন সমারোহের পরিবর্তন কিছু চোখে পড়ে না বটে, তবু তফাৎ কি উপলব্ধি করা যায়। কাজের তাড়া বেড়েছে, নিবিষ্টতা বেড়েছে, আবহাওয়ার একটা অলক্ষ্য তাগিদের ইঙ্গিত। সম্ভবত জলের দরুন। যতক্ষণ আকাশ সদয় যতটা পারো এগিয়ে যাও। ভুরু কুঁচকে সান্ত্বনা আকাশের দিকে তাকালো একবার।—এখনই এই, ভরা বরষায় কি হবে কে জানে।

এ ছাড়াও তফাৎ কিছু দেখছে। হাজার হাজার লোক কর্মরত। ক'জনকে আর বিচ্ছিন্ন করে চেনে। কিন্তু ওর অনুপস্থিতি যেন প্রায় সকলেই অনুভব করছিল। যেখান দিয়ে পাশ কাটালো সেইখানেই মানুষগুলোর চোখে নীরব অভ্যর্থনার আভাস

দেখল। খুশিতে আনন্দে ভরে ভরে উঠতে লাগল সান্ত্বনা। ওর যাওয়াও সার্থক, ফিরে আসাও সার্থক।

নিজের হাতে কাজ করে না পাগল সর্দার, কাজের তদারক করে। তাই করছিল। দূর থেকে সান্ত্বনাকে দেখে এগিয়ে আসতে লাগল। সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে আসতে সর্দারের ঘামে ভেজা কালো মুখ খুশিতে চকচকে হয়ে উঠল। দেখতে লাগল নিরীক্ষণ করে।

সান্ত্বনাও হাসছে। কি দেখছ সর্দার?

তুকে।...তেমনি জবাব দিল সর্দার, তু চলে যেয়েছিলি কেনে দিদিয়া?

বাঃ রে, বোনের বিয়ে, যাব না? বলল বটে, কিন্তু ওর খুশিভরা চোখের দিকে চেয়ে বিব্রত বোধ করতে লাগল। স্পষ্ট বলছে যেন, বোনের বিয়ে আর কতদিন ধরে হয় বাপু, তোর ডর লেগেছিল দিদিয়া। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কেমন ছিলে সর্দার—

ভালো ছিলাম। ভালো থাকার ছোটখাটো একটা ফিরিস্তি দিল সর্দার। আজকাল আর কাজে কামাই করছে না। তবে জলের জন্য মাঝে মাঝে আপনি কামাই হয়ে যায়। নয়তো রোজ আসে। অনুযোগ করল, যাবার আগে দিদিয়ার ওকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে তার সুন্দরীর এত কষ্ট হ'ত না। জানার পরে অবশ্য প্রায়ই গিয়ে সে সুন্দরীর দেখাশুনা করে এসেছে, ইত্যাদি।

সান্ত্বনা বাবার মুখে শুনেছে সে কথা। কৃতজ্ঞ নেত্রে তাকালো তার দিকে। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলল সর্দার, হালকা প্রশ্ন করল, উবাসীর বাবু তুর বিয়া কবে দিবে?

দিনেদুপুরে এই পরিবেশে এমন বেখাপ্পা প্রশ্ন শুনলে কার না হাসি পায়। সান্ত্বনা হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল, দিলে কি হবে? একেবারে তো চলে যাব এখান থেকে।

সর্দার মাথা নাড়ল, তা বটে। সত্যতাটুকু উপলব্ধি করল যেন। বিষণ্ণ ছায়া নামল মুখে। আর তক্ষুনি ভিতরের দগ্ধ মানুষটাকে দেখতে পেল সান্ত্বনা। রিক্ততা দেখতে পেল। ওকে দেখে যত খুশি হোক, যত ভালো আছে বলুক, এক নিঃসীম বেদনার জরায় মানুষটাকে বরাবরকার মত আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে চাঁদমণি। পাগল সর্দার বরাবরকার মতই বুড়িয়ে গেছে।

সর্দারের দোসরটিকেও দূর থেকে লক্ষ্য করেছে সান্ত্বনা। সেদিন নয়, পরদিন। কোদাল দিয়ে পাহাড়ের গা-ঘেঁষে মস্ত একটা পাথরের তলা থেকে মাটি সরাচ্ছে। ওর আশেপাশে আরো অবশ্য কাজ করছে কেউ কেউ। তবু মনে হয়, চারপাশে একটা রূঢ় বিচ্ছিন্নতার গণ্ডি টেনে দিয়ে নির্মম একাগ্রতায় ওই অটল পাথরটার সঙ্গে যুঝতে নেমেছে। চোখে চোখ পড়তে সান্ত্বনা দ্রুত প্রস্থান করল সেখান থেকে। পিছন ফিরে তাকালো না একবারও। ...ভাবছে। ঝরনার নিখোঁজ হওয়ার ষড়যন্ত্রে সত্যিই কি এই লোকটাও জড়িত? বিশ্বাস হয় না যেন। বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু ফিরে তাকাবে আবার এমন সাহসও নেই।

পা থেমে গেল।

অদূরে ওই প্রেসার-গেট সংলগ্ন ব্লকের দিকে এগোচ্ছে তিন চারটি লোক। একজন চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি। ওকে দেখেছে। সকলেই দেখেছে। এখানে এলে দেখা হবেই জানে।... গত কালই আশা করেছিল। আর, সংগোপন প্রত্যাশায় দু চোখ সজাগ ছিল আজও।

দলছাড়া হয়ে ভদ্রলোক এদিকেই আসছে। বাকী ক'জন কাজের দিকে এগোচ্ছে। সান্ত্বনা না দেখার ভান করল প্রথম। কিন্তু সেও এক বিড়ম্বনা। দাঁড়িয়ে পায়ে করে আঁচড় কাটতে লাগল আধভেজা পাথুরে বালিতে, আর হাসতে লাগল সোজাসুজি তাকিয়ে। এই বরং সহজ।

কাছে এসে বাদল গাঙ্গুলি হাসিমুখে বলল, পরশু এসেছ শুনলাম?

খবর রাখে। নিধুর মুখে শুনেছে বোধ হয়। নিধু কাল এসেছিল। খুশির লালিমায় সান্ত্বনা তার দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল শুধু।

আজ এখানে আসতে আসতে ভাবছিলাম দেখা হবে, ঠিক ভেবেছিলাম, দেখো।

সাধারণ কথা। কিন্তু তাতেই লাল। এ রকম ভেবেছিল জানলে সান্ত্বনা আসতই না কক্ষনো। সে কথা আর বলে কি করে। চুপ করে থাকাও কাজের কথা নয়। বলল, ভেবেছিলাম এই দেড় মাসে কত কি না জানি হয়ে গেছে, এসে দেখি যেমন কে তেমনি, কিছুই হয় নি।

সাদা কথায়, কি-ই বা এমন কাজের লোক আপনারা।

বাদল গাঙ্গুলি প্রচ্ছন্ন কৌতুকে চুপচাপ দেখল একটু। ড্যামের ব্যাপারে ওর এই আগ্রহের কারণ কিছুটা জানে এখন। জলঝরা এক সন্ধ্যায় নরেন আর সে বসেছিল কোয়ার্টারে। সেদিন কেমন মনে পড়েছিল ওর কথা। পর পর অনেক দিন দেখেনি বলেই হয়তো। কথায় কথায় তখন শুনেছিল। আভাসে অনুমানে নরেন যতটুকু জানত।

ছদ্ম-গাম্ভীর্যে প্রায় কৈফিয়ত দেবার মত করেই জবাব দিল, তুমি ছিলে না এখানে, যার যেমন খুশি ফাঁকি দিয়েছে।

হেসে ফেলল। এ প্রসন্নতা নিজের কাছেই প্রায় বিস্ময়ের কারণ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সঙ্গী অফিসার ক'জন অনেকটা এগিয়ে গেছে। আর কিছু না বলে ফিরে চলল।

উৎফুল্ল চোখে সেদিকে চেয়ে সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। বাবার মুখে শুনেছিল, জল-বৃষ্টির ব্যাঘাতে ভদ্রলোকের নাকি মেজাজ বিগড়ে আছে। তার ওপর বে-সরকারী কমিটি আসছে কাজ দেখতে আর সিমেন্টের ফয়সালা করতে, সে উদ্বেগও কম নয়। এই দেড়মাসে বেশ শুকনোই দেখাচ্ছিল ভদ্রলোককে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ওকে দেখে অন্য সকলের মত এরও চোখে মুখে সেই খুশির অভ্যর্থনা উপলব্ধি করেছে সান্ত্বনা।

বাড়ির উদ্দেশে পা চালিয়ে দিল। দেরি হয়ে গেছে। হোক গে। তৃপ্ত, প্রসন্ন। এই কর্মপরিসরের প্রতি একাত্ম অনুভূতির আস্বাদন একটা। অপরিসীম মমতা। বেশ হ'ত, এই মানুষদের মত সেও যদি কাজে লাগতে পারত কিছু। বেশ হ'ত, পুরুষমানুষ হলে। এ সময়ে ড্যামের ভালো-মন্দ দিয়ে ভাবতে পারত, আলোচনা করতে পারতো

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও।

ধেৎ! সপ্রগল্‌ভ সমস্ত মুখে যেন আবির লাগল একপ্রস্থ।

... পুরুষমানুষ হলে কেউ আমলই দিত না ওকে।

দিন দুই গেছে আরো।

কোন কাজে মন বসছিল না সান্ত্বনার। সন্ধ্যা পার হতে চলল। খানিক আগে বাড়ি ফিরেছে আর ঘুরেফিরে ঝরনার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটাই ভাবছে।

মেন কোয়ার্টারস্‌-এর এক পাথরের আড়ালে হাত পা ছড়িয়ে বসেছিলেন মিসেস চ্যাটার্জী। প্রসাধন-পারিপাট্য নেই, শিথিল বেশবাস। ভারী মুখে বিষণ্ণ কালচে ছাপ। উদাসীন বিষাদে এই দুনিয়ার প্রতিকূলতার কথাই ভাবছিলেন বোধ হয়। একেবারে সামনাসামনি পড়ে হকচকিয়ে গিয়েছিল সান্ত্বনা। পালিয়ে আসত। কিন্তু মহিলার অপ্রসন্ন দুই চোখ যেন কাঁচপোকার মত আটকে ফেলল ওকে। মনে হ'ল, ঠাণ্ডা ইশারায় ডাকছেন। পায়ে পায়ে কাছে আসতে আবার খানিক বিশ্লেষণ করে দেখলেন ওকে। পরে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

বলল। সে যে ছিল না এখানে সেটা এঁরও অগোচর নয় জেনে অবাক।

আর একদফা উষ্ণ পর্যবেক্ষণ। ঠিক ওকে নয় যেন। ওর ভিতর দিয়ে এই বয়সের সকল মেয়ের ওপর বিরূপ ভ্রূকুটি একটা। কিন্তু কণ্ঠস্বর বদলে গেল হঠাৎ। মুখভাবও। গলা নামিয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যাবার আগে ঝরনার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল একদিনও?

চট করে জবাব দিয়ে উঠতে পারে নি সান্ত্বনা। শেষ দেখা হয়েছিল ভুতুবাবুর হোটেলে। ওকে দেখে এবং একটু পরেই রণবীর ঘোষকে দেখে ব্যঙ্গ-কৌতুকে ঝরনা ঝলমলিয়ে উঠেছিল যে দিন। তার পর আর জানবে কি করে, সান্ত্বনা নিজেই পালিয়ে এসেছিল।

জবাব শুনে মিসেস চাটার্জী বিস্মিত। তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল? কবে? কেন? আমাকে বলে নি....

কান্নার মত শোনালো প্রায়। সামলে নিলেন। দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলার ক্ষোভে দ্বিগুণ বিরক্ত। মুখ ঘুরিয়ে রূঢ় মনযোগে ওপারের আকাশঘেঁষা পাহাড় দেখতে লাগলেন তিনি।

সেই থেকে মনটা ভারী হয়ে আছে সান্ত্বনার। ভদ্রমহিলা যেমনই হোন, মেয়ের ভালো ছাড়া মন্দ তো কখনো চান নি। বরং একটু বেশি ভালো চাইতেন বলেই অমন করতেন।

বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে আরো একজনের সাড়া পেয়ে খুশিতে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সান্ত্বনা। কিন্তু যত খুশি তত লজ্জা। যত আনন্দ তত সঙ্কোচ। হঠাৎ যেন অভিভূত হয়ে রইল দু'চার মুহূর্ত। দাওয়া ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল তাড়াতাড়ি।

বাবা ডাকলেন, কই রে সান্ত্বনা, নরেন এসেছে!

এসেছে তো জানে। কিন্তু যায় কি করে। সেই থেকে প্রতীক্ষাও করছে মনে মনে। কিন্তু সামনে গিয়ে দাঁড়ানো দায়।

নরেনই সহজ করে দিল ওর আসাটা। অবনীবাবুর সঙ্গে সঙ্গে গলা চড়িয়ে জানান দিল, দেড় মাসে মাসির কাছে রান্নাঘরের নতুন কি শিখে এলে হাতেকলমে পরীক্ষা চাই—একটু এদিক ওদিক হলেই গোল্লা।

আগের দিনের একটা সুর কানে লাগছে। এ ঘরে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল সান্ত্বনা। এতদিন পরে সাক্ষাতের আনন্দ থেকেও মানুষটাকে দেখে নেওয়ার কৌতূহল বেশি।

নরেনের দু চোখ তার মুখের ওপর আটকে রইল দু'চার মুহূর্ত। তারপর হালকা অনুশাসনের সুরে জিজ্ঞাসা করল, যা বললাম কানে গেলো?

সান্ত্বনা জবাব দিল না। দেখছে তেমনি। হাসছেও।

অবনীবাবু মেয়ের দিক টেনে ঠাট্টা করলেন, কানে গেলেই বা করবে কি, এই দেড় মাসের মধ্যে দেড় দিনও কি মড়াই ছেড়ে ছিল ভাবো নাকি।

হাসি চেপে ভ্রূভঙ্গি করে বাবার দিকে তাকাল সান্ত্বনা। নরেন সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে দাবি প্রত্যাহার করে নিল যেন। বলল, তা বটে, এত বড় দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায়, গেলেও বা নিশ্চিন্তে থাকে কি করে।

আবারও দৃষ্টি বিনিময়। দেখাটাই শেষ হয় নি যেন সান্ত্বনার। মৃদু হাসি, সকৌতুকে নিরীক্ষণ।

অবনীবাবু উঠে এলেন। অফিসের পোশাক বদলে হাতমুখ ধোবেন। নরেন সামনের দিকে ঝুঁকে এলো তৎক্ষণাৎ। গলা নামিয়ে বলল, এতদিন দেখা নেই দেখে ভাবলাম মাসি এবার হাতের মুঠোয় পেয়ে বোনঝিকেও একেবারে ঝুলিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বেন।

হাসি স্পষ্টতর হ'ল। সাদা দাঁতের আভাসও দেখা গেল প্রায়। কিন্তু তবু কথা বলবেই না সান্ত্বনা।

নরেন সোজা হয়ে বসল। চোখে চোখ রাখল আবার। হালছাড়া গলায় বলে উঠল, কি ব্যাপার, চিড়িয়াখানার জীব ঠাওরালে নাকি আমাকে?

নিরীক্ষণের কৌতুকগঞ্জনা শেষ হ'ল এতক্ষণে। সান্ত্বনা জোরেই হেসে উঠল।

॥ ১২ ॥

নরেন এবং সান্ত্বনা দুজনারই ভিতরে ভিতরে কিছু একটা আপোস হয়ে গেছে যেন। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে কথায় কথায় একদিন যে অস্বস্তির মুখোমুখি হয়েছিল, মনে মনে তার জন্য দুজনেই কুণ্ঠিত তারা। সেটুকু মুছে ফেলার ব্যগ্রতাও তাই দুজনারই সমান। হাসিখুশি চপলতার মধ্যে পরস্পরের মনোরঞ্জনের সূক্ষ্ম আগ্রহটুকুর প্রকাশ নেই, অনুভূতি আছে।

সান্ত্বনা ভাবে—ভাগ্যে মাসির বাড়ি গিয়েছিলাম, নইলে কি লজ্জা, কি লজ্জা। ও লজ্জা বুঝি আর জীবনে কাটিয়ে ওঠা যেত না। মনে মনে সঙ্কুচিত নরেনই বেশি। কি না কি কথা একটা, তাই শুনে একেবারে দেউলের মত ওদের বাড়ি থেকে উঠে

এসেছিল। নিজের সেই দৈন্য ওরও বিষম লজ্জার কারণ।

কিন্তু মাসির বাড়ি গিয়েছিল বলে আজ নরেনই মনে মনে খুশি বেশি। এই বাঞ্ছিত আপসের দরুনই নয় শুধু। দেড়মাসে মেয়েটা বদলেছে অনেক। নতুন সবুজের মতো ফিরে উচ্ছল হয়ে উঠেছে আবার। গোড়ার যে মেয়ে মড়াইয়ে এসেছিল তেমনি। বরং তার থেকেও বেশি। মাঝখানে ওই উচ্ছল প্রাচুর্য নারীচেতনার কানায় কানায় বাঁধা পড়ে আসছিল। কাম্য তাইই। কিন্তু ওই থেকেই এক ধরণের বিচ্ছিন্নতা এসেছিল। সংশয়ও।

কিন্তু সে অধ্যায় একেবারে মুছে গেছে এখন। চেতনার বাঁধ ভেঙেছে। নিজেকে আগলে রাখার কারিগরি ভুলেছে। দেড় মাসের শূন্যতা ভরাতে তিনগুণ উপচে উঠেছে। হাসে, গল্প করে, হৈ-চৈ করে। রাগালে রাগে, চোখ রাঙালে ডবল চোখ রাঙায়। বেড়াতে বেরোয় দুজনে। পুরনো জায়গায় নতুনের ছাপ লাগে। শালমহুয়ার দিকে যায়, পাহাড়ের দুর্গম কোনো পাথরে ওঠার ভীরু চেষ্টায় হেসে আটখানা হয় নিজেই, একসঙ্গে চা খেতে আসে ভুতুবাবুর দোকানে। নরেনবাবু কত প্রশংসা করে ভুতুবাবুর, তার কাল্পনিক ফিরিস্তি দেয় গম্ভীর মুখে। লজ্জায় সুখে গলে থাকে ভুতুবাবু। তাই দেখে হাসি চাপা দায় হয়ে ওঠে নরেনের।

সান্ত্বনার অগোচরে নরেন চেয়ে চেয়ে দেখে এক এক সময়। নতুন করে আবার কাঁচা বয়সের যাদু লেগেছে ওর মধ্যে। যা এই মড়াইয়ের আর এই মড়াইয়ের পাহাড়ী পরিবেশেই শুধু মানায়। বলেও ফেলে, ভাগ্যে জায়গাটা এরকম, অন্য কোথাও হলে টি টি পড়ে যেত।

নিরীহ মুখে পাল্টা প্রশ্ন করে সান্ত্বনা, ধিঙ্গী মেয়ে বলত? জবাব না পেয়ে হেসে ওঠে।—আগে যা ছিলুম জানেন না, তড়তড়িয়ে গাছে উঠতাম বলে মায়ের হাতে কম কিল খেয়েছি!

চেষ্টা করলে এখনো পারো বোধ হয়ে উঠতে!

না, এখন আর পারিনে, মোটা ধুমসী হয়ে গেছি।

নিজের সম্বন্ধে অমন একটা বিশেষণ প্রয়োগের আনন্দেই আবার হেসে সারা। কতটা মোটা হয়েছে নরেন পরীক্ষাসূচক চোখে তাই যেন দেখে চেয়ে চেয়ে। তৃষ্ণার্ত একটা অনুভূতি হাসি-চাপা দিতে হয় তাকেও।

নরেনের খুশি হওয়ার আরও একটু কারণ আছে। সম্প্রতি অবনীবাবুর মধ্যেও কিছু পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছে সে। প্রথম থেকেই এই বাড়িতে তার অবারিত আনাগোনা। অবনীবাবু বাড়ি থাকুন আর নাই থাকুন, যখন খুশি এসেছে, যতক্ষণ খুশি থেকেছে। কিন্তু বিবেকের আঁচড় পড়তই একটা দুটো। ভদ্রলোক কিছু ভাবেন কি না, মনে মনে অসন্তুষ্ট হন কি না কে জানে। কিন্তু নরেনের মন থেকে এখন সে সংশয়ও গেছে। কোন কারণ নেই তবু গেছে। ওর এবারের এই আসা যাওয়া এবং মেয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় ভদ্রলোকের একটুখানি সস্নেহ প্রশ্রয়ও আছে। কেমন করে নরেন যেন সেটুকু উপলব্ধি করেছে।

অনুকূল অবকাশ পেলে সান্ত্বনাকে ও নিজেই হয়তো বলত। কিন্তু এ উচ্ছলতার

মুখে বলাটা না হালকা হয়ে ভেসে যায়। সময় আসুক বলবে। সান্ত্বনা থামুক, শান্ত হোক একটু, তখন বলবে। সদ্য-অবরোধ-ভাঙা তটিনীর সঙ্গে ওর তুলনা চলে এখন।

কিন্তু বেজায় রাগ হয় নরেনের এই অকালবৃষ্টির ওপর। জলের দরুন ড্যামের কাজে বিঘ্ন হচ্ছে বলে চিন্তিত হয়তো হয়েছে, কিন্তু রাগ হয় নি এখনো। এ যেন এক গদ্যাকারের অমিল। দিনকতক ছিল বেশ। আবার শুরু হয়েছে। সময় নেই অসময় নেই ঝমঝমিয়ে নামলেই হ'ল। অফিসের পর বর্ষাতি নিয়ে অবশ্য হাজির দিতে পারে। দিচ্ছে না এমনও নয়। কিন্তু সান্ত্বনাই হয়তো চোখ বড় বড় করে বলে ওঠে, এই জলে কি কাণ্ড ! কি কাণ্ডর সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে জলের ছিটেফোঁটা কোথাও লাগল কি না অবনীবাবুর হাতে আবার সেই পরীক্ষার সঙ্কোচ। তাছাড়া বেড়ানো বন্ধ। দিনকতক ওটাই মস্ত আকর্ষণ ছিল।

সকাল থেকেই সেদিন আকাশ নির্মেঘ। রোদ উঠেছে। কান্নাভেজা মুখে একপ্রস্থ হাসির মত। দুপুরে রোদ থাকল না বটে, কিন্তু শীতকালের পড়ন্ত আলোর মত ভারি একটা মিষ্টি ছায়া পড়ল সর্বত্র। যে আলো আর যে হাওয়া ঘরকুনো মনকেও বাইরে টেনে আনে।

অফিস ঘরের টেবিলে আঁকার সাজ-সরঞ্জাম কাগজপত্র ছড়িয়ে রেখেই নরেন উঠে পড়ল শেষ পর্যন্ত। অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছে ভেতরটা। বিকেলে আবার শুরু হবে কি না এক পশলা কে জানে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। আসলে ওই আকাশ, ওই বাতাস আর এক নিভৃতের দিকে টানছে ওকে।

সরাসরি এসে ট্রাকে চাপল। মেন কোয়ার্টারস্-এ উঠে ট্রাক ছেড়ে দিল। তার পর পা চালালো জেনারেল কোয়ার্টারস-এর দিকে।

বেশিদূর যেতে হ'ল না। মুখোমুখি দেখা। সান্ত্বনা অবাক। কি ব্যাপার, এ সময়ে এদিকে কোথায় ?

সব ব্যাপারে ওর এই সহজ বিস্ময় নরেনের বাঞ্ছিত নয় খুব। ছদ্ম বিস্ময় হলে বরং খুশি হ'ত। অত্যন্ত হালকা সুরেই জবাব দিল, এদিকে অবনীবাবু নামে এক ভদ্রলোক থাকেন, যাচ্ছিলাম তাঁর বাড়ি। তা তুমি কি সুপারভিশানে বেরিয়েছ ?

জবাব না দিয়ে সান্ত্বনা হালকা করেই পাল্টা প্রশ্ন করল আবার, অবনীবাবু নামে ভদ্রলোকের বাড়ি এখন যাচ্ছেন, আপিস নেই ?

আছে। নরেন ঘটা করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল একটা। দিনটা দেখে ভবলাম ভদ্রলোকের কন্যার হাতে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসি।

হেসে উঠল সান্ত্বনা। বলল, হাতের নাগালে ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে এ পর্যন্ত আসছিলেন চা খেতে ?

যে অবকাশের প্রতীক্ষা মনে মনে, তারই একটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। আর কিছু না হোক, শুধু বলতে পারত, ভুতুবাবুর দোকানে ভুতুবাবু আছে, ওই ভদ্রলোকের কন্যাটি নেই বলেই এত পরিশ্রম আর পণ্ডশ্রম।

বলি বলি করেও বলা হ'ল না। সান্ত্বনা তড়বড়িয়ে উঠল, আমি কিন্তু এখন আর ফিরছি না, পাঁচ দিন ঘরে বসে বসে দম বন্ধ, সেই সকাল থেকে বেরুব বেরুব

কচ্ছি—ভুতুবাবুর দোকানে চলুন আপনাকে চা খাওয়াচ্ছি।

চা আর না হলেও চলে। সানন্দ প্রত্যাবর্তন এবং অবতরণ। সান্ত্বনারও খুশি ধরে না। বলল, চমৎকার দিন করেছে, না? চলুন মড়াইয়ে নামব, চট করে চা খেয়ে নেবেন, আমি ভুতুবাবুর পাল্লায় পড়ে গেলে ডাকবেন জোর করে। হেসে উঠল।

ভুতুবাবুর দোকনে ঢোকা হ'ল না। চা-প্রার্থীর ভিড় সেখানে। এ আবহাওয়ায় চায়ের অজুহাতে অনেকেই বেরিয়ে এসেছে। ওরা ঢুকতে পারত। আপ্যায়ন করে ভুতুবাবু বসার ব্যবস্থাও করে দিত। কিন্তু অফিস টাইমে স-সঙ্গিনী ওদের মধ্যে গিয়ে ঢোকা পদস্থ অফিসারের সাজে না। সান্ত্বনাও বোঝে, বলে, আপনার কপাল মন্দ আমি কি করব।

জবাব না দিয়ে মন্দ-কপালজনিত মুখখানা করে তুলতে চেষ্টা করে নরেন। লোক না থাকলেও এ সময়ে ভুতুবাবুর দোকানে গিয়ে ঢুকতে ভালো লাগত না। এগিয়ে চলল। মড়াইয়ে নামাটা অফিসের কাজের অন্তর্গত। নৈতিক না হোক বাহ্যিক কৈফিয়ত আছে।

মড়াইয়ের ধারে এসে সান্ত্বনা চ্যালেঞ্জ করল, নামুন, কে আগে নামতে পারে দেখি।

নরেন দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, দেখ মেয়ে ভালো হবে না, জলে জলে যা হয়ে আছে, পড়লে তখন?

সে সম্ভাবনা আছে। তবু ছাড়ার পাত্রী নয় সান্ত্বনা। ঠেস দিয়ে বলল, আচ্ছা ভীতু আপনি, হাত ধরে নামাবো?

নরেন হাত বাড়িয়ে দিল, ধরো না।

সান্ত্বনার উৎফুল্ল দুই চোখ মুহূর্তের জন্য আটকে গেল তার মুখের ওপর। অননুভূত এক রোমাঞ্চকর স্পর্শের মত লাগল নরেনের। ততক্ষণে দু'চার পা নেমে গেছে সান্ত্বনা। ফিরে দেখল আবার। বলল, তার থেকে হাত-পা না ভেঙে আপনি বরং একটা আছাড় খান, লোকে দেখুক? নামবেন তো নামুন।

মড়াইয়ের সেই একটানা কর্মস্রোত। কিন্তু রোজই নতুন মনে হয় সান্ত্বনার। আজকের দিনটা আরো অদ্ভুত লাগছে। মড়াইযের গহ্বরে মেঘলা দিনের সর্বাঙ্গ-জড়ানো ঠাণ্ডা বাতাসের ছড়াছড়ি। আর সান্ত্বনার মন তার থেকেও হালকা।

অনর্গল কথা বলছে। এখানে দাঁড়াচ্ছে, ওটা দেখছে, পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করছে। জবাব পেল কি পেল না খেয়াল নেই, প্রত্যাশাও নেই। মড়াইয়ে নেমেই পাগল সর্দারকে একবার খোঁজা অভ্যাস। কাছে দূরে দু চোখ ঘুরে এলো আজও। দেখতে পেল না। দূরে কোথাও আছে। আজ আর কারো কাছে যাওয়া নয়, কারো কাছে দাঁড়ানো নয়। মড়াইয়ের বাতাসের মতই হালকা হয়ে শুধু ভেসে বেড়ানো।

খেয়াল হতে দেখল, চার্নিং মেসিন চলছে যেখানে সেদিকটায় এগোচ্ছে তারা। ও আর এখন রণবীর ঘোষের আওতা নয়। আর কোনো কনট্রাক্টারের হাতে গেছে। অদূরে একদল কামিন ঝুড়ি মাথায় পাথরকুচি সরাচ্ছে। এরই মধ্যে এক নজর দেখে নিল সান্ত্বনা। পাঁচমিশালি বয়সের মেয়ে সব। ওদের দিকে চেয়ে চাঁদমণির কথা

মনে পড়ে যায় তবু। রণবীর ঘোষের পাশাপাশি ওকে দেখে অমনি দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েটা একদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু চোখে ভস্ম করেছিল ওকে। আজ অন্তত এসব আর মনে করতে চায় নি সান্ত্বনা। কিন্তু চাঁদমণি ওর মনে দাগ কেটে আছে। না চাইলেও মনে পড়ে।

ছোট নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে চলল। পাশের লোকটা কথাবার্তা বিশেষ বলছে না, সেদিকেও খেয়াল নেই খুব।

চার্নিং মেশিন চলছে না এখন। লোকজনও বিশেষ নেই। কনভেয়ারের শেষ মাথায় অনেক উঁচুতে সেই ঘরের মত জায়গাটার দিকে চোখ গেল। ক্রেনে ওঠার সুযোগ না পেলে ওই মইয়ের মত খাড়া সিঁড়ি বেয়েই যেখানে উঠবে একদিন ঠিক করেছিল।

সাগ্রহে বলল, ওখানে উঠি চলুন না?

কোথায়?

ওই যে উঁচু ঘরের মত—

নরেন বলল, ওখানে উঠতে গেলে পা হড়কে একেবারে বিশ্বরূপ দেখতে হবে।

যেন ছোট মেয়ের এক অসম্ভব আব্দার নাকচ করে দিল এক কথায়। ভুরু কুঁচকে সান্ত্বনা মাটি থেকে কতটা উঁচু হতে পারে এবং ওঠাটা একেবারেই অসম্ভব কি না তাই দেখতে লাগল।

ওদিকে নরেন দেখছে, মড়াই আজ ছোট বড় অনেক অফিসারকেই টেনেছে। অদূরে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এবং আরও দু'তিনজনের সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল। সান্ত্বনাকে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও একটু, এঁরাও সব হাওয়া খেতে নামলেন কি না দেখে আসি।

সান্ত্বনাও এক নজর দেখে নিল তাঁদের। বিশেষ করে ঝরনার বাবাকে। কিন্তু এতদূর থেকে মানুষটাকে দেখা যায় এই পর্যন্ত। পায়ে পায়ে নরেন তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দশ মিনিটও নয়। ফিরল আবার। কিন্তু এদিক ওদিক চেয়ে সান্ত্বনাকে দেখল না কোথাও। বিস্মিত নেত্রে চারদিকে তাকাতে লাগল সে। মেয়েটা গেল কোথায়।

টুপ করে কাছেই ছোট একটা পড়ল কি। চমকে উঠল নরেন। উপরের দিকে চেয়ে বিমূঢ়। কনভেয়ারের সেই মাথা থেকে সহাস্যে উঁকি দিচ্ছে সান্ত্বনা।

নরেন ভয়ে দিশেহারা। চিৎকার করে উঠল, ওখানে কি কচ্ছ?

তেমনি চিৎকার করে জবাব পাঠালো সান্ত্বনা, বিশ্বরূপ দেখছি।

শীগগির নেমে এসো। যথার্থ রেগে গেছে।

শীগগির উঠে আসুন। বেপরোয়া জবাব।

কি দস্যি মেয়ে রে বাবা। তুমি নামবে কি না?

আপনি উঠবেন কি না।

হতাশ হয়ে হাল ছাড়ল নরেন। কাঁধের কোটটা আছড়ে মাটিতে ফেলল সে। ভয়ে দুশ্চিন্তায় ঘেমে উঠেছে। কিন্তু চকিতে আরো একটা ভয়ের কথা মনে হ'ল।

এই খাড়া সিঁড়ি ধরে ওঠা যত সহজ নামা তত নয়। ওঠার থেকেও নামার সময় বিপদের সম্ভাবনা দ্বিগুণ। ওর কথা শুনে সান্ত্বনা যে নেমে আসতে চেষ্টা করে নি রক্ষা। তাড়াতাড়ি একজন কর্মচারীকে ডেকে নির্দেশ দিল ক্রেন-কেজ লাগানোর ব্যবস্থা করতে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল তার পর।

ওপর থেকে সান্ত্বনা হাসতে লাগল প্রচুর। এক্ষুনি নামতে হবে, তাড়াতাড়ি চারদিক দেখায় মন দিল সে। দু চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। বিশ্বরূপ না হোক অপরূপ বটেই। অত উঁচু থেকে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি দেখাচ্ছে এত বড় সৃষ্টি। ওপরে আকাশ। নিচে বিজ্ঞান-পথে যুগ-যুগান্তের সাধনার বিচিত্র রূপ। সেই মহিমার সামনে হঠাৎ যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল সান্ত্বনা।

এত উঁচু থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু দেখার দিকে খুব মন ছিল না। নইলে দেখত, একটা মেয়ে কোথায় উঠেছে তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে নিচের অনেকেই। আর মড়াইয়ের গহ্বরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলিও। দেখছে না ঠিক, শাড়ির আভাসে বুঝতে পারছে শুধু দুঃসাহসিকাকে।

কোনরকমে ওপরে উঠে জিব বার করে হাঁপাতে লাগল নরেন। তাই দেখে আর একদফা হেসে উঠল সান্ত্বনা। নরেন ধমকে উঠল, থামো। আর হাসতে হবে না, এতটুকু ভয়-ডর নেই তোমার?

অন্য সময় হলে প্রত্যুত্তরে তেমনি করেই কিছু বলত। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার স্তব্ধতার ঘোর কাটে নি এখনো। নিচের দিকেই চোখ গেল আবার। বলল, এত বড় অভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের এক ফোঁটা ভয়ের কথা ভাবতেও লজ্জা।

নরেন হাঁ করে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। সেটুকু উপলব্ধি করে সান্ত্বনা লজ্জা পেল যেন। বলল, দেখছেন কি?

দেখছি তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু!

হেসে উঠল সান্ত্বনা। দুইই খাসা। চলুন।

ক্রেন-কেজ্ আসতে দেখে আবারও ছেলেমানুষের মতই খুশি হয়ে উঠল সে। ওতে করে নামবে ভাবতেও রোমাঞ্চ। হাত ধরে নরেন কেজ্-এ ওঠালো তাকে। ক্রেন ঘুরতে লাগল। যেন বাতাস সাঁতরে চলেছে তারা। সান্ত্বনার মনে হ'ল শরীরের রক্ত সব সড়সড়িয়ে পা বেয়ে নামছে।

ছোট কেজ্। ওর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নরেন। হাতে হাত লাগছে। কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে চপল আনন্দে এটা সেটা জিজ্ঞাসা করছে যখন ওর নিঃশ্বাস এসে লাগছে গালে মুখে।

একটা সবল ইচ্ছাকে দ্বিগুণবলে নরেন ভিতরে ভিতরে নিষ্পেষণ করে রাখল সারাক্ষণ।

কেজ্ ভূমি স্পর্শ করল।

বিফল আরো এক নিবিড় মুহূর্ত।

কেজ্ থেকে মাটিতে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এক বিপরীত ধাক্কায় স্তব্ধ দুজনেই।

হঠাৎ দূরের একদিকে সামাল সামাল রব উঠল একটা। লোকজন যে যার কাজ ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সেই দিকে। চিৎকার, চেঁচামেচি, হট্টগোল। এত লোক ছড়িয়ে ছিল মড়াইয়ে, এমনিতে বোঝা যায় না। ওপর থেকেও লোক ছুটে আসছে।

সম্বিৎ ফিরতে নরেন আর একটি কথাও না বলে প্রায় দৌড়েই চলল সেদিকে।

সান্ত্বনা সেখানেই দাঁড়িয়ে। মড়াইয়ের এই বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ততা চেনে। এই কোলাহল জানে।

অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

সান্ত্বনা আড়ষ্ট। আর্ত আকৃতি। কি হ'ল? কার সর্বনাশ হ'ল? কিন্তু এক পা নড়ার ক্ষমতা নেই। যতবার যত দুর্ঘটনার কথা শুনেছে, একই অবস্থা। চোখে দেখা দূরে থাক, নির্মম কিছু কানে এলেও ভিতরটা ঘুলিয়ে ওঠে থেকে থেকে। কিছু না দেখুক, না জানা বা না শোনা পর্যন্ত শান্তি নেই।

কি হ'ল? কে গেল? ক'জন গেল?

পিলপিল করে লোক জমছে এখনো। মড়াইয়ের ওদিকটা কালো মাথায় কালো হয়ে গেল। তবু লোক আসছে। হট্টগোল বাড়ছে।

দুর্ঘটনার বিবরণ জেনে আবার ফিরেও যাচ্ছে কেউ কেউ। পায়ে পায়ে এগোলো সান্ত্বনা। জনা-দুই লোক ওর সামনাসামনি আসতে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখের দিকে চেয়েই লোক দুটো বুঝল, জানতে চায় কি হয়েছে। তারা জানাল, পাথর চাপা পড়েছে একজন। পেল্লায় পাথার—সঙ্গে সঙ্গে শেষ।

সান্ত্বনার চোখে বোবা ত্রাস, বোবা প্রশ্ন। অর্থাৎ কে? আমি দেখেছি? আমি চিনি?

—হোপুন। নিজে থেকেই জানাল তারা, জলে জলে ধারের পাথর আল্‌গা হয়েছিল, বোকার মত তারই তলার মাটি কাটছিল লোকটা। সবাই বলছে, ইদানীং মাথা ঠিক ছিল না ওর—ওদের বুড়ো সর্দারটা কপাল ঠুকে রক্তারক্তি করছে একেবারে।

ভিড় সরিয়ে, মরণাঘাতী পাথর নড়িয়ে, দলাপাকানো দেহটা সরিয়ে ফেলার পর এক ফাঁকে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এসে ওই এক কথাই বলল কুলিবাবু।—নিজের দোষেই গেল স্যার লোকটা, ওই পাথরের নিচে বসেই তলাকার মাটি সরাচ্ছিল...

চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি অন্যমনস্কের মত ভাবছিল কিছু। ভাবছিল সেই প্রথম দিনের কথা। বহু স্বজাতি পরিজনের সেই জিঘাংসু বিক্ষোভের জবাবে পাষাণ-গাম্ভীর্যে এই একজনের সামনাসামনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়ানো। সেদিন মড়াই ঘেরা গোটা পাহাড়টার মতই শক্ত নিটোল মনে হয়েছিল ওকে। আজকের এই শেষ দেখলে কে বলবে একখানিও হাড় ছিল ও-দেহে।

ছোটখাটো এমন দুর্ঘটনা মড়াইয়ে আরো অনেক ঘটেছে। কাজের তাড়ায় সে বিষণ্ণতা কাটিয়ে ওঠাও শক্ত হয় নি খুব। কিন্তু চারদিকে চেয়ে আজ বাদল গাঙ্গুলির কেমন মনে হ'ল এই একটা অপঘাত অজস্রের উদ্যমকে যেন থেঁতলে দিয়ে গেল। বাদল গাঙ্গুলি নয়, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সচেতন হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ। কুলিবাবুকে আদেশ

করল, দোষের কথা পরে হবে, জটলা বন্ধ করে ওদের সব কাজে যেতে বলুন, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর এক মিনিটও নয়।

কিন্তু শুনছে কে? কাজ যারা করবে তারা ভ্রূক্ষেপও করল না। বরং ক্ষুব্ধ হ'ল। অসন্তুষ্ট হ'ল। জাতের অর্ধেক লোক মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে চলে গেছে। যারা আছে, তারাও জায়গায় জায়গায় গোল হয়ে মূর্তির মত বসে। কুলিবাবুদের মৃদু অনুশাসনে কাউকে নড়ানো গেল না। উল্টে এই সময়ে এভাবে কাজের তাড়া দেওয়াটা প্রায় নির্মম মনে হ'ল ওদের সকলের কাছে।

সান্ত্বনার কাছেও।

অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে কখন। আচ্ছন্নতার ঘোর কাটে নি। স্তব্ধ, বিবর্ণ। নিজের অগোচরে দু চোখ খুঁজছে কাকে। খুঁজছে পাগল সর্দারকে। তাকে দেখল না। দেখল এদের। দেখল কলের মানুষ চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে। বেদনা-বিহ্বল মুহূর্তে এ নিষ্প্রাণতা নির্দয় মনে হ'ল শুধু।

চোখে চোখ পড়তে সোজা ফিরে চলল।

দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে অবনীবাবু দুঃখ করলেন। নরেনও অনেক কথা বলল। কিন্তু সান্ত্বনার মুখে কথা নেই একটিও। পাগল সর্দারের কাছে যাবে ভেবেছিল। যায় নি। যেতে পারে নি। চাঁদমণির অঘটনের পরে গিয়েছিল। কিন্তু এবারে পারল না। শেষের দিকে সান্ত্বনার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল হোপুনের ওপর। ওর বিসদৃশ আচরণ দেখে ভয় পেয়েছিল। আরো ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভুতুবাবু। কিন্তু...

থমকে গেল। নিজের ভিতরটাই দেখতে চেষ্টা করল যেন। এই কি চেয়েছি?

আর্ত আকৃতিতে শিউরে উঠল প্রায়। না, এ সে চায় নি, কোনদিন চায় নি।

পাগল সর্দারের কাছে যেতে পারে নি। কিন্তু মড়াইয়ে এসেছে পর পর দু দিনই।

সর্দার আসে নি। ওর সঙ্গে আরো বিশ-ত্রিশজন আসে নি। কাজ শুরু হয়েছে আবার। সান্ত্বনার মনে হয়েছে এই কালো মানুষদের কাজের মধ্যে যেন প্রাণ নেই আর। চিফ ইঞ্জিনিয়ার এসে তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছে, কুলিবাবুরা তাগিদ দিচ্ছে। তাই ওঠা, তাই কাজে লাগা।

তৃতীয় দিন পাগল সর্দার এলো। বাকি সকলেও। ওর আসার সঙ্গে সঙ্গে দলের মধ্যে যেন নতুন করে শোকের ছায়া নামল আবার। কাজে ছেদ পড়ে গেল। যারা কাজে লেগেছিল, কাজ ফেলে তারাও আস্তে আস্তে এসে জড়ো হ'ল।

অদূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছে সান্ত্বনা। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অসন্তোষ দেখছে। কুলিবাবুদের তাড়া দেখছে। তারা বলছে, যারা কাজ করবে না তারা বাড়ি যাও, যখন কাজ করবে তখন এসো। এখানে এসে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার অর্থ কী?

সান্ত্বনার ইচ্ছে হ'ল চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে গিয়ে বলে, যে লোকটা গেছে সে ওদের গাঁয়ের মাঝির ছেলে আর পাগল সর্দারের বুকের পাঁজর। ওদের এত বড় শোকে একটু ব্যতিক্রমে ড্যামের কাজের এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

কিন্তু ক্ষতি হোক না হোক তাগিদ দিয়ে ফল কিছু হ'ল না। বরং ক্ষোভ বাড়ল ওদের। এক জায়গায় ভিড় না করে বিচ্ছিন্ন ভাবে কাছে দূরে যে যার দাঁড়িয়ে রইল

বা বসে রইল চুপচাপ। দূরে একদিকে টহল দিচ্ছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার। সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার আছেন, আরো কেউ কেউ আছে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের চাপা অসহিষ্ণুতা তাঁদের উদ্বেগের কারণ।

পায়ে পায়ে পাগল সর্দারের দিকে এগোলো সান্ত্বনা। এ দু দিনে তার ভিতরেও পরিবর্তন এসেছে একটা। উচ্ছলতার বদলে আবার সেই অন্তর্মুখী মনের গতি। স্থির, শান্ত, পরিণত।

সর্দার ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। পরে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল একেবারে। ওকে আর কখনো কাঁদতে দেখে নি সান্ত্বনা। মেয়ে হারিয়েও না। বোবা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল।

খানিক বাদে শান্ত হ'ল পাগল সর্দার। উপুড় হয়ে হাঁটুর ওপরের আধখানা কাপড়ে চোখের জল মুছে ফেলল। পরে একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হোপুন চলে গেল দিদিয়া—

সান্ত্বনা বলতে পারল না কিছু। একটা সান্ত্বনার কথাও না। চুপচাপ তার পাশে বসল শুধু। কাছাকাছি যারা ছিল, দূরে সরে গেল আর একটু।

সর্দার আবার বলল, বাবুরা সকলে বলতে লেগেছে, হোপুন বোকা ছেল—পাথরের লিচে বসে মাটি কাটতে যেয়েছিল—কিন্তুক হোপুন মরদ ছেল, কুছুতে তার ডর লাগত না।

আমি জানি সর্দার। একটু থেমে প্রায় মুখোমুখি ঘুরে বসল সান্ত্বনা। কিন্তু তোমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছ কেন? কাজ কচ্ছ না কেন?

মুখ দেখেই বোঝা গেল, এই ব্যথার মুহূর্তে ওর মুখে এরকম কথা আশা করে নি সর্দার। মুহূর্তের জন্য তার চোখে যেন অবিশ্বাসের ছায়া নামল একটা। বলল, তু উদের মতন আমাদেরকে কাজের তাড়া দিস না দিদিয়া।

না, ওদের মত দেব না। কিন্তু যে কাজ করতে করতে হোপুন মরে গেল, সেই কাজটাই তোমরা বন্ধ করে বসে আছ?

দিদিয়ার এমন শান্ত কণ্ঠস্বর পাগল সর্দার আর শোনে নি কখনো। কিন্তু আজ তার এই ক্ষতর সঙ্গে খানিকটা খেদও মিশে আছে। জবাব দিল, তুরা ভদ্দজন আছিস দিদিয়া, আমাদিগের দুঃখ তুরা বোঝতে লারবি—এই ড্যাম হবে কিন্তুক হোপুন আর ফিরবে লা—উ চলে গেল—উ মরে গেল—আমাদিগের দুঃখ তুরা বোঝবি লা দিদিয়া।

চুপচাপ অনেকক্ষণ। তারপর তেমনি আস্তে আস্তে সান্ত্বনা বলল আবার, দুঃখ না বুঝলে তোমার কাছে এলাম কি করে সর্দার!...এই তিন দিন তোমরা কাজ বন্ধ করেছ, এই তিনদিনই হোপুন মরে আছে—তোমরা কাজ শুরু করলেই সে বেঁচে উঠবে। এই ড্যাম হয়ে গেলে চিরকাল বাঁচবে হোপুন, কোনদিনই মরবে না। গলা ধরে আসছিল সান্ত্বনার। একটা উদগত অনুভূতি চেপে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বলল, হোপুনের আগে আরো অনেকে এখানে জীবন দিয়েছে...হয়তো আরো দেবে, কিন্তু কেউ তারা মরবে না সর্দার, যতকাল এখান দিয়ে জল যাবে ততকাল বাঁচবে তারা। কাজ করে গে যাও সর্দার।

পায় পায় ফিরে চলল সান্ত্বনা। কিন্তু পাগল সর্দার বিহ্বলের মত দেখছে ওকে। দু চোখ টান করে দেখছে। নিজের জরা সরিয়ে আর মর্মচ্ছেদী বেদনা সরিয়ে দেখছে। তার কালো মুখ চকচকে দেখাচ্ছে আবার। নিজের অগোচরেই উঠে দাঁড়াল। তাকালো চারিদিকে।

—আই! হু-ই—কামি চালা কানা!

সমস্ত শক্তি উজাড় করা কণ্ঠস্বর। মড়াইয়ের খোলা বাতাস পর্যন্ত গমগমিয়ে উঠল যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল কাছের লোক, দূরের লোক, নাজেহাল কুলিবাবুরা। সহকর্মী পরিবৃত বাদল গাঙ্গুলিও।

বিকেল। বাবা ফেরে নি এখনো। একটু বাদেই ফিরবে হয়তো। নরেনবাবুও আসতে পারে। কিন্তু ঘরে আর ভালো লাগছে না। বাইরেও লাগবে না জানে। একটা গুমোট ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছে সান্ত্বনা। অনেকবার। ভাবতে চেষ্টা করেছে। এমন লাগছে কেন? হোপুন মরে গেল তাই? মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। মনে সারাক্ষণই পড়ছে। কিন্তু দুর্ঘটনার বেদনাই নয়। আরো কিছু। আরো কি।

পিছনের দিকের নতুন পাহাড়ী রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে সান্ত্বনা। দাঁড়িয়ে পড়ল এক জায়গায়। ছ'সাত বছরের একটা পাহাড়ী ছেলে আপন মনে খেলছে বেশ। মস্ত একটা সুপুরির খোলে দড়ি বেঁধে সড়সড় করে টেনে নিয়ে আসছে। মানুষের অভাবে বড় বড় গোটাকাতক ইঁট চাপিয়েছে খোলের মধ্যে।

হঠাৎ এই-ই ভালো লাগল সান্ত্বনার। অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করল ওর সঙ্গে সঙ্গে। সহজ হওয়া বা সহজ কিছু করার তাড়না। সোৎসাহে এগিয়ে গিয়ে বলল, দাঁড়া, আমি টানছি তোকে।

নিজের হাতে ইঁট ফেলে দিয়ে বলল, নে, বোস্।

দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলল তার পর। ছেলেটা হাসতে লাগল হি হি করে। সান্ত্বনাও হাসছে।

বেশিক্ষণ নয়, অদূরে মানুষটিকে দেখেই হাসি মিলিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে সকৌতুকে দেখছে চেয়ে চেয়ে। বাদল গাঙ্গুলি। কাছাকাছি হতে বলল, দৃশ্যটা ভালই লাগছে দেখতে।

সান্ত্বনা থমথমে গম্ভীর। একে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে কেন বিগত ক'টা দিনের এই অস্থিরতা আর অসহিষ্ণুতা। হোপুনের এই মর্মঘাতী মৃত্যুর স্তব্ধতাকে প্রায় অসম্মান করেছে এই মানুষ—এই কলের মানুষ। ফস করে জবাব দিল, পরিশ্রম সার্থক হ'ল তাহলে!

এগিয়ে চলল। মুহূর্তের জন্য থমকে গেল বাদল গাঙ্গুলি। সঙ্গ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কি বললে?

বললাম, আপনার ভালো লাগছে যখন আমার এ পরিশ্রম সার্থক হ'ল। পিছনে ফিরে তাকিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল, এই ছোঁড়া, অত নড়িস কেন? বসে থাক

না চুপ করে, দেব উল্টে ফেলে!

দেখল আড়চোখে। মানুষটা হাঁ করে চেয়ে আছে মুখের দিকে। কিন্তু আরো কিছু বলতে চায় সান্ত্বনা। আরো কিছু বলতে পেলে মন ঠাণ্ডা হয়। এমন কিছু যাতে লোকটার মনে হয় তাকে গ্রাহ্য করে না ও। ঝাঁজের মাথায় আর কিছু হাতড়ে না পেয়ে তার কথাই টেনে আনল আবার। বলল, আপনার ভালো লাগলে আপনিও গিয়ে ওখানে বসতে পারেন, আমি স্বচ্ছন্দে টানতে পারি।

এইবার হয়েছে খানিকটা। দু'চার পা এগিয়ে গেল সান্ত্বনা।

নিজের অজ্ঞাতে যেন পা ফেলছে বাদল গাঙ্গুলি। বিস্ময়ে, কৌতুকে নির্বাক খানিকক্ষণ। আমি...ওখানে বসব?

কণ্ঠস্বর বদলে ফেলল সান্ত্বনা। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, মুখফসকে বলে ফেলেছি, দয়া করে অপরাধ নেবেন না।

অর্থাৎ আমার যা বলার বলেছি, এবারে আপনি পথ দেখতে পারেন। কিন্তু পথ দেখার বদলে ওকেই দেখছে বাদল গাঙ্গুলি। নারী-রোষের মহিমা দেখছে। বিব্রত মুখে হাসল একটু, কি ব্যাপার?

জবাব না দিয়ে সান্ত্বনা এগোতে লাগল। সুপুরির খোলে বাঁধা দড়িটা দু হাতে পিছনে ধরা। সড়-সড়-সড়-সড় শব্দ হচ্ছে। ছেলেটা বসে আছে ধ্যান-গম্ভীর মুখে। ঢালু পথ, টানতে কষ্ট নেই। আর টানছে যে খেয়ালও নেই বোধ হয়। লোকটার মুখে হাসির আভাস দেখে উষ্ণ হয়ে উঠেছে আবার।

একটু অপেক্ষা করে বাদল গাঙ্গুলি অন্য প্রসঙ্গ তুলল। যাক, তোমাকে একটা কথা বলব ভেবেছিলাম। সেদিন মড়াইয়ে ওই এলিভেটারের ওপরে গিয়ে উঠেছিলে কেন?

ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল, অন্যায় হয়েছে?

হয়েছে। বিপদ হতে পারত।

কি বিপদ?

ওখান থেকে পড়লে তোমার আর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেত না।

এরকম সুযোগই চাইছিল সান্ত্বনা। প্রচ্ছন্ন শ্লেষে জবাব দিল তৎক্ষণাৎ, না গেলেই বা। ওর একটু পরেই তো পড়েছিল আর একজন, তারও আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না—কিন্তু কার কতটুকু ক্ষতি হ'ল তাতে? অন্তত আপনার মনে কতটুকু দাগ পড়ল তার জন্যে?

বীতরাগের হেতু স্পষ্ট হ'ল এতক্ষণে। মড়াইয়ে বিগত তিন দিনের ঘটনাবলী মনে পড়ল। বিশেষ করে আজকের দুপুরের ব্যাপারটা। হাসতে লাগল অল্প অল্প।—এই ব্যাপার!...তোমাকে আজ ওই সর্দার লোকটার কাছে বসে থাকতে দেখেছিলাম বটে, কি যেন বলছিলে...কি বলছিলে?

বলছিলাম, তোমার লোক মরেছে তাতে কি হয়েছে, তাকে তো সরিয়েই ফেলা হয়েছে চোখের সামনে থেকে—এখন বড় সাহেবের মেজাজ গরম হবার আগে তাড়াতাড়ি সব কাজে লাগো গে যাও।

যাই বলুক, সদলবলে সর্দার কাজে লেগেছে, নিজের চোখে দেখেছে। বাদল গাঙ্গুলি মৃদু মৃদু হাসছে তেমনি। ঘাড় ফিরিয়ে সকৌতুকে তাকালো দুই এক বার, দেখল। পরে বলল, বুঝলাম।

রাস্তার ওপর আড়াআড়ি বড় একটা শুকনো গাছের ডাল পড়ে আছে। খেয়াল না করেই সান্ত্বনা পেরিয়ে গেল সেটা। বাদল গাঙ্গুলিও। দড়ি বাঁধা সুপুরির খোল আটকে যেতে ছেলেটা কাত হয়ে পড়ল। দুজনেই ওরা ঘুরে দাঁড়াল। ছেলেটার হাতে লাগল বোধ হয় একটু, হাত ঘষতে ঘষতে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তার সারথির দিকে। সান্ত্বনা অপ্রস্তুতের একশেষ। কিন্তু ছেলেটাকে ধরার অবকাশ পেল না, তার আগেই ছুটে পালালো সে।

বাদল গাঙ্গুলির মজা লাগছে বেশ। নিঃশব্দ দৃষ্টি-বিনিময়। শুকনো ডালটা সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে দিল। দু'চার হাত টেনেই দড়িটা হাত থেকে ফেলে দিল সান্ত্বনা।

দেখলে ?

মুখ তুলে সান্ত্বনা তাকালো শুধু।

ওই শুকনো ডালটা পথ আটকে ছিল।

তাতে কী ?

বলছিলাম, এখন ওটা শুধু একটা বিঘ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে সান্ত্বনা বলে উঠল, তা বলে মানুষও তাই ?

মানুষের শোকটাকে যদি অমনি করে চোখের সামনে ফেলে রেখে দিই, তাহলে তাই।

সক্ষোভে প্রতিবাদ করে উঠল সান্ত্বনা, লোকটা মাটিকাটা কুলি-মজুর বলেই ওরকম বলছেন, ভদ্রলোক হলে বলতেন না।

দু'চার পা চুপচাপ অগ্রসর হয়ে বাদল গাঙ্গুলি এবারে শান্তমুখে জবাব দিল, আমি নিজে হলেও বলতাম। ওই লোকটার মত আজ যদি আমিও অমনি থেমে যাই, একবারও চাইব না সকলে মিলে আমায় নিয়ে একটা শোকের দেয়াল গড়ে তুলুক।...গাছটা হাতে করে সরিয়ে দিলাম, কিন্তু শোকটাকে তো আর হাতে করে সরিয়ে ফেলা যায় না—যায় কাজে ডুবে থেকে। কিন্তু তোমার সর্দার সেটা বুঝবে কি করে বলো, বোঝে না বলেই এ সময় কাজের তাগিদটাকে এত নির্মম বলে মনে করে। হাসল একটু, কিন্তু তুমিও তো দেখছি তার দলেই।

ফিরে ফিরে দেখছিল সান্ত্বনা। মনের সেই গুমোট চাপা এবারে যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। হালকা লাগছে, ভালো লাগছে, আর ফাঁক বুঝে এবারে রাজ্যের লজ্জা যেন চড়াও করছে ওকে।

একটু এগিয়েই রাস্তাটা মেন কোয়ার্টারস্-এর দিকে ঘুরে গেছে, দুজনেই দাঁড়াল তারা। মুখ তুলে সান্ত্বনা হেসেই ফেলল। বলল, আমার মাথাও ওই সর্দারের থেকে বেশি উর্বর নয়।

নিজের কথাগুলো নিজের কাছেই ভালো লাগছিল বাদল গাঙ্গুলির। মেজাজ প্রসন্ন আরো। বলল, রাগটা একটু পড়েছে দেখছি, যা বলছিলাম শোনো তাহলে,

ওই ওসব জায়গায় আর কক্ষনো উঠবে না।

শেষের ছদ্ম অনুশাসনের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করল সান্ত্বনা, উঠলে কি করবেন ?

ফের উঠলে এই ড্যামে আসাই বন্ধ করে দেব।

সান্ত্বনাও তেমনি জবাব দিল, এই ড্যাম করা ছেড়ে আপনাকে দিনরাত তাহলে আমাকেই পাহারা দিতে হচ্ছে।

বলেই অস্বস্তির একশেষ। ভদ্রলোকের হাসিভরা দুই চোখ যেন ওর মুখের ওপর আটকে আছে। সহজ কথার জবাবে সহজ কিছু বলার ঝোঁকেই বলা। অতশত ভেবে বলে নি। কিন্তু শুনেই মানুষটা দু চোখে পাহারার কাজ শুরু করেছে প্রায়।

আসন্ন সন্ধ্যার নজিরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বাঁচল। আকাশের দিকে একবার চেয়ে কোন কথা না বলে চপল পায়ে সোজা বাড়ির পথ ধরল সে।

যতক্ষণ দেখা গেল ওকে, দেখল বাদল গাঙ্গুলি। তার পর গন্তব্য পথ ধরল সেও।

অনেকটা এগিয়ে সান্ত্বনা পিছন ফিরে তাকালো একবার। ধীরে সুস্থে এগোতে লাগল তার পর। কিন্তু খুব সচেতন মনে নয়। ...ভাবছে আর লজ্জা পাচ্ছে। কিন্তু আরো বেশি লজ্জা পাচ্ছে আর কিছু ভেবে। হোপুনের অমন আকস্মিক মৃত্যু মনে দাগ কেটে বসার মতই। কিন্তু সেই মৃত্যুর বেদনা ছাড়াও সান্ত্বনা আর এক অসহিষ্ণু ক্ষোভে এমন করে কাটালো কেন এ ক'দিন ? কাটালো চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সেই যান্ত্রিক কর্তব্যপরায়ণতা বরদাস্ত করতে পারছিল না বলে, সেই নিষ্প্রাণ রূঢ়তা অসহ্য হয়েছিল বলে ?

...চিফ ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে আর কেউ হলে এমন হ'ত ?

সজল বিড়ম্বনায় ভ্রূকুটি করে উঠল মনে মনে, হ'তই তো।

কিন্তু ভিতরে কেউ বলছে, হ'ত না।

মেজাজ আজ অন্তত মোটেই প্রসন্ন থাকার কথা নয় চিফ ইঞ্জিনিয়ারের। ছিলও না। দুপুরে মড়াই থেকে উঠে অফিসে এসেই হেড অফিসের চিঠি পেয়েছে। এক্সপার্ট কমিটি আসার দিনক্ষণের নির্দেষ। মাঝে দিন পনের বাকী।

এক্সপার্ট কমিটি ড্যামের গঠন পরিদর্শন করবেন। আলাপ আলোচনা করবেন। মতামত জানাবেন। আর, ঘোষ-চাকলাদারের সিমেন্ট সংক্রান্ত গোলযোগের ব্যাপারটারও নিষ্পত্তি করে যাবেন।

সরকারী কাজে এই পরিদর্শন-নীতি জানা আছে। কিন্তু আনঅফিসিয়াল এক্সপার্ট কমিটির হাতে এই শেষের দায়িত্ব অর্পণ মনঃপূত নয়। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সততা এবং কর্তব্যপরায়ণতা ডিপার্টমেন্টই ভালো জানে। বাইরের কারো জানার কথা নয়। আর, এজন্য এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যস্থতা নিষ্প্রয়োজন।

যাই হোক, ও গোলযোগের মুখোমুখি দাঁড়ানো আছেই একদিন, জানে। নরেনের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বলেছিল, বিকেলে বাড়ি আসতে, পরামর্শ আছে।

কিন্তু একেবারে ভুলে গেল।

সচরাচর হয় না এমন ভুল। নিজের কোয়ার্টারের দিকে পা চালিয়েও ঠিক মনে পড়ে নি। আপন মনে হাসছে তখনো। রোমন্থন করছে কিছু। মিষ্টি কিছু। আগে এ রকম বিস্মৃতির আভাস মাত্রে চোখ রাঙিয়ে সচেতন করেছে নিজেকে। সেই নারীবিদ্বেষী বিবরাশ্রয়ীদের শেকল খুলে দিয়েছে। অসহিষ্ণু রোষে মুহূর্তে প্রশ্রয়ের দূতকে ছিন্নভিন্ন করেছে তারা। কিন্তু এই এক মেয়ের কাছে ওরা হার মেনেছে। আলোর ঘায়ে হার মানা কীটের মত অগোচরে আশ্রয় নিয়েছে। ...কবে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিজেও জানে না।

চলতে চলতে একটা অবান্তর কথা ভাবছিল বাদল গাঙ্গুলি। প্রায় ছেলেমানুষের মতই ভাবছিল, এই মেয়েটিকে ওর মা দেখলে ভারি খুশি হ'ত।....

অকারণেই এইবার নরেনের কথা মনে হ'ল কেমন। ওর সঙ্গে ওই বাপ-মেয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা। এ সবে কৌতূহল প্রকাশ করে নি কখনো। তবু জানে।....কিন্তু এতদিনেও কোন সম্ভাবনার আভাস পর্যন্ত পেল না কেন? ভুরু কুঁচকে ভাবতে ভাবতে চলল। বোধ হয় সেটা সম্ভব নয়। সামাজিকতার বাধা আছে হয়তো। এমন কিছু অতি আধুনিক মানুষ নন অবনী রায়।

নরেনের কথা মনে হতে খেয়াল হ'ল বিকেলে ওকে আসতে বলেছিল। এতক্ষণে এসে বসে আছে হয়তো। তাড়াতাড়ি পা চালালো।

নরেন অপেক্ষা করছিল ঠিকই। গোটা দুই সিগারেট শেষ করে কানকাঠি নিয়ে পড়েছে। প্রতীক্ষা ভালো লাগছে না খুব। এই সময়ে ঠিক এইখানে বসে থাকার কথা নয় তার।

বাদল গাঙ্গুলি ঘরে ঢুকে বলল, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তো?

একটা চেয়ার টেনে বসল সামনে। হাসির আভাস। কানকাঠি কিছুটা দুর্গমে ঠেলে দিয়েছিল নরেন চৌধুরী। সেটা নিরাপদে ফিরিয়ে এনে তাকালো তার দিকে।—এত দেরি যে?

তোমার প্রিয় বান্ধবীর জন্যে। প্রসন্ন হাস্যে জবাব দিল, ভয়ানক রাগ আমার ওপর—তুমি বসে আছ ভুলেই গেছি।

চুপচাপ নরেন যেন কান সুড়সুড়ির আমেজ উপভোগ করে নিল একটু—রাগ কেন?

আমি একটি অত্যাচারী পাষণ্ড, তাই। লোকের জন্য কোন মায়া-মমতা নেই, কুলি-মজুররা মরে গেলেও কাজ আদায় করে নিই—

নরেন অবাক।—বলল একথা?

প্রায়—। উৎফুল্ল মুখে হেসে উঠল বাদল গাঙ্গুলি। মেয়েটি সত্যি ভালো হে, .শেষে রাগ পড়লে লজ্জায় একাকার।

মুখ টিপে হাসছে নরেনও। বাহ্যিক মনোযোগ কানকাঠির দিকেই বেশি।... এরকম নির্মেঘ সজীবতা আগে আর কবে দেখেছে? অনেক দেখেছে। কলকাতার নেশান বিলর্ডাস লিমিটেড-এ দেখেছে। এর থেকে অনেক বেশি দেখেছে। তবে নেশান বিলর্ডাস ছেড়ে আসার পর আর দেখে নি। কানকাঠি পকেটে ফেলে সোজা হয়ে

বসল।—সান্ত্বনাকে তোমার কমপ্লিমেন্টটা জানিয়ে দেব'খন—আরো খুশি হবে আর আরো লজ্জা পাবে। যাক, এখন এদিকের খবর কি বলো।

বস্তুরাজ্যে ফিরে এলো বাদল গাঙ্গুলি। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে সামনে রাখল।..দিন পনেরোর মধ্যেই আসছেন মহারথীরা...কে কে আসছে লেখে নি।

আসবে তো জানা কথাই।

কি করা যায় ভাবছি।

সিমেন্ট কেস্-এর ?

হুঁ।

এ ব্যাপারে তাদের মতলবটা কি না জানলে আগের থেকে তুমি ভেবে কি করবে ?

মতলব কিছুটা বোঝা যাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকে নরেন বলল, গেলেও তোমার ভাবনার কিছু দেখিনে। ঘোষ-চাকলাদারের দুর্ভোগ যা হবার যথেষ্ট হয়েছে। মাসের পর মাস লোকসান খেয়েছে, অপদস্থ হয়েছে, ঘুষ দিতে এসে নাজেহাল হয়েছে, তার পর আসল দোষী যে সেও সরে গেছে এখান থেকে—এর পরেও ভাবা যখন স্বভাব তোমার, ভাবো বসে বসে, কি আর করবে।

পরামর্শের জন্য ডেকেছিল, কিন্তু এ রকম নির্বিকার পরামর্শ বাদল গাঙ্গুলি আশা করে নি। তবু হেসেই ফেলল সেও। বলল, তোমার উপদেশ মনে রাখতে চেষ্টা করব।

এক্সপার্ট কমিটি আসার প্রতিলিপি পেয়েছে ঘোষ-চাকলাদার ফার্মের দ্বিজেন চাকলাদারও। কারণ, এই পরিদর্শনের সঙ্গে সিমেন্ট কেসও জড়িত।

খুশি এবং আশান্বিত হবার কথা।

কিন্তু কর্মজীবনে দ্বিজেন চাকলাদার এত অসহায় আর কখনো বোধ করেনি।

তিন মাস হতে চলল পার্টনার নিরুদ্দেশ। রণবীর ঘোষের খবর-বার্তা দ্বিজেন চাকলাদারও যথার্থই জানে না। এই তিন মাসে ক্রমাগত কলকাতা এবং মড়াইয়ে ছোটাছুটি করে কালঘাম ছুটেছে। মড়াইয়ের কাজ শেষ হলে রণবীর ঘোষের সঙ্গেও বরাবরকার মতই শেষ করে দেবে, জানা কথাই। অনেক হয়েছে, আর নয়। কিন্তু সদ্য বর্তমানকে সামাল দেবে কি করে ভেবে পাচ্ছে না।

নারী-ঘটিত ব্যাপারে তার দু'দশ দিন ডুব মেরে থাকাটা নতুন নয়। আগেও এরকম করেছে অনেকবার। ওই সর্দারের মেয়েটাকে সরানোর পরেই তো নিখোঁজ হয়েছিল পনের দিন। কিন্তু তিন মাস অভাবনীয়...। বিশেষ করে এই সংকটের সময়। এখান থেকে সে যাবার আগেই হাবভাব দেখে বুঝেছিল, কিছু একটা মতলব ফাঁদছে। সে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের এই মেয়েটির জন্যে, সঠিক বোঝে নি। এর পর মড়াইয়ে আসা সম্ভব নয় তার পক্ষে ঠিকই। এমন কি কলকাতাতেও কিছু দিন তার গা-ঢাকা দিয়ে থাকারই কথা। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তাকেও একটা খবর

পর্যন্ত দেবে না, এমন দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতা ভাবা যায় না। ওই মেয়েটাই উল্টে যাদু করল নাকি শেষ পর্যন্ত!

রাগে আর দুশ্চিন্তায় জ্বলছে দ্বিজেন চাকলাদার। মনে মনে বুঝেছে হাতের টাকা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত রণবীর ঘোষের আর টিকি দেখা যাবে না। চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে ঘুষ দেবার জন্য আনা সেই তিরিশ হাজার টাকা তার হেপাজতেই ছিল। লোকটা অপচয় করত, কিন্তু টাকা-পয়সার গরমিল করত না কখনো। তাই এদিকটা ভাবে নি দ্বিজেন চাকলাদার। মাত্র তিরিশ হাজার নিয়ে সরে আজও পড়বে না। শেষ করে তবে আসবে।

কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই ছোট মড়াইয়ে আর একটা খবর ছড়ালো।

আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল দ্বিজেন চাকলাদারের।

খবরটা মহাসমারোহে রাষ্ট্র করলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের গৃহিণী মিসেস চ্যাটার্জী। ঝরনার মা।

মায়ের ওপর মেয়ের রাগ পড়েছে এতদিনে। চিঠি লিখেছে।

কোথা থেকে?

—আর বলো কেন কাণ্ড! যেখানে যাচ্ছেন আনন্দে আর গর্বে ডগমগিয়ে উঠছেন মহিলা।—একেবারে সেই বিলেত থেকে—লণ্ডন থেকে! বিয়ে? ও মা, বিয়ে করেই তো গেছে! জামাই মস্ত বিদ্বান,—এখানে অবশ্য চাকরিটা তেমন ভালো করত না, কলেজে প্রোফেসারি করত একটা। কিন্তু অত বিদ্বান ক'দিন আর ছাইচাপা থাকবে? যারা কদর বোঝে, তারাই ডেকে নিয়ে চাকরি দিয়েছে। শুধু তাই! মেয়েটা পর্যন্ত সেখানে কি একটা চাকরিতে লেগে গেছে। তাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

আনন্দে গর্বে মিসেস চ্যাটার্জী হেসে কেঁদে সারা। চেনা মুখ মাত্রেই সবিস্তারে সুখবর জানিয়ে দিলেন। স্বামীর ওপর হুকুমজারী হ'ল, অফিসসুদ্ধ লোক যেন অবিলম্বে জানতে পারে খবরটা। শুধু তাই কেন, বেশ ভালো করে একটা পার্টিও তো দিতে হবে সকলকে!

মনে মনে বিশ্বাস করল না শুধু দুজন। ঝরনার বিলেত যাওয়াটা নয়, প্রোফেসারকে বিয়ে করাটা।

একজন ভুতুবাবু। অন্যজন দ্বিজেন চাকলাদার।

ভুতুবাবু হাসল মনে মনে। আর দ্বিজেন চাকলাদার ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট সব কটা ব্যাঙ্কে নোটিশ দিল, একলার দস্তখতে রণবীর ঘোষ আর যেন এক পয়সাও না তুলতে পারে। অথবা, তার নির্দেশ ছাড়া কোথাও যেন তাকে টাকা না পাঠানো হয়। রণবীর ঘোষ শেষ কত টাকা তুলেছে না তুলেছে, তারও হিসেব চেয়ে পাঠালো সে।... বিলেত যদি গিয়েই থাকে, তিরিশ হাজার টাকা দুজনের পক্ষে বেশি দিন নয় খুব। ক্ষতি যা হয়েছে, হয়েছে—দ্বিজেন চাকলাদার এবারে ভালো হাতে শিক্ষা দেবে তাকে।

মড়াইয়ের আকাশে এমন ঘনঘটা এর আগে আর দেখে নি কেউ। কটা দিনের

জন্য মাত্র বর্ষণে ছেদ পড়েছিল একটু। আকাশ আজ যেন এক অদ্ভুত কালোর ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

মিসেস চ্যাটার্জী অর্থাৎ ঝরনার মায়ের সঙ্গে আজ আবার দেখা হয়েছিল সান্ত্বনার। ভিন্ন মূর্তি মহিলার। মেদবহুল দেহে অত আনন্দোত্তেজনা যেন ধরে না। ওকে ধরে-বেঁধে ঝাড়া একঘণ্টা মেয়ের সমাচার শুনিয়েছেন। এই মেয়েটার কাছেই নিজের মেয়ের সম্বন্ধে মস্ত দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন একদিন। এটা তারই জের, সান্ত্বনা বোঝে।

আকাশের অবস্থা দেখিয়ে কোন রকমে ছাড়ান পেয়ে এসেছে। শুধু সান্ত্বনা নয়, ঘরমুখী হয়েছে সবাই। অল্প অল্প বাতাস বইছে। গুড়-গুড় মেঘ ডাকছে জলদগম্ভীর। মেঘের কালো সমস্ত দিনের আলো টেনে নিচ্ছে শুষে নিচ্ছে যেন।

কিন্তু এরই মধ্যে ওই মহিলার কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ির দিকে চলেছে সান্ত্বনা। খবরটা রাষ্ট্র হওয়ার পরে ভুতুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর। ভুতুবাবুর সবজান্তা হাসি ভালো লাগে নি সেদিন। আকারে প্রকারে যা বলেছে তাও না। গলা নিচু করে বলেছে, বিলেত যাওয়া আজকাল আর শক্ত কি মা-লক্ষ্মী—গেলেই হ'ল।—তবে কার সঙ্গে গেছেন সেটাই কথা।...অমনি একবার গিয়েছিলাম ঘোষবাবুর পার্টনার দ্বিজুবাবুর কাছে—ওই দ্বিজেন চাকলাদার মা-লক্ষ্মী। ভদ্রলোক স্নেহ করেন একটু-আধটু...শুনলাম যা, তাতে তো ভুতুর চক্ষুস্থির।

চক্ষুদ্বয় খানিক স্থির করে সেটা দেখাল ভুতুবাবু। পরে খদ্দেরের সাড়া পেয়ে উপসংহার টেনে দিল চট করে।—তা গেছে যখন গেছেই, যার সঙ্গে যাক, ভালো থাকলেই ভালো, কি বলেন মা-লক্ষ্মী? আমাদের অতশত খোঁজে কাজ কি...

মহিলার সকল দোষ সকল অপ্রিয় আড়ম্বর মন থেকে মুছে গেছে সান্ত্বনার। আ-হা, যা ভাবছেন মহিলা, তাই যেন সত্যি হয়। ওঁর এত আনন্দ এত আশা আবার যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়। ভুতুবাবুর কথা মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক।

বাড়ি ফিরতে হাঁপ ফেলে বাঁচলেন অবনীবাবু। বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বকাবকি করলেন একপ্রস্থ—এ ঝড় যদি এসে যেত কি হ'ত। কাকপক্ষী বাইরে নেই, অথচ মেয়ের যদি হুঁশ থাকত একটুও।

কিন্তু ঝড় এলো আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। এই এক ঘণ্টা জানালার কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা। দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মেঘের নিচে মেঘ এসে জমছে, তার নিচে আবার। মাঝে মাঝে শুধু সেই জলদ গুড়-গুড় শব্দ একটা। ভয়াল ভয়ঙ্কর, বিরাটের রুদ্র সুন্দর মহিমা। ওই পাহাড়, ওই মাটি, ওই গাছপালা, ওই বাতাস সব এক মহারুদ্রের বেদনাতুর প্রতীক্ষায় স্তব্ধ, সমাহিত।

সান্ত্বনাও।

ঝড় এলো। ঝড় নয়, প্রলয়। কল্পান্ত।

জানলা বন্ধ করে ঘরের দরজার একটুখানি খুলে বারান্দার ওদিকের দেয়াল ছাড়িয়ে সেই ক্ষমাহীন লীলার দিকে চেয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের ঝাপটায় দরজা আঁকড়ে আছে, জলের কণা ছুঁচের মত বিঁধছে মুখে। হুঁশ নেই সান্ত্বনার।

মড়াই বন্ধনের অন্তিম বিদ্রোহ? পাহাড় ভেঙে পড়বে? প্রকৃতি লণ্ডভণ্ড করে দেবে তার আপন সৃষ্টি?...প্রাণের পরে আজ যেন তার অন্ধ ঈর্ষা। তবু অপরূপ। সমস্ত আকাশে বুঝি অজস্র সিংহের মাতামাতি হানাহনি। তবু অপরূপ। আলুথালু হতাশ বনস্পতি পড়ছে মুখ থুবড়ে। তবু অপরূপ।

দরজা ধরে ঠক ঠক করে কাঁপছে সান্ত্বনা। ভয়ে নয়, ওই বিরাটের স্পর্শে। ওই অপরূপের স্পর্শে। স্রস্ত বসন, জলকণায় সর্বাঙ্গ ভিজে, খোলা চুল উড়ছে। দুনিয়া ঝলসানো বাজ পড়ল একটা কড়কড় করে। দরজা আঁকড়ে তবু দাঁড়িয়েই আছে তেমনি। নির্বাক, নিস্পলক, বোবা। কিন্তু ওর ভিতরে বলছে কেউ। বলছে কিছু। আর কাঁপছে থরথর।—থামো, থামো, থামো। আর দেখিও না. আর দেখিও না। আর দেখতে পারিনে। আর সইতে পারিনে। ওই সর্বগ্রাসী বিরাটের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে পারিনে! এবারে শান্ত হও। এবারে সুন্দর হও। শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি, শান্তি... দুচোখ বুজে এলো সান্ত্বনার। নিস্পন্দ, বিহ্বল।

॥ ১৩ ॥

শোকের বাড়ি থেকে শবদেহ অপসারণের পরেও যেমন মৃত্যুর চিহ্ন ছড়িয়ে থাকে, ঝড়ের পরে গোটা মড়াইয়ের সেই অবস্থা। সমস্ত প্রাকৃতিক স্থাবরতার একেবারে গোড়ায় পড়েছে যেন। পাথরে আর গাছপালায় মড়াই ছেয়ে গেছে। রাস্তার অবস্থাও তাই। এতদিনের ওপারের কুলি-বসতির পাকা ব্যবস্থা সত্ত্বেও যে কটা তাঁবু ছিল, মাটি নিয়েছে। তবে লোকক্ষয়ের খবর কিছু কানে আসে নি। সময়ে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে উঠে থাকবে। সাময়িক অবরোধের ওধারে মড়াইয়ের লাল জলে গৃহস্থের আটচালা ভাসছে অনেকগুলো। আর গাছের ভাঙা ডাল। মড়াইয়ের গৈরিক-যৌবনে যেন কলঙ্ক লেগেছে।

সম্পূর্ণ দিন কেটে গেল রাস্তা পরিষ্কার করে, মড়াইয়ের গহ্বর থেকে পাথর আর গাছপালা সরিয়ে মোটামুটি কাজের ব্যবস্থায় ফিরে আসতে। তার পরের দিন বিধাতা যেন কৃপণ হাতে আলোও পাঠালেন একটু, মিষ্টি রোদ চিকচিকিয়ে উঠল। সকাল থেকে কাজের তাড়া লাগল মড়াইয়ে।

তার পরই অপ্রত্যাশিত আলোড়ন আবার একটা!

দূর থেকে, ওই দূর থেকে খবরটা কানাকানি হয়ে এদিকে পাগল সর্দারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছুতে সময় লাগল না খুব। কোদাল শাবল গাঁইতি ফেলে পায়ে পায়ে লোক চলল সেদিকে। ওই দূরে, যেদিকে পাহাড় ঘেঁষে মড়াই বেঁকে গেছে সম্পূর্ণ, যেদিকে আকাশে শকুনি উড়ছে অনেকগুলো, সেদিকে। কৌতূহল, চাপা উত্তেজনা, ক্রমশঃ বাড়তে লাগল সেটা। কাজ শুরু হবার আগেই কাজে ছেদ পড়ল আবার।

আর উত্তেজনায় একেবারে বসে পড়েছে পাগল সর্দার। স্বজাতীয়দের অনেকে দৌড়ে এসেছে ওর কাছে। নিজেদের ভাষায় বলাবলি করেছে কি। তার পর আবার ছুটেছে।

আনন্দে গড়াগড়ি করতে ইচ্ছে যাচ্ছে পাগল সর্দারের। ঠিকমত চেনা যাচ্ছে না বলে খটকা লাগছে ওদের মনে? কিন্তু না দেখেও এতটুকু সংশয় নেই পাগল সর্দারের। সে নিঃসন্দেহে বলে দিতে পারে লোকটা কে? বলে দিতে পারে ঝড়ে পাথর নড়ে কার বিকৃত শব মড়াইয়ে গড়িয়েছে! শব নয় ঠিক, শব হলে সকলে চিনতে পারত। কঙ্কালে পরিণত হয়েছে প্রায়। কিন্তু পাগল সর্দার ঠিক বুঝেছে। না দেখেও চিনেছে। তোরাও চিনবি। হাতে হীরের আঙটি নেই দুটো? পোশাক-আশাকের চিহ্ন নেই? নীল চশমা? পাহাড়ে উঠে খোঁজ করগে যা, যেখান থেকে গড়িয়েছে ওটা, সেই জায়গাটা খুঁজে বার করগে যা—ঠিক মিলবে কিছু, তোরাও চিনবি ঠিক!

এসব খবর বাতাসে ছড়ায়। কর্মকর্তারাও সবাই গুরুগম্ভীর মুখে চলেছেন সেদিকে। এমন কি দোকান ফেলে আজ ভুতুবাবুও নেমে এসেছে। থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে ভুতুবাবুর। গোল চোখ স্থির হয়ে আসছে এক একবার। সেই এক সকালে কেন জলে থৈ-থৈ করছিল সমস্ত ঘর এখন আর সেটা বুঝতে না চাইলেও বুঝতে পারছে। যত পারছে ততো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

পাগল সর্দার দেখছে সকলকে। যারাই যাচ্ছে ওদিকে, চেয়ে চেয়ে দেখছে তাদের।—দেখগে যাও, বেশ ভালো করে দেখে নাওগে যাও! তার কালো মুখে গলগলিয়ে হাসি উপচে উঠছে।

সান্ত্বনাকে দেখে আনন্দে একেবারে যেন অধীর হয়ে উঠল সে।—দিদিয়া! আঁই রে দিদিয়া। উদিন তুকে বলি নাই হোপুন মরদ ছেলে? আখুন দেখে লে রে দিদিয়া, আখুন দেখে লে!

স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে নি। যেটুকু ছড়িয়েছে আভাসে ইঙ্গিতে। সান্ত্বনার কানে গেছে, কিন্তু মাথায় ঠিকমত ঢোকে নি যেন। এখনো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল সর্দারের মুখের দিকে। কিন্তু আজ এই প্রথম এত হাসি এত আনন্দের মধ্যেও সর্দারের মূর্তিটা কেমন যেন কুৎসিত ঠেকল ওর চোখে।

পারলে ধেই ধেই করে নাচত সর্দার। অনর্গল কত কথা বলল, কত কি বলল ঠিক নেই। সবই হোপুনের প্রশস্তি! ও একটু থামলেই সান্ত্বনা বাড়ি ফিরবে ভাবছিল।

কিন্তু এরই মধ্যে আবার একটা বিশেষ উত্তেজনা দেখা গেল লোকজনের ছুটোছুটি আনাগোনায়।

আবার এক চমকপ্রদ চাঞ্চল্য। আবার এক হাড়-কাঁপানো খবর।

লোকজন পাহাড়ে উঠেছিল মৃতের চিহ্ন খুঁজতে। বেশি খুঁজতে হয় নি। পেয়েছে। সেই সঙ্গে আর একটা ভয়াবহ আবিষ্কারে স্তব্ধ সকলে।

আর একটা কঙ্কাল। এটা সম্পূর্ণই কঙ্কাল।

কিন্তু পুরুষের নয়। নারীর। রূপোর গয়না আটকে আছে কিছু, পাশেও পড়ে আছে দু'চারখানা।

কখন, কেমন করে বাড়ি ফিরেছে সান্ত্বনা খেয়াল নেই। কেমন করেই বা

সর্দারকেও নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে এত পথ হেঁটে জানে না। এক সময়ে সর্দারের হাত ধরে টেনেছিল মনে আছে। সর্দার যন্ত্র-চালিতের মত উঠে এসেছিল তাও মনে আছে। তার পর কখন বাড়ি এসেছে হুঁশ নেই।

ভিতরের দাওয়ায় বসে আছে সর্দার। সান্ত্বনা ঘরে। অবনীবাবু ক্রমাগত ঘর-বার করছেন। এ অবস্থায় এভাবে দুজনকে রেখে বেরুতেও পারছেন না। মুখে কেউ শোরগোল না করলেও ওই দুটো কঙ্কালের একটিকে মনে মনে সনাক্ত করেছে সবাই। পুরুষকে। কিন্তু দ্বিতীয়টিই সকলের বিভ্রান্তির কারণ। সঠিক বুঝে ওঠে নি কেউ। অবনীবাবুও না। কিন্তু এদের দুজনকে দেখে অনুমান করেছেন। বুঝেছেন।

সান্ত্বনার ইচ্ছে হচ্ছিল দেয়ালে মাথা ঠুকে সচেতন করে নিজেকে। তার যে এখনো অনেক ভেবে দেখার আছে, অনেক কিছু বুঝতে বাকী। রোদ উঠলে যেমন কুয়াশা মিলোয়, তেমনি সোজাসুজি একবার নিজের ভিতরে তাকাতে পারলেই কিছু একটা প্রহেলিকার যেন অবসান ঘটতে পারে। কিন্তু তাকাতেও পারছে না, ভাবতেও পারছে না। একটা বোবা নিষ্ক্রিয়তা একেবারে গ্রাস করেছে ওকে।

...এই জন্যেই আসবে বলেও আর আসেনি চাঁদমণি। সেই রাত্রিতেই হয়তো ধরা পড়েছে। মরণ শানাচ্ছিল যে মানুষটা তার হাতেই ধরা পড়েছে। সে দৃশ্য ভাবতে গিয়ে অব্যক্ত ব্যথায় একলা ঘরে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সান্ত্বনা। চাঁদমণির সেই পা-ছোঁয়া স্পর্শ সর্বাঙ্গে সিড়সিড়িয়ে উঠল। হয়ত কাঁচপোকার মত টেনে নিয়ে গেছে, বলির পশুর মত...। সান্ত্বনার মনে হ'ল, বুকের হাড়গুলো যেন মটমট করে ভাঙছে কে। ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু যাবে কোথায়? দাওয়ায় পাগল সর্দার। আস্তে আস্তে বসে পড়ল আবার।

...তার পর ফাঁদ পেতেছে হোপুন। সেই প্রলোভনের ফাঁদে রণবীর ঘোষকে আটকেছে। পিচ্ছিল প্রলোভনের ফাঁদ। উপলক্ষ্য সান্ত্বনা। সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে আবার। ওই জন্যেই জিপে সেই লোকটার পাশে দেখা গেছে তাকে। ওই জন্যেই মড়াইয়ে আর সেই গরু-চরা পাহাড়ের নির্জনে হোপুন অমন করে চেয়ে চেয়ে দেখত ওকে। ওই ফাঁদ দেখেই ভুতুবাবু ওকে সতর্ক করে দিতে এসেছিল। আর পাগল সর্দার ওকে সতর্ক করতে এসেছিল তো হোপুনেরই ইঙ্গিতে।

ভিতরে ভিতরে সব কটা উপলব্ধির তার যেন একসঙ্গে সজাগ করে তুলতে চাইল সান্ত্বনা। ব্যাকুল আকূতি। ওই পাষাণ-মূর্তি লোকটার নির্মম নৃশংসতাই বড়, না আর কিছু বড়?

চমকে উঠল একেবারে। ঘরের চৌকাঠে পাগল সর্দার দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি-বিনিময় হতে বলল, আখুন যাই রে দিদিয়া...।

সান্ত্বনা অবাক। যেন দুটো গল্পগুজব করতে এসেছিল, সুখ-দুঃখের কথা কইতে এসেছিল—বেলা পড়ে আসছে দেখে এখন চলল। সান্ত্বনা মাথা নেড়েছিল কি না নিজেই জানে না।

বাইরে এসে মেন কোয়ার্টারস্-এর রাস্তা ধরল পাগল সর্দার। কলের মত এগিয়ে চলল সে। মেন কোয়ার্টারস-এর ভিতর দিয়ে, গেস্ট হাউসের পাশ দিয়ে একেবারে

পাহাড়ের ধারে এসে দাঁড়াল। পায়ের নিচে মড়াই। বাঁয়ে শুকনো খটখটে। যেদিকে ড্যাম বাঁধা হচ্ছে। ডাইনে মাটির সেই সাময়িক প্রতিরোধ।

অন্যমনস্কের মত হাঁটতে হাঁটতে ছাড়িয়ে গেল সেটা। আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে থামল এক জায়গায়। এখানেও পায়ের নিচে অতলান্ত মড়াই। কিন্তু এখানে মড়াইভরা জল। লাল জল। লাল যৌবন। উচ্ছল, কলকল। একাগ্র মনোযোগে পাহাড়-ঘেঁষা ওপারের দিকে দেখতে লাগল পাগল সর্দার।

....কোন্ জায়গাটা হবে? তখন তো মড়াইয়ে জল ছিল না এককোঁটা। আর কত বছরের কত কালের কথা সেটা।

কিন্তু কোন্‌খানটায় হবে?

কোন্‌খানটায় আজও ঘুমিয়ে আছে চাঁদমণির মা ফুলমণি?

এইখানটায়?....নাকি ওইখানটায়?

জলের নিচে ঠাওর করা শক্ত। জলের নিচে পাথর, তার নিচে মাটি, তার নিচে....

মস্ত শিকারী ছিল পাগল সর্দার। এমন শিকারী হয় না নাকি। কিন্তু শিকার করা ছেড়ে দিল কেন? সকলের বিস্ময়।

ছাড়বে না-ই বা কেন? বড় শিকারের পরে ছোট শিকারে হাত ওঠে, না মন ওঠে? শেষ যে শিকার করেছে পাগল-সর্দার....বাঘ-ভালুকও তুচ্ছ। তারপর শিকার ছাড়বে না তো কি।

পাহাড়ীরা ছিল ওদের জাতশত্রু। পাহাড়ের ডগায় থাকত। ফাঁক পেলে এসে লুঠতরাজ করে যেত। ওদেরই কাউকে মনে ধরেছিল ফুলমণির। এদেরই কারো সঙ্গে 'ছাড়ুই' হয়ে চলে গিয়েছিল। সর্দার তো বনে-জঙ্গলে শিকার নিয়ে থাকত বছরের বেশীর ভাগ সময়। সে শিকার জলো ঠেকল এর পর। শিকারীরা ধৈর্যের পাহাড় নাকি। মিথ্যে নয় বোধ হয়। প্রায় এক বছর ধৈর্য ধরেছিল পাগল সর্দার, নিবিড় প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে ছিল। শিকার আসবে জানত। বনের হরিণ ঝোপে-ঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে কতক্ষণ। তার স্বভাবই তাকে টেনে আনে। ফুলমণিই বা পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ানো ভুলে থাকবে ক'দিন? তার স্বভাবও তাকে টেনে আনবে।

এনেছিল।

বছরের বড় শিকারের উৎসবে বেরিয়েছিল সাঁওতালরা। পাঁচ দিনের দেশময় শিকারোৎসব। ছেলে বুড়ো ঝেঁটিয়ে বেরোয় 'ডুবু ডুবু' নাগর পিটিয়ে, 'শরং শরং' বাঁশি ফুঁকে আর 'তুতু তুতু' শাকোয়া বাজিয়ে। কাছে দূরে কে আর না টের পায় ওদের এই শিকার অভিযান। পাঁচ দিন আর কোনো মরদ পুরুষের টিকি দেখা যাবে না দেশে গাঁয়ে।

কিন্তু পাগল সর্দার যায় নি।

সেও বড় শিকারেরই প্রতীক্ষা করছিল।

সূয্যি-ডোবা আবছা আলোয় শিকার সেদিন নিঃশঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছিল ওই ছোট খাড়া পাহাড়টার ডগায়।

এত মন দিয়ে আর কখনো তীর ছোড়ে নি বোধ হয় পাগল সর্দার।

বাণবিদ্ধ পাখি যেমন উল্টে-পাল্টে শূন্য থেকে নেমে আসে মাটির দিকে, ওর শিকারও তেমন লপ্‌টে-ঝপ্‌টে নেমে আসছিল নিচের দিকে। সবটা আসে নি, কাছেই একটা পাথরে আটকে গিয়েছিল। ক্ষিপ্রচরণে সর্দার গিয়ে তুলে নিয়েছিল তাকে। শিকার একবার মাত্র চোখ মেলে দেখেছিল তার নির্মম শিকারীকে, তার পর পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজেছিল। অতি যত্নে, অতি সঙ্গোপন বুকে করে শিকার নিয়ে নেমে এসেছিল সর্দার। তার পর....

তার পর, ওই জলের নিচে পাথর, তার নিচে মাটি, আর তার নিচে....

নরেনকে দেখা মাত্র সান্ত্বনা ভিতরের গুমোট অসহিষ্ণুতা কাটিয়ে ওঠার পথ পেল যেন। এক পলক দেখে নিয়ে আল্‌তো প্রশ্ন করল, কবে এলেন?

নরেন অবাক। কবে এলাম কি রকম?

নির্লিপ্ত মুখে সান্ত্বনা আবার তাকালো তার দিকে--আপনি কি এখানেই ছিলেন নাকি এ ক'দিন?

জবাব না দিয়ে নরেন হাসতে চেষ্টা করল একটু। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আরো অবাক সে। এ ঠিক ঠাট্টাও নয়, অনুযোগও নয়। নিরুত্তাপ অভিমানের ঝাঁজ একটু।

বাদল গাঙ্গুলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই সন্ধ্যায় নরেন এসেছিল। আশা করেছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটা সান্ত্বনা তুলবে। কিন্তু সান্ত্বনা তার ধার দিয়েও যায় নি। পরদিনও না। অথচ হোপুনের দুর্ঘটনার পরের সে থমথমে মুখভাব আর ছিল না। বরং খুশিতে উপচে উঠতে দেখেছিল অনেকবার। বাদল গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগের প্রসঙ্গ সান্ত্বনা আগেও সন্তর্পণে পরিহার করেছে। অথচ ভিতরের একটা চাপা আনন্দ চাপতে পারে নি। তাছাড়া আরো অনেক কিছু উপলব্ধির কারণ ঘটেছে অনেকবার।....বিশেষ করে মাসির বাড়ি যাওয়ার আগে সেই বিকেলে নরেনের হাল্‌কা ইঙ্গিতে অপ্রতিভ লালিমায় ধড়মড়িয়ে উঠে ওর রান্নাঘরে পালানো।

এবারেও সান্ত্বনা বলে নি কিছু, বাদল গাঙ্গুলি বলেছে। বলেছে, সান্ত্বনার সে কি রাগ তার ওপর। আর রাগ পড়তে লজ্জায় একাকার নাকি। বাদল গাঙ্গুলির বলার মধ্যেও চিরাচরিত নিস্পৃহতার ভাবটুকু নরেন লক্ষ্য করেছিল বৈকি। মনে হয়েছিল, সেই রাগ আর লজ্জা চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মরু-রুক্ষ জীবনে ঠাণ্ডা প্রলেপের কাজ করেছে।

তারপর গত চার-পাঁচদিন আর আসে নি নরেন। ঝড়-জল ছাড়া মড়াইয়ে বিপর্যয়ও কম ঘটে নি কটা দিনের মধ্যে। আজই শুধু জল হয় নি সকাল থেকে। তবু আসবে ভাবে নি। কিন্তু বিকেল হতে পায়ে পায়ে চলে এসেছে কেমন।

আগে হলে এটুকু অভিমানই দখিন বাতাসের স্পর্শ বলে মনে হ'ত। কিন্তু এ প্রশ্রয়ের যাতনা বিষম। এবারে নরেন সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। পাচ্ছে। দাওয়ার ওপর মোড়ায় বসে পড়ে বলল, এ কদিন ঘুমিয়ে কাটালে নাকি, আকাশের অবস্থা দেখো নি?

দু'চার মুহূর্ত অপেক্ষা করে সান্ত্বনা আকাশের অবস্থাটা তার মুখ থেকেই আঁচ করে নিতে চেষ্টা করল যেন। তার পর ঘরে চলে এলো। আধময়লা শাড়িটা বদলে নিল। আয়নায় মাথা আঁচড়ে নিল একটু।

নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে চায় সান্ত্বনা। নিঃশেষে ছাড়িয়ে যেতে চায়। ওই ঝড়টা যেন ওরই বুকের উপর এক অনড় বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেল। বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে ওর ভিতরে ভিতরে। ঘটে যাচ্ছে। দুঃসহ লাগে। ও ভুলতে চায় ওই ঝড়ের কথা। চাঁদমণির কথা, হোপুনের কথা, পাগল সর্দারের কথা....। ওই মানুষদের জীবনের ব্যর্থতা ওকে বুঝি গ্রাস করতে আসছে।

নিজেকে ভুলতে চায়। মাসির বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পর জীবনে যে নতুন জোয়ার এসেছিল, সেই জোয়ারেই আবার ভাসতে চায় সান্ত্বনা। বেরিয়ে আসতে চায় এই স্তব্ধতার আবরণ ভেঙে। চেষ্টাও করছে। চেষ্টা করছে সহজ হতে সুস্থ হতে।

নরেনের কথা ওর সত্যিই মনে হয়েছে এ ক'দিন। মনে হয়েছে, ওই লোকটাই পারে এই অসহ্য গুমোট খান্ খান করে ভেঙে দিতে। বিকেলে জল-বৃষ্টি সত্ত্বেও প্রতীক্ষা করেছে।

ফিরে এসে বলল, চলুন আর বসতে হবে না, বিদঘুটে ছিরি আকাশের, এক্ষুনি হয়তো আবার ঝমঝম শুরু হবে।

একটু দেখে নিয়ে নরেন বলল, বেরোলে পরে যদি শুরু হয়?

হয় হবে, আপনাকে আর সে গবেষণা করতে হবে না, চলুন।

বেরিয়ে সেই পিছন দিকের পাহাড়ী রাস্তা ধরল সান্ত্বনা।

এদিকে কোথায়?

যমের বাড়ি। ফিরে তা্কালো।—ভয় করছে?

ওর দিকে চেয়েই নরেনের আজ হঠাৎ কেমন মনে হ'ল, যে অবকাশের প্রতীক্ষা করছিল এতদিন, আজ সেটা আসবে। যে কথাটা বলি বলি করেও বলা হয় নি এতদিন, সেটা আজ বলা হবে। এ সংশয়ের থেকে সে অনেক ভালো। জবাব দিল, না, তুমি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কি!

ভালো লাগছে সান্ত্বনার। ভালো না লাগিয়ে ছাড়বে না। সেই জোয়ার-জীবনে ফিরে যাবে সঙ্কল্পবদ্ধ। সান্ত্বনা হেসে উঠল। ওই হাসি দিয়ে গোটা পাহাড়ের ওপর থেকে কালো মেঘের ছায়াটা পর্যন্ত দূর করে দেবে যেন। বলল, ভয় না তো কি, এ ক'দিন আসেন নি কেন? কি যাচ্ছেতাই সব ব্যাপার হ'ল একটার পর একটা, দুটো কথা বলারও লোক পাইনে।

খবর দাও নি কেন? নরেন নিস্পৃহ।

এতদিন কোন্ খবরটা দিতে হয়েছে মশাই আপনাকে?

জল-বৃষ্টি মাথায় করে আসি বলে তুমিই তো কতদিন কত খোঁচা দিয়েছ।

সান্ত্বনা বলতে যাচ্ছিল, খোঁচা খেয়েও তো আসতেন। বলল না, এবার এই না-আসার হেতুও কেমন করে যেন উপলব্ধি করেছে। সান্ত্বনা আপস করতে চায়। কিন্তু সোজা রাস্তায় নয়। নিজেকে সজাগ করে। বলল, খোঁচা না ছাই, আসলে

আপনি আজকাল আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না।

নরেনের ভিতরে প্রশ্রয়ের সাড়া জাগছে আবার একটা। সংশয়ের পর্দাটা যেন পাতলা হয়ে আসছে। পাশাপাশি চলার একটা স্পর্শ লাগছে কোথায়। তবু এই সেই প্রতীক্ষিত অবকাশ কি না বুঝে উঠল না। জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল সেও।

থাক, আর হাসতে হবে না, যে ভাবে হাঁটছেন এখানেই সন্ধ্যে !

এটা কি হাঁটার মত রাস্তা, ঠোক্কর খেতে খেতে প্রাণ গেল।

সান্ত্বনা হেসে ফেলল, এখনো ঠোক্কর খাওয়া অভ্যেস হয় নি ? কিন্তু জবাব শোনার আগে চট করে সামলে নিল।—সত্যি যা হয়েছে রাস্তাঘাটের অবস্থা, এক ঝড়ে সব কাত।

পাথরের ওপর পা ফেলে ফেলে নরেন চলেছে। মন বলছে, সময় আসে নি, আসবে। অবকাশ আসে নি, আসবে। আজই আসবে। ধমনীতে একটা উষ্ণ স্রোত বইছে ওর। জোর করেই চেষ্টা করল সহজ হতে। বলল, শুধু ঝড় কেন, এই বৃষ্টিটাও কম ভয়ের নাকি ! কোথায় কোথায় বন্যা হয়েছে খবর এসেছে—এ রকম হলে তো হয়েছে আর কি। আপিসে সারাক্ষণ এই কথা আর এই ভাবনা।

সান্ত্বনা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে তাকালো। এতক্ষণের চেষ্টায় মড়াইয়ের উপর থেকে যে অবাঞ্ছিত ছায়াটা সরিয়ে রেখেছিল সেটা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল আবার। আর সেই পাষাণ-ভারও। বলে উঠল, চিফ ইঞ্জিনিয়ার-এর মুখোমুখি বসে গালে হাত দিয়ে তাই ভাবুন গে, আমার সঙ্গে আসতে হবে না, যান্।

হন্ হন্ করে দু'চার পা এগিয়ে গেল সে। নরেন প্রথমে অবাক, পরে খুশি। কাছে এসে বলল, তোমার সঙ্গ এলে কি আলোচনা করতে হবে শুনি ?

কোন আলোচনা নয়। শুধু বড় বড় পা ফেলতে হবে আর হাসতে হবে। হাসার নমুনা ওর মুখেই ঝরল প্রথম।

নরেনের আপত্তি নেই। চলার গতি বাড়ল। দিনের আলো ঘন কালো হয়ে আসছে আরো। কোন দিকে বা কোন্ পথে চলেছে কারোই হুঁশ নেই। কথা অনর্গল সান্ত্বনাই বলছে। আবোল-তাবোল কথা। হাসছেও খুব। নরেনেরও হাসার ভূমিকা। কিন্তু কেমন যেন লাগছে। ওকে দেখে আজ হঠাৎ ঝরনার কথা মনে পড়েছে। কোথায় যেন মিল। থেকে থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব একটা। ওই নারীচাপল্য আর প্রশ্রয় ঠিক তার উদ্দেশ্যে নয়, সে উপলক্ষ মাত্র। ঝরনাও বাইরে থেকে কতজনকে অমন প্রশ্রয় দিয়েছিল। হাসার ভূমিকা নরেনের, কিন্তু হাসি তেমন আসছে না।

সান্ত্বনা থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়। সামনেই বাঁকের মুখে সেই বিশাল পাথরের আড়াল। তার ওপাশে বড় গাছ ভেঙে পড়ে আছে একটা। একান্ত নির্জনে এই আড়ালের ওধারে একদিন দেখেছিল দুজনকে। চাঁদমণি আর হোপুনকে। সর্বাঙ্গ সির-সির করে উঠল কেমন।....অমোঘ আকর্ষণ একটা।

আড়াল পেরিয়ে সেই ঢালু পাথর। সেখানে ওরা বসেছিল। বসে আর ছিল কোথায় ! চাঁদমণি শুয়েই ছিল প্রায়। আর ওর মুখের ওপর, বুকের ওপর ঝুঁকেছিল হোপুন। অনেক দিনের একটা বিস্মৃতিবিলগ্ন অস্বস্তি ভিতর থেকে যেন নড়েচড়ে উঠছে

আবার। যেমন উঠেছিল এখানে চাঁদমণি আর হোপুনকে দেখে। যেমন উঠেছিল প্রথম সন্ধ্যায় বাদনা উৎসব থেকে ফেরার পর রাতের বিনিদ্র শয্যায়। পাথরটা যেন ইশারায় ডাকছে ওকে। নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে না পারার যাতনা বুঝি ওখানে গিয়ে বসলে কমবে একটু। অজ্ঞাত অনড় বোঝাটা হালকা হবে।

পাশের লোকটা যে নির্নিমেষে লক্ষ্য করছে তাকে—সে খেয়ালও ছিল না বোধ হয়। লজ্জা পেল, হেসেও উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে থমকেও গেল একটু। চাঁদমণির উচ্ছল হাসির মত লাগল যেন নিজের হাসিটা। লাগুক, ও আর পরোয়া করে না। বলল, দেখছেন কি, আর হাঁটে না, চলুন ওই পাথরটায় গিয়ে বসি একটু।

চপল পায়ে গিয়ে পাথরটার উপর বসে পড়ল ধুপ করে। চুপচাপ নারীবর্ণচ্ছটা দেখছিল নরেন। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেও। প্রায় মোহগ্রস্তের মত বসল পাশে।

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে সান্ত্বনা তাকালো একবার। এত কাছে ঘেঁষে বসার মত ছোট নয় পাথরটা। বসেছে তো বসেছে, সান্ত্বনা বেপরোয়া। বলল, কি হ'ল, এমন চুপচাপ যে? জায়গাটা বেশ—না?

উৎফুল্ল মুখে চারদিকে তাকিয়ে জায়গাটা বেশ তাই যেন উপলব্ধি করতে লাগল সে। কিন্তু মনে পড়ছে অন্য কথা। প্রথম সন্ধ্যায় সাঁওতালদের বাদনা-উৎসব থেকে ফেরার পথে এর থেকে আরো বড় পাথরে বসেও সেটা বড় মনে হয় নি খুব। আর ওকে নীরব দেখে এই ভদ্রলোকই সেদিন বলেছিলেন, অমন চুপচাপ কেন?

অস্বস্তি আজও। কিন্তু সেদিনের মত অত ভীরু অস্বস্তি নয়। নেশার মত। ভদ্রলোক চেয়ে আছে নিষ্পলক, উপলব্ধি করেই সান্ত্বনা অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো আরো। পড়ো গাছটার দিকে চেয়ে অস্ফুট কণ্ঠে হেসে উঠল, বেচারী গাছটার অবস্থা দেখুন একবার।

তার পর সর্বাঙ্গে শিহরণ একটা।

এক হাত ওর পিঠে, অন্য হাত দিয়ে তার মুখখানি সম্পূর্ণ নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল নরেন।

চোখে চোখে, চোখের তারায় তারায় বিনিময়।

বিদ্যুৎস্পর্শের মত।

নিমেষে নেশার ঘোর কেটে গেল যেন সান্ত্বনার। চপলতার চিহ্ন মুছে যেতে লাগল। শুকনো খরখরে লাগছে জিবের ডগা, ঠোঁট। সামলে নিয়ে জোর করে হাসতে চেষ্টা করল একটু। নড়েচড়ে সরে বসতে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা সবল আকর্ষণে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার বুকের ওপর। মুহূর্তের অবকাশ পেল না। দুই ঠোঁট বিদীর্ণ হতে লাগল থেকে থেকে—ঘন, উষ্ণ, নির্মম। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল অধরের বাধা। দাঁতে লাগছে, জিবে লাগছে।

বাধা দেবে ভাবছে। প্রাণপণ চেষ্টা করতে চাইছে বাধা দিতে। কিন্তু সর্বাঙ্গ অবশ। ওর হাড়গোড় সুদ্ধ মটমট করে ভাঙবে নাকি মানুষটা। নিবিড় যাতনা জানুতে, কটিদেশে, স্তনভারে। দেহ-দেহলীতে ভাঙনের তাণ্ডব। আর পারছে না সান্ত্বনা। বাধা দিতে পারছে না। স্পর্শ-বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, ঘুমের মত লাগছে। শিথিল

হয়ে আসছে সব কিছু। সান্ত্বনা হাল ছেড়ে দিল। এলিয়ে পড়ল। সেই যাতনার মধ্যেও কতকালের, কত যুগের একটা জমাট-বাঁধা শীতল অবরোধ বুঝি বাষ্প হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অন্তিম বিস্মৃতির মুহূর্তে আবার এক ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হ'ল যেন। পাথরচ্যুত হয়ে নরেন মাটিতে বসে পড়ল। সান্ত্বনা উঠে বসল। দাঁড়াল। পা কাঁপছে থরথর। বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ি পিটছে ঠক ঠক করে। বাতাস নেই। বিস্রস্ত বেশবাস ঠিক করে নিল। বিস্ফারিত দুই চোখ নরেনের মুখের ওপর। লজ্জা নয়, ভয় নয়, ঘৃণা নয়। রাজ্যের বিস্ময় আর বিভ্রম।

চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ফিরে চলল। পিছন ফিরে তাকালো না একবারও। তবু উপলব্ধি করল মানুষটা আসছে পিছনে পিছনে। পাঁচ সাত মিনিটের পথ আর। কিন্তু আর ফুরোয় না যেন।

শোনো—

পা থেমে গেল। থামতে চায় নি তবু। নরেন কাছে এসে দাঁড়াল। ধীর স্থির। বলল, তোমার বাবার সঙ্গে আমি দুই এক দিনের মধ্যেই দেখা করব।

দুই চোখে এক ঝলক আগুন ছড়িয়ে হন হন করে এগিয়ে চলল সান্ত্বনা।

নরেন দাঁড়িয়ে রইল।

সোজা নিজের ঘরে এসে একেবারে শয্যা নিল সান্ত্বনা। বাবা বাড়ি নেই। কিন্তু আসবে তো। কি করে মুখ দেখাবে সান্ত্বনা। সামনে গিয়ে দাঁড়াবে কেমন করে। রাগে আগুন হয়ে উঠতে চাইছে মানুষটার ওপর। পারছে না বলেই রাগ বাড়ছে, যাতনা বাড়ছে। উঠে মুখে হাতে জল দিতে গিয়ে একেবারে স্নান করে এলো। কিন্তু গা জুড়োয় না তবু। সেই স্পর্শ-বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

বাবা ফিরেছে টের পেল এক সময়। কিন্তু তিনি খেয়াল করলেন না কিছু। যতটা সম্ভব আড়ালে কাটিয়ে রাতের মত নিশ্চিন্ত হ'ল সান্ত্বনা। আজ তার চোখে পাতায় এক করতে পারবে না জানা কথাই। না পারুক। অনেক বিচার-বিশ্লেষণ বাকী। মানুষটার অমন দুঃসাহসের দরুন নিজেকে উত্তেজিত করে তোলাই বাকী। কিন্তু একা ঘরে ঠোঁটের জ্বলুনি উপলব্ধি করছে আবার। বিস্মৃতির সেই নির্মম স্পর্শগুলো গ্রাস করতে আসছে আবার। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। হঠাৎ কান খাড়া করে নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে লাগল যেন সান্ত্বনা। কিছু একটা পরিবর্তন উপলব্ধি করতে লাগল। দেহের অন্তস্তলে সেই ভাঙনের সমারোহ মনে পড়তে লাগল। যত ভাঙছিল তত যেন ভরেও উঠছিল।

বাবার ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সান্ত্বনা। দু চোখ রগড়ে নিয়ে দেখল, দিব্বি বেলা। সান্ত্বনা অবাক। কখন ঘুমোলো। এমন বিচ্ছিরি ঘুম, শীগগির ঘুমিয়েছে বলেও মনে পড়ে না।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে-ফিরে সেই এক কথাই ভাবছে। বিগত দিনের কথা। ওই একটা দিনের সঙ্গে সঙ্গে ওর জীবনের একটা অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু খারাপ লাগছে না, বরং হালকা লাগছে অনেক।

বিস্মৃতির মুহূর্তে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। না উঠলে....?

অস্ফুট শব্দ নির্গত হ'ল একটা মুখ দিয়ে। উনুন থেকে তেলের কড়া নামিয়ে ফেলল তাড়াতাড়ি। ফুটন্ত তেলের ছিটেয় হাতের কব্জিতে ফোস্কা পড়ে গেছে। দেখল। বিদ্বেষের জ্বলন্ত ছিটায় অমনি করে দাহ করতে চাইল একজনকে। ভাবতে চেষ্টা করল, ওর অন্তস্তলের এক সংগোপন আশা দস্যুর মত উপড়ে ফেলতে চেয়েছে লোকটা। ওর জীবনে আর এক বাঞ্ছিতজনের পদসঞ্চার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছে। আর একজনের প্রাপ্য ভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়িয়েছে নির্লজ্জের মত।

কিন্তু তবু চোখের সামনে চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে বড় করে তোলার চেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে থেকে থেকে। সেই নির্লজ্জ মানুষটাই তাকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে বার বার। আর সান্ত্বনা রাগ করতে পারছে না বলেই অবাক হচ্ছে। ভালো লাগছে বলেই জ্বলে উঠতে চাইছে। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই অস্বস্তি। নিজের অন্তস্তলে দৃষ্টি চালাল সন্তর্পণে।

ওর প্রশ্রয়ে আমন্ত্রণ ছিল? আহ্বান ছিল? সরোষে বলে উঠতে চাইল, না, কক্ষনো না।

কিন্তু সমর্থন আসছে না। উল্টে যেন ব্যঙ্গ করছে কেউ নাকি! এতকালের যে জমাটবাঁধা অবরোধ হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে এখনো, সে তবে কি? আর সেটার প্রতি মোহ আছে কোনো? মায়া আছে কিছু?

এত বড় বিপর্যয়ের উপলক্ষ যে মানুষ, জীবনে আর তাকে মুখও দেখাবে না বোধ হয়। কিন্তু বাবার কাছে আসবে বলেছিল লোকটা। তিন চার দিন কেটে গেল। আসে নি। সান্ত্বনার জ্বলন্ত চোখে সেদিন এ প্রস্তাবের জবাব লেখা ছিল বলেই আসে নি বোধ হয়। ঠিক আশাও করছে না। আসুক না-আসুক বয়ে গেল। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে কি একটা অসহিষ্ণুতা যেন। উষ্ণতা বাড়ছে। রাগতে পারছিল না, কিন্তু এখন কারণে অকারণে মেজাজ চড়ছে।

ওর এ ক'দিনের হাবভাব অবনীবাবুর লক্ষ্য করার কথা। কিন্তু সম্প্রতি চাকরির ব্যস্ততায় বিড়ম্বিত তিনি। তিনি কেন, সকলেই। এক্সপার্ট কমিটি এসে গেল বলে। এদিকে আকাশ আর বৃষ্টির যা অবস্থা, বাইরের তত্ত্বাবধান ছেড়ে কমিটির পরিদর্শনপর্ব অফিসের ফাইলপত্র ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যেই শেষ হবে বোধ হয়। অতএব হিসেব-নিকেষ জল্পনা-কল্পনার নথিপত্র সব রেডি রাখো, গোছগাছ করো, অফিস সাজাও। এ ছাড়াও ওপরঅলাদের হাবভাব চালচলনে এই কমিটিকে কেন্দ্র করে কেমন একটা শঙ্কার ছায়া নেমেছে। কমিটি এলে প্রতিকূল কিছু ঘটতে পারে যেন। কি, সে আভাস স্পষ্ট নয় কারো কাছে।

অবনীবাবু এই নিয়েই ব্যস্ত ক'টা দিন। সান্ত্বনার সঙ্গে যত কথা হয়েছে, তার বেশির ভাগই এই কথা। সান্ত্বনা শুনেছে কি শোনে নি, তাও খেয়াল করেন নি। তবু সেদিন কি মনে হ'ল তাঁর। বললেন, নরেন আসে নি এর মধ্যে? অফিসেও দেখিনে বড় একটা...

জবাবে যথাসম্ভব নিস্পৃহ মুখে সান্ত্বনা ঠোঁট ওল্টালো শুধু। অর্থাৎ কে জানে,

খবর রাখিনে।

একটু খটকা লাগল বোধ হয়। অবনীবাবু খেয়াল করে মেয়ের দিকে তাকালেন এবার। হেসেই বললেন, কি রে, আবার ঝগড়াঝাঁটি করেছিস বুঝি?

ভ্রূভঙ্গি করে হাসতে হ'ল সান্ত্বনাকেও। দিব্বি পারে এসব এখন। পাল্টা অনুযোগে আসল জবাব এড়িয়ে গেল। বলল, তুমি তো দিন-রাত কচি মেয়ের মত ঝগড়া করতেই দেখো আমাকে।

সেদিনই নিজের উদ্যোগে নরেনের সঙ্গে দেখা করলেন অবনীবাবু। ভড়কে গিয়েছিলেন প্রথম। এমন ধীর শান্ত ওকে আর দেখেন নি কখনো। কিন্তু দুই এক কথার পরেই শুনলেন যা, তাতে পারিবারিক প্রসঙ্গ বিস্মৃত হলেন। ভাবলেন, ওর মুখের এই অবস্থা যখন, রীতিমত দুশ্চিন্তার কারণ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নরেন চৌধুরী এক্সপার্ট কমিটির প্রসঙ্গ তুলে নিজেকে আড়াল করল।

বাড়ি ফিরেই অবনীবাবু মেয়েকে বললেন সব। বললেন, এক্সপার্ট কমিটি যে আসছে তার চেয়ারম্যান হলেন বিপুল বাড়রী নামে এক ভদ্রলোক। মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, মস্ত এক ফার্মএর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। বাদল গাঙ্গুলি সেখানেই চাকবি করত আগে, এঁর সঙ্গেই একটা ভয়ানক গোলযোগের ফলে চাকরি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাকে।

এত না বললেও চলত, শুধু নাম শুনলেই চিনত সান্ত্বনা। বুঝতও। এ ক'দিন বাবার দুশ্চিন্তা দেখেও দেখে নি, বা তার কোনো কথা শুনেও শোনে নি। কিন্তু আজকের খবরটা শোনা মাত্র নড়েচড়ে সজাগ হয়ে উঠল। নিজের ভাবনাচিন্তা তলিয়ে গেল সব। আরো কিছু শোনার আশায় জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল শুধু।

অবনীবাবু বলে গেলেন, এই জন্যেই ক'দিন ধরে এরকম অবস্থা দেখছি অফিসের। নরেন বলল, এতটুকু নড়চড় হলে এখান থেকেও সোজা চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসতে পারে বাদল গাঙ্গুলি। এমন অদ্ভুত কথা তো আমি শুনি নি কখনো।

এতটা বরদাস্ত হ'ল না সান্ত্বনার। ঝাঁজিয়ে উঠল প্রায়, নরেনবাবুর সবেতেই বাড়াবাড়ি, আমি বলে রাখছি কিচ্ছু হবে না—এত সহজে যদি সব ভেস্তে যেত, দুনিয়ায় তাহলে আর বড় কাজ কিছু হ'ত না।

উত্তেজনায় নিজের ঘরে চলে এলো। কিন্তু উতলা সেও কম হয় নি। যা বলে এলো বাবাকে, সেটা তার মনের কথা, আশার কথা। কিন্তু শুধু এরই ওপর ভরসা করে সত্যি নিশ্চিন্ত থাকা সহজ নয়। নরেনবাবু যা বলেছে, বাবা সেটাকে অদ্ভুত ভেবে অবাক হতে পারেন, কিন্তু সে রকম কিছু ঘটা যে অসম্ভব নয়, সে শুধু সান্ত্বনাই জানে। যে নাম শুনল, তাঁর সঙ্গে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কণামাত্র আপসেরও কোন সম্ভাবনা নেই। ছটফটানি বেড়েই চলল। ইচ্ছে হ'ল, এক্ষুনি নরেনবাবুকে ডেকে পাঠায় একবার। কিন্তু সেও কোনদিন সম্ভব নয় আর।

আর কোনদিকে মন দেবার মত মনের অবস্থা থাকলে নরেনের পরিবর্তন চোখে পড়ত বাদল গাঙ্গুলির। হেড অফিস থেকে এক্সপার্ট কমিটির নামগুলো আসার পর

কথাবার্তা দু'চারটে শুধু তার সঙ্গেই বলেছে, একটু আধটু পরামর্শও করেছে। কিন্তু মুখের দিকে ভালো করে তাকায় নি বোধ হয়।

বাদল গাঙ্গুলির ভিতরে ভিতরে বিষম এক মর্যাদার লড়াই চলেছে সারাক্ষণ।...এরকম হতে পারে একবারও ভাবে নি। কিন্তু ভাবে নি কেন সেটাই আশ্চর্য। বেসরকারী বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশিষ্ট কমিটিতে বিপুল বাড়রীর আমন্ত্রণ নতুন কিছু নয়। নেশান বিল্‌ডার্সএ থাকতে এরকম অনেক কমিটিতে তাঁকে যোগ দিতে দেখেছে।

ভিতরে যাই হোক, বাইরে শান্ত মুখেই প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। অভ্যর্থনার ভার পড়ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের ওপর। গেস্ট হাউসে থাকবেন তাঁরা। মিটিংয়ের ব্যবস্থাও সেখানকার বড় লন-এ হতে পারে। যেমন ইচ্ছে তাঁদের।

যথা দিনে তাঁরা এলেন। বিকেলে নিজের কোয়ার্টারস-এ বসেই বাদল গাঙ্গুলি খবর পেল। অঝোরে জল পড়ছে তখন। সেই প্রথম বোধ করি জলের ওপর খুশি হল সে। নরেনকে আগেই বলে রেখেছে, ড্যাম পরিদর্শন করানোর ভার তার। একটা গাড়িও মজুত আছে তাঁদের জন্য। কিন্তু আজ আর কেউ বাইরে বেরুবেন না বোধ হয়।

বসে আছে চুপচাপ। ভিতরে শুকিয়ে-আসা ক্ষতের মুখে নতুন জ্বালা একটা। ঘোষ-চাকলাদার ফার্মের ওপর আর রাগ নেই একটুও। যথেষ্ট শিক্ষা দিয়েছে। তা ছাড়া অপকর্মের আসল নায়ক যে তার পরিণতি তো স্বচক্ষে দেখেছে। মৃত্যুর ওপরে অভিযোগ বড় থাকে না কারো। তারও নেই। যদিও রণবীর ঘোষের মৃত্যু বিধিবদ্ধ সমর্থন পায় নি এখনো। অনেকটাই চাপাচাপির মধ্যে আছে, তা বলে মড়াইয়ে জানতে বাকি নেই কারো। কিন্তু বোঝাপড়া এখন আর ঘোষ-চাকলাদার ফার্মের সঙ্গে নয়। বোঝাপড়া এক্সপার্ট কমিটির সঙ্গে...বিপুল বাড়রীর সঙ্গে। একবার তার বিচার করেছিলেন ভদ্রলোক। আবারও তাই করতে এসেছেন বোধ হয়। কমিটির আর পাঁচজনও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সায় দেবেন। কিন্তু এবারে আর সে বিচারের কোন আভাসও বরদাস্ত করবে না।

পরদিন সকাল থেকেই মাঝে মাঝে জল হচ্ছে, মাঝে মাঝে থামছে। এরই মধ্যে সদলে ড্যাম পরিদর্শনে বেরুলেন কমিটি। দেখার আনন্দেই তাঁরা দেখলেন সব কিছু। কখনো সকৌতুকে জানতে চাইলেন এটা সেটা, কখনো বা সপ্রশংস উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করলেন। নরেনের সঙ্গে বার কতক দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে বিপুল বাড়রীর। সপ্রতিভ বিনয়ে নরেন ড্যাম সংক্রান্ত আলোচনাও করেছে একটু আধটু। কিন্তু পূর্ব পরিচয়ের আভাসও ব্যক্ত হয় নি।

বিকেলের দিকে যথানির্দিষ্ট মিটিং বসল গেস্ট হাউসে।

বাদল গাঙ্গুলি এলো।

নরেন চৌধুরী, এমন কি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারও—এই যেন যথার্থ ইঞ্জিনিয়ারের মূর্তিতে দেখলে তাকে। সচেতন। মৃদুগম্ভীর।...প্রায় দাম্ভিক।

বিপুল বাড়রী বাদে বাকি সকলেই সকলরবে আপ্যায়ন করলেন। নরেন পর্যন্ত আশা করেছিল, অনুপস্থিতির দরুন সৌজন্যসূচক কিছু একটা বলবে। কিন্তু চিফ

ইঞ্জিনিয়ার তার ধার দিয়েও গেল না। হেসে পাল্টা অভিবাদন জ্ঞাপন করলে সকলের উদ্দেশে। তার পর তাকালো চেয়ারম্যান বিপুল বাড়রীর দিকে।

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন বিপুল বাড়রী। কন্‌গ্র্যাচুলেশান্‌স !

দুই এক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময়। হাত মিলাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।—থ্যাঙ্ক ইউ।

চেয়ার টেনে বসল তারপর। সদস্যদের কোনরকম অসুবিধে হচ্ছে কি না খোঁজ নিল। অতি-বর্ষার প্রসঙ্গ তুলল। ড্যাম কনস্ট্রাকশন সম্বন্ধে তাদের মতামত জিজ্ঞাসা করল।

সকলেই প্রশংসা করল আর একদফা। বিপুল বাড়রী চুপচাপ পাইপ টানতে লাগলেন। বিশেষ ফাইলপত্র সব হাতের কাছে এনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সে সবের ধার দিয়েও গেলেন না কেউ। মুখে মুখে আলোচনা চলল, কি হচ্ছে, কি হবে, আরো কি হতে পারে।

সবশেষে ঘোষ-চাকলাদারদের সিমেন্ট-প্রসঙ্গ। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল বাদল গাঙ্গুলি। সংক্ষেপে ঘটনা ব্যক্ত করে জানালো, ওই ফার্মকে ডিসমিস করতে হবে।

কথা উঠল এই নিয়ে। কিন্তু যেরকম ভেবেছিল সেরকম নয়। ঘরোয়া আলোচনার মত। সদস্যদের কেউ কেউ বললেন, এতবড় কাজে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কি ? এতদিনে এই ফার্মের ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে। এতবড় ফার্ম, এর আগে আর যখন কোনো অভিযোগ নেই, একেবারে বরখাস্ত না করে এবারের মত ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে, এতে কর্মকর্তাদেরও কিছুটা গলদ আছে যখন। কত মালের সঙ্গে কতটা সিমেন্ট মেশানো হচ্ছে—স্টাফের সেটা সব সময় দেখে নেওয়ার কথা।

কথাগুলো কতটা নীতিগত এবং কতটা স্বার্থগত বুঝে উঠল না বাদল গাঙ্গুলি। হাসিমুখেই পাল্টা জবাব দিল, স্টাফ কাজই করছে, কাউকে অবিশ্বাস করে নি এটাই তাদের গলদ। কিন্তু তা বলে অবিশ্বাসের কাজ যিনি করেছেন তাঁকে বরদাস্ত করবেন কি করে ?

প্রতিবাদ কেউ করলেন না। কিন্তু মীমাংসাও এখানেই শেষ হ'ল না। যাঁরা এসেছেন, কেউ তাঁদের মধ্যে ওই ফার্মের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, গলাজলে দাঁড়িয়ে বললেও বাদল গাঙ্গুলি সেটা বিশ্বাস করে না। নরেনের ধারণা তদারকে এসে সব কথায় একেবারে মুখ বুজে সায় দিয়ে চলে যাওয়া রীতি নয় বলেই কমিটি এই প্রসঙ্গ নিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া মুখে যত সৌজন্য প্রকাশই করুক, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নিস্পৃহ আপ্যায়নে মনে মনে সকলের পক্ষে তুষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক। অনেকটা যেন নিজেদের মধ্যেই আলোচনা চলতে লাগল। একজন বললেন, ফার্মের আসল কর্মকর্তা যিনি, তিনি নাকি বহুদিন ধরে নিখোঁজ, দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনান্ত ঘটেছে বলেও শোনা যাচ্ছে। অতএব এর পরে আর টানা-হেঁচড়া করে লাভ কি। তাছাড়া হয়তো বা কর্মচারীরাই করেছে এই কাণ্ড, ভদ্রলোকেরা হয়তো কিছুই জানেন না।

অনেকেই অনুমোদন করলেন। একেবারে জীবিকায় হাত না দিয়ে কড়া ওয়ার্নিং-এ ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই সাব্যস্ত করলেন তাঁরা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের মুখভাব বদলাতে লাগল। নরেন চৌধুরী এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার দুজনেরই বেশ অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। বিপুল বাড়রীর দিকে তাকালো বাদল গাঙ্গুলি। সেই থেকে পাইপ টানছেন আর নির্বাক শ্রোতার মত শুনছেন। তাঁর চোখে-মুখে চাপা হাসির আভাস দেখল যেন বাদল গাঙ্গুলি। শান্ত মুখে সব কজন সদস্যকেই দেখল একবার। পরে স্পষ্ট করে বলল, কিন্তু আমি তাতে রাজী নই।

হালকা আলোচনায় অস্বস্তিকর ছেদ পড়ল একটা। কিন্তু এসেছেন যাঁরা, পদমর্যাদায় সচেতন তাঁরাও কম নন। হেসেই একজন বললেন, এই সামান্য ব্যাপারটা আপনি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন মিঃ গাঙ্গুলি, একটু আধটু ভুলত্রুটি তো লোকে ক্ষমাও করে।

প্রায় টিপ্পনীর মত শোনালো। বাদল গাঙ্গুলি জবাব দিল, ব্যাপার সামান্য হলে আমি এত সিরিয়াসলি নিতাম না, আশা করি কমিটি সে আস্থা আমার ওপর রাখবেন। ভুল-ত্রুটি আর চুরি দুটো এক জিনিস নয়। কিন্তু আমার অভিযোগ ওইটুকু চুরির বিরুদ্ধেও নয়। আমার অভিযোগ, যে মনোবৃত্তি আপনাদের ওই ড্যামের চল্লিশ ফুট চওড়া দেয়ালকে স্বচ্ছন্দে ঝাঁঝরা করে দিতে পারে তার বিরুদ্ধে। আমার মতে ঘোষ-চাকলাদার ফার্মকে ডিসমিস করতে হবে।

সকলেই চুপচাপ। বস্তুত সরকারী আমন্ত্রণে গতানুগতিক পর্যবেক্ষণে আসা, তিক্ততা সৃষ্টি করতে কেউ চান না। কিন্তু বিতর্ক উঠলে বা প্রতিকূলতার আভাস পেলে এ রীতি সব সময় খাটে না। নিজেদের অস্তিত্ব তখন একটু আধটু জাহির করেই থাকেন তাঁরা। সেই রকমই করলেন একজন। হালকা হেসেই বললেন, ধরুন, আমাদেব মতামত যদি অন্যরকম হয়?

তা হলে আমি ধরে নেব, আপনারা আর কারো ডিসমিস্যাল অ্যাপ্রুভ করে যাচ্ছেন।

এরকম একটা জবাব প্রত্যাশা করেন নি কেউ। নরেন ঘেমে উঠতে লাগল। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার কোনো অছিলায় সরে পড়া যায় কি না ভাবতে লাগলেন। গুরুগম্ভীর পরিস্থিতি। তিলের থেকে তাল হ'ল যেন। একজন প্রবীণ সদস্য বলেই ফেললেন, দিস্ ইজ ট্যু মাচ।

ঠুক ঠুক শব্দ হ'ল। টেবিলে আস্তে আস্তে পাইপ ঠুকছেন চেয়ারম্যান বিপুল বাড়রী। অনেকটা আপন মনেই যেন। কিন্তু মুখ দেখলে মনে হয়, কোথায় যেন রসের আমেজ লেগেছে। ধীরেসুস্থে বললেন, ওয়েল্ জেন্টলমেন, আমার মনে হয় এই ব্যাপারে এবার আমার কিছু বলা উচিত।

থামলেন আবার। সকলেরই চোখ গেল তাঁর দিকে। বাদল গাঙ্গুলি অন্যদিকে ঘাড় ফেরাল।

—ব্যাপারটা হয়তো বা কিছুই নয়, আবার হয়তো বা অনেক কিছুই। কিন্তু আসল কথা, এই ড্যামের সমস্ত দায়িত্ব যাঁর ওপর তিনি এই ফার্মকে বিশ্বাস করেন না, আর সেই অনাস্থা নিয়ে কাজও করতে চান না।... চান না যখন, তখনই আমরাই বা বাইরে থেকে এসে এ নিয়ে জোর-জুলুম করি কেন? উই হ্যাভ সো মেনি গুড

কন্ট্রাক্টার্স—সো মেনি ইনভিড ! কাজেই আমার মতে কাজ যিনি করেছেন তাঁর ওপরেই এই ফয়সালার ভার ছেড়ে দিয়ে আমরা এ আলোচনা থেকে বিরত হই—আফটার অল, হোয়েন দি চিফ ইঞ্জিনিয়ার ইজ ডুইং সাচ এ ম্যাগনিফিসেন্ট জব !

পকেট থেকে শলাই বার করে নিবিষ্ট চিত্তে আবার পাইপ ধরাতে লাগলেন তিনি। কেউ আর প্রতিবাদ করলেন না কিছু। বাদল গাঙ্গুলি চেয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

খবরটা শোনা মাত্র খুশিতে একেবারে উছলে উঠল সান্ত্বনা। ওরই এক মস্ত দুর্ভাবনার অবসান যেন। বড় সমস্যা এলে ছোট অনেক সমস্যা যেমন তলিয়ে যায়, এ কদিন তেমনি নিজের কোন কথা ভাবার অবকাশ পায় নি। কেবল মনে হয়েছে, কি হবে, কি জানি হবে। ড্যাম পরিদর্শনে যাঁরা আসছেন তাঁদের মধ্যে একটা নাম অষ্টপ্রহর উতলা করছে তাকে। তাই প্রথম খবরটা শুনেই আনন্দে আটখানা। বলে উঠল, আমি বলি নি বাবা, এত সহজে গোলমাল কিছু হলেই হ'ল। তোমরা তো ভেবে সারা।

অবনীবাবু যেমন যেমন শুনে এসেছেন বলতে লাগলেন। অর্থাৎ, কি হ'ল না হ'ল। সান্ত্বনা উত্তেজিত রোমাঞ্চিত। বাবা আবার বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারও মনে হ'ল, ঘরে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। দুদিন আগেও ভেবেছে বাইরে বেরুনো এ জীবনের মতই ঘুচে গেল। কিন্তু এখন আর সেরকম মনে হ'ল না একবারও। স-প্রগল্‌ভ বিস্মৃতির আনন্দে উন্মুখ হয়ে উঠতে লাগল বার বার।... সরাসরি বাড়ি গিয়ে হানা দিলে কেমন হয় ? অবাক হবে, আকাশ থেকে পড়বে। কিন্তু খুশি হবে। পুরুষমানুষকে আর চিনতে বড় বাকি নেই সান্ত্বনার। এক ভাত টিপলে হাঁড়ির ভাত চেনা যায়। পুরষসন্নিধান-জনিত সঙ্কোচ ভয় ওর গেছে।

তবু যাবে কি যাবে না ঠিক করতেই কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল। টিপ টিপ জল পড়ছে আবার। ক্রুদ্ধ নেত্রে সান্ত্বনা আকাশ দেখতে লাগল বার বার। আর ভিতরে ভিতরে অধীর হয়ে উঠতে লাগল। শেষে জল একটু ধরতেই দরজায় শেকল তুলে দিয়ে সোজা সামনের দিকে পা বাড়ালো।

....ডর ভয় সঙ্কোচ গেছে, তবু একজনের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় পথে, বিড়ম্বনার একশেষ হবে।...নরেনবাবু। পা থেমে এলো সান্ত্বনার। হয় হবে। অসহিষ্ণু চরণে অস্বস্তি মুছে ফেলে এগিয়ে চলল আবার। দেখা হলে নিজেই মুখ তুলে তাকাতে পারবে না, ওর কি !

অন্যমনস্কের মত নিজের কোয়ার্টারের দিকে চলেছে বাদল গাঙ্গুলি। আর চিন্তা নেই, উত্তেজনা নেই। তবু ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। কিছুই ভাবছে না, ভাবতে চাইছে না। কিন্তু অন্তস্তলে কলকোলাহল চলছে একটা। নিঃসঙ্গ অবকাশে সেটা আরো মুখর হয়ে উঠবে।...এর থেকে বিপুল বাড়রী ওর বিরুদ্ধাচরণ করলে খুশি হ'ত বোধ হয়।

ভদ্রলোক হার মেনে ওর উদ্যমের শিখা অনেকটা নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন।

ঘরের ভিতরটা আবছা অন্ধকার। আলনায় কোটটা ফেলে সুইচ টিপতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ একেবারে। আরাম কেদারায় সমস্ত নারীদেহ ঢেলে দিয়ে নিঃশঙ্ক কৌতুকে চেয়ে আছে ওরই দিকে। আর হাসছে মৃদু মৃদু...।

নীলা।

একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সচেতন হ'ল বাদল গাঙ্গুলি। সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ কেটে গেল। সহজ হ'ল। এই মুহূর্তে অন্তত নির্মম ভাবে সহজ হতে হবে, চকিতে উপলব্ধি করে নিল সেটুকু।

নীলা বলল, বিষম অবাক হয়ে গেলে যে?

টাইটা খুলে বাদল গাঙ্গুলি সামনে এসে দাঁড়াল। জবাব দিল না। চোখে চোখ রাখল। তার চোখেও হাসির আভাস এখন।

নীলা হেসে জিজ্ঞাসা করল, চিনতে পারছো তো?

বিছানার একধারে বসল। নিধুকে হাঁক দিয়ে বলল, চা কর্। পরে তাকালো তার দিকে। বলল, কই আর পারলাম। তারপর, তুমি কি মনে করে?

যেন দেখা-সাক্ষাৎ হয় প্রায়ই। মনে কোন দাগ নেই, ছাপও নেই। অন্ততঃ আগ্রহ নেই কিছু। নীলা জবাব দিল, এলাম বাবার সঙ্গে। টেবিলের ওপর নিজের ফোটোর দিকে চেয়ে তেমনি হাসতে লাগল অল্প অল্প।—কেমন আছ?

নীলা এসেছে জানলে ফোটোটা ওখানে থাকত না নিশ্চয়ই। বাদল গাঙ্গুলির ইচ্ছে হচ্ছিল, ওর সামনেই ওই ফোটো আছড়ে ভাঙে, বলে, এই পরিণতির অপেক্ষাতেই এটা ছিল এখানে। ক্ষুদ্র জবাব দিল, ভালো।

এখানে এসে কি সব গোলযোগের কথা শুনছিলাম, মিটে গেছে?

হ্যাঁ, তোমার বাবা দয়া করে মিটিয়ে দিলেন।

তরল কণ্ঠে হেসে উঠল আবার নীলা। যে রকম হাসত। হেসে যেমন করে সমস্ত পরিবেশ নিজের দখলে নিয়ে আসত। সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখল আবার একটু। বলল, অর্থাৎ, তবু তোমার রাগ কোনদিন পড়বে না, এই তো?

তোমাদের ওপর আমার কোন রাগ নেই তো।

নীলা হাসল না এবার, আবার একটু চেয়ে দেখল শুধু। পরে বলল, না থাকারই কথা, আজ যে এভাবে এসেছি সেটাই মস্ত গর্ব আমার...তবে বাবা খুব অনুতপ্ত।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠছে বাদল গাঙ্গুলি। সেটা প্রকাশ হয়ে গেলেই পরাজয়। ঠাণ্ডা জবাব দিল, মরা মানুষ অনুতাপ শোনে না।

থমকে গিয়েও আবার হেসে উঠল নীলা। বলল, এত বড় একটা জ্যান্ত জিনিস গড়ে তুলছ, মরা মানুষ কি!

চিফ ইঞ্জিনিয়ার গড়ে তুলছে।

নিধু চা দিয়ে গেল। কিন্তু দিয়ে আর যাবে কোথায়? আগেও দরজার আড়ালেই ছিল, আবারো সেখানে এসে দাঁড়াবে বলেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর বন্ধ করতে গেল। ওর মুখের দিকে কেউ তাকালে স্পষ্ট দেখত, এই মেয়েটার পুনরাগমন সে একটুও

পছন্দ করে নি। ফিরে আসতে গিয়েই দু'পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল নিধুর। বাইরে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একজন...।

দিদিমণি!

সহসা একটা ঘা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সান্ত্বনা। বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঘরে আরাম কেদারায় অর্ধশয়ান হাস্যমুখী নারীমূর্তিটি দেখেছে। দেখে চিনেছে। নিস্পন্দ কাঠ হয়ে অন্ধকার দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে তারপর।

ঘরের মধ্যে নীলা হাসছে তখন। বলছে, আমি কবে যাব না-যাব সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমি যদি আর না-ই যাই, তাহলে?

জবাব শুনল, তাহলে আমার কাজের কিছুটা ক্ষতি হতে পারে এই পর্যন্ত।

তরল হাসি।—তা হলেই বা, তোমার থেকে তোমার কাজটাকে কবে আর বড় করে দেখেছি আমি।

অদূরে নিধুর উপর চোখ পড়ল সান্ত্বনার। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, জীবনে এত বড় দৈন্য আর আসে নি কখনো। যেমন এসেছিল, চকিতে আবার প্রস্থান করল তেমনি।

দ্রুত, আত্মবিস্মৃত...।

মেন কোয়ার্টারস ছাড়িয়ে এসে থামল। একটা পাথরের উপর বসল। বসে রইল নিশ্চল মূর্তির মত। অনেকদিন বাদে নরেনবাবুর সেই কথাগুলো যেন কানে বাজতে লাগল আবার।—ওর জীবন থেকে নীলা সরে গেছে ভালই হয়েছে...ওই মেয়ে আজও পারে ওর জীবনের সব কিছু ওলটপালট করে দিতে, এই কাজ এই নিষ্ঠা সব কিছু তছনছ করে ফেলতে।

কঠোর গাম্ভীর্যে থমথম করতে লাগল সান্ত্বনার সমস্ত মুখ।

কতক্ষণ বসেছিল ঠিক নেই। চমকে উঠল একেবারে। নিধু সামনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ দিল, নীলা দিদিমণিকে গোস্টো হাউস-এ পৌঁছে দিয়ে ভাবলাম এদিক দিয়ে একটু ঘুরে যাই...তুমি অন্ধকারে একলাটি বসে কেন দিদিমণি?

সান্ত্বনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। তার পর উঠে দাঁড়াল। এমনি বসেছিলাম—এগিয়ে দেবে চলো। দু'চার পা গিয়েই শান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল, আমি গিয়েছিলাম বাবুকে বলেছ নাকি?

নিধু অম্লানবদনে ঘাড় নাড়ল, বলে নি।

কিন্তু বলেছে। পৌঁছে দেবার জন্য নীলা দিদিমণির সঙ্গে কোয়ার্টারস-এর বাইরে এসেই চট্ করে আবার ফিরে গিয়ে বাবুকে জানিয়ে এসেছে, ওভারসিয়ার দিদিমণি এসেছিল, এসেই চলে গেছে। বাবুর মুখভাব অবলোকন করার অবকাশ অবশ্য পায় নি। তক্ষুনি চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু আর একজনের সম্বন্ধে বাবুকে সচেতন করার কর্তব্য কিছুটা যেন না করে পারে নি নিধুরাম। নীলা দিদিমণিকে পৌঁছে দিয়ে তার পর জেনারেল কোয়ার্টারস-এর দিকেই দ্রুত পা চালিয়েছিল সে। এখানে এখন দেখা হয়ে যাবে ভাবে নি।

গড় গড় করে বাবুর গুণকীর্তন করতে লাগল নিধু। সারাক্ষণ নীলা দিদিমণির

সঙ্গে একটু ভালো 'ব্যাভার' করে নি তার বাবু। সব কথায় কড়া কড়া জবাব দিয়েছে। কাল সকালে ড্যাম দেখাতে হবে বলে বলেছিল নীলা দিদিমণি, কিন্তু বাবু 'পষ্ট' জবাব দিয়েছে, তাঁর সময় নেই, অন্য লোক সঙ্গে দেবে দেখাবার জন্য। নীলা দিদিমণি বলেছে, ক'দিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসতে। বাবু বলেছে, সময় নেই। নীলা দিদিমণি তর্ক করতে ছাড়ে নি, বলেছে, সরকারী কাজ কারো জন্য আটকে থাকে না। ওর বাবু সে কথার জবাব পর্যন্ত দেয় নি, ইত্যাদি—

কিন্তু এত বলার পরেও মুখের দিকে চেয়ে নিধুর মনে হ'ল, সুপারিশ ঠিক জায়গামত পৌঁছল না। যতই বলুক, নিধুর ভিতরেও নাড়াচাড়া পড়েছে একটা। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে এবার আস্তে আস্তে নিজের দুশ্চিন্তা প্রায় স্বীকারই করল যেন, বাবু তার যত কড়া 'ব্যাভারই' করুক, দিনকতক এরকম দেখা-সাক্ষাৎ হলে আবার সব ভুলে যাবে, বড় সেয়ানা মেয়ে এই নীলা দিদিমণি।

ঘাড় ফিরিয়ে এবার তার দিকে তাকালো সান্ত্বনা। এতক্ষণ শুনছিল চুপচাপ। সন্তর্পণে আগ্রহে শুনছিল। কিন্তু শোনার কিছু নেই আর। তাছাড়া এর পরে চুপ করে থাকাও বিসদৃশ। প্রায় রুক্ষকণ্ঠেই বলে উঠল, কি বকছ বকর বকর করে, আর আসতে হবে না, এবারে বাড়ি যাও।

নিধু দাঁড়িয়ে পড়ল।

সান্ত্বনা এগিয়ে চলল হন হন করে।

মস্ত এক দুর্ভাবনা নিয়ে বসে আছেন অবনীবাবু। কোথায় কোথায় বন্যা হচ্ছে, কোন কোন জায়গা ভেসে গেল, কোথায় কি রকম ক্ষতি হয়েছে, একটু আগে সেই বৃত্তান্ত শুনে এসেছেন। এই বন্যার ভাবগতিক ভাল নয় মোটেই, মেয়ের কাছে এই দুর্ভাবনার ফিরিস্তি দিতে লাগলেন তিনি।

কোন উদ্বেগ প্রকাশ করল না সান্ত্বনা বা একটি কথাও বলল না। মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে রইল।

এক বর্ণও কানে ঢোকে নি তার।

রাত্রি। ঘরের আলো নিভানো। জানালার গরাদ ধরে মূর্তির মত সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে। বাইরে অন্ধকার। আকাশে তারা নেই একটাও। দূরের এক কোণে অন্ধকার ফুঁড়ে বিদ্যুৎ চিকচিকিয়ে উঠছে এক-একবার।

ইচ্ছে করেই নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে সান্ত্বনা। যে স্মৃতি সভয়ে পরিহার করেছে বরাবর, নিজেকে দগ্ধ করে তাই নিঙড়ে নিয়ে আসছে চোখের সামনে।

—ওর মায়ের সেই স্মৃতি।

....শেষের দিকে পুরোপুরি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল মায়ের। মাটির আগুন অষ্টপ্রহর ধিকি ধিকি বুকে জ্বলত। বোবা ব্যথায় সান্ত্বনা সেই ঝলসানো মূর্তি চেয়ে চেয়ে দেখেছে। মা নয়, একখানা জ্বলন্ত কঙ্কাল। কাছে যেতে ভয় হ'ত, ছুঁতে ভয় হ'ত। শেষে বুকফাটা তৃষ্ণায়ও এক ফোঁটা জল দিতে পারে নি মুখে। মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, বলেছে, জল তুই কোথা পেলি?

...জল নেই কোথাও, জল পেলি কোথায় তুই?

...জল নেই, জল নেই, ও জলন্ত আগুন!

—গলানো আগুন ঢালতে এসেছিস তুই আমার মুখে, অ্যাঁ? দূর হ'! দূর হ' আমার সুমুখ থেকে! দূর হ'!

—সেই তৃষ্ণার্ত স্মৃতির ওপর শান্তির সমাধি উঠছিল।—মায়াবিনী এসেছে তার নিবিষ্টতায় ভাঙন ধরাতে।

দিগন্তে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে।

॥ ১৪ ॥

পরদিন সকাল।

দিনটাই যেন ভয়ে ভয়ে মুষড়ে আছে কেমন। নিস্তেজ মেঘাচ্ছন্ন। অবিরাম বর্ষণের ফলে মড়াইয়ে একটা বিষণ্ণ ছায়া পড়েই আছে। নিরানন্দ, নিরুৎসাহ দিনের গতি।

যেখান দিয়ে সচরাচর মড়াইয়ে নামে সকলে, সে জায়গাটা ছাড়িয়ে খানিকটা তফাতে গিয়ে একেবারে ধার ঘেঁষে বসল সান্ত্বনা। প্রতীক্ষা করছিল, বাবা বেরুতে সেও বেরিয়ে পড়েছে। মড়াইয়ে প্রলয়ঙ্কর ঝড় হয়ে গেছে একটা। ওর জীবনেও তেমনি ঝড় এসেছে বা আসছে। মুখে সেই স্তব্ধতার আভাস।

থেকে থেকে দু চোখ মড়াইয়ের ওপর ঘুরে আসছে এক চক্কর করে। সন্ধানী দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে পাহাড়ী রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা। কাছাকাছি এসে যারা ওই উৎরাই ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে তাদের। নিধু বলেছিল সকালে সেই মেয়ে আসবে ড্যাম দেখতে। নরেনবাবুর মতে, চিফ ইঞ্জিনিয়ারের এই কাজ এই নিষ্ঠা সব কিছু আজও তছনছ করে ফেলতে পারে যে সে-ই মেয়ে...। আসবে কি না কে জানে। এলেই বা কি করবে ও?

জানে না। তবু এসেছে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সচকিত হয়ে ফিরে তাকালো। পায়ে পায়ে এই পথেই আসছে সেই ঝকঝকে মেয়ে।...একটাই পথ। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। খুঁজছে কাউকে বোঝা যায়।

সান্ত্বনার চোখে পলক পড়ে না। দুই চোখে তাকে টেনে নিয়ে আসতে চায় কাছে।

গত সন্ধ্যায় নিধুর শেষের কথা ক'টা ঠাস ঠাস করে কানে বেজে উঠল। বলেছিল, বাবু যত কড়া ব্যবহারই করুক, এরকম দেখা-সাক্ষাৎ হলেই আবার সব ভুলে যাবে...বড় সেয়ানা মেয়ে নীলা দিদিমণি....।

নীলাও দেখেছে ওকে। নিস্পৃহ দেখা। মুহূর্তে সান্ত্বনার সকল গাম্ভীর্য তলিয়ে গেল কোথায়। হাত তুলে ইশারায় ডাকল। কাছাকাছি হতে হেসে বলল, আপনি যাঁকে খুঁজছেন তিনি ও-ও-ই নিচে।

আঙুল দিয়ে দূরে মড়াইয়ের গহ্বরের একটা দিক দেখিয়ে দিল।

অবাক বিস্ময়ে নীলা চেয়ে রইল তার দিকে। আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, ওই দিক দিয়ে নিচে নেমে যান, এখান থেকে নামতে গেলে পা হড়কে নিচে যখন পৌঁছুবেন, আর দেখতে হবে না।

আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো নীলা। দেখল ভালো করে। এরকম যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না। হাসতে চেষ্টা করল একটু। আপনি আমাকে চেনেন?

খুব। ভগীরথবাবুর টেবিলে আপনাকে দেখেছি।

ভগীরথবাবুর টেবিলে! বিস্ময় ঝরল নীলার কণ্ঠে।

কলহাস্যে ভেঙে পড়ল সান্ত্বনা। নিজের কাণ্ডকারখানায় নিজেই অবাক। দম নিয়ে জবাব দিল, দেশে জল পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন ওই যে ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি—তাঁর টেবিলে।

নীলা বুঝল। কিন্তু বিস্ময় কমল না একটুও। বরং বাড়ল। নিজের অগোচরে আবারও দেখল খানিক—তুমি, মানে আপনি কে?

সেই হাসি—আমি? আমি সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা কে?

যাচ্ছেন তো ভগীরথবাবুর কাছে, তাঁর কাছেই জেনে নেবেন সান্ত্বনা কে।

যত বিস্ময় ততো কৌতূহল। হাসতে চেষ্ট করল নীলাও।—আপনার মুখেই শুনি না সান্ত্বনা কে?

হাল্‌কা কৌতুকে তার চোখে চোখ রাখল সান্ত্বনা। খেলনাপাতি গোছের কিছু দেখছে যেন। পরে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, নীলা সকলের সয় না, কিন্তু সেই না-সওয়ার দুঃখও পুরুষমানুষের সহজে যেতে চায় না। তখন সান্ত্বনার দরকার...আমি সেই সান্ত্বনা। চিনলেন?

হাসতে হাসতে অন্য দিকে ঘাড় ফেরালো। লাল হয়ে উঠছে, সেটা গোপন করার জন্যেই।

সমস্ত মুখ আরক্ত নীলার। দেখছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে তুমি কতটুকু চেনো?

বড় করে সান্ত্বনা একটা নিঃশ্বাস ফেলল প্রথম। পরে মুখের দিকে চেয়ে নিস্পৃহ জবাব দিল, যতটুকু উনি আপনাকে চেনেন।

উনি কে?

আপনাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। একটু থেমে তাকেও সান্ত্বনা দিতে চাইল যেন, বলল, উনি যেমনই চিনুন, আমার কিন্তু কোনো রাগ নেই আপনার ওপর। বরং রোজ আপনাকে একবার করে মনে করি। আপনার কাছে ভদ্রলোকে অমন ঘা খেয়েছিলেন বলেই আজ এমন একটা কাজে মন ঢেলে দিতে পেরেছেন।

ক্রোধে অপমানে ভিন্ন মূর্তি নীলার। সবই জানে মেয়েটা। পায়ের নিচে মাটি দুলছে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আবারও খুঁটিয়ে দেখল তাকে। স-শ্লেষে বলল, আর সেই সঙ্গে সান্ত্বনাও পেয়েছেন?

সোচ্ছ্বাসে মাথা নেড়ে সায় দিল সান্ত্বনা।

যাবার জন্য পা বাড়াল নীলা। থামল আবার। চাপা ঝাঁজে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে বললে?

আঙুল দিয়ে সান্ত্বনা মড়াইয়ের গহ্বরই দেখিয়ে দিল আবার। পরে আলতো প্রশ্ন করল, কিন্তু আজ আবার কেনই বা যাচ্ছেন তাঁর কাছে?

'আজ' কথাটার ওপর জোর পড়তে ব্যঙ্গের মত শোনালো। নীলা দাঁড়িয়েই রইল।

সান্ত্বনা ধীরেসুস্থে বলল, কাল রাতেও গিয়েছিলেন শুনলাম কিনা...তা কাল বোধ হয় সব বলা হয় নি আপনার। হেসে উঠল।—কিন্তু যেরকম রেগে আছেন, দিনেদুপুরে লোকজনের মধ্যে ওটা কি একটা কথা বলার মত জায়গা?

অব্যক্ত রোষে নীলা বিবর্ণ। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তোমার সাহস তো কম নয়!

কি বলছে বা বলেছে, কি করছে বা কি করেছে হুঁশ নেই সান্ত্বনার। কিন্তু এটুকু খেয়াল আছে, যে নাটকে হাত দিয়েছে তার শেষটুকু এখনো বাকী। সহাস্যে জবাব দিল, দেশে-গাঁয়ে জলে-জঙ্গলে মানুষ কিনা...ওটুকুই আছে। ঘুরে বসল, তাকালো সোজাসুজি, হাসি মিলিয়ে গেল। বেশ স্পষ্ট মোলায়েম করে বলল, ওঁর কাছ থেকে একটা জিনিস আপনি চেয়ে নেবেন। ওঁর টেবিলে আপনার যে ফোটোখানা আছে সেইটে। ওটা আমি সরাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উনি সরাতে দেন নি।...পাছে আপনাকে তিনি ভুলে যান, পাছে অমন একটা অবিশ্বাসের ব্যাপার মন থেকে মুছে যায়। নিজে মেয়ে বলেই চোখের সামনে অন্য কোনো মেয়েকে এভাবে ছোট করাটা মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে....লজ্জাও করে।

হয়েছে। শেষটুকু শেষ হয়েছে এবারে। পায়ে পায়ে পাথুরে রাস্তাটাকে ঘা দিতে দিতে সবেগে চলে যাচ্ছে নীলা। যতক্ষণ দেখা যায় তাকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সান্ত্বনা। উত্তেজনা কমে আসছে। সচেতন অবসাদে ভরে উঠেছে। স্থির কঠিন পাথর-মূর্তি।

অফিস-কোয়ার্টার থেকে গাড়ি ট্রাক নিয়ে গেস্ট হাউসে উঠে যাবে নীলা। কিন্তু অফিস-প্রাঙ্গণে অপ্রত্যাশিত দেখা একজনের সঙ্গে। নরেন চৌধুরী। নীলা দাঁড়িয়ে গেল।

ওকে দেখে নরেনই এগিয়ে এলো। হাত তুলে নমস্কার জানালো।

নিজেকে সংযত করে প্রতি-নমস্কার করল নীলা। একে দেখে মনে মনে অবাক হয়েছে, কিন্তু প্রকাশ পেল না। বলল, আপনি তাহলে এখানেই কাজ করছেন?

হ্যাঁ, এখানেই পড়ে আছি। আপনি ভালো আছেন?

খুব। সহজ হতে চেষ্টা করছে নীলা।

ড্যাম দেখলেন?

দেখলাম। নীলা লক্ষ করছে ওকে। কলকাতায় বাদল গাঙ্গুলি মাঝে ছিল বলেই যেটুকু আলাপ এর সঙ্গে। তবু মানুষটার ধরণ-ধারণ ভালই জানে। দেখা হলে অল্পস্বল্প রসিকতা হ'ত। এখনো প্রায় তেমনি করেই নীলা জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার বন্ধু না হয় এখানে এসে সান্ত্বনা পেয়েছেন, আপনি পড়ে আছেন কোন্ আশায়?

নিজের অজ্ঞাতে কত বড় ধাক্কা দিয়েছে নীলা জানল না। জানলে খুশি হ'ত। বিমূঢ় নেত্রে নরেন চেয়ে রইল তার দিকে।

দেখছেন কী?

না, কিছু না। চকিতে সামলে নিতে চেষ্টা করল নরেন। কিন্তু খুব সহজ হ'ল না সেটুকু। ওর কথাগুলো ঝিম ঝিম করছে মাথার মধ্যে। বলল, আর একটু খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করুন, এ মাথায় হেঁয়ালি ঢোকে না জানেন তো....।

নীলা চুপচাপ দেখল দু'চার মুহূর্ত। খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করল তার পর, সান্ত্বনাকে চেনেন আপনি?

খুব।...আপনি চিনলেন কি করে?

সে নিজেই চেনালে। অনেক কথা বলল আর অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল। নীলা থামল আবার, তাকালো সোজাসুজি। মেয়েটা যা বলল সব সত্যি?

তার বক্তব্য স্পষ্ট। জানতে যা চায় সে-ও স্পষ্ট। তবু দুর্বোধ্য লাগছে নরেন চৌধুরীর কাছে। অনেক কথা কি বলল সান্ত্বনা, অনেক কিছু কি বুঝিয়ে দিল!... বন্ধু সান্ত্বনা পেয়েছে, তাই? শান্ত মুখেই জবাব দিল, কি বলল মেয়েটা আর কি বোঝালো না জানলে বলি কি করে?

নীলার সহিষ্ণুতা গেছে। উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, না বললে বোঝেন না অমন সাদা মাথাও আপনার নয়, দয়া করে জবাবটা দিন।

তবু জবাব দিতে সময় লাগল নরেন চৌধুরীর। বন্ধু সান্ত্বনা পেয়েছে কিনা সেই জবাব...। অভ্যস্ত কৌতুকের আবরণ টেনে আনতে চেষ্টা করল মুখে। হাসতে চেষ্টা করল।

প্রচ্ছন্ন ঝাঁজে নীলা আবার জিজ্ঞাসা করল, সত্যি সব?

এবারে জবাব দিল। বলল, কিছু যদি বলে থাকে সেটা সত্যি, মিছে বলাটা তার স্বভাব নয়।

দৃষ্টি বিনিময়। কয়েক মুহূর্ত।

ধন্যবাদ। দয়া করে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন, ওপরে যাব।

অলস পায়ে ফিরে চলল নরেন। একজনকে ডেকে ট্রাক আনতে নির্দেশ দিল।

পাহাড়ী চড়াইয়ের কাছাকাছি আসার অনেক আগেই পা থেমে গেছে সান্ত্বনার। দাঁড়িয়ে দেখছে নিস্পন্দের মতো। ট্রাক এলো। অফিস-কোয়ার্টার পেরিয়ে ভুতুবাবুর দোকান ছাড়িয়ে নীলা এসে উঠল ট্রাকে। ট্রাক চলে গেল। অফিস-কোয়ার্টারের আঙিনায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে নরেন চৌধুরী।

ট্রাক চলে যেতে ঘুরে দাঁড়াল মানুষটা।...সান্ত্বনাকে দেখল বোধ হয়। চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল।

এ পথটা পেরিয়ে সান্ত্বনা যাবে কি করে ওপরে, ভেবে পাচ্ছে না। কিছুই ভাবতে পারছে না। কি করছে তাও না, কি করবে তাও না। দাঁড়িয়ে থাকা আরো বিসদৃশ। এগোতে লাগল।

সামনে ভুতুবাবুর দোকান। ভুতুবাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখছে।

বিগলিত বদনে হাসছে, যেমন হাসে। মাথা গোঁজ করে এগিয়ে আসছে সান্ত্বনা।

গতি শিথিল হ'ল আরো।

চকিতে এক পলক দেখে নিল। দু-পা অগ্রসর হয়ে একটা পাথরের ওপর বসে পড়ল নরেন চৌধুরী। দু চোখ সোজাসুজি ওর দিকে। সান্ত্বনার মনে হ'ল হাসছে একটু একটু। সেদিনের সেই নির্মম স্পর্শ এত দূর থেকেও যেন ছেঁকে ধরছে ওকে।

রাস্তার এক পাশ ধরে মাথা নিচু করে চলতে লাগল সান্ত্বনা। মুখ তুলে আর তাকাল না একবারও। ভুতুবাবুর প্রত্যাশিত মুখের দিকেও না। মনে মনে একটা জ্বালা অনুভব করতে চেষ্টা করল সান্ত্বনা। সেই পুরুষ-স্পর্শ নিপীড়নের জ্বালা।

কিন্তু তাও পারছে না। সর্বাঙ্গ অবসাদে ভরা। পা আর চলে না। এত পথ পেরিয়ে বাড়ি যাবে কেমন করে!

"—নীলা হারিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছ। তোমার সান্ত্বনা আর নরেনবাবুর মুখেই শুনলাম সব। খুশির কথা। ফোটোখানা নিয়ে গেলাম। কি জন্যে সযত্নে ওটা চোখের সামনে রেখেছিলে তাও শুনেছি। তুমি বড়। কিন্তু বড়র কি এমন ব্যঙ্গ সাজে? আর বোধ হয় দেখা হবে না চলি, নীলা।"

অফিস-ফেরত এখনো জামা-কাপড় বদলানো হয় নি বাদল গাঙ্গুলির। ডেক্-চেয়ারে বসে আছে সেই থেকে। মাঝে মাঝে পড়ছে চিঠিটা। কতবার পড়ল ঠিক নেই।

বেলা তিনটে নাগাদ অফিসে বসেই খবর পেয়েছে এক্সপার্ট কমিটি চলে গেলেন। নীলা এবং তার বাবাও। বাদল গাঙ্গুলি মস্ত এক দুঃসংবাদ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল তখন। উজানে বন্যা হয়ে গেছে যে চার-পাঁচটা পাহাড়ী নদীতে, তার সর্বনাশা গতি মড়াইয়ের দিকে। চারদিক থেকে সতর্ক-বাণী আসছে। এরই মধ্যে নীলার এমন অপ্রত্যাশিত বিদায়ের সংবাদ। সমস্ত দিন আর অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনায় মন বসল না। হার স্বীকার করে শ্রদ্ধার ডালি নিয়ে এলে শত্রুর উপরে রাগ থাকে না। নীলার সঙ্গে বা তার বাবার সঙ্গে কাল বাইরের আচরণ যেমনই হোক, নিরিবিলি অবকাশে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। ভবিতব্যের চাকা যেমন করে ঘুরলে বা যতটা ঘুরলে অন্তস্তলের সেই নিবিড় জ্বালা জুড়োতে পারে, ততটাই ঘুরেছে। সকালেই একবার দেখা হবে নীলার সঙ্গে, এরকম একটা সঙ্গোপন আশা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল মনে। বিকেলে কোয়ার্টারএ আসবে এ একরকম ধরেই নিয়েছিল। শুধু নীলা নয়, নেশান বিলডার্স-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিপুল বাড়রীও আসবেন নিঃসংশয় ছিল।

কাজে মন দিতে চেষ্টা করেছিল বাদল গাঙ্গুলি। সময় নষ্ট করার সময় নেই। কিন্তু খবরটা যেন কাঁটার মত বিঁধতে থাকল খচ-খচ করে। সন্ধ্যের আগে কোয়ার্টারে ফিরে ঘরে ঢুকতেই প্রথম চোখ গেল টেবিলের ওপর। নীলার ফোটো নেই, শূন্য ফ্রেমটা আছে। আর ওই চিঠি।

বিমূঢ় বিস্ময় কাটতে নিধুর তলব পড়ল। নিধু জানালো, নীলা দিদিমণি এসেছিলেন, ফোটো নিয়ে গেছেন আর ওই চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

গম্ভীর মুখেই সংক্ষিপ্ত বারতা জ্ঞাপন করল নিধু। কিন্তু বাবুর মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভিতরটা গুরগুর করছে। আধঘণ্টার চেষ্টায় বানান করে পড়ে চিঠির মর্ম মোটামুটি স্বেও উদ্ধার করে রেখেছে বৈকি। পাছে সেটা ধরা পড়ে, পাছে ওর খুশিভাব মনিবের চোখে পড়ে সেই জন্য সতর্ক, গম্ভীর। কিন্তু এখন সুমুখ থেকে সরতে পারলে বাঁচে। ঝকঝকে ফোটো-ফ্রেমটা এবারে একদিন ওর ঘরে ওর টেবিলে গিয়ে উঠতে পারে, সামনে দাঁড়িয়ে সেই গোপন প্রত্যাশাও সম্প্রতি মুছে গেছে নিধুর মন থেকে।

বাদল গাঙ্গুলি চুপচাপ বসে। গত রাত্রিতে নীলা যখন এসেছিল তখন সান্ত্বনাও এসেছিল। চিঠি পড়ার সঙ্গে সেটা মনে হয়েছে। তারপর সেই মেয়ে দেখা করেছে নীলার সঙ্গে। দেখা করে এমন কিছু বলেছে যার অর্থ চিঠিতে অস্পষ্ট নয় একটুও। শুধু সে বলে নি, নরেন চৌধুরীও বলেছে কিছু। এমন কিছু যা নীলা বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করে ওর সঙ্গে একবার দেখা না করেই চলে গেছে।

অসহিষ্ণু উত্তেজনায় আর বসে থাকা গেল না। ঘরময় পায়চারি করল বার কতক। থম থম করছে সমস্ত মুখ। বাদল গাঙ্গুলি নয়, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সজাগ হয়ে উঠেছে আবার।

নিধুর ডাক পড়ল আবারও। নরেনবাবুকে এখনি খবর দেবার নির্দেশ শুনে নিধু করুণ নেত্রে বাইরের দিকে তাকালো একবার। বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে তখন, পরোক্ষে সেদিকেই মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল নিধু।

চেষ্টা করে ধমক খেল একটা। অগত্যা হুকুম তামিল করতে চলল। আর মনে মনে ঠিক করল, বেরুতেই হবে যখন, নরেনবাবুকে খবর দিয়ে ওভারসিয়ার দিদিমণির কাছেও ঘুরে আসবে একেবারে। নিধুর নিজস্ব বিচার-বুদ্ধিতে নীলা দিদিমণির চলে যাওয়ার খবরটা সেখানেও জানানো দরকার বলে মনে হ'ল।

সকালের ধাক্কাটা নরেন চৌধুরী সামলে উঠতে পারে নি বটে, কিন্তু তার সহিষ্ণুতা অন্যরকম। ভিতরে যাই হোক, বাইরে প্রকাশ কম। নিরাসক্ত মনোযোগে কাজে ডুবে থাকতে চেষ্টা করেছে। মাঝে মাঝে শিস দিয়েছে, কানকাঠি বার করেছে পকেট থেকে। যত বেলা বেড়েছে, সিগারেট পুড়েছে প্রায় দ্বিগুণ। কামাই নেই বললেই হয়।

নীলার চলে যাওয়ার সংবাদ সেও জানে। সকলেই জানে। খবর দিয়ে নিধু চলে যাবার পরেও সে চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। সৃষ্টির কাজে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ-সম্ভাবনা রীতিমত সঙ্কটের কারণ এখন। মাটির সাময়িক অবরোধে প্রাচীরের ওধারে জল অনেকটাই ফুলে উঠেছে, ফেঁপে উঠেছে, প্রতিদিন বাড়ছে। এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কারণ যথেষ্ট আছে, আলাপ-আলোচনার দরকার আছে। কিন্তু তবু নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করছে নরেন চৌধুরী, এই মুহূর্তের এই ডেকে পাঠানোটা কর্ম-সংশ্লিষ্ট নয়। ডাক পড়েছে ব্যক্তিগত কারণে...।

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নরেন চৌধুরী। একটু বাদে অন্যমনস্কের মত আবার একটা সিগারেট ধরালো। দু'চার টান দিয়ে সেটাও ফেলে উঠে দাঁড়াল। বন্ধু ডেকেছে। কোনদিন উপেক্ষা করে নি নরেন চৌধুরী। আজও যেতে হবে। শুনতে হবে কি বলে। পরামর্শ দিতে হবে। কিন্তু আজকের এই ডাক কাটা ঘায়ে কাঁটার

মত বিঁধছে।

বাইরের ঘরেই বসেছিল বাদল গাঙ্গুলি। প্রতীক্ষা করছিল। শান্ত, গম্ভীর। ভেজা রেন্-কোট গা থেকে খুলতে খুলতে সহজ হাল্কা কণ্ঠে নরেন বলল, কি ব্যাপার। অসময়ে ওপরঅলার জরুরী তলব একেবারে?

জবাব পেল না। রেন্-কোট একটা কাঠের চেয়ারের কাঁধে ফেলে ওয়াটারপ্রুফ টুপী খুলে তার ওপর রাখল নরেন চৌধুরী। পরে মুখোমুখি বসে পকেট থেকে রুমাল বার করে জলের ছাট মুছতে মুছতে তাকালো তার দিকে।

বাদল গাঙ্গুলি স্থির চেয়ে আছে। এবারে কথা বলল। সংযত নিরুত্তাপ।—অসময়ে ওপরঅলা তলব পাঠাতে পারে সেটা বোধ হয় একেবারে ভুলে গেছ, না?

নরেন চৌধুরী হতভম্ব। এতকালের হৃদ্যতার মধ্যে এমন উক্তি আর শোনে নি কখনো। সেই মুহূর্তে বুঝে নিল, ওকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ওরই সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবে বলে।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, মনে রাখতে বলছ?

বলতে বাধ্য হচ্ছি।

বেশ মনে থাকবে। হেতুটা জানতে পারি?

জবাব না দিয়ে নীলার চিঠিখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিল বাদল গাঙ্গুলি। চিঠি নিল। পড়ল। একবার...দুবার। চিঠি রাখল টেবিলের ওপর। তাকালো। বাদল গাঙ্গুলির দু চোখ তার মুখের ওপর সংবদ্ধ। রূঢ়, কঠিন প্রতীক্ষা। বলল, এবারে ওপরঅলা কিছু জবাব চাইতে পারে বোধ হয়?

নিজের অজ্ঞাতে পকেটে হাত ঢোকাল নরেন চৌধুরী। কানকাঠি....। না, কানকাঠি চায় না। সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই। সিগারেট ঠোঁটে ঝোলালো। অগ্নি-সংযোগ করল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর হাল্কা জবাব দিল, কাল সকালে অফিস থেকে নোট পাঠিও, জবাব দেব।

নরেন। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবারে।—সব কিছুরই একটা মাত্রা থাকা দরকার।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবারও তেমনি নিস্পৃহ মুখে নরেন বলল, হ্যাঁ, সামান্য একটা চিঠি পেয়ে মাত্রা ছাড়িয়েই যাচ্ছ। কিন্তু কি জন্যে ডেকেছ আমাকে? কি জানতে চাও?

নীলাকে তুমি কি বলেছ?

এমন কিছু বলি নি যার জন্য তুমি আমায় এভাবে ডেকে এনে এত কথা বলতে পারো!

ক্রোধে, অবিশ্বাসে রুক্ষতর হয়ে উঠল বাদল গাঙ্গুলির মুখ।—বলো নি?

না। একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত শব্দ নরেন যেন ঠাস করে ছুঁড়ে দিল তার মুখের ওপর।

বাদল গাঙ্গুলি থমকে গেল একটু। কিন্তু দুই-এক মুহূর্ত মাত্র। চেয়ে আছে। দেখছে।—নীলা হারিয়ে আমি সান্ত্বনা পেয়েছি, কেমন?

সিগারেট ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরেন চৌধুরী। রেন্-কোট হাতের ভাঁজে ফেলে টুপী তুলে নিল। পরে পাল্টা নিরীক্ষণ করল তাকে ক্ষণকাল। জবাব

দিল, ভেবেছিলাম পেয়েছ। কিন্তু এখন দেখছি, আমারই মত ঘোলাটে বরাত তোমারও।

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি তেমনি। হনহনিয়ে চলেছে নরেন চৌধুরী। সর্বাঙ্গ ভিজে জবজবে। হাতে রেন্-কোট আর টুপী।

প্রথম বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল মাটির সাময়িক অবরোধ-প্রাচীর নিয়ে।

এর স্ফীতি বা প্রতিরোধ-ক্ষমতা কম নয়। বন্যার বা বর্ষার প্রচণ্ড নিম্নমুখী গতি এইখানে এসে থেমেছে। শেকলে বাঁধা কয়েদীর মত দু'চারটে কৃত্রিম পরিখার পথে এই জলস্রোত মুক্তির আস্বাদন পায় একটু-আধটু। নয়ত এখানে এসে গুমরে গুমরে ফুলে ওঠে।

এই সাময়িক অবরোধ নিয়ে মাথা ঘামায় নি কেউ কোনদিন। এত বড় সৃষ্টি-সমারোহের মধ্যে ওটার ভূমিকা ছিল উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত। ওর বাইরে জল বাড়ছে দিনে দিনে। বাড়বে সকলেই জানে।

সাতমহলা বাড়ির পাশে আগাছার মত তিলে তিলে বেড়ে ওঠা পথের ছেলেটা ডাকাত হয়ে যখন ওই সাতমহলা বাড়ির দিকেই দৃষ্টিপাত করে প্রথম, বিভ্রান্ত বিমূঢ় বিস্ময়ে তখন তাকে চেয়ে দেখে মহলবাসীরা। এ-ও তাই যেন। সাময়িক অবরোধের ওধারে দিনে দিনে জল ফেঁপে উঠছে, ফুলে উঠছে—সকলেই দেখছে। কিন্তু তেমন করে লক্ষ্য করে নি কেউ। একটানা দুর্যোগে ড্যামের কথা নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে সবাই। কিন্তু বন্যার অঘটনে সকলের সব চোখ আর সচকিত মনোযোগ এসে পড়ল এই দিকে।

এই বিশাল মাটির অবরোধ এমনিতে টলবে না একটুও। কিন্তু জল যেভাবে ফেঁপে উঠছে, যদি ওটা ছাড়িয়ে উঠতে পারে, ভাঙন অবধারিত। সেই সম্ভাবনা এখন। জল এখন আর ওটার কাঁধ থেকে নিচে নয় খুব।

কি করবে ? কৃত্রিম পরিখাগুলো খুলে দেবে ? যতক্ষণ সম্ভব তাই করা হয়েছে। আর সেটা সম্ভব নয়। গ্রামকে গ্রাম ভেসে যাবে তাহলে। এমনিতেও যেতে পারে, কিন্তু শ্বাস যতক্ষণ, আশা ততক্ষণ। আর বন্যার তোড় তেমন বাড়লে ওই করেই বা কি হবে। দুদিকের পাহাড়ে বাধা পেয়ে অবরুদ্ধ জল ফেঁপে উঠবেই ওপরের দিকে।

একটি মাত্র পথ আছে। একটি মাত্র চেষ্টা করা যেতে পারে। মাটির ওই বিশাল অবরোধ উঁচু করো আরো। পাথর ঢালো, বালির বস্তা ফেলো, মাটি ঢালো। যেখানে ভাঙনের সম্ভাবনা সেখানেই ঢালো মাটি, ঢালো পাথর, ফেলো বালির বস্তা। রাতারাতি উঁচু করো অবরোধ-প্রাচীর। কোনো দিক দিয়ে আসতে দিও না ওই অবরুদ্ধ জল।

ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় বাদল গাঙ্গুলি ড্যামের সমস্ত জনশক্তি নিয়োগ করলে এদিকে। আরো আগেই করা উচিত ছিল। আরো আগেই করত। আকাশ-বাতাশের বিরুদ্ধাচরণ শুরু হয়েছে আজ নয়, অনেক—অনেকদিন ধরে। এরকম প্রবল বন্যা-সঙ্কট অভাবনীয়। কিন্তু এমন দীর্ঘকালের দুর্যোগে তাও ভাবা উচিত ছিল। বিশেষ করে পাহাড়-ঘেরা অঞ্চলের প্রাকৃতিক বিঘ্ন যেখানে এরকম। প্রথম যখন বন্যার খবর আসে তখন থেকে

এদিকে প্রস্তুত হলেও কটা দিন হাতে পেত। হয় নি, কারণ, এক্সপার্ট কমিটির আসন্ন সফর চিফ ইঞ্জিনিয়ারের অন্তর্দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাদের আসার দিনকতক আগে থেকেই অবিরাম একটা কল্পিত বিরোধের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে তাকে।

....আর তার পরেও দুটো দিন কেটেছে এক মর্মচ্ছেদী বিভ্রান্তির মধ্যে, আত্মবিস্মিত বিহ্বলতার মধ্যে। এই সঙ্কটে দুটো দিনের কর্মশৈথিল্যও কম কথা নয়। প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা দুর্মূল্য এ সময়ে।

ঢালো মাটি ! ঢালো পাথর ! ফেলো বালির বস্তা। উঁচু করো—যত পারো উঁচু করো ওই অবরোধ। যত লোক আছে আনো এদিকে। পরিবহন যন্ত্রগুলো সব লাগাও এ কাজে।

ক্ষিপ্ত কাজের তাগিদে গোটা মড়াইসুদ্ধ লোক সচকিত হয়ে উঠল আবার। কাজ চলল সমস্ত দিন, সমস্ত রাত। বৃষ্টির মধ্যে, দুর্যোগের মধ্যে। ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে লাগল আবার একটা দুটো করে। কিন্তু তা নিয়ে শোক করার সময় নেই কারো। শোক পরে হবে। কে গেল কে থাকল তার হিসেবনিকেশ পরে হবে। ঢালো পাথর। ফেলো বালির বস্তা। ঢালো মাটি।

কিন্তু এর মধ্যেও ক্রোধ এবং দুর্বার আক্রোশে মাঝে মাঝে স্তব্ধ হয়ে পড়ছে বাদল গাঙ্গুলি।...এই সব কিছুর জন্যেই যেন দায়ী ওই মেয়ে....ওই ওভারসিয়ারের নগণ্য এক মেয়ে। যে ওকে বিভ্রান্ত করেছে, বিহ্বল করেছে। চক্রান্ত করে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে নীলার সঙ্গে। এতকালের বন্ধুত্বের অবসান ঘটিয়েছে নরেন চৌধুরীর সঙ্গে।

নীলা এসেছিল নত হয়ে, এসেছিল চীফ ইঞ্জিনিয়ারের জয়ের আর গৌরবের স্বীকৃতি নিয়ে। এত দিন শুধু এরই প্রতীক্ষায় ছিল বাদল গাঙ্গুলি। এই জয়ের আর এই গৌরবের। এই সমর্পণের। শুধু এরই জন্য যা কিছু, সব কিছু। বাদল গাঙ্গুলির মনে হ'ল, অপরিসীম স্পর্ধায় তার এত দিনের সব সাধনাই যেন নিস্ফল করে দিয়েছে তারই অধীনস্থ সামান্য এক কর্মচারীর মেয়ে।

অধীনস্থ সামান্য কর্মচারীর এই মেয়েটিই দিনে দিনে অসামান্য হয়ে উঠেছিল তার চোখে, এই ক্ষোভের মুহূর্তে সেই দুর্বলতা বিস্মৃত হয়েছে সম্পূর্ণ। তার মরুব্যর্থ যান্ত্রিক জীবনে সবুজের রোমাঞ্চ নিয়ে আসছিল এই অসামান্য মেয়েই, সে-ও আর মনে নেই। ড্যামের প্রতি এই সামান্য মেয়ের তন্ময় আকর্ষণ আর তার সহজ উচ্ছল প্রাণপ্রাচুর্য কত দিন আনমনা করেছে তাকে, আজকের নির্মম রোষে সেই স্মৃতি তলিয়ে গেছে। মাসির বাড়িতে ওই সামান্য মেয়েটি দু মাস গিয়েছিল যখন, কাজের নিবিষ্টতার মধ্যেও মড়াই তখন নীরস লাগত মাঝে মাঝে, আজ সে সত্য স্মরণাতীত। আর, নিরিবিলি অবকাশে এই সামান্য মেয়েকে ঘিরেই একদিন যে এক অবান্তর কথা মনে জেগেছিল—ভারি খুশি হ'ত তার মা এই মেয়েটিকে দেখলে—সেই অনুভূতিও এখন নিশ্চিহ্ন।

এত বড় প্রাকৃতিক অঘটন সম্ভাবনার প্রতিরোধ-ব্যস্ততা এবং দুশ্চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে এখন শুধু একটি মাত্র কঠিন প্রতীক্ষার স্তব্ধতা।

...নির্মম এক বোঝা-পড়ার প্রতীক্ষা।

দিন-দুই একরকম আচ্ছন্নের মত কেটে গেল সান্ত্বনার। কিছুই ভাবল না, কিছুই ভাবতে পারল না। সারাক্ষণ একটু ঘুম-ঘুম ভাব। অথচ ঘুম যে আসে খুব তাও না। ভাবনা-চিন্তা সব বাতিল করে দিয়েছে। পরে ভাববে, পরে চিন্তা করবে। আজ নয়, আর একদিন। অন্য একদিন। অন্য কোন দিন।

কিন্তু দু'দিন বাদেই এ ভাব কেটে গেল। গা-ঝাড়া দিয়েই নড়েচড়ে সজাগ হ'ল। নিজের মধ্যে আবারও যেন সেই দুর্গম রহস্যের সন্ধান পেল। অন্তস্তলের সেই বিচিত্র-রূপিণীকে সামনাসামনি দেখল যেন। মড়াইয়ে আসার পর দিনে দিনে, বহু পস্থিতিতে, বহু অনুকূল-প্রতিকূলতার মধ্যে, বহুজনের দৃষ্টিপথে যার চেতনার উন্মেষ। এতদিন শুধু আভাস পেয়েছে, উপলব্ধি করেছে আর রোমাঞ্চিত হয়েছে। সাহস করে একেবারে উদঘাটন করে দেখে নি নিজেকে, অনাবৃত করে দেখে নি। এবারে দেখল। আর উপলব্ধির জোয়ার উপচে উঠতে লাগল।

কি আবার ভাববে? কি চিন্তা করবে?

যা করেছে ও-ই করেছে, ও-ই শুধু করতে পারে।

দেশবিদেশের খবর রাখে না সান্ত্বনা। ইতিহাসের নজির জানে না। বিপুল নারী-মহিমা কত ইতিহাস গড়েছে আর কত ইতিহাস ভেঙেছে তার জানা নেই। কোথায় কত দেশের কত মানচিত্র বদলে গিয়েছে জানা নেই। কিন্তু ওর সমস্ত সত্তার সেই শাশ্বত গরবিণীকেই যেন অনুভব করছে থেকে থেকে। আনন্দে, আত্মপ্রাচুর্যে ভরে ভরে উঠেছে।

ভাবনার আবার কি আছে? চিন্তারই বা আছে কি? সব ভাবনা-চিন্তার অবসান তো করেই ফেলেছে।

ও-ই করেছে, ও-ই পেরেছে।

প্রাকৃতিক অঘটন সম্ভাবনার খবর কানে আসছে। সকলের ভাবনা চিন্তা আর উত্তেজনার আভাস পাচ্ছে। কিন্তু এ আর তেমন বড় করে দেখছে না সান্ত্বনা। ওর অন্তরের অনুভূতির সবল জোয়ারের বেগ ওই বন্যার থেকে কম নয়। প্রকৃতির মধ্যে বাস করছি, তার অঘটন ঠেকাব কি করে? সে আসবেই। আবার বাঁচার তাগিদে মানুষই তাকে প্রতিরোধ করবে। যেমন করে পারে ঠেকাবে তাকে। ঠেকাবেই। নইলে আজ ড্যাম হ'ত এখানে? হ'ত?

সান্ত্বনার গর্ব আর ধারণা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের থেকেও অনেক, অনেক বড় বিপর্যয়ের সম্ভাবনা প্রতিরোধ করেছে ও নিজে। একা। সৃষ্টি-কাজের নিষ্ঠায় ফাটল ধরতে দেয় নি। একদিনের জন্যও যজ্ঞনাশ হতে দেয় নি।

থেকে থেকে উসখুস করতে লাগল কেমন। একবার গেলে কেমন হয়?

গেলে কেমন হয় কি! যাবেই তো। এটুকু বাকী বলেই এরকম লাগছে...কি না জানি করছে মানুষটা। কি না জানি ভাবছে।

হাসি পেয়ে গেল সান্ত্বনার। বেচারী...।

কিন্তু সত্যি দুঃখ হ'ল না তা বলে। ভিতরে ভিতরে সেই সবল নিশ্চিন্ততা বোধ...শেষ পর্যন্ত মানুষটার লোকসান হবে না এক কণাও। সব লোকসান পুরিয়ে দেবে ও।

এবারে হেসেই ফেলল সান্ত্বনা। নিজের উদ্দেশেই ভ্রূকুটি করে উঠল একটু।

যাবার কথা মনে হতেই চনমন করে উঠল। এতটুকু সঙ্কোচ নেই আর। পুরুষ-সন্নিধানজনিত সব সঙ্কোচ আর ভয় ঘুচিয়ে দিয়েছে আর একজন। নরেন চৌধুরী। মনে হতেই বিমনা হয়ে পড়ল একটু। অনুকম্পার ছায়া নামল মুখে।

...বেচারী।

সদ্য-জেগে-ওঠা এই আত্মপ্রাচুর্যে ওর কাছে নরেন চৌধুরীও বেচারী পর্যায়ে গিয়ে পড়ল আজ। কিন্তু তার জন্য ভারী নিঃশ্বাস পড়ল একটা। আর তার ওপর কোন অভিযোগ নেই সান্ত্বনার, কোন বিদ্বেষ না।

...তার লোকসান থেকেই গেল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আকাশে সেই একটা দুর্যোগ। ক্ষণেক থামছে, ক্ষণেক ঝরছে।...মরুক গে, ও বেরুবেই আজ। জলের ভয় আবার কবে করেছে। চারটে দিন কেটে গেল কোথা দিয়ে। কাপড় জামা বদলে নেবার জন্য ব্যস্তসমস্ত ভাবে দাওয়া ছেড়ে ঘরে ঢুকল। বাবার বকুনির ভয় নেই আপাতত। বন্যা-সঙ্কটের চাপে পড়ে কখন কত রাতে বাড়ি ফেরেন ঠিক নেই।

ঘরে এসে দু'চার মুহূর্ত ভাবল কি। আটপৌরে বেশবাসেই বেরোয় সর্বদা। বছরান্তে মাসির দেওয়া ভালো শাড়িগুলোতে মড়াইয়ের আলো বাতাস লাগে নি। কিন্তু জলেকাদায় নষ্ট হতে পারে। হোক গে। আলমারি খুলে পোশাকী শাড়িগুলো থেকে মোটামুটি সাধারণ গোছের একটা টেনে বার করল। তবু লজ্জা-লজ্জা করছে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত প্রসাধন সেরে নিতে লাগল। দুই ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। চোখ দুটো চকচক করছে নিজের দিকে চেয়ে।

কিন্তু চকিতে কি মনে হতে স্তব্ধ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। মনে হ'ল আয়নায় ওর ওই চোখের মধ্যে যেন চাঁদমণির সেই আগের দিনের হাসি ফুটে উঠেছে, আর ঠোঁটের ফাঁকে চাঁদমণির লাস্য !...আর একদিনও চাঁদমণির কণ্ঠস্বর শুনেছিল নিজের কণ্ঠে। পাহাড়ের সেই সর্বনাশা নিরিবিলিতে যেদিন নরেনকে ডেকেছিল ওর পাশে পাথরে এসে বসতে।

তাড়াতাড়ি আয়নার কাছ থেকে সরে গেল সান্ত্বনা।

অন্ধকার নির্জন পথ ধরে কোয়ার্টারস-এর দিকে চলেছে। চাপা হাসিটুকু চাপতে পারছে না এখনো। নরেনের একদিনের টিপ্পনী মনে পড়ে। যেদিন এই মড়াইয়ের পাহাড়ে সবই সম্ভব বলে ঠাট্টা করেছিল। কিন্তু না, ওই লোকটির কথা এখন অন্তত একবারও ভাবতে চায় না। চলার গতি বাড়িয়ে দিল সান্ত্বনা। ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। মেঘ ডাকছে গুড় গুড় করে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রাস্তায় যদি ভিজে নেয়ে ওঠে, তাহলে আর যাবে না, ভিজতে ভিজতে সটান বাড়ি ফিরবে আবার। মিটি মিটি হাসছে সান্ত্বনা। চাঁদমণি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আবার। আগের দিনের চাঁদমণি।

মেয়েটা যেন সেই থেকে মন্ত্র জপছে কানে। যৌবনের মন্ত্র। মনকে শাসন করতে গিয়ে হার মেনে হাল ছাড়ল সান্ত্বনা।

বাংলো অন্ধকার। কারো সাড়াশব্দ নেই। বাইরের ঢাকা বারান্দায় উঠে মৃদু গলায় ডাকল, নিধু।

সাড়াশব্দ নেই ক্ষণকাল।

সান্ত্বনা চমকে উঠল। অন্ধকার সইয়ে চোখ টান করে দেখল, কোণের ইজিচেয়ারে শুয়ে আছে ভদ্রলোক। শুয়ে ঠিক নেই, ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে তাকে।

সাক্ষাৎকারটা এরকম হবে বলে প্রস্তুত ছিল না সান্ত্বনা। কিন্তু যে মেজাজে এসেছে সামলে নিতে সময় লাগল না। অস্ফুট স্বরে হেসে উঠল।—ওমা, আপনি। এই অন্ধকারে ভূতের মত বসে যে? মন খারাপ বুঝি?

মনে মনে এই মেয়ের সঙ্গেই যে চরম সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করছিল বাদল গাঙ্গুলি, সেটা আজই হবে ভাবে নি। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার রাতের কাজ পর্যবেক্ষণে বেরুবার কথা। তেমনি ঘাড় ফিরিয়ে অন্ধকার ঠেলে চেয়ে রইলো। তার পর মৃদুগম্ভীব গলায় জিজ্ঞাসা করল, তুমিই বা এ সময়ে এখানে কেন?

সহজ তরল গলায় সান্ত্বনা বলল, নরেনবাবু হলে বলতেন, পেত্নীর মত এখানে কেন?

কয়েক মুহূর্ত।—তোমার নরেনবাবুর সঙ্গে আমার কিছু তফাৎ আছে সেটা বুঝতে তোমার এখনো বাকী আছে।

আগে এর সামনে চেষ্টা করে তবে সহজ হয়েছে সান্ত্বনা। কিন্তু এখন চেষ্টাব কোনো বালাই নেই। অন্ধকারে মুখ ভালো দেখতে পাচ্ছে না। তেমনি হাল্‌কা জবাব দিল, নেই বলেই তো ভাবনা।

এক ঝলক বিদ্যুৎ যেন গোটা বাংলোটাকে ঝলসে দিয়ে গেল একবার। কড়-কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। সান্ত্বনার উৎফুল্ল উদ্বেগ কানে এলো।—বাবা রে বাবা, কি ঘটা। গোটা আকাশটাকেই ভাঙবে যেন।

ইজিচেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল বাদল গাঙ্গুলি। বেশ কাছে এসে দেখল ওকে। পবদা ঠেলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। সান্ত্বনাও পায়ে পায়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। চাপা হাসিতে জ্বল জ্বল করছে সমস্ত মুখ।

ধীর গম্ভীর মুখে বাদল গাঙ্গুলি বেশ করে নিরীক্ষণ করে দেখল। আজকের এই অল্প সাজটুকুও চোখ এড়াল না। হঠাৎ যেন সে এক হিংস্র আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল ভিতরে ভিতরে।

নিধুর খোঁজে এসেছিলে?

আলোয় এসে এবং মানুষটার মুখের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা থমকে গেল একটু। অন্তর-চেতনার গরিমা সত্ত্বেও কেমন মনে হ'ল, নিধু বাড়ি নেই কিন্তু থাকলেই ভালো হ'ত। তবু জবাবে উদ্বেগ প্রকাশ পেল না একটুও। বলল, নাঃ, এসেছিলাম নিধুর মনিবের খোঁজেই—

কেন? কঠিন দৃষ্টিতে বাদল গাঙ্গুলি দেখছে চেয়ে চেয়ে।

একটু এগিয়ে খাটের বাজু ধরে বসে পড়ল সান্ত্বনা। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল একটা। বসতে তো বলবেন না, তবু বসি।...এসেছিলাম দেখতে, এই মন-টন খারাপ কি না আপনার, যে দুর্যোগ চারিদিকে! হেসে উঠল, কিন্তু এসে ভালো করি নি দেখছি, আপনার ভাবগতিকে সুবিধের লাগছে না।

নিঃসন্দেহে বুঝে নিয়েছে ও, নীলার চলে যাওয়ার হেতু যে করেই হোক জেনেছে মানুষটা। নইলে এরকম ব্যবহার করত না। আর জেনেছে বলেই সঙ্কোচের আগল আরো ভেঙে গেছে সান্ত্বনার।

ওর দিকে চেয়ে চেয়ে সেই হিংস্র আকর্ষণটা বাড়ছে বাদল গাঙ্গুলির। উদগ্র হয়ে উঠছে। কিন্তু বিস্মিতও হচ্ছে কম নয়। এই মেয়েকে মড়াইয়ে দেখে এসেছে এতদিন। ওই চোখ ওই মুখ ওই হাসি ওই কথায় সরোষে যে পশু জাগছে ভিতরে ভিতরে, তাকে দমন করে কাছে এসে দাঁড়াল।

নীলার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

সেই হাসি আর সেই সচেতন কৌতুক-মাধুর্য সান্ত্বনার চোখে-মুখে। এ ছাড়া অন্য পথও নেই। জবাব দিল, শুধু দেখা! দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে, কত কথাও হয়েছে—আপনি তো আর আলাপ করিয়ে দেন নি।

কি বলেছ তাকে?

কত কি বলেছি। কেমন করে ড্যাম তৈরী হচ্ছে, কোথা দিয়ে কি ভাবে কত দেশে জল যাবে, কত জায়গার দৈন্য ঘুচবে অভাব ঘুচবে—

সান্ত্বনা।

হুকুম করুন।

তোমার বাবার কাছে আর তোমার নরেনবাবুর কাছে আগে বেশ ভালো করে জেনে নিও, আমি তোমার ঠাট্টার পাত্র নই!

মড়াই ড্যামের ওভারসিয়ারের মেয়ে আসে নি চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে। আজও চেনেও না সেই মেয়েকে। আজকের সান্ত্বনা স্ব-মহিমায় বিভ্রান্ত নিজেই। ঈষৎ শ্লেষে জবাব দিল তৎক্ষণাৎ, জানি—তাঁরা আপনার কাছে চাকরি করেন সেই জ্ঞান আপনার খুব টনটনে। উঠে দাঁড়াতে গেল।

হ্যাঁ, খুব। একেবারে কাছে ঝুঁকে এলো বাদল গাঙ্গুলি। দুই হাতে তার কাঁধ ধরে বসিয়ে দিল আবার। তার পরেও হাত সরালো না কাঁধ থেকে।

নীলাকে কি বলেছ?

এই রূঢ় সান্নিধ্যেও সহসা বিচলিত হ'ল না সান্ত্বনা। রয়ে-সয়ে জবাব দিল, বলেছি নীলা সকলের সয় না!

কিন্তু মানুষটার চোখের সঙ্গে ওর দুই চোখ ভালো করে সংবদ্ধ হতেই এক ফুঁয়ে নিভে গেল যেন।

....এই চোখ, এই হিংস্র পিচ্ছিল চকচকে দুই চোখ ও কোথায় দেখেছে এর আগে! কোথায়? কোথায়?

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল সমস্ত মুখ। মড়াইয়ের রণবীর ঘোষের নাকের

ডগা থেকে নীল চশমা সরে যেতে ওই চোখ দেখেছিল, ওই দৃষ্টি দেখেছিল আর ওই অজগর-লেহন দেখেছিল। আচমকা একটা ঘা খেয়ে সহসা কঠিন বাস্তবে ফিরে এলো ওভারসিয়ারের মেয়ে। নারী-মহিমার এত গর্ব বিলীন হয়ে গেল।

উঠতে গেল আবারও, হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, ছাড়ুন—

ছাড়াতে পারল না। দুই হাতের দশটা নির্দয় আঙুল ক্রমশ ওর কাঁধে বসে যাচ্ছে।

সংযমের বাঁধভাঙা স্পর্শ-সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে বাদল গাঙ্গুলি দেখছে ওকে। দেখছে না, গ্রাস করছে। বিস্মৃতি, বিস্মৃতি, বিস্মৃতি। বিস্মৃতির তিমির পিপাসা-হিংস্র পিপাসা। বন্যা-কবলিত মড়াই ড্যামের সংকট ভোলার বিস্মৃতি, জীবনের সকল ব্যর্থ প্রতীক্ষা অবসানের বিস্মৃতি, সব নিষ্ফলতা উজাড় করে দেবার বিস্মৃতি।

আর এই চিত্তবিভ্রমের পথে...এই বিফল পরিণামের পথে ঠেলে দিয়েছে যে, তার নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার নির্দয় বিস্মৃতি। ক্রূর বিনিময়ের বিস্মৃতি।

বলল, কেন? নীলা সয় না, যাকে সয় সে-ই তো এসেছে এই রাতে এই জলে এই দুর্যোগে?

এই রাতে এই জলে এই দুর্যোগেই এসেছিল বটে। আর, এভাবে ফিরে যাবার জন্যেও আসেনি। এসেছিল সগর্বে নিজেকে প্রকাশ করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে। এসেছিল আকর্ষণ করতেও। কিছু দিতে আর কিছু নিতে। কিন্তু এ কি দেখছে সান্ত্বনা। কাকে দেখছে। কাঁধের ওপব দু'হাতের চাপ বাড়ছে। সর্বাঙ্গ কাঠ।

...এর থেকে অনেক, অনেক কঠিন স্পর্শ সহ্য করেছিল আর একদিন আর এক পুরুষের। হাড়-পাঁজর-সুদ্ধ টনটনিয়ে উঠেছিল তার নির্মম নিষ্পেষণে। কিন্তু সেই বেদনার মধ্যেও মুক্তির স্বাদ ছিল কিছু, যাতনার মধ্যেও ছিল এক মুক্তির শিহরণ।

কিন্তু এই দুই চোখে শুধু অপমান লেখা।

শুধু ক্রূর অভিলাষ।

এই স্পষ্ট যাতনায় শুধু বিষক্রিয়া।

জোর করে দুই চোখ তুলে সান্ত্বনা একটা লোলুপ আক্রমণ যেন প্রতিরোধ করে রাখল খানিকক্ষণ। পরে আস্তে আস্তে বলল, আমার ভুল হয়েছে, ছাড়ুন। আপনাকে ধরে রাখার জন্য আমাকে দরকার ছিল না, যে কেউ পারত...।

শুধু তাই নয়। এই প্রথম বোধ করি মনে হ'ল, এই ড্যামের জন্যও একে ধরে রাখার দরকার ছিল না। যে কেউ পারত, যে কেউ পারে।

উগ্র উত্তেজনার মুখেও থমকে গেল বাদল গাঙ্গুলি।

ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ কথা ক'টা কানে যেতে আবার একটা ধাক্কা খেয়ে সচেতন হ'ল। নিজের বাসনার বীভৎসতাই দেখতে পেল যেন। চোখের দৃষ্টি বদলাতে লাগল। হাতের চাপ শিথিল হতে লাগল।

কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল। মন্থর পায়ে একটা চেয়ার টেনে বসল।

দু'চার মুহূর্তের নিঃসীম স্তব্ধতা। নিজের অজ্ঞাতে সান্ত্বনা উঠে দাঁড়াল। যাবে।

বোসো।

প্রায় আদেশের মত শোনাল।

সান্ত্বনা বসল যন্ত্রচালিতের মত।

খানিক নীরব থেকে আবার সেই একই প্রশ্ন করল বাদল গাঙ্গুলি, নীলাকে কি বলেছ?

দু চোখ মেলে তাকালো সান্ত্বনা। ধীর, শান্ত। মৃদু স্পষ্ট জবাব দিল, কি বলেছি সে তো আপনি ভালই বুঝেছেন।...তাকে আমি বলি নি কিছু, তাকে আমি তাড়িয়েছি এখান থেকে।

কেন?

তেমনি নিষ্পলক চেয়ে আছে সান্ত্বনা, খেয়াল নেই। আচ্ছন্ন, নিরাসক্ত, ভাবলেশহীন।—কারণ, আপনার কাজের থেকেও নীলা আপনাকেই বড় করে দেখে তাই। কারণ, নীলা আবারও পারে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে তাই। কারণ, আপনার পুরুষকারের ওপর আমার বিশ্বাস নেই তাই। কারণ, আপনার ওই শোক-মোহ ভেঙে গেলে এই কাজের মোহও ভেঙে যেতে পারে তাই।

বাদল গাঙ্গুলি নির্বাক খানিকক্ষণ। অনুত্তেজিত কথাগুলো ঠাণ্ডা স্পর্শ হয়ে কানে বাজতে লাগল। কিন্তু একটু বাদে উষ্ণও হয়ে উঠল আবার। গম্ভীর শ্লেষে বলে উঠল, কাজের মোহ আমার।

নয় তো কি? আপনি এত বড় একটা কাজ নিয়ে মেতে উঠেছেন লোকের দুঃখ আর দুর্দশা দেখে?

জবাব পেল না। প্রত্যাশাও করল না। তেমনি আত্মবিস্মৃত শান্ত কণ্ঠে একটানা বলে গেল, অনেক আশা ছিল আপনার, সে আশা মেটে নি। বড়লোকের দরজায় ঘা খেয়ে, আপনি এখানে এত বড় একটা জিনিস গড়ে তুলতে চেয়েছেন শুধু তারই জবাব দিতে। এত বড় ড্যামের কণায় কণায় শুধু তারই জবাব লিখে রাখতে চেয়েছেন। মোহ নয় তো কি। মানুষের দুঃখকষ্টের কতটুকু দেখেছেন আপনি...কতটুকু জেনেছেন।...

বাইরে বৃষ্টি চেপে এসেছে আবার। মেঘ ডাকছে ঘন ঘন। সান্ত্বনা মূর্তির মত বসে। কথাগুলো যেন ও বলে নি, আপনি নিঃসৃত হচ্ছে।

দু চোখ আবারও খরখরে হয়ে উঠল বাদল গাঙ্গুলির।—আমার এই কাজের মোহ যাতে না ভাঙে, শুধু সেই জন্যেই নীলাকে তুমি মিছে কথা বলে এখান থেকে তাড়িয়েছ তাহলে?

নিরুত্তর। অতি কষ্টে বড় একটা ধাক্কা সামলে নিচ্ছে বোঝা গেল। বাদল গাঙ্গুলি অপেক্ষা করছে। দেখছে চেয়ে চেয়ে। মানুষের দুঃখকষ্টের চিন্তায় দিনরাত তোমার ঘুম নেই, কেমন?

কিন্তু এই রুক্ষতা এবারে আর স্পর্শ করল না. আস্তে আস্তে আবারও যেন সেই সমাহিত ব্যবধানে চলে গেল সান্ত্বনা। রূঢ়তা সত্ত্বেও বিস্ময়ের শেষ নেই বাদল গাঙ্গুলির। এই মেয়েকে আর দেখে নি কখনো। কেউ দেখে নি।

কিছুক্ষণ। অনেকক্ষণ। অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল সান্ত্বনা, দিনরাত ঘুম নেই।...জলের অভাবে একটা দেশকে-দেশ কি করে শ্মশান হয়ে যায় সে আপনি ভাবতে পারবেন না। যুগ যুগ ধরে ওই মাটির নিচের আগুন বুকে টেনে তিলে তিলে যারা শেষ হয়ে গেছে তাদের সে মূর্তি আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

সেই স্মৃতির অব্যক্ত বেদনায় আরো নিষ্প্রাণ, আরো মৃদু শোনাচ্ছে। যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আসছে যেন কথাগুলো। —সময়ে একটুখানি জলের জন্য ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়েছে তারা, আর্তনাদ করে গলা দিয়ে রক্ত তুলেছে, শাস্ত্র মেনে সংস্কার মেনে রক্ত-জল-করা শেষ পুঁজিও মাটিতে ঢেলেছে মাটির আগুন ঠাণ্ডা করতে।...আমি দেখেছি...আমি যে তাই দেখেছি চেয়ে চেয়ে...

অস্ফুট কান্নায় শোনা যায় কি যায় না। দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে। থামল একটু। ঝাপসা দৃষ্টি প্রসারিত করে তাকালো সামনের মানুষটার দিকে। বলল, আরো দেখেছি।...আমার ঠাকুমার আর আমার মায়ের জীবন্ত প্রেতমূর্তি দেখেছি। ওই মাটির আগুনে অষ্টপ্রহর ধিকি ধিকি জ্বলে তাদের পাগল হতে দেখেছি। কারো ওপর তাদের এতটুকু নালিশ ছিল না কোনদিন। কিন্তু আমার ছিল। তাই যেদিন আপনারা জল নিয়ে আসছেন শুনলাম, সেই দিন থেকেই ঘুম নেই আমার। আমি শুধু ভাবতাম, বাঁচার তাগিদে মানুষ আর ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবে না...মানুষের বুক আর দাউ দাউ করে জ্বলবে না কোনদিন।

বাইরে বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা। কিন্তু ঘরে বাতাস বইছে না। চিত্রার্পিতের মত বসে আছে বাদল গাঙ্গুলি। চেয়ে আছে বিমূঢ় নেত্রে। কাকে দেখছে, কার কথা শুনছে হুঁশ নেই।

একটু থেমে সান্ত্বনা একটা উদ্‌গত অনুভূতি সামলে নিল যেন। বলল, সে দিন এলে দলে দলে লোক আসবে সেই জল দেখতে। তারা জয়-জয়কার করবে আপনাদের। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, সেদিন আমি আর এখানে বসে থাকব না।...সেদিন নীলা আসুক আপনার কাছে, আমি আসব না। এখান দিয়ে শুধু জল যাক, সান্ত্বনা মুছে যাক।

...কিছুক্ষণ।

উঠল। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে জল, ঝড়ো বাতাস। বাদল গাঙ্গুলি মোহাচ্ছন্নের মত বসে। বাকশক্তি রহিত। একবার ডেকে থামাতে পারল না ওকে।

বন্যা বন্যা বন্যা।

সর্বগ্রাসী, সৃষ্টিধ্বংসী।

দুই পাহাড়ে বাধা পেয়ে পিছনের দিক ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ বন্যার চরম লক্ষ্য ওই সাময়িক অবরোধ। ওই অবরোধ উপচে উঠবে অমোঘ সঙ্কল্প।

পিছনের দিকে যতদূর চোখ যায় থৈ থৈ জল। গাছপালা ভেসে আসছে, ভেসে আসছে গৃহস্থের গৃহপালিত জীব—গোরু ভেড়া ছাগল কুকুর—আটচালা হাঁড়িকুঁড়ি। মানুষের মৃতদেহ একটা দুটো।

গোটা মড়াই প্লাবনে ভাসছে। মড়াইয়ের জীবনযাত্রা বিকল।

কিন্তু সংগ্রামী মানুষের নাড়িতে নাড়িতে জেগে উঠেছে সৃষ্টি বাঁচানোর অটুট সঙ্কল্প। ছোট বড়, উঁচু নীচু, নারী পুরুষ সকলের। আর তাদের তাগিদ দিতে হয় না, তাড়া দিতে হয় না।

ঢালো মাটি। ঢালো পাথর। ফেলো বালির বস্তা।

যেখানে বিপদের সম্ভাবনা সেখানেই ছুটে যাও, ঝাঁপিয়ে পড়ো। কারো আদেশ নির্দেশের অপেক্ষা রেখো না। ঢালো মাটি, ঢালো পাথর...

সকলের সকল চেষ্টা সংহত এই সাময়িক অবরোধ কেন্দ্র করে। যার ওধারে সর্বগ্রাসী তরল মৃত্যু। পদমর্যাদার ব্যবধান ঘুচে গেছে। কে কর্মচারী, কে বা নয়, সে প্রশ্ন ঘুচে গেছে। সমস্ত মড়াই একটা মিলিত ইচ্ছার বেগে, একটি মাত্র প্রতিরোধ-মন্ত্রে আবর্তিত।

ঢালো মাটি। ঢালো পাথর। ফেলো বালির বস্তা।

এই এক অবরোধের কোথাও ভাঙন আটকাতে না পারলে সে ভাঙনের তাণ্ডব আর ঠেকানো যাবে না, সবাই বুঝেছে। বুঝে মরণ-যোঝা যুঝছে। দিবারাত্র অষ্টপ্রহর।

যুঝতে হচ্ছে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে। অঘটন হাঁ করে আছে পায়ে পায়ে। প্রতিটি পা দেখে ফেলো। পায়ের নিচে পাথর না পিছলে যায়, মাটি না সরে। কিন্তু দেখার সময় নেই। জলে কাদায় পিচ্ছিল নরক হয়ে আছে সব।

মাটি সরে, পাথর নড়ে, অঘটন ঘটে।

এবারে আর একটা দুটো করে নয়, অত বড় গেস্ট হাউস হাসপাতাল হয়ে উঠেছে। ঘরে জায়গা নেই, বারান্দাও ভরে উঠল। কিন্তু কে কার শুশ্রূষা করে। শক্তি যার আছে সেই গেছে ভাঙন আটকাতে। আহত হলে তবে এখানে আসবে। কেউ নিয়ে আসবে, রাখবে, আবার ছুটবে।—ঢালো মাটি, ঢালো পাথর, ফেলো বালির বস্তা।

দিনান্তে বড় জোর একবার বাড়ি আসেন অবনীবাবু। সান্ত্বনা আর জিজ্ঞাসা করে না কিছু। তীক্ষ্ণচোখে তাঁর দিকে চেয়ে চেয়ে দিনের সমাচার আঁচ করে নেয়। পিতামহের ক্ষোভের স্তব্ধতা দেখে বাবার চোখে-মুখে। মুখ-হাত ধোবার জল এনে দেয়, খাবার আনে সামনে, বাতাস করে বসে। কিন্তু মুখভাব ওর ক্রমেই কঠিন হতে থাকে। সজ্ঞানে ওর মায়ের অসহিষ্ণুতা যেন সংক্রামিত হতে থাকে ওর শিরায় শিরায়।

ড্যাম হবে না?

ওর জীবনের সকল সম্বল এই এক জায়গায় গচ্ছিত এখন।

সেই ড্যাম হবে না?

মড়াই নদীর ড্যাম হবে না?

জল জল করে হাহাকার করেছিল বলে এই জল এখন সব খাবে? সব বিনাশ করবে?

তা হবে না। হতে পারে না। সারাক্ষণ এই একটিমাত্র অসহিষ্ণু প্রতিবাদ-মন্ত্র জপছে নিজের অজ্ঞাতে। জপছে স্তব্ধ আত্মিক শ্লেষে। তা হবে না, হতে পারে না!...

সমস্ত দিনে সেদিন আর বাড়ি ফিরলেন না অবনীবাবু। লোক এসে খবর দিয়ে

গেল, কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। কিন্তু খবর সেটা নয়। খবর যা, সান্ত্বনা আঁচ করেছে। দিনের শুরুতে অশুভ দুর্যোগের ছায়া দেখেছে। অনেকবার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকবার এ খবরের আভাস পেয়েছে। এবারে সঠিক জেনে নিল।

...কিন্তু তা হবে না। হতে পারে না।

বড় রকমের ধস নেমেছে একটা। বিনাশের স্পষ্ট সূচনা। প্রায় আমোঘ। সমস্ত শক্তি এক করেও ঠেকানো যাচ্ছে না। ঠেকানো সহজ নয়।

...কিন্তু তা হবে না। হতে পারে না।

বেলা গড়ালো। সন্ধ্যা পেরুলো। রাত হ'ল। বাইরে বাতাসের একটানা সাঁ সাঁ শব্দ। টিপটিপ বৃষ্টি। ক্রমাগত ছটফট করছে সান্ত্বনা, ঘর বার করছে। এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ। কি করছে তার বাবা? কি করছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার? কি করছে নরেনবাবু? কি করছে পাগল সর্দার? কি করছে মড়াইয়ের সব লোকেরা? আটকাতে পেরেছে? ঠেকাতে পেরেছে?

রাত বাড়ছে আর অব্যক্ত যাতনায় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে।

রাত বাড়ছে আর ঘরে টেকা অসম্ভব হয়ে উঠছে।

ঘর ছেড়ে সান্ত্বনা বাইরে এসে দাঁড়াল আবার।

দুর্যোগ-ঠাসা অন্ধকার। টিপ টিপ বৃষ্টি। মেঘের গুড় গুড় ডাক। প্লাবনের চাপা কলতান। বাতাসের সোঁ সোঁ শাসানি। শিউরে উঠল। বাতাস নয়। মায়ের সেই হিস-হিস আর্ত বিক্ষোভ। দূর হ'! দূর হ'। দূর হ'! দূর হ'!

দরজায় শিকল তুলে দিল।

দ্রুত চলল। যেখানে মড়াইসুদ্ধ সকলে আছে।

যেখানে কেউ বসে নেই।

মড়াই নদীর ড্যাম হয়েছে।

সমারোহে তার ঘোষণা ছড়িয়েছে কাছে, দূরে।

সরকারী নিয়মে তার উদ্‌ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয়েছে ঘটা করে।

দলে দলে লোক এসেছে তাই দেখতে। আসছে এখনও। বিজ্ঞানের সফল কারিগরী দেখতে আসছে। যুগ যুগ ধরে মাটির কণায় যেখানে আগুন ঠিকরতো, সে পথে জল যাবে কেমন করে তাই দেখতে আসছে। যে পথে মরু-নীরস শুকনো উপোস বেঁধেছিল শাশ্বত কালের বাসা, কেমন করে সৃষ্টির ধারা বইবে সেখান দিয়ে তাই দেখতে আসছে।

অলক্ষ্মীর নিশ্চিত নির্বাসন দেখতে আসছে।

ভুতুবাবুর হোটেল জমজমাট।

মাঝপাহাড়ে উঠে তবে তো এপার-ওপার দুই পাহাড়ের কাঁধজোড়া ড্যাম। তার অনেক আগে ভুতুবাবুর দোকান। তাই সকাল-সন্ধ্যা আর ফুরসত নেই ভুতুবাবুর। ছেলেমেয়েদের জন্য পরদা খাটিয়ে একটা ঘরকে দু ভাগ করে চলে না আর। সম্প্রতি দুটো ঘরই তাদের জন্য ভাগ করে দিয়েছে। ভাগ করলেও পরদার বালাই রাখে

নি আর। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রাচুর্য-ভরা এক একটা মেয়েকে দেখে সচকিত হয়ে ওঠে ভুতুবাবু। ইচ্ছে করে মা-লক্ষ্মী বলে ডাকতে। কিন্তু ডাক বেরোয় না মুখ দিয়ে।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ভুতুবাবু।

চড়াই ধরে ওঠো। অনেকটা উঠতে হবে। তার পর ড্যাম। ড্যামের ওপর দিয়ে মড়াই পারাপার করতে পারো হেসে খেলে দৌড়ে। একশ' ফুট চওড়া কন্‌ক্রিটের নিটোল অবরোধ প্রাচীর। কালজয়ের স্পর্ধা রাখে। তারও ধারে রুদ্ধ আক্রোশে বিপুল গর্জনে অজস্র মাথা খুঁড়ছে, শতেক হাত গভীর মড়াই-ভরা জল। অন্য দিকে শুকনো খট্‌খটে মড়াইয়ের অতল গহ্বর। তাকালে মাথা ঘোরে। ওই শুকনো দিকে নালা কাটা হয়েছে কয়েকটা। আরো কাটা হচ্ছে। যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এদিক থেকে জল ছাড়লে ওই পথে জল যাবে। দরকারমত জল ছাড়ো। জল বাড়লেই জল ছাড়ো। ফ্লাড-লেবেল্‌-এর ওপরে উঠলেই ছেড়ে দাও জল, যন্ত্র-গহ্বরের মধ্য দিয়ে এই শুকনো দিকে। আর বন্যা নয়, আর জলাভাবের হাহাকারও নয়। নিঃশঙ্ক কৌতূহলে ড্যামের ওপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের এই কেরামতি দেখছে নারী-পুরুষেরা। ভর-ভরতি দেখাচ্ছে মড়াই নদীর ড্যাম।

কিন্তু পুরনো যারা এখানকার, এই দেখার আগ্রহে ফিরেও দেখে না তারা। এক মেয়ের দেখার আগ্রহ তারা প্রাণভরে দেখেছিল। হাজার হাজার কুলিকামিন কর্মচারীর মধ্যে সেই এক মেয়ে মড়াইয়ের অত বড় শূন্য গহ্বরটাই ভরে রেখেছিল।...মড়াইয়ে এক বন্যা হয়েছিল। এই ড্যাম হবে কি হবে না, সেই ত্রাস দেখা দিয়েছিল। গোটা মড়াই ভেঙে পড়েছিল সেই বন্যা আটকাতে।

সেদিন সেই মেয়েও এসেছিল। কিন্তু এসেছিল যে কেউ জানত না।

আরো ওঠো। মেন কোয়ার্টারস্‌। ঝক্‌ঝকে। তক্‌তকে। সোজা রাস্তা পাহাড়ের শেষে এসে থেমেছে। নিচে মড়াই। পাথরে পাথরে পা ছড়িয়ে বসে আছে মেয়ে-পুরুষেরা। নিচে মড়াই। জীবনের আশা বইছে, আশ্বাস বইছে। অমনি একেবারে ধারের কোনো পাথরে একটা বসে থাকত এক মেয়ে। দেখতো চেয়ে চেয়ে। কিন্তু ওই মড়াই কেঁপে উঠেছিল একবার। বন্যা হয়েছিল। গোটা মড়াই ভেঙে পড়েছিল সেই বন্যা আটকাতে।

সেইদিন সেই মেয়েও এসেছিল। কিন্তু এসেছিল যে কেউ জানত না।

সেই বন্যা অনেক কিছু গ্রাস করতে চেয়েছিল। অনেককে গ্রাস করতে চেয়েছিল। গ্রাস করেও ছিল।

...সেই এক মেয়েকেও। কিন্তু গ্রাস যে করেছিল কেউ জানত না।

পরে জেনেছিল। পরে দেখেছিল।

মেন কোয়ার্টারস বাঁয়ে রেখে ডাইনে জেনারাল কোয়ার্টারস্‌-এর রাস্তা। রাস্তার দুদিকে পাহাড়। দুই পাহাড়ের গাছপালায় রাস্তাটা ছায়াচ্ছন্ন বরাবর। শুকনো পাতা আর ঝড়া পাহাড়ী ফুল মাড়িয়ে এই নির্জনে পা আপনি এগোবে সামনের দিকে। দুই-একটা কোয়ার্টার ছাড়ালে প্রায় বিচ্ছিন্ন একটা বাড়ি চোখে পড়বে। সে বাড়ি

এখনকার সবাই না চিনুক, আগে চিনত। মনে হবে, বাড়িটা যেন স্তব্ধতার মূক-মন্ত্র জপছে। মনে হবে বাড়ির ভিতরে জনপ্রাণী নেই। কিন্তু যে কোনো স্থানীয় পথচারী ওখান দিয়ে যেতে যেতে একটু থেমে বলে দিয়ে যাবে, ওখানে থাকেন প্রায়-বৃদ্ধ এক ওভারসিয়ার।

মড়াইয়ের সেই করাল বন্যা যার সব নিয়েছে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হয়তো পায়ের শব্দ কানে আসবে কখনো। মৌন কৌতূহলে দেখবে, ওই বাড়ির স্তব্ধতার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে কেউ। একজন নয়, দুজন। তাদের চেনে এখানকার নতুন পুরনো সবাই। তাদের অন্তরঙ্গ নীরবতাটুকু চোখে পড়লেও পড়তে পারে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি আর ইঞ্জিনিয়ার-ড্রাফট্স্ম্যান নরেন চৌধুরী।

দুপুরের ভরা নির্জনের নিটোল গুমোট চিরে কখনো বা ওই স্তব্ধতার গহ্বর থেকে এক অবলা গাভীর ডাক শুনতে পাবে একটা দুটো। পরিত্যক্ত অসহায় পশুর শ্রান্ত আকৃতির মত শোনাবে সে ডাক। মনে হবে ওটাকে দেখার কেউ নেই বুঝি, খেতে দেবার কেউ নেই।

কিন্তু না। ওখানেও বসে ঝিমোয় একজন। নিষ্প্রভ-কালো, অতি বৃদ্ধ, ঘাড়-পিঠ-দুমড়নো।

পাগল সর্দার।

বাজীকর

শ্রীভূষণচন্দ্র দাস

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু

আর দু'ঘণ্টার মধ্যেই সমুদ্র ফুরোবে।

উনিশ দিন একটানা জল দেখে যাদের চিত্ত বিকল হয়েছিল, তাদের চোখে মুখে ডাঙার আলো নাচছে। বিশেষ করে ভারতীয়দের। অনেকেই দীর্ঘকাল বাদে দেশে ফিরছে। এই সমুদ্র শেষ হওয়াটা যেন মস্ত কিছুর পরিসমাপ্তি। তাই বটে। আশার ঝুলি প্রায় ভরভরতি সকলেরই। যারা আগামী দিনের পাথেয় সংগ্রহের তাগিদে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল, তাদের তো বটেই। প্রস্তুতির বৃত্ত-প্রদক্ষিণ শেষ। এবার নতুন জীবন, নতুন স্বপ্ন। এই অনাগত নতুনের আঙ্গিনায় বিত্তদাত্রী দেবীটি যেন তাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে প্রসন্ন চরণে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে।

জাহাজের এক-একটা জ্বলজ্বলে মুখের দিকে চেয়েই গুণী দত্ত বুঝতে পারে কে কোন্ দরের যোগ্যতার ছাড়পত্র নিয়ে ফিরছে।

এই দুনিয়ায় চলতে হলে পাসপোর্ট চাই। যার যেমন পাসপোর্ট তার তেমন কদর। তুমি এলে এই সার্থকতার দরবারে তোমার জন্যেও একটি আসন পাতা হবে। কিন্তু আসার যোগ্যতা অর্জন করো আগে। পাসপোর্ট দেখাও। আসন সামনে হবে কি মাঝে হবে কি পিছনে হবে—তোমার যোগ্যতার পুঁজি দেখে সেই বিচার।

ডেকের কোণের দিকে আবছা আলোয় রেলিং-এ ঠেস দিয়ে গুণী দত্ত জল দেখছে আর হাসছে অল্প অল্প। খুব সগোচরে নয়। নিজেরই নিভৃতে একটা কৌতুকের বুদবুদ দেখছে যেন। ছ'বছর বাদে সে কোন্ যোগ্যতার পাসপোর্ট নিয়ে ফিরছে?

গুণী দত্ত ঈর্ষা করে না কাউকে। বরং জাহাজসুদ্ধ দিশি-বিদেশী মেয়ে-পুরুষের দঙ্গল এই উনিশটা দিন এক ধরনের ঈর্ষা মেশানো সম্ভ্রমে তাকে নিয়েই হৈ-হুল্লোড় করে কাটিয়েছে। তাদের আব্দারে অনুরোধে আদর-অভ্যর্থনায় হাঁপ ধরার উপক্রম।

গুণীডাটা! গুণীডাটা! গুণীডাটা!

ও গুণীডাটা! ইউ আর সিম্প্‌লি ওয়ান্ডারফুল!

আসুন আসুন, গুণীডাটা আসুন!

আইয়ে গুণীডাটা! শাম্ উজিয়ালী কীজিয়ে।

মানব-রীতি বা হিউম্যান বিহেভিয়ারের মোটামুটি একটি ধাঁচ জানা হয়ে গেছে গুণী দত্তর। ওতে তফাত নেই খুব, বিভেদ নেই খুব। সাদা চামড়া কটা চামড়া কালো চামড়ার তলায় প্রায় একই ধরনের মিরাকল্ ভক্তর বাস। নিরাপদ বিস্ময়ের ধাক্কার প্রতি তার চিরকালের লোভ। হতচকিত বিভ্রান্ত বিমূঢ় অভিভূত হতে ভালবাসে যে কিশোর, সেই কিশোর একটি করে প্রায় সকলের মধ্যেই আছে। তার বয়স বাড়ে না।

এইটুকু মূলধন গুণী দত্তর। এটুকুই একমাত্র পুঁজি। মানুষের নিভৃতের এই কিশোর চিরকিশোর। এই পুঁজিটুকুর উপর ভরসা করেই ছ'বছর আগে অনির্দিষ্টের মত সে

একদিন সমুদ্রের বুকে ভেসে পড়েছিল। আর, ছ'বছর বাদে শুধু এই পুঁজির ওপর নির্ভর করেই আবার একদিন ফেরার পথে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে।

যাবার সময় গুণী দত্ত ক্রীতদাসের মত গিয়েছিল। প্রতিটি যাত্রীর বিস্মৃতির প্রতিক্রিয়াগুলো নিজের মনের দর্পণে খুঁটিয়ে দেখতে হত। সংশয়ের বিশীর্ণ মূর্তি কৃত্রিম হাসির ছটায় আর কৌতুকের ছটায় আড়াল করে নানা অছিলায় তাদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসতে হত। তোষামোদ-কলার জাল বিছাতে হত। তাদের খুশির আলোয় তার আশার পলতেটা জ্বেলে নিয়ে নিয়ে গুণী দত্ত সমুদ্রের ওপারে পৌঁচেছিল সেদিন।

যাত্রীদের ভালো না লাগলে বা একঘেয়ে লাগলে বা তারা বিরক্ত বোধ করলে সহৃদয় কোয়ার্টার মাস্টার শেষ পর্যন্ত তাকে অতটা সুনজরে দেখত কিনা সন্দেহ। যে-কোন একটা বন্দরে ঘাড় ধরে নামিয়ে দিলেও খুব আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। তার সঙ্গে মৌখিক শর্তটা অন্তত সেই গোছেরই ছিল। তাই যাবার সময় গুণী দত্তর কেবলই মনে হল, সমুদ্রের পরিধি বড় নির্মম রকমের অনন্ত। মনে হত, এই সমুদ্র বুঝি আর শেষ হবে না।

কিন্তু ফেরার সময় উল্টো মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে সমুদ্রটা চট করেই ফুরিয়ে গেল। অন্যান্য গণ্যমান্য যাত্রীদের মত আজ মাথা উঁচিয়েই ফিরছে সেও। এই জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার বা কর্তাব্যক্তিরা বরং ডবল খাতির করছে তাকে। বিনা মাসুলে অনেক ফুর্তির অনেক বিস্মৃতির খোরাক যুগিয়েছে সে। যোগাচ্ছে। এবারে বাধ্যবাধকতা ছিল না কোনো, যা করছে সহযাত্রী আর সহযাত্রিণীদের নিছক অবকাশ বিনোদন আর চিত্ত বিনোদনের জন্যই করেছে। নইলে অন্যান্য যাত্রীর মত সেও টিকিট কেটেই জাহাজে উঠেছে, কারো করুণার ওপর নির্ভর করে নয়।

জাহাজের সান্ধ্য আসরে গুণী দত্ত প্রোগ্রাম করবে জানলে আগে থাকতেই রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। উৎসুক প্রতীক্ষায় থাকে সকলে। ঠকে মজা আর ঠকিয়ে মজার মধ্যেও আরও অনেক মজা বুনে দিতে পারে সে। তারা তাকে ভাবে খুশির দূত, ইচ্ছে করলেই দু'হাতে মুঠো মুঠো খুশি ছড়াতে পারে। অনেক ভদ্রলোককে নাজেহাল করে আর অনেক সুদর্শনাকে হতচকিত করে খুশির জোয়ারে অনেকবার হাবুডুবু খাইয়েছে সকলকে। তিনটে দিন ছেদ পড়লে সহযাত্রীরা দল বেঁধে ধর্না দেয়, ছোটখাটো প্রোগ্রাম একটা করতেই হবে, নইলে সমুদ্র-যাত্রা নীরস হয়ে গেল যে।

যে লক্ষ্য নিয়ে গুণী দত্ত এক জাহাজ লোকের মধ্যে বেছে বেছে প্রথমেই শুভেন্দু নন্দীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ জমিয়েছিল, রস-সৃষ্টির এ যোগানদারী তারই অবধারিত ফল। আগামী দিনের স্বার্থের খাতিরে এই আপাতনিঃস্বার্থ ফল পরিবেশনে খুব আপত্তি ছিল না। গত ছ'টা বছরে গুণী দত্ত অনেক দেখেছে, অনেক শিখেছে। অনেক দেখা অনেক শেখার মধ্যে প্রচারের মাহাত্ম্যও জেনেছে। শুভেন্দ নন্দীর সঙ্গে তার হৃদ্যতার সূত্রপাত সেই দূরের দিকে চোখ রেখে।

হঠাৎ চমক লাগিয়ে অভিভূত করার প্রয়োজনে কিছুটা চর-চর্যা পেশার অঙ্গ। এ পথের অনেক স্মরণীয় পথিকৃৎ নয়া পটভূমিতে চমক-লাগানোর আসরে নামার আগে শহরের চারদিকে চর নিয়োগ করতেন শোনা যায়। গুণী দত্ত অতটা তৎপর

না হোক, এক জাহাজ লোকের মোটামুটি খবর সংগ্রহ করতে তার দেড় দিনও লাগেনি। জাহাজে ওঠার আগেই অর্ধেক লোকের বৃত্তি বা ভাবী বৃত্তির খোঁজ পেয়ে গেছে। হোমরাচোমরা ব্যক্তি অনেক ছিল। কিন্তু সকলকে ছেড়ে এই বাঙালী সাংবাদিকটির দিকেই চোখ গেছে তার।

বাংলা দেশের একটা নামকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত শুভেন্দু নন্দী কৃতী সাংবাদিকই বলতে হবে। অন্যথায় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় অথবা বিদেশের সাংবাদিকতার নাম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশে ক'জন আর সমুদ্রপাড়ি দেবার সুযোগ পায়? বয়সে গুণী দত্তর থেকে এক-আধ বছরের ছোটই হবে, এখনো তিরিশে পা পড়েনি হয়ত। বেশ সুশ্রী, সপ্রতিভ। সাংবাদিকতা পেশা বলেই সম্ভবত প্রাথমিক আলাপে গম্ভীর একটু।

কিন্তু সে-গাম্ভীর্য তরল হতে সময় লাগেনি খুব। কথায় কথায় জানা গেছে শুধু শুভেন্দু নন্দী নয়, তার বাবাও আর এক কাগজের প্রবীণ সাংবাদিক। শুনে গুণী দত্ত খুশী মনে মনে। নেবার জন্য তুমি এক হাত বাড়িয়েছ, আমি দু'হাত ভরে দিলাম। হাত দু'টো ভরা-ভরাই লেগেছে। প্রচারের জোড়া কাঠি জোটাতে পারলে আওয়াজটা ছোট হবার কথা নয়।

বলা বাহুল্য গুণী দত্ত যেচে এসে আলাপ করাতে সাংবাদিকটি খুশি হয়েছিল। সকাল থেকে অনেকবার তাকে লক্ষ্য করেছে শুভেন্দু নন্দী। কেন সঠিক জানে না। ভদ্রলোকের মধ্যে ভারী সহজ অথচ বলিষ্ঠ কিছু একটা বৈশিষ্ট্য আছে মনে হয়েছে। মুখের আদলে ভারতীয় মনে হয়েছে, কিন্তু এমন নির্ভেজাল বাঙালী যে, ভাবতে পারেনি। কেউই পারেনি হয়ত। যাত্রী তালিকায় নাম লেখা 'গুণীডাটা'। এর থেকে জাতের হদিস পাওয়া সহজ নয়। তার ওপর দুটি মেমসাহেব আর গুটি তিনেক সাহেবের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ ভাবসাব দেখেছে। এতদিনের বিলেত-দেখা চোখে সেটা এমন কিছু দর্শনীয় নয় অবশ্য, তবু ঠিক বাঙালীর মেলামেশার মত মনে হয়নি শুভেন্দুর।

আপনি বাঙালী। প্রথমেই বাঙালীসুলভ বিস্ময় প্রকাশ করে ফেলেছিল সে।

গুণী দত্ত মুখ টিপে হেসেছে, তারপর মৃদু জবাব দিয়েছে, বাঁকড়ো জেলার—

ততক্ষণে গুণীডাটার সন্ধি বিচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে। ব্যাপারটা একবার মাথায় ঢুকলে শব্দটা দু'ভাগ করে বাঙালীর হদিস পাওয়া জলের মত সোজা। শুভেন্দু নন্দী একে দু'পুরুষের সাংবাদিক নন, তায় এমন বেশি দিন পাশ্চাত্ত্যের বাতাস গায়ে লাগেনি যে নামের ওপর ঠুনকো কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হবে। এই এক নাম-সজ্জা থেকেই মানুষটাকে তার মনে মনে ঠুনকো ভাবার কথা।

কিন্তু তাও ভাবতে পারেনি। ভাবতে ভালো লাগেনি। কারণ, অনেকের মত শুভেন্দু নন্দীও প্রথম থেকে তাকে ভালো লাগার চোখ দিয়েই দেখেছে। লোকটার কথাবার্তার ধরন-ধারণ সংক্ষিপ্ত কিন্তু চটপটে। আত্মপ্রত্যয়ী বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানায় একটুখানি নরম হাসির প্রলেপ মাখানো। চোখ দুটো অবিশ্বাস্য রকমের উজ্জ্বল, কালো তারা থেকে যেন সাদা আলো ঠিকরোয়—অথচ তীক্ষ্ণ নয় একটুও। ভারী জীবন্ত, স্বচ্ছ।

নিজের এসব গুণের খবর গুণী দত্তর ভালই জানা আছে।

ছেলেবেলায় ঠাকুমা বলত মেয়েখেকো চোখ। ইস্কুলের মাস্টার মশায়রা জুলপি ধরে টানত আর বলত, মুখ দেখলে তো মনে হয় মগজে বিদ্যে গিসগিস করছে, আসলে তো অষ্টরম্ভা। নতুন বয়সের কালে আরো অনেকে অনেক কিছু বলত, বিশেষ করে ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি ধরা মেয়েদের মায়েরা। জুলি স্যান্ডারসন এখনো বলে, তোমার ভাবনা কি, সামনে নিরেট পাথরের দেয়াল পড়লেও ওই চোখ দিয়েই দু'খানা করে কেটে এগোবে তুমি, তোমায় রুখবে কে?

আলাপ বেশ খানিকটা এগোবার পরেও শুভেন্দু নন্দী ঠাওর করে উঠতে পারেনি লোকটা কে বা কোন্ দরের মানুষ। অথচ নিজের সম্বন্ধে ততক্ষণে টুকটুক্ করে অনেক কথাই বলা হয়ে গেছে তার। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেনি, প্রায় অগোচরেই বলেছে। কি করে যেন ভারী সহজে এক কথা থেকে আর এক কথার মধ্যে এনে ফেলা হয়েছে তাকে। কিন্তু শুভেন্দুর ইঙ্গিতসূচক কৌতূহল সত্ত্বেও আলাপীটি নিজের প্রসঙ্গের পাশ কাটিয়েছে।

বিলিতি ভব্যতা রেখে শেষে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছে শুভেন্দু, আপনি কি করেন?

সিগারেটের প্যাকেটের ভিতরের রাঙতা কাগজের সাদা দিকটা আলাদা করছিল গুণী দত্ত। তাই করতে করতে হাসল একটু। তারপর রাঙতার দিকটা ফেলে দিয়ে পাতলা সাদা কাগজের টুকরোটা সরু করে ছিঁড়তে লাগল। পনের-বিশটা টুকরো করে সেগুলো এক হাতের চেটোয় রেখে অন্য হাতের চেটো দিয়ে নাড়ু পাকানোর মত কুণ্ডলী পাকালো। শেষে শুভেন্দুর একটা হাত টেনে ওটা রেখে হাতটা মুঠো করিয়ে ছেড়ে দিল।

ব্যাপারটা কি হল শুভেন্দু বুঝতে পারল না। প্রশ্নের জবাব না পেয়ে অবাক হচ্ছিল। কেমন-মনে হল লোকটার চোখ দুটো যেন বলছে, সে কি করে সেই পরিচয় ওর হাতের মুঠোয়। মুঠো খুলে হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে কাগজের কুচিগুলো আলাদা করতে গিয়ে অবাক। কুচি একটাও নেই, সবগুলো জুড়ে গেছে, আর তাতে কালি দিয়ে স্পষ্ট করে লেখা, ভণ্ডামি।

শুভেন্দু হকচকিয়ে গেছে। কাগজটা তার চোখের সামনে টুকরো টুকরো করা হল, ডেলা পাকিয়ে সেটা তার হাতে দেওয়া হল—কুচিগুলো জুড়লো কেমন করে? তাছাড়া প্রশ্নটা তো এইমাত্র করেছে, জবাব লেখা হল কখন?

চোখে চোখ পড়তে হেসে ফেলল। কাগজের লেখা জবাবটার ওপর গুরুত্ব দিল না। তার অলক্ষ্যে কিছু একটা কারসাজি করা হয়েছে ভেবে বলল, কিন্তু আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ভেবে জবাবও লিখে এনেছিলেন নাকি?

না, আপনার কলম দিয়েই তো লিখলুম, দেখলেন না?

শুভেন্দু আবার হতভম্ব। বুক-পকেটে কলমটা নেই বটে। খানিক আগে বাইরে ডেক-চেয়ারে বসে বাড়িতে চিঠি লিখেছে, কলমটা পকেটেই ছিল। চোখের সামনে শূন্য হাতটা একবার এদিক-ওদিক নেড়ে কোথা থেকে আস্তে কলমটা বার করল বোঝা গেল না। নিজে হাতে সেটা তার বুক-পকেটে গুঁজে দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে

লাগল গুণী দত্ত।

হাসছিল শুভেন্দুও। মনে মনে হাত সাফাইয়ের প্রশংসা না করে পারেনি। কিন্তু এই-ই যে পেশা তখনও স্পষ্ট হয়নি। মোট কথা এদিক থেকে চিন্তাই করেনি শুভেন্দু। দু'দুবার এভাবে ঠকে আলাপের ধারাটা আরও সহজ হয়েছে। হাতের দুমড়নো সাদা কাগজের টুকরোর লেখাটা আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, ভণ্ডামি তো অল্পবিস্তর সকলেই করছে, আপনার রাস্তাটা কি?

গুণী দত্ত মিটি মিটি হাসছিল তেমনি। হাসির জেল্লা ভরা চোখের কালো তারা দুটো তার মুখের ওপর আটকে ছিল। সে দুটো নড়ল এবার। হাত বাড়িয়ে তার হাত থেকে সেই দুমড়নো কাগজটাই নিল আবার। তারপর আগের মতই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগল। এবারে দুচোখ আপনা থেকেই সজাগ শুভেন্দুর। হাসিমাখা মৃদু গাম্ভীর্যে আবার কিছু করতে যাচ্ছে লোকটা, কিন্তু ছোট ছেলের মত বার বার ঠকতে রাজী নয় সে।

তেমনি ধীরে-সুস্থে টুকরো টুকরো করা হল কাগজটা। চোখের সামনে কালিতে লেখা ভণ্ডামি শব্দটাও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে দেখা গেল। তারপর ঠিক তেমনি করে কাগজের কুচিগুলো চোখের সামনে হাতের চেটোয় রেখে কুণ্ডলী পাকানো হল। ওষুধের ট্যাবলেটের মত দু'আঙুলে ধরে গুণী দত্ত তার খোলা হাতের মধ্যেই ওটা রাখল এবার।

এবারেও কি শুভেন্দুকে বিশ্বাস করতে হবে! এবারে তো সে অ-প্রস্তুত ছিল না। সেই আস্ত কাগজের টুকরো, একটা ছেঁড়া কুচির চিহ্নও নেই। জবাব লেখা, ধাপ্পাবাজী। দুমড়নো কাগজটার উল্টো পিঠে আগের লেখা ভণ্ডামি শব্দটাও আছে। সে শব্দটা চোখের সামনে কাগজের সঙ্গে বহুধা হতে দেখেছে।

এবারে চেতনা সক্রিয় হল একটু, সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি ম্যাজিসিয়ান নাকি?

গুণী দত্ত হ্যাঁ-না কিছুই বলেনি, ঠোঁটের ফাঁকে হাসিটুকু শুধু লেগেছিল।

শুভেন্দুর মনে হয়েছে তার মুখের ওপর চোখ দুটো শুধু হাসছিল।

কিন্তু এবারে লিখলেন কি দিয়ে?

আপনার কলম দিয়েই।

চকিতে নিজের পকেটের দিকে তাকালো শুভেন্দু। কলম পকেটেই আছে। তবু হাসিটা কেমন অর্থপূর্ণ মনে হতে পকেট থেকে কলমটা তুলতে গেল। কলমের ক্যাপই শুধু হাতে উঠে এলো। ক্যাপের ক্লীপটা পকেটে আটকেছিল, কলম নেই। অথচ মনে হচ্ছে স্বচক্ষে গোটা কলমটাই তার পকেটে রাখতে দেখেছিল সে।

এরপর আলাপ ঘন হতে সময় লাগেনি। একজন ম্যাজিসিয়ানের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু এই বয়সে এক খাস বিলিতি দলের কর্ণধার হয়ে যে যাদুকর ভারতের বুকে ফিরে আসছে, তাকে তুচ্ছ ভাবা দূরে থাক, সাংবাদিক জীবনে বহু রাজা-উজীর দেখা শুভেন্দু নন্দী নতুন কারো সঙ্গে পরিচিত হয়ে এত খুশি কমই হয়েছে। জাহাজের সান্ধ্য আসরে গুণীডাটাকে সে-ই যেন উপহার দিয়েছে। নামটা

তখন অনেকেরই শোনা শোনা লেগেছে। শুনলে চট করে মুছে যাবার মত চালু নাম নয়। কিন্তু এই লোক স্টেজে দাঁড়িয়ে কি কাণ্ড করতে পারে শুভেন্দুরও ধারণা ছিল না। ম্যাজিক এযাবৎ অনেক দেখেছে। তাছাড়া বুকের মধ্যে দম আটকে বসে থাকার মত রোমাঞ্চকর কিছু গুণীডাটা জাহাজের এই হালকা পরিবেশে এক-আধটার বেশি দেখায়নি। সেও বহু অনুরোধ-উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত করে দেখিয়েছে। বেশির ভাগই ড্রইং-রুম ম্যাজিক গোছের লঘু বিস্ময়ের ব্যাপার। অমুক ভদ্রলোকের শৌখিন রুমাল অমুক ভদ্রমাহিলার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বার করে দিয়েছে। কোনো সুদর্শনাকে স্টেজে ডেকে স্টেনোগ্রাফারের মত তার একটু সংক্ষিপ্ত বিবৃতি লিখে নিয়েছে। বিবৃতিটুকু মহিলাকে ফিস ফিস করে বলতে হবে, যাতে আর কারো কানে না যায়। লেখা হতে গুণীডাটা সেটা আবার মহিলাকে দেখিয়েছে, মহিলা দেখে ঘাড় নেড়ে অনুমোদন করেছে, অর্থাৎ তার বক্তব্যই লেখা হয়েছে। পাছে পরে মহিলা অস্বীকার করে সেই আশঙ্কায় গুণীডাটা সকলকে শুনিয়ে লেখার নিচে নিজের হাতে তাকে নাম স্বাক্ষর করে বাখতে অনুরোধ করেছে। ভয়ে ভয়ে মহিলা আবার গুণীডাটার হাতে ধরা লেখাটা পড়েছে, তারপর নিশ্চিন্ত হয়েই নিচে নাম স্বাক্ষর করেছে। লেখা কাগজখানা ভাঁজ করে গুণীডাটা তার হাতে দিয়েছে, সঙ্গে একটা খামও দিয়েছে। মহিলা নিজের হাতে নিজের বিবৃতি খামে পুরে মুখ এঁটে নির্দেশ অনুযায়ী তার পছন্দমত একজন দর্শককে স্টেজে ডেকে সেটা তার হাতে দিয়েছে। অতঃপর ভদ্রলোক তার অনুমতি নিয়ে খাম ছিঁড়ে লেখাটা পড়ে শোনানোর উপক্রম করতে গুণী দত্ত হঠাৎ তাকে থামিয়ে গম্ভীর মুখে মিনিটখানেক বক্তৃতা করে নিয়েছে। তাৎপর্য, যাদুগুণে যে কোন ভদ্রলোকের বা ভদ্রমহিলার গোপনতম মর্মকথাটি সে টেনে বার করতে সক্ষম। সে জিজ্ঞাসা করলে সত্যি-সমাচারটি তাকে নিজের মুখে উদঘাটন করতেই হবে। প্রমাণ ওই খাম।

এবারে প্রমাণটা হাতে-নাতে যাচাইয়ের প্রহসন। কিন্তু লেখাটা পড়ে শোনানো শেষ হতে না হতে আসরে হাসির তুফান। ওই সিলোনবাসিনী সুদর্শনা বিবাহিতা রমণীটি জাহাজের এক চাটগেঁয়ে খালাসীর কাছে হৃদয়মনপ্রাণ সমর্পণ করে বসে আছে। খামের লিপিটি সেই স্বীকৃতি বহন করছে।ওই খালাসীর মধ্যে সে তার যুগ-যুগান্তরের, দেহ-দেহান্তরের দয়িতকে দেখেছে, দেখে পর্যন্ত তার সমুদ্র-পরিমাণ যৌবন দুঃসহ প্রেমের আগুনে পুড়ে পুড়ে সাহারা হয়ে গেল, ইত্যাদি ইত্যাদি। লেখার নীচে মহিলার নিজের হাতের স্বাক্ষর। স্বাক্ষরটা তারই অস্বীকার করতে না পেরে মহিলা তখনকার মত আসর ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে। অবশ্য পরে জানা গেছে ওই নামের কোনো খালাসীর অস্তিত্বও এই জাহাজে নেই।

এমনি ছোটখাটো অনেক কাণ্ড করেছে গুণীডাটা। শূন্যে বীভৎস মড়ার মাথার খুলি ভাসিয়ে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে, জামার আস্তিন গুটিয়ে খালি হাতে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখা থেকে জীবন্ত কীট-পতঙ্গ বার করে দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে—সেগুলো যে রবারের কীট-পতঙ্গ তা বোঝা গেছে একপ্রস্থ সন্ত্রাস হুটোপুটির পর। শেষে শিখা থেকে টাকা বের করে ছুঁড়তে গিয়েও ছোঁড়েনি, টাকা ছোঁড়া উচিত নয় বলে ঠনঠনিয়ে সামনের টেবিলের ওপর ফেলেছে সেগুলো। মুখ-আঁটা শূন্য টিনের

কৌটার ঢাকনা খুলে সকলকে দেখিয়ে তারপর কাঠের গুঁড়ো ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি ভরেছে তার মধ্যে। ঢাকনা বন্ধ করে আসর থেকে একজন মিষ্টি মহিলাকে স্টেজে উঠে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে—যার হাতের ছোঁয়া পর্যন্ত মিষ্টি।

বলা বাহুল্য কেউ উঠে আসেনি। অগত্যা গুণীডাটা নেমে এসে নিজেই একজন মিষ্টি মহিলা আবিস্কার করে স্টেজে ধরে নিয়ে গেছে। অতঃপর মহিলার হাতের ছোঁয়া সত্যিই কত মিষ্টি প্রমাণ করার জন্য ঢাকনা আঁটা ছেঁড়া কাগজ আর কাঠের গুঁড়ো ভরতি টিনটা তার হাতে দিয়েছে। দিয়েই আবার তার হাত থেকে নিয়ে ঢাকনা খুলে দেখিয়েছে টিন ভরতি রসগোল্লা। সকলকে সেই রসগোল্লা খাইয়েছে। তারপর আবার ঢাকনা বন্ধ করে মহিলার হাতে দিয়েছে। ঢাকনাটা খুলে দিয়ে দু হাত পেতেছে বাদবাকি রসগোল্লা কটি পাবার আশায়। কিন্তু টিন উবুড় করতে হাতে পড়েছে সেই কাঠের গুঁড়ো আর ছেঁড়া কাগজ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গুণীডাটা মন্তব্য করেছে, অত মিষ্টি মহিলারা পর্যন্ত বরাবর শুধু তার প্রতিই অকরুণ।

লেবু কেটে রক্ত বার করে ত্রাস সৃষ্টি করেছে, মনের কথা বলে তাক লাগিয়েছে, দিব্যদৃষ্টির খেলা দেখিয়ে অবাক করেছে, মন্ত্রপূত তাসের চমক দেখিয়েছে, শূন্য ডেভিল্স্ ড্রাম থেকে পুরুষদের ড্রিঙ্ক আর মেয়েদের সফ্‌ট্ ড্রিঙ্ক বার করে খাইয়েছে।

কোনটাই অভিনব কিছু নয়। কিন্তু শো-ম্যানশিপ বোধ হয় একেই বলে। সামান্য বিস্ময়ের ব্যাপারকে রসিয়ে ফাঁপিয়ে এমন অসামান্য করে তোলাটাই মস্ত আর্ট। সেই আর্ট গুণীডাটার চলন-বলন ভাবভঙ্গির সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। যাই করুক যাই বলুক, কিছুই কৃত্রিম মনে হয়নি কারো। অন্তস্তলের সহজ সত্তার সঙ্গে যোগ যেন প্রতিটি অভিব্যক্তির।

ভালো লাগে। এই ভালো লাগাটুকু বোধ করি তাক্ লাগানোর একটা বড় অস্ত্র গুণীডাটার। ম্যানেজার উড সাহেব সেদিন তার দলের মুকুটমণি এই তরুণ যাদুকরের সীরিয়াস ম্যাজিক প্রসঙ্গে একটা ছোটখাটো লেকচার দিল। বলল, এর হাল্‌কা খেলা যেন উপভোগ করছেন সকলে, সীরিয়াস খেলা দেখলে তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে হবে। সে-সব খেলা দেখিয়ে কোন্ জায়গায় কত বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেছে তারা, সেই ফিরিস্তি দিল। উপসংহার, জাহাজে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা সহজ নয়, সরঞ্জামেরও অভাব, কিন্তু তার নিশ্চিত বিশ্বাস, ইন্ডিয়ান যাদুমঞ্চে গুণীডাটার সেই সব অনুষ্ঠান দেখে দর্শকজন প্রীত হবেন, মুগ্ধ হবেন।

ম্যাজিয়ুড দলের আসন্ন ভারত সফরের প্রচার কার্যটি একটু এগিয়ে রাখা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না অধিনায়ক উড সাহেবের। এই গণ্যমান্য ভদ্রলোকের মৌখিক বিজ্ঞাপনও ফেলনা মনে করেনি সে। কিন্তু আসরে তক্ষুনি সম্মিলিত রোল উঠল, সীরিয়াস ম্যাজিক দেখব, একটা-আধটা সীরিয়াস কিছু এখানেই দেখাতে হবে।

কিন্তু গুণীডাটার সেই সীরিয়াস কাণ্ডকারখানা দেখে হেসে সারা সকলে।

অনুরোধের ধাক্কায় সে স্টেজে এসে দাঁড়াল। মুখখানা সীরিয়াস, থমথমে গম্ভীর। হাতে একহাত প্রমাণ একটা ঝকঝকে লম্বা ছোরা। মঞ্চের জোরালো আলোয় ছোরার জেল্লা আসরে ঠিকরোচ্ছে।

জুলি।

গুরুগম্ভীর হাঁক শুনে জুলি স্যান্ডারসন ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

এঁরা সব সীরিয়াস কিছু দেখতে চান। আমি ভাবছি তোমার গলাটা দুখানা করে কেটে দেখাব।

সত্রাসে নিজের গলায় হাত বোলাতে লাগল যাদুসঙ্গিনী জুলি স্যান্ডারসন। ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করল, লাগবে না?

গম্ভীর অনুশাসনের সুরে গুণীডাটা বলল, এইসব রেসপেক্টব্‌ল লেডীস অ্যান্ড জেণ্টলমেন সীরিয়াস কিছু দেখার প্রত্যাশায় বসে আছেন, আর তোমার লাগাটাই বড় হল?

খপ করে তার কপালে হাত দিয়ে মাথাটা পিঠের দিকে ঠেলে গলার ওপর সেই চকচকে ছোরাটা ছোঁয়াল। কাটে আর কি। মেয়েদের কেউ কেউ অস্ফুট শব্দ করে উঠল, ভদ্রলোকেরা নড়েচড়ে বসেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে হাত পিছলে পালিয়ে জুলি স্যান্ডারসন স্টেজের সামনে এসে সকরুণ আবেদন জানালো, বসে বসে একজন অবলার এই মর্মান্তিক নিগ্রহ দেখবেন আপনারা? ওই লোকটা আমার গলা কাটতে চাইছে।

দর্শকদের মধ্য থেকে কে একজন রসিকতা করে উঠল, গুণীডাটা গলা কাটলে খুব লাগবে না, আপনি নিশ্চিন্ত মনে গলা বাড়িয়ে দিন।

জুলি স্যান্ডারসন রেগেই গেল হঠাৎ, ছদ্মকোপে বলে উঠল, তাহলে আপনাদের কেউ এসে গলা বাড়ান, আমার গলা অত সস্তা নয়। ঝপ করে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে নেমে সামনের মেয়েদের পাশে একটা চেয়ারে ধুপ করে বসে পড়ল সে।

অগত্যা গুণী দত্ত এগিয়ে এসে তাদেরই একজনকে ডাকল, বলল, আপনারাই তাহলে আসুন কেউ, নইলে সীরিয়াস কিছু দেখাই কি করে।

সবটাই কৌতুক জেনেও হাতে ঝকঝকে ধারালো ছোরাটা দেখেই হয়ত মেয়েদের কেউ এগোতে সাহস করল না—এ ওকে ঠেলতে লাগল।

মজার ব্যাপারটা আরো খানিক জিইয়ে রাখার জন্যে হোক, বা কি করে, সেই কৌতূহলবশতই হোক, হাসিমুখে পায়ে পায়ে স্টেজে এসে দাঁড়াল শুভেন্দু নন্দী। অর্থাৎ, তার গলা কাটতে দিতে আপত্তি নেই।

তাকে দেখামাত্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত গুণীডাটা।—আসুন, আসুন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম মাদাম, ইউ আর সিম্প্‌লি চার্মিং, এক্সকুইজিট, আই উইল লাভ টু কাট ইওর থ্রোট মাদাম।

দুবার মাদাম শুনে শুভেন্দু নন্দী হকচকিয়ে গেছে, ওদিকে আসরের কৌতূহল কণ্ঠনালীতে এসে থেমে আছে।

ছোরাটা তুলে গলা চড়াও করতে গিয়ে গুণীডাটা ধমকালো হঠাৎ। এক পা পিছিয়েও গেল। দুই চোখ বিস্ফারিত।—আর ইউ শিউর ইউ আর এ শী, আই মিন নট্‌ হী?

সম্মিলিত অট্টহাসিতে এতক্ষণের রুদ্ধ আবেগ ভেঙে পড়ল। শুভেন্দ নন্দী এক লাফে স্টেজ ছেড়ে পালিয়েছে। কিন্তু গুণীডাটার নিরুপায় মুখখানা তখনো সীরিয়াস।

বিমর্ষ কণ্ঠে বলল, ইন দ্যাট কেস্ আই অ্যাম আন্‌ডান্ লেডীস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আমি শুধু মেয়েদেরই গলা কেটে থাকি—দি মোর বিউটিফুল শী ইজ, দি মোর সাকসেসফুল আই অ্যাম।

ম্যাজিক ছেড়ে নিছক নাটকটাই জমেছিল সেদিন।

ওই গুণীডাটাই অন্তরঙ্গ সকলের। দেখে দেখে ম্যাজিয়ুড দলের কর্তা উড আর কর্ত্রী মিসেস জেনিফার উডের ধারণা হয়েছে, ম্যাজিকে হোক আর বিনা ম্যাজিকে হোক গুণীডাটা মানুষ গুণ করতে পারে। অনেক দেখেই অনেক যাচাই করেই এমন এক ব্যয়বহুল অভিযানে ভেসে পড়তেও দ্বিধা করেনি তারা। অবশ্য তারা যা দেখেছে আর যাচাই করেছে তার মধ্যে ম্যাজিকটাই প্রধান। তবে এই সুচতুর আর সুশোভন পরিতোষণ-কলার মিশেল ভিন্ন ওই প্রধান অঙ্গটিও এতটা প্রাধান্য পেত কিনা বলা যায় না।

॥ ২ ॥

কিন্তু ভালো লাগে না।

জাহাজের এই প্রহসন অন্তত আর ভাল লাগছিল না গুণী দত্তর। শুরু যা করেছিল সেটা নিছক উদ্দেশ্যের তাড়নায়। শুভেন্দু নন্দীর সঙ্গে জাহাজের অন্তরঙ্গ পরিচয় কতটা কাজে লাগবে সেটা বোঝা যাবে বাংলা দেশের আসরে নেমে। শুভেন্দু অন্ধ ভক্ত হয়ে উঠেছে তার। আপাতত এটুকুই লক্ষ্য ছিল।

গুণী দত্তর এক-একসময় মনে হয়েছে, আসলে এই সমুদ্রটাকেই ফাঁকি দিতে চায় এরা। উল্লাসে মেতে উঠে সমুদ্রকে ভুলতে চায়। অথচ আকাশে মেশা এই সমুদ্রই সব থেকে ভালো লাগে তার। সকলের চোখের আড়ালে নিরিবিলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে মহাসৃষ্টির এই বিরামহীন সুগভীর উল্লাস দেখতে ভাল লাগে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে কতদিন প্রায় সকাল পর্যন্ত ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে শুধু দেখেছে আর দেখেছে। গুণী দত্ত নিজেই অবাক, যাবার সময় তো এই দেখার চোখ ছিল না, তখন তার চোখের হয়েছিল কি?

বিশেষ করে রাত্রিতেই সমুদ্র দেখাটা নেশার মত হয়ে উঠেছে ক'দিন ধরে। শুক্লপক্ষ বোধ হয় এটা। থালার মত চাঁদটা যেন নিজেকে উবুড় করে দিয়ে জ্যোৎস্না ঢালছে। এত বড় সমুদ্রটাকেও এক-একসময় মনে হয় চাঁদের গা উপছানো তরল জ্যোৎস্নার ভাণ্ডার। বড় ঢেউগুলি খলখলিয়ে আবার চাঁদে উঠতে চাইছে, না পেরে আছড়ে ভাঙছে। জ্যোৎস্নার তাল ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—সাদায় সাদায় একাকার তখন।

যতদূর চোখ চলে, দিগ্‌বলয়ের ওই শেষ তারা-ছোঁয়া সমুদ্র থেকে গুণী দত্তর দৃষ্টিটা গুটিয়ে গুটিয়ে শেষে জাহাজের গা ঘেঁষে এসে থামে। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে সর্বত্র একরকম।....এই অনন্ত সমুদ্রের বুকে কত লক্ষ কোটি কণার একটা কণার মত আর খেলনার মত এই জাহাজটা ভাসছে। তার মধ্যে তারও কত শত কণার এক কণা সে—এই মানুষটা দাঁড়িয়ে। অথচ প্রায় অস্তিত্বশূন্য এই মানুষেরই

বুকের মধ্যে ওই অসীম অনন্তকে উপলব্ধি করার কি যে এক কৌশল লুকানো, সে-কথাটা মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিলেও অব্যক্ত দিশাহারা অবস্থা।

গুণী দত্তর হঠাৎ হাসিই পায়, সে কিনা ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। চারদিকের অনন্ত ম্যাজিক কারো চোখে পড়ে না বলেই রক্ষা।

কিন্তু এই চোখে বেশিক্ষণ সমুদ্র দেখতে রাজী নয় সে, এইরকম ভাবতেও রাজী নয়। দেখতে ভয় ভাবতে ভয়। এ-রকম বেশি দেখলে আর ভাবলে ম্যাজিক মাথায় উঠবে। তবু কিছু না দেখে না ভেবেও এই অনন্ত সিন্ধুর বুকে অস্তিত্বের এক বিন্দুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জীবনের স্বাদ নিতে ভাল লাগে তার।

সমুদ্রটা ফুরিয়ে এলো বলেই সকলের আনন্দ। কিন্তু গুণী দত্ত নির্লিপ্ত মুখে অন্ধকার ডেকের কোণে দাঁড়িয়ে জল দেখছে তখনো। আনন্দ যারা করছে করুক, আর দু ঘণ্টা বাদে জাহাজটার সঙ্গে সঙ্গে তারাও একটা নিটোল নিশ্চয়তার মোহনায় এসে পৌঁছবে। আনন্দ করাই স্বাভাবিক। তাদের সমুদ্র ফুরিয়েছে, কিন্তু গুণী দত্তর সমুদ্র ফুরোয়নি। এই কটা দিন বরং নিশ্চিন্ত ছিল সে, আজ রাত পোহালেই তার সমুদ্র শুরু হবে। যে সমুদ্র পেরিয়ে এলো এরা সকলে, সেই সমুদ্র। অনিশ্চয়তার সমুদ্র। গলায় বাঁধা যাদু-জাহাজ টেনে টেনে সেই সমুদ্রে ভাসতে হবে, সাঁতার কাটতে হবে। সমুদ্রের ওপার থেকে খুশির দূত গুণীডাটা ভাগ্যের কোন লিপি বহন করে নিয়ে আসছে ?

দেশের হাওয়া গায়ে লাগতে না লাগতে নিজের এই কাটা-ছাঁটা নামটা নিজের কানে অদ্ভুত লাগছে। গুণীডাটা। গুণময়কিশোর দত্ত—গুণীডাটা।

বছর দশেক আগে কলকাতায় তার অতি শখের একটা ভালো গরম জামা পয়সার অভাবে সস্তার ধোলাই খেতে খেতে কয়েক বছরের মধ্যে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এমন ক্ষুদ্রাকৃতি হয়ে গিয়েছিল যে, সে নিজেই এক শীতে সেটা বার করে অবাক। মনে হল নামটারও বেপরোয়া ধোলাই খেতে খেতে এই অবস্থা।

পিসী ডাকত গুণময়—গুণী। ঠাকুমা ডাকত কিশোর। পোশাকী নামের মধ্যে ও দুটোই ঢুকে গিয়েছিল। গুণময়কিশোর। বয়েসকালে কিশোর তার নিজের বিবেচনাতেই ছাঁটাই হয়ে গেছে। ওদিকে গুণময় থেকে গুণী ডাকটাই চালু। কলকাতায় এসে বাঙালীমহলে সে গুণী দত্ত হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত দেশে-বিদেশে সে নিজে আর সেই সঙ্গে নামটাও অবাঙালী ঘাটেই ধোপ খেয়েছে বেশি। ডট্টো ডট্টো ডাট্টার খটোমটো রাস্তা দিয়ে শেষে সাদা-সাপটা ডাটায় এসে ঠেকেছে। যুক্তঅক্ষর বর্জিত একটা শব্দ গুণীডাটা। সাগরপারের যাদুবিদরা নামের চটকের উপর আস্থাবান্। বিশ্বের যাদুসম্রাট হ্যারি হুডিনিকে এহ্‌রিক ভাইস বললে কেউ চিনবে না, চুং লিং সু-র চীনা বেশ খুলে উইলিয়ম রবিনসনকে দেখালে অতি বড় যাদুভক্তও মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবে। এমন কি খাস বাংলার যাদুজ্যোতিষ্ক রিপেন বসুকে রাজা বোস না বললেই বা ক'জনে চিনবে ? সাগরপারের যাদু রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের কাছে গুণীডাটা নামটা চটকদার লেগেছে। হয়ত বা গুণীর সঙ্গে গিনির একটা পরোক্ষ যোগ কল্পনা করছে তারা। এই নামের লোকের ঝুলিতে চমক কিছু থাকতেই পারে।

জাহাজ আসছে বোম্বে পোর্টে। বাংলা দেশ অনেক দূর।....না, নাড়ির যোগ নয়, নাড়ির স্মৃতিও টনটনিয়ে ওঠেনি। তবু আশ্চর্য, এই বন্দরের কাছাকাছি আসতে না আসতে ওই দূরের বাংলার মফঃসল শহরের একটা জীর্ণ বাড়ির আনাচে-কানাচে দুচোখ ধাওয়া করতে চাইছে। সেই সঙ্গে মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে এক ষোল বছরের মেয়ের মুখ। না, আগে মুখ নয়। মুখের আগে বাঁ চোখের পাতাছোঁয়া বড় মটরদানার মত মিশকালো একটা তিল। তারপর মুখ।....ষোল বছর। মনে মনে একটু হিসেব করে নিল গুণী দত্ত।....ষোল এগারোয় সাতাশ হবে এখন স্বর্ণর বয়েস। সাতাশ বছরের স্বর্ণ দেখতে কেমন হয়েছে? চেষ্টা করেও ষোলর সঙ্গে এগারোটা বছর জুড়ে উঠতে পারা গেল না।

চেষ্টা করলে উনিশ বছরের চকিত-বিমূঢ় স্বর্ণকে বরং গোটাকতক মুহূর্তের স্মৃতির আয়নায় দেখা গেলেও যেতে পারে। তিন বছর বাদে একবার দেখেছিল। এক সন্ধ্যায়, মাত্র কয়েক নিমেষের জন্য। খবরটা শোনার পর একটা অন্ধ আবেগ যেন তাকে কলকাতা থেকে বাঁকুড়া পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গুণী দত্ত যায়নি। গুণী দত্ত যেতে চায়নি। সেই দুরন্ত গিয়েছিল, যার ওপর তার কোনদিন কোন হাত নেই। এমন কি, তখনকার মত তিন বছর আগের রক্তে-ভেজা সেই আর্ত স্মৃতিও মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

দেখেছিল। মা হবে যে স্বর্ণ তাকে সে দেখেছিল। মা হবে বলে তিন বছর বাদে বাপের বাড়ি এসেছিল যে স্বর্ণ—তাকে। দেখে আবছা অন্ধকারে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল। তাকে দেখামাত্র অন্তস্তলের সেই অবুঝ দুরন্ত গা-ঢাকা দিয়েছিল। জানালার অদূরে আবাল্যের সেই বহু পরিচিত পুকুরধারে হতবুদ্ধি চোরের মত শুধু গুণী দত্ত দাঁড়িয়েছিল হাঁ করে।

ওই ঘরে আলো ছিল। লণ্ঠনের স্তিমিত আলো। সেখান থেকে স্বর্ণর তাকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। দেখলেও চিনতে পারার কথা নয়। কিন্তু স্বর্ণ তাকে দেখেও ছিল, চিনেও ছিল। পুকুরপাড়ে, অন্ধকারে সাপ জোঁক কাঁকড়াবিছের পরোয়া না করে ওই প্রতীক্ষা নিয়ে তার জীবনে একজনই বার বার এসে দাঁড়িয়েছে। এই আবছা মূর্তি স্বর্ণ মর্মে মর্মে চেনে—জানে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠাও বিচিত্র ছিল না। কিন্তু স্বর্ণ তা করেনি। উদ্গত আর্তনাদটাকে প্রাণপণে এক অব্যক্ত নীরবতার গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল বুঝি। তারপর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল খানিক। গুণী দত্ত তার চোখে ত্রাস কতটা দেখেছিল জানে না। তার থেকেও অনেক বেশি দেখেছিল ঘৃণা আর গলিত ভর্ৎসনা।

ভুলে গেলে? এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

দাগ মিলিয়েছে?

না, কেউ বলেনি। স্বর্ণ বলেনি। গুণী দত্তর মনে হয়েছিল স্বর্ণ বলেছে। বলছে।

গুণী দত্ত তস্করের মতই পালিয়েছিল।

এবারে টনটনিয়ে উঠছে কোথায়। বুকের দিকে নয়, পিঠের দিকে—পিঠে। ঘাড়ের নিচে থেকে কোমরের দিকটা পর্যন্ত শিরদাঁড়ায় এধার-ওধার জোড়া

আধ-ইঞ্চি পুরু আড়াআড়ি লম্বা একটা ক্ষতচিহ্ন। নিজের পিঠ নিজের চোখে দেখা যায় না। গেলে গুণী দত্ত বোধ হয় পাগল হয়ে যেত। সামনে পিছনে আয়না রেখে অনেকবার দেখেছে, যতবার দেখেছে ততবার এক অব্যক্ত যাতনায় ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে। অথচ যাতনা তখন সত্যিই নেই। চামড়া-ওঠা মাংস-ওঠা শুকনো গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন শুধু। তবু দেখামাত্র তার ফর্সা মুখ নীল হয়ে যেত, শিরার রক্ত চলাচল বন্ধ হত, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি থেমে যেত। তারপর তরল আগুনের মত এক প্রশান্তকর জ্বালা ছড়িয়ে পড়ত দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে—একেবারে সত্তার মূল পর্যন্ত। একসঙ্গে হাজার বৃশ্চিক দংশালেও এত জ্বলে কিনা গুণী দত্ত জানে না।

আয়না দিয়ে দেখা ছেড়েছিল। কিন্তু ওই কথাটা মন থেকে তাড়াতে অনেক সময় লেগেছিল। থেকে থেকে চমকে উঠত শিউরে উঠত। শেষে দেখার অভ্যাসটা যদি বা গেল—গায়ের জামা ফাঁক করে ঘাড়ের নিচ দিয়ে বা পাঁজরের পাশ দিয়ে হাত চালিয়ে অনুভব করার অভ্যাসটা রোগে দাঁড়িয়ে গেল। স্পর্শমাত্র আঙুলের ডগাগুলো শিরশির করে উঠত, সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুগুলো কেঁপে কেঁপে উঠত।

কিন্তু এ অভ্যাসও তো অনেক দিন গেছে। তবু একটা হাত নিজের অগোচরে আজ আবার পিঠের দিকে চলেছিল কেন? অবাক ব্যাপার, ক্ষতর পরমায়ু এমনও হয়। এত বছর তো মনে পড়েনি, একটা স্মৃতির আঁচড়ও পড়েছে কিনা সন্দেহ। ফিরতে না ফিরতে এই, বাংলা দেশটা তো এখনো কত দূর।

রেলিংএ ঠেস দিয়ে সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিল। এবারে নড়েচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাগ কোথাও নেই। ওটা স্মৃতির বিলাস, শোকের বিলাস। জোর করেই গুণী দত্ত অন্যদিকে মন ফেরাতে চেষ্টা করল। না, দাগ আর কোথাও নেই। যা আছে সেটা বাইরের দাগ। ভিতরের দগদগে দাগটা চাঁদ সাহেব মুছে দিয়েছে। দাগ ফেলে দাগ মোছার বিচিত্র রীতি চাঁদ সাহেবের।

সমুদ্র ফুরিয়ে আসা সত্ত্বেও এই প্রথম হঠাৎ ভিতরটা খুশি হয়ে উঠল গুণী দত্তর। এই রাতটা পোহালেই চাঁদ সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে।

অবাক মানুষ চাঁদ সাহেব।

ভালয় মন্দে দোষে গুণে মানুষ। কিন্তু যারা জানে চাঁদ সাহেবকে, মদের আসরে বসে আকণ্ঠ মদ না গিললে কেউ তারা চাঁদ সাহেবের ভালর সন্ধান বা গুণের সন্ধান পায় না। নিরুদ্বেগে কাউকে জাহান্নমের পথে ঠেলে নিয়ে যেতে চাঁদ সাহেবের জুড়ি নেই। কিন্তু এই লোক কি খেয়ালে গুণী দত্তকে এক অবধারিত বিলুপ্তির স্রোত থেকে জীবনের পথে টেনে তুলেছিল সে-ই জানে। এই এক ব্যাপারে তাকে দিয়ে ভালো যাদুর খেলা দেখিয়েছে ওপরওয়ালা।

গুণী দত্ত চাঁদ সাহেবের মন্দ দেখে না, দোষ বিচার করে না। করলে নেমকহারামি হবে। লোকটার ভিতরকার সব জঞ্জাল ঠেলে ঠেলে সরিয়ে অমলিন সাদা কিছু দেখতে চেষ্টা করে সে। দেখতে না পেলেও কল্পনা করে নেয়। এই চাঁদ সাহেবই উঠত বসতে আবার লেকচার দেয় তাকে, উপদেশ দেয়। বলে, খবরদার লোভ করো না, ওর মত দুশ্‌মন আর নেই, আসলে ওটাই কলজেয় ছোরা বসায় সব সময়, নইলে এই

দুনিয়ায় কে কার ক্ষতি করতে পারে ?

গুণী দত্ত হাসিমুখে চুপ করে থাকত। আবার এক-একদিন ঠেসও দিয়ে বলত। বলত, তোমার মত সাধুসঙ্গ লাভ করে জীবনের এইটুকুই সার জেনেছি।

—খামোশ !

চাঁদ সাহেব বাঙালী মুসলমান নয়। কিন্তু বাংলাটা ভালো রপ্ত করেছে। বাঙালীর সঙ্গে সর্বদা বাঙালীর মতই বাংলা বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু রাগ্‌লে বা মদ খেলে বা বেশি খুশি হলে হিন্দী উর্দু বেরোয়। দুই একটা ইংরেজি শব্দও। মদ খেলে ইংরেজি না জানার খেদও ভোলে।

এমন পিপে পিপে মদ খেতে গুণী দত্ত বিদেশেও কাউকে দেখেছে কিনা সন্দেহ। জলের বদলে মদ দিলে খুশি। এ পর্যন্ত অন্যের ঘাড়ে যত মদ খেয়েছে তার বদলে হাত পেতে টাকা নিলে চাঁদ সাহেব বোম্বাইয়ের মেরিন ড্রাইভে দালান-কোঠা বানাতে পারত। এক-এক সময় অবাক হয়ে ভাবত গুণী দত্ত, বেঁটে-খাটো লোকটার ওই জালার মত ভুঁড়িটাতে কম মদ ধরে।

মদ খাওয়া নিয়ে তাকেও কম নাকাল আর নাস্তানাবুদ করেনি চাঁদসাহেব। গোড়ার দিকের একবারের ঘটনা মনে পড়লে আজ হাসিই পায়। চাঁদসাহেবের বিরাগ আর ভ্রূকুটির ভয়ে যেটুকু জঠরে চালান দিয়েছিল গুণী দত্ত, তাতেই অস্বস্তি বোধ করছিল। পাছে ঠেলে ওঠে সেই ভয়ে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে বসেছিল সে, আর করুণ নেত্রে তখনো গেলাসে যেটুকু বাকি আছে সেইটুকুর গতি কি করবে ভাবছিল। ভয়ের দরুনই অবস্থাটা বেশি সঙ্গিন হয়ে উঠেছিল কিনা বলা যায় না, ধরা পড়ে গেল।

চাঁদ সাহেব থমকে তাকিয়েছে তার দিকে, অন্য সঙ্গীদের কি বলছিল ভুলে গেছে, তার লালচে মুখ আরো লাল হয়েছে, মেহেদীর রসে রঙ করা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সঙ্গে রঙটা মিশেছে প্রায়। উঠে এসে তার কপালটা পিছনের দিকে সামান্য ঠেলে দিয়ে মুখখানা ভাল করে দেখেছে চাঁদ সাহেব। তারপর নিজের দ্বিতীয় দফায় ভরতি মদের গেলাসটা তুলে জলেব ঝাপটা দেবার মত করে সজোরে এক গেলাস মদের ঝাপটা মেরেছে মুখে। মদে স্নান একেবারে।

আভি ঠিক হো যায়েগা। পী লো !

গুণী দত্ত ধড়ফড়িয়ে উঠেছে, জিভে করে মদে সপসপে ঠোঁটটা ঘষেছে বার কতক।

পী লো ! চাঁদ সাহেবের চাপা তর্জন।

ঢকঢক করে নিজের গেলাসের অবশিষ্টটুকু এক চুমুকে উদরে চালান করেছিল গুণী দত্ত। কিন্তু আশ্চর্য, অঘটন কিছু ঘটেনি। অস্বস্তিটাও আর তেমন বোধ করেনি। ধমকালে হয়ত আরো খানিকটা খেতে পারত।

অন্য সময় গুণী দত্ত এই নিয়ে কথা শোনাতে ছাড়েনি। বলত, তুমিই তো লোভ করতে বারণ করো, তবে মদের বেলায় ও-রকম করো কেন ? ওতে লোভ বাড়ে না ?

চাঁদ সাহেব হেসে সারা, মদ খেলে লোভ বাড়ে ! যেন এমন হাসির কথা আর

শোনেনি।

বাড়েই তো, অভ্যেসটি ভালো মত হয়ে গেলে তখন পাবো কোথায়?

আসমান সে বারিশ বন্ কর আয়েগী, ঘাবড়াও ম্যত্। তত্ত্বকথা আউড়েছে তারপর, বলেছে, যতদিন খোদার মরজি হবে ততদিন ঠিক পাবে, খোদার মরজি না হলে পাবে না। খোদা চাইলে না পেলেও তখন কষ্ট হবে না, আর খোদা যদি কষ্ট দিতেই চায়, তার দেওয়া কষ্ট হাত পেতে নিতে ডরটা কিসের!

খোদা-তত্ত্ব ঠিক এভাবে মাথায় ঢোকার কথা নয় গুণী দত্তর, ঢোকেওনি। উল্টে বিরক্ত হয়েছে, তা বলে তুমি জুলুম করবে কেন?

এ সম্বন্ধে একটা সাদা-সাপটা মত পোষণ করে চাঁদ সাহেব। যথা, মদ খেলে মাথা সাফ থাকে, ভয় রাগ দুঃখ আর সেই সঙ্গে কতকগুলো বাজে কশিশ্ (আবেগ) দূর হয়ে যায়। এক কথায় মনের দুশমনগুলো সব দূর হয়। তার মতে গুণী দত্ত অনেক আবেগের জঞ্জাল বুকে পুষছে, কষে মদ টানতে না পারলে ওগুলো সব গলে গলে দু চোখ বেয়ে আঁসু (চোখের জল) হয়ে গড়াবে। ও-সবে প্রশ্রয় দিয়েছ কি জীবন বরবাদ!

কেমন আছে এখন চাঁদ সাহেব? এই ছ'বছরে একটু বদলেছে কি? বয়েস তো কম হল না, পঞ্চান্ন ঘেঁষতে চলল বোধ হয়। এতদিনের মধ্যে গুণী দত্ত তার খান দুই মাত্র চিঠি পেয়েছে। ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লেখার ধার ধারে না চাঁদ সাহেব, তাকে কেউ লিখলেও বিরক্ত হয়।....কিন্তু আশ্চর্য, ছ'ছটা বছর কেটে গেল এরই মধ্যে।

গুণী দত্তর মনে হয়, এই তো সেদিন চাঁদ সাহেবের টেলিগ্রাম পেয়ে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় কলকাতা থেকে বোম্বাই ছুটে এসেছিল। কলকাতায় চাঁদ সাহেবের কাছে বিলেত যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল একদিন, বলেছিল, একবার ঘুরে আসতে পারলে বরাত হয়ত খুলত, নামের জেল্লা বাড়ত। শুনে চাঁদ সাহেব বলেছিল, খোদার মরজি হলে ঠিক যাবে।

তারপর কলকাতার বাস তুলে চাঁদ সাহেব বোধ হয় নিজের নসিব বাজিয়ে দেখার জন্যে বোম্বাই চলে এসেছিল। অন্য সকলের মত গুণী দত্তর বিশ্বাস চাঁদ সাহেব একজন কাউকে ফাঁসিয়ে রাতারাতি গা-ঢাকা দিয়েছে। কোথায় গেল তখন কেউ জানত না। গুণী দত্ত জেনেছে দু'বছর বাদে। হঠাৎ তার নামে বোম্বাই থেকে টেলিগ্রাম একটা—তার পাওয়া মাত্র চলে এসো, একদিনও দেরি করো না—মালপত্র যা আছে সব সঙ্গে নিয়ে এসো। আর কাউকে কিছু বোলো না।

গুণী দত্ত না এসে পারেনি। চাঁদ সাহেবের কাছ থেকে ওই দুর্বোধ্য টেলিগ্রাম পেয়ে আর কেউই হয়ত আসত না। সে এসেছে। ভয়-ভাবনা নেই। তপ্ত কড়া থেকে বড় জোর গনগনে আগুনে এসে পড়বে—তার ভয় কিসের। কিন্তু কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ে এমন নির্ভয়ে ছুটে আসার পিছনে সত্যিই কি কারণ কিছু ছিল না? যুক্তির বিচারে কারণটা আবেগপ্রবণ বটে, কিন্তু মিথ্যে নয়। তার বেলায় অন্তত মিথ্যে কখনো হয়নি। বনের পশুও যত হিংস্র হোক, যত কুটিল হোক, তারও বুকের এক

জায়গায় বিধাতা অপত্যস্নেহের থলে ঠেলে ঢুকিয়েছে। না, আচার-আচরণে তার প্রতি চাঁদ সাহেবের সন্তান-বাৎসল্য নেই—সে তাকে দোস্ত ডাকে। কিন্তু এই দোস্তের চিত্রটা সে ওই মদ্যপ লোকটার হৃদয়দর্পণে দেখে রেখেছে। এই দেখার ওপর গুণী দত্তর বিশ্বাস ছিল, ভরসা ছিল।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের বাইরে এসেই চাঁদ সাহেব জিজ্ঞাসা করেছে, আমার টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছ, কেউ জানে না তো?

গুণী দত্ত সত্যিই কাউকে বলেনি। বলার মত অন্তরঙ্গজনও তার কেউ ছিল না। মাথা নেড়েছে জানে না। কিন্তু কি ব্যাপার? টেলিগ্রাম কেন?

খুশিমুখে চাঁদ সাহেব বলেছে, ব্যাপার আছে। তুমি বিলেত যাচ্ছ।

গুণী দত্ত হাঁ।

চাঁদ সাহেবের মুখে হাসি ধরে না। খুশিতে রঙ-করা ফ্রেঞ্চ্‌কাট্‌ দাড়িসুদ্ধু নাড়া খেয়েছে। ওয়েটিং রুমে তার মালপত্র রেখে সেখান থেকে সোজা তাকে নিয়ে এসেছে য়ুরোপগামী জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার টমাসের কাছে। আনত কুর্নিশ করে গুণী দত্তকে যেন তার হাতে সঁপে দিয়েছে সে।—ইয়ে হ্যায় সাহাব হমারা দোস্ত্‌ গুণীডাটা—।

সাহেব দোস্তটিকে খুঁটিয়ে দেখেছে একটু। চাঁদ সাহেব তাড়াতাড়ি খুঁত ঢাকতে চেষ্টা করেছে, এইমাত্র দোস্ত ট্রেন থেকে নেমেছে, তাই চেহারা আর বেশবাসের এই অবস্থা—সাফসুফ হয়ে এলে অপছন্দ হবে না সাহেবের।

সাহেব জিজ্ঞাসা করল, খেলার নমুনা কিছু দেখাতে পারবে?

তক্ষুনি দেখাবার কথা বলেনি বোধ হয়। কিন্তু আসার সময় দুই-একটা টুকিটাকি খেলার উপকরণ তার পকেটে গুঁজে দিয়েছিল চাঁদ সাহেব। সাহেবের কথা শোনামাত্র কনুইয়ের ঠেলা, জরুর! আভি দেখলায়েঙ্গে—তুমহারে পাস সামান্‌ হ্যায় কুচ্‌? নঁহী? তব আসমান সে নিকালো, তুম তো ম্যাজিসিয়ান হো, সাহাব দেখনে মাঙতে—দেখাও কুছ।

আশ্বস্থ হবার চেষ্টায় গুণী দত্ত গলদঘর্ম। এতক্ষণে যেন দুর্বোধ্যতার কুয়াশা সরেছে একটু। ট্রাউজারের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুখখানা সপ্রতিভ করে তুলতে চেষ্টা করেছে। ওদিকে হাতের আঙুলগুলো পকেট নেড়েচেড়ে দেখছে চাঁদ সাহেব কি কি গুঁজে দিয়েছে।

অগত্যা নিরুপায় হয়েই যেন শার্টের হাতা গোটাল। শূন্য হাত দুখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাহেবকে দেখাল। তারপর সাহেবের শৌখিন রুমালখানা তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বেশ করে ভাঁজ করে এককোণে আগুন ধরিয়ে দিল। রুমালের কতগুলো ভাঁজ পুড়ে ছাই। দুহাতে খানিক ঘষাঘষি করে রুমালটা যখন সাহেবকে ফেরত দিল, আস্ত রুমালে একটা পোড়া দাগও নেই। ব্যাপারটা বুঝতে গিয়ে সাহেব বিভ্রান্ত, গুণী দত্ত আবার নিজের ট্রাউজারের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে মিটি মিটি হাসছে।

এ রকম ম্যাজিক চাঁদ সাহেব কষ্ট করে চোখের কোণ দিয়েও চেয়ে দেখে না, কিন্তু এক্ষেত্রে সানন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। যেন তাজ্জব কিছু দেখেছে।

ট্রাউজারের পকেট থেকে আবার হাত উঠল গুণী দত্তর, তারপর শূন্য হাতের

এপিঠ-ওপিঠ দেখিয়ে ঝপাঝপ সাহেবের কোটের হাতা থেকে, গা থেকে, গলা থেকে, মুখ থেকে প্রায় আট-দশটা করকরে টাকা বার করে ঠং ঠং করে টেবিলের ওপর ফেলল। সাহেব শূন্য হাত দেখছে, অথচ তারই সর্বাঙ্গ থেকে টাকা বার করা হচ্ছে। টাকাগুলো হাতে করে সাহেব পরীক্ষা করে দেখলো সত্যি টাকা কি যাদু টাকা। এ ব্যাপারটা দেখে সে খুশি। তার মুখ দেখেই বোঝা গেছে জীবনে ম্যাজিক-ট্যাজিক বিশেষ দেখেনি, নইলে এ ম্যাজিক দেখে খুশি হবার কারণ ছিল না। তাক বুঝে চাঁদ সাহেব আবার বাহবা দিয়ে উঠল।

সাহেব গুণী দত্তর দিকে চেয়ে হাল্‌কা ঠাট্টা করল, এভাবে গা থেকে টাকা বার করতে পারো, তোমার য়ুরোপ যাবার টাকার অভাব?

হেসে গুণী দত্ত জবাব দিয়েছে, টাকা নিজের গা থেকে বার করতে পারি না।

সাহেব বলল, তা হলে অন্যের গা থেকে বার করে যাও।

মুচকি হেসে এবারও সপ্রতিভ জবাব দিয়েছিল গুণী দত্ত, তাই তো যাচ্ছি।

সাহেব খুশি হয়েছিল, হেসেও ফেলেছিল। এবারে গুণী দত্ত সাহেবের হাতঘড়িটা চেয়ে নিয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা দেখে প্রশংসা করেছে। সাধারণ ঘড়িটার মধ্যে এত প্রশংসার কিছু আছে সাহেব নিজেও জানত না। তারপর টেবিলের ওপর একটা রুমাল পেতে গুণী দত্ত ঘড়িটা তার ওপর রেখে রুমালটা চারদিক থেকে জড়িয়ে নিয়ে শেষে সাহেবেরই পেপার-ওয়েট দিয়ে ঘড়িটা বেশ করে গুঁড়িয়েছে।

মাই গড্। সাহেবের দু চোখ গোল। চাঁদ সাহেবেরও যেন মুখ শুকিয়ে এতটুকু।

ঘড়ি গুঁড়ানো শেষ হতে রুমালসুদ্ধ সেটা কেবিনের জানালা দিয়ে জলে ফেলে তবে নিশ্চিন্ত গুণী দত্ত। কোমরে হাত দিয়ে সাহেবের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

দেন.....হোয়াট? সাহেব খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না।

জবাবে খপ করে সাহেবের কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েই আস্ত ঘড়িটা বার করে তাকে ফেরত দিল সে।

আর কিছু দেখানো দরকার হয়নি। সাহেব জিজ্ঞাসা করছে, এ-রকম কত ম্যাজিক জানো?

চাঁদ সাহেব ফসফসিয়ে জবাব দিয়েছে, দো-চার হাজ্‌আর। শেষে সত্যি কথাটাই বলেছে, সাহেব, এর আসল ম্যাজিক দেখলে তুমি তাজ্জব হয়ে যাবে, এ কোনো ম্যাজিকই নয়।

যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। দুদিন বাদে জাহাজ ছাড়বে। যাত্রীদের সান্ধ্য অবকাশ বিনোদনের প্রোগ্রাম করার ভার কোয়ার্টার-মাস্টারের। মাঝে মাঝে তাদের ম্যাজিক দেখানোটা নয়া প্রোগ্রাম হবে—সেই রাস্তা দিয়ে জাহাজের কর্মচারী হিসেবে গুণী দত্তর সমুদ্রে ভাসা। কোয়ার্টার-মাস্টারটি স্বার্থের ব্যাপারে কড়া, সতর্ক করে দিয়েছে, কোনরকম গণ্ডগোল হলে বা যাত্রীরা বিরক্ত হলে বা তাদের একঘেয়ে লাগলে সে যে-কোনো বন্দরে তাকে বিনা কৈফিয়তে নামিয়ে দিতে পারবে।

চাঁদ সাহেব তক্ষুনি সায় দিয়েছে, যেন নামিয়ে না দেওয়াটাই অন্যায় হবে।

বাইরে এসে গুণী দত্তর মাথা ঝিমঝিম করছিল। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছে, লন্ডনে যে নামব, পাসপোর্ট?

শুনেই চাঁদ সাহেবের চোখ গরম।—তুমি তো খোকা একেবারে, পাসপোর্ট ছাড়া চলতে পারবে না। চোখ কান বুজে ভেসে পড়ো, ওই বুদ্ধুটাই সব রাস্তা বাতলে দেবে।

বুদ্ধু অর্থাৎ কোয়ার্টার-মাস্টার। গুণী দত্ত চুপ, শীতের দেশে যেতে হলে কতরকম ঝামেলা, তার ওপর শীতকালও সেটা—কিছুই নেই বলতে গেলে। কিন্তু এ-সব তুচ্ছ সমস্যার কথা তুললে চাঁদ সাহেব ক্ষেপে যাবে। এদিকে হাতে টাকাও নেই। অবশ্য টাকা সামান্য কিছু জাহাজ থেকে পাবে, কিন্তু সে তো পরের কথা। এত বড় সুযোগের মুখে সমস্যাগুলো মন থেকে ছেঁটে দিতে চেষ্টা করেছিল গুণী দত্ত, দুর্গা বলে ঝুলে পড়া তো যাক, যা হয় হবে।

চাঁদ সাহেবের কোয়ার্টার-মাস্টার বশ করার রহস্য অজ্ঞাত তখনো। জিজ্ঞাসা করল, এই লোকটাকে গাঁথলে কি করে?

জুয়ার আখড়ায়। চাঁদ সাহেব বেজায় খুশি, তুমি তো বলো মদ খাওয়া ভালো নয়, জুয়া খেলা ভালো নয়, এখন দেখো বিলকুল খারাপ বলে কিছু আছে?

এক যাদু কাহিনীই বটে। জাহাজ পোর্টে লাগলে কোয়ার্টার-মাস্টারটি অভিজাত মহলের জুয়ার আখড়ায় হানা দিত। আর চাঁদ সাহেবের কোথায় না আনাগোনা? সেই থেকেই সে তালে ছিল দোস্তকে কেমন করে জাহাজে তুলে দেওয়া যায়। প্রথম বছরে পারেনি, দ্বিতীয় বছরে পারল। চাঁদ সাহেবের জুয়া খেলার টাকা নেই, সে আসর জমাতে যেত।মাঝে মাঝে মওকা বুঝে ভাগেসাগে খেলত। রোখের মাথায় সাহেব এক রাতে প্রায় হাজারখানেক টাকা হারল, তখনো রোখ যায়নি, কিন্তু পকেটে আর টাকা নেই। দশ মিনিটের মধ্যে শ'দুই টাকা ধার করে এনে দিল চাঁদ সাহেব, বলল, তুমি খেলো সাহেব, ঠিক মওকা ফিরবে। সাহেব প্রথমে রাজী হয়নি, কিন্তু চাঁদ সাহেব না-ছোড়। বলেছে, তুমি খেলো, টাকা যায় আমার যাবে। দু'শ টাকার লোকসান দিয়েও চাঁদ সাহেব মনে মনে দোস্ত্‌এর নসিব যাচাই করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল,—এই থেকেই বোঝা যাবে দোস্ত্‌এর য়ুরোপে যাওয়া কপালে আছে কি নেই।

বোঝা গেছে। সেই দু'শ টাকায় আট'শ টাকা লোকসান উশুল করেছে সাহেব। টাকাটা চাঁদ সাহেবকেই দিতে গিয়েছিল সে। চাঁদ সাহেব জিভ কেটে নাক-কান মলেছে আর দু'শ টাকাই শুধু ফেরত নিয়েছে।

চাঁদ সাহেবের সেই দরাজ হাসি এখনো কানে লেগে আছে গুণী দত্তর।—যব খোদাকী মরজি হ্যয় তুম বিলায়েত যাওগে তো সাহাবকো জীতনাহি পড়েগা।

সেই জেতার পরিণাম। কোয়ার্টার-মাস্টারকে খুব আর সাধ্যসাধনা করতে হয়নি, দু'চার দিন দোস্ত্‌এর কেরামতির কথা বলতেই হুকুম হয়েছে, নিয়ে এসো তোমার দোস্তকে।

জাহাজে ওঠার আগে গুণী দত্তকে স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই কাটাতে হয়েছে

দুটো দিন। অবশ্য রাতটুকু বাদ দিয়ে দিনের বেশির ভাগ সময় তার সঙ্গেই কাটিয়েছে চাঁদ সাহেব। কিন্তু সেবার গুণী দত্ত ঠিক তা আশা করেনি। সব জেনেও আশা করেছিল, চাঁদ সাহেব তাকে তার বাড়িতে নিয়েই তুলবে। শেষে হোটেলে খাওয়ার আর ওয়েটিং রুমেই তার থাকার ব্যবস্থা হল দেখে নিজেই মুখ ফুটে প্রস্তাব করেছিল, এ দুটো দিন তোমার কাছেই থাকা যায় না?

চাঁদ সাহেবের ভুরুর মাঝে কুঞ্চন রেখা পড়েছে তক্ষুনি, চেয়ে দেখেছে একটু, তারপর সাফ জবাব দিয়েছে, ছোড়ো!

চাঁদ সাহেবের এই দুর্বলতা অনেককাল ধরেই জানা তাদের। কাউকে তার বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিত না কখনো। কলকাতায় থাকতে নিয়মিত সে একটা আড্ডায় আসত, সেখানেই সকলের সঙ্গে যোগাযোগ হত। নইলে বারএ বা কোন রেস্তরাঁয়। তাছাড়া ব্যবসায়েরও ঠিকানা ছিল একটা। কিন্তু চাঁদ সাহেব ভুলেও বাড়ির ঠিকানার আভাস পর্যন্ত দিত না কাউকে।

ইয়ার-বকশীরা তার এ দুর্বলতার কারণ জানত, ঠাট্টা-তামাসা করত প্রায়ই, চাঁদ সাহেব কবে আমাদের তোমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ বল!

জবাবে অশ্লীল কিছু একটা বলে বসত চাঁদ সাহেব।

রহস্যটা সে-সময় চাঁদ সাহেবের এক অন্তরঙ্গজনের মুখেই শুনেছিল গুণী দত্ত।

কলকাতায় ডেরা বাঁধার আগে চাঁদ সাহেব করাচিতে থাকত। স্বাধীনতার কিছুদিন আগের কথা। সেখানেই ঘর-বাড়ি ছিল, নিজের স্ত্রী-পুত্র ছিল, আর অবস্থাও ভাল ছিল। সেখানে এক সিন্ধি ভদ্রলোকের সঙ্গে মস্ত ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল, আধাআধি বখরার ব্যবসা। অংশীদারটির উপর ভারী বিশ্বাস করে সবই তার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। ফুর্তিবাজ মানুষ, তার ব্যবসা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার ফুরসত কোথায়?

সেই অংশীদার একদিন সব কিছু আত্মসাৎ করে তাকে পথে বসালো। সব বুঝেও চাঁদ সাহেব কিছু না বোঝার ভান করেছিল। প্রত্যুত্তরে সেও সামান্য একটা কাজ করেছে। ভাঁওতা দিয়ে অংশীদারের স্ত্রীটিকে ঘরের বার করে তাকে নিয়ে নিজের স্ত্রী-পুত্র ঘর-বাড়ি ফেলে একেবারে নিখোঁজ হয়েছে।

ভদ্রমহিলা প্রথম কয়েকটা দিন নাকি একটু বেগ দিয়েছিল, তারপর ঠাণ্ডা হয়ে দিব্বি ঘর করেছে চাঁদ সাহেবের সঙ্গে। অবশ্য ঠিক সেই সময়েই স্বাধীনতার ঝাপটায় দেশের হাওয়া উল্টে গিয়েছিল খানিকটা। কিন্তু মহিলা কলকাতায় এসে অন্তত ইচ্ছে করলে উদ্ধারের রাস্তা একটা বার করতে পারত। কিন্তু কেন তা করেনি কেউ সঠিক জানে না। ইয়ার-বকশীরা বলাবলি করত, চাঁদ সাহেব তাকে সুরা-সমুদ্রে ভাসিয়ে বশ করেছে। স্বামী নিতে এলেও এখন সে-ই বেঁকে দাঁড়াবে। সুরার মায়া জবর মায়া!

গুণী দত্ত শুনেছে, চাঁদ সাহেবের বাড়িতে তখন অবারিত দ্বার ছিল সকলের। অনেকেই আসত যেত। তার ঘরের এই রমণীটিকে নিয়ে কেউ কেউ কটাক্ষও করত।

কিন্তু তাকে নিয়ে চাঁদ সাহেবের দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেনি কখনো। তবে মহিলাটির মুখও বড় দেখতে পেত না কেউ।

একবার ঘটল দুশ্চিন্তার কারণ। একজনের মাত্র হাজার দুই টাকা ফাঁসাবার ব্যবস্থা প্রায় করে এনেছিল চাঁদ সাহেব। লোকটাকে বাড়িতে ডেকে কি কুক্ষণেই খাতির-যত্ন করেছিল একটু। চাঁদ সাহেবের সব থেকে দুর্বল জায়গাটিতেই চোখ পড়েছিল সেই দুশমনের—রমণীটিকে সে বারকয়েক দেখার সুযোগ পেয়েছিল। তাছাড়া সেও করাচির লোক, ঘটনা জানত।

বলল, দু হাজার ছেড়ে পাঁচ হাজার দেব, ওকে দাও।

দু হাজারের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে চাঁদ সাহেব তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু লোকটা ছাড়েনি, ঘুরেফিরে আবার এসেছে, বলেছে, দশ হাজার দেব, দাও।

উপায় থাকলে চাঁদ সাহেব খুন করত। কিন্তু টাকার জোরে লোকটার জোর তার থেকে অনেক গুণ বেশি ছাড়া কম নয়। সেবারও বিতাড়িত হবার পর নাছোড়বান্দা আবার একদিন এসেছে। বলেছে, বিয়ে করা বউ তো নয় তোমার, দেবে না কেন? পনের হাজার দিচ্ছি, মাসকয়েক বাদে আবার না হয় তোমার জিনিস তোমাকেই ফিরিয়ে দেব। দেবে তো দাও, নইলে ওই আওরতের জন্যেই গণ্ডগোলে পড়বে, ওটিকে কোথা থেকে এনেছ তুমি সব ফাঁস হয়ে যাবে।

ফাঁস হওয়ার জন্য চাঁদ সাহেব পরোয়া করে না, আর গোপনও ছিল না কিছু। কিন্তু লোকটার এই টাকা ছড়ানো আর দর চড়ানো দেখে এবারে মনে মনে ঘাবড়ালো চাঁদ সাহেব, ভয়ও পেল। আর কত হাজার পর্যন্ত তার মাথা ঠিক থাকবে ঠিক কি! এখনই তো ঝিমঝিম করছে। তাছাড়া তার অনুপস্থিতিতে যাকে চায় তার মাথার ওপর অমন মুষলধারে টাকা বৃষ্টি হলে ফল কি হবে কে জানে?

সেই দিনই বাড়ি বদলালো চাঁদ সাহেব। আর একটানা অনেকদিন নিখোঁজ হয়ে রইল। কোন্ তল্লাটে ঘর নিয়েছে অনেককালের মধ্যে তা পর্যন্ত কেউ জানল না। সেই থেকে কেউ তার বাড়িমুখো হতে চাইলে একেবারে মারমুখো হয়ে ওঠে চাঁদ সাহেব।

কিন্তু তখনো বাড়ি নিয়ে যেতে আপত্তি কেন গুণী দত্ত বুঝে ওঠেনি। চাঁদ সাহেবের সেই রমণীটি তো কলকাতায় থাকতেই মারা গেছে। চাঁদ সাহেব কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ে গা-ঢাকা দেবারও বছরখানেক আগে। ইয়ারবকশীরা আবারও বলাবলি করেছে, দেদার মদ খেয়েই এত তাড়াতাড়ি ভবনদী পাড়ি দিল রূপসীটি। মনে মনে মহিলাটিকে একবার দেখার লোভ ছিল গুণী দত্তর। তাকে না দেখুক, তাকে হারানোর ঝাপটাটা দেখেছে। এক আচমকা মহাঝড় যেন ধরাশায়ী করে দিয়ে গিয়েছিল চাঁদ সাহেবকে। জালা জালা মদ গিলে প্রায় ছ'মাস বাদে খানিকটা আগের মত হতে পেরেছিল সে। আর তার ছ'মাস বাদে তো নিরুদ্দেশ।

গুণী দত্ত আজও ভেবে পায় না বোম্বাইতে ওই দুদিন তাকে ওয়েটিং রুমে থাকতে হয়েছিল কেন? চাঁদ সাহেব কেন তখনো তাকে তার বাড়ি নিয়ে যায়নি?

যার জন্য এত করল, কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করে আনিয়ে জাহাজে তুলে ছাড়ল, ঘরের সেই রমণী চোখ বোজার ক'বছর পরেও তাকে পর্যন্ত বাড়ির ছায়া মাড়াতে দিল না কেন?

চাঁদ সাহেব কি আবারও সঙ্গিনী জুটিয়েছে?

॥ ৩ ॥

ডেকের আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গুণী দত্ত যাত্রীদের চাঞ্চল্য টের পাচ্ছে। আর মাত্র ঘণ্টাখানেক জল কাটবে জাহাজ। তারপরেই বিরতি। কিন্তু গুণী দত্তর নড়ার তাড়া নেই, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার কথা হয়েছে, জাহাজ এই রাতে আর পোর্টে ভিড়বে না। কাছাকাছি অপেক্ষা করবে, সকাল হলে বন্দরে লাগবে।

পিঠে কার হাত পড়তে চমকে ফিরে তাকালো। জুলি স্যান্ডারসন।

এই অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। এসে তো গেলে, কার শ্রীমুখ ভাবছ?

গুণী দত্ত হাসল, বলল, সেই শ্রীমুখে একগাল দাড়ি।

এদিক-ওদিকে চেয়ে নিয়ে চট করে একটু চুমু খেয়ে ফেলল জুলি স্যান্ডারসন। তারপর হাসিমুখে বলল, সবাই লাফালাফি করছে আর তুমি একলাটি দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাই, মিসেস উড আবার মাল মেলাচ্ছে, এক্ষুনি ডাক পড়বে।

যেমন চকিতে এসেছিল তেমনি চলে গেল। কোনো শ্রীমুখের কথা ভাবছে না শুনেই খুশি হয়ে গেল। ও অল্পতেই খুশি হয়। দেশে গুণী দত্তর জন্য কোনো মেয়ে বসে নেই, এ যেন ও ভাবতেই পারে না। গুণী দত্তর ডায়েরি লেখা অভ্যাস আছে, দু'দশ দিন বাদে এক-একসময় পাঁচ-সাত পাতা লিখে ফেলে। বাংলায় লেখে। জুলি বাংলা বোঝে না। সে ডায়েরীটা নাড়াচাড়া করত আর বলত, তোমাদের ভাষা জানিনে তাই ভাঁওতা দিচ্ছ, নিশ্চয় এতে ডজনখানেক মেয়ের নাম লেখা আছে।

আবার এক-একদিন অবাক হয়ে বলেছে, তোমাদের দেশের মেয়েগুলোর কি চোখ নেই নাকি, ভালো করে দেখেওনি কেউ তোমার দিকে চেয়ে?

গুণী দত্ত শুধু চাঁদ সাহেবের কথাই ভাবছিল কেন? ওপরওয়ালার যাদুর খেলায় এই একটা মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটালেই বা কি করত সে? কি হত?

না, যাবার সময় এই যাদুর জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

জাহাজের সেই কোয়ার্টার-মাস্টারটি ঠাস ঠাস করে কথা বলত, গাঁ-গাঁ করে চেঁচাত। সপ্তাহের মধ্যে চার-পাঁচদিন যাত্রী মনোরঞ্জনের সান্ধ্য আসরে তার ডাক পড়ত। কোয়ার্টার-মাস্টারের হেঁড়ে গলা শুনলেই তার বুকের ভিতরে একটা অস্বস্তি শুরু হত। যা জানে সে-সব ঠিক ঠিক মনে আছে কিনা নিজেরই সন্দেহ হত। মনে থাকলেও কলা-কৌশল নিখুঁত হবে কিনা সেই ভয় লেগেই থাকত। এক-একটা রাতের আসর শেষ হলে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত তার।

সকাল হলেই আবার ভাবনা শুরু হত, নতুন কি দেখানো যায়। তার হাতের সরঞ্জাম পরিমিত। রোমাঞ্চকর পরিবেশ সৃষ্টি করার মত বলতে গেলে কিছুই ছিল

না। হাতে যা ছিল তাই নানাভাবে সাজিয়ে উল্টেপাল্টে কথার বুনোনিতে নতুনের জাল বিস্তার করতে হত। তার আজকের মুখের ধার আর স্নায়ুর ওপর আস্থার জন্য গুণী দত্ত ছ'বছর আগের সেই বিলেতগামী জাহাজটার কাছে ঋণী।

কিন্তু সংশয় আর অস্বস্তি সত্ত্বেও চোখে তার নতুন স্বপ্নের ঘোর লেগেছিল। অবসর সময় অফুরন্ত সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবত, এই জল কেটে জাহাজটা তার স্বপ্নের ডাঙায় পৌঁছবেই একদিন। তারপর স্বপ্নলক্ষ্মীব অন্তঃপুরও সে খুঁজে পাবে। তা না হলে এমন কাণ্ড সম্ভব হল কেমন করে।

বাঁকড়ো জেলার একটা নিতান্ত সাধারণ ঘরের ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলে ছেলে অস্তিত্বের সমুদ্রে একেবারে তলিয়ে যাবার মত অবিরাম ঝাপটা খেতে খেতে শেষে সত্যিই এক বাস্তব সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে। এই সমুদ্র শেষ না হয়ে পারে? শেষ হলেও অনেক বাধা অনেক বিঘ্ন অনেক পরীক্ষা সামনে জানে। কিন্তু নিস্ফল শূন্যতার গহ্বরে বিলীন হবার জন্য এত আয়োজন কি সম্ভব?

ভাবতেও জোর পেত মনে। অবসাদ কেটে যেত। থাকুক বাধা-বিঘ্ন—সে উত্তীর্ণ হতে চলেছে, এইটুকুই সে জপের মত ধ্যান করত সর্বদা। মনটাকে সব-রকম প্রতিকূল বাস্তব থেকে যাদুর রাজ্যেই টেনে নিয়ে যেত। যে রাজ্যে অলৌকিক বলে কিছু নেই—সবই সম্ভব।

বিশ্বাস করুক না করুক, একসময় এ-সবের পৌরাণিক পুঁথিপত্র সে কম ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। ভারতবাসীদের দাবি, ভোজরাজ ছিলেন এই অঘটন-ঘটনপটু কুহক বিজ্ঞানের আদিগুরু। শান্তিকর্ম মারন উচাটন বশীকরণ স্তম্ভন রোগনিরাকরণ ভূতপ্রসাধন আকর্ষণ মোহন বিদ্বেষণ প্রভৃতি নৈসর্গিক ক্রিয়াকাণ্ডর অনেক অলৌকিক কাহিনী তার জানা আছে। কিন্তু এক ছেলেবেলায় ছাড়া পরিণত মনে এ-সব কোনোদিন একটুও রেখাপাত করেনি। বরং স্থূল মনে হয়েছে। এই সব স্থূল গল্প মানুষের মর্মমূলে বাসা বেঁধেছিল বলেই একদা পশ্চিমের বেদে-বেদেনীদেরও লোকে পুড়িয়ে মারতে চাইত।

কিন্তু ছ'বছর আগে সেই জাহাজে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে গুণী দত্ত পুঁথিপত্রের কত অলৌকিক বিন্যাস বিশ্বাস করতে চেয়েছে ঠিক নেই। অবশ্য যে-সব কাহিনীর সঙ্গে সুন্দরের সংঘাত নেই সেইগুলোই শুধু মনে হয়েছে। তারই থেকে উদ্দীপনা সংগ্রহ করেছে, বিস্মৃতি সংগ্রহ করেছে। তার মনে হয়েছে, এই সমুদ্র বা তার পরের কোনো প্রতিবন্ধকই সত্যি নয়। মনে হয়েছে, আসলে সমুদ্রটাই সত্যি নয়। ভোজরাজার রূপসী বিদুষী দুর্লভযৌবনা যাদুরূপিণী কন্যা ভানুমতি একবার মোহিনীবিদ্যায় উসর প্রান্তরমধ্যে সমুদ্র সৃষ্টি করে বিক্রমাদিত্যের গতি রোধ করতে চেষ্টা করেছিল। গতি সত্যি সত্যি রুদ্ধ হলে কন্যাটিই বোধ করি সব থেকে বেশি হতাশ হত। কিন্তু তা হবে না জানত। দৃশ্যটা কল্পনায় দেখতে ভারি ভালো লাগতো গুণী দত্তর। সামনে সমুদ্র দেখে চকিত-বিমূঢ় বিক্রমাদিত্যর রুদ্ধগতি হঠাৎ। সেই মহাসমুদ্রের অপর প্রান্তে বসে তার ভাবী রূপসী কন্যাটি হাসছে মিটিমিটি।

গুণী দত্ত ভাবতে চেষ্টা করত, এই সমুদ্রটাও তেমনি। যাদু-পসারিণীর মায়া। এর ওধারে বসে মোহিনীময়ী হাসছে মিটিমিটি। হাসছে, জব্দ করছে, আবার তারই

জন্য প্রতীক্ষাও করছে। হাতছানি দিচ্ছে।

'সেফের টোলদাথ জেসু—'

কতকাল আগের পড়া শব্দ কটা ঘুরে ফিরে কানে বাজতে লেগেছে আবার। মানবপুত্রের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের উপাখ্যান সত্যি ভাবতে ভালো লেগেছে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেছে, বিশ্বপিতার যাবতীয় কর্ম সম্পাদনের জ্ঞানদ্যোতক মন্ত্রটি আঁকা আছেই কোথাও।

গল্পটা গুণী দত্ত ভুলবে না। এই কাহিনীর আঙ্গিকে যাদুমঞ্চে একটা বাস্তব ম্যাজিক দেখানো যায় কিনা সে-কথা অনেক দিন ভেবেছে।—জেরুসালামের পবিত্র মন্দিরের ভিত্তি খননকালে পুণ্যাত্মা ডেভিড একটা বড় বিচিত্র জিনিস দেখতে পান। দেখে একেবারে স্তব্ধ তিনি। জিনিসটা একটা পাথর। সেই পাথরে বিশ্বপিতার জ্ঞানদ্যোতক মন্ত্র খোদাই করা।

ডেভিড চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই মন্ত্র যদি কারো চোখে পড়ে, এর বলে এই বস্তুজগতে সে কত-রকম অলৌকিক কাণ্ডকারখানা করে বসবে ঠিক কি! তাতে সকলের অমঙ্গল, তামাম দুনিয়ার অমঙ্গল। অজ্ঞ মানবের হাতে এই জ্ঞানদ্যোতক মন্ত্র, শিশুর হাতে ভয়াবহ অস্ত্রের সামিল। অনেক ভেবেচিন্তে ডেভিড সেই প্রস্তর-ফলক ওই মন্দিরের ভূগর্ভস্থ পীঠস্থানে রেখে দেন। কিন্তু প্রাজ্ঞজনেরা তাতেও নিশ্চিন্ত বোধ করলেন না। পবিত্র পীঠের প্রবেশদ্বারে তাঁরা অতিকায় কালান্তর দুটি সিংহমূর্তি স্থাপন করলেন। এর পরেও যদি কেউ ওই মন্ত্রের সন্ধান পেয়ে কোনো কারসাজিতে ভিতরে প্রবেশ করে তাহলেও ভয়ের কারণ নেই। সেই মন্ত্রের বলে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানচক্ষু লাভ করে সে বাইরে আসা মাত্র ওই সিংহ দুটি একযোগে এমন সর্বনেশে বিকট গর্জন করে উঠবে যে সেই মন্ত্র বিস্মরণ হতে বাধ্য।

কিন্তু তবু, কেউই যদি সেই মন্ত্র না পেত তাহলে তার অস্তিত্ব ব্যর্থ হত। যোগ্যতম মানবপুত্র প্রভু যীশু পেয়েছিলেন সেই মন্ত্র।

একদা ভোজবিদ্যা প্রভাবেই তিনি পুরোহিতদের অজ্ঞাতসারে ভূগর্ভস্থ পীঠস্থানে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর প্রস্তরখণ্ডের মন্ত্র উদ্‌ঘাটন করে তা একখণ্ড পার্চমেন্ট কাগজে লিখে নিজের গায়ের চামড়া ভেদ করে কাগজের লেখনী তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। বেরিয়ে আসার সময়ে সর্বচেতনাগ্রাসী সিংহের সেই করাল গর্জনে মন্ত্রটি তিনিও ভুলে গেলেন বটে, কিন্তু সেটা তো তাঁর সঙ্গেই আছে।

গাত্রচর্মের লিপি বার করে আবার তিনি জ্ঞানদ্যোতক মন্ত্র আয়ত্ত করলেন। সেই মন্ত্রের প্রভাবেই তিনি বিশ্বকল্যাণের যাবতীয় অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করতে পারতেন।

সমস্ত বাধা বিঘ্ন প্রতিকূলতা পার হয়ে গুণী দত্ত দুই যোগ্য হাতে সেই মন্ত্রই উদ্ধার করতে চলেছে।

কিন্তু সাগরপারে বিদেশের মাটিতে পা দেবার দিনকতকের মধ্যে গুণী দত্তর সঙ্কল্পের মোহ আর স্বপ্নের মোহ ভেঙে খানখান। সেখানে না আছে কোনো স্বপ্ন-সম্ভবের পীঠস্থান, না কোনো প্রতিরক্ষারত যাদুলক্ষ্মীর হাতছানি।

সেখানে ছিল শুধু অপেরা হাউসের সস্তা নাচিয়ে মেয়ে জুলি স্যান্ডারসন।

লন্ডনে পৌঁছে কয়েকদিন একটু গা-ঢাকা দিয়ে ছিল গুণী দত্ত। কোয়ার্টার-মাস্টার শিখিয়ে দিয়েছিল, জাহাজ আবার ছেড়ে চলে গেলেই আর কেউ তার খোঁজ করবে না, তখন আর পাসপোর্টের ভাবনাও থাকবে না।

প্রচণ্ড শীত। হাড়ে হাড়ে লেগে যাবার উপক্রম। অজানা অচেনা সবাই। চাঁদ সাহেব গোটা দুই কম্বল দিয়েছিল, আর গোটা তিনেক গিনি পকেটে গুঁজে দিয়েছিল। জাহাজ থেকে যা পেয়েছিল সেও নামমাত্র। পাসপোর্ট না থাকার ভয়ে কিছুদিন তো কাজের চেষ্টায়ও বেরুনো হয়নি। সপ্তাহে এক পাউন্ড ভাড়ায় শহর থেকে অনেক দূরের এক ঘিঞ্জি দরিদ্র পল্লীতে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছিল। হাতের সম্বল ভেঙে খেয়েছে। কিন্তু গা ঢাকবে কি দিয়ে, কম্বল গায়ে চড়িয়ে তো আর কাজের চেষ্টায় বেরুনো যায় না। ওদিকে দ্বিপ্রহরে সূর্য একবার ওঠে কি ওঠে না, বেলা দশটা-এগারোটা পর্যন্ত কুয়াশায় ছাওয়া—সেই ঠাণ্ডা যেন কান দিয়ে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ঢুকে হাড়পাঁজর জমিয়ে দেয়।

তবু না বেরিয়ে উপায় নেই। বেরুতে হয়েছে। যেটুকু সম্বল ছিল তাই গায়ে চাপিয়েছে। সেই মূর্তি দেখে যে যাই ভাবুক, স্মার্ট কেউ ভাবেনি।

খাটতে রাজী থাকলে কাজ মেলে সেখানে। গুণী দত্তরও কাজ জুটেছে। মস্ত একটা অপেরা হাউসের ঝাড়ুদার—প্রমোদ ভবনটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব তার। একটা সুবিধে আছে। এখানে কোনো কাজই কেউ ছোট ভাবে না। কাজ করা নিয়ে কথা, কোন দরের লোক করছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু এই কাজটার শারীরিক ধকল বড় কম নয়। শীত কমাবার জন্যেই খাটতে আপত্তি নেই গুণী দত্তর, বসে থাকলেই শরীর জমে যেতে চায়।

মাইনে সপ্তাহে সাড়ে ছ'পাউন্ড। সপ্তাহে এক পাউন্ড লাগে ঘরভাড়া, এত পরিশ্রমের পর দিনে চারবার খেতে সপ্তাহে খরচ হয় সাড়ে তিন পাউন্ডের মত। এক পাউন্ড যাতায়াতে লাগে, কারণ ছুটি গেলেও যাদু রঙ্গমঞ্চের এজেন্টদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্যে ঘোরাঘুরি করতে হয় তাকে। আর থাকল এক পাউন্ড। আনুষঙ্গিক খরচা গিয়ে টেনেটুনে বড় জোর আধ পাউন্ডটাক বাঁচে। গরম জামাকাপড় করবে কি দিয়ে? তবু সস্তায় টুকটাক এটা-ওটা করাচ্ছিল। কোথাও দেখা করতে হলেও একটু ভদ্রস্থ হওয়া দরকার।

এই অপেরা হাউসেই স্যান্ডারসনের সঙ্গে আলাপ এবং হৃদ্যতা।

ছুট্ আর্টিস্ট সে, মাইনে-করা বাঁধা নাচিয়ে নয়। কিছুদিন এক জায়গায় থাকে, আবার মেয়াদ ফুরোলে অন্যত্র সংস্থান খোঁজে। অনেক হোটেলেও নেচে গেয়ে বেড়িয়েছে। বয়সে গুণী দত্তর চেয়ে বছর দুই ছোট হবে হয়ত। এই জুলির কাছ থেকে হদিস নিয়ে সে জনকয়েক যাদুমঞ্চের এজেন্টের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেছে। ফল কিছু হয়নি। হাতের কাজ একটু-আধটু দেখিয়েছেও দুই-একজনকে, কিন্তু শহরের যাদুমঞ্চে তাকে সুযোগ দেবার কথায় কেউ কান দেয়নি। সে কি জানে বা কতটা

জানে ভালো করে দেখার অবকাশও হয়নি তাদের।

ক্রমশ হাল ছেড়ে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল গুণী দত্ত। দরকারমত শীতের জামাকাপড় পর্যন্ত জোটাতে পারেনি তখনো। একদিন রেস্তরাঁয় বসে লাঞ্চ খাচ্ছিল আর ভাবছিল কি হবে। এমন সময় জুলি স্যান্ডারসন খেতে এলো সেখানে। আরো কয়েক দিনই দেখা হয়েছে—গল্প করতে করতে খেয়েছে দুজনে। কিন্তু অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত কথা খুব একটা হয়নি, কাজ-কর্মের কথাই শুধু হয়েছে।

জুলি স্যান্ডারসন সেদিন খেতে খেতে বারকতক তাকে লক্ষ্য করল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, খাচ্ছ অথচ মুখ অত শুকনো কেন?

জবাব না দিয়ে গুণী দত্ত মুখ গোঁজ করে খেতে লাগল, কেউ তার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাবে সেটা অসহ্য।

জুলি দেখল খানিক, তারপর এক হাতে থুতনিটা ধরে তার মুখটা নিজের মুখ বরাবর তুলে দিল।—কি হয়েছে?

কিছু না। এখান থেকে চলে যাব ভাবছি।

কোথায়?

দেশে।

কেন?

এখানে কি ঝাড়ুদার হতে এলাম?

জুলি স্যান্ডারসন খাওয়া ধরল আবার। তারপর একসময় জিজ্ঞাসা করল, দেশে তোমার কে আছে?

কেউ না।

নো গার্ল? জুলি হাসল।

জবাবে গুণী দত্তও হাসতে চেষ্টা করেই মাথা নাড়ল। কথায় কথায় কিভাবে সে এখানে এসেছে সেই কথাও বলল।

কে জানে কেন এই চটপটে হাসিখুশি মেয়েটাকে বলতে ভালো লাগল তার।

সব শোনার পর জুলি স্যান্ডারসন চুপচাপ তার খাওয়া শেষ করে নিল। সস্তার খাওয়া, কিন্তু দিব্যি নিরুদবেগ তৃপ্তি সহকারে খেল সে। তারপর বলল, আমিও বলতে গেলে বারো বছর থেকে এই তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত ভেসে ভেসেই বেড়াচ্ছি। আমার কোনো দুঃখ নেই। একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করল, দেশে ফিরতে চাইছ, ফেরার টাকা কোথায় তোমার?

দেখি। টাকার ব্যবস্থা হলেই যাব।

সাধু উপায়ে বছর দুই লাগবে ব্যবস্থা হতে, ততদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে যেজন্য এসেছ—চেষ্টা করে যাও।

উপদেশ নিরর্থক সেটা জুলি স্যান্ডারসন তার আশাহত গোমরা মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিল হয়ত। সেই প্রথম বোধ হয় সে তার শীত-বস্ত্রের অভাবটাও লক্ষ্য করেছিল। রেস্তরাঁর নিরিবিলিতে এর পরেও ক'দিন দেখা হয়েছে। ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কোনো কথা ওঠেনি। কিন্তু গুণী দত্তর মনে হয়েছে, মামুলী গল্পের ফাঁকে মেয়েটা

তার পোশাক-পরিচ্ছদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে শীতের কষ্টটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে।

তখন নিজের ওপর রাগেই তার শরীর কিছুটা গরম হয়েছে।

এরপর ঠাণ্ডায় হঠাৎ দিনকতক অসুস্থই হয়ে পড়ল গুণী দত্ত। গায়ে হাতে পায়ে বেদনা, জ্বর, আর শীতের কাঁপুনি। কাজে আসাও বন্ধ। একরোখা জেদী লোক, তবু মনে মনে এবারে হালছাড়ার অবস্থা। অসুখে পড়ে থাকলে খাবে কি, ঘরভাড়া দেবে কি? ঠাণ্ডায় আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে, তবু কাঁপুনি থামে না। ঘর গরম করার গ্যাস-তাপের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু গ্যাস-স্লিটে ছ-পেনি করে না ফেললে সেটা চালু হবে না। পকেটে ছ-পেনি থাকলেও ওভাবে খরচ করার কথা ভাবতে পারে না।

সেই দারুণ শীতের এক রাতে জুলি স্যাণ্ডারসন তার ঘরে এসে হাজির।

কাজ ছিল না খুব, ছুটি নিয়ে চলে এসেছে গুণীডাটা অনুপস্থিত কেন দেখতে। তার ঠিকানা অপেরা হাউস থেকে পেয়েছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরবস্থাটাই খানিক উপলব্ধি করল। তারপর শয্যার একধারে বসল। গুণী দত্ত সেদিনও নিজের ওপরেই রেগে উঠেছে আর দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে পড়ে আছে। হঠাৎ দু চোখ ভেঙে জল আসতে চাইছে বলেই সব থেকে বেশি বিড়ম্বনা। বিড়বিড় করে বলল, বড় শীত, এই শীতটাই মেরে ফেললে।

নিজেও জানে, মনের জোর যত কমছে শীত ততো বাড়ছে।

জুলি স্যাণ্ডারসন আরো খানিক দেখল তাকে চুপচাপ। উঠে ব্যাগ খুলে গ্যাস-স্লিটে একটা ছ-পেনি ফেলল। তারপর গুণী দত্তর বিস্ফারিত চোখের সামনেই একটা কাণ্ড করল সে। ওভারকোটটা খুলে চেয়ারের উপর রাখল, গায়ের উলের জার্সিটা আর হাতের দস্তানা দুটোও খুলে ফেলল। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল।

সেই রাতে অনাত্মীয় বিদেশিনী নিঃস্ব মেয়ে জুলি স্যাণ্ডারসন তার বিকলপ্রায় হিম-দেহে জীবনের তাপ ছড়িয়েছিল। মৃত্যুর ঠাণ্ডা গ্রাস থেকে তাকে ছিনিয়ে এনেছিল বুঝি। গুণী দত্তর জীবনে এই অতি সাধারণ প্রথম নারী বড় বিচিত্ররূপিণী।

কোথা থেকে কি করে এরপর টাকা সংগ্রহ করেছে জুলি, সে-ই জানে। অপমান করতে চায়নি, বলেছে, ধার দিলুম, সুবিধেমত শোধ কোরো। তাই দিয়ে ওভারকোট কেনা হয়েছে, একটা মোটা উলের জামাও। ইনস্টলমেন্টে গরম ট্রাউজার বানাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে ওই মেয়েই।

নতুন উত্তাপের স্পর্শে মাটির ওপর আবার শক্ত দুটো পা ফেলে দাঁড়িয়েছে গুণী দত্ত। তার আবারও মনে হয়েছে, সে উঠতে পারবে, চলতে পারবে, যুঝতে পারবে।

তাই পেরেছিল। দ্বিগুণ উদ্যমে ছোটাছুটি করেছে। এজেন্টদের সঙ্গে দেখা করেছে। পোশাক বদলে চেহারার চটক ফিরেছে একটু, চলন-বলন বদলেছে। অবকাশ সময়ে জুলি স্যাণ্ডারসন তার ম্যাজিকের নিয়মিত পরীক্ষা নিয়েছে। যেন সে-ই ভালো-মন্দের বিচারক। এজেন্টদের নামের তালিকা সংগ্রহ করে তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘাড় ধরে ঠেলে পাঠিয়েছে তাকে। কিছু হল না শুনলে জুলি একটুও মন খারাপ

করেনি। আশার সম্ভাবনা দেখলে উৎফুল্ল হয়েছে।

এজেন্টদের মধ্যে এডওয়ার্ড উডের সঙ্গে যোগাযোগটাই পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। ভীরু নয় লোকটা, উচ্চাকাঙ্ক্ষীও। ভারতের যাদুবিদ্যার প্রতি কিছু শ্রদ্ধাও ছিল। স্বামী-স্ত্রী দুজনে, আবার কর্মসঙ্গিনীও তারা। স্বামীটির থেকেও গুণী দত্তকে বেশি পছন্দ হয়েছিল মিসেস জেনিফার উডের। তার মধ্যে সে-ই বেশি প্রতিশ্রুতি আবিষ্কার করেছিল।

কিন্তু একেবারে অভিজাত এলাকার বড় বড় যাদু রঙ্গমঞ্চে অনভিজ্ঞ নতুন লোককে দাঁড় করিয়ে দিতে সাহস করেনি উড দম্পতি। একবার হাস্যাস্পদ হলে নাম খারাপ, ভবিষ্যৎও খারাপ। অতএব যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য তারা ম্যাজিক দেখাবার কন্ট্রাক্ট দিলে। বিশেষ করে মজুর শ্রমিক নাবিক প্রভৃতি শ্রেণীর জন্যেই এই সস্তা রঙ্গমঞ্চ। অবিরাম কিছু না কিছু দেখানো হচ্ছে সেখানে, কেউ পনের মিনিট ক্যারিকেচার করছে, কেউ বিশ মিনিট গান করছে, কেউ বা আধ ঘন্টা নাচছে—এমনি সর্বক্ষণের কিছু না কিছু প্রোগ্রাম।

এডওয়ার্ড উড আশ্বাস দিল, ওখানকার দর্শকদের যদি ম্যাজিক দেখিয়ে খুশি করতে পারো, তখন বড় রঙ্গমঞ্চের কথা ভাবব।

কন্ট্রাক্ট পেয়ে গুণী দত্ত খুশি, জুলি স্যান্ডারসন আনন্দে আত্মহারা।

কিন্তু এজেন্টের কথার তাৎপর্য বোঝা গেল রঙ্গস্থলে এসে। গুণী দত্তর চক্ষু স্থির, জুলি স্যান্ডারসনেরও মুখ শুকালো। সেও নাচের প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছিল। এ-সব মঞ্চগুলো সম্বন্ধে তার ধারণাও কিছু ছিল। কিন্তু এজেন্ট গুণী দত্তকে প্রথমেই এমন বেপরোয়া দর্শকদের সামনে ঠেলে দেবে ভাবেনি। নিজের জন্যে ভাবে না সে, তার নাচের কদর হোক না হোক, যৌবনের হিল্লোল দেখলেই মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা থাকবে ওদের—শিষ দেবে, হৈ-হুল্লোড় করবে, বাহবা দেবে। কিন্তু গুণীডাটার কি হবে?

টিকিটের দাম যত সস্তাই হোক, সেই পয়সাও এসব জায়গার দর্শকরা যেমন করে হোক উশুল করবেই। চিড়িয়াখানায় গেটের কাছে জন্তু-জানোয়ারদের জন্যে যেমন ছোলা বুট কলা বিক্রি হয়, এখানে তেমনি পচা ডিম পচা টোমাটো পচা কলা বিক্রি হয়। দর্শকরা সে-সব দু পকেটে বোঝাই করে নিয়ে আসে খেলা দেখতে। প্রোগ্রামে যে কোনো শিল্পীর অনুষ্ঠান অপছন্দ হলেই হল। অমনি পচা ডিম পচা টোমাটো পচা কলার বৃষ্টি চারদিক থেকে। নাকাল নাস্তানাবুদ করে শিল্পীকে একেবারে স্টেজ থেকে তাড়িয়ে তবে তারা ক্ষান্ত হবে।

একটু আগের কৌতুকশিল্পীটির সেই দুরবস্থা দেখে গুণী দত্তর আত্মা খাঁচা-ছাড়া।

দর্শকদের হাসির খোরাক যোগাবার বায়না নিয়ে এসেছিল লোকটি। বয়েস বেশি নয়, কাঁচা মুখ—দেখলে মায়া হয়। কিন্তু দেখা গেল মায়া কারো হয়নি। এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার দ্বৈত ভূমিকা নিয়ে মঞ্চে নেমেছিল সে। তার হাতে দুটো মুখোশ ছিল। প্রণয়ীর ভূমিকার কথা বলার সময় পুরুষের মুখোশটা পরে, আবার প্রণয়িণীর উত্তর-প্রত্যুত্তরের সময় চট করে স্ত্রীমুখের মুখোশটা লাগিয়ে নেয়। প্রণয়ীটির বুকের তলায় প্রেমের ঝড় বইছে, আর প্রণয়িণীটি কথাবার্তায় হাবভাবে তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে

রমণীর প্রেম বড় মহার্ঘ্য জিনিস—দেশে দেশে শিগগীরই স্বর্ণমানের বদলে প্রেমমান চালু হবে। যার তবিলে যত বেশি রমণীর প্রেম, তার ততো সম্পদ। নিখাদ প্রেম নিখাদ স্বর্ণের থেকেও দুর্লভ। পুরুষটির আশা, শুধু নিখাদ প্রেম নয়, নিখাদ প্রেমের একটি আস্ত খনির মালিক হবে সে। তার জন্য শুধু প্রাণটুকু রেখে জীবন দিতে প্রস্তুত। প্রাণও দিতে পারত, কিন্তু সেটি দিয়ে দিলে প্রেম-খনি আর ভোগ করবে কে? রমণী তখন তাকে একে একে সেই খনি-সন্নিধানে পৌঁছুবার উপায় বাতলে দিচ্ছে—প্রেমিকা রত্নলাভের এক-একটা অব্যর্থ উপায়। প্রেমিকবর শোনে আর তড়কা রোগীর মত চমকে চমকে ওঠে।

শুনে হাসার কথাই। জুলি বেশ হেসেছিল। দুর্ভাবনা না থাকলে গুণী দত্তও হয়ত হাসত। কিন্তু দর্শকদের কাছ থেকে তেমন হাসির প্রেরণা আসছে না দেখেই সম্ভবত কৌতুকশিল্পীটি ঘাবড়ে গিয়েছিল। বার বার তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে গিয়ে রসের স্বতঃস্ফূর্ত যোগানদারিতে ছেদ পড়েছিল। সেই কারণেই হোক বা ঘন ঘন মুখোশ বদলানোটা একঘেয়ে লাগছিল বলেই হোক, একজন দর্শক প্রথম প্রতিবাদ জ্ঞাপন করল আচমকা তার মুখের উপরে একটা পচা টোমাটো ছুঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরা তাদের হাসার রসদ সংগ্রহে মেতে উঠল। করুণদশা কৌতুক-শিল্পী পিছন ফিরে তবু খানিকক্ষণ সহানুভূতি লাভের আশায় দাঁড়িয়েছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত পচা ডিম আর পচা টোমাটোয় ভূত সেজে স্টেজ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। এমন মর্মান্তিক কৌতুকের দৃশ্য আর বড় দেখা যায় না।

বিদেশী ছোকরা ম্যাজিসিয়ান গুণীডাটাকে তারা কি করবে?

গুণী দত্তর প্রোগ্রাম শেষের দিকে। নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর মুখে মঞ্চে এসে দাঁড়াল। গুঞ্জন কোলাহল থেমে গিয়ে দর্শকদের জোড়া জোড়া চোখ তার মুখের ওপর থমকালো। পরখ করে দেখতে লাগল তারা, লোকটা কি করে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সাত-আট মিনিট ধৈর্য ধরে দেখতে বা শুনতে তাদের আপত্তি নেই।

গুণী দত্ত মাথার টুপি খুলে সকলকে অভিবাদন জানালো, তারপর শূন্য টুপিটা সকলকে দেখিয়ে সেটা আবার মাথায় চাপিয়ে এক লাফে মঞ্চ থেকে দর্শকদের সামনে নেমে এলো। একজনের সামনে এসে মাথা থেকে টুপি খুলতেই দেখা গেল টুপির মধ্যে পচা ডিম গোটা দুই। সে-দুটো দুজনের হাতে দিয়ে শূন্য টুপিটা মাথায় চাপিয়ে আবার নামালো। এবারে টুপির মধ্যে পচা টোমাটো গোটাকয়েক। সেগুলোও একটা একটা করে বিতরণ করল। তারপর শূন্য টুপি মাথা থেকে নামাতে বেরুলো পচা কলা—তাও দিল।

যতবার টুপি পরছে আর নামাচ্ছে, টুপি থেকে বেরুচ্ছে শুধু পচা ডিম পচা টোমাটো আর পচা কলা। একটা টুপি থেকে কোন মন্ত্রে এত সব বেরুচ্ছে ভেবে না পেয়ে হকচকিয়ে গেল সকলে। তারা হাঁ করে চেয়ে থাকে, তারপর আরো বড় হাঁ করে টুপির উৎপাদন শক্তি দেখে। এই করে প্রথম এক সারির সমস্ত দর্শককে পচা ডিম পচা কলা আর পচা টোমাটো বিতরণ করে গুণী দত্ত স্টেজে উঠে এলো। দর্শকদের মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

গুণী দত্ত সকলকে আনত অভিবাদন জানিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, এতক্ষণে হয়ত আপনাদের রসদ ফুরিয়ে গেছে, আপনাদের আনন্দের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে তাই এগুলো সরবরাহ করে রাখলাম।

হাততালির ধুম পড়ে গেল। সেই হাততালি থামতেই তিন-চার মিনিট কেটে গেল আরো। এরপর বাকি সময়টুকু গুণী দত্ত যা দেখালে তাতেই আনন্দে উৎফুল্ল তারা।

উউ দম্পতির পরস্পরের মধ্যে নীরব ইশারা হয়ে গেল। লোকটা অবহেলার নয়, দর্শক বশ করতে জানে বটে। আর আনন্দে আত্মহারা জুলি স্যান্ডারসন সকলের সামনেই আদরে আদরে অস্থির করে তুলল গুণী দত্তকে।

এক নাগাড়ে এক মাস সেখানে নির্বিবাদে ম্যাজিক দেখিয়েছে সে। ক্রমশ দেখার মতই যাদুর খেলা দেখিয়েছে।

এরপর আস্তে আস্তে অভিজাত রঙ্গমঞ্চে খেলা দেখাবার সুযোগ এসেছে। এক সপ্তাহ বা দু' সপ্তাহের সাময়িক কন্ট্রাক্ট। ক্রমশ যাদুমহলে নাড়াচাড়া পড়েছে একটা, সাড়া জেগেছে। তার পলায়নী খেলা আর দাঁতে করে ছুটন্ত বুলেট ধরা নিয়ে যাদু-সাময়িকীতে লেখালিখি শুরু হয়েছে। সব থেকে আশ্চর্য, তার পলায়নী যাদু। যাদু-রসিকরা নানাভাবে এই খেলা অনেক দেখেছে, কিন্তু গুণীডাটার হাতে সেই সবই যেন মৌলিক মনে হয়েছে। চমক লেগেছে তাদের। ঘটা করে বিজ্ঞাপন ছড়িয়েছে উড দম্পতি, গুণীডাটা চিরবন্ধন-মুক্ত, গুণীডাটা মুক্তির দূত—কোনো জাগতিক বন্ধন, জাগতিক অবরোধ, হাতকড়া ডাণ্ডাবেড়ি তাকে আটকে রাখতে পারবে না—পলায়ন। যাদুকর গুণীডাটা পালাবেই!

দড়ি দিয়ে বহুরকম জটিল বাঁধনে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে, দেখা গেছে বাঁধন পড়ে আছে গুণীডাটা নেই। হাতে পুলিসের কঠিন হাতকড়া আর পায়ে ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে সেলের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে—গুণীডাটা বেরিয়ে এসেছে। থলের মধ্যে হাত-পা-বদ্ধ অবস্থায় পুরে থলের মুখ শিলমোহর করে বাঁধা হয়েছে—গুণীডাটা হাওয়া। তাকে প্যাকিং বাক্সে পুরে বাক্সের ডালায় পেরেক মেরে দেওয়া হয়েছে—পেরেক মারা বাক্স তেমনি পড়ে আছে, গুণীডাটা যেন বাতাস হয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

জীবনের এই অধ্যায় গুণী দত্তর শুধু খ্যাতিলাভের অধ্যায়ই নয়, নিবিষ্ট সাধনার অধ্যায়ও। একমাত্র প্রোগ্রামের সময় যাদুমঞ্চে ছাড়া আর কেউ তাকে বড় দেখতে পেত না। আহার-নিদ্রা ভুলে দিবারাত্র অনুশীলনে মগ্ন সে। সেই সাধনা দেখে উড দম্পতি মুগ্ধ, আর জুলি স্যান্ডারসন বোবা। নিজের কাজ ভুলে হাঁ করে জুলি এক-একসময় দেখে তাকে আর ভাবে, হাসিতে খুশিতে কথার ছটায় এভাবে দর্শক মাতিয়ে তুলতে পারে যে লোক, নিরিবিলি অনুশীলনের সময় তার এ কি তন্ময় মূর্তি!

উড দম্পতির চোখের মণি হয়ে উঠতে খুব সময় লাগেনি গুণী দত্তর। তারা ব্যবসা বোঝে আর মানুষের মূল্য বোঝে। শুধু লন্ডনে বসে থাকলে সেখানে নাম আরো চতুর্গুণ ফাটত গুণী দত্তর। কিন্তু তার বদলে দল গড়ে উড দম্পতি বহু জায়গায় ঘুরে বেড়াল তাকে নিয়ে। ভ্রাম্যমাণ ম্যাজিক প্রতিষ্ঠান ম্যাজিয়ুড কোম্পানি। বেলজিয়াম

হল্যান্ড সুইজারল্যান্ড প্যারিস ইটালি জার্মানি—ভ্রাম্যমাণ যাদুগোষ্ঠী নিয়ে দেশে দেশে দুহাতে টাকা রোজগার করে বেড়াল মিস্টার আর মিসেস উড। গুণী দত্তকেও বঞ্চিত করল না তারা। শুধু থাকা-খাওয়ার খরচ আর মোটা বেতনই নয়—চুক্তি অনুযায়ী লাভের অংশও দেয়। যেখানে যায় তারা, মাত্র কয়েকজনের ছোট দল নিয়ে যায়, তারপর প্রদর্শনী জমাট করার জন্য স্থানীয় মেয়ে-পুরুষ নিয়োগ করে। গুণী দত্তর যাদু-সঙ্গিনী হিসেবে জুলি স্যান্ডারসনও প্রায় বেশীর ভাগ জায়গাতেই ঘুরেছে, আবার সব জায়গায় যে গেছে তাও নয়। মরজি না হলে জুলি বেঁকে বসেছে, যাব না, তুমি যাও, ঘুরে এসো।

ছ'বছর বাদে গুণী দত্ত উড দম্পতিকে প্রস্তাব দিল, ইন্ডিয়া চলো, সেখানেই আপাতত ব্যবসা ফেঁদে বসা হবে। তারা ইতস্তত করেছিল প্রথম, শেষে তার ঝোঁক দেখে রাজী হয়েছে। গুণী দত্ত তাদের আশ্বাস দিয়েছে, ইন্ডিয়া দেশটা ছোট নয়, সেখানে হেসে খেলে এর থেকে অনেক বেশি পয়সা লুটতে পারবে তোমরা—আর না যদি যাও, তাহলে আমাকে ছাড়ো।

মিস্টার আর মিসেস উড শেষে মন বেঁধেই ভেসে পড়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু আসার আগে মুশকিল হল জুলি স্যান্ডারসনকে নিয়ে। দলের সঙ্গে সেও আসতে চায়। উড দম্পতি আপত্তি করেনি, উল্টে এডওয়ার্ড উড আসার জন্যে তাকে সাধাসাধিই করেছে। আপত্তি কারোরই করার কথা নয়, তবু গুণী দত্ত বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল এবার তাকে।

বলেছে, আমি হয়ত আর ফিরব না।

তাতে কী?

গুণী দত্ত সরাসরি বলতে পারেনি তাতে কি। বলেছে, তুমিও থেকে যাবে?

জুলি স্যান্ডারসন হেসে সারা, কেন, আমার ফিরতে বাধা কি। এরা যখন ফিরবে তখন ফিরব, ভালো না লাগলে আগেই ফিরব, টাকা তো দেবে তোমরা, না কি?

নিলে গুণী দত্ত অনেক টাকাই দিতে পারে এখন, তার নিশ্চিন্ত দিনযাপনের মোটামুটি একটা ব্যবস্থাও এডওয়ার্ড উডকে বলে করা যেতে পারে। কিন্তু কিছুই করা হল না, কিছুই বলা গেল না। তাকে নিয়ে আসতে বাধাটা কোথায় তাও মুখ ফুটে কখনো প্রকাশ করা যায়নি।

কিন্তু জুলি তা বুঝেছিল বোধ হয়। বলেছিল, আমি কি আমি তা জানি, আমার জন্যে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

শুনে বুকের কোথাও খচ করে লেগেছিল গুণী দত্তর। কিন্তু তবু চুপ করেই ছিল। তার সমস্যা অন্য রকমের। এত বড় ঋণের বিনিময়ে জুলি স্যান্ডারসনকে সে দয়া করতে চায়নি, কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে তাকে ধোঁকা দিতেও চায়নি।

জাহাজ অনেকক্ষণ থেমে আছে। যাত্রীদের কোলাহলও আর কানে আসছে না। রাতের মত যে যার শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে বা নিতে যাচ্ছে। আবছা অন্ধকারে গুণী

দত্ত ঘাড় ফেরাল, এদিকেই আসছে কেউ।

জুলি। তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।—কি আশ্চর্য, তুমি এখনো সেই একভাবে দাঁড়িয়ে! হাসল, এবারে কার শ্রীমুখ ভাবছ?

গুণী দত্ত সামনা-সামনি ফিরে রেলিংয়ে ঠেস দিল। হাসিমুখে বলল, এবারে একটি মেয়ের মুখই ভাবছি।

অন্ধকারে জুলির দু-চোখ তার মুখের ওপর থমকালো একটু। অস্ফুট শব্দ করে হাসল তারপর।—এতকাল বাদে দেশে ফিরছ, ভাবারই কথা, এত গোপন করার কি ছিল!

শুনে কি মনে হচ্ছে তোমার?

কিচ্ছু না। জুলির হাসিটা আরো স্পষ্ট শোনাল, বলল, তুমি ভয়েই গেলে দেখছি, আমার জন্যে তোমার ভয়ও নেই ভাবনাও নেই, এতকাল ভেসে এসেছি ইচ্ছে হলেই আবার দিব্বি ভেসে পড়ব। যাক্ কোন্ মেয়ের কথা ভাবছ বলো শুনি—

পদ্ম পাতায় জলের দাগ পড়ে না। জীবনের পাতায়ও ঠিক তেমনি দাগ না পড়ে পারে কিনা গুণী দত্ত জানে না। জুলি ভেসে পড়বে বলছে, কিন্তু ভাসারও তো একটা সময় আছে। কতকাল ভাসবে? বয়েস তো সাতাশ-আটাশ হল, কতকাল আর ভাসা সম্ভব? কিন্তু মেয়েটা ও-সব ভাবে না বলেই রক্ষা, ভাবলে এখনই তার ভাসার উৎসটাতে টান ধরত বোধ হয়।

হঠাৎ গুণী দত্ত দু'হাতের মধ্যে টেনে নিল তাকে। বলল, আমি এই মুখখানাই ভাবছিলাম।

তার দিকে মুখ তুলে হাসতে গিয়েও হাসা হল না জুলি স্যান্ডারসনের। নিবিড় বন্ধনে উষ্ণ-ঘন দুটো ঠোঁটের মধ্যে তার হাসিটা হারিয়ে গেল।

কতক্ষণ ছিল সেইভাবে হুঁশ নেই, হঠাৎ সচকিত দুজনেই। অন্ধকারে একটা আবছা মূর্তি চকিতে প্রস্থান করছে। জুলি ঠাওর করে উঠতে পারল না কে, কিন্তু গুণী দত্ত চিনেছে।

শুভেন্দু নন্দী। তারই খোঁজে এসেছিল বোধ হয়।

॥ ৪ ॥

সকাল হতে না হতে হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি। জাহাজ জেটিতে ভিড়ল একটু বেলায়, সঙ্গে সঙ্গে ছোটাছুটির ধুম পড়ে গেল। কতকালের একদল বন্দী যেন মুক্তির উল্লাসে মুখর হয়ে উঠেছে।

অনেকেরই আত্মীয়-পরিজন জাহাজে উঠেছে। গুণী দত্ত তার দলসহ নামবে, না চাঁদ সাহেবের জন্য অপেক্ষা করবে বুঝছে না। নেমে গেলে এরপর তার দেখা পাবে কোথায়? ঠিকানা অবশ্য জানে, কিন্তু তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হওয়া তো রীতিবিরুদ্ধ। আর চাঁদ সাহেব যদি এসেও থাকে, এত বড় জাহাজে চট করে তার দেখা পাওয়া সহজ নয়।

একে একে অনেকে নেমে গেল। যাবার আগে শুভেন্দু বিদায় নিতে এলো। গুণী দত্তর হাসি পেল, সঙ্কোচে শুভেন্দু মুখ তুলে সহজভাবে তাকাতে পারছে না তার দিকে।

চলি। তুমি কলকাতা আসছ কবে?

এ ক'দিনের অন্তরঙ্গতায় আপনি গিয়ে তুমি হয়েছে তারা। গুণী দত্ত তার চোখে চোখ রেখে হাসছে মিটিমিটি। বলল, দেখি, দেরি আছে। বম্বেতে প্রোগ্রাম আছে কয়েকটা। তারপর মাদ্রাজ দিল্লীতে আছে।

কলকাতায় এসেই আমাকে খবর দেবে তো?

কি বলো, দেব?

শুভেন্দুর মুখ আরো লাল হয়ে উঠল। কাল রাতে ওই পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়াটা গোপন নেই বুঝেছে। সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করে হাসিমুখেই জোর দিয়ে বলল, কলকাতা পৌঁছেই দেখা করবে বা খবর দেবে। বাড়ির ঠিকানাটা রেখেছ, না হারিয়ে ফেলেছ?

গুণী দত্ত ঘাড় নাড়ল, হারায়নি, আছে।

গুণীডাটা! গুণীডাটা! গুণীডাটা! মেরে দোস্ত, মেরে পেয়ারে—

শুভেন্দুকে হাত নেড়ে বিদায় দিচ্ছিল গুণী দত্ত, পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরে আদরের বন্যায় একেবারে ভাসিয়ে দিল চাঁদ সাহেব। ঠাস ঠাস করে দুগালে চুমু খেল গোটা পাঁচেক করে, বঙ করা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির গোছা তার থুতনিতে আর বুকে ঘষতে লাগল। গুণী দত্ত নাজেহাল।

মেরা দোস্ত! মেরা দোস্ত আ গয়া!

অন্য যাত্রীরা দাঁড়িয়ে পড়েছে কেউ কেউ, মিস্টার আর মিসেস উড অবাক, জুলি স্যান্ডারসনের দুই চক্ষু বিস্ফারিত। এমন আসুরিক অভ্যর্থনা তারা বোধ হয় আর দেখেনি।

চাঁদ সাহেবের উচ্ছ্বাসের প্রথম ধাক্কা কাটতে গুণী দত্ত তার সঙ্গী আর সঙ্গিনীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। চাঁদ সাহেবের মুখ গম্ভীর হঠাৎ, গাম্ভীর্যটা কৃত্রিম কিনা বোঝা গেল না। সঙ্গীদের ছেড়ে সঙ্গিনী দুটিকেই একদফা খুঁটিয়ে দেখলে সে। দেখাটা প্রায় বিসদৃশ। জুলি স্যান্ডারসন বড় বড় চোখ করে গুণী দত্তর দিকে তাকিয়েছিল। তার সেরা ম্যাজিক দেখেও হয়ত এত অবাক হয়নি কখনো। তার মনে হচ্ছিল এই অদ্ভুত-দর্শন লোকটা এবারে বুঝি বিশেষ করে তারই নাক মুখ চোখ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে করে পরখ করে দেখবে কোন্ শ্রেণীর জীব সে।

জাহাজ থেকে নামিয়ে সকলকে একটা হোটেলে এনে তুলল চাঁদ সাহেব। হোটেলে দোস্ত্-এর ছাড়া আর সকলেরই নাম লেখালে সে। গুণী দত্ত জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল সে থাকবে কোথায়, কিন্তু ভ্রূকুটি করে মাঝপথেই চাঁদ সাহেব থামিয়ে দিল তাকে। দলটিকে সেখানে রেখে তার একটা হাত বগলদাবা করে নিচে নেমে এলো।

কাস্টমস-এর ঝামেলা শেষ করে হোটেলে পৌঁছতে দশটা বেজে গেছে বেলা। গুণী দত্ত জাহাজেই স্নান সেরে নিয়েছিল। বলল, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্

এসো।

চাঁদ সাহেব আপত্তি করল না। কিন্তু বেজায় গম্ভীর তখনো। গুণী দত্ত বুঝে উঠছে না হঠাৎ হল কি! একটা কেবিনে বসল তাকে নিয়ে, খাবার অর্ডার দিল। তারপর কি ভেবে জিজ্ঞাসা করল, শরাব চলবে?

গাম্ভীর্যে ফাটল ধরল একটু।—রুপয়ে হ্যায়?

মুচকি হেসে গুণী দত্ত ঘটা করে মাথা নাড়ল। তারপর আবার বেয়ারা ডেকে চাঁদ সাহেবের মনের মতই অর্ডার দিল।

চাঁদ সাহেব দেখছে তাকে। মুখ নিরীক্ষণ করে দেখছে। দেখেই যেন সব সমাচার জেনে নেবে, শোনার কিছু দরকার নেই। খাবার এলো, পানীয় এলো। খেতে খেতে চাঁদ সাহেব পাঁচ মিনিটে ছ'বছরের সমাচার শুনে নিল। তার সমস্ত উৎসাহ নিভে গেছে যেন। মদের বোতলটার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, গড়পড়তায় মাসে এখন আর এক দিনও মদ খাওয়া হয় না, ছেড়েই দিয়েছে প্রায়।

গুণী দত্ত এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ্য করল চাঁদ সাহেবকে। এই ছ'বছরে লোকটা বেশ বুড়িয়ে গেছে। ফর্সা রঙে শুকনো তামাটে ছোপ ধরেছে।

বেশ শীর্ণ হয়েছে, নাকের দুপাশের হাড় দুটো উঁচিয়ে উঠেছে। অত সাধের আর যত্নের রঙ করা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতেও জট পাকিয়েছে। এক কথায় সেই প্রাণের জেল্লাটুকুই নেই আর।

আধাআধি খাওয়ার পর আরো কয়েক ঢোক তরল পদার্থ পেটে পড়তে একটু চাঙ্গা হল চাঁদ সাহেব। কিন্তু গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম ঘটল না।

উও ছোক্‌রি হ্যায় কওন্?

আচমকা আক্রমণের মত শোনালো প্রশ্নটা।—কার কথা বলছ?

উও যো মিস্ মিস্ না জানে কেয়া তুমনে কহা—

জুলি স্যান্ডারসন, দলের সঙ্গে এসেছে।

উ তো ম্যয়নে শুন লিয়া, মগর উও হ্যায় কওন্?

এ আবার কি উদ্ভট প্রশ্ন! আরও বিস্ময়, এই মেজাজই বা কেন চাঁদ সাহেবের? গুণী দত্ত চেয়ে আছে।

বোতলের কাঁচা মালই ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিল চাঁদ সাহেব। মদ আর মেজাজে মিশে আপাতত বাংলা আর বেরুবেই না জানা কথা। আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমহারে সাথ উসকি দিল্‌কী লপট্ হুয়ী ইয়া নহী?

বিস্ময় চেপে গুণী দত্ত হেসে জবাব দিল, হলেই বা তাতে কী?

বোলো তুম্।

দুর্বোধ্য হলেও লোকটাকে আর তাতিয়ে তুলল না সে, জানালো ম্যাজিকের দলের মেয়ে, দলের সঙ্গে কাজ নিয়ে এসেছে, এর মধ্যে দিলের ব্যাপার কিছু নেই।

মুহূর্তে তরল আনন্দে জ্বলজ্বলে চাঁদ সাহেবের সমস্ত মুখ। মেজাজ আর গাম্ভীর্য রসাতলে গেল।—সাচ্?

মাথা নাড়ল, সত্যি।

মাথাটা সরিয়ে না নিলে ওই মুখেই চাঁদ সাহেব আবার একটা চুমু খেয়ে বসত তাকে। ফুর্তির চোটে হাতের সামনে যা পেল তাই একরাশ মুখে ঢুকিয়ে দিল সে। তারপর খুশির আতিশয্যে গলায় ঢকঢক করে মদ ঢালতে লাগল। বোতলের ভাগ দোস্তকে সামান্যই দিল।

এই বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখে গুণী দত্ত হাঁ। ছ'বছরে কি ঘটেছে কিছুই ঠাওর করতে পারছে না। কি মনে পড়তে জিজ্ঞাসা করল, হোটেলে জায়গা নিলে না, আমি থাকব কোথায়?

বুক ফুলিয়ে চাঁদ সাহেব জবাব দিল, মেরে সাথ! মেরে গরীবখানেমে।

গুণী দত্ত অবাক, তার বাড়িতে থাকবে বলছে। চাঁদ সাহেবের কি নেশা ধরল?

বোতল খালি করে চাঁদ সাহেব হাসতে লাগল হি-হি করে, বলল, বহুত দিনোঁকে বাদ এ্যায়সে খুশি-খুশি খানা খায়া।

একটু বাদেই কি খেয়াল হল তার। মুখ ছেড়ে ফরসা গাল দুটো দিয়েও হাসি চুয়ে চুয়ে পড়ছে মনে হল। কিছু যেন রোমন্থন করছে। জিজ্ঞাসা করল, তুম্‌নে এক কাহিনী বয়ান কিয়া থা, কি তওয়ারীখ্ কী (পুরাণের) কিসী হরীকো কোই যাদুগর উড়াকর্ লে আয়া থা—উও আদমী কওন্ থা?

গুণী দত্ত বলল, আদমী-টাদমী কেউ নয়, সে খোদ শয়তান।

হাঁ হাঁ ঠিক। হাসি উছলে উঠেছে, অওর কওন্ থী উও হুরী?

হেলেন।

আঃ হা! হেলেন! ছদ্ম-গাম্ভীর্যে সোজা হয়ে বসল হঠাৎ।

ম্যয়ভী তো এক শয়তান হুঁ, বহুত জবরদস্ত্ শয়তান! ম্যায়ভী তুমহে ম্যাজিক দেখলাউঙ্গা। তুম্ কেয়া বিলায়েত সে ম্যাজিসিয়ান বন্‌কর আয়ে হো, মেরী হেলেন কা খেল্ দেখো। শিরিন, হেলেন—হেলেন, শিরিন—

গুণী দত্ত চেয়ে আছে। মাথার কিছু গণ্ডগোল হয়েছে কিনা দেখছে। আর যত দেখছে ততো খলখল করে হাসছে চাঁদ সাহেব। এমন একটা মজার পরিস্থিতি যেন জীবনে আর সৃষ্টি করেনি সে।

গুণী দত্ত যতটা সম্ভব নিস্পৃহ মুখেই জিজ্ঞাসা করল, তোমার এই হেলেনটি কে?

শিরিন!...শিরিন, হেলেন। হেলেন, শিরিন—শিরিন শিরিন শিরিন!

উঠে দাঁড়িয়ে হাসির দমক সামলাতে চেষ্টা করল চাঁদ সাহেব।

তারপর খপ করে তার জামার বুকের কাছটা মুঠোর মধ্যে ধরে এক টান।

আ যাও, খেল্ দেখো।

বাহাত্তরে বাইশ বছরের মেয়ের প্রেমে পড়ার নজির আছে। অতনু-শরে দু'চারটে বাহান্ন-বাষট্টির কল্‌জে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হতে গুণী দত্ত নিজের চোখেই দেখেছে। বাংলা দেশের মফঃস্বল শহরে মানুষ, অ-সম যৌবনের প্রজাপতি নির্বন্ধ দু'চারটে ছেড়ে দু'চার ডজন দেখাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু এই তিরিশের কোঠায় পা দিয়ে, দেশ-বিদেশের বহু ঘাটের জল খেয়ে,

বহু বৈচিত্র্যের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে শেষে হঠাৎ এক সতের বছরের মেয়েকে দেখা মাত্র প্রেম-জ্বরে হুমড়ি খেয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত গুণী দত্তর জানা নেই। না, প্রথম দর্শনে গুণী দত্ত প্রেমে পড়েনি। তার পরের শতেক দর্শনেও না।

কিন্তু প্রথম দর্শনে অভিভূত হয়েছে। আর তার পরে যতবার দেখেছে ততবার। বিস্ময় বিলানো পেশা যার, এক অননুভূত বিস্ময়ের ধাক্কায় তারই চোখ ধাঁধিয়েছে। চাঁদ সাহেবের এই নাটকের জন্য গুণী দত্ত একটুও প্রস্তুত ছিল না।

প্রস্তুত মেয়েটাও ছিল না।

সামনের বড় ঘরটার অন্য প্রান্তের দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে মেয়েটা। চাঁদ সাহেবেরই একটা ধোওয়া পাজামা হাতের পালিশে টান করে ভাঁজ করছিল। জোড়া পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো।

সেই মুহূর্তে এই বিস্ময়ের ধাক্কা। গুণী দত্ত হকচকিয়ে গেল। ছ'বছরের বিলেত-দেখা রুচিজ্ঞানে এ-ভাবে চেয়ে থাকাটা সুশোভন কিনা তাও খেয়াল হল না। নাটকের নিয়ামক চাঁদ সাহেব পাকা ম্যাজিসিয়ানের মতই বিস্ময়ের পরদাটা সরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দ কৌতুকে অবগাহন করছে। মেয়েটা জানত বোধ হয় কেউ আসছে, কেউ আসবে। ঘরের মধ্যে হঠাৎ এক অপরিচিত পুরুষ-পদার্পণের সঙ্কোচ নেই, কে এলো সেই প্রশ্নও নেই চোখে। যে এলো তাকে সে দেখছে।

দেখা ঠিক নয়। কোনো স্বপ্নের গাছের এক নাম-না-জানা ফুল যেন সদ্য পাপড়ি মেলে তাকিয়েছে। নিজের রহস্যও যে ভালো জানে না, তবু গোটাগুটি বিকশিত হতে ভয়। অবিশ্বাসের ছোঁয়ালাগা সঙ্কোচ আর বিস্ময়।

গুণী দত্তর হুঁশ নেই, তবু একটু বাদেই অন্যরকম মনে হয়েছে অদূরবর্তিনীর চাউনিটা। মেয়েটি তার মুখের ওপর থেকে আয়ত-পক্ষ্ম গভীর দুচোখের মায়া সরিয়ে ক্ষণকালের জন্য একবার চাঁদ সাহেবের মুখের ওপর রেখেছিল যখন—তার পরেই। সেই দৃষ্টি আবার যখন ফিরেছে, গুণী দত্তর চকিত-বিভ্রান্ত বিমূঢ় মুখের ওপর সপ্তদশীর দু'চোখের প্রথম জাগরণ অন্যরকম লেগেছে। এই চাউনির নরম দিকটার সঙ্গে একটু একটু করে যেন তাপ মিশেছে। ভোরের প্রথম লাল সূর্যের জবাকুসুম রঙ দেখতে দেখতে যেভাবে সাদার দিক ঘেঁষে, অনেকটা সেই রকম।

নীরব নাটকের এই পর্যায়ে চাঁদ সাহেব শব্দ না করেও হ্যা-হ্যা করে হাসছিল আর মজা দেখছিল। তার লালচে মুখের থলথলে গাল দুটোও ভেজা-ভেজা লাগছিল, পুরু ঠোঁট দুটো আরো বেশি। রঙ করা ফ্রেঞ্চকাট পাকা দাড়ির ঝোপে যেন আগুন লেগেছে। সেই আগুন-রাঙা দাড়িও উদগত রসের বন্যায় ভেজা-ভেজা মনে হয়েছে।

মেয়েটা হঠাৎ আবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো চাঁদ সাহেবের দিকে। এক নজরে মুখ থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত দেখে নিল। হাসি গিলতে গিলতে চাঁদ সাহেব থতমত খেয়ে উঠল এক দফা। তারপর তার চোখ এড়িয়ে দোস্ত্‌এর দিকে চেয়ে আরো জোরেই হেসে উঠল।

মেয়েটা এক ঝলক আগুনের মত এগিয়ে এলো চাঁদ সাহেবের দিকে। গুণী দত্তর এক হাতের মধ্যে। চাঁদ সাহেবের গা ঘেঁষে, বুক ঘেঁষে দাঁড়াল। ফলে চাঁদ

সাহেব সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়াবার অবকাশ পেল না, মাথাটাই শুধু যতটা সম্ভব অন্যদিকে ঘুরিয়ে হাসতে লাগল তেমনি।

মুখোমুখি চোখাচোখি হলেই মজা মাটি যেন। হাসির আওয়াজ কমে আসছে, কিন্তু তোড় বাড়ছে—হাসির দমকে চাঁদ সাহেবের জালার মত পেটটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

মেয়েটির মাথা চাঁদ সাহেবের মাজা থেকে চার আঙুল ওপরে। একটা হাত বাড়িয়ে চাঁদ সাহেবের দাড়িসুদ্ধ গাল ধরে তার গোটা মুণ্ডুটাই নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল সে। তার ঘোলাটে দুই চোখের মধ্যে মেয়েটার দুটো গভীর কালো তারা আস্তে আস্তে বিঁধে গেল ; চাঁদ সাহেব আর হাসতে পারছে না, হাসতে চেষ্টা করছে শুধু।

ছেড়ে দিল। গুণী দত্তর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ওই অতল-গভীর কালো চোখের তারা থেকে একটা তপ্ত ঝাপটা এসে লাগল যেন মুখের ওপরে। তারপরেই যেভাবে সে এগিয়ে এসেছিল চাঁদ সাহেবের দিকে ঠিক তেমনি ত্বরিত তীক্ষ্ণ পায়ে ঘর ছেড়ে বারান্দার আড়ালে চলে গেল।

গুণী দত্ত যথার্থই ম্যাজিক দেখে উঠল।

এতক্ষণে চাঁদ সাহেব হাঁফ ফেলে বাঁচল। সে যেন কিছু একটা অপরাধ করে এসেছে, সেই অপরাধ চাপা দেবার চেষ্টা করছিল এতক্ষণ। তার লালচে মুখে চাপা খুশি উপচে উঠতে লাগল। গুণী দত্তর পাঁজরের কাছে কনুইয়ের একটা গুঁতো দিয়ে বলে উঠল, দোস্ত, বিজলী চমক গয়ী। দেখা মেরা ম্যাজিক? তুমহারী তওয়ারীখ কী ছুরী সে অচ্ছি হ্যায় ইয়া নহী?

গুণী দত্ত অস্বীকার করল না, জবাবও দিল না। জিজ্ঞাসা করল, ও কে?

শিরিন।

শিরিন কে?

ব্যয়ঠো ইধার, শিরিন,—শিরিন,—অওর কওন।

ঘরের একধারে একটা ছোট টেবিল পাতা, তার ওপর পরিষ্কার টেবিল-ক্লথ। মনে হয় এটা ডাইনিং টেবিল। দুদিকে দুটো চেয়ার। গুণী দত্ত সমস্ত ঘরটাতে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। লক্ষ্য করলে অসচ্ছলতা চোখে পড়ে, কিন্তু তারই মধ্যে পরিচ্ছন্ন রুচিবোধটুকুও দৃষ্টি এড়ায় না। ঘরের দুকোণে দুটো ছোট ছোট নেয়ারের খাটিয়া পাতা, শয্যা পরিষ্কার রঙিন চাদরে ঢাকা। দুদিকে দুটো ছোট আলনা, একটাতে চাঁদ সাহেবের গোটা দুই পাজামা, কোর্তা। অন্যটাতে সালোয়ার কামিজ ইত্যাদি। এই ঘরেই যাবতীয় গৃহস্থালী। বেশ সুপটু হাতের গোছানো সব।

গুণী দত্ত জিজ্ঞাসা করল, এই একটাই ঘর নাকি তোমার?

এ-সময় এই গদ্যাকারের প্রশ্ন চাঁদ সাহেবের ভালো লাগলো না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, এক ভী জুটানেকা মুরদ নহী। তারপর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে বসল, উও বাত ছোড়ো, লড়কী পসন্দ হুয়া ইয়া নহী?

গুণী দত্তর ভিতরে ভিতরে অজ্ঞাত অস্বস্তি একটা। গোড়া থেকে চাঁদ সাহেবের ধরন-ধারণ হেঁয়ালির মত লাগছে। জুলি স্যান্ডারসনকে মনের জন সন্দেহ করার ফলে

রেস্তরাঁয় তার ওই মূর্তি, এতকাল অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও এই প্রথম তাকে ঘরে টেনে নিয়ে আসা, তারপর এখন এই প্রশ্ন। মদের আমেজ কেটে আসছে হয়ত, টেবিলের ওপর বুক ঠেকিয়ে ঝুঁকে তার দিকে চেয়ে আছে। এই এক জবাবের ওপর যেন অনেক কিছু নির্ভর করছে।

আমার পছন্দ-অপছন্দয় কি যায় আসে?

বোলো তুম্। সেই চিরাচরিত অসহিষ্ণুতা।

খুব সুন্দর। কিন্তু মেয়েটি রাগ করে বেরিয়ে গেল মনে হল?

চাঁদ সাহেব হাসতে লাগল। তার কিছু একটা দুর্ভাবনা গেছে। মেয়েটির সম্বন্ধে এই প্রশংসাই শুনতে চাইছিল হয়ত। একমুখ হাসিতে আনন্দ গলে গলে পড়তে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে মাথা নাড়ল, বহুত বিগড় গয়ী।

কেন?

সরাবকে লিয়ে।

গুণী দত্ত অবাক। বসন্তের কোকিল ডাকবে না, পূর্ণিমার চাঁদে জ্যোৎস্না ভাঙবে না, আর চাঁদ সাহেব মদ খাবে না—সব প্রায় একই ব্যাপার। গুণী দত্তর মনে আছে, চাঁদ সাহেবের চোখের মণি সেই সিন্ধি রমণীটির জীবিত কালেও মদ নিয়ে কারো দ্বিধা বা ভ্রূকুটি সে বরদাস্ত করেনি। এক সতের বছরের মেয়ের বিরাগের ভয়ে সে-ই কিনা চোরের মুখ করে হাসছিল তখন।

গুণী দত্ত নিঃসংশয়, মেয়েটাকে নিয়ে চাঁদ সাহেবের মতলব আছে কিছু। অন্যথায় তাকে ঘরে ধরে আনত না, তার এই আচরণ দেখত না। এবারে খুব ধীর গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটি কে?

মদের নেশা সম্পূর্ণই ছুটেছে বোধ হয়, তেমনি ভারিক্কি গাম্ভীর্যে চাঁদ সাহেব বাংলায় জবাব দিল, আমার মেয়ে।

বুকের ওপর ভারী বোঝার মত কি একটা চেপে বসেছিল এতক্ষণ, সেটা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই জবাবটাও অবাক হবার মতই, কিন্তু এ বিস্ময়ে অস্বস্তি নেই। বার্ধক্যের নতুন শিকার কিনা ভেবে গুণী দত্ত রীতিমত ধাক্কাই খেয়েছিল একটা।

চাঁদ সাহেব এবারে আরো জোর দিয়ে বলল, দেড় বছর বয়সে আমার কাছে এসেছে, তারপর এই ষোল বছর ধরে মেয়ের মত দেখেছি, মেয়ের মত বড় করেছি—মা'টা বেইমানী করে মরে গেল, তার পরেও বুকে করে আগলে আছি—মেয়ে নয় তো কী?

যেন মেয়ে কিনা সেই সংশয় গুণী দত্তই প্রকাশ করেছে। এবার সম্পর্কটা বোধগম্য হল। সেই সিন্ধি রমণীটিকে যে স-কন্যা হরণ করে এনেছিল চাঁদ সাহেব, জানত না। কেউ জানত না। এই মেয়েটাকে দেখার পর সেই রমণীটিকে একবার চোখের দেখাও দেখেনি ভেবে আজ এতকাল বাদে আবার নতুন করে আফসোস হল গুণী দত্তর। মনে মনে হিসেব করে নিল একটু, মিথ্যে অনুমান করেনি, ষোল আর দেড়-এ সাড়ে সতের মাত্র বয়েস। কিন্তু গুণী দত্তর আসলে কোন বয়স চোখে পড়েনি, চিত্ত বিভ্রান্ত করার মত কোনো নারীও না। কি যে চোখে পড়েছে সেটাই মনে মনে

হাতড়ে বেড়াতে লাগল এখন।

স্মৃতির তাড়নায় চোখ পাকালো চাঁদ সাহেব, বলল, পাছে কেউ ছিনিয়ে নেয় সেই ভয়ে ওকে নিয়ে কুকুরের মত পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে আমাকে, জানো? তোমাদের ছেড়ে, রোজগার ছেড়ে, কলকাতা থেকে গা-ঢাকা দিলাম কেন? ওরই জন্যে তো। জানো তোমরা?

জানত না, জানল। সবিস্ময়ে শুনল। মেয়ের বাপ মেয়েকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিল তার কাছ থেকে। বাপ জানবে না কেন, সেই দুশমনটার কাছ থেকেই খবর জেনেছিল সব। যে লোকটা শিরিনের মাকে টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল তার কাছ থেকে। দুশমনটাও তো করাচিরই লোক, আগে থাকতেই চেনা-জানা ছিল—সবই জানত। মা-টাকে হাত করা গেল না সেই রাগে বাপকে গিয়ে লাগিয়েছে সব। বাপটা তার আওরতকে আর উদ্ধার করতে চায়নি, সে যে বেহেস্তে চলে গেছে তাই জানত না—মেয়েটাকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল। নিজে আসতে সাহস করেনি, তার পিয়ারের কোন লোক পাঠিয়েছিল।

সে ব্যাটা চুপিচুপি দেখা করেছিল চাঁদ সাহেবের সঙ্গে। ভেবেছিল ওই মেয়েটাকে রেখে আর কি করবে, কিছু টাকা পেলেই দিয়ে দেবে। দিল না দেখে শেষে চোখ গরম করেছে, বলেছে, মা-মেয়ে দুজনকেই খোয়াতে হবে তাহলে।

শুনে চাঁদ সাহেবের খুব ফুর্তি হয়েছিল, আর সেই ফুর্তির চোটে একটা ভুল করে বসেছিল। বলে ফেলেছিল, সেই আওরত এখন খোদাতালার বাঁদীগিবি করছে, সেখান থেকে আর কারো বাঁদী হতে সে আসবে না।

লোকটা অবাক হয়েছিল। কিন্তু তারপর ঠাট্টা করে এমন একটা কথা বলেছিল যে চাঁদ সাহেব মারতে গিয়েছিল তাকে। সে কথা মনে পড়তে এতকাল বাদেও তার জরা-ছোঁয়া চোখ ঝলসে উঠতে দেখল গুণী দত্ত। লোকটা নাকি বাঁদরের মত হেসে বলেছিল, লাজবন্তী নরকে পাপীদের বাঁদীগিরি করছে এখন।

ঝোঁকের মাথায় এই প্রথম রমণীর নামও বলে ফেলল চাঁদ সাহেব। লাজবন্তী। গুণী দত্তর মনে হল, যে নেই সে তো নেই-ই—কিন্তু, এই একটা নামও বুকের তলায় লালন করার মত।

পরের সমাচার অনেকটা সেই প্রথম দুশমনের লাজবন্তীকে করায়ত্ত করার চেষ্টার মতই। কদিন বাদে এই লোকটাও আবার এসেছে—মেয়ের বাপকে টেলিগ্রামে খবর দিয়েছিল বা নিজেই হাওয়াই জাহাজে উড়ে গিয়েছিল করাচিতে। তারপর ক'দিনের মধ্যেই আবার এসে মোটা টাকার টোপ ফেলেছে। বলেছে, ওইটুকু মেয়েকে রেখে তুমি করবে কী?

মগজের ঘিলু দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল চাঁদ সাহেবের, মেয়ের বাপের কথা মনে হতে আরো রাগ হয়েছে, বলেছে, লড়কী কালে বহুত খুপসুরত আওরাত হবে, বেহেস্তের হুরীদের মুখ কালো হয়ে যাবে তাকে দেখলে, সেই জন্যেই পুষেছে, আর সেই জন্যেই ছাড়বে না।

কিন্তু কথা বলে বা চোখ রাঙিয়েই হটানো যায়নি লোকটাকে, মেয়েটাকে নিয়ে

না যেতে পারলে মনিবের কাছে তার ধন মন প্রাণ সব খোয়া যাবে। নাকের ডগায় নোটের তাড়া দুলিয়েছে। শাসিয়েছেও, মেয়ে না দিয়ে সে পার পাবে না, মাঝখান থেকে মেয়ে আর টাকা দুই-ই ফসকাবে।

গণ্ডগোলে যে পড়বে সেটা চাঁদ সাহেব হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিল। ঠাণ্ডা মাথায় অনেক ভেবে সে মেয়েটাকে দিয়ে দিতে রাজী হয়েছে। লোকটার কাছ থেকে অর্ধেক টাকা আগাম নিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। তাকে বাড়িতে ডেকে খানাপিনার আয়োজন করেছে। খাঁটি বিলিতি দু'বোতল মদ দুজনে সাবাড় করেছে। তারপর চাঁদ সাহেব তার কাছে একটা আরজি পেশ করেছে। পরের দিনটা লাজবন্তীর জন্মদিন--সেই দিনটা গেলে লাজবন্তীর মেয়ে তার হাতে দিয়ে দেবে। ওই একটা দিনের জন্যে শুধু বন্ধুকে সবুর করতে হবে, মেয়েটাকে না দেখলে লাজবন্তীর স্মৃতি সেভাবে মনে জাগবে না—তার কলজে খাক হয়ে যাবে তাহলে।

অতখানি মদ পেটে পড়তে লোকটা অবিশ্বাস করেনি। চাঁদ সাহেব হেসে বাঁচে না, নতুন বন্ধুর শোকে প্রায় কাঁদ-কাঁদ মুখ নাকি তার। এক কথায় রাজী হয়েছে। বাকি অর্ধেক টাকার আরো কিছুটা হাতিয়ে নেবার জন্যে হাত নিশপিশ করলেও পাছে অবিশ্বাস করে, সেই ভয়ে সে চেষ্টা আর করেনি চাঁদ সাহেব।

ব্যাস, তারপর একদিনের মধ্যেই চিড়িয়া সুদ্ধু হাওয়া। ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসতে লাগল চাঁদ সাহেব, যেন সদ্য দু'দশ দিন আগের ঘটনা।

গুণী দত্ত সবিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে তাকেই দেখছে না, হৃদয়যন্ত্রের ওপর কোন দুর্নীরিক্ষ শিল্পীর প্রায়-দুর্বোধ্য কারিগরীও দেখছে। লোকটার নিজের ঘর ছিল একদিন, স্ত্রী পুত্র কন্যা সংসার সবই ছিল। কিন্তু কোনদিন তো কিছু হারানোর যাতনা দেখেনি মুখে। অথচ সে-ই কিনা রক্তের সম্পর্ক-শূন্য আর একজনের একটি শিশুকে বুকে নিয়ে টাকার লোভ ছেড়ে সংস্থান ছেড়ে অতি সহজে নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মেয়েটার মায়ের জন্যে হলেও না হয় মোহ বলা যেত। কিন্তু এর নাম কি?

চাঁদ সাহেব হঠাৎ আবার টেবিলের ওপর দিয়ে তার মুখের কাছে ঝুঁকে এলো খানিকটা।—ঠিকসে বোলো দোস্ত্, অমন মেয়ে তুমি হাজারের মধ্যে একটা, লাখের মধ্যে একটা দেখেছ? তোমার ওই বিলেতেও দেখেছ?

দেখেছে কি দেখেনি সে-চিন্তা একবারও মনে এলো না। বিশ্বাসযোগ্য ভাবেই মাথা নাড়ল। দেখেনি।

মদের নেশা ছুটেছে না জানলে আর মুখ দিয়ে পরিষ্কার বাংলা না বেরুলে চাঁদ সাহেবের এই তুষ্টির হাসি একটুও স্বাভাবিক মনে হত না। অত হাসির নিচে যেন খানিকটা কান্না থিতিয়ে আছে, হাসিটুকু সব উবুড় করে ঢালা হয়ে গেলে তলানীর মত কান্না গড়াবে।

—দেখবে কোত্থেকে দোস্ত্, উৎসাহে গলা চড়ল, আমিও তো কম জায়গা চষে তবে এই বোম্বাইয়ে এসে ডেরা বাঁধিনি, ওর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এমন একটা মেয়েও চোখে পড়েনি। আর দু'চারটে বছর গেলে কেমন হবে বলো দেখি!

গুণী দত্ত হেসে ফেলল। চাঁদ সাহেব আরো উৎফুল্ল। আর—নামটা? শিরিন। নামটা আমার দেওয়া, বুঝলে দোস্ত? মেয়েটার ছ'বছর বয়সে ওই নাম দিয়েছিলাম, তার আগে তোমাদের কি ওই হিজিবিজি হিন্দু নাম ছিল—এখন বোঝ কেমন নাম দিয়েছিলাম—শিরিন শিরিন শিরিন—কেমন? আর কোনো নামে মানায়?

গুণী দত্ত তক্ষুনি মাথা নাড়ল, মানায় না। খুব যে চাটুকারিতা করছে তাও নয়। নামটা শোনার পর অন্তত অন্য নাম মনে ধরার কথা নয়। অন্য নামে ওই আলো ঝলসায় না।

অতঃপর সদ্য বর্তমানের দুশ্চিন্তা জ্ঞাপন করল চাঁদ সাহেব। কিন্তু এই দুশ্চিন্তার ছায়ার তলায়ও আনন্দ উপচে উঠছে। মেয়েটাকে নিয়ে সম্প্রতি নাকি বেশ ভাবনায় পড়ে গেছে চাঁদ সাহেব। যত দিন যাচ্ছিল তত ভাবনা বাড়ছিল। পথেঘাটে তো ওরকম মেয়ে দেখা যায় না, ছেলে-ছোকরাগুলো হামেশাই ঘুরঘুর করে বেড়ায়। ছেলে-ছোকরাদের আর দোষ কি, তাদের বাপ-দাদারাই পারলে কাছে ঘেঁষে। দিনরাত মেয়ে আগলে আগলে প্রাণান্ত, এখন দোস্ত এসে গেছে, এবারে চাঁদ সাহেব খানিকটা নিশ্চিন্ত।

গুণী দত্ত ভিতরে ভিতরে নাড়াচাড়া খেল একটু। কি যে বলতে চায় ঠিক বুঝল না। এমনিতে খটকা লাগার কথা নয়, কিন্তু সকাল থেকে চাঁদ সাহেবের অনেক আচরণ, অনেক কথাই রহস্যের মত লেগেছে। তার স্বভাববিরুদ্ধ অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে সে। সব থেকে বড় কথা, শিরিনকে তার কাছে দুর্লভ রত্নের মতই কিছু প্রতিপন্ন করার আগ্রহ তার প্রতি কথায় প্রতিটি ইঙ্গিতে স্পষ্ট।

গুণী দত্ত বলল, আমি আর ক'দিন আছি এখানে, বড় জোর দিন পনের।

চাঁদ সাহেবের রঙ-করা দাড়ি নাড়া থামল হঠাৎ, কপালের খসখসে লালচে চামড়ায় ভাঁজ পড়ল কয়েকটা, ঘোলাটে চোখ দুটো ওর মুখের ওপর থমকে রইল খানিক।

তারপর বলল, বিলেত থেকে তুমি একটি বুদ্ধু বনে এসেছ।....নাকি দেমাক হয়েছে?

প্রথমে বোঝেনি, শেষে অনুপ্রাস শুনে লজ্জা পেল। গুণী দত্ত ভাবল, সাদা অর্থেই বলেছিল চাঁদ সাহেব কথাটা। দোস্ত আসায় সে নিশ্চিন্ত হয়েছে, কারণ এর পর থেকে সে-ও দোস্ত্‌এর সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। স-কন্যা সে এবারে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় পেয়ে গেছে এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল নিশ্চয়। অথচ গুণী দত্ত সে-সম্বন্ধে কোন উৎসাহ না দেখিয়ে বোকার মত নিজের চলে যাওয়ার কথাটাই কিনা বলে বসল।

কিন্তু তবু মন বলছে চাঁদ সাহেব এই স্থূল স্বার্থের দিকে চোখ রেখেই এমন সাদর অভ্যর্থনায় আজ ঘরে এনে তোলেনি তাকে। সে বিলিতি দল নিয়ে দেশের মাটিতে পা দিয়েছে সেই জন্যেও নয়। তার মনের তলায় অন্য অভিসন্ধি আছে।

চাঁদ সাহেব আর কিছু বলেনি। মেয়েটা সেই যে রাগ করে বাইরে চলে গেছে, আর একবারও এ-ঘর মাড়ায়নি। হয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, নয়ত এ-বাড়ির কোনো সঙ্গিনীর ঘরে গিয়ে চুপচাপ বসে আছে।

উঠে দেখতে গেল চাঁদ সাহেব।

সেই দিকে চেয়ে গুণী দত্তর আবারও মনে হল, চাঁদ সাহেব বুড়িয়েই গেছে। বয়েস পঞ্চান্ন হল বলে নয়, এর থেকে দু-যুগের ওপর প্রাচীন হলেও ভিতরটা এক ধরনের কাঁচাই থেকে যাবে আশা করেছিল। হঠাৎ দেখলে মনে হবে সেই কাঁচাই আছে। কিন্তু গুণী দত্ত এই একজনের ভিতরটা দর্পণে দেখে রেখেছে। মনে হচ্ছে কোথায় যেন তফাত। ঠিক ঠাওর করতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে বুড়িয়েই গেছে লোকটা। অত সাধের লালচে দাড়িতে কালচে জট পাকিয়েছে, মুখের লালচে চামড়ার জ্যোতি গিয়ে খড়খড়ে মোটা হয়েছে। এমন কি, মনে হল, মেয়ের খোঁজে তার উঠে যাওয়াটাও কেমন যেন শ্রান্ত, কষ্টক্লিষ্ট।

॥ ৫ ॥

ক'টা দিন ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লীর শো-এর প্রোগ্রাম সাগরপারের থেকেই স্থির হয়েছিল। অবশ্য দিন-ক্ষণ ঠিক ছিল না, কোন সময় নাগাদ প্রোগ্রাম ফেলা যেতে পারে তার একটা মোটামুটি সময় নির্দিষ্ট ছিল শুধু। এ ধরনেব সংগঠনের ব্যাপারে উড দম্পতির কাজ পাকা। মেসার্স ম্যাজিয়ুড কোম্পানি বিশ্ব যাদুরাজ্যের যে এক নামজাদা ভ্রাম্যমাণ প্রতিষ্ঠান সেটা তাদের প্রচারের চটক আব পত্র-বিনিময়ের সমারোহ দেখলে স্বীকার না করে উপায় নেই। যাদু রঙ্গমঞ্চের পৃষ্ঠপোষকদেব ও ধরনের টোপ না গেলাটাই আশ্চর্য।

বোম্বাইয়ে পদার্পণ করার আগেই পয়সা ছড়ানো হয়েছে সেখানকার নামকবা খবরের কাগজের আনন্দানুষ্ঠান-বিজ্ঞাপনের পাতায়। প্রথমে ম্যাজিয়ুড কোম্পানির যাদু কর্ণধার গুণীডাটার ছবি, তার ডাইনে বাঁয়ে মিস্টার আর মিসেস উড হাসছে—নিচে অধোমুখী জুলি স্যান্ডারসন। অমন চোখে পড়ার মত বিজ্ঞাপনের সঙ্গে দলটির যে প্রচার-বিবৃতি পাঠানো হয়েছে, কাগজের কর্মকর্তারা স্বভাবতই তা ছাপতে দ্বিধা কবেনি। শুধু এ-দেশে নয়, সর্বত্রই এ-রকম হয়ে আসছে। একটা খাস বিলিতি দল এক ভারতীয় যাদুকরকে শীর্ষশিল্পী করে একের পর এক দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক মস্ত আকর্ষণের ব্যাপার তাই। বিদেশে তো কত লোক ভারতবর্ষকে শুধু যাদুর দেশ আর ভেলকিবাজির দেশ বলেই জানে—তাই প্রচারে ঢাক বড় হয়েই বেজেছে সেখানকার সর্বত্র। গুণীডাটাকে প্রাধান্য দিয়ে ঢাক পেটাতে কোথাও কার্পণ্য করেনি উড দম্পতি।

এ-দেশে যাত্রা করে ভারতীয় যাদুপ্রসঙ্গে তারা অবশ্য আজগুবী প্রহেলিকা কিছু সৃষ্টি করেনি। এখানে খুব সহজ আর স্বাভাবিক রাস্তাটাই নিয়েছে। ভারতের সন্তান যাদুর খেলায় সমস্ত পাশ্চাত্ত্য দেশে কত অভিনব আলোড়ন সৃষ্টি করে এসেছে সেই সব প্রচারপত্র এ-দেশের রঙ্গালয়ে পাঠানো হয়েছে। এখানে আলাদা যাদুমঞ্চ নেই বললেই চলে, রঙ্গালয়গুলোর সঙ্গেই সাময়িক ব্যবস্থা করে নিতে হয়।

মোট কথা বিদেশী এক যাদু প্রতিষ্ঠানের মুকুটমণি ভারতীয় যাদুকর গুণীডাটার ভারতের ভূমিতে পদার্পণ ঘটল, খবরের কাগজের এও একটা খবর। বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পত্র বিনিময় বা প্রোগ্রাম স্থির করে থাকে ম্যাজিয়ুড কোম্পানির তরফ থেকে

অন্যতম অংশীদার মিসেস উড। এও এক ধরনের পরোক্ষ প্রচারের মতই। জীবনের সব ক্ষেত্রেই জোরালো নারীর মহিমা অনস্বীকার্য। এডওয়ার্ড উড হৃষ্টচিত্তে লিপি-সংযোগের ভারটা স্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিয়ে বস্তুতন্ত্রীয় সংগঠনের দিকটা নিয়ে আছে।

কিন্তু এত সব পাকা ব্যবস্থা সত্ত্বেও কাজ শুরু করার ঝামেলা আছেই। মঞ্চের মালিকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে প্রোগ্রামের পাকা দিনক্ষণ ঠিক করা, টুকিটাকি যে-সব সরঞ্জাম বিলেত থেকে বয়ে আনেনি সেগুলি সংগ্রহ করা, স্টেজ জমানোর মত সাময়িকভাবে বাড়তি মেয়ে-পুরুষ নিয়োগ করা, তাদের তালিম দেওয়া, একটু-আধটু রিহার্সাল দেওয়া—এ রকম অনেক ব্যাপার আছে। গুণী দত্ত আর উড কোম্পানি এই সব নিয়েই ব্যস্ত। বিশেষ করে ভারতে এসেছে বলে গুণী দত্তর নৈতিক দায়িত্ব এখানে বেশী।

কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যেও থেকে থেকে একটা মেয়ের মুখ তার মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দেয়। মনে হয়, তাকে যেন সেখানে সে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছে। তার সঙ্গে মুখোমুখি হতে বাকি, এই সব ঝামেলা মিটলেই তাকে নিয়ে কিছু ভাবার আছে। ভাবতে হবে। সেই মেয়ে শিরিন।

অথচ মেয়েটার সঙ্গে চোখের দেখাও বেশি হয় না। চাঁদ সাহেবকে সঙ্গে করে গুণী দত্ত সকালে বেরিয়ে পড়ে, ফেরে একেবারে সেই রাতে—বাইরে খাওয়াদাওয়া সেরে। চাঁদ সাহেব যে সারাক্ষণই সঙ্গে থাকে তা নয়—দিনের মধ্যে অনেকবার হোটেল আর বাড়ি করে সে। তবে বেশির ভাগ সময়ই গুণী দত্তর সঙ্গে কাটায়। বিস্ময়ে আর আনন্দে বিলেত থেকে আনা উপকরণগুলো দেখে, আসন্ন প্রোগ্রামের জাঁকজমক দেখে—মনে মনে তারিফ করে, ফাঁক পেলে দোস্তএর পিঠ চাপড়ায়। সে এ-সবের কদব বোঝে, পুরনো গায়ক গাইতে পারুক না-পারুক, গানেব মজলিশে গিয়ে বসলে সহজে যেমন নড়তে চায় না, তেমনি।

এককালে এ-সবের মস্ত সমঝদারই ছিল চাঁদ সাহেব। নামকরা ম্যাজিসিয়ানরাও খাতির করত তাকে, আর নতুন অনুশীলনের রসিকরা তো রীতিমত তোয়াজ করত। কলকাতায় ম্যাজিকের উপকরণ আর যন্ত্রপাতি যোগানো বা তৈরি করার ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে। খদ্দের এনে দালালি পেত দু'তরফ থেকেই, আবার যাদু-যন্ত্র বা সরঞ্জামের নতুন নতুন কলা-কৌশল উদ্ভাবন করেও এক একসময় মোটা দাঁও হাঁকত। ম্যাজিসিয়ানের নতুন কোন প্ল্যান মাথায় এলে বা পুরানো ম্যাজিক নতুনের আঙ্গিকে চালানোর প্রয়োজন হলে যন্ত্রপাতি সরঞ্জামের জন্য তাকে আসতে হত চাঁদ সাহেবের কাছে। নিবিষ্ট মনোযোগে চাঁদ সাহেব ম্যাজিসিয়ানের প্ল্যান শুনত, অভিলাষ বুঝে নিতে চেষ্টা করত। তারই পয়সায় মদ খেত আর ভাবত। তারপর কি কবা যেতে পারে না-পারে যন্ত্র-নির্মাতার সঙ্গে হাতে-কলমে সেই গবেষণায় বসত।

যাদু জগতের সঙ্গে এই যন্ত্র বা সরঞ্জাম তৈরির রাজ্যের একটা বিশেষ যোগ। এ রাজ্যে ঘোরাঘুরি না করে যাদুকর হবার আশা পোষণ করা সিঁড়ি ছাড়া শূন্যে ওঠার মতই। শুধু কলকাতা বা বাংলা দেশের নয়, বাইরেরও ছোট-বড় বহু যাদুকরের সঙ্গে কলকাতায় নৈমিত্তিক যোগ ছিল তার। বিদেশের প্রায়-অচেনা আধুনিক

সরঞ্জামগুলো খুঁটিয়ে দেখার প্রতি চাঁদ সাহেবের এই আগ্রহ অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু উল্টে গুণী দত্তরই মনে হত, চাঁদ সাহেব বড় বেশিক্ষণ বাইরে কাটাচ্ছে। ঘরে মেয়েটা একলা পড়ে আছে। চাঁদ সাহেবের ওঠা উচিত, যাওয়া উচিত। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেনি। মেয়েটা সেই যে প্রথম দিনের প্রথম দর্শনে বিরূপ হয়েছে তার ওপর, তারপর থেকে এ পর্যন্ত একদিনও সদয় মনে হয়নি তাকে।

চাঁদ সাহেবের ডেরায় প্রথম রাতেই গুণী দত্ত আবার একটা ছোটখাটো ধাক্কা খেয়েছিল।

রাতে বাইরে থেকে খাওয়ার পাট চুকিয়ে চাঁদ সাহেবের সঙ্গে ঘরে ফিরে দেখে ওই ঘরের আর এক কোণে একটা বাড়তি খাটিয়া পড়েছে। অর্থাৎ তারও শয়নের ব্যবস্থা এই এক ঘরেই। গুণী দত্ত আশা করেছিল চাঁদ সাহেব তাকে যখন জোরজার করে নিজের আস্তানায় এনে তুলেছে, তখন বিকেলের মধ্যে এই বাড়িতেই একটা ঘরের ব্যবস্থাও করেছে। বাড়িটাও মস্ত, ঘরও অজস্র।

কিন্তু ব্যবস্থা দেখে চক্ষুস্থির। মেয়েটা তার শয্যায় বসেছিল। মোমের মূর্তির মত। গোলাপী রঙ করা মূর্তি যেন। লম্বা বেণী পিঠ বেয়ে বিছানায় এসে পড়েছে। তারা ঘরে ঢোকার পরেও নিশ্চল। আস্তে আস্তে চোখের দৃষ্টিটা সজাগ হয়েছে শুধু। কিন্তু সেই দৃষ্টি তার দিকে একবারও ফেরেনি, চাঁদ সাহেবের মুখের ওপর গিয়ে থেমেছে। নির্বাক, তীক্ষ্ণ।

কি দেখছে চাঁদ সাহেবও বুঝেছে, গুণী দত্তও। চাঁদ সাহেব মেয়ের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হেসেছে, তারপর তার গা ঘেঁষেই ধুপ করে বসে পড়েছে। এ-বেলায় সে যে এক ঢোঁকও গিলে আসেনি সেটাই বোঝাতে চায়, হাতেনাতে প্রমাণ দিতে চায়। এক হাতে মেয়েটার পিঠ জড়িয়ে একটু কাছে টানতে চেষ্টা করেছে, তারপর দোস্তকে বলেছে, বুড়ো বাপের জন্য বেটীর কত ভাবনা দেখেছ। ষাট বছরের বুড়ীর মত মুখ করে ভাবছে বাপটা জাহান্নমে গেল—

এই একটা ঘরে তিন শয্যা দেখে চাঁদ সাহেবের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার কথা ভাবছিল গুণী দত্ত। মেয়েটার ওই মূর্তিও এই জন্যেই কিনা কে জানে। চাঁদ সাহেবের আদরে একটুও মন গলছে মনে হল না। কিন্তু লোকটার সেদিকে হুঁশ নেই, লাল দাড়ি নেড়ে হেসেছে আর তাকে বলেছে, খড়ে কেঁও হো, বয়েঠ যাও। মেরী লড়কীকো দেখো—উও আভী গুস্‌সে সে লাল হ্যায়, লেকিন হঁসতে হী ফুল ঝরনে লগেঙ্গে।

মেয়ের মুখে হাসির লেশমাত্র দেখা গেল না তবু। গুণী দত্তই হেসেছিল, বলেছিল, কাল দেখব, আজ বড় ঘুম পাচ্ছে।

তবে শো যাও।

নির্দেশ দিয়েই খালাস। সেদিনই জাহাজ থেকে নেমেছে আর তারপর সমস্ত দিনে বিশ্রামও জোটেনি, অতএব ঘুম পেতেই পারে। পেয়েছে যখন শুয়ে পড়তে বাধা কি?

গুণী দত্ত অবাক, বাধা কোথায় এটুকু না বোঝার মত এত সরল তো চাঁদ সাহেব ছিল না। নিজের সঙ্গে সে যেন কিছু একটা ফয়সালা করে ফেলেছে, আর

তার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বাধা-বন্ধন নেই কিছু। চাঁদ সাহেবের সহজ হাবভাব দেখে দোস্ত্‌এর মতই সে-ও ওইটুকু এক মেয়ের জন্য কোনরকম অস্বস্তি বোধ না করে সরাসরি শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারত। কিন্তু পারেনি। কেন পারেনি জানে না। তিরিশ বছরের এই লাগাম-ছাড়া জীবনে, বিশেষ করে ছ'টা বছর বিদেশের বহু পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে অনেক সঙ্কোচই মুছে গেছে গুণী দত্তর। তবু পারেনি।

ঘর-সংলগ্ন ঢাকা ফালি বারান্দার দিকে চোখ গেছে তার। বাইরে এসে দেখেছে একবার। তারপর ঘরে এসে একটি কথাও না বলে সুবিন্যস্ত শয্যাসুদ্ধ খাটিয়াটা হিড়হিড় করে বাইরে টেনে এনেছে।

চাঁদ সাহেব হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। মেয়েটা এতক্ষণে আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়েছিল। গুণী দত্ত বলেছে, ছ'বছর ওই ঠাণ্ডার দেশে থেকে আর তিন সপ্তাহ খোলা সমুদ্রের ওপর কাটিয়ে গরমে চামড়া জ্বলছে, তোমার এই ঘরের মধ্যে থাকা পোষাবে না আমার।

কিন্তু ঘুম সে রাত্রিতেও হয়নি গুণী দত্তর। অন্তত ভালো ঘুম যাকে বলে তা হয়নি।

রাত গভীর তখন। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল বোধ হয়। খাটিয়ার লাগোয়া দবজাটা আধা-আধি ভেজানো। বাইবে আবছা অন্ধকার, ঘরের ভিতরটা পুরোপুরি অন্ধকাব, এক হাতও চোখ চলে না।

চাঁদ সাহেবের চাপা গলা কানে আসতে তন্দ্রা ছুটে গেল। বাইরে লোকটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে বলেই ধারণা তার। অবুঝ মেয়েকে বোঝাচ্ছে সে। বলছে, তুই একটা ভারী বোকা মেয়ে, আমার দোস্ত খুব ভালো লোক, এত ভালো লোক আমি দেখিনি—কতদিন তোকে দোস্ত্‌এর গল্প করেছি না? আর কত বড় নামজাদা ম্যাজিসিয়ান হয়ে এসেছে সে—দেখিস'খন তার ম্যাজিক। তোকেও নিয়ে যাব। দোস্ত আসছে বলে তুইও তো কত কথা জিজ্ঞাসা করেছিলি, হঠাৎ হল কী?...ও, শরাব খেয়েছিলাম বলে? দূর বোকা মেয়ে, সে কি দোস্ত খাইয়েছে নাকি—আমি লোভে পড়ে খেতে চেয়েছিলাম বলেই তো—তার কি দোষ! আচ্ছা আর কক্ষনো খাব না, এই কসম খাচ্ছি।

গুণী দত্ত শয্যায় উঠে বসেছিল। উৎকর্ণ। কিন্তু রমণী-কণ্ঠের একটা টুঁ-শব্দও কানে আসেনি। মেয়েটার গলার স্বর কেমন তাও জানে না।

চাঁদ সাহেবের গলাই কানে এসেছে আবার। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দোস্তএর প্রশংসার কথা, মেয়ের উদ্দেশে কিছু আদর সোহাগের কথা, জীবনে আর মদ না ছোঁয়ার কথা।

হ্যাঁ, মদ না ছোঁয়ার কথাই বলেছে চাঁদ সাহেব। অবস্থাফেরে ভূতের মুখে রামনাম কখনো শোনা গেছে কিনা জানে না, কিন্তু চাঁদ সাহেবের মুখে মদ না ছোঁয়ার কথা শোনা গেল বটে। স্ব-কর্ণে শুনল। শুনে, বহুক্ষণ বিনিদ্র কেটেছে, গুণী দত্ত অনেক মাথা ঘামিয়েও ভেবে পায়নি, এ কেমন করে হয়? মদের আসরে তাকে সচল করার জন্য চাঁদ সাহেবকে এক-এক সময় নৃশংস অত্যাচারী মনে হয়েছে তার, ওই মেয়ের মায়ের খাতিরেও কোনদিন মদ নিয়ে আপস করেনি সে। সেই চাঁদ সাহেব এমন

হয়ে গেল কেমন করে? কোন্ যাদুতে? গুণী দত্ত অবাক।

পরের রাতটাতেও কম নাজেহাল হয়নি।

সমস্ত দিনের ব্যস্ততার পর রাতে শিরিন আর তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল চাঁদ সাহেব। এ পর্যন্ত তার সঙ্গে একটি কথাও বলেনি মেয়েটা, তখনো তার কণ্ঠস্বর শোনেনি। এমন কি, সন্দেহ হয়েছে মেয়েটো বোবা নয় তো? ভাবতেও খারাপ লেগেছে, আড়ে আড়ে অনেকবার দেখেছে তাকে। বোবা হলে তো কালাও হয় শুনেছে, কিন্তু তাও তো মনে হয়নি। কথাবার্তায় চাঁদ সাহেব একাই একশ, সারাক্ষণ খোশগল্পে মশগুল। কিন্তু গুণী দত্তর গতদিনের মতই অনমনীয় কঠিন মনে হয়েছে মেয়েটাকে। ...এমনিতেই গম্ভীর হয়ত, এই বয়সের মেয়ের যা হওয়ার কথা নয়, তার ওপর সারাক্ষণ যেন একটা বিচ্ছিন্ন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে নিজেকে।

ফেরার আগে চাঁদ সাহেবেরই পছন্দমত একটা হোটেলে ঢুকল তিনজনে। গুণী দত্ত আগেই তাকে জানিয়ে রেখেছিল হোটেলে একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ফিরবে তারা। সেই কারণেও হয়তো মেজাজ একটু বেশি খুশি ছিল চাঁদ সাহেবের।

বয় প্রথম শ্রেণীর আহার্য পরিবেশনের অর্ডার নিয়ে গেল। আনন্দে চাঁদ সাহেব জিব দিয়ে চকচক শব্দ বার করে ফেলল গোটাকয়েক। আজও তার খুশি-খুশি খানা আসছে। গুণী দত্ত দেখেছে, মেয়েটার গাম্ভীর্যে ফাটল ধরেনি একটুও। উল্টে মনে হল, তার যেন ধারণা, তাকে খুশি করার জন্যেই এই আয়োজন।

ইচ্ছে করলেই গুণী দত্ত এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারত তাকে, কথা বলাতে পারত। এই বয়সের একটা মেয়ে তার স্নায়ুর বিভ্রম ঘটিয়েছে ভাবতেও লজ্জা। তবু মনে হয়েছে, থাক, দেখা যাক এত বিরাগ কেন? এর পিছনে কিছু একটা রহস্য আছে যা আপনিই প্রকাশ পাবে। চাঁদ সাহেবকে বিশ্বাস নেই, তার আসার আগেই তাকে নিয়ে হয়ত মেয়ের সঙ্গে কিছু একটা ঘটেছে। গতকালের মদের জের আজ পর্যন্ত চলেছে বিশ্বাস্য নয়। এক-একবার মনে হয়েছে, জ্বলন্ত শিখার মত নিজের রূপ সম্বন্ধে এই বয়সেই বুঝি অতিমাত্রায় সচেতন মেয়েটা। চাঁদ সাহেবকে যেভাবে প্রশ্রয় দিতে দেখেছে, মাথা বিগড়ানো অসম্ভব কিছুই নয়।

কিন্তু শেষে তাও মনে হয়নি। পথে বেরিয়ে বহু পথচারীর সোজা বা বাঁকা দৃষ্টি মেয়েটার মুখের ওপর সজাগ হতে দেখেছে, হোটেলের নৈশ ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আর এক প্রান্তের এই কেবিনে ঢোকার ফাঁকেও বহু জোড়া চোখের নানারকম কটাক্ষ দেখেছে। এমন কি সামনের এক শৌখিন পুরুষের মুখভরা খাবার চিবুনো ভুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকার বহর দেখে খুশিতে আটখানা চাঁদ সাহেবের একটা কনুইয়ের গুঁতো পর্যন্ত খেয়েছে গুণী দত্ত—কিন্তু মেয়েটার মুখে এতটুকু সচেতন কৌতুক ঝিকমিকিয়ে উঠতে দেখেনি একবারও। হোটেলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বরং আরো কঠিন, আরো নির্লিপ্ত মনে হয়েছে তাকে।

খাবার এলো। ডিশের পর ডিশে অত বড় টেবিলটা ভরে গেল। ব্যস্তসমস্ত চাঁদ সাহেব খাবার ভরতি ডিশগুলো এক-একজনের হাতের নাগালের মধ্যে সাজিয়ে সাজিয়ে রাখছে আর বিড়বিড় করে অস্ফুট খুশির আওয়াজ বার করেছে গলা দিয়ে।

সব ঠিক-ঠাক করে মুখ তুলল। অর্থাৎ এবার শুরু করলেই হয়। কিন্তু হঠাৎ কিছু মনে হল বোধ হয় চাঁদ সাহেবের। দৃষ্টিটা দোস্ত্এর দিক থেকে মেয়ের মুখের ওপর এসে থামল। মুখের চাপা হাসি রঙ করা দাড়ির ঝোপে লুকিয়ে ফেলল।

বোয়।

তারস্বরে হাঁক শুনে গুণী দত্ত সচকিত, এক্ষুনি আবার কি চাই। গম্ভীর আয়তপক্ষ্ম মেলে মেয়েটাও ঘাড় ফিরিয়েছে।

বয় এলো।

শরাব—

হুকুমটা একটা জ্বলন্ত গোলার মত কানের পরদায় ঘা দিল গুণী দত্তরই। চমকিত দৃষ্টিটা সামনের জ্বলন্ত শিখারূপিণীর দিকে। একখানি স্থির শিখার মতই জ্বলছে সে, যদি কেউ নাগালের মধ্যে আসে সে জ্বলবে, অন্যথায় নির্লিপ্ত।

বয় দাঁড়িয়ে আছে, কোন শরাব আনতে হবে সেই হুকুমের প্রতীক্ষা। গুরুগম্ভীর মুখে চাঁদ সাহেব হুকুম দিল। ছোট মাপের আস্ত একটা বিলিতি বোতল আনতে বলল সে। বয় চলে যেতে মেয়ের দিকে ঘুরল। —মূর্তিকী তরহ কেয়া খড়ী হো, খানা দেখনে সে হী পেট ভরা গয়া? দোস্তএর দিকে ফিরল, কেয়া তুমহে ভী কাঠ মার গায়া?

তবু কেউ খাবারের দিকে ঝুঁকল না দেখে সেও গম্ভীর মুখে হাত গুটিয়ে বসে রইল। গুণী দত্ত ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছে। দিলে বোধ হয় মেয়েটার খাওয়া মাটি করে। অথচ চাঁদ সাহেবের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে, ওই গাম্ভীর্য অকৃত্রিম নয়, তার লাল দাড়ির ঝোপে একটা বড়গোছের হাসি লুকিয়ে আছে। সময় হলেই সেই হাসি ঝরবে।

ছোট বোতল আর সোডা আর দুটো গেলাস হাতে বয় পরদা সরিয়ে কেবিনে ঢুকল। সোডার বোতল আর গেলাস টেবিলে রেখে পরিচারকটি রঙিন বোতলটা খোলার উদ্যোগ করতেই চাঁদ সাহেব এক থাবায় সেটা প্রায় কেড়েই নিল তার কাছ থেকে। ফটাস করে নিজেই মুখটা খুলল। বোতলটা নাকের কাছে ধরে বড় করে ঘ্রাণ নিল একটা—আঃ।

তৃপ্তিতে মুখখানা ভরাট হয়ে উঠল, যেন সামনের আহার্য-টাহার্য কিছু নয়, পরম প্রিয় বস্তুটিই হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছে। তারপরেই মেয়ের দিকে তাকালো। মূর্তির মত মেয়েটা সেই থেকে চেয়ে আছে তার দিকে। দেখছে যেন, কতটা এগোয়। এই পর্যায়ে গুণী দত্ত প্রমাদই গুনছে মনে মনে। মেয়েটা হঠাৎ দু'হাতে টেবিলের সব কটা ডিশ ফেলে ছড়িয়ে তছনছ করে দিলেও খুব অবাক হবে না বোধ হয়।

তৎপর হাতে চাঁদ সাহেব এবার নাটকের পরের অধ্যায় সম্পন্ন করল। বোতলটা ঠিক করে দোস্তএর একেবারে বুকের কাছে রেখে মঞ্চের সুদক্ষ অভিনেতার গাম্ভীর্যে একবার মেয়ের দিকে তাকালো। তারপর একটা সোডার বোতল আর একটা গেলাস তেমনি করে দোস্তএর দিকে এগিয়ে দিয়ে বাকি গেলাস আর সোডার বোতলটা বয়ের সামনে রেখে গম্ভীর মুখে হুকুম করল, লে যাও।

লোকটার হাবভাব দেখে হোক বা যে কারণেই হোক, বয়টাও হাঁ করেই দাঁড়িয়ে আছে। হুকুমের তাৎপর্যও হয়ত সঠিক বোধগম্য হয়নি।

হটা লো! সগর্জনে তাড়া দিয়ে উঠল চাঁদ সাহেব।

বাকি সোডার বোতল আর গেলাস নিয়ে বয় প্রস্থান করে বাঁচল। মেয়ের দিকে চেয়ে চাঁদ সাহেব এবারে কেবিন ছেড়ে গোটা হলটা সচকিত করে হেসে উঠল একপ্রস্থ। এতক্ষণে মেয়েটার গাম্ভীর্যেও ফাটল দেখা গেল একটু। মেঘের ফাটলে বিদ্যুতের মত হাসির আভা চিকচিকিয়ে উঠল।

ব্যাপারটা বোঝা গেল এতক্ষণে। মদ যে সে ছেড়েইছে আর কতটা মনের জোর নিয়ে ছেড়েছে তারই একটা দেখালো। অর্থাৎ এর পরেও যদি মেয়ে নিশ্চিন্ত না হতে পারে তো সে নাচার। কিন্তু মুশকিল হল গুণী দত্তর। এই পানীয়টির প্রতি এতখানি বীতশ্রদ্ধ যে মেয়ে, তার চোখের সামনে বসে এ জিনিস গলাধঃকরণ না করলেও চলত। কিন্তু নিজের মনের জোর আর প্রতিজ্ঞার জোর দেখাবার তাড়নায় আর মেয়েকে নিশ্চিন্ত করার আগ্রহে আর কিছুই ভাবেইনি হয়ত চাঁদ সাহেব। কিংবা, হয়ত শুধু সে মদ খেলেই মেয়েটার যত আপত্তি, দুনিয়ায় আর যে যত খুশি মদ গিলুক তাঁর মাথাব্যথা নেই।

আজও এই তরল পদার্থটির প্রতি তেমন বিশেষ আকর্ষণ নেই গুণী দত্তর। নেশা বলতে কিছু নেই। হাতের কাছে কেউ এগিয়ে দিল তো খেল, কিন্তু না দিলেও ভিতরটা তেমন আনচান করে না। আজ এই নাটকের পর বোতলটা স্পর্শ না করারই কথা, কিন্তু ওইটুকু এক মেয়ের ইচ্ছে বা অনিচ্ছাটাকে অতটা প্রাধান্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হল না গুণী দত্তর।

তিনজনেই আহারে মগ্ন। গুণী দত্ত শুধু আহারে নয়, পানাহারে। খেতে খেতে চাঁদ সাহেব আবার গল্প জুড়ে দিয়েছে, আর এক-একবার কথার খেই হারিয়ে বোতলটার দিকে তাকাচ্ছে।

এদিকে কি একটা অহেতুক ঝোঁক চেপেছে গুণী দত্ত নিজেই জানে না। মেয়েটার চোখের সামনে এই সমস্ত বোতলটাই সে ধীরে-সুস্থে শেষ করবে। এমন কি শেষ হয়ে গেলে হয়ত বয়কে ডেকে আরো দিতে বলবে। বেশি খেয়েও দেখেছে এমন কিছু ওলট-পালট কাণ্ড হয় না, মাথাটা ঝিমঝিম করে, পা দুটোর ওপর খুব নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় না—এ-ছাড়া আর কিছু গণ্ডগোল হয় না।...মেয়েটা সরাসরি তাকাচ্ছে না একবারও, কিন্তু তার বিশ্বাস বোতলটা যে অর্ধেকের বেশি খালি করে এনেছে সেটা সে ঠিক লক্ষ্য করেছে।

গুণী দত্তর কে জানে কেন মন্দ মজা লাগছে না।

হঠাৎ একসময় চাঁদ সাহেবের দিকে চোখ পড়তে সে অবাক। চাঁদ সাহেব খাচ্ছে না, আঙুল ক'টা খাবারের প্লেটে নাড়াচাড়া করছে শুধু। তার তৃষ্ণার্ত দুটো করুণ চোখ ওই রঙিন বোতল আর গেলাসের দিকে। চোখ দিয়েই বস্তুটির রসাস্বাদন করছে যেন!

খাচ্ছ না? গুণী দত্ত তার দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করল।

হাঁ, খাচ্ছি তো। চাঁদ সাহেব সচকিত। —বহুত বঢ়িয়া খানা পাকিয়েছে। ঢোক গিলল, বোতলটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে হালকা প্রশ্ন করল, ভাল মাল দিয়েছে তো ? আজকাল তো আবার—

আজকাল কি, সেই সংশয়টা আর পুরোপুরি ব্যক্ত করতে পারল না।

খুব ভালো। গুণী দত্ত গম্ভীর। যেন এত ভালো জিনিস শিগগীর পেটে পড়েনি। সেই মুহূর্তে মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি হল একবার, মনে হল একটা জ্বলন্ত ছুরির ফলা যেন তার মুখখানায় কেটে কেটে বসছে।

আবার চুপচাপ খানিকক্ষণ। চাঁদ সাহেব মাঝে মাঝে ফস ফস করে এটা সেটা বলে টেবিল সরগরম রাখতে চেষ্টা করছে। কিন্তু কথাগুলো কেমন অসংলগ্ন ঠেকছে কানে। একটু আগে বলল, জবর খানা পাকানো হয়েছে, আবার এখন বলছে, আজকাল আর আগের দিনের মত খানা পাকাতেই জানে না এরা, গলা কেটে দাম নেয় অথচ খানা গলা দিয়ে নামতে চায় না।

গুণী দত্ত বাক্যালাপে যোগ দেয়নি। মুখ তুলে এক-একবার শুনছে, সেই ফাঁকে দেখেও নিচ্ছে। মেয়েটার হাত গোটানো, খাওয়া শেষ বোধ হয়। এত কম খেয়ে চেহারাটা এমন পরিপুষ্ট থাকে কি করে তাই নিয়েও মাথা ঘামানো যেতে পারে। গুণী দত্ত একবার ভাবল জিজ্ঞাসা করবে আর কিছু দেবে কিনা, কিছু খেল না বলেও একটু বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত। তারই অতিথি।

কিন্তু কিছুই বলা হল না। একটু আগের ওই দুটো শাণিত চোখ মনের পর্দায় বিঁধে আছে।

ধীরে-সুস্থে হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিয়ে গ্লাসের মুখে উবুড় করল সে। বোতলে আর সামান্যই থাকল। বোতল রেখে সোডা ঢালল, তারপরেই মুখ তুলে একেবারে হাঁ। চাঁদ সাহেব চেয়ে আছে, চোখ দুটো যেন তার গেলাসটার ওপর গলে গলে পড়তে চাইছে। আর মুখ মোছার জন্য টেবিলের যে ন্যাপটা তুলে নিয়েছিল, তন্ময় হয় তারই একটা ধার চিবুচ্ছে এখন—কি চিবুচ্ছে চাঁদ সাহেবের খেয়াল নেই।

গলানো সীসের মত একটা হিস হিস কণ্ঠস্বর কানের পরদা দুটো হঠাৎ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একাকার করে দিল বুঝি। শিরিন মুখ ঘুরিয়েছে। শিরিন কথা বলছে। গুণী দত্তর দিকে চেয়ে গুণী দত্তকেই বলছে। বলছে না, গলা দিয়ে তরল আগুন ঢালছে।—বসে বসে সেই থেকে নিজে একা গিলছ কেন ? চোখ নেই ? দেখছ না কিছু ? ওদিকেও দাও না খানিকটা ঢেলে ?

হাতের ধাক্কায় গেলাসটা উল্টাবার আগেই গুণী দত্ত সামলে নিল। চাঁদ সাহেব একটা স্বপ্নের ঘোর থেকে যেন সজোরে কঠিন বাস্তবে আছাড় খেয়ে মুখথুবড়ে পড়েছে। যাকে বলে নক-আউট। মেয়েটা বোবা নয়। গুণী দত্ত এই প্রথম শুনল কণ্ঠস্বর। আরো আশ্চর্য, স্পষ্ট বাংলা কথা। চোখ বুজে শুনলে কচি ছেলের গলা মনে হবে। কিন্তু সব ভুলে বিমূঢ় চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সে। একটা নির্মম তীক্ষ্ণ চোখ-ধাঁধানো অস্ত্র যেন তার মাথার ওপর উদ্যত।'

স্তব্ধ, থমথমে মুহূর্তে কয়েকটা। মেয়েটা চেয়েই আছে। সাড়ে সতের বছরের

একটা মেয়ের নয়, ওই দুই চোখে যেন কোন্ শাশ্বত নারীর সত্তা জ্বলছে ধকধকিয়ে—ঘৃণা ঝরছে, বিদ্বেষ ঝরছে। রমণীর যে রোষ প্রশমিত না হলে কোনো পুরুষের অব্যাহতি নেই, সেই রোষে জ্বলছে মেয়েটা।

চাঁদ সাহেবই আত্মস্থ হয়েছে প্রথম। মেয়ের এই রোষ আর এই মূর্তি শুধু সে-ই চেনে। তার একটা হাত মেয়ের পিঠের ওপর। পিঠ চাপড়াচ্ছে, পিঠ চাপড়ে চাপড়ে শান্ত হতে বলছে তাকে, ঠাণ্ডা হতে বলছে। কিন্তু মুখে বলতে পারছে না কিছু। অস্ফুট স্বরে তার নাম ধরে ডাকছে শুধু। ডাকছেও না, নামটাই শুধু আওড়াচ্ছে।

শিরিন, শিরিন! শিরিন শিরিন শিরিন শিরিন—

আগুন নিবল। ঘৃণা বিদ্বেষ জ্বালার ওপর ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়ল। অতি স্নেহের, অতি পরিচিত হাতের স্পর্শ পেয়ে একটি ব্যাঘ্র-দুহিতা শান্ত হল যেন। আর একদিকে দৃষ্টি ফেরাল।

আরো কিছুক্ষণ বাদে চাঁদ সাহেব ভাষা খুঁজে পেল। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল, আমার জন্যে তুই দোস্ত্‌কে অপমান করলি? মদ দেখে আমার ভিতরের দুশমনটা বেইমানি করেছে, দোস্ত্‌এর কাছে শিগগীর মাপ চেয়ে নে!

ঘাড় গোঁজ করে মেয়েটা আর একদিকে চেয়ে আছে। ব্যাঘ্র-দুহিতা মাপটাপ চাওয়ার ধার ধারে না। মাপ চাইলে সেটাই বেমানান হত।

গুণী দত্ত রাগ করেনি, অপমানিতও বোধ করেনি। সে ম্যাজিসিয়ান, একটা অভূতপূর্ব ম্যাজিক দেখে স্তব্ধ হয়েছে, হয়ত বা চমৎকৃতও হয়েছে। পুরো দুটো দিনও হয়নি সে জাহাজ থেকে নেমেছে, তার আগে ছ'টা বছর শ্বেতাঙ্গদের দেশে কাটিয়ে এসেছে। গতকাল চাঁদ সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিল, ওই দেশে শিরিনের মত মেয়ে দেখেছে কিনা। কিছু না ভেবেই কাল সে মন-রাখা জবাব দিয়েছিল, দেখেনি। আজ মনে হচ্ছে সে খাঁটি জবাবই দিয়েছে। চোখ-ঝলসানো মেয়ে গুণী দত্ত অনেক দেখেছে। আর, ওদেশের অনেক মেয়েও তার মধ্যে পুরুষ দেখেছে। জুলি স্যাণ্ডারসনের মত সে-রকম মেয়ের সংখ্যা অগুনতি। কিন্তু এই ভারতের বুকে পা দিয়েই গুণী দত্ত যা দেখেছে তার বুঝি তুলনা নেই। এখানে মাত্র সাড়ে সতের বছরের এক মেয়ের কাছে তার পুরুষকার ঘা খেয়েছে। না, সেখানে সে এই মেয়ে দেখেনি। সেখানে শিরিন দেখেনি।

গুণী দত্ত গেলাসটা আর বোতলটা একধারে সরিয়ে রেখেছে। আর সেটা স্পর্শ করেনি। বয়কে ডেকে বিল দিতে বলেছে, তারপর কি ভেবে ভরতি গেলাস আর বোতলটা তাকে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে।

হুকুম তামিল করে বয় চলে গেল। গুণী দত্ত একবার ভাবল, মিষ্টি করে শিরিনকে আর কিছু খেতে বলবে। কিন্তু গেলাস আর বোতল সরিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে একবারও এদিকে ঘাড় ফেরায়নি। বলা বৃথা হবে।

একটা বিস্ময় নিয়েই গুণী দত্ত ঘরে ফিরেছে। একান্তে পেলে চাঁদ সাহেবকে একবার জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল, কি ব্যাপার। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়নি। চাঁদ সাহেবই বরং এক ফাঁকে অনুতাপ প্রকাশ করেছে তার কাছে। বলেছে, দোস্ত্ যেন

অবুঝ মেয়েটাকে ক্ষমা করে। মেয়েটা ওই রকমই, কিন্তু আসলে দোস্তএর ওপর রাগ করে সে অমন কাণ্ড করেনি, তার আসল রাগ সাহেবজীর ওপর।

শিরিন তাকে সাহেবজী বলে ডাকে এ গল্প চাঁদ সাহেবই ইতিমধ্যে করেছিল। লাজবন্তী যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন সাহেবজী ডেকে এসেছে। তারপর বাপজী ডাকটা রপ্ত করাতে গিয়ে মেয়ের কাছে চাঁদ সাহেব নাকি হার মেনেছে। আর বাপজী ডাকতে গিয়ে মেয়ে হেসে বাঁচেনি। সত্যি বলতে কি, সাহেবজীর মত বাপজী ডাকটা অত মিষ্টিও নাকি শোনায়নি। শেষে চাঁদ সাহেবই আবার বলেছে, থাক বেটী, যে নামে ডাকছ, তাই ডাকো।

রাগ সাহেবজীরই ওপর সেটা একেবারে অবিশ্বাস্য নয় হয়ত। যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে তাই মনে হয় বটে। কিন্তু সেটাই পুরোপুরি সত্যি মনে হয়নি গুণী দত্তর। ওই ঝলসানো রাগ আর ঘৃণার চাবুক তার সমস্ত বুকের ওপর যেন গভীর ক্ষতসৃষ্টি করে দিয়ে গেছে একটা। ...গুণী দত্তর সমস্ত পিঠ জুড়ে একটা কালচে ক্ষতচিহ্ন আছে। এগার বছরেও সেটা মিলোয়নি। আর মিলাবেও না। আজও হঠাৎ উপলব্ধির পথে সেই স্মৃতিটাই আলোড়ন তুলল। সেদিন সমস্ত পিঠটা জ্বলে ঝলসে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই দিনে মুখটা।

একটা একটা করে দিন যাচ্ছে। গুণী দত্ত রোজই ভাবে এবারে হোটেলে আস্তানা নেবে। ম্যাজিয়ুড কোম্পানির মুকুটমণি গুণীডাটা চাঁদ সাহেবের এই ডেরায় কোন্ আরামের শয্যায় রাত কাটায়, কল্পনাও করতে পারবে না উড দম্পতি বা জুলি স্যাণ্ডারসন। আর দেখলে বিস্ময়ে হতভম্বই হবে হয়ত। পাছে চাঁদ সাহেবের সঙ্গতির ওপর চাপ পড়ে, তাই অতি কৌশলে এখানে দু'বেলাই খাওয়ার পাট এড়িয়ে গেছে গুণী দত্ত। সকালে শুধু চা আর প্রাতরাশ খেয়ে বেরোয়। কিন্তু থাকার ব্যবস্থাও এড়াতে গেলে ধরা পড়ে যাবে, দারিদ্র্যের দিকটাই বড় করে দেখে চাঁদ সাহেব দুঃখ পাবে। এখানেও পাঁচ রকমের দালালি করে কায়ক্লেশে দিন চলছে তার। নিজেই বলে, এখন আর তাও দেহে কুলোয় না। বলে, তেমন বয়েস না হতেই পঙ্গু হতে চলেছি দোস্ত্।

তাই বলি-বলি করেও আর বলা হয়নি। কিন্তু হঠাৎ এই ঘরসংলগ্ন ফালি বারান্দার শয্যায় এক বিনিদ্র রাতে নিজেরই গভীরে কেমন করে ডুব দিয়েছিল গুণী দত্ত। সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছে, সে যেতে পারছে না শুধু এই অসমবয়স্ক বন্ধুর প্রতি অনুরাগ আর কৃতজ্ঞতার কারণে নয়। সে যেতে পারছে না ওই ঘরের আর কারো প্রতি কোনরকম মোহ বা আকর্ষণের ফলেও নয়। সে যেতে পারছে না, এইখানে সে কিছু একটা দুর্বোধ্য রহস্যের কিনারায় বসে আছে বলে। তার মধ্যে যাদুকরের নেশা লাগার মতই যে রহস্যময়ী বাসা বেঁধেছে সে তার সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু গুণ্ঠন সরাতে পারেনি। যাদুকর রহস্য বিলোয়, নিজে রহস্য বরদাস্ত করে না।

নিজের অগোচরে গুণী দত্তর আর একটা মন এখানে আটকে আছে এই কারণে।

॥ ৬ ॥

যতটা আশা করেছিল উড দম্পতি, প্রথম দিনের প্রোগাম তার থেকে বেশি চমকপ্রদ হয়েছে।

ভারতের বুকে এই প্রথম বড় অনুষ্ঠান গুণী দত্তর। আরো অনেক বড়র প্রতিশ্রুতি নিয়েই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেছে। দর্শকচিত্তের একটা সাধারণ ঐক্যের প্রতি সে বিশ্বাসী। সেটা হচ্ছে আনন্দের মধ্য দিয়ে তাদের বিস্ময়ের স্তব্ধতার দিকে নিয়ে যাওয়া—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটাই ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে স্তরে স্তরে টেনে তোলার চাতুরী। তাই উপভোগের দিক থেকে কোনো খেলা থেকে কোনোটা বিচ্ছিন্ন মনে হয় না খুব। টুকিটাকি পাঁচটা সাধারণ খেলা দিয়েই অনুষ্ঠান শুরু। সকলেরই অদেখা অথবা সবই অভিনব কিছু নয়। কিন্তু এগুলোরই ফাঁকে ফাঁকে হাসির বন্যা বইয়ে দেওয়ার ফলে সবই নতুন লেগেছে, অভিনব লেগেছে।

শেষের তিন খেলায় আসর মাত।

তার মধ্যে প্রথমটি গুণীডাটার পলায়নী খেলা। যে খেলায় সমস্ত পৃথিবীর সাম্প্রতিক যাদুকরদের মধ্যে তার জুড়ি নেই বলে দাবী ম্যাজিয়ুড প্রতিষ্ঠানের। তাদের ঘোষণা, এই দুনিয়ায় কোন পার্থিব জড়-বাঁধন কবলিত হবে না এমন মানুষ একজনই আছে। সে গুণীডাটা।

কিন্তু পলায়নী খেলা দর্শক তো অনেক রকমের দেখেছে। গুণীডাটা এমন কি দেখাবে?

তেমন কিছুই দেখাল।

স্টেজে ইস্পাতের বরগার ওপর দ্রুত ইঁটের দেওয়াল গাঁথা হল একটা। আট ফুট উঁচু নিরেট দেওয়াল। দর্শকদের ডেকে ডেকে দেয়াল পরীক্ষা করানো হল, কোথাও ফাঁক নেই। কোথাও ফাঁপা নেই। দেয়ালের চারদিকে চাদর ঘেরাও করা হল, বাইরে থেকে কেউ ঢুকতে বা বেরুতে না পারে—জনা দশ-পনের দর্শক পাহারায় মোতায়েন থাকল চাদর ঘিরে—আর সামনের দিকটা তো অগুনতি দর্শকের প্রহরায়। দেয়ালের দুদিকই দেখতে পাচ্ছে তারা।

এবারে একটু দূরে দূরে দেয়ালের দু'দিকে দুটো পরদা ঘেরা আড়ালের একটায় গিয়ে ঢুকল দুহাতে হাত-কড়া লাগানো অবস্থায় যাদুকর গুণীডাটা। দুই আবদ্ধ হাত তুলে সকলকে দেখালো, সে কোথায় আছে। তারপর হাত নামিয়ে নিল। অপরিসীম স্তব্ধ মুহূর্ত কয়েকটা। এক-একটা মুহূর্ত যেন শেষ হতে চায় না। অর্কেস্ট্রায় আসামীর পলায়ন-সূচক ঝমঝমানি। দেখা গেল দেয়ালের এধারের দ্বিতীয় পর্দা ঘেরা আড়াল থেকে দুটো কড়া-বন্ধ হাত উঠছে। তারপরেই ঘোষণা, আমি এখানে এসে গেছি।

কিন্তু এ তো হাত-কড়া লাগানো অন্য কারো হাত হতে পারে, আর নকল গলাও হতে পারে। অতএব পরদা সরাও।

পরদা সরানো হল। না, নকল কেউ নয়, হাত-কড়া লাগানো জলজ্যান্ত গুণীডাটাই সকলের চোখের সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

দর্শক বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। ঠাস গাঁথুনির দেওয়াল ফুঁড়ে এ-ধার থেকে ও-ধারে যাওয়া সম্ভব এ যে নিজের চোখে দেখল তারা!

হাততালির ধুম।

সামনের একটা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে প্রায় নাচতে নাচতে হাততালি দিচ্ছে একজন। সে চাঁদ সাহেব। তার পাশে বিস্ময়ের ধাক্কায় স্থান-কাল বিস্মৃত যে মেয়ে—সে শিরিন। খেলা আরম্ভ হবার আগে, এমন কি খেলা শুরু হবার পরেও গোড়ায় গোড়ায় এই মেয়ের অবস্থানে আশেপাশের অনেক দর্শকের চক্ষু অমনোযোগী হয়ে বার বার এইদিকে ফিরেছে। তারপর একসময় নিজেদেরই অগোচরে সব বিস্মৃত হয়ে রঙ্গমঞ্চের ভোজবাজী দেখেছে তারা। এমন কি শেষের দিকে চাঁদ সাহেবও মেয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে ভুলে গেছে।

সাহেবজীর জুলুমেই শেষ পর্যন্ত খেলা দেখতে আসতে হয়েছে মেয়েকে। তারপর দেখতে দেখতে নিস্পৃহতার সেই কঠিন বর্ম ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে। তাদের ঘরের বারান্দায় পড়ে থাকে যে লোক, সে-ই একের পর এক এই কাণ্ড করছে এ যেন ভাবতে পারে না। হাসির ব্যাপারে দর্শকদের সঙ্গে সঙ্গে শিরিনও নিঃশব্দ হাসির দমকে ভেঙে পড়েছে এক-একবার। পরক্ষণেই আবার নিস্পলক বিস্ময়ে বিপরীত কাণ্ড দেখেছে। একটু একটু করে যেন গোটাগুটি এক বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যেই টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাকে।

দুই চোখে পলক পড়ে না।

খবরের কাগজে পলায়নী খেলা ছাড়াও গুণীডাটার আরো দুটি চমকপ্রদ খেলার ঢালাও প্রশংসা করেছে আনন্দানুষ্ঠানের সমালোচকরা। একটা কামানের খেলা আর সব শেষেরটি 'পীপলস্ অফ অল নেশনস'।

কামানের খেলা দেখে অনেকেই ত্রাসে কেঁপে উঠেছিল। শিরিনও।

দুপাশে চাকাওয়ালা এক অতিকায় কামান ঠেলে এনে স্টেজে দাঁড় করানো হয়েছে। কামানের বিশাল মুখ-গহ্বর দর্শকদের দেখানো হয়েছে। আঁটসাঁট বসন পরে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জুলি স্যাণ্ডারসন। মুখ-ভাব করুণ, যেন একটা খুনীর সামনেই দাঁড়িয়েছে সে। আচমকা দুই হাতে তাকে শূন্যে তুলে সেই কামানের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে-ঠুলে ঢুকিয়ে দিল গুণীডাটা। তারপর কামানের মুখে রাখা হল মস্ত একটা গোলা।

হল্ স্তব্ধ। ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে কামান দাগানো হল। কানে তালা লাগানো বিস্ফোরণ একটা। গোলাটা খানিক উঁচু হয়ে উঠে স্টেজের ওপরেই পড়ল ধুপ করে। আর জুলি স্যাণ্ডারসন? সে কি বেঁচে আছে? সে কোথায়?

সে অনেকটা দূরে দর্শকদের মধ্যেই এক জায়গায় চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে, রুমাল নেড়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়ে দিচ্ছে সে কোথায়।

শেষ খেলা 'পীপল্স অফ অল নেশন্স'। সকল দেশের মানুষ দেখাবে গুণীডাটা। কোথা থেকে? একজন মানুষ অবস্থান করতে পারে এমনি পৃথিবীর মানচিত্র আঁকা একটি ফাঁপা গ্লোবের ভিতর থেকে। গ্লোবের একটা পাট খুলে দেখানো হল, ভিতরটা ফাঁকা—কেউ নেই, কিছু নেই। পাট বন্ধ করা হল। গ্লোব ঘুরিয়ে প্রথমেই ভারতবর্ষের

মানচিত্র দর্শকের সামনে দাঁড় করানো হল। তারপর সেই পাট খোলা হল। ভিতর থেকে ভারতীয় পোশাকে ভারতীয় ফ্ল্যাগ হাতে বেরিয়ে এলো জুলি স্যাণ্ডারসন। আবার পাট বন্ধ করা হল, এবারে দর্শকের সামনে ইংল্যাণ্ডের মানচিত্র। পাট খোলা হল, জাতীয় পোশাকে জাতীয় পতাকা হাতে বেরিয়ে এলো মিসেস জেনিফার উড। এমনি করে ওই ফাঁক। গ্লোবের ভিতর থেকে জাতীয় পোশাকে আর জাতীয় পতাকা হাতে একে একে বেরিয়ে এলো নানা দেশের নানা জাতের মানুষেরা।

দর্শক প্রথমে মন্ত্রমুগ্ধ, তারপর আনন্দে দিশেহারা।

খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা রেষারেষি করে অবাক যাদুকর গুণীডাটার খেলা, গুণীডাটার চিত্তাকর্ষক শো-ম্যানশিপ, আর বৈশিষ্ট্যের খুঁটিনাটি নিয়ে ফলাও করে আলোচনা করেছে। দর্শকেরা পরস্পর আলোচনায় মেতে উঠেছে। পরের ছ'দিনের ছ'টা শো-এর টিকিট একদিনেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের রাতেই নেপথ্য রঙ্গমঞ্চে আর এক যে ক্ষুদ্র প্রহসনের সূচনা হয়ে গেছে, দর্শক বা সমালোচক তার খবর রাখে না।

শো শেষ হবার পরেই শিরিনের হাত ধরে আনন্দে ডগমগ চাঁদ সাহেব একেবারে গ্রীনরুমে এসে হাজির। গুণী দত্ত নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। তার চুমু আর দাড়ির ঘষায় নাস্তানাবুদ হয়ে হাল ছেড়ে আত্মসমর্পণ করেছিল।

কিন্তু সেই বিগলিত মুহূর্তে চাঁদ সাহেবেরই হঠাৎ খেয়াল হল, কারো দৃষ্টিই তাদের দিকে নয়, তার সঙ্গে যে এসেছে তার দিকে। এডওয়ার্ড উড, জেনিফার উড, জুলি স্যাণ্ডারসন, অন্যান্য সহকারীরা সকলেই শিরিনকে দেখছে।

শিরিনের সে-দিকে হুঁশ নেই, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে গুণী দত্তর দিকে। বিমূঢ় বিস্ময়ে সে গুণী দত্তকে দেখছে।

গুণী দত্ত হাসিমুখে এগিয়ে এলো। হঠাৎ মনে হল, সে সাফল্যের প্রত্যাশায় ছিল, আর এই পুরস্কারের প্রত্যাশায়ও ছিল। একে একে উড দম্পতির আর জুলি স্যাণ্ডারসনের সঙ্গে শিরিনের পরিচয় করিয়ে দিল। চাঁদ সাহেবের মেয়ে সেই পরিচয়ই দিল। মিস্টার আর মিসেস উড অকারণেই চকিতে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় করে নিল একবার। মিসেস উড সাদরে কাছে টেনে বসালো তাকে। চাঁদ সাহেবের এই মেয়ে এ যেন বিশ্বাস্য নয়। জুলি স্যাণ্ডারসন প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে উঠে এখন সকৌতুকে দেখছে তাকে। বিস্ময় এক ভারতীয় মেয়ের রূপ দেখে কি আর কোন কারণে নিজেও সঠিক জানে না। মিসেস উড একটু-আধটু আলাপের চেষ্টা করছে তার সঙ্গে, কিন্তু ঘুরেফিরে শিরিন তখনো যাদুকরকেই দেখছে।

চাঁদ সাহেবের সঙ্গেই ঘরে ফেরার ইচ্ছে ছিল গুণী দত্তর। কিন্তু কেন যেন পারল না। জুলি স্যাণ্ডারসনের চাউনিটা ঈষৎ তির্যক, হাসি-হাসি। হয়ত সেই জন্যেই পারল না। তারা হোটেলে ফেরার জন্য প্রস্তুত। এক ফাঁকে এরই মধ্যে তাকে একটু নিরিবিলিতে পেয়ে জুলি জিজ্ঞাসা করল, যাচ্ছ?

হ্যাঁ, তোমরাও তো যাচ্ছ?

আমরা তো যাবই, জুলি যেন তার দিকে চেয়ে মজা দেখছে কিছু। —তা অপেক্ষা

করছ কেন, যাও?

হাসি চেপে গুণী দত্ত বলল, যাব, একটু কাজ বাকি—

কাজটা সেরে নেবার জন্যেই সে সরাসরি এগোলো তার দিকে।

থতমত খেয়ে জুলি তাড়াতাড়ি দু'হাত বাড়িয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করল। ভারতের মাটিতে অন্তত সকলের চোখের সামনে সব কিছু সচল নয় সেটা সে এরই মধ্যে জেনেছে। শুধু এখানে কেন, এই পরিবেশে সব দেশেই এর নাম কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কিন্তু লোকটার কাণ্ডজ্ঞানের ওপর তার কিছুমাত্র আস্থা নেই। তাই সভয়ে দু'পা সরেও দাঁড়াল। তারপর ছদ্ম-কোপে চোখ রাঙাল, ইউ র‍্যাসক্যাল, নাও গেট আউট।

গুণী দত্তর ঘরে ফিরতে রাতই হয়েছে একটু। ফেরামাত্র তাকে নিয়ে চাঁদ সাহেব আবার লাফালাফি করেছে একপ্রস্থ। শিরিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। রেলিং ধরে সামনের খোলা আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখছে সেই থেকে, সে-ই জানে। একসময় চাঁদ সাহেবকে গুণী দত্ত না জিজ্ঞাসা করে পারল না, শিরিন ওখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে কেন, শো ভালো লাগেনি?

জবাব জানাই ছিল। তবু শুনতে ভালো লাগল চাঁদ সাহেবের আকর্ণবিস্তৃত হাসি।—এত ভালো লেগেছে যে তাজ্জব বনে গেছে, আর বহুত সমস্যায় পড়েছে।

তাজ্জব বনাটা দুর্বোধ্য নয়, কিন্তু এই সঙ্গে সমস্যাটা যে কি তা অস্পষ্ট। নীরব প্রশ্নের জবাব মিলল না, দাড়ির ঝোপে চাঁদ সাহেব যেন একটা রহস্য আড়াল করে আছে। গুণী দত্ত জিজ্ঞাসা না করে পারল না। —সমস্যা কিসের?

চাঁদ সাহেবের মুখে হাসি ধরে না। —সবুর দোস্ত্ সবুর, সব জানবে—আজ বড় আনন্দের দিন।

ঘণ্টাখানেক বাদে তার আনন্দের ঘড়ঘড়ানি শোনা গেছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মেয়েটাও হয়ত এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই রাতেই আর একবার তার মুখখানা ভালো করে দেখার ইচ্ছে ছিল গুণী দত্তর, কিন্তু চাঁদ সাহেবের খুশির জোয়ারে ভেসে সে অবকাশ পায়নি।

ঘরের ভিতরটা অন্ধকার, দরজার একটা পাট খোলা। সেই খোলা পাট দিয়ে ঘরের মধ্যে ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ছুটেছে—যেন ঘরের অন্ধকার মাঝখান দিয়ে দু'খানা করে চিরে দিয়েছে।

ঘুম আসে না। রেলিং-এ ঠেস দিয়ে গুণী দত্ত আকাশ দেখছে আর সিগারেট টানছে। তেমন করে কান পাতলে সেই নীরব জ্যোৎস্নার কিছু একটা কানাকানি যেন শুনতে পাবে সে। অনেকক্ষণ ধরেই চেষ্টা করছে শুনতে, উপলব্ধি করতে।

বিষম চমকে ঘুরে দাঁড়াল। পিঠে কার হাতের স্পর্শ। বিস্ময়ে বিমূঢ় পরের মুহূর্তে।

শিরিন!

পাতলা একটা চাদর বুকে-পিঠে জড়ানো। পিঠে বেণী ঝুলছে, শুধু সামনের কয়েক গোছা চুল অবিন্যস্ত।

গুণী দত্ত অবাক। মেয়েটা যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছে। স্বপ্নের ঘোরেই

উঠে এসেছে। রক্তমাংসের কেউ উপস্থিত নেই তার মধ্যে। আকাশের জ্যোৎস্নার ঝলক তার মুখের ওপর এসে ভেঙে পড়ছে। গুণী দত্ত অবাক হয়ে দেখছে, শুধু স্বপ্নের ঘোর নয়, শুধু বিস্মৃতি নয়—মেয়েটার চোখে মুখে সত্যিই কি যেন দুর্বোধ্য সমস্যা একটা। দুর্বোধ্য আকূতি। যেন কি এক অজ্ঞাত সমুদ্রে ভাসছে, আর ভাসতে ভাসতে তার তট্ খুঁজছে। গুণী দত্তর দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু মানুষটাকে দেখছে না। চাঁদ সাহেব কি সমস্যার কথা বলেছিল। মেয়েটার চোখে এ কোন্ সমস্যার সমুদ্র?

হাতের সিগারেট আগেই ফেলে দিয়েছিল, পাছে মুখের ধোঁয়ায় এই বিহ্বল তন্ময়তা ভেঙে যায় এই জন্য ঘাড় ফিরিয়ে মুখের অবশিষ্ট ধোঁয়াটুকু নির্গত করে দিয়ে তার দিকে আবার ফিরল গুণী দত্ত। মেয়েটা একটা হাত দিয়ে তার হাত তার বাহু তার কাঁধ তার বুক স্পর্শ করে দেখেছে। গুণী দত্তর বিস্ময়ের শেষ নেই, যাদু-মানুষ কিনা তাই দেখছে নাকি। এই প্রথম দেখলে মাথার গণ্ডগোল আছে বলেই ধরে নিত।

দু'হাতে গুণী দত্ত তার কাঁধ ধরে মুখখানা পুরোপুরি জ্যোৎস্নার ধারার দিবে ফিরিয়ে দিল। তারপর চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরল।

তুমি আমাকে এত ঘৃণা করো কেন?

হঠাৎ যেন বিস্মৃতির ঘোরে ভাঙন ধরল। বিহ্বল আচ্ছন্নতা কেটে যেতে লাগল। মেয়েটার চেতনা ফিরছে, দিশা ফিরছে, নিজের মধ্যে ফিরে আসছে সে। চোখের দৃষ্টি বদলাচ্ছে, এখন আর সে যাদু-মানুষ দেখছে না, শুধু মানুষ দেখছে। যে মানুষকে এই ক'দিন ধরে সে দেখে আসছে। চোখে তেমনি অবিশ্বাসের ছায়া আর বিদ্বেষের ছায়া পড়ছে, দৃষ্টিটা সচেতন রূঢ়তায় খরখরিয়ে উঠছে।

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে চোখের পলকে ঘরের অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে গেল শিরিন।

গুণী দত্ত দাঁড়িয়ে।

... আজ সে বিস্ময়ের ধাক্কায় অগণিত দর্শকের হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিয়েছিল প্রায়।

আজই নাকি?

সাত দিনের সাতটা শো-এর প্রোগ্রাম ছিল বোম্বাইয়ে। তিন সপ্তাহে এনে দাঁড় করাতে হল সেটা। তার ওপর ছুটির দিন ডবল শো। আগে ছাড়ান পাওয়ার কোন উপায় দেখল না উড দম্পতি। প্রথমে ভারতের সর্বত্র একবার করে ঘুরে এসে বাজার যাচাই হওয়ার পরে সুবিধেমত এক এক জায়গায় বসার ইচ্ছে ছিল তাদের। গুণী দত্তের সঙ্গে আলোচনা করে সেই রকমই প্ল্যান ঠিক করা ছিল। কিন্তু সাতদিনে নড়ার নামে জনতা মারমুখী।

এ ধরনের অন্তরায় কাম্য। জনতার এই ইচ্ছার বেগকে কি করে প্রচারের খাতে বইয়ে দিতে হয় উড দম্পতি সেটা ভালই জানে। টেলিগ্রামে মাদ্রাজ দিল্লীর প্রোগ্রাম নাকচ করে অন্য সময় ফেলা হল। চিঠিতে চিঠিতে তাদের অসহায়তার বারতা ছুটল।

আর দর্শনোন্মুখ জনতা কত অভিনব ভাবে তাদের আটক করছে, কত রকমের বিচিত্র কাণ্ডকারখানা করছে, চুটকি কাগজগুলোকে সেই সব সত্যি-মিথ্যায় মেশানো কাহিনীও তলায় তলায় তাদেরই লোক সরবরাহ করে বেড়াতে লাগল।

একটা উত্তেজনা আর উদ্দীপনা মিশ্রিত চাহিদা সৃষ্টি কবা গেল এই ফাঁকে। ফলে তারা যখন বোম্বাইয়ে বসে তখনই দিল্লী আর মাদ্রাজের বাজার প্রায় তৈরি। আর কলকাতার মঞ্চের কর্তা-ব্যক্তিরা প্রস্তাবনা পেয়েই উদগ্রীব—কবে নাগাদ ম্যাজিয়ুড কোম্পানির কলকাতায় পদার্পণ আশা করবে তারা?

প্রথম দিন থেকে হিসেব করলে বোম্বাই ছেড়ে নড়তেই ছয় সপ্তাহ কাবার। প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল ভারতে পদার্পণের দু'সপ্তাহ বাদে। বোম্বাইয়ের বাজার বোঝা গেছে। পর্যটন-সফর শেষ করে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সফরে ফিরে এলে এখানকার শহরের বিভিন্ন মঞ্চে মাস ছয়েকের জন্য অন্ততঃ জাঁকিয়ে বসা যাবে। আর মফঃস্বল শহরে আরো তিন-চার মাস। সমস্ত বোম্বাইয়ে পরের বারে প্রায় এক বছরের সম্ভাবনা নোট করে রাখল জেনিফার উড।

এইভাবে তৈরি বাজার ফেলে চলে যাবে সেটা আদৌ ইচ্ছে ছিল না চাঁদ সাহেবের। দোস্তকে সে দিনের মধ্যে অনেকবার ফুসলেছে, আপাতত এখানেই থেকে যাও, বোম্বাইয়ের নানা জায়গায় ঘোরো—দেখবে এক বছর ছেড়ে দু বছরেও কুলিয়ে উঠতে পারছ না। গুণী দত্ত কানে তোলেনি। বাজার গরম দেখে সরে পড়ার সুফল জানা আছে তার। একনাগাড়ে বসে না থেকে ঘুরে-ফিরে বার বার এলে অনেকগুণ কদর হয়।

চাঁদ সাহেব দেখল, যাওয়া স্থির। হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ল সে। এ ধরনের মুখ গুণী দত্ত এতদিনের মধ্যে দেখেনি। আগে তো দেখেইনি। আর সেই সঙ্গে শিরিনের মুখখানা যেন আরো বেশি গম্ভীর। তার যাবার দিন যত ঘনিয়েছে, তত কঠিন মনে হয়েছে তাকে। একটা দিনেব জন্যেও সদয় ব্যবহার করেনি, সদয় চোখে তাকায়নি তার দিকে। চাঁদ সাহেবের টানা-হেঁচড়ায় শিরিন আরো কয়েকদিন ম্যাজিক দেখতে গেছে। দেখে অবাকও হয়েছে। কিন্তু সে শুধু তখনকার মতই। শিরিন তখন শুধু যাদুকরকে দেখেছে। গুণী দত্তকে দেখেনি। যাদুকর নয়, এই লোকটাই যেন তার চক্ষুশূল। অথচ যাবার আগেও ঠিক এ-রকম ব্যবহার আশা করেনি গুণী দত্ত।

সেদিন এক ফাঁকে শিরিনকে বলেছিল, আর তো দিন কয়েকের মধ্যেই চলে যাচ্ছি এখান থেকে—

সঙ্গে সঙ্গে ছুরির ফলার মত তার দৃষ্টিটা যেন মুখের ওপর এসে বিঁধেছিল। সেই দৃষ্টিতে ভয় ছিল, ঘৃণা ছিল, বিদ্বেষ ছিল, অবিশ্বাস ছিল। তারপর দ্বিতীয় কথা বলার অবকাশ না দিয়ে চোখের আড়াল হয়েছিল। গুণী দত্ত সেই প্রথম দিনের মত শুধু অবাক হয়ে ভেবেছে। তার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে জেনিফার উড ঠাট্টা করেছে। আর জুলি স্যাণ্ডারসন টিপ্পনী কেটেছে, কি বন্ধু, কলে পড়ে গেছ? শেষে যাবে তো এখান থেকে ঠিক?

অনুষ্ঠান শেষ হবার পরদিন থেকেই প্যাকিং শুরু হয়েছিল।

সেদিন বিকেলে গুণী দত্তকে নিয়ে একটা রেস্তরাঁয় এসে বসল চাঁদ সাহেব।

আগে বলে রেখেছিল জরুরী কথা আছে তার। গুণী দত্তর অনুমান, নিজের ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গেই কথা তুলবে। তবু ওই গাম্ভীর্য খুব স্বাভাবিক লাগেনি।

ভনিতা বাদ দিয়ে চাঁদ সাহেব প্রথমেই সরাসরি প্রশ্ন করল, শিরিনের জন্য তোমরা কি ঠিক করলে?

প্রশ্ন শুনে অবাক, তোমরা শুনে আরো অবাক।

কি ঠিক করব?

নিজের জিনিসের দর বাড়ানোর মত করে চাঁদ সাহেব হাসল একটু।—ওই রকম একটা মেয়েকে দলে পেলে তোমাদের কি রকম সুবিধে হয়?

জবাব না দিয়ে গুণী দত্ত চেয়ে আছে। মেয়েটার এই সমস্যার কথাই কি চাঁদ সাহেব একদিন বলেছিল, আর মেয়েটার মুখে-চোখেও কি এই সমস্যার ছাপই দেখেছিল সে গোড়ার দিকের সেই এক রাত্রিতে?

অবশ্য তুমি আছ বলেই ওকে দেব, চাঁদ সাহেব আবার গম্ভীর, ছ'বছর আগে তোমাকে বিলেতের জাহাজে যেদিন তুলে দিয়েছিলাম, ফিরে গিয়ে সেই দিন থেকেই ওকে তোমার হাতে দেব বলে তালিম দেওয়া শুরু করেছি। ভালো করে খেতে পাইনি, তবু পয়সা খরচ করে ওকে ইংরেজি বাংলা শিখিয়েছি।

গুণী দত্ত বিমূঢ় খানিকক্ষণ, তারপর সচকিত।—ওকে বলেছ?

তুমি আসার আগে বলেছি। যেদিন তুমি বোম্বাইয়ে নামলে তার আগের রাতে বলেছি।

মেয়েটার বিরূপ আচরণের একটা হদিস পেল গুণী দত্ত। জিজ্ঞাসা করল, সে রাজী হয়েছে?

না।

তবে?

তাহলেও সে জানে তোমার সঙ্গে তাকে যেতে হবে। তার বিপদ কোথায় সে জানে। আর আমি তাকে বেশিদিন রক্ষা করতে পারব না তাও জানে। এখনই অনেক বাজে লোক হামলা করে।

কোন্ ধরনের বাজে লোক কি হামলা করে গুণী দত্তের ধারণা নেই। জিজ্ঞাসাও করল না। বলল, বেশ তো, তাকে ছাড়ার দরকার কি, তাকে নিয়ে তুমিও আমার সঙ্গে থাকো।

চাঁদ সাহেব চুপ খানিকক্ষণ। বিদায়ী দিনের আলোয় মুখের কালচে ছাপটা আরো স্পষ্ট লাগছে। লালচে দাড়িগুলোও অযত্নে অগোছালো দেখাচ্ছে। আজ গুণী দত্তর হঠাৎ আবার মনে হল লোকটার মধ্যে একটা শুকনো টান ধরেছে, ক্ষয় শুরু হয়েছে।

চাঁদ সাহেব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। একটা প্রলোভনের প্রস্তাব নাকচ করল যেন। বলল, কারো ঘাড়ের ওপর বসে খাওয়া আমার পোষাবে না। কোনোদিন তা করিনি।

গুণী দত্তর মেজাজ চড়ল, গলাও চড়ল একটু।—কিন্তু আমার এই ঘাড় তো আজ তোমার জন্যেই সোজা হয়ে আছে, নইলে এগারো বছর আগেই তো সেই

কলকাতার মাটিতে মিশে যেত।

যেত না। খোদাতালা তোমার নসীবে মাথা উঁচিয়ে চলা লিখে রেখেছে। চাঁদ সাহেব না এলে আর কেউ আসত। খোদার ইচ্ছেমতই সব হত।

গুণী দত্ত জবাব খুঁজে পেল না। কি একটা অজ্ঞাত অনুভূতি ভিতর থেকে গুমরে উঠতে চাইছে তাও জানে না। একটু বাদে জোর দিয়ে বলল, কিন্তু তোমারই বা চলবে কি করে, তোমার তো রোজগারপাতি প্রায় বন্ধ বলছিলে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চাঁদ সাহেব বেশ ধীর-স্থির মুখেই বলল, তুমি শিরিনের দাম দেবে। শিরিনের জন্য এ পর্যন্ত যা করেছি সে-সব বিচার-বিবেচনা করে দেখবে।

গুণী দত্ত একটা বিষম ঘা খেয়ে বোবা একেবারে। মুখে কথা সরল না, হাঁ করে চেয়ে রইল শুধু।

প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে চাঁদ সাহেব আবার বলল, ম্যাজিক দেখাবার জন্যে তোমরা তো কত মোটা মোটা খরচ করে সরঞ্জাম কেনো, আমার নিজের হাতের তৈরী সব থেকে সেরা জিনিস শিরিন, ওকে নিয়ে খেলা শুরু করলে তোমাদের নসীব আরো ফিরে যাবে—দাম পাব না কেন? ভালো দাম পাব—

যা শুনল, গুণী দত্ত বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পাচ্ছে না। একবার মনে হল, গম্ভীর মুখে একটা রসিকতাই করছে লোকটা। কিন্তু এমন মর্মান্তিক রসিকতা ভাবা যায় না। একদিন ওই মেয়েকেই অনেক দাম দিয়ে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল তার বাবা।....নাকি সবই বানানো? তার কাছ থেকে টাকা চাইবে বলেই সে গল্প বানিয়েছে? ভাবতে গিয়েও নিজের মনটাকেই অত্যন্ত ছোট মনে হল গুণী দত্তর। চাঁদ সাহেব সাধুপুরুষ নয় খুব—ভাঁওতা দিয়ে ছলচাতুরী করে আজ পর্যন্ত অনেকের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছে সে। সে-সব ইতিহাস গুণী দত্ত জানে। কিন্তু তার কাছ থেকে সে-ভাবে টাকা নেবার তো কোন প্রশ্ন ওঠে না। টাকা গুণী দত্ত তাকে এমনিতেই দিতে পারে। তার ভবিষ্যতের ভার গ্রহণেও রাজী সে। কিন্তু তার বদলে এ কি প্রস্তাব!

গুণী দত্ত চেয়ে আছে। চাঁদ সাহেব প্রতীক্ষা করছে। ওই মুখে কোনো রসিকতার আভাস মাত্র নেই। বিদায়মুখী দিনের মতই বিষণ্ণ, ক্লান্ত।

গুণী দত্ত বিব্রত মুখেই হঠাৎ হাসতে চেষ্টা করল একটু। হালকা সুরেই বলল, তোমার ভালো জিনিস তো তোমার কাছে। ভাল দাম পাবে কি মন্দ দাম পাবে সেটা যে নেবে তার প্রয়োজনের ওপর নির্ভর করছে।

এটা ঠাট্টার কথা নয়, চাঁদ সাহেবের গলা ঈষৎ উষ্ণ, অসহিষ্ণু—তুমি বলেই মেয়েটাকে নিশ্চিন্ত মনে তোমার হাতে তুলে দিয়ে ভাবতে পারছি খোদার যা মর্জি তাই হবে। আর কেউ হলে তুমি যা দেবে ডবল পেলেও ছাড়তে পারতুম না। ও-সব বাজে কথা থাক, এখন কি দেবে বলো—

গুণী দত্ত শেষবারের মতই যেন দেখে নিল তাকে। না, হেঁয়ালি কিছু নয়, দুর্বোধ্য কিছু মনে হয় না। যা শুনছে তাই বটে। শিরিনকে সে তার হাতে তুলে দেবে। সেই জন্যেই জাহাজে জুলি স্যান্ডারসনকে প্রথম দেখেই অমন ক্ষেপে গিয়েছিল,

আর সেই জন্যেই যে-লোক কাউকে বাড়ির দরজা মাড়াতে দেয় না, সে হোটেলে উঠতে না দিয়ে সরাসরি তাকে নিজের আস্তানায় এনে তুলেছে। চাঁদ সাহেবের আরো অনেক কথা অনেক হাবভাব আজ অর্থপূর্ণ আর তাৎপর্যপূর্ণ মনে হচ্ছে গুণী দত্তর।

বিনিময়ে চাঁদ সাহেব টাকা নেবে। চাঁদ সাহেব তার ভারতের মাটিতে পা দেবার আগেই অনেক প্ল্যান করে রেখেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, বুকের যে-দিকটা দেখল এই ক' সপ্তাহ ধরে সে কি তাহলে মিথ্যা, মেকী।

শান্ত মুখেই গুণী দত্ত বলল, বেশ, তুমি কি চাও বলো।

চাঁদ সাহেব মাথা নিচু করে ভাবল খানিক। মনে হল, মনে মনে কিছু হিসেব করে নিল। তারপর জবাব দিল, পাঁচ হাজার হলেই হবে—

পাঁচ হাজার হলে কি হবে?

চাঁদ সাহেব থতমত খেল, বলল, কিছু হবে না, পাঁচ হাজার টাকা তুমি আমাকে দেবে।

দেহের হাড়-পাঁজরের মধ্যে একটা বাষ্পীয় যাতনা ওঠা-নামা করতে লাগল বুঝি। এমন হচ্ছে কেন গুণী দত্ত জানে। কেবল মনে হচ্ছে, মনের দিক থেকে কি একটা সম্পদ সে হারালো যার দাম পাঁচ হাজারের অনেকগুণ বেশি। অথচ এই যাতনা সত্ত্বেও চাঁদ সাহেবের দিকে চেয়ে কিছুতে কেন জানি রূঢ় হয়ে উঠতে পারছে না। রূঢ় হয়ে উঠতে চাইছে মন, তবু না।

টাকা আছে। পাঁচ হাজার টাকা নিজেরই আছে, কারো কাছে চাইতে হবে না। আরো অনেকগুণ বেশিই আছে। কিন্তু তবু ঠাণ্ডা জবাব দিল, আচ্ছা, মিস্টার আর মিসেস উডের সঙ্গে কথা বলি, কোম্পানির মালিক তো আসলে তাঁরাই—

তারা যদি আপত্তি করে? যদি না চায় ওকে?

তাহলে তুমি কি করতে বলো?

চাঁদ সাহেব স্থির চোখে চেয়ে রইল খানিক, কালচে মুখ লাল দেখালো, সঙ্গে সঙ্গে রঙ-করা দাড়ির গোছাও। চাপা তর্জনে ঝাঁজিয়ে উঠল তারপর, উনকী পসন্দ না-পসন্দসে কেয়া লেনা-দেনা হ্যায়? ইস লড়কী কো তুমহে লেনা হী পড়েগা, অওর মুঝে রুপয়ে দেনেহী পড়েঙ্গে। সমঝে?

গুণী দত্ত আবারও নির্বাক খানিকক্ষণ। চেয়ে রইল। তারপর উঠে দাঁড়াল।—বুঝলাম। চলো।

না, আর ভাববে না। টাকা দেবে। তবে শিরিনকে দলে নেবে কিনা সেটা পরে ভাববে। আজ তার স্নায়ুর ওপর দিয়ে ধকল গেছে একটা। আজ গুণী দত্ত এই স্নায়ুর ওপর খুব নির্ভর করতে পারছে না।

মনে মনে ঠিক করল, ঘরে পৌঁছে আজ রাতেই অন্য কোথাও উঠে যাবে। জুলিরা যে হোটেলে আছে সেই হোটেলে নয়। এতদিন বাদে যাবার দু'পাঁচ দিন আগে থাকার ব্যবস্থা বদলাতে দেখতে তারা অবাক হবে। আর কেউ না হোক, জুলি অন্তত সকৌতুকে সতের রকমের প্রশ্নের জাল ছড়াবে।

কিন্তু ঘরে ফেরার আগেই সংকল্প বদলালো। কেন বদলালো নিজেও ভালো জানে না, শুধু মনে হল যাওয়া উচিত হবে না। আজ যে-রকমই দেখুক, এই লোকের কাছ থেকে সে যা পেয়েছে একদিন, তা তো মিথ্যে নয়। এতকাল লোকটার ভালো-মন্দ বিচার করেনি, আজও করবে না।

শো শেষ হওয়ার দরুণ হাতে অবকাশ ছিল। সন্ধ্যেটা আর হোটেলে গেল না। শিরিনের সঙ্গে তার কিছু কথা বলে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। ওইটুকু মেয়ের মধ্যে যে সত্তা প্রতিফলিত তাকে কেন জানি অবহেলা করা চলে না। অবকাশ মিলল। সে-অবকাশ চাঁদ সাহেব ইচ্ছে করে করে দিল কিনা জানে না। সন্ধ্যাব পব সে কোথায় বেরিয়ে গেল।

গুণী দত্ত সেই ঢাকা বারান্দাব রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে সিগারেট টানছিল, একসময় ঘাড় ফিবিয়ে দেখে মেয়েটা চৌকিতে বসে আছে। একাগ্র দৃষ্টিতে তাকেই দেখছে।

সিগারেট ফেলে গুণী দত্ত ঘরে এলো। শিরিন চোখ ফিরিয়ে নিল না। গুণী দত্ত কাছে এসে দাঁড়াল, প্রায় এক হাতের মধ্যে। তবু না। মনে হল তারও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, সে-ই কিছু বলবে। বলল।

এখান থেকে কবে যেতে হবে?

গুণী দত্ত অপেক্ষা করল একটু, জবাব না দিযে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তুমি যেতে চাও '

সাহেবজী বলছে আমাকে যেতে হবে।

বলুক। তুমি না চাইলে যেতে হবে না।

ঠিক এই কথা আশা করেনি যেন। অতল গভীর কালো দুটি চোখের তারা তাব মুখেব ওপব নড়েচড়ে স্থির হল। বিশ্বাস করবে কি করবে না, তাই বুঝতে চেষ্টা কবল। তাবপর ছোট্ট জবাব দিল, আমি যাব।

অন্যদিকে চোখ ফেরাল, বুকের তলায় কিছু একটা আলোড়ন প্রতিহত কবার চেষ্টা। দুই হাত বাড়িয়ে গুণী দত্ত তাব মুখখানা আবার নিজের দিকে ফিরিয়ে দিল। হাত সবাল না, হাতের মধ্যে তার দুই গাল ঢাকা পড়ে গেছে। গুণী দত্ত সামনেব দিকে ঝুঁকল একটু। দেখছে। দুটো চোখের গভীরে নিস্তরঙ্গ নিটোল কালো সমুদ্র দেখছে। এই চোখে কতদিন আগুন দেখেছে. আজ সমুদ্র দেখল। অথচ মেয়েটাব বয়েস মনে পড়লে অবাক লাগে।

তুমি যাবে এখানে এসেও আমি জানতুম না। চাঁদ সাহেব আজ বলেছে। তুমি নিজের ইচ্ছেয় না এলে কেউ তোমার ওপর জুলুম করবে না। তুমি এখানেই থাকো—

দেখছে। দুই হাতের মধ্যে ধরা মুখখানা নাড়ল একটু। থাকবে না। যাবে।

তুমি আমাকে এত ঘৃণা কর কেন?

ওই চোখে আবারও একটা বিরূপ ছায়া পড়বে মনে হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়ল না। ঘৃণা করলে ভুল হবে কিনা তাই দেখছে যেন। নিরুত্তর।

জীবনে নিজের জন্যে গুণী দত্ত কোনদিন সওয়াল কবেছে কিনা মনে পড়ে না। কিন্তু সেদিন করল। বয়সের তফাতটা বড় হয়ে উঠল না। মনে হল, শুধু তারই

জন্য একটানা ক'দিন ধরে মেয়েটা তুষানলে জ্বলছে। দস্যুর মত সে তাকে সাহেবজীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে ভেবেছে। এর কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে না পারলে অপরাধ হবে যেন। মুখখানা ছেড়ে দিয়ে গুণী দত্ত সেই এক কথারই পুনরুক্তি করল আবার। বলল, শিরিন, তুমি বিশ্বাস করো, চাঁদ সাহেবের এই মতলব আজ বিকেলের আগেও আমি জানতুম না। চাঁদ সাহেব আমাকে আজ পর্যন্ত অনেক দিয়েছে—এই জীবনটাই দিয়েছে। সে না থাকলে প্রাণে বাঁচতুম না। আমাকে বিলেতেও সে-ই পাঠিয়েছে। তাই সে আমাকে আদর করে ঘরে ডেকেছে যখন আমি না এসে পারি কি করে? কিন্তু তার মন বুঝিনি। যাক সে কথা, তুমি যেতে না চাইলে কেউ তোমাকে জোর করে নিয়ে যাবে না, তোমার সাহেবজীও তোমাকে কিছু বলবে না—বুঝলে?

শিরিন তেমনি নিষ্পলক চেয়ে রইল খানিক। কতটা বুঝেছে বোঝা গেল না, কিন্তু অবিশ্বাস আর করছে না হয়ত। না জেনে লোকটার ওপর বেশী অবিচার করেছে কিনা তাই দেখল যেন। তারপর অনুচ্চ শান্ত জবাব দিল, সাহেবজী রাজী হবে না। আমার ভালোর জন্যেই আমাকে দিয়ে দিতে চায়।

গুণী দত্ত একটা উদ্গত উষ্মার ধাক্কা সামলে নিল। ফস করে বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ, ভালোর জন্যেই তোমাকে দিতে চায়, আর তার বদলে টাকা চায়—পাঁচ হাজার টাকা। বলল না, বা বলতে পারল না। চাঁদ সাহেবের সম্বন্ধে বিরূপ কিছু বলতে এখনো অভ্যাসবশতই বাধে হয়ত। জবাব দিল, সে-জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, সাহেবজী যাতে রাজী হয় সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি কি চাও বলো। থাকবে এখানে?

শিরিন চেয়েই আছে। দেখছে তাকে। কিছু ভাবছেও হয়ত। গুণী দত্ত উৎকর্ণ একটু। এবারের জবাবটাই যেন শেষ জবাব, ঠিক জবাব।

তার মুখের ওপর দু'চোখের আয়ত গভীর দুটো কালো তারা তেমনি নিবদ্ধ। জবাব দিল না। আগের মতই শুধু মাথাটা নড়ল একটু। থাকবে না। যাবে।

বিনিদ্র শয্যায় সমস্ত রাত শুধু ভেবেছে গুণী দত্ত। এলোমেলো বিচ্ছিন্ন ভাবনা। এই একটা মেয়ে জড়িয়ে গেল সেটা অনভিপ্রেত নয় যেন আদৌ। ভাবতে ভালো লেগেছে, অননুভূত উদ্দীপনা বোধ করেছে একটা। অথচ অজ্ঞাত অস্বস্তি কিসের। নিজের ভিতরটা তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছে গুণী দত্ত। প্রেম কামনা বাসনা? ভাবতে গিয়ে হাসিই পেল। না, ওই মেয়েকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রিয়ের কোন বন্ধ দরজায় ঘা পড়েনি। ভিতরটা আঁতিপাতি করে দেখেছে গুণী দত্ত, ডুব দিয়ে হাতড়ে দেখেছে।....তবে এই উদ্দীপনা কিসের? তবে চাইছে কেন, আসুক?

এই উত্তরটাই আবিষ্কার করেছে সে। আবিষ্কার করে আরো খুশি হয়েছে। উদ্দীপনা আরো বেড়েছে। অনেক, অনেকদিন আগে কলকাতায় কোন এক পরিচিত লোকের কাছ থেকে সে একটা পাথর পেয়েছিল। হীরে-মুক্তো কিছু নয়, কি যে তা আজও জানে না। শুধু জেনেছিল জীবন্ত পাথর ওটা—লোকের সর্বনাশ করতে পারে,

আর সর্বনাশ থেকে টেনেও তুলতে পারে। এমনিতে সাদা-মাটা দেখতে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই এক ধরনের অস্বস্তিকর জ্যোতির আভা চোখে পড়ত। গুণী দত্তর তখন ডুবন্ত অবস্থা। যে-দিনটা কাটলো সেই দিনটাই বাঁচল—এমন। সেই পরিচিত লোক পাথরটা সয় কিনা পরখ করতে দিয়েছিল তাকে। যত্ন করে গুণী দত্ত সেটা বালিশের নিচে রাখত, শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে নেড়েচেড়ে দেখতে। জীবন্তই মনে হত তার। অথচ এমনিতে দেখার মতো কিছু নয়, লোভের কিছু নয়। কিন্তু এরই সঙ্গে তার ভাগ্যের যোগ, কিছুতে তা ভুলতে পারত না। সেই জন্যেই দুর্মূল্য মনে হত ওটা। যে-ক'দিন তার কাছে ছিল, সযত্নে আর একান্ত আগ্রহে রক্ষা করেছিল সেটা।

সেই পাথর হাতছাড়া হওয়াটা ভিন্ন কাহিনী। কিন্তু শিরিনের আসাটা পাথর আসার মতই যেন। একটা রূপসী মেয়ে দলে আসছে বলে কোন আকর্ষণ বা আগ্রহ নেই। শুধু মনে হয়েছে, এই মেয়েটার সঙ্গে তার পেশার যোগ, ভাগ্যের যোগ, নিয়তির যোগ। এই জন্যেই দুর্লভ, দুর্মূল্য। এই জন্যেই বুঝি সে আসছে বলে উদ্দীপনা-মিশ্রিত একটু অস্বস্তিও। বিধাতাপুরুষ পরম যাদুকর। চাঁদ সাহেব নয়, সেই বিধাতা এই চেয়েছে, এই দিয়েছে। একে গুণী দত্ত একাগ্র শ্রদ্ধায় নিষ্ঠায় সম্ভ্রমে রক্ষা করবে।

রক্ষার অটুট সংকল্পে গুণী দত্ত বিছানায় উঠে বসেছিল।

পরদিন। শিরিন আর চাঁদ সাহেবকে নিয়ে এলো হোটেলে, মিস্টার আর মিসেস উডের কাছে। জুলি স্যান্ডারসনও ঘরে বসে। সকলেই ভাবল বেড়াতে এসেছে। জেনিফার উড আদর-আপ্যায়ন করল, চা খাওয়াল। আজ শিরিনকে কাছে ডেকে জুলি স্যান্ডারসনও আলাপ জমাতে চেষ্টা করল একটু। কিন্তু আলাপ জমল না। কারণ, কথা তাকে এক-তরফাই বলতে হল। মাথা নেড়ে জবাব দিতে পারলে শিরিন মুখ দিয়ে শব্দ বার করেনি। আধ ঘণ্টা বাদে সকন্যা চাঁদ সাহেবকে বিদায় দিয়ে গুণী দত্ত সিঁড়ির কাছ থেকে ফিরে এলো। মেয়েটাকে দলের সঙ্গে যুক্ত রাখাই সঙ্গত মনে হয়েছে তার।

মিসেস উডকে বলল, বোসো, দরকারী কথা আছে।

মিসেস জেনিফার উড বয়সে বছর দুই বড় হবে গুণী দত্তর থেকে। মহিলার মধ্যে পুরুষালি ভাবটা একটু প্রখর। মেজাজ প্রসন্ন থাকলে সুরসিকা, অন্যথায় কড়কড়ে হাবভাব। কিন্তু গুণী দত্তর সঙ্গে কথাবার্তায় মেজাজ সর্বদা প্রসন্ন রাখতে হয়। অতি আদরের একটি পোষা জীবকে সর্বরকমে প্রশ্রয় দেবার মতই ব্যবহার তার সঙ্গে। বেশি খুশি হলে বা মতের অমিল হলেও নাক ধরে গাল ধরে টানে, ভ্রূকুটি করে, দরকার বুঝলে দুই-একটা রসের কথাও বলে।

—ডোণ্ট টেল্ মী বয় ইউ আর ইন লাভ। সী ইজ ডেঞ্জারেস্‌লি বিউটিফুল, অ্যা-অ্যাম সিউর ইউ উইল লুজ ইওর হেড।

মিস্টার উড হেসে সায় দিল। জুলি স্যান্ডারসন একটা সিগারেট ধরিয়েছে, তার চোখেও কৌতুক কাঁপছে।

উড দম্পতির উদ্দেশে গুণী দত্ত বলল, পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক লেখো, দরকার আছে, বেয়ারার চেক, এক্ষুনি ভাঙাতে হবে—

হঠাৎ এই টাকার অঙ্ক শুনে মিস্টার উডের থেকেও মিসেস উড বেশি নাড়াচাড়া খেল।—কি ব্যাপার?

ওই মেয়েটিকে আমাদের ইউনিটে নেব, টাকাটা চাঁদ সাহেবকে দিতে হবে।

উড দম্পতি হঠাৎ কি বলবে ভেবে পেল না, জুলি স্যান্ডারসন এবারে এদিকে ঘুরে বসেই সিগারেট টানছে।

এডওয়ার্ড উড বলল, কিন্তু তার জন্যে আগে থাকতেই এত টাকা দিতে হবে কেন?

চাঁদ সাহেবের সঙ্গে সেই রকম কথা হয়েছে।

তারা দুজন চুপ। এ রকম প্রস্তাব শুনলে বিরক্ত হবার কথা, কিন্তু সাহস করে বিরক্তি প্রকাশ করতে পারছে না। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট ঝুলিয়ে জুলি স্যান্ডারসন নির্লিপ্ত কৌতুকে মজাই উপভোগ করছে যেন।

একটা স্থূল প্রশ্ন করে বসল জেনিফার উড, নাও কাম ক্লীন মাই ডিয়ার, মেয়েটাকে তুমি নিজের জন্যে চাও না দলের জন্যে?

দলের জন্যে।

বিশ্বাস্য নয়। আবার অবিশ্বাস'ও নয়। কারণ দলের কথা না ভাবলে পাঁচ হাজার টাকা নিজেই সে অনায়াসে দিতে পারে। দেবার মত দরাজ হাতও। এবারে একটু দ্বিধান্বিত মুখে বলল মিসেস উড, আমার কেমন মনে হচ্ছে ও রকম সুন্দর মেয়েকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল, ও থাকবে না।

মিস্টার উডও হাসিমুখে স্ত্রীর উক্তি সমর্থন করল, বলল, মাঝখান থেকে অনেক রকম গন্ডগোলের সৃষ্টি হতে পারে, এত রূপ ঠিক নির্ভরযোগ্য নয়।

তার রসিকতায় যোগ না দিয়ে গুণী দত্ত উঠে দাঁড়াল। বলল, পরের কথা আমি ভাবছি না। তোমরা টাকা না দিলে আমিই দেব, কিন্তু সেক্ষেত্রে শিগগিরই হয়ত তোমাদের আবার সব কিছুই নতুন করে ভাবতে হবে। সী উইল কাম ইন ম্যাজিক, উইথ ইউ অর উইদাউট ইউ।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ইঙ্গিতটা এতই স্পষ্ট যে বাকি তিনজন হতভম্ব, নির্বাক।

গুণী দত্ত বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির আধাআধি নেমেছিল, পিছনে ডাক শুনে থামল।—হ্যালো।

জুলি স্যান্ডারসন। চাপা গলায় ঝাঁজিয়ে উঠল, উঠে এসো।

গুণী দত্ত উঠে এলো। জুলি স্যান্ডারসন পাশের ঘর, অর্থাৎ নিজের ঘরে এলো তাকে নিয়ে। মুখখানা হাসি-হাসি কিন্তু দৃষ্টিটা ক্রুদ্ধ।

প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছ, কেমন?

না।

ইউ লায়ার। তুমি সেই লন্ডন থেকে মিছে কথা বলে আসছ আমার কাছে।

কি মিছে কথা?

তুমি বলোনি কেউ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে না, তুমিও কারো অপেক্ষায় নেই?

ঠিকই বলেছি।

তাহলে এটা কী? এসেই ওখানে পড়ে আছ কেন?

গুণী দত্ত চুপচাপ চেয়ে রইল খানিক, তারপর ফিরে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটার এখন বয়েস কত বলে মনে হয় তোমার?

বয়েস যাই হোক, তুমি মিছে কথা বলবে কেন?

মিছে কথা বলিনি। মেয়েটার বয়েস এখন সাড়ে সতের। আমি বিলেতে গিয়েছিলাম ছ'বছর আগে। ওব বয়স তখন এগারো সাডে এগারো–ওই বয়সের একটা মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম মনে হয় তোমার?

জুলি স্যান্ডারসন থতমত খেয়ে গেল। তারপর হেসে ফেলল।–ও, এটা তাহলে নতুন প্রেম?

গুণী দত্ত মাথা নাড়ল। তাও না। তারপর অল্প কথায় মেয়েটার সম্বন্ধে যতটুকু জানে বলল। আর সেই সঙ্গে পাথরটার গল্প করল, বলল, অদৃষ্টের দিশারি সেই পাথরটার সঙ্গে মেয়েটাকে তফাৎ কবে দেখছে না সে।

জুলি স্যান্ডারসন অবাক খানিকক্ষণ। তারপর সত্যিকারের আবেগেই বলে ফেলল, আচ্ছা মেয়েটাকে তুমি নিয়ে এসো। এরা না নেয়, আমরা নিজেরাই দল গড়ব একদিন—তুমি একাই তো একশ।

গুণী দত্ত হাসছে একটু একটু। এবাবে সে একটা প্রশ্ন করবে, নির্মম প্রশ্নই। তবু সময়ে স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া ভালো। বলল, কিন্তু আমি যা-ই হই, তোমার ব্যাপারখানা কী? তোমার অত রাগ কেন?

জুলি তক্ষুনি নির্দ্বিধায় জবাব দিল, আমি ভাবলাম তুমি মিছে কথা বলেছ, ছোট হয়ে গেছ—রাগ এর জন্যে। চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে হেসে ফেলল, বলল তোমাকে আর একটু কম চিনলে চোখ কান বুজে অনেক আগে আমিই তোমাকে ঘায়েল করে ফেলতাম। শেষে সামলাতে পারব না জেনেই সে-চেষ্টা করিনি। তোমার সাধনা দেখেছি আর তোমার এক একটা মুডও দেখেছি।—হরিবল। দু চোখ বিস্ফারিত করে তাকাল, তারপর হঠাৎ-ই গভীর আন্তরিকতায় কোমল করে বলল, গুণীডাটা, আমি শুধু তোমাকে বড় দেখতে চাই, আর কিছু চাই না। সত্যি ওই জন্যেই রেগে গিয়েছিলাম।

এ-কথা জুলিই বলতে পারে। দু হাত বাড়িয়ে গুণী দত্ত তাকে কাছে টেনে আনল। মাথা নুইয়ে দুষ্টুমি করে কি বলতে গেল, কিন্তু তার আগেই বাধা পড়ল।

—ওয়েট ওয়েট। লেট মি ফিনিস মাই জব ফার্স্ট। মিসেস উড ত্রস্ত পায়ে ঘরে ঢুকল। হাসিমুখে জুলি সরে দাঁড়াল। হাতের চেকটা মিসেস উড দু হাতে গুণী দত্তর চোখের সামনে ধরল একবার, তারপর সেটা তাব জামার পকেটে গুঁজে দিল। দিয়ে ছদ্মরোষে মুখের দিকে থমকে তাকাল, এক হাতে খপ করে তার ঝাঁকরা চুলের মুঠি ধরে মাথাটা টেনে এনে মুখের ওপর সশব্দে চুমু খেয়ে বসল একটা। তারপর চুল ছেড়ে দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি গট গট করে চলে গেল।

জুলি স্যান্ডারসন হেসে সারা। হাসছে গুণী দত্তও। জুলি তরল মন্তব্য করে

উঠল, সাম্ ডে সী উইল লীভ্ হিম অ্যান্ড টেক্ ইউ।

মাদ্রাজের ট্রেন ছুটেছে। সমস্তক্ষণের মধ্যে শিরিনের সঙ্গে দশটা কথাও হয়নি গুণী দত্তর। তার পাঁচ কথার জবাবে মেয়েটা একবার হাঁ বা না ছাড়া আর কিছু বলেনি। জুলি স্যান্ডারসন আলাপ জমাতে চেষ্টা করেও পেরে ওঠেনি। রসিকতা করে তার হাত আর গাল ঘষে দেখেছে রঙটা খাঁটি না মেকী। শেষে গুণী দত্তকে চুপিচুপি বলেছে, ওইটুকু মেয়ে যে-ভাবে তাকায়, সী ক্যান কীল্—আমার দ্বারা হল না।

চার বার্থের কূপে। এটাতে মিসেস উড, গুণী দত্ত, জুলি আর শিরিন। অন্যেরা পাশের বার্থে। মিসেস উড নাক ডাকাচ্ছে। জুলিও ঘুমিয়ে পড়েছে। শিরিন জানালায় ঠেস দিয়ে মোমের মূর্তির মত বসে। গুণী দত্ত ভাবছিল, মেয়েটার সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠতে কতদিন লাগতে পারে। আর ভাবছিল চাঁদ সাহেবের কথা। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত চাঁদ সাহেবকে বেজায় হাসিখুশিই দেখেছে সে। ট্রেনটা ছাড়ার আগে একবার শুধু কানে কানে বলেছে, খোদার কসম, মেয়েটাকে দেখো।

আর যতক্ষণ ছিল—ট্রেন ছাড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত—শিরিন শুধু চাঁদ সাহেবকেই দেখেছে। নির্নিমেষে দেখেছে। তাকে হাসতে দেখেছে, তার কথাগুলোও শোনেনি যেন—দেখেছে। এই দিনেও চাঁদ সাহেবের অত হাসিখুশি গুণী দত্তর ভালো লাগেনি। কৃত্রিম মনে হয়েছে। এই মেয়েকে হাতছাড়া করে হাত পেতে সে টাকা নিয়েছে আসলে সেটাই বোধ হয় ভুলতে পারছিল না।

গুণী দত্ত নিজের বার্থ থেকে নেমে এলো। রাত প্রায় একটা তখন। তাকে দেখে শিরিন পা গুটিয়ে একটু সোজা হয়ে বসল।

ঘুম আসছে না?

শিরিন চুপচাপ চেয়ে রইল, জবাব দিল না। গুণী দত্ত তার পায়ের দিকটা ঘেঁষে বসল। খুব কোমল গলায় বলল, অত মন খারাপ করছ কেন। আবার তো আমরা আসব এখানে।

কবে?

গুণী দত্ত সোৎসাহে বলল, যদি বলো মাদ্রাজের শো হয়ে গেলেই প্লেনে করে তোমাকে নিয়ে একবার এসে ঘুরে যেতে পারি। কতটুকু আর পথ—

শিরিন আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ, দরকার নেই।

গুণী দত্ত আবার বলল, কত নতুন নতুন দেশ দেখব আমরা, বাইরেও যাব—দুদিনেই তোমার মন ভালো হয়ে যাবে দেখো।

কিন্তু তার দিকে চেয়ে মনে হল সে নিজেই ছেলেমানুষের মত বকছে। কালো টানা দুটো চোখ তার মুখের ওপরে আটকে আছে। তেমনি চেয়ে থেকেই শিরিন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, সাহেবজীকে টাকা দিয়েছ?

এমন একটা আচমকা প্রশ্ন হতে পারে গুণী দত্ত কল্পনাও করেনি। চট করে জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। ইতস্তত করে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে কে বললে?

সাহেবজী বলেছিল তোমার কাছ থেকে টাকা নেবে।

গুণী দত্ত অবাক, এই কথাও বলেছে! লোকটা কত বড় আঘাত দিয়েছে মেয়েটাকে ভেবে মনে মনে এই প্রথম বোধ করি জ্বলে উঠল চাঁদ সাহেবের ওপর। বলে ফেলল, তোমার বদলে সে টাকা নিয়েছে জেনেও ওরকম লোকের জন্য তোমার এত মন খারাপ কেন?

দেখতে দেখতে মেয়েটার চোখ দুটো ধারালো হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য ঝলসে উঠল বুঝি। তারপর আবার ঠাণ্ডা হল। বলল, সাহেবজীর জুয়ার আড্ডার একজন লোক আমার জন্য একবার অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল, টাকা নিয়ে ঘরে এসেছিল সে—সাহেবজী তাকে কিরিচ নিয়ে তাড়া করেছিল।

শোনা মাত্র গুণী দত্ত বিভ্রান্ত বোধ করল কেমন। চাঁদ সাহেবের কাণ্ডকারখানা দুর্বোধ্য।

তুমি কত টাকা দিয়েছ?

না বলে পারল না, মনে হল মেয়েটা শুনতেই চাইছে। বলল, পাঁচ হাজার।

চুপচাপ কিছুক্ষণ। ভাবছে কিছু। ভাবছে না, মনে মনে যেন হিসেবই করছে। তারপর অল্প একটু মাথা নাড়ল, বলল, তাতেই হবে।

গুণী দত্ত চমকে উঠল। মনে পড়ল, চাঁদ সাহেবও যেন অমনি একটু হিসেব করে বলেছিল, পাঁচ হাজার হলেই হবে। জিজ্ঞাসা করল, তাতে কি হবে?

ওই টাকা ফুরোবার আগেই সাহেবজী বেহস্তে চলে যেতে পারবে।

গুণী দত্ত বিমূঢ়। হঠাৎ বিষম নাড়াচাড়া খেল একটা। জিজ্ঞাসা করল, চাঁদ সাহেবের কি হয়েছে?

পেটে ঘা। ডাক্তার বলেছে সারবে না। সরাব ছুঁতে নিষেধ করেছে। খুব সাবধানে থাকলে কিছুকাল বাঁচতে পারে বলেছে। একটু থেমে অস্ফুট স্বরে আবার বলল, সাহেবজী সাবধানে থাকবে না, ওই টাকা ফুরোবার আগে সরাব খেয়েই মরে যেতে চেষ্টা করবে।

গুণী দত্ত স্তব্ধ, নির্বাক। আস্তে আস্তে শিরিন আবার বলল, টাকাও সাহেবজী আমার জন্যে নিয়েছে, আমাকে ভোলাবার জন্যে। আমাকে বলেছে, তুই গেলে টাকা পাব, ভালো চিকিৎসা হবে—তুই না গেলে তোকে খুন করব। সাহেবজী আমার ভালোর জন্যে আমাকে তাড়িয়েছে, টাকার জন্য নয়। আমি জানি, আজ সে গলা পর্যন্ত শরাব খেয়ে ঘরে ঢুকবে।

আর সাড়াশব্দ নেই। গুণী দত্ত দেখছে। শিরিনের দুচোখ বোজা, চিবুকটা বুকের সঙ্গে ঠেকেছে।....প্রথম দিন থেকে মেয়েটার আচরণ একটুও দুর্বোধ্য নয় আর।

কিন্তু গুণী দত্ত কি করবে? চেন টেনে গাড়িটা থামাবে? এই অন্ধকারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবে তারপর? বুকের ভিতর দিয়ে গলার ভিতর দিয়ে একটা অব্যক্ত কিছু গুমরে ঠেলে উঠতে চাইছে।

গুণী দত্ত উঠল একসময়। নিজের শয্যায় ফিরে এলো। শুয়ে পড়ল মুখ গুঁজে। নৈশ অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে ট্রেন ছুটেছে। আর অন্তস্তলের এক মর্মচ্ছেদী আকৃতি

ছুটেছে তার উল্টো দিকে। বোম্বাই শহরের একটা বাড়ির একটা ঘরের দিকে।

ক্ষমা করো বন্ধু ক্ষমা করো। দোস্তকে তোমার ক্ষমা করো।...

॥ ৭ ॥

কলকাতার আসরে অবতীর্ণ হবার অনেক আগেই সাফল্যের আবহাওয়াটি ষোলকলায় প্রস্তুত।

বিস্ময়ের খবর একবার রসিকজনের অন্দরমহলে পৌঁছে দিতে পারলে মিরাকল-ভক্ত মানুষ নিজেরাই অনেক ফাঁক ভরাট করে নেয়, অনেক ছেদ কল্পনায় পুরিয়ে নেয়। যে লক্ষ্য নিয়ে গুণী দত্ত ভারতগামী জাহাজে উঠেই খবরের কাগজের শুভেন্দু নন্দীর সঙ্গে হৃদ্যতায় আবদ্ধ হয়েছিল, রটনার ভিতর দিয়ে সেই লক্ষ্য এখন জনতার আবেগ ছুঁয়েছে। ফলে যেটুকু আশা করা গিয়েছিল লোকের আগ্রহ তার বহুগুণ বিস্তার লাভ করেছে।

ম্যাজিয়ুড় কোম্পানী। দ্বিতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম জানা না থাকলেও রকের ছেলেরা চোখ বুজে ঘোষণা করবে, সারা পৃথিবীর মধ্যেই সব থেকে নামজাদা ভ্রাম্যমাণ ম্যাজিকের দল ওটা। খাস সাহেব মেমসাহেব মালিক। ভারতীয়দের চোখে সেই প্রতিষ্ঠানের অনন্য কারিগরটি ভারতীয় এটা যত না বড় খবর, বাংলাদেশের চোখে তার থেকে অনেক বড় খবর সেই কারিগরটি নির্ভেজাল বাঙালী। তাই তাকে না দেখেও খবরের কাগজের চারগুণ ফাঁপিয়ে আলোচনা সম্ভব হয়েছে এখানে। গুণী-ডাটার শোম্যানশিপ, গুণীডাটার চালচলন প্রসঙ্গে মন্তব্য নির্দ্বিধায় করা যেতে পারে। গুণীডাটার চেহারা? জমাট মাখনে তৈরি, মনে হয় গলে গলে পড়বে, কিন্তু ভিতরে ইস্পাত। গুণীডাটার চোখ? চোখই তো সব। কোথায় কোথায় নাকি চোখে চোখ পড়ার আশঙ্কায় মেয়েরা প্রথম সারিতে বসতে ভয় পেয়েছে। অবশ্য এ-সবই বেকার যুব-চিত্তের উদ্ভাবন, কিন্তু এরই কিছুটা আবার খুব স্বাভাবিক ভাবেই অনেক নিস্পৃহ কানেও পৌঁছয়।

মঞ্চ প্রস্তুত, আবহাওয়া প্রস্তুত, দর্শকের হৃদয়ও প্রস্তুত। এই অকৃপণ প্রস্তুতির মধ্যে কলকাতায় গুণীডাটার আসরে পদার্পণ।

পদার্পণ সার্থক। প্রথম সপ্তাহের সূচনা দেখেই উড দম্পতি ধরে নিয়েছে মাস তিনেকের আগে এখান থেকে নড়া সম্ভব হবে না।

কলকাতায় এসে গুণী দত্ত নিজে গিয়ে মাত্র একজনের সঙ্গেই দেখা করেছে। সে খবরের কাগজের শুভেন্দু নন্দী। বাড়িতে নয়, এডওয়ার্ড উডকে সঙ্গে করে তার কাগজের অফিসে গেছে। জাহাজের আলাপের পর পাঁচটা মাস কেটে গেছে। গোড়ায় গোড়ায় এই যাদুকরটির সম্বন্ধে বাড়িতে আর অফিসের সতীর্থদের কাছে শুভেন্দু অনেক গল্প করেছে। সত্যিকারের গুণী লোক আসছে একজন বাংলা দেশের যাদুমহলে সেই ঘোষণা বোধ হয় সে-ই সবার আগে করেছিল। কিন্তু বিগত ক'টা মাসে প্রচারের ঘোষণা এতগুণে ফেঁপে উঠেছিল যে জাহাজের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার দিকটার প্রতি

আর খুব বেশি আস্থা ছিল না তার।

এই সাক্ষাতে আস্থা চতুর্গুণ ফিরল। তাকে নিয়ে শুভেন্দু নন্দী খুশির জোয়ারে ভাসল খানিকক্ষণ। সঙ্গে করে সম্পাদক-গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। উড সাহেব সাদর আমন্ত্রণ জানালো তাঁদের। আর গুণী দত্তর ইঙ্গিতে সে আরো বাড়তি গোটাকয়েক আমন্ত্রণপত্র গুঁজে দিল শুভেন্দু নন্দীর হাতে।

বিদায়ের আগে শুভেন্দু একদিন তাকে বাড়িতে আসার জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো। তারপর চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, তোমার উনি কেমন আছেন?

উনিটি কে গুণী দত্ত বুঝেছে। জুলি স্যান্ডারসন। হেসে বলল, ভালো। কিন্তু উনিটি যে আমার তোমাকে কে বলল?

অপ্রস্তুত হয়ে শুভেন্দু তার হাত ধরে সানন্দে ঝাঁকুনি দিয়েছে একটা। এই হৃদ্যতার সুফলও পেয়েছে। তাদের দুটো কাগজে যতটা করা সম্ভব করেছে। শুধু তাই নয়, পর পর দু'সপ্তাহে দু বার নিজের নামে শুভেন্দু নন্দী জাহাজে গুণী দত্ত আর তার ম্যাজিক প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত স্মৃতির গল্প লিখেছে। এর মূল্য পয়সার বিজ্ঞাপনের শতেক গুণ বেশি।

সে-দিন শো ছিল না। সপ্তাহে একটা দিনই অবকাশ।

গত দু'সপ্তাহের দু'দিনই শিরিন আর জুলিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল গুণী দত্ত। ম্যাজিকের প্রধান দলটি বলতে গেলে এক বাড়িতেই থাকে। মধ্য কলকাতার বনেদী পাড়ায় একসঙ্গে দুটো ফ্ল্যাট ভাড়া করে জুড়ে নেওয়া হয়েছে। সকলের সঙ্গে সকলের সংযোগও আছে আবার প্রয়োজনমত যে-যার নিরিবিলি ব্যবস্থাও করে নিতে পারে।

তৃতীয় সপ্তাহের অবকাশের দিনটিতে কি কারণে জুলির বেরুনো হল না। ফলে এই দিনে গুণী দত্ত শিরিনকেও ডাকল না। গত ক'টা মাসই কর্তব্য এবং প্রয়োজন ভিন্ন এই এক মেয়ের নিরিবিলি সান্নিধ্য পরিহার করে চলেছে সে। শিরিনের একমাত্র সঙ্গিনী বলতে গেলে জুলি স্যান্ডারসন। অসম বয়সের এই মেয়েটির প্রতি যথার্থ একটা মায়া পড়ে গেছে জুলির। গুণী দত্ত কখনো মায়ের মত ব্যবহার দেখেছে তার, কখনো সখীর মত। দেখে অনেক দিনই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে।

গুণী দত্তর খেয়াল হল, আজ কোন গাড়িও নয়, ট্যাক্সিও নয়, পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াবে। আগে যেমন বেড়াত। দরকার হলে ট্রামে-বাসে উঠবে। আগে অবশ্য দরকার হলেও সব সময় ট্রামে-বাসে ওঠা হত না। বহুকালের মধ্যে সেইদিনই ধুতি-পাঞ্জাবি পরল। ছিলও না, কলকাতায় এসে কিনেছে। তার সেই নতুন সজ্জা দেখে জুলি স্যান্ডারসন মুগ্ধ, শুধু শিরিন সামনে ছিল বলেই একটা লোভ দমন করতে হয়েছে তাকে।

না, এই বেশে যাদুকর গুণীডাটাকে কেউ চেনেনি। পথচারীর কৌতূহলে ঘা পড়েনি। শো-এ যারা দেখেছে তাকে, বা খবরের কাগজে ছবি দেখেছে—তারা খালি-মাথা আর ধুতি-পাঞ্জাবি-পরনে কেউ দেখেনি। গুণী দত্ত অনির্দিষ্টের মত ঘুরে বেড়াল বহুক্ষণ, বুক ভরাট করে বড় বড় নিঃশ্বাস টানল। এগারো বছর আগের সেই কলকাতার

বাতাসই বটে। এই জনতার মাঝেই সে কপর্দকশূন্য নিঃসম্বল ফকিরের মত ঘুরে বেড়িয়েছে দিনের পর দিন। হাসিই পাচ্ছে, ওপরঅলার যাদুর খেলায় ফকির আজ উজির বনেছে।....চাঁদ সাহেবের খেয়ালের খেলায়ও বলা যেতে পারে।

অন্যমনস্ক একটু, সকাল থেকে চাঁদ সাহেবকে আজ বারকয়েক মনে পড়ল। ক'দিন ধরেই মনে পড়ছে। রোজই ভাবে চিঠি দেবে, কিন্তু কলকাতায় এসে পর্যন্ত লেখা হয়ে ওঠেনি।

কম করে মাইল দুই আড়াই হাঁটার পর শ্রান্ত লাগছে একটু। আগে পাঁচ মাইল হাঁটলেও টের পেত না। কিন্তু সন্ধ্যার ছায়াও নামেনি তখনো পর্যন্ত। এরই মধ্যে ফিরে করবে কী? শিরিনকে নিয়ে মহড়ায় বসতে পারে। এই নিষ্ঠায় কমই ছেদ পড়ে। কিন্তু আজ তাও ভাল লাগল না।

হঠাৎ শুভেন্দু নন্দীর কথা মনে পড়ল। যাবে একদিন কথা দিয়েছিল। খবর দেওয়া নেই, পাবে কিনা ঠিক নেই....তবু একবার গিয়ে দেখলে হয়। এই উত্তর কলকাতাতেই তো কোথায় বলেছিল বাড়িটা। দাঁড়িয়ে ঠিকানাটা ভাবল একটু। স্মরণ-গুণ অতিমাত্রায় প্রখর, মগজে একবার কিছু একটা চালান করে দিলে ভোলে না বড়। মনে পড়ল। পড়বে না-ই বা কেন, শহর কলকাতার কোন্ রাস্তা না শতবার করে চষা তার। ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়াল যখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

গুণী দত্ত জানে না, দুর্নিরীক্ষ চক্রীর হিসেবমত ঘুরেফিরে আজ এই সময় এইখানটিতেই তার এসে দাঁড়ানোর কথা।

দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। এদিকের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। কড়া নাড়তে গিয়েও নাড়ল না। এদিকের ঘরের জানালা দিয়ে ভিতরটা দেখা যায়। গরমের দিনের বিকেল, তাই পরদা সরানো। মনে হল লোক আছে, ওখান থেকেই কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে শুভেন্দু নন্দীর এই বাড়ি কিনা, বা সে বাড়ি আছে কিনা।

কিন্তু দাঁড়ানোই হল, ডেকে জিজ্ঞাসা কিছু করা গেল না। ঘরের মধ্যে গুটিকয়েক মেয়ে, এক-নজরে প্রায় সমবয়সীই মনে হল। পঠন-পাঠনের ব্যাপার চলছে কিছু। একজনের হাতে বই, মুখখানার আধাআধি বইয়ের আড়ালে। বাকি তিনটি মেয়ে মনোনিবেশ সহকারে লিখছে কি।

গুণী দত্ত সরে এলো। প্রথম কারণ, জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে মেয়েদের দেখা অশোভন। দ্বিতীয়, যে-কাজে মগ্ন এরা তাতে ছেদ পড়বে। তৃতীয়, এই এক ব্যাপারে, অর্থাৎ পড়াশুনার ব্যাপারে তার একটা গোপন দুর্বলতা আছে। যত বয়েস বাড়ছে, এই একদিকের ঘাটতিটা ততো বড় হয়ে উঠছে। অবশ্য পড়াশুনা সেও করে, আর সেই সমাহিত তন্ময়তা বোধ হয় এক জুলি স্যান্ডারসন ছাড়া আর কেউ দেখেনি। কিন্তু সে সবই যাদুর বই, যাদুবিজ্ঞান, যাদুকলা, যাদুসাহিত্য।

চুপচাপ খানিক দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে কড়া-ই নাড়ল।

ওই ঘরেরই একটি মেয়ে এসে দরজা খুলল। লোকটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে বলেই হয়ত কিছু জিজ্ঞাসা না করে সৌজন্যসূচক আহ্বান জানালো, ভিতরে আসুন!

গুণী দত্ত ভিতরে অর্থাৎ আলোয় দাঁড়াল। কিন্তু মেয়েটির মুখের দিকে তাকানোর

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ অহেতুক ঝাঁকুনি খেল একটা। অহেতুক বটে কিন্তু বিষম ঝাঁকুনি। এমন কেন হল গুণী দত্ত জানে না। কতকালের একটা জমাট বাঁধা গোপন আবেগের একেবারে মর্মস্থলে কেউ বুঝি স্পর্শ করেছে। ভিতরে সেই আলোড়ন আর বাইরে সেই স্তব্ধতা। ভব্যতা মনে থাকল না, কেন এসেছে কার কাছে এসেছে তাও ভুল হয়ে গেল। মেয়েটির বয়স বছর তেইশ, সুন্দরী নয়, তবে বেশ কমনীয়, সুশ্রী। সুডোল সুঠাম গড়ন। গুণী দত্ত এসব কিছু দেখছে না—মুখের দিকে তাকালেই সকলের আগে যার ওপর চোখ পড়ে—সেটা দেখছে, আর সেইটুকুই দেখছে। নির্বাক, চকচকে, দুই চোখ মেয়েটির চিবুকের নিচে থুতনির ওপর।

কিন্তু মেয়েটির তা বোঝবার কথা নয়, বরং ষোল আনাই ভুল করার সম্ভাবনা। কোন ভদ্রলোকের কাছ থেকে হঠাৎ এরকম আচরণ কেউ আশা করে না। একজন সুশ্রী সুউন্নত পুরুষের ঝকমকে দুটো চোখের আচমকা ঘায়ে হকচকিয়ে গেল একটু। পরক্ষণে আটপৌরে শাড়ির আঁচলটা আর একটু টেনে দিয়ে ঈষৎ বিরক্ত-গম্ভীর প্রশ্ন করল, কাকে চান?

গুণী দত্তর নিষ্পলক দৃষ্টি তখনো সম্মুখবর্তিনীর কণ্ঠ-ঘেঁষা চিবুকের ওপর। ফলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব না পেয়ে মেয়েটির ভুরুর মাঝে কুঞ্চন-রেখা স্পষ্ট হল। আরও ঝাঁজালো কঠিন স্বরে একই প্রশ্নের পুনরুক্তি করতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই গুণী দত্তর চমক ভাঙল। যেন কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ আবার এখান থেকে এখানেই ফিরে এলো সে। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, শুভেন্দু নন্দী এ বাড়িতে থাকেন?

হ্যাঁ, বাড়ি নেই তিনি।

কোথায় গেছেন...?

বলতে পারব না।

ফিরতে দেরি হবে?

বলে যাননি।

ও, আচ্ছা নমস্কার। দু'হাত জুড়ে কপালে ছোঁয়াল, আপনাকে বিরক্ত করলাম—

জবাবে মেয়েটি মাথা নাড়ল কি নাড়ল না, একটি কথাও বলল না। বিরক্ত যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, নিস্পৃহ বিদায়ের প্রতীক্ষা। গুণী দত্ত ফিরল, চৌকাঠ পেরুলে একটাই সিঁড়ি।

তিনি এলে তাঁকে কিছু বলতে হবে?

গুণী দত্ত সিঁড়ির ওপর ঘুরে দাঁড়াল, চোখ দুটো এখনো মুখের আগে ওই চিবুকের দিকে ছোটে বলে বিড়ম্বনা। বলল, তাঁকে বলবেন গুণী দত্ত এসেছিল।

দরজা বন্ধ করার জন্য একটু এগিয়ে এসেও থমকে দাঁড়াল মেয়েটি, কমনীয় মুখে চকিত বিস্ময়-মাধুর্য।—আপনি ম্যাজিসিয়ান গুণীডা—গুণী দত্ত?

গুণীডাটা শব্দটা এই মুখে বোধ হয় ভালো লাগতও না, সংশোধনটুকু সুচারু লাগল। মুখের দিকে না তাকিয়ে একটু হেসে মাথা নাড়ল। সিঁড়ি ছেড়ে নিচে নেমেছে।

কি সর্বনাশ! আমি তো—দয়া করে ভিতরে আসুন—

ঈষৎ ব্যগ্র, বিব্রত আহ্বানটুকু কানে ভালো লেগেছে। একটু আগে নিজের বিসদৃশ

আচরণ সম্বন্ধে সচেতন এখনো। চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গুণী দত্ত। ম্যাজিসিয়ানকে ধন্যবাদ। কিন্তু সেই সঙ্গে ঈষৎ বিস্মিতও, শুভেন্দু নন্দী বাড়ি থাকতেও রাগ করে নেই বলে দিয়েছে নাকি? দ্বিধাগ্রস্তের মত দাঁড়িয়েই রইল, বলল, শুভেন্দুবাবু নেই তো....

না, অফিস থেকে এসে বেরিয়েছেন। আমি দেখছি একটু চেষ্টা করে, আপনি ভিতরে আসুন, বড় অন্যায় হয়ে গেছে, আসুন।

এ ধরনের সহজ অথচ বিনম্র অভ্যর্থনা এড়ানো সহজও নয়, শোভনও নয়। গুণী দত্ত আবারও ভিতরে এসে দাঁড়াল। স্থান কাল ভুলে একটু আগে যে লোকটা এক অপরিচিতার দিকে হাঁ করে চেয়েছিল এই আন্তরিকতা তার প্রাপ্য নয়। সেটা গুণী দত্তর নিজের কাছে অন্তত এমনি স্পষ্ট যে চট করে সঙ্কোচ কাটিয়ে ওঠা কঠিন। আপ্যায়নের অর্থ বোঝা গেছে কিন্তু কি চেষ্টা করবে বোঝা গেল না।

মেয়েটির কৌতূহলভরা দুই চোখ তার মুখের ওপর। দেখা যাকে বলে এই প্রথম দেখল। বলল, কাগজে কাগজে আপনার এত ছবির ছড়াছড়ি অথচ আমি ঠিক চিনতে পারিনি। আসুন—আপনি এসেছেন জেনেও দাদাকে একবার ধরার চেষ্টা পর্যন্ত করিনি জানলে ফিরে এসে আর রক্ষে রাখবে না।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে অর্থাৎ যে-ঘরে পড়াশুনা চলছিল সেই ঘরে নিয়ে এলো তাকে। যে চেয়ারে সে বসেছিল সেটাই দেখিয়ে বলল, বসুন।

ঘরের অন্য তিনটি মেয়ের বয়স কম মনে হল এখন। বিনা কৈফিয়তে সরাসরি বিদায় দেওয়া হল তাদের, বলল, আজ থাক, আবার কাল পড়ব, কেমন? বলতে বলতে মেয়েটি তার পাশের ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেয়াল-ঘেঁষা ছোট টেবিলে টেলিফোন। রিসিভার তুলে নম্বর ডায়েল করতে লাগল। মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে, আর চিবুকের সেই দিকটাও দেখা যাচ্ছে।

এদিকে বিনা বাক্যে মেয়েরা উঠে চলে গেছে। টেবিলের ওপর উপুড় করা খোলা বই একটা। গুণী দত্ত বইটা টেনে দেখল, ডিডাক্‌টিভ্ লজিক। যতদূর ধারণা, আই-এর পাঠ্য বই—কাল পড়বে বলল কিন্তু এই মেয়েটির ঠিক আই-এ পড়ার বয়স মনে হয় না।

ওদিক থেকে টেলিফোনের চাপা কথা কানে এলো। গুণী দত্তর দু'কান সজাগ।

কে? আমি শ্রাবণী—দাদা আছে ওখানে? নেই? আচ্ছা ধরছি—

মিলনী? আমি দিদি।—দাদা কোথায়? একটা খবর পাঠাতে পারিস? বলবি ম্যাজিসিয়ান গুণী দত্ত এসেছেন—গুণী দত্ত—কি জানি বাপু আমার মুখে অত ডাটা-চচ্চড়ি আসে না।—তুই? অস্ফুট হাসি, আয়, কিন্তু দাদাকে না পেলে তুই এসে কি করবি?

ঈষৎ গম্ভীর।—ফাজলামো করতে হবে না, তাড়াতাড়ি আয়।

শেষের দিকের সব কথাই খুব চাপা, চেষ্টা করে না শুনলে শোনার কথা নয়। গুণী দত্ত শুনেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে, চিবুকের কাছ থেকে দৃষ্টিটা নড়তে চায়নি। টেলিফোনের সব কথাই মিষ্টি লেগেছে, সব থেকে ভালো লেগেছে নামটা।—আমি

শ্রাবণী। শহুরে ছেলে নয় বলেই হয়ত মানেটা জানে। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার রাত।....আমি শ্রাবণী।

টেলিফোন রেখে সপ্রতিভ স্মিতমুখে এ-ঘরে এলো। বলল, দাদাকে খুব সম্ভব ধরা যাবে, আমার বোনও আসছে, আপনি বসুন, আমি বাবাকে খবর দিই—না, বাবা তো একটু আগে পূজোয় বসেছেন দেখলাম, বেশি দেরি হবে না—

গুণী দত্ত তাড়াতাড়ি বলল, আপনি ব্যস্ত হবেন না, বসুন, আমি এসে আপনাদের পড়াশুনা পণ্ড করলাম—

না। অদূরে একটা চেয়ার টেনে বসল সে।

আপনি শুভেন্দুর বোন ?

হ্যাঁ।

মুখের দিকে তাকানো শক্ত, কিন্তু না তাকিয়েও পারা যায় না। হাতের বইটাই আবারও কি একটু খটকার কারণ, জিজ্ঞাসা করল, আপনি পড়েন ?

এবারে বিশেষ করেই লজিক বইটার দিকে চোখ পড়ল। রমণীর মুখের সুচারু সঙ্কোচ। জবাব দিল, না, পড়াই।

কোথায় পড়ান ?

মেয়ে কলেজে, ছোট নতুন কলেজ—আমিও নতুন মাস্টার। হাসতে গিয়েও থমকালো। লোকটার চোখ দুটো আবার থুতনি ঘেঁষে বুকের দিকে। ও-ঘরে টেলিফোন বাজল। উঠে ধরতে গেল।

গুণী দত্তও ঘাড় ফিরিয়েছে। এই দেখাটা নিরাপদ। মনে মনে নিজের উদ্দেশেই কটূক্তি করে উঠল একটা, নিজে এমনই দিগ্‌গজ পণ্ডিত যে কলেজে মাস্টারি করতে পারে সে সম্ভাবনা মনেই হয়নি।

কিন্তু এ কি হচ্ছে ? চেহারায় মুখের আদলে কোথাও তো কিছু মিল নেই, তবু সব কটা স্নায়ু এমন একটা স্মৃতির ধাক্কা খাচ্ছে কেন ? কোন রকম সঙ্কোচ বা লজ্জার অপবাদ তাকে শত্রুও দেবে না, কিন্তু হঠাৎ এ আড়ষ্টতা কিসের ?...আমি শ্রাবণী। এখনো কানে লেগেই আছে গুণী দত্তর। শ্রাবণের সরল গাম্ভীর্যের মধ্যে ওই চিবুকের ধারে চক্রাকারে স্পষ্ট একটু চাঁদ জ্বলছে। মুখের দিকে তাকালে শুধু তার নয়, যে-কোন লোকের আগে ওইখানে চোখ আটকাবে।

ফিরে এসে বসতে বসতে হাসিমুখে শ্রাবণী বলল, বসুন, দাদা আসছে। আপনাকে আটকে রাখতে বলল, দল বেঁধে আসছে সব—এদিকে আমার ভাইয়েরাও এলো বলে, সবাই ভয়ানক ভক্ত আপনার। এরা সবাই একবার দেখেছে, মিলনী তো দাদার সঙ্গে দুবার করে গিয়ে আপনার ম্যাজিক দেখে এসেছে।

আপনি দেখেননি ?

দেখেনি বলেই লজ্জিত যেন। বলল, না, আমার এখনো দেখা হয়ে ওঠেনি—শিগগিরই দেখব।

হাসল গুণী দত্তও। বলল, না দেখে একটুও অপরাধ করেননি, ও ভাঁওতাবাজী সকলের দেখার জন্যে নয়।

সে কি। সকলের মুখে কত প্রশংসা....দল বেঁধে বাড়িসুদ্ধ সকলে গেল, তাই যাওয়া হয়নি।

অর্থাৎ বাড়ি পাহারার দায়ে না যাওয়ার ত্যাগস্বীকারটুকু সে-ই করেছে। গুণী দত্তর অনুমান, অকাতরেই করেছে। চেয়ে আছে, আবারও একটা অশোভন তন্ময়তা আসছে টের পাচ্ছে।—কবে আসবেন বলুন?

স্বনামধন্য হলেও সদ্য পরিচিত লোকটির এই চাউনি অনেকবারই অস্বস্তির কারণ হয়েছে শ্রাবণীর। গোড়ায় না বুঝে তো রেগেই গিয়েছিল। বারকতকের বিড়ম্বনার পর এখন বুঝেছে লোকটর ওই চকচকে ছুরির ফলার মত চোখ দুটো বারে বারে কোথায় এসে ধাক্কা খাচ্ছে। নতুন পরিচিতজনের দৃষ্টি শ্রাবণী তার চিবুকের ধারের টকটকে লাল জড়ুলটার ওপর পড়তে দেখেছে বটে, তবু সেটার অস্তিত্ব নিজের সব সময়ে খেয়াল থাকার কথা নয়, খেয়াল থাকেও না। কিন্তু বার বার করে ওটা এভাবে দেখার মত কি? এই দেখাটা আদৌ স্বাভাবিক লাগেনি তার। এখন ম্যাজিক দেখার আপ্যায়ন করল বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা ওই দিকেই।

ভিতরে ভিতরে একটু কৌতূহলই বোধ করল শ্রাবণী। বলল, যাব একদিন....আপনি তো এখনো অনেকদিন দেখাবেন।

গুণী দত্ত কানে তুলল না।—একদিন নয়, কবে বলুন! দেখে প্রশংসা যাঁরা করেছেন করুন, আপনার মত না দেখে প্রশংসা করলে আত্মসম্মানে লাগে—

শ্রাবণী অবাক। এইটুকু আলাপে এমন জোরের সুর সচরাচর শোনে না। অথচ বলার মত করে বলতে পারলে সদ্য পরিচয়ের কথা মনে হয় না, খারাপও লাগে না। চোখে চোখ পড়তে দৃষ্টি ফেরাতে হল, বড় বেশি দ্বিধাশূন্য স্বচ্ছ মনে হয়।

আমি কি প্রশংসা করলাম?

সবটাই—আমাকে ডেকে বসানো, মেয়েদের পড়া বন্ধ করা, টেলিফোনে দাদাকে ডাকা, তারপর কাজ ফেলে নিজেও বসে আছেন—এই সব যত্নই আমি ম্যাজিসিয়ান বলে, অথচ আপনি ম্যাজিকই দেখেননি।

কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে এত অল্প সময়ের মধ্যে এ-রকম আলাপে অভ্যস্ত নয় শ্রাবণী, কিন্তু এই অন্তরঙ্গতার মধ্যে তার যেন কোন হাত নেই। হেসে ফেলে বলল, আপনাকে আমার আগেই চেনা উচিত ছিল, দাদার কাছে এত গল্প শুনেছি। দাদা বিলেত থেকে ফিরে দিনকতক শুধু আপনার গল্পই করেছে।

ভাবল তুষ্ট করাও হল আবার জোরজুলুমও এড়ানো গেল।

কিন্তু গুণী দত্তর এই প্রথম মনে হল, জাহাজের অন্ধকার ডেকে জুলি স্যান্ডারসনের সঙ্গে শুভেন্দু নন্দী তাকে ওইভাবে না দেখলেই ভালো ছিল। ঘড়ি দেখল, সাতটা বাজে। জিজ্ঞাসা করল, আপনার দাদা কতদূর থেকে আসছে?

সেই দক্ষিণ কলকাতা থেকে, আর বেশি দেরি হবে না বোধ হয়।

কি মনে করে শ্রাবণী উঠতে যাচ্ছিল, তার আগে আবারও প্রশ্ন হল, আপনার বোন আসছেন বললেন, তিনিও সেদিকেই থাকেন?

হ্যাঁ, সেখানে ওর শ্বশুরবাড়ি, দাদা ওর ওখানেই গেছল—

বলতে বলতে শ্রাবণী থেমে গেল। লোকটার দৃষ্টি মুখের ওপর আবারো বড় বেশি রকমের সজাগ। ছোট বোনের শ্বশুরবাড়ি শোনার ফলে একটা নীরব কৌতূহলও। মনে হল, কৌতূহলের কারণেই এই প্রসঙ্গ, নইলে ছোট বোনের খবর করার কোন কারণ নেই।

উঠল।—বসুন, ওরা এলো বলে, আমি চায়ের ব্যবস্থা করে রাখি। সামনের ঘরে মাঝামাঝি এসে ফিরে দাঁড়াল, বলতে যাচ্ছিল, বাবার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, তাঁকেও নিয়ে আসছে।

বলা হল না। উল্টে একটা মুহূর্তের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরব ব্যাপার ঘটে গেল একটা। মনে হল একটা তরল দৃষ্টিধারা তার গায়ের ওপর এসে ভাঙছে। শ্রাবণী সেই ধাক্কাতেই যেন বাইরে চলে এলো। থমকে দাঁড়াল তারপর। সর্বাঙ্গে অস্বস্তির অনুভূতি। প্রথমেই মনে হল, যত বড় নামজাদা লোকই হোক, লোক সুবিধের নয়। অথচ তাও কেন জানি নির্ভুল সিদ্ধান্ত বলে মনে হল না শ্রাবণীর। কলেজে পড়া, য়ুনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে, একদিনের দর্শনে এ ধরনের বিভ্রম অবিশ্বাস্য। শুনতেও হাস্যকর, ভাবতেও। তাই শ্রাবণীর মনে হল, কিছু একটা ব্যাপার আছে যা ধরতে পারছে না, নইলে দরজা খুলে প্রথম গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অমন হতভম্বের মত তাকিয়েছিল কেন? আর যা ভাবছে তাই হলে অমন অনাবৃত চাউনির মধ্যেও একটু অন্তত অপরাধ-চেতন গোপনতার আভাস পেত।

নিজের অজ্ঞাতেই থুতনিটা একবার হাতে করে ঘষল শ্রাবণী, শুধু ওইখানেই যেন অনেকবার অনেকক্ষণ করে একটা কনকনে জোরালো আলোর ঘা পড়েছে আজ।

বাইরে ট্যাক্সি থামার শব্দ এলো। শ্রাবণী হাঁপ ফেলে বাঁচল—এলো সব। মিলনীটা এক্ষুনি কলকলিয়ে ঘরে ঢুকবে...লোক কেমন ওকে দিয়েই কিছু বোঝা যাবে। শ্রাবণীকে কেউ রূপসী বলবে না, কিন্তু মিলনী সত্যিকারের রূপসী।

শ্রাবণী আগে গিয়ে বাবাকে খবর দিল। কে এসেছে, কি বৃত্তান্ত বলল। তারপর চায়ের ব্যবস্থা দেখতে গেল। ফিরল প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে।

বাবা কথাবার্তা কইছেন। সকলেরই হাসি-হাসি মুখ, সমস্ত ঘরে যেন একটা রোমাঞ্চ-ঘেরা কৌতূহল ভরাট হয়ে আছে। বাবা গেলেই সেটা ভেঙে পড়তে পারে।

একটু বাদে কর্তাটি উঠে গেলেন, পরের দিনের সম্পাদকীয় লেখার ব্যাপারে তাঁর কাগজপত্র দেখা আছে। সঙ্গে সঙ্গে শুভেন্দু উঠে এসে বাবার আসন দখল করল। উৎফুল্ল আনন্দে পকেট থেকে সিগারেট বার করে বলল, আজ আসছ একটা টেলিফোন করবে তো,—খুব জব্দ! শ্রাবণীর দিকে তাকালো, এই, সত্যি এক ঘণ্টা ধরে বসে আছে?

জবাব না দিয়ে শ্রাবণী হাসল একটু। মিলনী তাকে ডাকল, দিদি আয়, এখানে বোস—তুই তো আগে দেখিসওনি!....অবশ্য এতক্ষণ ধরে তুই একলাই দেখলি। জোরেই হেসে উঠল, তারপর অতিথির উদ্দেশে বলল, আমি কিন্তু জোরে হাসি জোরে কথা বলি, আর যা মুখে আসে তাই বলি, দোষ নেবেন না।

গুণী দত্ত হাসছিল, মেয়েটাকে অদ্ভুত প্রাণবন্ত মনে হল তার। আর সুন্দরীও

বটে, এই জন্যেই বোধ হয় আগে বিয়ে হয়েছে। বলল, তাতে আপনাকে আরও সুন্দর দেখায়।

এবারে মিলনী লজ্জা পেল, বাদবাকি সকলে সমস্বরে হেসে উঠল। শুভেন্দুর পাশে লাজুক গোছের চশমা পরা লোকটির সঙ্গে শ্রাবণী আসার আগেই পরিচয় হয়েছে। ভগ্নীপতি প্রশান্ত ঘোষ। এধারের হাসিখুশি ছেলে দুটি শুভেন্দুর ছোট ভাই। এই দুজনের সঙ্গে মিলনীর মুখের আদল আসে, কিন্তু শ্রাবণীর মুখের সঙ্গে মেলে না।

সানন্দে শুভেন্দু আবারও জাহাজের গল্প ফেঁদে বসল—প্রথম আলাপেই কিরকম অপ্রস্তুত করা হয়েছিল তাকে, সেই গল্প। এখানকার শো-এর গল্পও উঠল। মিলনী বলল, সত্যি দিদি, সে যে কি কাণ্ড তুই না দেখলে বিশ্বাস করবি না ! অবাক হয়ে হয়ে আমাদের হার্ট ফেল করার দাখিল ! অতিথির দিকে ফিরল, এতক্ষণ বসে রইলেন, দিদিকে একটু কিছু দেখালেন না কেন—সঙ্গে কিচ্ছু নেই বুঝি ?

গুণী দত্তর মনোযোগ দিদির দিকে ফিরল। শ্রাবণী বোনকে তাড়া দিল, থাম, শূন্য থেকে ম্যাজিক হবে তোর জন্যে !

শুভেন্দু তক্ষুনি ছোট বোনকেই সমর্থন করল, তুই জানিস না শ্রাবণী, গুণীডাটা হাওয়া থেকেই ম্যাজিক আমদানি করতে পাবে।

এদিকে চা আর খাবার এসেছে। ঘর তখন গুণীডাটার শূন্য থেকে ছিপে করে লাল নীল মাছ ধরার গল্পে মুখর। শূন্যের মধ্যে মনোযোগ সহকারে ছিপ ফেলা হচ্ছে, যেন জলেই ছিপ ফেলা হচ্ছে। আর এক এক টানে বঁড়শীর মুখে জীবন্ত রঙীন মাছ উঠছে একটা করে। জলভরা জারে ফেলতে সেই মাছ আবার সাঁতার কাটছে তরতরিয়ে।

শ্রাবণী না দেখুক, শুনেই অবাক হচ্ছে। এ-রকম আজগুবী কাণ্ড কেমন করে সম্ভব হয়। মিলনী একফাঁকে চুপিচুপি শ্রাবণীকে বলল, ভদ্রলোকের চোখ দুটো দেখেছিস দিদি, যেন কাছে নয় অথচ ঝক-ঝক তক-তক করছে।

শ্রাবণী শুনেও শুনল না যেন। ওই চোখের ধকল আজ তার ওপর দিয়েই সব থেকে বেশি গেছে। এখনো যাচ্ছে। একটু বাদে-বাদেই ওই চোখের আলো তার মুখের ওপর এসে পড়ছে। মিলনী আসার পরেও। মিলনীর কাছে ও কিছুই নয়, তবু।

ওঠার আগে শুভেন্দু আর মিলনী আবার আসার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে। মিলনী ঘরোয়া ম্যাজিকের বায়না করেছে। বলেছে, আপনি বিখ্যাত লোক, এখানে এলেন বলে আমরাও বিখ্যাত হয়ে গেছি—পাঁচজনের কাছে গল্প করতে পারব।

লোকটা তখনো হাসিমুখে শুনছিল, কিন্তু চেয়েছিল শ্রাবণীর দিকেই। আর বিদায়টাও যেন তার কাছ থেকেই নিয়ে গেছে। কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু শ্রাবণী লক্ষ্য করেছে। শ্রাবণী কিছু বলেনি, চেষ্টা করে হাসি-হাসি মুখ করে দাঁড়িয়েছিল শুধু—কিন্তু তখনো এক-ধরনের অস্বস্তিই বোধ করছে।

গুণী দত্ত জানে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একজনের ওই প্রতিক্রিয়া তার দৃষ্টি-দর্পণে ছিল। অভদ্র ইতর ভেবেছে হয়ত, তবু আপ্যায়ন যেটুকু করেছে, শুধু দাদার

বন্ধু বলে আর নামজাদা লোক বলেই করেছে। কিন্তু সব জেনেও গুণী দত্তর কোন হাত ছিল না। এখনো নেই। যতবার চোখ পড়েছে, এক হারানো কালের অতল থেকে স্মৃতির দূতেরা সার-বাঁধা বুদবুদের মত চোখের সামনে ঠেলে উঠতে চেয়েছে। উঠেছে।

রূপ ?

না। একে রূপ বলে না। সুশ্রী, কমনীয়, নিটোল স্বাস্থ্যবতী বলা যেতে পারে। কিন্তু রূপ নয়, রূপ তার ঘরেই আছে। ওখানে শিরিনকে এনে দাঁড় করালে ঘরের অত জোরালো আলোটাও নিষ্প্রভ মনে হত। শ্রাবণীর মত অমন চেহারার মেয়ে গুণী দত্ত অনেক দেখেছে, অজস্র দেখেছে।

কিন্তু গুণী দত্ত তো রূপ খুঁজছে না, তার একটা বয়েস সেই ষোল থেকে উনিশ বছরের মধ্যেই আটকে আছে। গুণী দত্ত নয়, সেই এক অপরিণত উদভ্রান্ত তরুণের যুক্তিহীন অবুঝ খোঁজের বিরাম নেই। এখনো সে অন্ধ আবেগে স্মৃতির তাড়নায় গুমরে গুমরে মাথা খুঁড়ছে। গুণী দত্ত অসহায় তার কাছে।

অথচ পাগলামি ছাড়া আর কি ? আজ যা ঘটে গেল, সেই বিকৃতির দিকটা কেউ জানলে কেউ শুনলে ঠেলেঠুলে তাকে হয়ত কোন মানসিক হাসপাতালে পাঠাত। তাই অতি সন্তর্পণে, অতি সঙ্গোপনে—প্রায় নিজের অগোচরে এই রোগ পুষছে গুণী দত্ত, লালন করছে।

কিন্তু তবু এই একজনকে দেখে এমন হল কেন তার ? এ কি লাগাম-ছাড়া কল্পনা ? চেহারায় আচারে আচরণে মিল তো কোথাও নেই। স্বর্ণর গায়ের রঙ ফরসা, শ্রাবণীর বড় জোর মাজা। স্বর্ণর ছিপছিপে দোহারা গড়ন, এই মেয়ের বসনের শাসনে তনুভার ধরে না। স্বর্ণর দু চোখ টানা-টানা, পিঠে এক বোঝা চুল। শ্রাবণীর চোখ ছোট না হোক টানা নয়—মাথায় ছোট খোঁপা। একজন দ্বিতীয় ভাগ পড়া আধা-শহরের গরীব ঘরের মেয়ে, আর একজন এম. এ. পাস কলেজের প্রোফেসার—হয়ত গ্রাম দেখেনি জীবনে। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ, বুদ্ধির দীপ্তি, চাল-চলন কথায়-বার্তায় রুচিবোধ সৌজন্য-বোধ।

কিন্তু এত অমিল সত্ত্বেও এই মেয়েকেই দেখার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির রাজ্যে বিপর্যয় ঘটে গেছে গুণী দত্তর।

অথচ যে-জন্যে ঘটেছে তাতেও মিল নেই এতটুকু, তাতেও রাত আর দিনের মতই তফাত।

এই মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রথমেই তার চোখ গিয়েছিল চিবুকের নিচে টকটকে লাল ছোট্ট গোল জড়ুলটার দিকে। ওইটুকু থেকে প্রায় গালের দু'পাশ পর্যন্ত যেন চুনির মত লালচে আভা ছড়িয়ে আছে। তাকালে যে-কোন লোকের সমস্ত মুখ ছেড়ে আগে ওটার দিকে চোখ আটকাবেই।

স্বর্ণর দিকে তাকালেও সব ছেড়ে আগে অন্য কিছুর ওপর চোখ পড়তই। তার চোখের নীচে, নাকের বাঁ-পাশের ঈষৎ উঁচু হাড়ের ওপর যেন আলতো করে বসানো মস্ত একটা কালো তিল। মটরদানারও দ্বিগুণ, চকচকে কালো। ফর্সা মুখ

বলেই আরো তকতকে স্পষ্ট দেখাতো। যতবার পলক পড়ত, টানা চোখের পক্ষ্মরেখা ওটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত।

গুণী দত্ত এক-এক সময় হাঁ করে দেখত চেয়ে চেয়ে। না, তখন গুণী দত্ত নয়, গুণময়কিশোর দেখতো—গুণময়, গুণী। ছেলেবেলায় অনেকদিন সে চেষ্টা করেছে, ওই ঘন কালো তিলটার দিকে না চেয়ে আগে স্বর্ণকে দেখতে পায় কিনা, আগে স্বর্ণর মুখটা দেখা যায় কিনা। পায়নি, দেখা যায়নি। আগে ওই কালো চিহ্ন, পরে স্বর্ণ। আজ হঠাৎ এক মেয়েকে দেখল, ঠিক স্বর্ণের মতই—যার আগে ওই টুকটুকে লাল জড়ুল, পরে সে। অনেকবার দেখেছে, অনেকবার চেষ্টা করেছে—আগে ওটাই দেখেছে, তারপর যাকে দেখেছে সে শ্রাবণী। আগে ওই লাল চিহ্ন, পরে শ্রাবণী।

যতবার দেখেছে, চোখের সমুখ থেকে শ্রাবণী মুছে গেছে, গুণী দত্ত মুছে গেছে। তার দেহের হাড়-পাঁজর গুঁড়িয়ে অবুঝ উদ্‌ভ্রান্ত দুর্দম গোঁয়ার উনিশ বছরের সেই ছেলেটা আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে। এক অব্যক্ত দিশেহারা তাড়নায় ভীরু শশকের মত ষোল বছরের একটা মেয়ের দিকে ধাওয়া করতে চেয়েছে। যে মেয়ের শেষ পর্যন্ত কাছে এলেও বাঘের মুখে পড়ার ভয়, আবার না আসতে পারলেও প্রাণ-সংশয়।

পথ চলতে চলতে এক জায়গায় গুণী দত্ত ঠায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, হুঁশ নেই। হঠাৎ একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করে উঠল সে। সমস্ত পিঠটা যেন জ্বলে জ্বলে ঝলসে ঝলসে একাকার হয়ে গেল। একটা পুরনো ক্ষতর ওপর দিয়ে এক-ঝলক নতুন আগুনের স্রোত ছুটল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবির ওপর দিয়ে পিঠে হাত বোলাতে লাগল গুণী দত্ত।

কোথাও যাওয়া দরকার। কিছু একটা করা দরকার। বিস্মৃতিদায়ক কিছু। কিন্তু সত্যিকারের বিস্মৃতির বস্তু এ দুনিয়ায় আছে কিছু?

কি মনে হতে ঘড়ি দেখল। সাড়ে নটাও নয়। কলকাতা শহরে এইটুকু রাত কিছুই নয়। চাঁদ সাহেবের সঙ্গে থেকে আগে কতদিন তো রাত একটায়ও রাত মনে হয়নি।

অনেকবার মনে পড়ল আজ চাঁদ সাহেবকে।

ট্যাক্সি নিয়ে ঘন লোকালয় বর্জিত এক নামজাদা বিদেশী রেস্তরাঁর সামনে এসে নামল। বাইরে থেকে এটা কত বড় পান্থশালা চট করে বোঝা যায় না। সেকেলে আমলের বিশাল তিনতলা অট্টালিকা। শহরের আধুনিক বিত্তবানদের আনাগোনা এখানে। এক নম্বর আহার্য আর নির্ভেজাল রকমারি পানীয় সরবরাহের সুনাম আছে।

ট্যাক্সি বিদায় দিয়ে চারদিকে ভালো করে দেখে নিল গুণী দত্ত। দূরে-দূরের আলোগুলো আগের মতই স্তিমিত। আগের মত.....কত দিন আগের মত? এক যুগেরও ওপরে হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুণী দত্ত চারদিকটা একবার দেখে নিল। কিছুই বদলায়নি। যেন মাঝে মাত্র দিনকতক আসা-যাওয়ায় ছেদ পড়েছিল। জায়গাটা মনের তলায় চিহ্নিত হয়ে থাকার কথা। আছেও। রাত্রিতে এখানে এলে সব-সময়ই রাত একটু বেশি মনে হয়। প্রবেশ পথের দু'ধারে সসজ্জ প্রহরী মোতায়েন। তাদের সামনেই

ছেঁড়া পাজামার ওপর শতছিন্ন জীর্ণ কোট পরনে একজন আধ-বুড়ো লোক মোলায়েম সুরে ভায়োলিন বাজাচ্ছে। আশা, পান-ভোজন-তৃপ্ত ক্ষণিকের অতিথিরা যদি তাকেও জীবন ধারণের রসদ কিছু দিয়ে যায়।

দিয়ে যায়। গুণী দত্ত জানে দিয়ে যায়। চকিতে আট-দশ হাত দূরের মোটা অশ্বত্থ গুঁড়িটার দিকে তাকালো সে। গুণী দত্ত জানে, দয়া করে মাঝেসাজে কেউ কিছু কিছু দিয়ে যায়। ....ওই অশ্বত্থ গুঁড়ির কাছে এখন কেউ নেই। কিন্তু একদিন এমনি স্তিমিত আলোয় গভীর রাত পর্যন্ত ওখানে উনিশ-কুড়ি বছরের একটা ছেলে অশ্বত্থ গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কোমল বিলম্বিত লয়ে বাঁশী বাজাতো।

বাঁশী ঠিক বাজাতো না, বাঁশী বাজানোর ছলনায় প্রাণের কান্না কাঁদত। কখনো কৌতূহলে, কখনো বিরক্ত হয়ে, কখনো সুরের ঝোঁকে, কখনো বা শুধু তাচ্ছিল্যভরে কিছু কিছু কেউ কেউ দিয়ে যেত।

প্রবেশ পথের প্রহরী দুজনের দিকে তাকালো।....না, তারা নয়, আগের প্রহরী বদলেছে। ভায়োলিন হাতে লোকটাকে দেবার জন্য পার্স থেকে প্রথমে একটা পাঁচ টাকার নোটই হাতে উঠে এসেছিল গুণী দত্তর। তাড়াতাড়ি সেটা রেখে একটা টাকা দিল। সে তো আর চাঁদ সাহেব নয়, সে শুধু দয়াই করছে।

ভিতরে ঢুকল। পরিচালক সেলাম ঠুকে অভ্যর্থনা জানালো। কেউ তাকে চেনে না, কেউ তাকে চিনবে না এখানে। এতগুলো বছর মুছে দিয়ে একটা ছেলেকে চিনে নেওয়া সহজ কথা নয়। তাছাড়া যে এলো আর আগে যে আসত তারা কি একই লোক? আজ গুণীডাটা এসেছে, গুণময় নয়। গুণী দত্তর হাসি পাচ্ছে—গুণীডাটা! শ্রাবণী ফোনে মিলনীকে বলছিল, ও-সব ডাঁটা-চচ্চড়ি মুখে আসে না। শ্রাবণী....চিবুকে লাল জড়ুল, স্বর্ণ....চোখের নিচে কালো তিল। একটা ক্যাবিনে ঢুকে বসল গুণী দত্ত। বয় অর্ডার নিয়ে গেল—দিয়ে গেল। বেশি কিছু নয়, শুধু একটা গেলাস, একটা বোতল, আর একটা প্লেটে মুখরোচক ভাজাভুজি কিছু।

গুণী দত্ত কান পেতে আছে। ভায়োলিনের সুর এখান থেকে শোনা যাচ্ছে না। না, ভাববে না। আগের কথা ভাববে না। কি ভাববে তাহলে।....আমি শ্রাবণী। কানে লেগেই আছে, লেগেই আছে। শ্রাবণীর আগে ওই লাল জড়ুল, তাতে চুনির আভা।

না, শ্রাবণী নয়। স্বর্ণ। লাল জড়ুল নয়। চোখের পাতা ছোঁয়া হাড়ের ওপর দ্বিগুণ-প্রমাণ মটরদানার মত একটা তিল।

গুণী দত্ত গুণময়কে দেখছে, গুণীকে দেখছে, আর স্বর্ণকে দেখছে।

॥ ৮ ॥

তিলটা নখের আঁচড়ে খুঁটে খুঁটে এক-এক সময় প্রায় রক্ত বার করার দাখিল করত বারো বছরের এক মূর্তিমান দস্যু।

ন'বছরের স্বর্ণ যতক্ষণ পারত মারের ভয়ে দাঁত-মুখ সিঁটকে সহ্য করত। তারপর ভ্যা করে কেঁদে ফেলত। কখনো বা হঠাৎ আক্রোশে আঁচড়ে-কামড়েও দিত। কিন্তু গুণীর একটা মারাত্মক কৌতূহল ওটা নিয়ে। তার কেবলই মনে হত ওটাকে উপড়ে ফেলা যায়।

বহু লোক জ্যাঠার কাছারীতে আসত। জ্যাঠা নায়েব ছিল। স্বর্ণর বাবাও আসত, খাতাপত্র নিয়ে আসত, কাজে বসত। গুণী আর কিছু না বুঝুক এটুকু বুঝত স্বর্ণর বাবাও তার জ্যাঠার অধীনে কাজ করে। তাই অধীনস্থদের ওপর জ্যাঠার মেজাজটি গুণী অবলীলাক্রমে স্বর্ণের ওপরে খাটাতো।

মা কেমন ছিল স্বপ্নের অগোচর, শুনেছিল জন্মের দু'মাসের মধ্যে মা মারা গেছে।

গুণীর জন্মটাই নাকি মায়ের মৃত্যুর কারণ। বাবা বলে একটা লোককে ধু-ধু মনে পড়ত। তার বছর পাঁচেক বয়সের সময় আবার বিয়ে করতে গিয়ে নাকি বাবার সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছিল। গুণীর এ-সব জানার কথা নয়, ঠাকুমা এই সব বিন্যাস করতে করতে এক-এক সময় কপালে করাঘাত করে কাঁদত।

অতএব জ্ঞান হতেই জ্যাঠাকে আর ঠাকুমাকে আর এক বিধবা পিসীকে দেখে আসছিল সে। ছেলেবেলায় যম-রাজার অনেক ভয়াবহ গল্প শুনত সে। যম-রাজার মুখ কল্পনা করতে গেলেই জ্যাঠার মুখখানা মনে হত তার। এমনই নির্মম রাগী মানুষ গুণী আর বোধ হয় দুজন দেখেনি। জ্যাঠার ভ্রূকুটিতে অনেক সময় রক্ত জল হত, খুব মারধোর করার দরকার হত না। কিন্তু জ্যাঠা মারবে বলে কখনো ধরলে আধমরাই করত।

জ্যাঠার হাত থেকে তাকে সর্বদা রক্ষা করত ঠাকুমা আর পিসী। জেঠিও ঠাকুমা আর পিসীর ভয়ে জ্যাঠার কাছে বিশেষ নালিশ-টালিশ করত না। কিন্তু যা একটু-আধটু নিগ্রহ হত পাড়ার লোকগুলোর জন্য। তারা মাঝে মাঝে এসে লাগান-ভাঙান দিত। তবে তাও পুরোপুরি জ্যাঠার ভরসা পেলে বা খুব নিরাপদ বুঝলে। নইলে সাহস করত না।

কোনো অপরাধের দরুন জ্যাঠা এসে তাকে ধরবে বুঝলেই ঠাকুমা আগেভাগেই এসে ধরত তাকে। অপরাধের সংখ্যারও লেখাজোখা থাকত না, গুণী যা করত অন্যের চোখে তাই যেন অপরাধ হয়ে দাঁড়াত। জ্যাঠাকে ফেরাবার জন্যে ঠাকুমা তাকে ধরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঠেঙাত, আর তার চতুর্গুণ ধমকাত। যেন মেরেই ফেলবে। ওই বুড়ীকে গুণী থোড়াই কেয়ার করত, এক ধাক্কায় চোখের পলকে ঠেলে ফেলে উধাও হতে পারে। কিন্তু ঠাকুমার এ মারের আর গালাগালের অর্থ সে-ও জানত। সেটা যে আর একটা বড় দুর্যোগ দূর করার উদ্দেশ্যে তাও বুঝত। তাই ঠাকুমাকে আঁকড়ে ধরেই ঠাকুমার মার খেত সে। জ্যাঠার ইচ্ছে ছিল ভাইপোকে কোনরকমে

প্রবেশিকা পার করিয়ে দিতে পারলে তার কাছারীতে এনে বসাবে। কিন্তু পড়াশুনার ব্যাপারে তার সে আশায় ছাই দিয়ে আসছিল গুণী।

কিন্তু এই দুরন্ত ছেলের মনের আর একটা দিকের খবর কেউ বড় রাখত না। বড়রা অন্তত কেউ রাখত না। কারণ দুরন্তপনাটা এত প্রকট ছিল যে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলেও তারা ভাবত কিছু অপরাধ করা হয়ে গেছে, বা নতুন কোনো দুর্বুদ্ধি মগজে দানা বাঁধছে। জ্যাঠা তো কতদিন ওভাবে আপনমনে বসে থাকতে দেখেও একেবারে বিনা দোষে কান ধরে টেনে হিড়হিড় করে তুলে নিয়ে গেছে।

এই দুরন্ত ছেলেরই মনের তলায় নিঃসঙ্গ একটা রূপকথার রাজ্য গড়ে উঠেছিল। সেখানে অবিরাম একটা কল্পনার ঘোড়া ছুটত। মনে মনে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করত সে। সেই কল্পনার জগতে বসে নানা বীরত্বের সাজে কতবার কতভাবে জ্যাঠাকে ঘায়েল করেছে সে তার হিসেব নেই। সেই রাজ্যে বসে আরো কত রকম অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতো তারও লেখাজোখা নেই। সেখানে ওই ছোট ছেলেটার মাথাটাই প্রায় আকাশ-ছোঁয়া। সেখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই, যা ভাবত তাই সম্ভব।

একবার বাড়ির কাছে একটা চোর ধরা পড়েছিল। ছিঁচকে চোর। বয়েসও বেশি নয়। একগাদা লোক মিলে তাকে বেদম মারলে। মারামারি হাতাহাতিতে গুণীও কম ওস্তাদ নয়। প্রিয় শিষ্য জীবনের ওপরে তো তার অবিরাম হাত চলে। আর মাথায় গাঁট্টা খেয়ে দিনে দুই-একবার অন্তত হাউমাউ করে ওঠে এই ছিঁচ-কাঁদুনে মেয়ে স্বর্ণ। বেশি জোরে কেঁদে উঠলে আবার জ্যাঠার ভয়ে বীরপুরুষটিকেই চোঁ-চাঁ দৌড় লাগাতে হয়। কিন্তু সেদিন চোরটাকে ও-ভাবে মারতে দেখে গুণীর যেমন রাগ তেমনি দুঃখ। কতখানি অপরাধ করা হয়েছে সে-চিন্তা একটুও বড় নয়। কারণ চুরি তো সে-ও করে। লোকের গাছের ফলপাকড় থেকে ঠাকুমার হাতবাক্সের পয়সা পর্যন্ত। কাজেই চুরি করাটা এমন মস্ত কি অপরাধ! অতগুলো লোকে মিলে একটা লোককে ও-ভাবে মারাটাই বরং অপরাধ।

কিন্তু অপরাধীর শাস্তি গুণী দেবে কেমন করে? কিছু বলতে গেলে তো তাকেই দু'ঘা লাগিয়ে দেবে। অথচ শাস্তি না দিলেও নয়। সমস্ত দিন ধরে ছোট ছোট মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতের রক্ত ফুটেছে। তারপর হঠাৎ আনন্দে আত্মহারা সে। রাজুর কথা মনে পড়েছে। রাজুর সন্ন্যাসীর মন্ত্র শুনে শুনে মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল। রাজু তাদের বাড়ির ছোকরা চাকর ছিল। অলৌকিক রাজ্যের প্রথম সন্ধান বোধ হয় সে-ই দিয়েছিল গুণীকে। অনেক উদ্ভট উদ্ভট গল্প করত সে। কত মন্ত্রের কথা, কত ক্রিয়া-কলাপের কথা। সবই নাকি সন্ন্যাসীর কাছে পাওয়া তার। গাঁয়ের পথে জটাজূটধারী সাধুর আনাগোনার অভাব ছিল না। রাজুর গাল-গল্প শোনার পর গুণী দূর থেকে ভয়ে ভয়ে দেখত তাদের। রাজু বলত, খবদ্দার, ওদের কাছে যাস না—ভুলিয়ে-ভালিয়ে মহাকালের বিচি খাইয়ে আর উড্ডীন-মুড্ডীন মন্ত্র পড়ে দিলেই পায়রা হয়ে উড়ে যাবি, বা ছাগলমাথার ধুতরো ফুল খাইয়ে অজমন্ত্র ফুঁইয়ে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ছাগল হয়ে গিয়ে ব্যা ব্যা করবি!

এসব যে সম্ভব গুণী রূপকথার বইয়ে পড়েছে। পায়রা হয়ে আকাশে উড়তে

তার আপত্তি ছিল না, যদি ইচ্ছেমত আবার মানুষ হওয়া চলত। ছাগল হতে একটুও ইচ্ছে নেই—কে কখন কেটে খেয়ে দেবে ঠিক কি! মোট কথা, রাজুর গাল-গল্প শুনে শুনে জটাজুটধারী সাধু-সন্ন্যাসীদের ভয়াল রকমের শক্তিধর ভাবত সে।

এমনি এক রুদ্র ভৈরবের কাছ থেকে রাজুর অদৃশ্য মন্ত্র আদায় করাটাই গুণীর বিবেচনায় সব থেকে বড় কেরামতি। তার মুখে শুনে শুনে অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র আর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ গুণীর কণ্ঠস্থ। এই মন্ত্রের গুণাবলী রাজু অনেকবার তাকে চাক্ষুষ দেখিয়েছে। অদৃশ্য হয়ে ঘর থেকে কত জিনিস হাতসাফাই করে তাকে দিয়েছে আর নিজে খেয়েছে। তাকে অদৃশ্য করে দেবার জন্য কত সাধ্যসাধনা করেছে, রাজুর কত গা-হাত-পা টিপে দিয়েছে ঠিক নেই। এই করে রাজুর কাছ থেকে মন্ত্র আর প্রতিক্রিয়াগুলো আদায় করে নিয়েছিল সে, কিন্তু রাজু বলেছে, অত ছোট বয়সে অদৃশ্য হওয়া যায় না। অতএব সখেদে বড় হওয়ার অপেক্ষায় ছিল সে। এরপর জ্যাঠার ক্রূর তাড়নায় রাজু পালিয়েছে—যাবার আগে আর একবার মন্ত্রের কেরামতি দেখিয়ে গেছে। একগাদা বাসনকোসন নিয়ে গেছে সে। থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল, অনেক তত্ত্বতল্লাসী হয়েছিল। শুধু গুণীই তখন মনে মনে হেসেছিল, অদৃশ্য মন্ত্রের গুণে রাজুর টিকির খবর আর যে কেউ পাবে না এ-সম্বন্ধে সে-ই শুধু নিঃসংশয় ছিল।

রাজু না থাকার মাঝে কিছুকাল এইসব মন্ত্র-মাহাত্ম্য নিয়ে মাথা ঘামানোয় ছেদ পড়েছিল। চোরের মার দেখে আর অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার জন্য ভিতরটা ফুঁসে উঠতে এই সহজ রাস্তাটাই গুণীর মনে পড়ে গেল। অদৃশ্য থেকে রাজুই যেন তার কানে কানে মন্ত্রটা বলে দিয়ে গেল : ওঁ হ্রীং হ্রীং হ্রেং ঐং লং ভং ওঁং ভৌ স্বাহা!

গুণীর হঠাৎ মনে হল, সে আর ছোট নেই, অনেক বড় হয়ে গেছে এতদিনে। মন্ত্রগুণে এবারে অনায়াসে অদৃশ্য হওয়া চলে। আর অদৃশ্য হতে পারলে যারা ওভাবে ঠেঙিয়েছে চোরটাকে, তাদের শায়েস্তা করা তো জলভাত ব্যাপার। কিন্তু শুধু মন্ত্র আওড়ালেই তো হবে না—আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপগুলোই আসল। প্রথমে একটা পায়রার মাথা যোগাড় করতে হবে। তারপর কৃষ্ণা-চর্তুদশী রাতে সেই পায়রার মাথায় কালো মাটি পুরে তার মধ্যে তিল বুনে দিতে হবে। বুনে ওটা মাটিতে পুঁততে হবে। তারপর এক ধার থেকে ওই মন্ত্র পড়ে দুধে জল মিশিয়ে রোজ সেই মাটিতে ঢাললেই হল। আস্তে আস্তে ছোট গাছ গজাবে। আরো জল-মেশানো দুধ ঢালতে ঢালতে সেই গাছ একটু বড় হবে আর তাতে ফুল হবে। সেই ফুল মুখে রেখে আবার ওই মন্ত্র পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য—সে সকলকে দেখতে পাবে অথচ তাকে কেউ দেখতে পাবে না। আবার মুখ থেকে ফুল ফেলে দিলেই যে কে সে—সবাই দেখতে পাবে।

গুণীর আক্ষেপ হতে লাগল, রাজুর কাছে তো কত অদৃশ্য ফুল ছিল, গোটা কয়েক যদি তাকে দিয়ে যেত। তাহলে আর এত হাঙ্গামা করতে হত না—মুখে দাও আর অদৃশ্য হও!

কিন্তু নেই বলে উদ্দীপনা কমল না। ভেবে-চিন্তে সংকল্পটা প্রধান সাগরেদ জীবনের কাছে ব্যক্ত করল। বাগচীপাড়ার জীবন বাগচী। কায়ার সঙ্গে যেমন ছায়া, গুণীর সঙ্গে তেমনি জীবন। বয়েস বছর দুই ছোট গুণীর থেকে—সর্বগুণমুগ্ধ অনুচর। তার

কাছে সঙ্কল্প ব্যক্ত করার প্রধান কারণ, তাদের বাড়িতে অনেক পায়রা আছে—পায়রার মাথা সংগ্রহ করা সহজ হবে। দ্বিতীয় কারণ, এমন এক অভিনব উদ্দীপনা নিজের মধ্যে ধরছিল না।

প্ল্যান শুনে জীবনের দ্বিগুণ উৎসাহ। এমন একজনের সাগরেদি পেয়ে সে ধন্য। তাছাড়া বাড়িতে তারও শত্রুতুল্য অভিভাবক আছে—অদৃশ্য পুষ্প লাভ হলে সেও প্রয়োজনমত তাদের একটু-আধটু শাস্তি-টাস্তি দিতে পারবে। একটা ছেড়ে গোটাকয়েক পায়রার মাথা এসে গেল। কালো মাটি আর তিল সংগ্রহ করা আরো সহজ। কৌশলে ঠাকুমার কাছ থেকে কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত কোনটা তাও জানতে কতক্ষণ। যথাসময়ে দ্বৈত-মন্ত্রপাঠসহ সেই পায়রার সব ক'টা মাথা স্বর্ণদের বাগানের এক নিরিবিলি কোণের মাটির তলায় চলে গেল।

গোল বাধল তাতে জল-মেশানো দুধ ঢালা নিয়ে। কয়েকটা দিন বিনা উপদ্রবেই দুধ ঢালা চলছিল। দুজনেই যে যার ভাগের দুধ নিয়ে ফাঁক-মত বৃক্ষসম্ভব-মৃত্তিকায় ঢেলে দিয়ে যায়। কিন্তু ওদিকে বলতে গেলে বিনা কারণেই ভাইপোটির ওপর পিসীর সদা খরদৃষ্টি। কারণে অকারণে সে আবার গুণধরটির মুখে দুষ্কৃতির ছায়া দেখে। যে-ছেলে কুইনিন গেলা মুখ করে দুধ খায়, দুধের প্রতি তার হঠাৎ অনুরাগ দেখে খটকা লাগল। দুধ আবার সামনে বসে খায় না, নিয়ে বাইরের দিকে চলে যায়। শেষে খেয়াল করল, স্বর্ণদের বাগানের দিকে যায়। জিজ্ঞাসা করতে গুণী নিরীহ মুখে ইনিয়ে বিনিয়ে জবাব দিল, বাগানের ছায়ায় বসে গরম দুধ একটু একটু করে চায়ের মত আয়েস করে খেতে খুব ভালো লাগে।

এই আয়েস করে খাওয়াটা পিসী হাতেনাতে ধরল একদিন। একসঙ্গে দুজনকেই। কিন্তু একসঙ্গে দুজনকে ধরে রাখা সম্ভব হল না। গুণী এক ঝটকায় পিসীর হাত ছাড়িয়ে গাছপালার ফাঁক দিয়ে চোখের পলকে উধাও। অদৃশ্য মন্ত্র না শিখেই তখনকার মত অদৃশ্য হতে পেরেছে। জীবনের অত শক্তিও নেই সাহসও নেই। বমাল সমেত অর্থাৎ দুধের গ্লাস সমেত তার একটা বাহু পিসীর হাতের মুঠোয়। গুণীর দুধের বাটি মাটিতে গড়াচ্ছে—তাকে মাটিতে দুধ ঢালতে পিসী স্বচক্ষেই দেখেছে, আর বিড় বিড় করে কি সব বলতে স্বকর্ণে শুনেছে।

গোটা দুই ঝাঁকুনি পড়তে জীবন ভ্যা করে কেঁদে ফেলল। আর, আরো দুই একটা ঝাঁকুনি খেয়েই সমস্ত গুপ্ত সঙ্কল্প ফাঁস করে দিল। প্রাণের দায়ে সব অপরাধ তখন গুণীদার ওপর চাপালো সে। গোপন কথা ফাঁস করার অপরাধে পরে গুণীর হাতের দুই একটা চড়চাপড় আর দাঁত কড়মড়িয়ে মুখ ভেঙচানোকে খুব গুরু শাস্তি বলে মনে করল না। ওতে অনভ্যস্ত নয় মোটেই।

এরপর গুণী দিনকয়েক পিসীকে তোষামোদ করে ঠাণ্ডা করেছে। মার খাবার জন্য তার হাতের নাগালের মধ্যে ঘুরঘুর করেছে। শেষে পিসী যত রাগই করুক, ব্যাপারটা জ্যাঠার কানে উঠাবে না বুঝে নিশ্চিন্ত হয়েছে। শেষে অদৃশ্য গাছ কেন ইতিমধ্যে গজালো না তাই ভেবে অবাক হয়েছে। দুধ তো এ ক'দিন কম ঢালা হয়নি। কৌতূহল দমন করতে না পেরে জীবনকে নিয়েই একদিন মাটি খুঁড়ল। অবাক হয়ে

দেখল, পায়রার মাথার চিহ্নও নেই, মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে গেছে।

পরে সখেদে ভেবেছে, এখনো বোধ হয় যথেষ্ট বড় হয়নি সে, তাই হল না। তার অদৃশ্য হওয়ার ঝোঁক গেল বটে কিন্তু মন্ত্র-তন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থা একটু শিথিল হল না। তার ধারণা, এই দুনিয়ায় সব কিছুই হওয়া সম্ভব, সব কিছুই ঘটানো সম্ভব—শুধু গোপন চাবিকাঠিটি করায়ত্ত নয় বলেই ইচ্ছেমত সব হয় না, ইচ্ছেমত সব ঘটানো যায় না। বাস্তবে কোন চাহিদা না মিটলেই সরাসরি কল্পনার রাজ্যে হাজির হয়ে গোপন চাবিকাঠিটি হাতড়ে বেড়াতো সে, যা পেলে কোনো পাওয়া অপূর্ণ থাকার নয়। গাঁয়ে বা আশেপাশে মেলা-টেলা এলেই ঠাকুমা তার হাতবাক্স সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। ফলে যা দরকার গুণীকে চেয়ে-চিন্তে বা ঘ্যানর-প্যানর করে আদায় করে নিতে হত। বলা বাহুল্য, যা পেত তাতে অভিলাষের এক আনাও পূরণ হত না। ফলে অনেক সময় সে বিমর্ষ মুখে বসে বসে ভাবত, একটা টাকার গাছ পুঁততে পারলে বেশ হয়। ডাইনী বুড়ীর গল্পে পড়েছে টাকার গাছ হয়। টাকা একটা চুরি করে অনায়াসেই সে মাটিতে পুঁতে রাখতে পারে। কিন্তু গাছ হবে কি করে, মন্ত্র তো জানা নেই। মন্ত্রই তো আসল। গুণী ভেবে পেত না, বয়স্ক লোকগুলো এত নির্বোধ কেন। টাকার ওপর এত মায়া যে একটা টাকা খোয়া গেলে হৈ-চৈ পড়ে যায়—অথচ কোন মন্ত্রে টাকার গাছ গজাতে পারে তা নিয়ে কেউ যদি একটুও ভাবত।

গুণী ভাবত। ভেবে ভেবে কল্পনায় সেই মন্ত্র উদ্ধারও করত। তারপর টাকার গাছ—যত ঝাঁকাও ততো টাকা—বৃষ্টির মত ঝমঝম করে শুধু টাকা-বৃষ্টি। গুণীর তখন স্থান-কাল ভুল হয়ে যেত, পরম তুষ্টিতে নিজের মনেই হাসত মৃদু-মৃদু। একা একা বসে তাকে হাসতে দেখে সাগরেদ জীবন আর বাল্যসঙ্গিনী স্বর্ণ অনেকদিন অবাক হয়েছে। স্বর্ণ এক-এক সময় সাহস সঞ্চয় করে বলেছে, গুণীদা, তুমি একা একা হাসো, তুমি কি পাগল?

শুধু স্থূল প্রাপ্তি-মন্ত্র নয়, সমস্ত প্রকৃতির দিকে চেয়ে-চেয়েও অনেক সময় বিভ্রান্ত বিস্ময়ে রহস্যের অবগুণ্ঠন দেখত ওই দুরন্ত ছেলে। দূরে মেঘের মত শুষনি পাহাড় দেখে ভাবত, ওটার মধ্যে প্রাণ আছে, কারো যাদুমন্ত্রে নির্জীব পাহাড় হয়ে পড়ে আছে। পাল্টা মন্ত্রটা জানা থাকলেই আড়মোড়া ভেঙে ওটা আবার জেগে উঠত। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ত, বেচারার কপালে আর জেগে ওঠা নেই, চিরকাল পাহাড় হয়েই থাকতে হবে। বিকেলে আকাশের রঙের খেলা দেখে ভাবত, আকাশের ওধারে কোথাও একটা রঙের ভাণ্ড আছে—বিকেলে দেবতারা তাই থেকে পিচকিরি দিয়ে রঙ নিয়ে খেলা করে। মেঘ ডাকলে আর বিদ্যুৎ চমকালে দুটো বিকট দৈত্যের যুদ্ধ হচ্ছে ভাবত—বিদ্যুৎ হল তাদের তলোয়ার—আর মেঘের ডাক তাদের গর্জন ছাড়া আর কি? যে জেতে সে গরজায় আর যে হারে তার বউ ছেলেমেয়ে নাতিপুতিরা কাঁদে। কাঁদে বলে বৃষ্টি হয়। বেশি কাঁদলে অঝোরে বৃষ্টি হয়।

কিন্তু এ-সব যে নিজস্ব কল্পনা তা গুণী ভালই জানে। কারণ মেঘ বা বৃষ্টি কি করে হয় ততদিনে বিজ্ঞান বইয়ে তার পড়া হয়ে গেছে। পরীক্ষায় প্রশ্ন এলে সে দৈত্যের কথা নিশ্চয় লিখবে না। কিন্তু কল্পনার পরীক্ষার কাছে ও-সব নীরস

পরীক্ষা লাগে নাকি? এমনি এক-একটা উদ্ভাবনের পরীক্ষায় সগৌরবে উতরে গিয়ে সে পরম তৃপ্তিলাভ করত।

সব থেকে ভালো লাগত বোধ করি কল্পনায় ইচ্ছেমত মেঘের জোড় লাগাতে। যা ভাবত, ভাসমান মেঘগুলো জোড় লেগে লেগে ঠিক যেন সেই আকার নিত। এই অভিনব ব্যাপারটা বহুদিন স্বর্ণকে আর জীবনকে দেখিয়েছে সে। দেখিয়ে অবাক করেছে।

—ওই মেঘটা ওই মেঘটার সঙ্গে গিয়ে লাগছে দ্যাখ—এবারে বোধ হয় একটা হাতি হবে—ঠিক হয়েছে—ওই সামনেটা হাতির মাথা, মাঝের মোটা দিকটা পেট—ওই শুঁড়, ওই দাঁত, হাত-পা দেখছিস?

তারা দেখত। অবাক হয়ে হাতিই দেখত। সিংহ দেখালে সিংহ দেখত, বাঘ দেখালে বাঘ। গুণীর মনে হত, যা ইচ্ছে করা যায় তাই দেখা যায়—দেখানোও যায়। ক্ষুদ্রকায় সঙ্গী আর সঙ্গিনী তখন দার্শনিক কাকে বলে জানত না। কিন্তু গুণীদা যে তাদের মত নয়, তার মাথায় যে উদ্ভট অনেক কিছু খেলে, গুণমুগ্ধ ভক্তের মতই এ তারা বিশ্বাস করত।

কিন্তু দুরন্ত ছেলের মনে এই সব অবাধ বিচরণের দিকটাই আর কারো দেখার অবকাশ হয়নি। হলে তার জীবনের মোড় আর কোনোদিকে ঘুরত কিনা বলা যায় না। কিন্তু অবকাশ হয়নি, হয়ও না বড়।

পনের বছর বয়সে গুণী জ্যাঠার সঙ্গে একবার কোলকাতায় এসেছিল। জেঠির বাপের বাড়ি কলকাতায়। সেই বাপের বাড়ির লোকেরা তাকে কলকাতার মঞ্চে ম্যাজিক দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ম্যাজিক দেখে এসে প্রথম একদিন গুণী নাওয়া-খাওয়া ভুলল। পুরনো তাস নিয়ে, কড়ি নিয়ে, পয়সা নিয়ে, রুমালের বদলে ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে সে নিজেই কিছু কিছু ম্যাজিক উদ্ভাবন করতে লাগল। এ ছাড়া রাস্তায় রাস্তায় বেদেদের খেলা দেখত চেয়ে চেয়ে। সবই ফাঁকি জানত, কিন্তু ফাঁকিটা কোথায় তন্ময় হয়ে তাই ভাবত বসে বসে। দেশে ফিরেও এমনি দুই একজন ভবঘুরে বেদে আর সাধুর পিছনে ঘুরে ঘুরে লোককে একটু-আধটু অবাক করার মত রসদ সে সংগ্রহ করেছিল।

নূতন বয়সের বিদ্যে চেপে রাখা যায় না। সে-বিদ্যে পাঁচজনের কাছে জাহির করতে না পারলে যাতনা। আর জাহির করতে বসলে যতটা জানে তার কিছু বেশিই প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইস্কুলের সহপাঠীদের কাছে এই নূতন বিদ্যে প্রকাশ করে গুণী চট করেই একটু নাম করে ফেলেছিল। কলকাতার কোন মস্ত নামজাদা ম্যাজিসিয়ানের কাছে সে ম্যাজিক্ শিখে এসেছে তা বেশ ফলাও করেই প্রচার করেছে। ওই বয়সের ছেলেদের একটা মন সদাই বিস্ময়োন্মুখ। তারা অবিশ্বাস করে না। তাছাড়া এই সতীর্থটির সাহস আর ক্ষমতার প্রতি এমনিতেই তাদের প্রগাঢ় আস্থা। তাবা জেনেছে কত কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে মস্ত ম্যাজিসিয়ানের সুনজর লাভ করেছে গুণী। কত সাধ্যসাধনা করে আর কতভাবে তোয়াজ করে তবে দুই-একটা খেলা আদায় করা গেছে। তবে মস্ত ম্যাজিসিয়ানটি নাকি খুদে শিষ্যটির ওপর তুষ্ট হয়ে তাকে নিজের কাছে রাখতেই

চেয়েছিল। কিন্তু জ্যাঠার ভয়ে গুণী থেকে যেতে পারল না।

এভাবে পটভূমি প্রস্তুত করে নিয়ে সে বাছাই করা সমবয়সীদের ম্যাজিক দেখিয়ে সত্যিই তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। দর্শক বাছাই করার কারণ, বুদ্ধিমান দর্শক থাকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে শিল্পী সাধারণত নিজের বিপদ নিজেই খুঁড়ে থাকে। তার সাহস বাড়ে, যশের আকাঙক্ষা বাড়ে। ফলে কতটা এগোনো উচিত সব সময় খেয়াল থাকে না।

ক্ষুদে ম্যাজিসিয়ান গুণীরও তাই হল। তার দর্শকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ভাঁওতার সংখ্যাও।

এদিকে গোড়ায় গোড়ায় অবাক হোক আর যাই হোক, সমবয়সীদের ভাঁওতা আবিষ্কার করার চেষ্টাটাও বালক মনের স্বাভাবিক বৃত্তি। তারা ফাঁকি ধরতে চেষ্টা করত, খুব চোখ রাখত, অবিশ্বাসের সুতো বার করে তর্ক করত। ঠিক এই সময়ে গুণী আসল ভুলটা করে বসল। জীবনকে ম্যাজিকের চর নিযুক্ত করল। অর্থাৎ তার সঙ্গে কতগুলো ইশারা ঠিক করে নিল। সে নিরীহ মুখে দর্শক সেজে বসে থাকবে। জ্ঞাতব্য সংবাদ ইশারায় সকলের অগোচরে সরবরাহ করবে।

ব্যবস্থা ঠিক করে গুণী কলকাতায় মস্ত ম্যাজিসিয়ানের শেখানো কয়েকটা অবাক খেলার সূত্রপাত করল। যেমন দশটা ছেলে বসে আছে, গুণী তাদের কাছে একটা রুমাল দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। রুমালটা ছেলেদের একজন লুকালো। গুণী এসে বলে দেবে কার কাছে রুমাল আছে। তিনটে কৌটোর একটাতে তেঁতুল বিচি রাখা হয়েছে, গুণী সে কৌটো স্পর্শ না করেই এসে বলে দেবে কোনটাতে আছে। এক প্যাকেট তাস থেকে একটা তাস বেছে নিয়ে সকলকে দেখিয়ে আবার সেটা মিশিয়ে রাখা হল। গুণী এসে তাসের প্যাকেট হাতে তুলে নিল। সাড়ম্বরে তাসের গন্ধ শুঁকল। তারপর নানাভাবে তোয়াজ করে সেই নির্দিষ্ট তাসের মন ভোলাতে চেষ্টা করল। ম্যাজিসিয়ানদের বাগাড়ম্বর দরকার সেটা সে কলকাতায় দেখেছে। এদিকে কথার ফাঁকে আড়ে আড়ে জীবনকে দেখছে। ভারী নিরীহ মুখ করে সে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখ কামড়াচ্ছে, আর ডান হাতে করে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছে।

গুরুগম্ভীর মুখে প্যাকেট থেকে চিঁড়ের গোলামটা বার করে সকলের মুখের ওপরেই ছুঁড়ে মারবে গুণী। বলবে, এই নে, চিরকাল গোলামী করিস তোরা, গোলামই তো ধরবি—তাও আবার চিঁড়ের গোলাম।

দাঁতে করে কড়ে আঙুলের নখ কাটা হচ্ছিল, অর্থাৎ রঙ চিঁড়ে। তারপর দু'হাতের দশ আঙুল পেরিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ খোঁটা হচ্ছিল, অর্থাৎ তাসের নম্বর এগারো। তাস চিঁড়ের গোলাম হতে বাধ্য।

এবারে গুণীর সত্যিই নাম হল, আর সেই নাম সত্যিই কালও হল।

আসল কলকাঠি একজনের হাতে অথচ নামটা পুরোপুরি আর একজন নেবে, সেটা ক্রমশ জীবনের অপছন্দ হতে লাগল। তার ইচ্ছে, এই বলে দেওয়ার ম্যাজিকটা গুণীর সঙ্গে পালা করে সে-ও দেখায়। কিন্তু ভরসা করে প্রস্তাবটা গুণীর কাছে উত্থাপন

করতে পারেনি। করল আর একজনের কাছে। বলল, এই সব ম্যাজিকগুলো সে-ও দেখাতে পারে—শিখেছে—গুণীদা আপত্তি না করলে সে-ও অনায়াসেই দেখিয়ে দিতে পারে।

সন্দেহের প্রথম বীজ বোনা হয়ে গেল। এরপর সেই ছেলে আর জনাকতকের সামনেই জীবনকে দেখিয়ে গুণীকে বলল, ও বলছে, তোর ওই বলে দেওয়ার ম্যাজিকগুলো ও-ও দেখাতে পারে।

জীবন ঈষৎ লজ্জায় আর ঈষৎ সঙ্কোচে অধোবদন। গুণী একপলকে তার মুন্ডুটা চিবিয়ে নিয়ে তারপর হেসেই প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিল। সস্নেহেই সাগরেদের দিকে চেয়ে বলল, ও ভাবছে পারবে, কিন্তু আসলে পারবে না। আচ্ছা, পারলে কাল দেখায় যেন।

বিকেলে জীবনকে স্বর্ণদের বাগানে টেনে নিয়ে এলো। জীবন ভাবছে, আলোচনা করে এরপর আপসে দুজনে পালা করে খেলা দেখানোর ব্যাপারেই একটা রফা হবে। কিন্তু বাগানের নিরিবিলিতে এসেই চোখে লাল নীল অন্ধকার দেখার মত করে জীবনের মাথায় গুণী রাম গাঁট্টা বসিয়ে দিল দুটো। এত জোরে যে জীবন ধুপ করে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর অন্ধকার দেখল চোখে। মাথার দু'জায়গায় কুলোর মত ফুলে উঠেছে।

রাসকেল কোথাকার, খুব ম্যাজিক দেখানোর শখ হয়েছে। আজ মেরেই ফেলব তোকে, আর জীবনে বলবি?

জীবনের দু চোখে ধারা নেমেছে। এই গুরুর হাতে মার খেলে নিঃশব্দে কাঁদাই অভ্যাস। জীবন মাথা নাড়ল, জীবনে আর বলবে না।

আরো দু'চারটে রামঝাঁকুনি দিয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে গুণী ছেড়ে দিল তাকে। কিন্তু পরবর্তী ক্ষুদ্র ম্যাজিকের আসরেই সব ওলট-পালট। জীবনের আহত অভিমান সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। সুপ্ত পুরুষকার হঠাৎ ফুঁসে উঠল। তাস বাছাই করার জন্য বন্ধুদের হাতে তাদের প্যাকেট দিয়ে গুণী আড়ালে চলে গেছে। ফিরে এসে বাহান্ন তাসের মধ্যে ওই একটি বাছাই করা তাস বার করে দেবে।

সকলকে অবাক করে ছিলা-ফসকানো তীরের মতো হঠাৎ জীবন উঠে দাঁড়াল। দাঁত কড়মড় করে বলল, কেমন তাস বার করে করুক—

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে আর এক পথে হাওয়া। বন্ধুরা বিমূঢ় প্রথম। কিন্তু কিছু একটা রহস্যের যেন যবনিকা সরছে।

তাস বাছাই হতে সংকেত মত ভারিক্কি ম্যাজিসিয়ানের চালে গুণী এলো। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল। জিভ আর ঠোঁট শুকিয়ে জল-তেষ্টা পেল। এক বন্ধু তার দিকে তাসের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেদিকে দৃকপাত না করে গুণী এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর গলা দিয়ে প্রথম অস্ফুট স্বর নির্গত হল, জীবন কোথায়?

ব্যাপারটা এতক্ষণে বন্ধুদের স্পষ্টই বুদ্ধি-গোচর হয়েছে। তারা বলে উঠল, জীবনকে দিয়ে কি হবে, তুই ম্যাজিক দেখা, তাস বার কর।

ম্যাজিক না জানলেও গুণীর এবারে বন্ধুদের মুখের লেখা পাঠ করে নিতে দেরি হল না। সকলকে সচকিত করে হঠাৎ এক দৌড় সেখান থেকে। ভয় নয়, জীবনের মাথাটা ছিঁড়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু সে সম্ভাবনার কথা জীবন ভালই জানত। অনেক দিনের মধ্যে সে আর তার ছায়াও মাড়ায়নি। তার ক্ষমা চাওয়ার বৃত্তান্ত আর গুণীর তাকে ক্ষমা করার বৃত্তান্ত আর এক পর্ব। এক কথায়, মোড়লি করার মত যোগ্য সাগরেদের অভাবেই গুণী শেষ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করেছিল।

বন্ধুদের তাক লাগিয়ে ম্যাজিসিয়ান হওয়ার চেষ্টায় সেখানেই ইতি। মর্যাদার উঁচু আসন থেকে একেবারে নিচের মাটিতে মুখ থুবড়ে আছাড় খেতে হয়েছে তাকে। বন্ধুরা এরপর তাকে দেখলেই অনেকদিন পর্যন্ত টিটকিরি দিয়েছে, ছড়া কেটেছে, 'লাগ লাগ্ লাগ্ লাগ্ ভেলকী লাগ্—মামীর মায়ের খেলা দেখ'।

গুণী যতটা সম্ভব মুখ বুজে সহ্য করেছে। নয়ত সুবিধেমত নাগালের মধ্যে কাউকে পেলে মারামারি ধস্তাধস্তি করে মামীর মায়ের খেলা দেখিয়ে ছেড়েছে।

যাই হোক, কলকাতায় জ্যাঠার শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরার পরেই গুণী বারো বছরের স্বর্ণর মধ্যে একটা কিছু ইশারা আবিষ্কার করেছিল। স্বর্ণর মধ্যে কার যেন একটা কারিকুরি চলেছে। এই সময় ফাঁক পেলে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে একটা-আধটা উপন্যাস সংগ্রহ করে পড়া হয়ে গিয়েছিল। স্বর্ণকে নির্দ্বিধায় সেই সব উপন্যাসের নায়িকা ভাবত সে, আর নায়ক তো নিজেই।

তার ম্যাজিকেরও প্রথম দর্শক স্বর্ণ। হাতে এটা ওটা দিয়ে চোখে ধুলো দেওয়ার ছলে তার হাতটা প্রয়োজনের অনেক বেশি সময় ধরে রাখত। নিজের হাতটা অকারণে অনেক সময় ওর বাহু পর্যন্ত ওঠা-নামা করত। স্বর্ণর চোখে ধুলো দেওয়া সহজ, তখনো শুধু সে-ই ওই ম্যাজিকের একনিষ্ঠ ভক্ত। স্বর্ণ ওর সব আজগুবী গল্প শুনত আর টলমলিয়ে চেয়ে থাকত। গুণী অনেক সময় তার কালো বড় তিলটা পরখ করে দেখার ছলে ঘষে ঘষে দেখত আর বলত ম্যাজিকের হাত আর একটু পাকা হলেই সে ম্যাজিক করে ওই বিদঘুটে তিল তুলে দেবে।

বিদঘুটে বলাটা স্বর্ণর পছন্দ হত না, বলত, দিদু যে বলে চাঁদের কলঙ্কের মত এই তিল ছাড়া আমাকে মানায় না?

তোর দিদু বুদ্ধির ঢেঁকি। এটা কি চিরকাল থাকার মত তিল নাকি? দেখি—

নিজের নাক মুখ প্রায় ঠেকিয়ে আবার গভীর মনোনিবেশে তিল দেখা হত।

ইদানীং তার সব ব্যাপারেই স্বর্ণর দুর্বোধ্য শঙ্কা হত কেমন। ঠিক বুঝত না, কেবল একটা অস্বস্তি নিয়ে তাকে দেখতে চেয়ে চেয়ে, আর তার দাপট সহ্য করতো।

তের বছর বয়সে স্বর্ণ হঠাৎ কেমন বদলে গেল। তার মধ্যে পরিবর্তনের ইশারা আরো স্পষ্ট তখন। হঠাৎ টেনে ধরতে গেলে বাধা দেয়, ম্যাজিক দেখাতে চাইলে বলে, দূর থেকে দেখাও। আর তিলটা তো ছুঁতেই দেয় না মোটে। পিছনের বাগানের নিরিবিলিতে বা পুকুরের ওপারে কাঁটাঝাড়ের ওধারে যদিই বা তাকে টেনেটুনে নিয়ে আসতে পারত, বেশিক্ষণ থাকতে চাইত না সে, আর একটু বেচাল দেখলেই হাত পিছলে ছুটে পালাত। গুণী রাগে জ্বলত, আর হাত নিশপিশ করত।

ওই বয়সেই রোগ পাকা তার। স্বর্ণ-রোগ।

রাতে ঠাকুমার কাছে শুয়ে চুপিচুপি পরামর্শ করত, স্বর্ণকে বিয়ে করে ঘরে এনে শায়েস্তা করা যায় কিনা। ঠাকুমা হাসত, কখনো রাগ করত। বলত, ওরা বামুন, ও কথা বলে না। ঠাকুমা রাগ করুক বা হাসুক, জ্যাঠার কানে যাতে নাতির অভিলাষ না ওঠে সেদিকে খেয়াল রাখত। বকাবকি করতে হলেও চুপে চুপেই করত।

মনের জ্বালায় আর কিসের জ্বালায় গুণী ভালো জানে না, তের বছরের স্বর্ণকে জব্দ করার একটা ফন্দি আঁটল। তার কাছে ঘোষণা করল, তিল আর সর্বরকমের দাগ তোলার বিদ্যেটা সে আয়ত্ত করে ফেলেছে। সাদা নীল কয়েক রকমের গুঁড়োও সংগ্রহ করেছিল, কালির দাগ যে ওঠে গুঁড়ো ঘষে ঘষে তাও স্বর্ণকে দেখাল।

শেষ পর্যন্ত আর লোভ সামলানো গেল না, স্বর্ণ হাত বাড়াল, দাও—

বাগানে আয়, অনেক ব্যাপাব আছে আরো, তাছাড়া সময়ও লাগবে।

না, হাতে দাও।

তবে যা ভাগ, তোর ওই চাঁদের কলঙ্ক নিয়ে তুই থাকগে যা। সমস্ত মুখময় যখন এরপর ওই তিল উঠবে তখন বুঝবি মজা। তখন আমার কাছে আসবি তো মেরে তাড়াব।

স্বর্ণ সেদিন চলে গেছে, কিন্তু ঘুরঘুর করেছে। এই ক'বছরে একটা ধাবণা তারও বদ্ধমূল, ওই তিলটা তোলাই দরকার। তাছাড়া সতিাই যদি মুখে আরো গোটাকতক এ-রকম তিল ওঠে তাহলে তো সর্বনাশ।

গুণী বাগানের পিছনে নির্দিষ্ট স্থানটিতে নিয়মিত অপেক্ষা করল দিন তিনেক। নিস্পৃহ, উদাসীন। তিলনাশক গুঁড়োর আশায় স্বর্ণর ঘোরাঘুরির পরিধি বাড়তে লাগল, তারপর চাব দিনের দিন সামনে না এসেও পারল না।

ঠোঁট উল্টে বলল, তিল উঠবে না ছাই—

উঠে কাজ নেই, পালা। দুবছর ধরে নানা লোকের পিছন ঘোরাঘুবি করে তোর জন্যে যোগাড় করলাম—কালই পুকুরে ফেলে দেব। গুঁড়োর পুরিয়া দুটো পকেট থেকে বার করল, যেন তক্ষুনি ফেলে দিয়ে এলেই হয়।

আমার হাতে দাও না।

তোর হাতে কাজ হলে দিতুম।

স্বর্ণ কাছে এসে বলল, ঠিক উঠবে বলছ?

উঠবে।

জ্বালা করবে না?

না।

কটকট করবে না?

না। এখানে এসে বোস।

এখানে অর্থাৎ গোটাগুটি তার নাগালের মধ্যে। অগত্যা বসতে হল। গুণী তিল তোলার মন্ত্র আওড়ালো মিনিটখানেক। তারপর এক হাতে তার কপালটা পিছন দিকে হেলিয়ে ধরে অন্য হাতের আঙুলে করে গুঁড়ো ঘষে ঘষে দিতে লাগল তিলটার

ওপর। মেয়েটা তার দুই হাতের আওতার মধ্যে, চোখ বোজার নির্দেশ, চোখ বুজে আছে—চোখে লেগে গেলে চোখ জ্বলে যাবার ভয় নাকি।

কিন্তু একটু বাদে টের পেল তিলের ওপর আঙুল নড়ছে না, কিসের যেন সুড়সুড়ির মত লাগছে, আর চোখের নিচে হাড়ের ওপরটা ভিজে ভিজে লাগছে। তার মাথাটা আরো শক্ত করে ধরা, আর অন্য হাতে তার কাঁধটাও। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকাতে হল। গুণীদা তিলের ওপর তার জিভের ডগাটা ঘষছে। নড়তে গিয়ে স্বর্ণ অস্ফুট গর্জনের মত ধমক খেল, চুপচাপ চোখ বুজে থাক, জিভের লালা লাগাতে হবে।

ভয়ে কাঠ হয়ে স্বর্ণ তক্ষুনি চোখ বুজে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল, জিভ আর দাঁতের চাপে তিলসুদ্ধু ওই জায়গার চামড়াটাই টেনে তুলে নিতে চেষ্টা করল গুণী। উত্তেজনায় কাঁপছে নিজেও।

হঠাৎ এক ঝটকায় তাকে ঠেলে উঠে দাঁড়াল স্বর্ণ। শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে দু চোখ বিস্ফারিত করে তাকে দেখল একবার, তারপর ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

পরের তিন বছরের মধ্যে গুণী আর এইভাবে হাতের নাগালের মধ্যে পায়নি তাকে। পায়নি বলেই দিনে দিনে ভোগ দ্বিগুণ হয়েছে, অসহ্য হয়েছে। পেলে ওকে নিয়ে ঠিক যে কি করবে ঠিক করে উঠতে পারে না। প্রথম প্রথম ভাবত, পেলে খুব মারবে। একেবারে হাড়-মাংস গুঁড়িয়ে দেবে। তারপর ভেবেছে, না, অতটা মারবে না। তাহলে বাড়িতে জানাজানি হয়েই যাবে। জ্যাঠার কাছে নালিশ আসবে। তাছাড়া পুরুষমানুষ হয়ে একটা মেয়েকে বেশি মারধর করার সঙ্কল্পটা নিজেরই এক সময় ভালো লাগল না। না, বেশি মারবে না, অল্পই মারবে। তারপর স্বর্ণ যখন কাঁদবে, তখন তার সঙ্গে আপস করে নেবে। একটু-আধটু আদরও করবে। মারধর করার থেকে এই আদরের পর্বটাই ভাবতে বেশি ভালো লাগল। কি ভাবে আদর করবে সঠিক জানে না। কত রকমের আদর আছে। বইয়েও দুই এক রকমের আদর করা পড়েছে। তাও ভাবতে ভালো লেগেছে।

যাকে নিয়ে এই ভাবনা সে-ই আর কোন ডাকে কাছে আসত না, কোন ছলনায় ভুলত না। কিন্তু এমনি ডাকে না আসুক না ভুলুক, আর এক ডাকে যে কাছাকাছি আসত বা একটু ভুলত, গুণী সেটা উপলব্ধি করতে পারত।

বাঁশীর ডাকে। বাঁশের বাঁশী।

এগারো-বারো বছর বয়সেই বাঁশীর ঝোঁক হয়েছিল কেমন করে মনে নেই। বছর কয়েকের মধ্যে সেই আধা-শহরে বেশ শোনার মতই বাজাতো।

ঠাকুমা বলত, হবে না, বাপের ধারা পেয়েছে, ওর বাপের বাঁশী শুনলে যে পশু পাখি বশ হত। প্রথমে একটা ভবঘুরে লোকের কাছে বাঁশীর হাতেখড়ি গুণীর। তারপর জ্যাঠার চোখে ধুলো দিয়ে অনেক যাত্রাদলে হানা দিয়েছে, অনেক রকমের তালিম নিয়েছে। কিন্তু আসল শিক্ষাগুরু সম্ভবত তার নিজেরই তাড়না। বাঁশী বাজাতে বাজাতে একসময় তাড়না ঠাণ্ডা হত। জ্যাঠা খাজনা আদায়ে বেরুলে বা শহরের কোর্টে

গেলে বাড়ির দাওয়ায় বসেই বাজাতো, নয়তো আশেপাশের কোথাও বসে। নানা ছলছুতোয় তখন স্বর্ণ আসত। কখনো ঠাকুমার কাছে কিছু দরকার পড়ে যেত তার, কখনো বা বার দুই-তিন সামনে দিয়ে ঘাটে যেত জল আনতে।

বাঁশীর এই অদ্ভুত ক্ষমতা উপলব্ধি করার পর থেকে নানা আকৃতির সেতু ধরে সুরের অন্তঃপুরে উঁকিঝুঁকি দেওয়ার ক্ষমতাও যেন আপনিই বাড়ছিল গুণীর।

জ্যাঠা বাড়ি থাকলে বা অন্য কোন অসুবিধে থাকলে বাঁশী নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যেত। স্বর্ণ যখন টানত না তাকে, তখন ওই দূরের পাহাড়টা টানত। অবশ্য পায়ে হেঁটে যাওয়া যেত না, সতের-আঠার মাইল দূর। কয়েক মাইল গিয়ে একটা পছন্দমত জায়গায় বসে বাঁশীতে মগ্ন হত। সঙ্গে থাকত জীবন। গুণমুগ্ধ অনুচর হলেও তার বিষম শত্রুও ওই ছেলেটাই। গুণী প্রবেশিকায় বার দুই হোঁচট খাওয়ার ফলে জীবন তার সহপাঠী তখন।

অনেক সময় অনেক ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে সে গুণীর হাতে বেদম মার খেয়েছে। উনিশ বছরের সেই গুণীর হাত দুটোকে সমবয়সী এমন কি একটু-আধটু বয়োজ্যেষ্ঠরাও বিশেষ ভয় করত, সমীহ করত। কিন্তু যে কারণেই মারধর করুক, একসময় গুণী জীবনকে আবার না ডেকে পারত না, আর জীবনও না এসে পারত না।

প্রণয়ের সব বেদনা একজনের কাছেই ব্যক্ত করেছিল গুণী। ব্যক্ত না করে উপায় ছিল না, এমনই দুর্বহ সেই বেদনা। জীবন প্রথম প্রথম ভাবী অবাক। গুণীদার এই মুখ আগে বড় দেখেনি। ক'দিনই তাকে কি বলবে বলবে করেছে। অথচ বলছে না। ঠিক যে বলছে তাও নয়, যেন বলতে পারছে না। কথাই কম বলে, ফর্সা মুখ লাল হয়, গলার স্বরও নরম। তারপরে তাকে দিয়ে অনেক দিব্বি কাটিয়ে, গোপন কথা চিরকাল গোপন থাকবে এই শর্ত আদায় করে শেষে যেন সঙ্কোচের পাহাড় ঠেলে গোপন কথাটা ব্যক্ত করেছে। যা বলেছে শুনে জীবন আবারও হাঁ। স্বর্ণকে নাকি সে ভয়ানক ভালবাসে। ভয়ানক ভালবাসার তাৎপর্য জীবনের বোধগম্য হয়নি। ভয়ানক ভালবাসার কথা শুনে তার বরং একটু ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছিল। মারুক ধরুক আর যা-ই করুক গুণীদার আসল ভালবাসার পাত্র সে নিজেকেই ভেবে রেখেছিল। যাই হোক এর জন্যে এমন মানসিক তাড়নার হেতু কি থাকতে পারে ভেবে পায়নি। ভালো তো স্বর্ণকে একটু-আধটু সে-ও বাসে।

গুণী তখন তাকে বুঝিয়েছে, এটা আর এক রকমের ভালবাসা। এ ভালবাসা ছেলেতে ছেলেতে হয় না। জানাশোনা থাকলে বিয়ের আগে লোকে হবু বউকে যেমন ভালোবাসে, সেই রকমের ভালবাসা এটা। অর্থাৎ সব সময় তার কথা মনে হয়, কাছে যেতে ইচ্ছে করে, কথা বলতে ইচ্ছে করে।

এ-ভাবে বিশ্লেষণ করার পর এই ভালবাসার ধরণটা জীবনের কাছে কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। ব্যাপার তাহলে অন্য রকমই বটে, বিয়ের আগে লোকে হবু বউকে যেমন ভালবাসে, গুণীদা স্বর্ণকে সেই রকম ভালবাসে। ব্যাপারটা জীবনও আর ছোট করে ভাবতে পারল না। দুজনে এরপর এই নিয়ে পরামর্শ করত। শলাটা তেমন

জমে উঠলে এক-একদিন বাঁশী বাজানোই হত না। এই সময়টায় গুণী আর মারধর করত না তাকে, পরম সমব্যথী ভাবত।

সমব্যথীই বটে। বয়েস ষোল পেরিয়ে সতেরোয় গড়ালেও জীবনের ভিতরটা সে তুলনায় অনেক কাঁচা। গুণীদার অবস্থা দেখে স্বর্ণর ওপর রাগই হয় তার। ইচ্ছে হয় ধরে দেয় দু'ঘা বসিয়ে। কিন্তু দেবে কি, ও মেয়ে পনের পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ, অথচ হাবভাব একেবারে পাকা বুড়ীর মত। উল্টে তাকেই ছেলেমানুষ ভাবে। চোখ পাকিয়ে মারতে আসে। গুণীদার সঙ্গে পরামর্শ এঁটে সেদিন কৌশল করে স্বর্ণকে বাগানে নিয়ে আসার অনেক চেষ্টা করেছে। এটা সেটা বলে অনেক ভাঁওতা দিয়েছে। কিন্তু স্বর্ণ ঠিক বুঝেছে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। কখনো রেগে গিয়ে তাকে মুখ ভেঙচে বিদায় করেছে, কখনো বা তারস্বরে মাকে ডেকে বিপাকে ফেলতে চেয়েছে।

কিন্তু এদিকে গুণীদার জন্য কিছু একটা করার তাগিদে ভিতরটা জীবনের উন্মুখ হয়ে উঠেছে। এ যেন ভক্তেরই পরীক্ষা। এমন অবস্থাতেও যদি গুরুর পরাণটা একটু ঠাণ্ডা করতে না পারে তাহলে কি আর করল? প্রবল লোককে দুর্বল হতে দেখলে দুর্বলের সবল হবার বাসনা জাগে। গুণীদা ভয়ানক দুর্বল এখন। কিছু একটা করতে পারলে গুণীদা তাকে অন্য চোখে দেখবে।

গুণীকে না বলেই ভেবেচিন্তে একটা মতলব ঠিক করে ফেলল সে। গুণীদা কাউকে বলতে বারণ করেছে। কিন্তু স্বর্ণকে বলতে দোষ কি? অন্য কাউকে তো বলছে না, যাকে ভালবাসে তাকে বলছে। স্বর্ণ জানে না বলেই হয়ত একটুও দরদ নেই। জানলে খুশি হবে, ভালো ব্যবহার করবে। ভালবাসে শুনলে কে না খুশী হয়—জীবন তো হয়।

সেদিন দুপুরের নিরিবিলিতেই পেল স্বর্ণকে। উঠোনের ধারে লাউমাচার নিচে বসে এক বালতি জল নিয়ে পূজোর কতকগুলি বাসন ধুয়ে রাখছিল সে। গুটি গুটি জীবন এসে সামনে দাঁড়াল। তারপর কাছাকাছি উবুড় হয়ে বসল। স্বর্ণর কথা শুনে শুনে আজকাল সে-ও সুন্দরই দেখে তাকে।

বলল, কি রে, কি কচ্ছিস?

স্বর্ণ আড়ে আড়ে দুই-একবার দেখল তাকে। জবাব না দিয়ে হাতের কাজ করে যেতে লাগল।

জীবন হি-হি করে হাসল একটু।—গুণীদা কি বলে জানিস? বলে তোর মত সুন্দর মেয়ে এক বাঁকড়োয় আর একটাও নেই।

বালতির মধ্যে স্বর্ণর হাত দুটো প্রায় থেমে এলো। বক্তার দিকে তাকাচ্ছে না বটে, কান দুটো উৎকর্ণ।

এবারে জীবন আরো সামনের দিকে ঝুঁকে আরো একটু ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করল। তার মানে হচ্ছে দূতিয়ালি ব্যর্থ হবে না—একটা কথা তোকে বলব, খু-উ-ব ভালো কথা—কাউকে বলবি না বল্?

স্বর্ণ নিরাসক্ত মুখে একবার তাকালো শুধু। তারপর আবার হাতের কাজে মন

দিল। এটুকু থেকেই জীবন স্বীকৃতির আশ্বাস পেল যেন। প্রায় ফিস-ফিস করে বলল, গুণীদা তোকে খু-উ-ব ভালবাসে, একেবারে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—বুঝলি?

বালতির জলে স্বর্ণর হাত দুটো থেমে গেছে। তার মুখের দিকে চেয়ে জীবনের মনে হল যতটা সে বোঝাতে চায় ততটা বোঝেনি। তাই সাগ্রহে আরও একটু স্পষ্ট করে বোঝাতে চেষ্টা করল। বলল, আমাকে যে রকম ভালবাসে সে-রকম ভালবাসা নয়, এটা অন্য রকম ভালবাসা—জানাশোনা থাকলে লোকে বিয়ের আগে হবু বউকে যেমন ভালবাসে—

বিশদ করে বোঝানোর আগেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠতে হল। এক বালতি ঘোলাটে জলের আচমকা ঝাপটায় জীবন চোখে অন্ধকার দেখল প্রথম। গায়ের গরম জামা ভিজে একাকার। হি-হি কাঁপুনি। সে আত্মস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ানোর অনেক আগেই স্বর্ণ পালিয়েছে সেখান থেকে। নাকের জলে চোখের জলে হয়ে জীবন বাগানের দিকে ছুটল। এত ভালো কাজের এ-রকম প্রতিফল স্বপ্নের অগোচর। তার মনে হল, এই মেয়েকে ভালবাসার বদলে গলায় পা দিয়ে মারা উচিত। কিন্তু এরপর গুণীদা সব শুনে যখন সেই অবস্থাতেই তাকে ধরে রাগের চোটে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিল, জীবনের আর সহ্য হল না। সে কেঁদেই ফেলল।

কান্না দেখে অবশ্য গুণীর মেজাজ ঠাণ্ডা হয়েছিল। তাছাড়া ইদানীং সে বেশ ক্ষমাশীল হয়ে পড়েছে। তখন জীবনকেই সান্ত্বনা দিল সে। তাকে বোঝালো, স্বর্ণর এই রাগটা আসলে রাগ নয়—অনুরাগ। ভালবাসার কথা শুনলে মেয়েদের ভালো লাগে আবার অমনি করে। মোট কথা এভাবে নাজেহাল হবার ফলে জীবন যেন আরো বিশ্বস্ত, আরো প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল।

এক-একদিন সাইকেল নিয়ে তারা পাহাড় পর্যন্তই চলে যেত। স্বর্ণর গল্প, স্বর্ণর কথা বলতে বলতে গুণী হঠাৎ একসময় চুপ করে যেত। খোলা ধূ-ধূ মাঠ, তপস্বীর মত এক-একটা গাছ, পাহাড়, আকাশ—সব মিলে মিশে তার চোখে একাকার হয়ে যেত। কোনদিন বা সাইকেল থেকে নেমে বসে পড়ত। তন্ময় হয়ে দেখত—দেখত, তারপর পকেট থেকে বাঁশী বার করত।

হঠাৎ একদিন শুনল স্বর্ণর বিয়ের তোড়জোড় চলছে, শিগগিরই হয়ে যাবার আশা।

পর পর ক'টা দিন বুকে ক্রমাগত হাতুড়ির ঘা পড়ল গুণীর। বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে ভাঙতে লাগল। কেমন করে স্বর্ণকে দেখবে একটু, সেই চেষ্টায় সকাল-সন্ধ্যা দু'চোখ উন্মুখ। পুকুরের ধারে অপেক্ষা করে, ঠাকুমার জানালাটার কাছে ওদের দাওয়ার দিকে চেয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে বাড়ির আশপাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরঘুর করে। স্বর্ণর বয়স তখন ষোল, তার উনিশ। কিন্তু স্বর্ণ যেন এরই মধ্যে চোখে ধুলো দেওয়ার বিদ্যেয় তার থেকে অনেক সেয়ানা হয়ে উঠেছে।

মনের এই অবস্থায় হন্তদন্ত হয়ে একদিন একটা সঞ্জীবনী সংবাদ নিয়ে এলো জীবন। পাহাড়ের কাছাকাছি এক সাধুজী এসেছেন—অনেক রকম অসাধ্য সাধন

করেছেন, অলৌকিক কাণ্ড করেছেন। সাক্ষাৎ মহাপুরুষ। অতএব গতি হবে না?

গতি হবে আশা পেলে গুণী তখন মরীচিকার পিছনেও ছুটতে রাজী, সাধুজী কোন ছার। দুজনে সেই দুপুরেই গেল, জটাজূটধারী সাধুর পায়ে ধরণা দিল। একদিন নয়, দিনের পর দিন। আরো অনেকে যায়। দয়া হলে সাধুজীকে এক-একটা অলৌকিক কাণ্ডই করতে দেখেছে তারা। কারো হাতে ধুলো তুলে দিয়ে ধমকে উঠেছেন, খেয়ে ফেল্। সে হাত খুলে দেখেছে ধুলো সন্দেশ বা চিনি হয়ে গেছে। কারো হাতে জটার অংশ ছিঁড়ে দিয়েছেন, নিয়ে যা। সে হাত খুলে দেখেছে মাথার জটা মায়ের চরণের প্রসাদী জবা হয়ে গেছে। কাউকে পাতা দিয়ে বলেছেন, চিবো। চিবিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে সে আত্মহারা।

একটানা পনের দিন ধরণা দেবার পর সাধুজী রক্তচক্ষু মেলে গুণীর দিকে চেয়ে ধমকে উঠেছেন, কামনার দাস তুই, উচ্ছন্নে যা।

উচ্ছন্নে যাবার জন্যে গুণী আসেনি। ধমক খেয়ে উল্টে তার বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয়েছিল। আরো দিন পনের ধরণা দেবার পর আর ঠাকুমার হাতবাক্সের করকরে অনেকগুলো টাকা চেলাদের মারফৎ সাধুর পায়ে অর্পণ করার পর যখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে বসেছিল, তখন সাধুজীর দয়া হল। তিনি বললেন, বশীকরণ পিষ্টক তৈরী করতে হবে, উপকরণ চাই। লজ্জালু লতা, অপামার্গের জটা, চাণ্ডালীর পাতা, বহেড়া আর অপরাজিতা, শক্রকাটা, স্বর্ণচূর্ণ, রক্তবর্ণ ঘৃতকুমারীর রস, একবর্ণা গাভীর দুগ্ধের ঘৃত, ইত্যাদি ইত্যাদি।—ওঁ হ্রীঁ মোহনি স্বাহা। ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি।

কিচ্ছু পারবি না? কিচ্ছু চিনিস না? সাধুজীর আবার রক্তচক্ষু, তবে জাহান্নমে যা।

জাহান্নম থেকে উদ্ধারের তাড়নায় ঠাকুমার হাতবাক্স প্রায় ফাঁক হয়ে গেল। সময়মত আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে রাখলে ঠাকুমার মুখ বন্ধ হবে এটুকুই যা ভরসা।

বশীকরণ পিষ্টক তৈরী হল। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধুজীই সব উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। সন্দেশের মত খানিকটা পদার্থ। যজ্ঞ হল, হোম হল। সাধুজী মন্ত্র পড়লেন, মহাচাণ্ডালি অমুকীং মে বশ্যমানয় স্বাহা। ওঁ নম কামাখ্যা দেবী অমুকীং মে বশংকবী স্বাহা।

অতঃপর পিষ্টক হাতে দিলেন, বললেন, ছলে বলে ওটুকু খাওয়াতে হবে, খেলে মেয়ে দুদিনের মধ্যে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে, মেয়ের অভিভাবকরাও স্নেহে অন্ধ হবে। আগামী তিন দিনের মধ্যে অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়া, অনুবাধা ও রোহিণী নক্ষত্রে কার্য সম্পাদন করতে হবে, অনাথায় পিষ্টকের গুণ নষ্ট হবে।

তিনদিন নয়, দু'দিন লেগেছিল। জ্যাঠা তখন শহরের সদর আদালতে, চার-পাঁচ দিনের আগে ফিরবেন না। এও ভগবানের অনুকূল ইচ্ছে ছাড়া আর কি? স্বর্ণকে হাতের কাছে পাবার জন্যে গুণী মরীয়া হয়ে উঠল। অনেক ডেকেছে, অনেক অনুনয় করেছে, অনেক সাধ্য-সাধনা করেছে, কিন্তু দশটা মিনিটের জন্য স্বর্ণ তার সঙ্গে কোনো আড়ালে আসতে রাজী হয়নি।

পরদিনও সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে, তারপর পুকুরের ওধারের অন্ধকারে

ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে বাঁশী বাজাতে বসেছে। বাঁশীতে এমন ডাকা গুণী আর বোধ হয় ডাকেনি।

এইবার কাজ হয়েছে। ঝোপ-ঝাড়ের ওধারে চাপা তর্জন শোনা গেছে, বাঁশী বাজাবার আর জায়গা পেলে না, সাপে কামড়ালে তখন।

বাঁশী বাজছে।

বলি কানে যাচ্ছে? না চিৎকার করে ঠাকুমাকে ডাকব?

বাঁশী থেমেছে। গুণী বেরিয়ে এসেছে।—কী?

ওখানে কেন, সাপ এলে?

আসবে বলেই ওখানে বসেছি। আমার বাবা বাঁশী বাজাতো, সাপের কামড়ে মরেছে। আমারও সেই অদৃষ্ট।....তা যদি না চাস তাহলে পাঁচ মিনিটের জন্যে একটা কথা শুনে যা।

খপ করে স্বর্ণ তার জামাটা ধরেছে, উদ্দেশ্য টানতে টানতে তাকে এধারে নিয়ে আসবে। তর্জন করে বলেছে, তোমাদের বাড়ি গিয়ে ঠাকুমার সামনে বসে শুনব—ফের আমাদের পুকুরের দিকে আসবে তো ভালো হবে না।

নির্জনে একটু কথা শোনার জন্য গুণী তার পায়ে ধরতে গেছে। কিন্তু স্বর্ণ কানে তোলেনি, জামা ধরে টানছে।

হঠাৎ মাথায় সমস্ত রক্ত উঠল গুণীর, দু'হাতে তাকে জাপটে ধরে প্রায় আলতো করেই ঝোপের এধারে এনে ফেলল, ফিসফিস গর্জন করে বলে উঠল, একেবারে চুপ। আমার কথা শুনবি তো শোন, নইলে কাল আমার মরা মুখ দেখতে হবে তোকে। উত্তেজনায় পকেট থেকে বশীকরণ পিষ্টক বার করল, এটা খেয়ে ফেল, সাধুজীর জিনিস, তোর আমার দুজনেরই মঙ্গল হবে, আমরা ভালো থাকব, নে খা—

স্বর্ণর সর্বাঙ্গ অবশ। গুণীর সাঁড়াশির মত একটা হাত তার পিঠ জড়িয়ে সবলে আঁকড়ে ধরে আছে তাকে, অন্য হাতেও তার বাহু আগলে মিষ্টির পিণ্ডটা মুখে গুঁজে দিতে চেষ্টা করছে সে। অন্ধকারেও স্বর্ণর দুই চোখে অব্যক্ত ত্রাস দেখল গুণী। উত্তেজনার মধ্যেও কি মনে হল তার, বলল, কিছু ভয় নেই, এই দেখ আমি খাচ্ছি—

এক কামড়ে খানিকটা ভেঙে নিজে চিবুতে চিবুতে আরো জোরে আঁকড়ে ধরল তাকে, বাকিটা তার মুখে গুঁজে দিল, নে, খা শিগগির।

দিশেহারার মত স্বর্ণ তাড়াতাড়ি হাঁ করল, চার ভাগের তিন ভাগ মিষ্টির খণ্ডটা গোগ্রাসে চিবিয়ে গলাধঃকরণ করতে চেষ্টা করল। গুণী আরো দু-চার মুহূর্ত তেমনি করেই ধরে থাকল তাকে। অন্ধকারে এত কাছ থেকে ওই কালো তিলটাই শুধু দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু অনুমানে ওটার ওপর ঠোঁট দুটো স্পর্শ করল একবার। তারপর ছেড়ে দিল।

স্বর্ণ ঝোপ-ঝাড় ভেঙে হুড়মুড়িয়ে যেন প্রাণের দায়ে ঘরের দিকে ছুটল।

গুণী বসে রইল খানিকক্ষণ। উত্তেজনা গেল, কাঁপুনি থামল। জীবনে যেন এই একটাই কাজ বাকি ছিল, সেটা হয়ে গেল। শ্রান্ত লাগছে, অবসন্ন লাগছে। গত এক মাস ধরেই স্নায়ুর ওপর বিষম ধকল যাচ্ছে। মুখে সাধুর মিষ্টি নয়, ঠোঁটে ওই তিলের

স্পর্শটা লেগে আছে। এখন আর গুণী ওই তিলটা সরাবার কথা একেবারেও ভাবে না, স্বর্ণর সঙ্গে সঙ্গে তার ফর্সা মুখের ওই তিলটাও ভারী প্রিয়। কিন্তু ঘুম পাচ্ছে, ঘরে গিয়ে ঘুমুতে ইচ্ছে করছে।

বেশ খানিকক্ষণই কেটেছে বোধ হয়। গুণী উঠে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চলল। কিন্তু পা দুটো চলতে চাইছে না। রাজ্যের ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে। তিন পা হেঁটে মনে হচ্ছে দশ পা হেঁটেও ঘরের কাছাকাছি হওয়া যাচ্ছে না। ঘরে এসে কানে মাথায় জল দিয়ে বিছানায় বসল। স্বর্ণদের বাড়ি থেকে কি একটু গণ্ডগোলের মত কানে আসছে কিন্তু মাথায় ঢুকছে না কিছু। মাথাটাই যেন ওর নিজস্ব নয়। ঠাকুমা একবার এসে কি যেন বলতে গেল। গুণী বলল, তার শরীরটা ভালো লাগছে না, সে ঘুমুবে এখন, কেউ যেন ডাকাডাকি না করে।

ঠাকুমার দিকে ভালো করে চোখ টান করে তাকাতে পারেনি, শুয়ে পড়েছে।

ঠাকুমা আর পিসীর ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙেছে পরের দিন অনেক বেলায়। স্বর্ণর কথা কি বলছে তারা কিছুতে মগজে ঢুকছে না। চান করে খেয়েদেয়ে আবার ঘুমিয়েছে গুণী। সেই ঘুম ভাঙতে সন্ধ্যা। তখন শুনেছে স্বর্ণর অসুখ করেছে। গুণী উতলা হয়নি, সাধুজীর জোরালো জিনিস, একটু-আধটু প্রতিক্রিয়া তো হবেই। এখন মনে হচ্ছে তার নিজেরও ওই জন্যে একটু বেশি ঘুম হচ্ছে। কিন্তু স্বর্ণর কতখানি কি হয়েছে সে-সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। সে কেবল খুশি, স্বর্ণ কিছু বলেনি কাউকে। বশীকরণেরই লক্ষণ।

সেই রাতেও খুব ঘুমিয়েছিল গুণী।

তারপর আরো তিন দিন কেটেছে। স্বর্ণর সম্বন্ধে আর কেউ কিছু বলেনি তাকে। গুণীও খোঁজ করেনি। নিঃশব্দ প্রতীক্ষা ছাড়া আর কি করার আছে? কিছু করার তাড়াও নেই, জানার তাড়াও নেই। বিকেল হতে না হতে পাহাড়ের দিকের মাঠে চলে যায়। বসে থাকে চুপচাপ। বাঁশীও বাজায় না। জীবনের কথা মনে হয়েছে এক-আধবার। তার দেখা নেই কেন জানে না, তার জন্যেও আর আগ্রহ নেই। একা থাকতেই ভালো লাগছে।

সেদিন জ্যাঠা ফিরেছে। বিকেলের দিকে গুণী বেরুবে বলে জামাটা টেনে নিচ্ছিল। কিন্তু জামা পরা হল না। স্বর্ণদের দাওয়ায় কিসের জটলা একটা। মনে হল তার জ্যাঠাই বসে আছে. আর স্বর্ণর কাকারা গম্ভীর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, স্বর্ণর বাবা কাঁদছে মনে হল।

বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল গুণীর। জামা ফেলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। তারপরেই পাথর একেবারে। মোটা থামের আড়ালে মুখ লুকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জীবন। আর ও-ধারের ঘরের জানালায় কপাল ঠেকিয়ে চৌকিতে বসে আছে স্বর্ণ, সত্রাসে গুণীকে সে ইশারা করছে পালিয়ে যেতে।

কিন্তু এ কি চেহারা স্বর্ণর! এরাই বা এখানে কি করছে? জীবন ওভাবে ওখানে মুখ লুকিয়ে কেন?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ব্যাপারটা বোধগম্য হবার আগেই জ্যাঠা উঠে এসে তার হাত

ধরে ওই দাওয়ায় টেনে নিয়ে গেল। তার এই মূর্তি গুণী আর দেখেনি। অস্ফুট প্রশ্ন কানে এলো, স্বর্ণকে কি খাইয়েছিস?

গুণী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে।

জ্যাঠার একটা খড়ম হাতে উঠে এসেছে দেখেনি। নাক মুখ সাপটে গোলার মত একটা মর্মান্তিক আঘাতে চার পা দূরে উল্টে পড়তে পড়তে দেয়ালে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপরই পিঠ বেঁকিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

সামনেই পড়েছিল আঁশ বার-করা বাঁকাচোরা একটা চেলা কাঠ। খড়ম ফেলে জ্যাঠা সেটা হাতে তুলে নিল। গুণীর দু'হাতে ঢাকা নোয়ানো মুখ—পিঠটা প্রসারিত।

মরণ-ছোটা ছুটেছিল গুণী।

আঁশ বার-করা চেলা কাঠের একটাই আঘাতে পিঠটা লম্বালম্বি দুখানা হয়ে চিরে গেছে। চেরা চামড়ার ভিতর দিয়ে, মাংসের ভিতর দিয়ে, হাড়ের ভিতর দিয়ে, সেই সত্তা-জ্বালানো মরণস্রোত ভোলার জন্য মরণ-ছোটাই ছুটেছিল। সমস্ত পিঠ রক্তাক্ত, মুখেও রক্তের স্বাদ।

একটা একটা করে দিন গেছে।

কোথায় কোন্ দিনটা গেছে, কোথায় কোন্ রাত কেটেছে গুণী বলতে পারবে না। অনেক দিন আর অবসান হবে না বলে যেন চোখের সামনে স্থির হয়ে এসেছিল, অনেক রাত আর কাটবে না-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু দিন গেছে, রাত কেটেছে।

পিঠের ওই মারাত্মক ঘা-ও শুকিয়ে এসেছে। চিকিৎসা হয়ই-নি বলতে গেলে, তবু ওতে টান ধরেছে। কিন্তু গুণীর মনে হত, ওই বাইরেটাই শুধু—ভিতরের হাড় মাস মেরুদণ্ডে অবিরাম একটা জ্বলন্ত স্রোত বইছে।

আর মাথাটার মধ্যেও কি যেন হয়ে গেছে। কিছুই ভাবে না, কিছুই ভাবতে পারে না। স্বর্ণর কথাও না। স্বর্ণ যেন জীবনের একটা অতীত অধ্যায়। সবই অতীত, সবই বিগত। ঠাকুমা আর পিসী তার জন্য কাঁদছে কিনা সে চিন্তা মাথায় এলেও বুকে নাড়া দেয়নি। জ্যাঠা তার খোঁজ করেছে বা করছে কিনা তাও ভাবেনি। এমন কি নিজের ভিতরটা হাতড়ে দেখেছে—জীবনের ওপরেও তার একটু রাগ নেই। যা হবার তাই শুধু হয়ে গেছে। সে যেন গাছ থেকে বোঁটা ছেঁড়া একটা ফলের মত। বোঁটা খসে মাটিতে পড়ে গেছে। সে পড়াটা অবশ্য মর্মান্তিক। কিন্তু গাছের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা না ফেলা সমান।

জীবনের সব কিছুর সঙ্গেই তার যোগ ঘুচে গেছে, মুছে গেছে যেন। দেহের মধ্যে প্রাণটা আছে। এটা গেলেও আপত্তি নেই, বরং যাচ্ছে না বলেই অনড় বোঝার মত লাগছে ওটা।

তিন মাস বাদে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আজকের এই বিদেশী পান্থশালার সামনে এসে পড়েছিল। অনেক জায়গায় ঘুরেছে, অনেক জায়গা ছেড়েছে—শুধু একটা বাঁশের বাঁশী সম্বল। রেস্তরাঁর সামনের ওই অশ্বত্থ-গুঁড়ির আশ্রয় যে নতুন সূচনা কিছুর, গুণী একবারও ভাবেনি। পয়সা পাচ্ছিল কিছু কিছু—যখন পাবে না আবার অন্য কোথাও চলে যাবে।

একটা বুড়ো পাহারাদার ছিল তখন। বাইরের প্রবেশপথে একটা টুল পেতে বসে থাকত। খদ্দের এলেই উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকত। চেহারা দেখে হোক বা কথা বলেই হোক, লোকটা সদয় ব্যবহার করত গুণীর সঙ্গে। চেনা খদ্দেরদের সে-ই চেনাত, কোন লোকটা দয়ালু, কোন্ লোক কি-রকম প্রকৃতির।

একদিন চাঁদ সাহেবের কথা ও শুনল তার মুখে। শুনল, যাদুর খেলার লোকেরা একে খুব খাতির করে। মত্ত সঙ্গীদের সঙ্গে যেতে যেতে লোকটা এক-আধদিন থমকে দাঁড়িয়েছে, কান পেতে বাঁশী শুনেছে, দেখেছে ওকে—সিকিটা আধুলিটা দিয়ে গেছে। যাদুর খেলার লোকেরা খাতির করে জানার পর থেকে এই লোকের প্রতি দৃষ্টি ছিল গুণীর। কেন জানে না। এর পিছনে অদৃশ্য বিশ্ব-যাদুকরটির কোনো ইঙ্গিত আছে, তাও মনে হয়নি। কারণ তখন তো সে আশা করা ছেড়ে দিয়েছে, সামনের দিকে তাকানো ছেড়ে দিয়েছে। তবু নিজের অগোচরেও জীবনের রীতিই বোধ করি বাঁচতে চাওয়া। বাঁচার তাড়নায় কুণ্ডলী পাকানো।

এক রাতে লোকটা একা বেরুচ্ছে দেখে গুণী বাঁশীর সুর চড়িয়ে দিল। তার কাছেই যেন একটা নিঃশব্দ আবেদন পাঠালো।

চাঁদ সাহেব সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল নিরীক্ষণ করে। পকেটে হাত ঢোকালো।

পয়সা দিতে হবে না সাহেব। একটু শুনবে?

চাঁদ সাহেব থমকে চেয়ে রইল খানিক। কি দেখল সে-ই জানে। এত ভালো করে আগে দেখেনি। ধুপ করে অশ্বত্থ-গুঁড়ির ধুলোর ওপরেই বসে পড়ল সে।

শুনাও!

গুণী তখনো ভেবেছিল মদের নেশা, মদের ঝোঁক। কিন্তু তার প্রাণের দায়। মিনিট দশেক শোনালো। কি শুনিয়েছে কি বাজিয়েছে জানে না।

ক্যা ম্যাঙতা? চাঁছাছোলা প্রশ্ন।

দুটো কথা বলবো একদিন।

লোকটা আবারো দেখল তাকে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত ধরে টানল, আও—

সমস্ত দিনের অনাহারের জন্যে হোক, স্নায়ুর দুর্বলতার দরুন হোক, বা হঠাৎ উঠে দাঁড়ানোর জন্যেই হোক—দশ পা যেতে না যেতে গুণীর পা টলল, মাথা ঘুরে গেল। ধুলোর ওপর লুটিয়ে পড়ল সে।

আবার মিনিট দশেক। চাঁদ সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। বুড়ো পাহারাঅলাটাও এসেছে।

আস্তে আস্তে উঠল।—ঠিক আছে সাহেব।

কিন্তু চাঁদ সাহেব আর সামনের দিকে নড়ল না। দেখছে। খপ করে তার একটা হাত ধরে তাকে ওই অভিজাত রেস্তরাঁর দিকেই টেনে নিয়ে চলল আবার।

...চাঁদ সাহেব, চাঁদ সাহেব, চাঁদ সাহেব!...চাঁদ সাহেব, আমি আবার শিগ্‌গিরই বোম্বাই যাচ্ছি। খুব শিগ্‌গির। আমি আর তোমাকে ছেড়ে আসব না চাঁদ সাহেব।

গুণী দত্ত ঘড়ি দেখল। রাত সাড়ে এগারোটা। রেস্তরাঁ নিঝুম। শুধু সে ছাড়া

আর দ্বিতীয় বাইরের লোক নেই বোধ হয়। কর্মচারীরাও হয়ত তার ওঠার অপেক্ষায় আছে। চাঁদ সাহেবের মত খদ্দের আজকাল বিশেষ আসে না হয়ত। তখন চাঁদ সাহেবের মেজাজ অনুযায়ী এখানকার ঘড়ি চলত। গুণী দত্ত উঠল।

ভায়োলিন বাজিয়ে লোকটা আবছা আলোয় হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে, যন্ত্রটা মাটিতে পড়ে। গুণী দত্তর আবার মনে হল, আরো কিছু দিলে হত লোকটাকে। যতক্ষণ কানে গেছে, বাজনাটা মিষ্টি লাগছিল।....ও ধরনের পরিত্যক্ত বেদনা-বোধের সুর বাঁশীতে সে অনেক বাজিয়েছে। চাঁদ সাহেবের সুপারিশে গুণী দত্ত এক নামজাদা অবাঙালী ম্যাজিসিয়ানের আসরে যাদু প্রদর্শনীর সাময়িক বিরতির অবকাশে একটানা তিন বছর বাঁশী বাজিয়েছে। দর্শকদের কান খালি হতে না দেবার রীতি এটা। ভালই বাজাত। বিনিময়ে তখনকার মত খাওয়ার চিন্তাটা ঘুচেছিল গুণী দত্তর।

কিন্তু সেই যাদুকরের সংস্রবে এসে দিনের পর দিন সে যে কোন সাধনায় ডুবে থাকত সে-খবর কেউ রাখত না। তা ছাড়া চাঁদ সাহেবের যাদু-সরঞ্জাম উদ্ভাবনের কাজেও দেখতে দেখতে সে তার ডান হাত হয়ে উঠেছিল। চাঁদ সাহেব তারিফ করত, তোমার চোখ আছে, আর মাথাও বহুত সাফ।

চোখ আর মাথা গুণী দত্ত সেই ছেলেবেলার নিষ্ঠা আর বিশ্বাস নিয়েই এই একটি মাত্র বিদ্যা আত্মসাৎ করার কাজে লাগিয়েছিল। ম্যাজিসিয়ানের খেলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখত আর ভাবত। ভাবত আর স্বপ্ন দেখত। ফাঁক পেলে চোরের মতই মালিকের সরঞ্জাম নিয়ে খেলাগুলো নিজে করতে চেষ্টা করত।

তারপরে এক রাতে রেস্তরাঁয় চাঁদ সাহেবের সঙ্গে নিরিবিলিতে মদের টেবিলে বসে তার কাছে মনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল গুণী দত্ত। প্রস্তাবের আগে চমক লাগাতে না পারলে কাজ হবে না জানত। চমক লাগবার মত কিছু ব্যবস্থাও তার সঙ্গে মজুত ছিল। তামাশা ভেবে বারকয়েক ঠকে চাঁদ সাহেবের দৃষ্টি সজাগ হয়েছিল। এমন কি মদের ঝোঁকে ঠকছে কিনা সেই সন্দেহও হয়েছিল। কিন্তু চোখ রাখতে গিয়ে আরো বেশি ঠকেছে। নিজের আধা খালি মদের বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢালতে গিয়ে দেখে জল ঢালছে। বোতলে মদের বদলে জল।

মদের ওপর চাঁদ সাহেবের চোখের সামনে যে এই কারসাজি ফলাতে পারে সে যাদুকর নয় তো কি। গোলাপের থেকে গন্ধ আড়াল করা আর চাঁদ সাহেবের চোখের সমুখ থেকে মদ উবিয়ে দেওয়ার মধ্যে তফাত নেই খুব। অতঃপর গুণী দত্ত আরজি পেশ করেছিল, বাসনা ব্যক্ত করেছিল।

চাঁদ সাহেব শুনেছে, তাকে দেখেছে চেয়ে চেয়ে, আর আকণ্ঠ মদ গিলেছে। শেষে পরিতুষ্ট মেজাজে তাকে কথা দিয়েছে, ঘাবড়াও মাত, তুম ম্যাজিসিয়ান জরুর বন যায়গা।

যে অবস্থায় বলেছিল, কথা দেওয়া ছেড়ে দরাজ গলায় রাজ্যসম্পদ নিয়ে দেওয়াও অস্বাভাবিক ছিল না। অন্য লোক হলে সেই প্রতিশ্রুতি মনে রাখারও কথা নয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতি যে দিয়েছিল সে ভোলেনি। চাঁদ সাহেব ভোলেনি।

ভোলেনি বলেই অচিরেই বাঁশী ছেড়ে যাদু-সহকারী হতে পেরেছিল। আর ভোলেনি

বলেই সমস্ত পাশ্চাত্ত্য দেশ ঘুরে আজ সে গুণীডাটা হয়ে বসেছে।

জুলি স্যান্ডারসন তখনো জেগে। নিজের ঘরে ঢোকার আগেই আটকালো তাকে। বলল, তুমি বেরুবার একটু পর থেকেই দেখি শিরিন একেবারে অন্যরকম—একটিও কথা বলছে না কারো সঙ্গে, অদ্ভুত মুখ-চোখ—কি ব্যাপার?

গুণী দত্ত জানে না কি ব্যাপার। মুখের দিকে চেয়ে আছে।

জুলি ভাবল তার মাথায় কিছু ঢুকছে না। অস্ফুট তর্জন করে উঠল সে,—ফুল। ইউ আর ড্রাঙ্ক্—কি বলছি শুনতে পাচ্ছ? এসো একবার, সেই থেকে এখনো পাথরের মত বসে আছে মেয়েটা।

যেতে গিয়ে যেতে পারল না গুণী দত্ত। নিজের ভিতরেই বাধা একটা। বলল, শুয়ে পড়তে বলগে যাও, কাল সকালে শুনব।

আর না দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। তার পক্ষে এখন ওই মেয়েটার কাছে যাওয়া সহজ নয়। শিরিন মদ সহ্য করতে পারে না। কাউকে খেতে দেখলে বা কেউ মদ খেয়ে কাছে এলে তার মূর্তি বদলে যায়।

গত ক'মাস ধরে তাকে সুযোগ্য যাদু-সহচরী করে তোলার নিয়মিত মহড়া চলছে। এই এক ব্যাপারে গুণী দত্তর নিষ্ঠা আর একাগ্রতার অভাব নেই। অদৃষ্টের সঙ্গে যোগ সেই পাথরের মত করেই দেখছে তাকে, সেই রকম করেই তাকে রক্ষার সংকল্প। মনে মনে মেয়েটার বুদ্ধি আর শেখার তন্ময়তা দেখে মুগ্ধ সে। যা শেখায় যা বোঝায় শেখে কিনা বা বোঝে কিনা মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় না। কিন্তু কিছু করে দেখাতে বললে এমন সুন্দর পরিপাটি ভাবে তক্ষুনি তা দেখাবে যে গুণী দত্তর আনন্দ ধরে না। অনেকদিন তাকে ঠকাতে চেষ্টা করেও পারেনি, মেয়েটা থমকে মুখের দিকে তাকায়—তারপর ফিক করে হেসে ফেলে। চোখ দুটো আরও বেশি হাসে, দাঁতের আভাস ঝকমকিয়ে উঠে।

কিন্তু এই ক'মাসে একটা দিনের জন্যেও মঞ্চে এনে দাঁড় করায়নি তাকে। দর্শকের চোখের আড়ালে রেখেছে। এডওয়ার্ড উড অনেকদিন তাগিদ দিয়েছে, স্টেজে নামাতে আপত্তি কি, খুঁটিনাটি এটা ওটা করতে দিতে আপত্তি কি? গুণীডাটার গোঁয়ারতুমি দেখে এক-আধ সময় ক্ষুণ্ণও হয়েছে সে।

গুণী দত্ত জবাব দিয়েছে, সময় হলে নামবে, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

আড়ালে জুলি স্যান্ডারসন ভুরু-ভঙ্গিমা করেছে, অমন মেয়েটাকে তুমি একলাই এ-ভাবে আগলে বসে আছ, মালিকের সেটা সহ্য হচ্ছে না। মেজাজও ভরছে না, টাকাও লোকসান। মেয়েটা স্টেজে নামলে লোকের চোখে রঙ লাগবে না?

জুলির তরল বাঁকা চাউনি ভালো লাগেনি। ওদিকে জেনিফার উড, কে জানে কেন, শিরিনকে স্টেজে নামাবার জন্যে একদিনও তাগিদ দেয়নি, উল্টে মুখ বুজে তার শিক্ষানবিসির মাসোহারা দিয়ে যাচ্ছে।

কাজ শেখার সময় শিরিন শিক্ষা-গুরুর মতই দেখে গুণী দত্তকে। শ্রদ্ধা করে, যা বলে সম্ভ্রমভরে শোনে। আর এ-সব যে বেশ ভালো লাগে তাও বোঝা যায়। কিন্তু কোনো পার্টিতে বা আসরে মদ খেতে দেখলেই গম্ভীর। সে গাম্ভীর্য সরল হতে

সময় লাগে। দিল্লীতে একবার তিন দিন একটা কথাও বলেনি। গুণী দত্ত অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছে, কি হল? শেষে বিরক্তও হয়েছে। তারপর অন্য আর এক সময় ডেকে সদয়ভাবেই জানতে চেয়েছে, কি হল তার—

চুপচাপ খানিক বসে থেকে শিরিন বলেছে, তুমি মদ খাও কেন?

গুণী দত্ত অবাক প্রথম, পরে মনে হয়েছে, যখনই মদ খেয়েছে তখনি মেয়েটাকে অমনি গম্ভীর দেখেছে বটে। কাছেও আসতে চায়নি।

জবাব না পেয়ে শিরিন আবারো শান্ত মুখে বলেছে, আমার মা মদ খেয়ে মরেছে, সাহেবজীও মদ খেয়েই মরবে। মদ দুশমন।

গুণী দত্ত অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি, তারপর আশ্বাস দিয়েছে, আচ্ছা, না খেতে চেষ্টা করব।

জুলি স্যান্ডারসন জানে না, কেন আজ শিরিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না সে। ইতিমধ্যে মদ আর খায়ইনি বলতে গেলে। খেলেও কম খেয়েছে, আর শিরিন তা জানতেই পারেনি। কিন্তু আজ নিজের ওপরে দখল ছিল না গুণী দত্তর। কোনো হিসেব ছিল না মাত্রা ছিল না। ওই একটা মেয়েকে তার পরোয়া করার কোন কারণ নেই। তবু কি যেন বাধা একটা। মনে হয়, কাছে গিয়ে কাজ কি।

কিন্তু শিরিনের কি-ই বা হতে পারে? জুলিকে বেশ উতলা মনে হল। সেটা খুব স্বাভাবিক নয়। ওই হালকা মেজাজের মেয়ে ভাবনা-চিন্তার ধার ধারে না। সে কেন শিরিনের সঙ্গে দেখা করল না জুলি বুঝেছে নিশ্চয়। সেই জন্যেই জোর করেনি। ভেবেছে মদের ঝোঁকে মাথার ঠিক নেই—কি হতে কি হবে ঠিক কি।

গুণী দত্তর হাসি পেল। শিরিন মদ বরদাস্ত করতে পারে না বলেই যে সে কাছে গেল না সেটা মিথ্যে নয়। কিন্তু মদ যতই খাক, মাথা ঠিকই আছে। এই এক ব্যাপারে চাঁদ সাহেব তার মাথাটা সত্যিই খেয়েছে। চাঁদ সাহেব যার গুরু তার মদ খেয়ে বে-সামাল হওয়া কপালে নেই।

ঘুরে ফিরে আবারও সেই চাঁদ সাহেব। আশ্চর্য, আজ হল কি....।

বিছানায় বসে ছিল। এইবার শোবে।

দরজায় টোকা পড়ল। ভাবল জুলি। আবার কি খবর নিয়ে আসছে।

এসো।

দরজা খুলে গেল। চৌকাটে শিরিন দাঁড়িয়ে। লালচে আভার পাথর-মূর্তি। হাতে রেজিস্ট্রি খাম একটা।

গুণী দত্ত চমকে উঠল।—কি ব্যাপার? এসো ভিতরে এসো, হাতে ওটা কী?

শিরিন পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল। নিরীক্ষণ করে দেখল একটু তাকে। ঘাবড়ে গিয়ে গুণী দত্ত কাছে এসে তার কাঁধে হাত রাখল।—শিরিন, কি হয়েছে?

কাঁধ থেকে আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে দিল শিরিন। মুখের দিকে চেয়ে আছে। মদ খেয়ে এসেছে যে সেটা আর মুখে বলল না। অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলল, ওইখানে বোসো—

গুণী দত্ত হকচকিয়ে গেছে, নইলে ধমকেই উঠত হয়ত। সরে গিয়ে বিছানায়

বসল।

তেমনি নিরুত্তাপ গলায় শিরিন বলল, সাহেবজী মারা গেছে।

হাতের খামটা তার সামনে বিছানায় রেখে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

গুণী দত্তর হুঁশ নেই। মেয়েটাকে যেতে দেখল। খামটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করল। তারপর খুলে পড়ল। চাঁদ সাহেবের শেষ অনুরোধ-মত হাসপাতাল থেকে লিখেছে। চাঁদ সাহেব পরশু মারা গেছে। তার কাছে অবশিষ্ট টাকাকড়ি যা ছিল তার নির্দেশমত ম্যাজিসিয়ান গুণীডাটার নামে ইনসিওর করে পাঠানো হচ্ছে।

....চাঁদ সাহেব। কে চাঁদ সাহেব? আজ সমস্ত দিন যে লোকটাকে মনে পড়ল সে-ই যদি চাঁদ সাহেব হয়, আর সে-ই যদি মরে গিয়ে থাকে, তাহলে আজই সে এমন জীবন্ত হয়ে উঠল কেমন করে? চাঁদ সাহেব কি ম্যাজিসিয়ান? না সে ম্যাজিসিয়ান—গুণীডাটা ম্যাজিসিয়ান। তার অবাক হওয়া সাজে না। সে-ই অবাক করে থাকে লোককে, বিমূঢ় করে থাকে।

রাত ক'টা তখন গুণী দত্ত জানে না। উঠল।....কি জানি হয়েছে....ও, চাঁদ সাহেব মারা গেছে। যে লোকটা এভাবে বেঁচে আছে সে নাকি মারা গেছে! মুখে চোখে ঘাড়ে জল দিল গুণী দত্ত...চাঁদ সাহেব আর নেই। শিরিনের বড় কষ্ট হয়েছে। চোখ মুখ অন্য রকম হয়ে গেছে মেয়েটার। কাল তাকে বোঝাতে হবে। ম্যাজিকের মূলে সত্যি কিছু নেই, আসলে ফাঁকি—সেটা সে বুঝলে না কেন? বোঝালেই বুঝবে। এদিক-ওদিক তাকালো গুণী দত্ত। কি যেন চাই! ও, তোয়ালে। ওই যে। কাণ্ডজ্ঞান বলে কোনদিন কি কিছু ছিল চাঁদ সাহেবের—বুকের ভিতরে যে অত নড়াচড়া করা ভালো নয় সেটা তাকে বোঝাবে কে?

পাখাটা পুরোদমে বাড়িয়ে দিয়ে গুণী দত্ত আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল।

....চাঁদ সাহেব মারা গেছে। গুণী দত্ত ঘুমুবে।

॥ ৯ ॥

জুলির কাছে ঋণ বাড়ছে। বাড়ছেই।

অথচ গুণী দত্ত প্রথমে বিরক্ত হয়েছিল। পর পর দশটা দিনের মৃত্যুর ঠাণ্ডা স্পর্শ থেকে শিরিনকে সজাগ হতে দেখে সে অবাক হয়েছিল। এটুকু না দেখলে ওই নির্লিপ্ত প্রগলভতার জন্য সে হয়ত জুলিকে আড়ালে ডেকে কটূক্তি করত। কিন্তু গুণী দত্ত সবিস্ময়ে দেখেছে, তার এ ক'দিনের উপদেশ বা গম্ভীর অনুশাসনে যা হয়নি, জুলির এক ইন্দ্রিয়-ঘেঁষা স্থূল মন্তব্যে তাই হয়েছে।

শিরিন একটা চেয়ারে বসে ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে সেখান থেকেই জুলির দিকে তাকিয়ে ছিল। তার টানা দুই চোখে নারীসুলভ লঘু বিড়ম্বনা উঁকিঝুঁকি দিতে দেখা গিয়েছিল। জুলির মন্তব্যের উপমা শেষ হতে শিরিনের গোলাপী গালে রক্তকণিকার ছোটাছুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শেষে ফিক করে হেসেই ফেলেছিল সে। ঝকঝকে

দাঁতের আভাস পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

ব্যাপার সামান্য।

ওই মেয়ের সামনে থেকে গুণী দত্ত একটা মৃত্যুকে তফাত করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু চেষ্টাটা গায়ের থেকে জোর করে পাঁচ ডিগ্রী জ্বর টেনে নামানোর মতই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। গুণী দত্তর অসহিষ্ণুতা বাড়ছিল। কারণ তারও নিভৃতের দর্পণে কিছু ঘষা-মোছা চলেছে। সেখান থেকে একজন মুছে গেছে। যাচ্ছে। চাঁদ সাহেব—। শিরিনের মত তারও ওই একটা মুখ স্মৃতির ধারালো দিকটা দিয়ে বুকে খোদাই করে রাখার কথা। রাখলে বিধিবদ্ধভাবে শোক করা হত, সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু তার বদলে সেই দর্পণে আব একজন উপস্থিত। আর এক মেয়ে, যার চিবুকে লাল জড়ুল—চুনির আভা ঠিকরোয়। যার দিকে তাকালে আগে ওটাই চোখ টানে। ঠিক যেমন করে টানত চোখের পাতা-ছোঁয়া হাড়ের ওপর মটর দানার মত একটা কালো তিল।

ওই হাস্যকর আজগুবী ভাবের বন্যায় গুণী দত্ত আর ফিরে যেতে চায় না। পিঠের ওপরে পাকা দাগ ফেলে সেই বন্যায় পাকাপোক্ত বাঁধ দেওয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া তার বয়েস এখন আর উনিশ নয়। সে গুণময়কিশোর নয়। গুণীডাটা মস্ত ম্যাজিসিয়ান—নাম—যশের ছড়াছড়ি।

এই যোঝাযুঝি যত বাড়ছিল, নিজের মুখে গুণীডাটার মুখোশটাও ততো শক্ত করে আঁটছিল সে। এই জন্যেই শিরিনের এমন অব্যক্ত স্তব্ধতা তার ভালো লাগেনি। উল্টে চোখে খোঁচা দিয়ে গেছে যেন। ....চাঁদ সাহেব নেই তাতে শোক কার কম হয়েছে? তবু শোক আগলে বসে থাকলে চলে? উঠে দাঁড়াতে হবে, চলতে হবে, কাজ করতে হবে।

কিন্তু সব থেকে মুশকিল, শিরিন নির্দেশমত মুখ বুজে উঠে দাঁড়িয়েছে, চলছে, যা বলছে তা করছেও। সে যেন নিস্প্রাণ যন্ত্র একটা, ম্যাজিকের উপকরণ। ঘোরাও ফেরাও ওটাও বসাও—যা করাও তাই করবে। এর থেকে ও যদি অঝোবে কাঁদত, শোকে মাথা খুঁড়ত, তাহলে ওকে শান্ত কবা সহজ হত। তা সত্ত্বেও গুণী দত্ত সমব্যথীর মত তার কাছে আসতে চেষ্টা করেছিল। পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে মস্ত শোকের কথাই বলেছিল। বলেছিল, আজ তুমি আমি দুজনেই আবার পিতৃহীন হলাম।

এত বড় কথাও একটুও স্পর্শ করেনি। করেনি বলেই মেয়েটার এই শোক থেকে নিজেকে আরো বেশি বিচ্ছিন্ন মনে হয়েছে গুণী দত্তর। তবু বোঝাতে চেষ্টা করেছে। মৃত্যুর সম্বন্ধে ছকে বাঁধা অনেক দার্শনিক উক্তি করেছে। বলেছে, এও ম্যাজিক বই আর কিছু নয়, আসলে ফাঁকি, মানুষ মরে না, খোলস বদলায় শুধু, চাঁদ সাহেবও মরেনি—আবার আসবে।

শিরিন শুনেছে। যা বলে তাই শোনে। কথা বলে না, কথার জবাব দেয় না। মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ শোনে। শুনেও চুপ কবেই থাকে।

তার এই নীরবতার মধ্যেও একটা নীরব অভিযোগ অনুভব করা যায় যেন। ওটা মনগড়া কিনা জানে না, কিন্তু গুণী দত্ত সেই রকমই অনুভব করে। মনে হয়, ওই একটা রাতে অন্তত মদ না খেলে ভালো হত। শিরিন জানে মা তার মদ খেয়ে

অকালে চোখ বুজেছে। তার সাহেবজীও তাই। অব্যক্ত যাতনায় সেই রাতে সে ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল, মুহূর্ত গুনছিল—তার কাছে ভেঙে পড়বে বলেই হয়ত অত রাতে ঘরে এসেছিল। কিন্তু গুণী দত্তর তখন মাথা যতই ঠিক থাক, জঠরের অঢেল তরল বস্তুর বার্তা মুখে লেখাই ছিল।

শিরিন শুধু সেটুকুই দেখেছে। শোকের দোসর দেখেনি।

গুণী দত্ত এরপর কর্তব্যের কথা ভেবেছে, দায়িত্বের কথা ভেবেছে। দ্বিগুণ একাগ্রতায় তাকে নিয়ে ম্যাজিকের মহড়ায় মেতে উঠতে চেয়েছে। ঘরে সে সময় এক জুলি ছাড়া আর কেউ থাকে না বড়। যা বলা হয় শিরিন শোনে, যাদু-সহচরীর ভূমিকায় মূক অভিনয় করে যায়। কিন্তু ভুল হয়, নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক মনে হয়। গুণী দত্ত বিরক্ত হয়।

জুলি তাকে আড়ালে পরামর্শ দেয়, মন খারাপ, মন দেবে কি করে—এখন থাক্ না ক'টা দিন—

গুণী দত্তর বিরক্তি বাড়ে। শিক্ষাগুরু হিসাবে তখন আরো কঠিন মনে হয় তাকে। প্রশ্রয়ে সায় না দিয়ে করাত-হাতে বাক্সের ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে ভাবী যাদু-সহচরী ঠিক করছে কি ভুল করছে। তারপরেই ধমকে ওঠে, করাত চালিয়ে দেব দুখানা করে? কথা কানে যায় না?

কানে যায়। শিরিন ভুল শুধরে নেয়।

যাদু সম্মোহনের মহড়ায় হয়ত সবই ঠিক হয়েছে, যাদুকরের অভিব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিথিল প্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে—অথচ চোখ দুটো চাওয়া, শূন্য দৃষ্টি। অসহিষ্ণু বিরক্তিতে গুণী দত্ত হাতের যাদুদণ্ড শূন্যে আছড়ায়, আমার দিকে চেয়ে দেখছ কি—চোখ চেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে নাকি?

শিরিন চোখ বোজে।

মহড়া শেষে গুণী দত্ত জুলির কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে, তুমি তো চেষ্টা করে মেয়েটাকে একটু হাসিখুশির মধ্যে রাখতে পারো, নাকি তোমারও শোক হয়েছে?

দলের মধ্যে একমাত্র জুলির সঙ্গেই যা অন্তরঙ্গতা শিরিনের। এই অন্তরঙ্গতায় জুলি বয়সের ব্যবধান ঘোচাতে পেরেছে। ছল-ছুতোয় তাকে হাসাত রাগাত, তার সঙ্গে খুনসুটি করত, এক বিছানায় শুয়ে তাকে ধরে নানা দেশের গল্প করত। দিনকতক হল সে-সব বন্ধ।

অনুযোগ শুনে জুলি কৃত্রিম গাম্ভীর্যে তার দিকে চেয়ে থাকে, তারপর জবাব দেয়, পারি, কিন্তু তোমার জন্যে একটু ত্যাগ স্বীকার করছি। শোকের সময় যত কাছে আসা যায় অন্য সময় ততো নয়। তুমিই বোকার মত করে বেড়াচ্ছ, কোথায় এ মওকায় বুঝে-সুজে নেবে, তা না—

গুণী দত্ত রাগ করে চলে গেছে। জুলির ঠাট্টার থেকেও হাসিটা আরো খারাপ লেগেছে। কিন্তু ওকে বলে পারা যায় না, বোঝানোও যায় না। শিরিনের সামনেই আগেও অনেক দিন চটুল ইঙ্গিত করেছে, মেয়েটাকে নিয়েই বেফাঁস রসিকতা করে বসেছে। শিরিনের মাথায় কিছু ঢোকেনি অবশ্য। হাসিঠাট্টার তল-কূলও পায় না।

বড় বড় দু চোখ মেলে জুলিকে দেখে, তাকে হাসতে দেখে হাসেও মৃদু মৃদু। গুণীডাটার মত মানুষের মুখের ওপর এই একজনই ঠাস ঠাস কথা বলে বসে বলেও শিরিনের বেশ শ্রদ্ধা তার ওপর।

পরে গুণী দত্তর রাগ দেখেও জুলি নির্লিপ্ত মুখে বলে, মেয়েটা বোকা, তোমাকে মানুষ ছেড়ে আর কিছু ভাবে বোধ হয়—

গুণী দত্ত কড়া জবাবই দিয়েছিল একদিন। বলেছিল, ও বোকাই থাক, দোহাই তোমার, জ্ঞানের ভাণ্ডার আর ওর কাছে খুলতে যেও না।

বলার মধ্যে ঝাঁজ ছিল, অপমানকর খোঁচাও ছিল। কিন্তু জুলির গায়ে কথা কমই বেঁধে। ভুরু কুঁচকে খানিক দেখেছে তাকে, শেষে পাল্টা তর্জন করে উঠেছে, ইউ র‍্যাসক্যাল। অবলা অজ্ঞানের ওপর হামলা করতে খুব সুবিধে, কেমন?

গুণী দত্তর এক-এক সময় সন্দেহ হয়, জুলি মনের জ্বালায় এই কাণ্ড করে কিনা। তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও বোঝানো সত্ত্বেও ওই মেয়েটাকে তার দিকে এগিয়ে দেওয়ার একটা স্থূল ঝোঁক তার। আবার এও ভাবে, যা করে জুলি নিজের স্বভাবেই করে—দেহ সম্বন্ধে শুচিতা-বোধ ওবকম মেয়ের মনে আসবে কোথা থেকে। নারী-পুরুষের একটাই সম্পর্ক জানে সে।

কিন্তু গুণী দত্তকে নিয়ে না হোক, জুলি সে-দিন এমনি একটা স্থূল রসাভাবেই গত ক'টা দিনের গুমোট কাটিয়ে দিল।

শিরিনকে নিয়ে দিব্য-দৃষ্টি যাদুর অনুশীলনে বসেছিল গুণী দত্ত। কোনোদিকেই এগোচ্ছে না বলে মেজাজ তেমন প্রসন্ন নয় তার। শিরিন একটা চেয়ারে বসে, অদূরে একটা সোফায় গা ছেড়ে দিয়ে জুলি উল বুনছে। কিছু করার না থাকলেই জুলি উল বোনে। খোলে আর বোনে। বোনার সময় তাকে দেখলে মনে হবে আর কোনো দিকে চোখ কান নেই তার। একেবারে নির্লিপ্ত।

চোখ বোজো।

শিরিন চোখ বুজেছে। স্টেজে নামলে এই ম্যাজিক দেখানোর আগে পাঁচ দফা পুরু কালো কাপড় বাঁধা হবে চোখে।

পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে গুণী দত্ত জিজ্ঞাসা করল, বল তো দেখি এটা কি?

শিরিন চুপ কয়েক মুহূর্ত। তারপরই বলল, কলম।

গুণী দত্তর রুমালসুদ্ধ হাতটা ঠাস করে সামনের টেবিলের ওপর পড়ল।—চোখ খোলো, কি এটা?

জুলি দেখল কি, জবাব দিল না।

সবই তো ভুলেছ দেখছি, মন না দিলে মনে থাকবে কি করে? একটাতেই এই, দু'চারশ যখন মনে রাখতে হবে তখন কি করবে?

শিরিন নির্বাক। জুলি উল বুনছে।

চোখ বোজো। পকেটের পার্স থেকে একটা একশ টাকার নোট বার করল।—বেশ ভেবে বলো, এবারে কী?

টাকা।

রাইট। টাকা সবাই চেনে, কল্পিত দর্শক-ভোলানো সরস কণ্ঠস্বর গুণী দত্তর, এবারে ওই কালো কাপড়ের ভাঁজ দিয়ে বেশ করে দেখে নিয়ে বলো, কত টাকা? বলার সঙ্গে সঙ্গে একশ টাকার নোটটা পকেটে পুরে তার বদলে একটা দু'টাকার নোট ধরেছে সামনে। মঞ্চে খেলা দেখানোর সময় সে চুপিচুপি সামনের যে-কোনো দর্শকের কাছ থেকে যে-কোনো অঙ্কের নোট নিয়ে সে যেন সহচরীকেই ঠকাতে চেষ্টা করবে।

শিরিন চোখ বুজে আছে। কিছু মনে করার চেষ্টা। বলল, পাঁচ টাকা—

গুণী দত্ত হাল ছেড়ে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। সে শব্দে শিরিন চোখ মেলে তাকালো, ভুলটা দেখল। জুলি একবার দুজনকেই দেখে নিয়ে আবার বোনায় মন দিল।

রাগ করে লাভ নেই। গুণী দত্ত আর রাগ না করে শিরিনকে বোঝাতে বসল, দর্শকদের সামনে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে কত বড় বিপদ হতে পারে। সহকারী বা সহচরীর সামান্য ভুলে দলকে দল সুদ্ধু উঠে যেতে পারে, একটা গোটা জীবনের সাধনা নষ্ট হতে পারে। দর্শক আবেগের জোয়ারে ভাসে, এতে ছেদ পড়লে তারা ক্ষমা করে না।

কথাগুলো গম্ভীর উপদেশের মত শোনাচ্ছে দেখে এই অন্যমনস্কতার প্রসঙ্গে একটা লঘু কাহিনীও বলল। সহকারী বা সহচরী সর্বদা সচেতন না থাকলে কি কাণ্ড হতে পারে সেই দৃষ্টান্ত। ও দেশের এক মস্ত ম্যাজিসিয়ান মঞ্চে খেলা দেখাচ্ছিল। সহচরীর সামান্য ভুলে এক সাধারণ খেলায় মারাত্মক বিভ্রাট। দর্শকের সামনে নামজাদা অভিজাত পরিবারের একটি মহিলার হীরের আঙটি চেয়ে নিয়ে খেলা দেখাচ্ছিল যাদুকর। প্রকাণ্ড হীরে, কম করে দশ বারো হাজার টাকা দাম। মহিলা আঙটিটা নিজের হাতে রুমালের মধ্যে পুঁটলি করে সকলকে দেখিয়ে সেটা যাদুকরের কাচের গ্লাসে রেখেছে। সকলের চোখের সামনে আঙটি, সেই রুমাল। কিন্তু রুমাল টেনে বার করে দেখা গেল আঙটি হাওয়া। অনেক ভণিতার পর যাদুকর ছোট একটা কাঠের বাক্স খুলল। তার মধ্যে একটা পায়রা। পায়রার গলায় ফিতে বাঁধা সেই হীরের আঙটি—যাদুকর পায়রাটাকে চোখ রাঙিয়ে বলছে চুরি করা ভালো নয়, যাও যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। উদ্দেশ্য পায়রাটা একটু উড়বে, তারপর পায়রাসহ যাদুকর নিজেই মহিলার কাছে গিয়ে আঙটি খুলে নিতে বলবে।

এইখানেই বিভ্রাট। ছাড়া পেয়ে পায়রা উড়ল বটে, কিন্তু উড়ে একেবারে সোজা প্রেক্ষাঘরের আধখোলা জানলার ফাঁক দিয়ে অদৃশ্য। কি ম্যাজিক যে হয়ে গেল দর্শক তখনো বোঝেনি—শুধু যাদুকর হতভম্ব। কালো সিল্কের সুতোর একটা মাথা তার আঙুলে জড়ানো ঠিকই, কিন্তু অন্য মাথাটার সঙ্গে পায়রার যোগ ঘটেনি। আসলে অন্য মাথাটা পায়রার পায়ে বাঁধা থাকার কথা। অন্যমনস্কতায় যাদুসহচরী সেটা বাঁধতে ভুলে গেছে।

অতঃপর এই আঙটি খোয়ানো নিয়ে কি প্রহসন ঘটেছে, কাগজে কাগজে কত

রকমের টিকা-টিপ্পনী হয়েছে সে-সম্বন্ধেও গুণী দত্ত কম অতিশয়োক্তি করল না। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে করা তা প্রায় ব্যর্থই।

শিরিন তার দিকেই চেয়ে আছে, শুনছেও। কিন্তু মুখে একটা হালকা রেখাও পড়তে দেখা গেল না। ম্যাজিক প্রসঙ্গে নির্দেশ উপদেশ যেমন শোনে, তেমনি শুনছে।

গম্ভীর মুখে উল বুনছিল জুলি, আড়চোখে এক-একবার দুজনকেই দেখছিল। গুণী দত্তর কথা শেষ হতে আল্‌তো করে বলল, স্টেজে নাচার সময় অন্যমনস্ক হয়ে আমিও একবার ভয়ানক বিপদে পড়েছিলাম—

গুণী দত্ত মুখে জিজ্ঞাসা করল না কি বিপদ, ঈষৎ আগ্রহে তাকালো শুধু। শিরিন তেমনি নিরাসক্ত।

বেশির ভাগ সময় হাতের বোনার দিকে চোখ রেখে জুলি খুব সাদাসিধে ভাবে বলে গেল, জলদেবী মৃগয়াদেবী অগ্নিদেবী যুদ্ধদেবী প্রণয়দেবী কলাদেবী—গ্রীক পুরাণের এমনি একগাদা দেবীদের নাচ। স্টেজের মধ্যেই পোশাক বদলে বদলে নাচতে হবে। আমার পরনে প্রত্যেক দেবীর ঝকমকে হালকা পোশাক—কোনোটার নিচে কোনোটা দেখা যায় না। জামাগুলোর কাঁধের কাছে ফাঁস, নাচের ফাঁকে জামার রঙের ফাঁস টেনে দিলে সেটা আস্তে আস্তে গা বেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।....সেদিন নাচের সময় নতুন আলাপী এক ছোকরার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে একসঙ্গে কটা ফাঁস ধরে টান দিয়েছি খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি গা বেয়ে সব ক'টা জামা সড়সড় করে নেমে আসছে—গায়ে আর কিছু নেই। সর্বনাশ আর কি, তাড়াতাড়ি বসে পড়ে উবুড় হয়ে মৃগয়াদেবী ডায়নার নাচে ভারতীয় প্রণাম দেখিয়ে পড়ে রইলাম। ব্যাপার ভাল করে না বুঝেই হকচকিয়ে গিয়ে উইং-এর ছোকরা ড্রপসিন ফেলে দিল। ওদিকে দর্শকদের হাততালি আর এনকোর থামে না—নাচটা খুব পছন্দ হয়েছে তাদের, আবার দেখাতে হবে।

শিরিন সামনে বসে বলেই গুণী দত্তর কানের কাছটা লাল হয়েছিল, গরম ঠেকছিল। কিন্তু বিরক্তির অভিব্যক্তি প্রকাশের আগেই অবাক হয়ে দেখে, ঘাড় ফিরিয়ে শিরিন জুলির দিকে চেয়ে আছে। যে মেয়েকে কটা দিনের স্তব্ধতার গহ্বর থেকে আর টেনে তোলা যাবে কিনা ভেবে উতলা হয়েছিল, তার আয়ত কালো চোখে নারীসুলভ লঘু বিড়ম্বনা আর গোলাপী গালে রক্তকণার খেলা।

শেষে গুণী দত্তর চোখে চোখ পড়তে ফিক করে হেসে ফেলল শিরিন, ঝকমকে দাঁতের আভাস দেখা গেল।

এই সুচারু পরিবর্তন দেখে নিয়ে জুলি হাসি চেপে তেমনি নিস্পৃহ মুখে আবার বোনার দিকে চোখ ফেরাতে চেষ্টা করেছে। এদিকে অপ্রস্তুত হয়ে শিরিনের সঙ্গে নিরুপায় গুণী দত্তও হেসে ফেলেছিল। আর হয়ত নিজের অগোচরে অবাক হয়ে ভেবেছিল, নিজের দেহ সম্বন্ধে এরা সকলেই কি এমনিই সচেতন।

যাই হোক, এরপর জুলিকে আড়ালে ডেকে বকার কথা তার মনেও হয়নি। উল্টে তার বুক থেকে যেন একটা দুর্বহ পাথর নেমে গিয়েছিল।

পরের অনুশীলনে শিরিনের আর ভুল হয়নি।

কিন্তু গুণী দত্তর সংগোপন নিভৃতে আর একজন প্রতীক্ষা করছে। সময়ের প্রতীক্ষা, সুযোগের প্রতীক্ষা। সে এক যুগেরও আগের গুণী—গুণময়কিশোর। যে যুক্তি বোঝে না, সম্ভব অসম্ভব বোঝে না, অন্ধ আবেগের তাড়নায় অনায়াসে যে রসাতলের পথেও পা বাড়াতে পারে। কিন্তু সে যে আজও তার সত্তার সঙ্গে এ-ভাবে মিশে আছে জানত না। গুণী দত্ত সেদিন তাকে আবিষ্কার করেছে। শুভেন্দু নন্দীর বাড়িতে—এক মেয়ের চিবুকে টুকটুকে একটা লাল জড়ুল দেখে।

হাস্যকর। গুণী দত্ত হেসে উড়িয়ে দিতেই চেষ্টা করেছে, নিভৃতের ওই অবুঝকে সে হেসেই নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে, অস্বীকার করতে চেয়েছে। না করার জ্বালা জানে। পিঠের দাগের জ্বালা জুড়িয়েছে, কিন্তু সে জ্বালা আর কতটুকু ! তাছাড়া ম্যাজিসিয়ান গুণীডাটা তো আর অবুঝ নয়, পাগল নয়। সে জানে, চোখের নিচের কালো তিল আর চিবুকের নিচের লাল জড়ুল এক নয়। আধা-শহরের প্রায় নিরক্ষরা মেয়ে আর শহর কলকাতার এম-এ পাস মাস্টার মেয়ে এক নয়। একজন আছে কি নেই বোঝা যেত না, আর একজনের চলা-ফেরা ওঠা-বসায় পরিপুষ্ট অস্তিত্ব ঘোষণা। পাগল ভিন্ন মিল কেউ দেখবে না। রাত-দিনের তফাত।

পরক্ষণে নিজেকে চোখ রাঙিয়েছে। তফাত না থাকলেই বা। মিল থাকলেই বা। আজ যদি শ্রাবণী ছেড়ে স্বর্ণ নিজেই তার সামনে এসে দাঁড়ায়—তা হবেই বা কি ? সে ভাবছে কেন ? ভাবার কি আছে ?

না ভেবে কাজে মেতেছে, কর্তব্যের রাশ হাতে নিয়েছে। সেই জন্যেই শিরিনের অনুশীলনে একাগ্রতার ত্রুটি বরদাস্ত করতে পারেনি। শোক নিয়ে বসে থাকলে চলবে ? নাকি মঞ্চে নামার যোগ্যতা অর্জন না করলে চলবে ? কিন্তু শিরিন আত্মস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুণী দত্তর উদ্দীপনায়.ছেদ পড়তে লাগল। ভিতরে যে অশান্ত অবুঝের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল, তার অমোঘ পদক্ষেপ স্পষ্টতর হতে লাগল। গুণী দত্ত উপলব্ধি করছে, সে দখল নিতে আসছে। ম্যাজিসিয়ান গুণীডাটা তার কাছে নিতান্ত দুর্বল।

সকাল থেকেই সেদিন মনটা বিচলিত ছিল, বিক্ষিপ্ত ছিল। এডওয়ার্ড উডকে প্রায় অকারণেই তার ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে কটু কথা শুনিয়েছে। সন্ধ্যার স্টেজ-প্রোগ্রাম লিখে নিতে এসে তার মেজাজ দেখে জেনিফার উড বিস্মিত। আইটেম লেখার সময় যে খেলাগুলো গত কয়েক শোতে দেখানো হয়নি সেগুলোর প্রসঙ্গ তুলতে গুণী দত্ত ঝাঁজিয়ে উঠল, তোমাদের পরামর্শমত আমাকে ম্যাজিক দেখাতে হবে ?

কি থেকে কি, মিসেস উড হতভম্ব।—হোয়াট্স দি ট্রাবল্ উইথ ইউ ?

কি দেখাব সে আমি ভাবব, তোমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। গুণী দত্ত অন্য দিকে ঘাড় ফেরাল।

মিসেস উডের ভিতরেও এক জাঁদরেল রমণীর অবস্থান। এডওয়ার্ড উডের মত মিনমিনে স্বভাব নয়। ঝুঁকে মুখখানা দেখতে চেষ্টা করল, তারপর সমান ঝাঁজে উত্তর

দিল, ইকুইপমেণ্টের লিস্ট দেবে তো, না কি তোমার ম্যাজিকে সব আকাশ থেকে পড়বে?

গুণী দত্ত গম্ভীর মুখে সরঞ্জামের তালিকা বলে দিল।

মিসেস উড ততোধিক গম্ভীর মুখে লিখে নিল। তারপর কাগজ কলম হাতে তার সামনে এসে দাঁড়াল। দেখল কয়েক মুহূর্ত। শেষে মন্তব্যসহ তপ্ত প্রশ্ন নিক্ষেপ করল একটা, ...মাস্ট্ বি সাম্ গার্ল্, হু দ্য ডিভিল্ সী ইজ্?

জবাবের প্রতীক্ষায় আর দাঁড়ানো সমীচীন বোধ করল না, মালিকের গাম্ভীর্যে প্রস্থান করল জেনিফার উড।

দিন দুই হল তার এই মেজাজের আভাস জুলিও খানিকটা পেয়েছে। শিরিনের মন ফেরার দরুন প্রসন্ন দেখবে ভেবেছিল। উল্টো ব্যাপার দেখে সে-ও অবাক।

কিন্তু সকলেই এরা তাদের পরিচিত গুণীডাটাকে দেখছে। তাই অবাক হচ্ছে। গুণময়কিশোরের খবর কেউ রাখে না।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে গুণী দত্ত উঠল একসময়। নম্বর দেখে টেলিফোন ডায়েল করল। শুভেন্দু নন্দীর কাগজের অফিস। তাদের অপারেটার জানালো, শুভেন্দু কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইছে। লাইনটা ধরে থাকতে নির্দেশ দিল, খালি হলে দেবে।

গুণী দত্ত ঝপ করে রিসিভার ফেলে দিল। লাইন খালি থাকলেও তাই করত বোধ হয়, কানেকশান দেবার আগেই রেখে দিত।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করে নিল একবার। আবার রিসিভার তুলল। নম্বর ডায়েল করল। এবারে অন্য নম্বর। রিং হচ্ছে শুনতে পাচ্ছে।....আছে না কলেজে গেছে? আজ কিছু একটা ছুটির দিন। ছুটির দিনে কাগজে ফলাও করে বিজ্ঞাপন দেয় মিসেস উড। তার বিজ্ঞাপন দেখেই গুণী দত্ত বুঝতে পারে কবে ছুটির দিন।...রিং হচ্ছে....ভাইয়েরাও ধরতে পারে...শুভেন্দুর ছুটি নেই, কাগজের অফিসে ছুটি থাকে না বড়....ইস্কুল কলেজ তো যে কোনো ছুতোনাতায় বন্ধ থাকে....

হ্যালো—

এধার থেকে গুণী দত্ত চমকে উঠল প্রায়। সেটা আনন্দের আতিশয্যেও হতে পারে। টেলিফোনে গলা আরো নিটোল, মিষ্টি। গুণী দত্ত এবারে কিছু শুনতে চায়। আগের দিন যা শুনেছিল....

বলল, আমি গুণী দত্ত, আপনি কে?

আমি শ্রাবণী।

এটুকুই। ঠিক এই দুটো কথাই শোনার আগ্রহে ওই বাচনরীতি। আমি শ্রাবণী। কানের ভিতর দিয়ে অনেক নিভৃতে পৌঁচেছে। আমি শ্রাবণী। ক'টা দিনের স্নায়ুর টান-ধরা ভাবটা কমে আসছে। আমি শ্রাবণী....

বলছে কিছু। বলছে, দাদা তো বাড়ি নেই। অফিসে...

জানি। আমি দাদার বোনেরই খোঁজ করছিলাম। হাসল, কিছু মনে করবেন না, এর মধ্যে একদিনও তো এলেন না?

ওদিকের গলার স্বরে কুণ্ঠার আভাস।

এর মধ্যে হয়ে ওঠেনি, একদিন যাব।

একদিন নয়, আজই। বিকেলে আপনাদের বাড়িতে কোম্পানীর গাড়ি যাবে। আপনি শুভেন্দুকে খবর দিন, আপনার বোনকেও—আপনার যতজন খুশি সকলকে নিয়ে আসুন—

আজই কেন, আজ—

আপত্তি কানে তুলল না, আপত্তি করার ফুরসতও দিল না।—আজই, আজই। ভালো না লাগলে আর কোনদিন না হয় এমুখো হবেন না। আজ স্পেশাল আইটেম আছে কয়েকটা, ঠিক সময়মত গাড়ি যাবে। বড্ড ব্যস্ত, ছাড়ি, কেমন?

জবাব আসার আগেই শব্দ করে রিসিভার নামালো।

এবারে টেলিফোনের ওধারের দৃশ্যটা কল্পনা করছে গুণী দত্ত আর হাসছে একটু একটু। কল্পনা কেন, দেখতেই পাচ্ছে যেন।....রিসিভারের শোনার দিকটা গাল ঘষটে নিচের দিকে নামছে....জড়ুলটা ঢেকে গেল....দ্বিধাগ্রস্ত, বিব্রত....রিসিভার রেখে মন্থর পায়ে ভিতরের দিকে এগলো, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

কিন্তু গুণী দত্ত যেন নিশ্চিত জানে শ্রাবণী কি করবে। আসবে। আসবে বলেই ওই কাল্পনিক দ্বিধার দৃশ্যটা ভাবতে মজা লাগছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে আবার এক লঘু পরিবর্তনের ঝাপটা খেয়ে মিসেস উড এবারও নিরীক্ষণ করে দেখেছে তাকে। ছেলেমানুষের মত উৎফুল্ল ব্যস্ততায় তার ম্যাজিসিয়ানটি প্রোগ্রামের অনেকগুলো তালিকা অদল-বদল করে দিল। বেশির ভাগ ভালো খেলা যেন এই একদিনে দেখানো দরকার। তারপর খুশির উদ্দীপনা গোপন করে তাকে একটা ঠিকানা দিয়ে বলল, এই ঠিকানায় সময়মত গাড়ি যায় যেন, আমার জনাকতক গেস্ট আসবে। প্রথম রো-তে জায়গা রেখো—

এ-রকম নির্দেশ পেতে একেবারে অভ্যস্ত নয় মিসেস উড। তবে এই অতিথি পর্যায়ের বেশির ভাগই সরকারী হোমরাচোমরা বা রাজা-মহারাজা গোছের লোক।

এনি লেডি কামিং?

মিসেস উডের সাফ প্রশ্ন। কিন্তু গুণীডাটার জবাবটা তেমন সাফ লাগল না। জবাব দিল, লেডি জেণ্ট সব—

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে প্রস্থান করল সে।

শ্রাবণীর দ্বিধার দৃশ্যটা খুব ভুল কল্পনা করেনি গুণী দত্ত। হঠাৎ ও-ভাবে টেলিফোন পেয়ে সে রীতিমত বিব্রত বোধ করেছে। একদিনের আলাপ, তারপর ওই ফোন। কলেজে মাস্টারী শুরু করার পর থেকে তার প্রতি পুরুষের আচরণে কিছুটা মর্যাদার ব্যবধান অনুভব করে আসছে। শ্রাবণীর বিরক্ত হবারই কথা। কিন্তু একদিনের আলাপে এই লোক ওর ভিতরে কিছু জটিলতা সৃষ্টি করে গেছে। তাই বিরক্তির থেকেও অস্বস্তি বেশি।

এই অস্বস্তি কাটানোর জন্যেই শ্রাবণী ভারী দল সংগ্রহের চেষ্টায় ছিল। বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছে যাবেন কিনা। তিনি তাদেরই যেতে বলেছেন। টেলিফোনে শুভেন্দুকে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসতে বলেছে। বলেছে, তোমার বন্ধুর কাণ্ড, ম্যাজিক দেখতে

যাবার জন্য গাড়ি পাঠাচ্ছেন জানিয়েই লাইন কেটে দিলেন। তারপর মিলনীকে ডেকেছে। প্রশান্তকে নিয়ে সে খুশি হয়ে এসেছে। গাড়ি আসছে জেনে আনন্দে দুচোখ কপালে তুলেছে সে, এত খাতির কার জন্যে রে দিদি!

শ্রাবণী ভুরু কোঁচকাতে চপলতা পরিহার করেছে। আগে দিদিকে তবু একটু সমীহ করত। বিয়ের পর দিব্বি মুখরা হয়েছে। ছোট ভাইদেরও সঙ্গে নেবার ইচ্ছে ছিল শ্রাবণীর। মিলনী বাধা দিয়েছে।—ভদ্রলোক ভদ্রতা করে যেতে বলেছে বলে কি গুষ্টিসুদ্ধ যেতে হবে নাকি! ওরা আর একদিন যাবে'খন, দেখেছেই তো—

তারা অতিথি। আমন্ত্রিত অতিথির সমাদর সকলেই করে থাকে। কিন্তু এতটা যেন আশা করেনি মিলনী। দাদার সঙ্গে আগেও ম্যাজিক দেখে গেছে। তখনো আপ্যায়নে ত্রুটি হয়নি, কিন্তু এমন বিশেষ সমাদর দেখেনি। রঙ্গালয়ের দ্বারে তাদের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং উড দম্পতি উপস্থিত। এমন গণ্যমান্য অতিথি আর যেন হয় না, সঙ্গে করে তাদের নিয়ে গিয়ে প্রথম সারির প্রথমে বসিয়ে দিয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চা সফ্ট্ ড্রিঙ্ক পরিবেশন করিয়েছে।

সকৌতুক বিস্ময়ে মিলনী দিদিকে লক্ষ্য করেছে। পাশে দাদা বসে বলেই মুশকিল। তবু এক ফাঁকে দিদিকে কাছে টেনে কানে কানে বলেছে, আজ আমাদের এত খাতির কেন রে দিদি!

মিলনী এ-কথা দ্বিতীয়বার বলল। বাড়িতে গাড়ি আসছে শুনেও বলেছিল। শ্রাবণী গম্ভীর, আর অস্বস্তি বাড়ছে। কিন্তু এরপর যে লোককে আশা করছিল, তার দর্শন মিলল একেবারে মঞ্চে—শো আরম্ভ হতে। ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে বলেই পরিবেশ এক মুহূর্তে জমে ওঠে না। দর্শকের মন রসিয়ে টেনে আনতে সময় লাগেই একটু। শ্রাবণীও ব্যতিক্রম নয় তার। যতক্ষণ না বিস্ময়ের আবর্তে চোখ মন ধাঁধিয়ে গেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মনে হয়েছে, হল্ ভরতি দর্শকের মধ্যে দর্শক যেন সে একা। শুধু তারই উদ্দেশ্যে যেন যত বাক্যছটা, হাসির ব্যঞ্জনা, ছলাকলা। এমন অসম্ভব অনুভূতিটাকে কলেজের মাস্টার মেয়ে শ্রাবণী নন্দী প্রশ্রয় দিতে চায়নি, প্রতিহত করতে চেয়েছে। কিন্তু যেখানে ওরা বসেছে সেখান থেকে এক ঝলক দ্বিধাশূন্য আবরণশূন্য তীক্ষ্ণ নিঃশঙ্ক দৃষ্টি বুঝি অবিরাম তার মুখে এসে বিঁধছে বিঁধছে বিঁধছে বিঁধছে। বিঁধে আছে। মুখ থেকে চিবুকে আর চিবুক থেকে মুখে। চিবুকের নিচে যেখানে লাল জড়ুল, সেখানটা চিনচিন করছে আবার। প্রথম দিন যেমন করেছিল। নিজের অগোচরে শ্রাবণী সেখানটা আঙুলে করে ঘষে দিল দুই-একবার।

তারপর অবশ্য এ ভাব গেছে। বাইরের এই মনটা বিস্ময়ের অতলে ডুবেছে কখন টের পায়নি। এতগুলো দর্শকের এতগুলো মনকে যেন অনায়াসে এক বিহ্বলতার খোঁয়াড়ে এনে পোরা হয়েছে। সেখান থেকে ওই একজনের ইচ্ছেমত এক-একবার মুক্তি পেয়েছে সকলে। তখন হাসি আনন্দ হাততালির অভ্যর্থনায় সকলে ভেঙে পড়েছে। তারপর আবার নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার যাত্রা, একজনের যাদু-সংকেতে আজব-দরিয়া পাড়ি।

শো শেষ হল।

কোথা দিয়ে ক'টা ঘন্টা কাটল কেউ জানে না। শ্রাবণীরাও না।

তারা গাত্রোত্থান করার আগেই মিসেস উড সুবিনীত সৌজন্যে আবার অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো, সকলকে ভিতরে নিয়ে গেল। শ্রাবণী বাস্তবে ফিরে এলো আবার। কে জানে কেন, এই বাস্তব বাঞ্ছিত নয় খুব।

গুণী দত্ত হাসিমুখে এগিয়ে এলো। শুভেন্দু সাড়ম্বরে ঘোষণা করল, আগে যেদিন দেখেছিল এই দিনের শো তার থেকেও অনেক ভালো হয়েছে। মিলনীও হেসে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ দাদার কথা ঠিক।

ভিতরে বিশ্রামের আসর, চা-জলযোগের আসরও। গুণী দত্ত একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তাদের—উড দম্পতির সঙ্গে, জুলি স্যান্ডারসনের সঙ্গে, শিরিনের সঙ্গেও। এর মধ্যে উড দম্পতিকে আগেই দেখেছে তারা, মঞ্চে যাদুসহচরী জুলি স্যান্ডারসনকেও দেখেছে, শিরিনকে এই দেখল।

জুলি ঈষৎ ক্লান্ত। সারাক্ষণ নিজের কাজে মগ্ন ছিল বলে এই দিনটায় তেমন ব্যতিক্রম কিছু চোখে পড়েনি। সকালের দিকে সে গুণীডাটার মেজাজের কিছু পরিবর্তন দেখেছে আর এখনও খুব খুশি দেখছে—এই পর্যন্ত। সকলের কাছ থেকে সামান্য ব্যবধানে বসে চা খেতে খেতে নির্লিপ্ত চোখে সে অতিথিদের লক্ষ্য করছে।...এর মধ্যে শুভেন্দু নন্দী জাহাজের চেনা। এখানেও একদিন দেখেছিল।

কিন্তু আজকের দিনের ব্যতিক্রমের নাড়ি টিপে বসে আছে জেনিফার উড। অতিথিদের মধ্যে পুরুষ দুটিকে সে গোড়া থেকেই ছেঁটে দিয়েছে। তাদের নিয়ে মাথা ঘামানো অনাবশ্যক। নিজের দেশে এবং এদেশেও অনেক সুদর্শনার প্রগল্ভ সান্নিধ্যে মিসেস উড অবাধে বিচরণ করতে দেখেছে গুণীডাটাকে। কিন্তু কোনো রমণীর প্রভাব বলতে যা বোঝায়, কোনদিন তা দেখেছে বলে মনে পড়ে না। অথচ আজ সেটুকুই বিশেষ লক্ষ্যণীয়। মিসেস উডের মাথা ঘামানোর কারণ আছে। ওই শিরিন মেয়েটাই একদিন তার ম্যাজিসিয়ানটির বাসনার অভিসারে এসে দাঁড়াবে ধরে নিয়েছিল। জুলির সঙ্গে আলাপ করে দেখেছে, তারও সেই রকমই ধারণা। ভালবাসা-বাসির আবেগের ওপর তেমন শ্রদ্ধাভক্তি নেই মিসেস উডের। রূপের জোয়ারে তাদের দেশের অনেক প্রবল পুরুষকে মুখ থুবড়ে পড়তে দেখে অভ্যস্ত। তাই এ-জন্যে উতলা হয়নি সে। মেয়েটা দলেই আছে যখন গুণীডাটা হাতছাড়া হবে না। গুণীডাটা চোখের মণি, তাকে নিয়ে আবার তারা একদিন দেশে পাড়ি জমাতে পারবে।

কিন্তু এ আবার কোথা থেকে কারা এলো। মেয়ে দুটোর মধ্যে রূপের বিচারে যার ওজন বেশি—সে বিবাহিতা। অর্থাৎ মিলনী। বিবাহিত বলেই পুরুষ যে তার দিকে চোখ দেবে না এমন কথা ভাবার অবশ্য কারণ নেই। বিবাহিত মেয়েকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি নজির আছে। কিন্তু গুণীডাটার হাবভাব দেখে মিসেস উডের নিঃসংশয় অনুমান, হৃদয়যন্ত্রের এই নতুন উদ্দীপনার মূলে দ্বিতীয় মেয়েটা—প্রোফেসার মেয়ে। তাই মিসেস উড খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে তাকে, বলতে গেলে চোখ দিয়ে ওজন করেছে। কিন্তু গুণীডাটাকে বশ করার মত কিছুই চোখে পড়েনি।....শুধু

স্বাস্থ্য ভালো। কিন্তু ভালো স্বাস্থ্যই যদি আকর্ষণ হয় তাহলে তার সঙ্গেই বা প্রেমে পড়তে বাধা ছিল কি গুণীডাটার? তবে প্রোফেসার বলছে যখন, খুব বিদুষী নিশ্চয়। তাদের দেশে হেজিপেজি কেউ প্রোফেসার হয় না। কিন্তু শিক্ষা বা বিদ্যার মস্ত অনুরাগী তো গুণীডাটাকে কখনো মনে হয়নি।

ফেরার পথে ঠিক এ-রকম না হোক, কিছুটা অনুরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিল শ্রাবণীও। চায়ের আসরে ম্যাজিকের বিহ্বলতা কেটে গেছে। দু'হাতের মধ্যে বসে বাধা-বন্ধহীন ঝকঝকে এক জোড়া চোখ কতবার তার মুখের ওপর বিঁধেছে ঠিক নেই। মুখ থেকে চিবুকে, চিবুক থেকে মুখে। আলাপ বলতে এই দুদিন মাত্র। অথচ শ্রাবণী সারাক্ষণ কেমন অসহায় বোধ করেছে। আর এখন সবই ভারী দুর্বোধ্য লাগছে তার।...রূপ নয়, যেখানে গিয়ে বসেছিল, সেখানে মিলনীও চোখে লাগে না এমন একজন ছিল।....নাম তার শিরিন। বয়েস বেশি নয় অবশ্য, তবু রূপ-পতঙ্গ পুরুষকে নিঃশেষে দহন করতে পারার মতই রূপসী মেয়েটি। কিন্তু শ্রাবণী অনুভব করেছে, ওটা রূপের আসর নয়, কোনরকম স্বাভাবিক প্রীতির আসরও নয়—ওটা শুধু তার আসর। শুধু তারই জন্য আসর।

তাই বিভ্রান্ত। সোজাসুজি সব মিলিয়ে বোধ হয় পাঁচটা কথাও হয়নি গুণী দত্তর সঙ্গে। ম্যাজিক ভালো লাগল কিনা তাও জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু কি এক অগোচরের ইচ্ছা দিয়ে লোকটা যেন সর্বক্ষণ ওকে ঘিরে রেখেছিল। ক্রমেই সহজ হওয়া কঠিন হয়ে পড়ছিল শ্রাবণীর। তাছাড়া ওই মেম-কর্ত্রীটিই বা সারাক্ষণ ওভাবে দেখছিল কেন তাকে? চাউনিটা কেমন অনাবৃত মনে হয়েছে।

গাড়িতে বসেও সাড়ম্বরে ম্যাজিক বিশ্লেষণ চলছে। মিলনীব গলাই বেশি শোনা যাচ্ছে। তার মতে লোকটা যাদুকরই বটে, অসাধ্য কর্ম নেই। শ্রাবণীর মনে হচ্ছিল, কথার ফাঁকে মিলনী তাকেই লক্ষ্য করছে, আর এত কথা তাকেই শোনাচ্ছে। ওদের আলোচনা এক সময় চায়ের আসরের দিকে ঘুরল। মিলনী বলল, কি সুন্দর ওই মেয়েটা, চোখ ফেরানো যায় না—শিরিন কোন দেশী নাম?

এই থেকেই বিদেশী মেয়েদের প্রসঙ্গ উঠল। এই প্রসঙ্গের বক্তা শুভেন্দু। তার মতে আজকের দুনিয়ায় শুধু বাঙালী মেয়েরাই মিইয়ে আছে। অন্য সব জায়গার মেয়েরা ভারী জীবন্ত—লাইফ আছে, লাইফ ফোর্স আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জুলি স্যান্ডারসনের প্রশংসা জুড়ে দিল সে। গেলবারে ম্যাজিক দেখার পর গুণী দত্তর সঙ্গে ঘণ্টা দুই কাটিয়েছিল শুভেন্দু। তখন জুলির কথা কিছু শুনেছিল। অবশ্য গুণী দত্ত নিজে থেকে বলেনি, তারই শোনার কৌতূহল ছিল।

সকলের অগোচরে চাপা পুলকে মিলনী শ্রাবণীর গায়ে খোঁচা দিল একটা। তার কারণ বিলেত থেকে ফেরার পর দাদাকে অনেকবার বিদেশিনীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা গেছে। মিলনী বাড়িতেও একদিন এই নিয়ে শ্রাবণীকে বলেছিল, এত প্রশংসা কেন রে দিদি, কিছু কাণ্ডমাণ্ড বাধিয়ে আসেনি তো!

শ্রাবণী অবশ্য উল্টে মিলনীকেই জব্দ করেছিল। বলেছিল, হুঁ, সবাই তোর মত—

একটা দুর্বল জায়গায় হাত পড়তে মিলনী পালিয়েছিল।

ঠিক সে-ভাবে না হোক, এখনো তাকেই জব্দ করল শ্রাবণী। এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল, কোনো কথায় সহজভাবে যোগ দিতে পারেনি সেটা নিজের কাছেই বিসদৃশ ঠেকছিল। মনে হচ্ছিল, ওর এই অস্বাচ্ছন্দ্য নীরবতা সকলেই লক্ষ্য করছে। তাই সকলের দৃষ্টি ফেরানোর জন্যে ফিরে তারই ওপর চড়াও হল সে।—আমাকে খোঁচাচ্ছিস কেন, কি বলবি দাদাকে বল না!

অপ্রস্তুত হয়ে মিলনী চার আঙুল জিব কাটল। ইঙ্গিতটা বুঝে শুভেন্দু লজ্জা পেয়ে হাসত লাগল। আর, সামনের আসন থেকে লাজুক প্রশান্ত একবার ঘাড় ফিরিয়ে সকলকে দেখে নিল।

সহজ হতে পেরে এতক্ষণ বাদে শ্রাবণী মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল একটা।

॥ ১০ ॥

কলকাতায় গুণী দত্তর বন্ধুর বাড়ি বলতে একটাই বাড়ি, আর সেটা শুভেন্দু নন্দীর বাড়ি—গোড়ায় গোড়ায় এটা বেশ গর্ব আর আত্মপ্রসাদের কারণ হয়ে উঠেছিল বাড়ির লোকের। এরপর অনেক দিনের অনেক ঘরোয়া বৈঠক জমজমাট হয়েছে। বাড়ির লোকেরা আবার তাদের আত্মীয়-পরিজন আপনজনদের নিমন্ত্রণ করে এনেছে। এই ঘরোয়া বৈঠকে ম্যাজিসিয়ান গুণীডাটার আর এক রূপ। তাসের রুমালের টাকার ঘড়ির ডিমের আংটির গ্লাসের টুপির ছোট ছোট টুকিটাকি খেলায় হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেছে—আর গুণী দত্ত মিটিমিটি হেসেছে শুধু। এখানে সে বচনবাগীশ নয়।

এই আসরে সব থেকে ঠকেছে আর অপ্রস্তুত হয়েছে মিলনী। কখনো হেসে গড়িয়েছে, কখনো বা হাসি সামলে চাপা রাগ দেখিয়েছে, আমাকে কেন, দিদিকে চোখে পড়ে না আপনার?

ফাঁক-মত গুণী দত্ত একদিন জবাব দিয়েছিল। বলেছিল, ইস্কুলে পড়তে মাস্টারদের কাছ থেকে শত হাত দূরে থাকতুম—সেই ভয়টাই আজও কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

ম্যাজিক ছেড়ে গল্পের আসরও জমত। বিদেশে কোথায় কোন্ ভদ্রলোক তাকে চায়ের নেমন্তন্ন করে বলা নেই কওয়া নেই এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজায় ডবল-তালা এঁটে দিয়ে বলেছে, আপনি পলায়নী যাদুকর, চির-মুক্তির দূত—দেখান দেখি কেমন মুক্তির দূত আপনি! গুণী দত্তর প্রাণান্ত অবস্থা, শেষে গলার কারসাজিতে যেন অনেক দূর থেকে চেঁচিয়ে বলেছে, আমি বেরিয়ে এসেছি—দরজা খুলে দেখুন আপনারা! দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে একেবারে রাস্তায়।

আর একবারের নাজেহাল অবস্থার গল্প শুনে শ্রাবণীও কম হাসেনি। বিলেতের এক নামকরা পালোয়ান তাকে ঘরে আটকেছিলেন। সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁর একটা উপকার করতে হবে। হবেই হবে, নইলে ভদ্রলোক আত্মঘাতী হবেন। কাজটি করে দিলে গুণী দত্তকে তিনি দু'হাজার পাউন্ড পর্যন্ত দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর আজীবন তার কেনা হয়ে থাকবেন।

শেষে মর্মকথাটি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর স্ত্রীটির জন্যে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে, বেঁচেও শান্তি নেই—সেই মহিলাটিকে হাওয়ায় মিশিয়ে দিতে হবে। মঞ্চে গুণী দত্তর 'ভ্যানিশিং লেডী' খেলার খুব নামডাক তখন। বিপদ কোথা থেকে ঘনিয়েছে বোঝা গেল। গুণী দত্ত অনেক করে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করল, এটা সম্ভব নয়, এটা সে পারে না। কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়, শেষে রেগেই গেলেন, পারেন না মানে? চোখের সামনে পর পর ক'দিন দেখলাম জলজ্যান্ত লেডী হাওয়ায় মিশিয়ে দিচ্ছেন। বেগতিক দেখে গুণী দত্ত বলেছে, এক মহিলাকেই তো দর্শকরা রোজ দেখছে, হাওয়ায় মিশিয়ে দিয়ে তাকে তো আবার নিয়ে আসা হচ্ছে। ভদ্রলোক সবেগে মাথা নেড়েছেন, না, ফিরিয়ে আনা আর চলবে না, চিরকালের মত ভ্যানিশ করে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক রেগে আগুন, শাসালেন কাজটি না করে দিলে তার বিপদ হবে।

অগত্যা গুণী দত্ত তখনকার মত রাজী হয়ে সে-যাত্রা প্রাণে বেঁচেছিল।

ম্যাজিকপ্রসঙ্গে অনেক তত্ত্বকথাও শোনা গেছে তার মুখে। গল্পের ছলে বলেছে। বলেছে সকলের উদ্দেশেই, কিন্তু শোনাতে চেয়েছে একজনকে—যার কৌতূহল সব থেকে কম। শ্রাবণীকে। যাদু বিদ্যা যে একটা খেলো ব্যাপার নয়, এর পিছনে যে স্মরণীয় ঐতিহ্য আছে, সেটা জানাবার লোভ সংবরণ করতে পারেনি। না পারার আরো একটা কারণ, শ্রাবণী এম. এ. পাস, অনেক পড়াশুনা করেছে, কলেজের মাস্টার—গুণী দত্তর অচেতন মনে এই সত্যগুলির কিছু প্রতিক্রিয়া ছিলই। মনের তলায় কিছু ব্যবধান উঁকিঝুঁকি দিত। সেটা পীড়ার কারণ। তাই পড়াশুনা যে সেও কিছু করেছে, আর খুব খেলো কিছু নিয়ে নয়, সেটা জানাবার তাগিদ এড়ানো সহজ হত না। এ বিদ্যাপ্রসঙ্গে পুঁথিগত অনেক কথাই বলে ফেলেছে। এই জ্ঞানের অনুশীলন একসময় সাধারণের কত আদরের ছিল সেই গল্প করেছে। প্রাজ্ঞ জ্ঞানী সাধু সজ্জনেরা পরের উপকারের জন্যেই এর চর্চা করত—সম্মান পেত। আমরা ভোজবাজি বলি বা ম্যাজিক বলি—এর পিছনের আদি ইতিহাস কম গৌরবের নয়। এককালে শাকদ্বীপবাসী ভোজক ব্রাহ্মণরা ছিল এই বিদ্যার আদিজনক। গ্রহ চালনা, সূর্যপূজা, স্তব প্রভৃতির নানা প্রক্রিয়ায় অনেক অলৌকিক মঙ্গল সাধন করে গেছে তারা। শাকদ্বীপের সেই গ্রহ-বিপ্রদের এক শাখা ভারতে এসে ভোজক নাম নিয়েছিল। তাই এদেশে এ বিদ্যের নাম ভোজবাজি। তাদের আর একটা বড় শাখা ছড়িয়ে পড়েছিল পারস্য আর মিডিয়ায়। সেখানে এদের নাম হয়েছিল ম্যাজাই। তাই থেকে ম্যাজিক। মিডিয়ার ঋষি দ্যানিয়েল দরায়ুস এদের সসম্মানে গ্রহণ করেছিল—অনুশীলনের সাহায্য করেছিল। এইভাবে ভারতে আর পশ্চিম এশিয়ায়—সেখান থেকে য়ুরোপ পর্যন্ত এক দার্শনিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল—তাদের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

শ্রোতাদের নিজের অনুভূতিলব্ধ অনেক বিচিত্র বিশ্বাসের কথাও শুনিয়েছে গুণী দত্ত। তার মতে, মারীচের মায়া-হরিণ, মায়া সীতাবধ, কালনেমির মায়া আশ্রম, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণ বা কালীয়দমন কথা, হারকিউলিসের অসম্ভব রকমের সব বীরত্বের গল্প—এ সবই ভোজবিদ্যা, সবই ম্যাজিকের অন্তর্গত। ওই সব রহস্য নিয়ে ঠিকমত অনুশীলন করলে এখনও তা দেখানো যায়, করা যায়। শুধু তাই নয়, গুণী

দত্ত নিজেই ক্রমশ ওই সব মায়া-খেলার রহস্য উদঘাটন করতে পারবে বলে আশাও রাখে।

সমস্ত কথার মধ্যেই তার প্রত্যয়ের বাঞ্জনাটুকুই আসল। শুধু শুভেন্দু বা মিলনী বা তার ভাইদেরই নয়, প্রায় সমস্ত পৃথিবী-চষা এই অবাক যাদুকরের মুখে এসব পৌরাণিক আখ্যান শুনতে শ্রাবণীরও ভালো লেগেছে। এর মধ্যে তার এম-এ পাসের বিদ্যেটা অন্তত মাথা উঁচিয়ে ওঠেনি একবারও।

এটুকুই লক্ষ্য ছিল গুণী দত্তর। শ্রাবণীও কান পেতে তার কথা শোনে তা সে অনুভব করেছে। করে তখনকার মত প্রসন্নও হয়েছে। কিন্তু এই আত্মপ্রসাদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে বাড়ি ফেরার পর। কেন বলতে গেল, কেন নিজেকে জাহির করার তাড়না ? সে যা, তার থেকে তো সে এক কণাও বেশি নয়। জীবনে যা করার সোজাসুজি করেই বসেছে—বাঁকা-চোরা পথে কখনো চলেনি বলেই উল্টে নিজেকে ছোট মনে হয়েছে। নিজেকে এভাবে প্রকাশের হীনমন্যতা নির্মূল করে দিতে চেয়েছে।

মিলনী মাঝে-সাজে ঠাট্টাতামাশা করলেও এই এক বাড়ির সঙ্গে প্রখ্যাত যাদুকরটির এমন অন্তরঙ্গ হৃদ্যতার পিছনে স্থির লক্ষ্য কিছু আছে, গোড়ায় গোড়ায় সেটা এক শ্রাবণী ভিন্ন বোধ হয় কেউ উপলব্ধি করেনি। তার এখন স্থির বিশ্বাস, চিবুকের ওই লাল জড়ুল বা কিছু একটার সঙ্গে লোকটার জীবনের গভীর কোন যোগ আছে। কিন্তু শুধু সেই আকর্ষণেই সে আসে, এটা অবিশ্বাস্য। আসরে শ্রাবণী ইচ্ছে করেই যেদিন উপস্থিত থাকেনি, আসরও সেদিন জমেনি শুনেছে। এই লোকের সান্নিধ্য অনেক সময় এড়াতেই চেষ্টা করেছে সে। তার সামনে পড়লে আর ওই চোখের আওতায় পড়লে নিজেকে সেই একই রকম অসহায় মনে হয়েছে। বড় বেশি দেখে, মনে হয় একেবারে ভেতর পর্যন্ত দেখে। এই দেখার সঙ্গে যাদুর যোগ আছে কিনা প্রথম প্রথম সেই সংশয়ও উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। শ্রাবণী অনেকদিন ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেছে, মনে হয়েছে তাকে যেন এক-ঘর লোকের মধ্যে কে টেনে ধরে রেখেছে। সে যেন আর কারো ইচ্ছের বশ, তার নিজস্ব সত্তা একেবারে আচ্ছন্ন।

এ পর্যন্ত মঞ্চের অনুষ্ঠানেও কম দিন দেখা হল না। প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন বিস্ময় নিয়ে ফিরেছে। সত্যিই লোকটা যা খুশি তাই করতে পারে কিনা শ্রাবণী ভেবে পায়নি। প্রায়ই স্থির করে আর যাবে না, ম্যাজিক আর লোকে কতবার দেখে ? কিন্তু টেলিফোনে তাগিদ এলে যেতে হয়। যাবে না বলেও যায়। না গিয়ে পারে না। এমন নিঃসংকোচ বেপরোয়া তাগিদও জীবনে দেখেনি।

কখন আসছেন ?

আজ ? আজ যেতে পারছি না, কাজ আছে।

আমি অপেক্ষা করছি, আসুন।

টেলিফোন নামিয়ে রেখেছে, শ্রাবণীকে আর কথা বলার অবকাশ দেয়নি।

টেলিফোন বাজলেই বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে ওঠে শ্রাবণীর। একটা উত্তেজনার স্রোত বয়ে যায়। অন্য কারো ডাক এলে হাঁপ ফেলে বাঁচে। তারপর

অবসন্ন লাগে। কিন্তু ওই গলা কানে এলেই সর্বাঙ্গ নিস্পন্দ। শুধু কান দুটো সজাগ।

আজ একটা নতুন খেলা দেখাব, আসুন।

কিন্তু আজ তো—

আপনি না আসা পর্যন্ত শো আরম্ভ করতে পারছি না। আসুন।

আর কথা নেই। অনেকক্ষণ পর্যন্ত শ্রাবণীকে নিজের সঙ্গে যুঝতে হয়েছে তারপর। নিজের ওপর বিরক্ত হয়েছে। যে ডাকল তার ওপর দ্বিগুণ বিরক্ত হয়েছে, এমন কি ক্রুদ্ধও হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেছে। যেতে হয়েছে। তখনকার মতো নিজের ইচ্ছের জোরটা হারিয়ে গেছে। পরে নিজের ওপর রাগ করেছে। অস্বস্তি বোধ করেছে, যাতনা ভোগ করেছে। ফিরতে দেরি দেখলে ভাইয়েরা জিজ্ঞাসা করে, দিদিভাই, কোথায় গিয়েছিলে ? বাবা এক-একদিন জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় গিয়েছিলি ? শ্রাবণী কোনদিন জবাব দেয়, কোনদিন চুপচাপ পাশ কাটায়। প্রায় প্রতিজ্ঞাই করে, আর যাবে না।

আবারও একদিন যেতে হয়।

ক্রমশ সকলেই বুঝেছে, সকলেই টের পেয়েছে। শুভেন্দুর মনে প্রথম ছায়াপাত হয়েছিল, শ্রাবণীর একটা সামান্য কথায় গুণী দত্ত যেদিন ওদের কলেজের সাধারণ উৎসবে ম্যাজিক দেখিয়ে এলো। শ্রাবণী কথায় কথায় বলেছিল, কলেজের সবাই ধরেছে আপনাকে ম্যাজিক দেখাতে হবে, সাধ্যের মধ্যে হলে যা লাগে দিতে রাজী—আমি অবশ্য বলে দিয়েছি, আপনি কোথাও যান না।

গুণী দত্ত তখন কিছু বলেনি। শুনে হেসেছিল শুধু। শুভেন্দুও জানত, যাবে না। কারণ অনেক ক্লাব আর কাগজের সুবাদে জানা কয়েকটা পয়সাঅলা প্রতিষ্ঠান মোটা টাকার বিনিময়ে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। শুভেন্দুকে রীতিমত ধরাধরি করেছে তারা। গুণী দত্ত কানেও তোলেনি। মিলনী কতদিন বায়না করেছে, আমাদের পাড়ার মেয়েরা যে আপনার ঘরোয়া ম্যাজিকের গল্প শুনে মাথা খেয়ে ফেলল, একদিন আমার শ্বশুরবাড়ি আসুন—।

যাবে যাবে করেও গুণী দত্তর সময় হয়নি।

শ্রাবণীদের কলেজে ম্যাজিক দেখানোর খবরটা কানে এলো। তারপর থেকেই অনেক ব্যাপার বিসদৃশ ঠেকেছে শুভেন্দুর চোখে। মনে পড়েছে, শ্রাবণীর সম্বন্ধে খোলাখুলি গুণী দত্ত এক-একটা প্রশ্ন করেছে। অত খোলাখুলি না জিজ্ঞাসা করলে হয়ত খটকা লাগতে পারত। তার সাদা-সাপ্‌টা কৌতূহলের রীতি ভেবে শুভেন্দু জবাবও দিয়েছিল। এখন মনে হয়েছে শুধু জবাব দেয়নি, হৃদ্যতার মুহূর্তে কেমন করে যেন লোকটা শ্রাবণীর প্রসঙ্গে অনেক কথা তাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছে। গুণী দত্তর কাছে মিলনীর বিয়েটা কেমন করে হয়ে গেল সেই গল্প কেন করেছিল এখন আর সেটা মনে পড়ছে না শুভেন্দুর। অথচ গল্প করেছিল। শুভেন্দুর নিজের বোন শুধু শ্রাবণী। মিলনী আর পরের ভাই দুটি তাদের বৈমাত্রেয় ভাই বোন। ওই প্রশান্তর সঙ্গেই বিয়ে ঠিক ছিল শ্রাবণীর। সেও শুভেন্দুর বন্ধু। প্রশান্ত বিয়েতে আপত্তি করেনি, কিন্তু শুভেন্দু দেখত, মিলনীর সঙ্গেই তার যত হাসিখুশি ভাবসাব। অথচ শ্রাবণীর সামনে কেমন আড়ষ্ট সে। বাইরে শুভেন্দু এক-আধদিন মিলনীকে প্রশান্তর সঙ্গে দেখেছে, অথচ

বাড়ি ফিরে মিলনী তা প্রকাশ করেনি। শ্রাবণী একদিন সন্ধ্যার দিকে পার্কের বেঞ্চিতে বসে ওদের গল্প করতে দেখেছিল। বাড়ি ফিরে মিলনী তাও গোপন করেছে। তারপর শ্রাবণী নিজেই একদিন হঠাৎ দাদার কাছে প্রস্তাব করেছে, বিয়েটা মিলনীর সঙ্গে দাও। না, শ্রাবণী দুঃখ কিছু পায়নি, এর মধ্যে মন দেওয়ার ব্যাপার কিছু ছিল না। বাবার ইচ্ছে দাদার ইচ্ছে বিয়ে হোক, সে-ও বলেছিল হোক। এই পর্যন্তই। শ্রাবণী আঘাত কিছু পায়নি, বরং পরে বোনকে এই নিয়ে অনেক জব্দ করেছে।

পরে হঠাৎ শুভেন্দুর কেমন মনে হয়েছে শ্রাবণী সম্বন্ধে এত কথা সে যেন স্বেচ্ছায় বলেনি। নিজের অগোচরে বলেছে।

কলেজে ম্যাজিক দেখানোর খবরটা পরে প্রকাশ হয়েছে। শ্রাবণীই বলেছে। অন্যের মুখে জানাজানি হলে আরো বিসদৃশ ঠেকবে ভেবেছিল।

কিন্তু গুণী দত্তকে আর তাগিদ দিতে হয়নি। সে নিজে থেকেই একদিন প্রস্তাব করেছে, আপনার কলেজে কবে ম্যাজিক দেখাতে হবে, বলুন।

শ্রাবণী বিস্মিত হয়েছিল। যাবে ভাবেনি। জিজ্ঞাসা করেছে, আপনি সত্যি যাবেন?

মুখের দিকে চেয়ে গুণী দত্ত অল্প অল্প হেসেছে। বলেছে, আপনি বলছেন, যাব না কেন?

শ্রাবণী এই জবাব চায়নি। মনে হয়েছে, না এলে ভালো হত। কিন্তু কলেজেও না বলে পারেনি। বলা মাত্র ছাত্রী আর সহশিক্ষয়িত্রীদের প্রবল উৎসাহ। তাদের চাপে কলেজ থেকেই টেলিফোনে যোগাযোগ করতে হয়েছে। তাছাড়া, কেমন মনে হয়েছে, সামনে পড়া থেকে ফোন করাই ভালো। দিন ঠিক করে শেষে দ্বিধা কাটিয়ে শ্রাবণী বলে ফেলেছে, ওরা জানতে চাইছে কি দিতে হবে, আপনার মত লোককে সত্যি আনা যাবে কিনা—

গুণী দত্ত গম্ভীর জবাব দিয়েছে, অনেক দিতে হবে, তা হলেও আনা যাবে।

ফোন ছেড়ে দিয়েছে। কথার মাঝে এভাবে ফোন ছাড়াটা যেন অভ্যাস। কিন্তু আসলে কথার বাকি নেই জানে বলেই শ্রাবণীর এ বিড়ম্বনা।

এরপর নির্দিষ্ট দিনে সে এসেছে। ম্যাজিক দেখিয়েছে।

ব্যবস্থাপনার ভার যে শিক্ষয়িত্রীর ওপর, অনুষ্ঠানের ফাঁকে সে বার দুই উঠে এসে শ্রাবণীকে ঠেলেছে, কি দিতে হবে কিছুই তো জানা গেল না।

শ্রাবণী বিব্রত বোধ করেছে। সারাক্ষণই করছিল। বলেছে, তোমরা জিজ্ঞাসা করো, দাদার খুব বন্ধু তো, আমি বললে কিছু নেবেন না।

কিন্তু অনুষ্ঠানের পর গুণী দত্ত তাদেরও কিছু বলেনি। হেসে মাথা নেড়েছে শুধু। আর শ্রাবণীকে ডেকে দিতে বলেছে।

গাড়িতে উঠে শ্রাবণী বলেছে, ওরা আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করছিল কি দিতে হবে, আপনি কিছুই বললেন না। আপনি এসেছেন এই মস্ত কথা, তার ওপর নিজের ক্ষতি করবেন কেন?

গুণী দত্ত হাসছিল, লাভটা আপনার চোখে পড়ল না? আমি ওঁদের কাছ থেকে কিছু পাব সেই প্রত্যাশায় এসেছি?

শ্রাবণী হাসতে চেষ্টা করেছে, হাসতে পারেনি। রাতের আলোছায়ায় মোটরের ছোট পরিসর বিষম ছোট মনে হচ্ছিল শ্রাবণীর। পাশের দিকে না চেয়েও সর্বাঙ্গে একটা দৃষ্টির স্পর্শ উপলব্ধি করছিল সারাক্ষণ। ম্যাজিক নিয়েও দুটো প্রশংসার কথা বলতে পারেনি। গাড়ি কোন্ রাস্তা দিয়ে কোথায় চলেছে তাও খেয়াল করেনি। সে যেন এক প্রবল পুরুষের ইচ্ছের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়েছিল সর্বক্ষণ। লোকটা হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিলেও বাধা দেবার শক্তি ছিল না। এমন কি হাত বাড়াতে পারে সেই আশঙ্কাও ছিল।

গুণী দত্ত হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি থামাতে বলে একাই নামল। পাশেই গাড়ি-বারান্দাঅলা একটা মস্ত বাড়ি। নিচে সারি সারি দোকানঘর।

দোকান সব বন্ধ হয়ে গেছে, তালা ঝুলছে। দোকানের সামনের সিঁড়িগুলো বেশ চওড়া। সিঁড়িতে পথের লোক শুয়ে।

শ্রাবণী অবাক। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছে বোঝেনি। খানিক বাদে গাড়িতে ফিরে আসতে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো। ড্রাইভারকে গাড়ি চালাতে ইঙ্গিত করে গুণী দত্ত হাসল একটু, জায়গাটা দেখলাম—

শ্রাবণী নীরব জিজ্ঞাসু।

গুণী দত্ত হাসছে। বলল, এই সিঁড়িতে বসে বাঁশী বাজিয়ে আর কলের জল খেয়ে ঘুমিয়ে আমার অনেক রাত কেটেছে। জায়গাটা বদলায়নি, তেমনি আছে। হাসল, আবারও এক-এক সময় আমার মনে হয়, এ-সবই মিথ্যে, আমিও বদলাইনি, তেমনি আছি।

শ্রাবণী একটি কথাও বলেনি। চুপচাপ চেয়ে ছিল শুধু। এতক্ষণের অস্বস্তিকর আশঙ্কটা গিয়ে হঠাৎ উল্টে তারই একটু কাছে সরে এসে বসতে ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু তাও পারেনি।

সেই রাত্রেই শ্রাবণী কথায় কথায় শুভেন্দুকে কলেজের ম্যাজিকের কথা বলেছিল। শুভেন্দু কোনরকম মন্তব্য করেনি, চুপচাপ শুনেছে। বিস্ময়ও গোপন করতে চেষ্টা করেছে। কয়েকটা কাগজ খুলে সম্পাদকীয় টিকা-টিপ্পনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছিল—তাই করে গেছে।

কিন্তু এই নীরবতা খুব স্বাভাবিক মনে হয়নি শ্রাবণীর। আজ ক'দিনই দাদার মুখে একটা স্পষ্ট বিরূপতার ছায়া লক্ষ্য করছে। সেটা কি কারণে জানে না।

শ্রাবণীর কেমন মনে হল, ওই বিরূপ গাম্ভীর্য তারই কারণে। মনে হল, পারলে দাদা কিছু বলতও হয়ত ওকে, পারছে না বলেই বলছে না। সম্ভব হলে গুণী দত্তর সঙ্গে অত মিশতে হয়ত নিষেধ করত ওকে।

শ্রাবণী নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। সে নিজের ইচ্ছেয় মেশে না কারো সঙ্গে সেটা বোঝাবে কেমন করে। এমন কি এই মেলামেশাটা যদি হয় শ্রাবণী খুব অখুশিও হবে না হয়ত। যার সামনে নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সজাগ থাকা যায় না, তার সামনে পড়তে কার সাধ? জীবনে এভাবে তো নিজেকে অভ্যস্ত

করেনি সে।

কিন্তু তবু দাদার মনোভাব বিসদৃশ লেগেছে তার। সে যা ভাবছে তাই যদি হয়, তা হলেই বা এই আচরণ কেন? ক'দিন আগেও তো ওই লোকের তুলনা নেই ভাবত সকলে।

পরের ক'টা দিনে বাড়ির হাওয়া সম্পূর্ণই বদলালো। শ্রাবণী ইতিমধ্যে নিজের সঙ্গে কিছু যেন ফয়সালা করে নিয়েছে, কিন্তু দাদার ওপর সে যেন খুব সদয় ছিল না।

ফাঁক পেলে দাদার টেবিল, বই, কাগজপত্র সে-ই গুছিয়ে রাখে। অনেক দিন ওগুলোর দিকে চোখ পড়েনি বলে সেদিন হাত দিয়েছিল। একটা বইয়ের ফাঁক থেকে বিদেশের রেজিস্ট্রি খামটা টুপ করে টেবিলের ওপর পড়ল। শ্রাবণী উল্টেপাল্টে দেখল। ইংল্যান্ডের ছাপ। বোনের কাছে শুভেন্দুর গোপন কিছু নেই, অবকাশ-মত তার চিঠিপত্রও সে-ই ফাইল করে রাখে। খুলে দেখল, ইংরেজীতে লেখা একটা বিয়ের কার্ড। পাঠিয়েছে রমা থাদানি। তারই বিয়ে।

খামটা আবার যথাস্থানে রেখে দিল। টেবিল গোছাল। ওদিকে মিলনী আব প্রশান্ত এসেছে, তাদের খেতে দিতে হবে। তারপর দেখতে দেখতে ভাইয়েরা এসে যাবে। সকলেই দিদির মুখাপেক্ষী। কাজে মন দিলে শ্রাবণীর কাজের শেষ নেই।

কিন্তু কাজে হাত দিলে বেশিক্ষণ আবার লাগেও না। পরদিন আগে ক্লাস শেষ হতে দুটোয় বাড়ি ফিরেছে। চারটে না বাজতে হাত খালি। যে মেয়ে ক'টা পড়তে আসে তাদের অনেকদিন পড়া কামাই হয়েছে। আজ তাদের আসতে বলেছে। কিন্তু তাদের আসতে আসতে পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা।

শ্রাবণী চুপচাপ নিজের ঘরে বসে ছিল।

বাবা ফিরলেন। শ্রাবণী কান পাতল, তিনি একা নন, সঙ্গে আর কেউ আছে। পরক্ষণেই যেন একটা আচমকা ধাক্কা খেয়ে গম্ভীর সে।

বাবা গুণী দত্তকে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, দ্যাখ কাণ্ড, শুভেন্দুর জন্যে গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে কি এখন ফিরবে। বোসো—

বাইরে থেকে বাবা এলেন বলেও শ্রাবণীর উঠে দাঁড়াবার কথা। কিন্তু সে যে বসেই ছিল খেয়াল নেই। গুণী দত্ত শিষ্টমুখে বসতে খেয়াল হল। আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

বাবাও বসলেন একটু। খবরের কাগজে চাকরি করার ঝামেলার কথা বললেন। চারদিকে তার ম্যাজিকের নামডাক হয়েছে বলে প্রশংসা করলেন। বাড়ির সকলে যে তার ম্যাজিকের নামে পাগল সে-কথাও বললেন।

এই দিন-কতক ধরে যে ম্যাজিকের স্তুতি থেমে গেছে সে খবর তিনি রাখেন না। শ্রাবণী স্থির দাঁড়িয়ে। বাবার সামনেই ওই অসংযত দুটো চোখ এক-একবার তার মুখের ওপর এসে থামছে, থমকাচ্ছে। এই প্রথম একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করছে শ্রাবণী। করতে চেষ্টা করছে। কাউকে ছেঁটে দেবার মত এ ধরনের কিছু দুর্বলতাই হাতড়ে বেড়াচ্ছিল সে। গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকাটা যত না নিলর্জ্জতা, তার থেকেও

বেশি হীনতা বাবার কাছে মিছে কথা বলাটা।

...বাবাকে বলেছে দাদার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা সরল লোক না হলে তক্ষুনি ধরা পড়ত। দাদা বাড়ি আছে কি নেই, সে খবর নিয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেই ধরা পড়ত। তখন শ্রাবণীর মাথায় লজ্জার বোঝা নামত।....কিন্তু তাতে এর বোধ হয় কিছু যায় আসে না।

বাবা উঠে গেলেন। যাবার আগে শ্রাবণীকে চা-টা করে দিতে বললেন। তিনি আড়াল হতে গুণী দত্ত তার দিকে ফিরল। চাউনির মধ্যে এ পর্যন্ত তবু কিছুটা আবরণ ছিল। এবারে যেন সেটা সম্পূর্ণ গেল।

বসুন—।

শ্রাবণীর হঠাৎ ইচ্ছে হল, সে-ও ফিরে চেয়েই থাকে। এটা কোনরকম সম্মোহন-বিদ্যে ফলানোর জায়গা নয় বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু সম্ভব নয়। বাবা ঘর ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজের ওপর দখলটা আর অতটা উঁচিয়ে নেই। বলল, না...বাবা এলেন, আপনি বসুন।

যান, দেখে আসুন। আমার জন্য কিছু আনবেন না, এখনি উঠব।

শ্রাবণী ফিরে তাকালো একবার। কিন্তু কিছু না বলেই চলে গেল।

খানিক বাদে শুধু এক পেয়ালা চা নিয়ে ফিরল। ভদ্রলোক একা বসে আছে বলে বাবাই তাড়া দিয়ে পাঠালেন তাকে।

গুণী দত্ত চা নিল। কিন্তু আনতে বারণ করা সত্ত্বেও খুশি হয়েই নিল।

শ্রাবণী বসল।

চা খেতে খেতে গুণী দত্ত বলল, বাইরে প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলাম—

দাদার অপেক্ষায়?

না, আসব কি আসব না ভাবছিলাম।

বাবা বললেন, দাদার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন?

চায়ের পেয়ালা কোলের কাছে নামল, দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর স্থির হয়ে বসল। জবাব দিল, দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উনি তাই ধরে নিয়েছেন। হাসল একটু, আপনার কাছেই যে এসেছি উনি কি করে বুঝবেন?....আপনার কলেজে গেছলাম, দরোয়ান বলল আপনি বাড়ি চলে এসেছেন।

বাবার কাছে মিথ্যা বলেনি বোঝা গেল। কিন্তু তার বদলে যে উক্তি করল তাও স্তম্ভিত হওয়ার মতই। শ্রাবণী বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। এই দ্বিধাশূন্যতা কতটা কৃত্রিম তাও বুঝে উঠছে না। খানিক আগে আর এক দফা প্রস্তুত হয়েই ঘরে ঢুকেছিল। সে সহজ হবে, সহজভাবে দু-পাঁচ কথা বলে তাকে বিদায় দেবে। যে সহজতায় সৌজন্যের অভাব নেই অথচ কোনরকম প্রশ্রয়ও নেই।

চেষ্টা সত্ত্বেও শুধুই একটা শুকনো প্রশ্ন নির্গত হল, বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন?

প্রশ্নটা করেই শ্রাবণীর অস্বস্তি বাড়ল। এই জিজ্ঞাসার আন্তরিক অর্থও হয়। তেমনি স্পষ্ট নিঃসঙ্কোচ জবাব শুনল, বাড়িতে ভালো লাগে না—

শ্রাবণী কি করবে? কি বলবে? আধ-খাওয়া চায়ের পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে

রেখেছে, ইচ্ছে হল উঠে ওটা নিয়ে কিছু কাজের অছিলায় ভিতরে চলে যায়। কিন্তু এই আত্মবিড়ম্বনা আরো বিরক্তিকর। অশোভন তন্ময়তায় দুটো চোখ শুধু তার মুখটা বেষ্টন করে নড়ছে, ঘুরছে। দৃষ্টি নয়, একটা স্পর্শের মত। মুখের ওপর অনুভব করা যায় যেন। শ্রাবণীর আবার ইচ্ছে হল, চোখে চোখ রেখে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর জিজ্ঞাসা করে, সে তার মুখের দিকে চেয়ে আর এই জড়ুলটার দিকে চেয়ে কি দেখে, কি পায়?

কিন্তু কিছুই বলা হল না। এ-রকম বলার ধাত নয় শ্রাবণীর। গুণী দত্তই যেন স্বেচ্ছায় অব্যাহতি দিল তাকে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে নিজের হাতঘড়ির দিকে চোখ ফেরাল।

সময় হল, চট করে রেডি হয়ে আসুন।

শ্রাবণী জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো শুধু।

ছটায় শো—

শ্রাবণীর কানের কাছটা গরম ঠেকছে। বলতে যাচ্ছিল, তাতে আমার কি? সামলে নিয়ে মাথা নাড়ল, বলল, না, আমার কাজ আছে।

গুণী দত্তর মুখে অসহিষ্ণু তাগিদ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—কি কাজ?

শ্রাবণী রাগ করবে না অবাক হবে? লোকটার কাণ্ডজ্ঞান বলে সত্যিই কি কিছু নেই নাকি। কিন্তু এ-রকম নিঃসঙ্কোচ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাই এযাবৎ শ্রাবণীর যত অস্বস্তির কারণ। বলল, অনেক কাজ, তাছাড়া মেয়েরা পড়তে আসবে।

গুণী দত্তর গলার স্বরে এবারে ঈষৎ বিস্ময়-মিশ্রিত হতাশা।—মেয়ে পড়ানো বড় হল।

তার ইচ্ছেটা একবার নাকচ করতে পেরে শ্রাবণী যেন এতক্ষণে নিজের স্বাভাবিক সত্তা ফিরে পেয়েছে। সহজ শান্ত মুখেই জবাব দিল, এ-ই কাজ যখন, ছোট ভাবলে মুশকিল....

গুণী দত্ত আবার ঘড়ি দেখল। হাসছে। বলল, আমাকে ফেরালেন বটে, কিন্তু এরপর আপনার পড়াতে ভালো লাগবে না বলে গেলাম। চলি, আবার দেখা হবে—

হাসিমুখেই প্রস্থান করল। প্রথমে ও-ঘরে তারপর গলিতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

শ্রাবণী তার পরেও কতক্ষণ বসে ছিল খেয়াল নেই।

গুণী দত্তর আসার খবরটা শুভেন্দু শুনল রাত্রিতে খাবার টেবিলে বসে। আসার খবরটা ঠিক নয়—এ পর্যন্ত বহুবার সে এ বাড়িতে এসেছে। শুনল, বিকেলে চারটেয় তার প্রতীক্ষায় গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকার খবর। বাবা সাদা মনেই বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা না হয়ে গেলে অপেক্ষা করে করে হয়ত ফিরেই যেত।

শ্রাবণীর মনে হল, শুধু দাদা নয়, ভাইয়েরাও একটু অবাক হয়েছে। তাদের আহারে নির্বাক মনোযোগ লক্ষ্য করল। বাবা যার কথা বলেছেন, দাদার অনুপস্থিতিতে সে অনেক দিন বাড়ি এসেছে—এসে আসর জমিয়েছে। তবু শ্রাবণী খুব একটা সঙ্কোচ বোধ করছে না। আজ এই প্রথম ওই প্রবল মানুষের ইচ্ছা প্রতিহত করতে পেরে তার জোর বেড়েছে। তাকে ফেরাতে পেরে সুস্থ স্বাভাবিক বোধ করেছে।

খাওয়ার পরে দাদা এক ফাঁকে ঘরে ডাকল তাকে। বলল, কথা আছে, একবার আসিস।

কি কথা শ্রাবণী তাও অনুমান করতে পারে। কিছু মনে হলে দাদা তাকে ডেকে না বলা পর্যন্ত সুস্থির হতে পারত না। এবারই দিন-কতক একেবারে চুপচাপ দেখছে।

সে ঘরে আসতে শুভেন্দু বলল, বোস্—

শ্রাবণী বসল, দাদার গম্ভীর মুখ দেখে কৌতুক বোধ করছে। বলল, খুব সাঙ্ঘাতিক কথা মনে হচ্ছে—

না....তোর ভালোর জন্যেই তোক একটু বলে রাখা দরকার ভাবলাম।

ভণিতা ছেড়ে বলে ফেলো—

শুভেন্দু হাসতে চেষ্টা করল একটু।—সে-রকম কিছু নয়, ওই গুণী দত্তর কথাই তোকে একটু বলে রাখব ভেবেছিলাম। লোকটা মস্ত ম্যাজিসিয়ান....সবই ভালো, কিন্তু আমাদের সঙ্গে তার এভাবে মেলামেশার আগ্রহ আমার ঠিক ভালো লাগছে না। জাহাজে জুলি স্যান্ডারসনের মত একটা ঠুনকো মেয়ের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক দেখেছি....

এটুকু ব্যক্ত করতেই কান লাল। শ্রাবণী স্থির চেয়ে আছে। দাদা কি বলবে বা কোন্ প্রসঙ্গে বলছে অনুমান করেছিল বটে, কিন্তু এ-রকম অপরিচ্ছন্ন ইঙ্গিত আশা করেনি। অথচ ইঙ্গিত যে মিথ্যা নয় দাদার মুখের দিকে চেয়েই অনুভব করেছে।

তবু শ্রাবণী চুপচাপ আরো একটু নিরীক্ষণ করল তাকে। তারপর খুব ঠাণ্ডা মুখে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, রমা থাদানি কে?

শুভেন্দু সচকিত, বিস্মিত।—কেন?

বইয়ের মধ্যে বিয়ের টেলিগ্রাম দেখলাম, গ্রিটিং রিপ্লাই পাঠিয়েছ, না ভুলে গেছ?

পাঠিয়েছি—

চকিত বিমূঢ় অবস্থাটা শ্রাবণীর চোখ এড়ায়নি। হালকা প্রশ্ন কবল, বিলেতে থাকতে তোমাকেই বিয়ে-থাওয়া করতে পারে এমন ভরসা দিয়েছিল নাকি?

শুভেন্দুর কান মুখ আরো লাল। জবাবে বিরক্তিই বেশি প্রকাশ পেল। বলল, কি বাজে বকিস, আমি কি বলছি আর তোর যত সব—

থাক্ তাহলে। শ্রাবণী তক্ষুনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। দরকার হলে এই দাদাটির ওপরেও অনায়াসেই বড়র মত প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে। অনেকের ওপরেই পারে। এযাবৎ শুধু একজনের বেলাতেই ব্যতিক্রম ঘটেছে।—কি বলছিলে বলো। দিনকতক আগেও তো জুলি স্যান্ডারসনের অনেক প্রশংসা শুনেছিলাম তোমার মুখে—

শুভেন্দুর ক্ষোভ একেবারে যায়নি। একটু আগে বড় বেশি অপ্রস্তুত হয়েছিল সে। বলল, এখনো নিন্দে করছি না, গুণী দত্তর জন্য সে অনেক করেছে, গুণী দত্ত নিজে বলেছে, ও না থাকলে তার ম্যাজিসিয়ান হওয়া হত না।....তা হলেও সে হোটেলে নেচে পয়সা রোজগার করত, আর গুণী দত্ত বিলেতে তার সঙ্গেই থাকত। তোর জন্যে ভাবতে হয় বলেই জানিয়ে রাখা, এরপর যা ভালো বুঝিস, করবি।

শ্রাবণী আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথাও নাড়ল একটু, করবে।

অস্ফুট স্বরে ঈষৎ আশ্বস্তও করল যেন, বলল, আর ভেবো না। তারপর নির্লিপ্ত মুখেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কিন্তু রাজ্যের বিরক্তিতে ভিতরটা ছেয়ে গেছে। শয্যা নেবার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত সেই বিরক্তি গেল না। দাদা তাকে ভালবাসে, তার ভাল চায়। সে উচিত কথাই বলেছে, উচিত কাজ করেছে। এ ধরনের লোকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সংস্রব না থাকাই ভালো। কিন্তু এর বদলে দাদা যদি ওই মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা কিছু বোঝাপড়া করে আসত, তাকে বাড়ি আসতে নিষেধও করত, আর তারপর শ্রাবণীকে ডেকে বলত, এই জন্যে এই করে এলাম, এই বলে এলাম—সেটা এত খারাপ লাগত না। তার মর্যাদা আর পৌরুষ অন্য রকম। কিন্তু সাত হাজার মাইল দূরের এক মেয়ের বিয়ের খবরে নিজেকে পরিত্যক্ত বোধ করছে যে তার মুখে এ-রকম মিনমিনে সতর্কবাণী শুনতে ভালো লাগে না।

ভালো না লাগার আসল কাবণটার দিক থেকে শ্রাবণী সন্তর্পণে মুখ ফিরিয়ে থাকতেই চেষ্টা করল। আসল কথা, তাকে আর ওই একজনের সামনাসামনি এসে না দাঁড়াতে হলেই সে স্বস্তি বোধ কবত। আজ বিকেলে যাকে ফেরাতে পেরে নিজের সুস্থ সত্তার জোরটাই বড় করে তুলতে চেয়েছিল, তার মধ্যে ফাঁক কিছু ছিলই। সামনে এসে দাঁড়ালে এর পরেও অসহায় বোধ করবে না, সেই পরিপূর্ণ আস্থা নিজের ওপর নেই।....বলে গিয়েছিল, এরপর আর মেয়ে পড়াতে ভালো লাগবে না।

ভালো লাগানোর জন্য নিজের সঙ্গে বড় কম যুঝতে হয়নি শ্রাবণীর।

॥ ১১ ॥

তুমি দেখবেই বা কি করে, জানবেই বা কি করে, তুমি কি নিজের মধ্যে আছ—তুমি তো দেখছি হাওয়ায় ভেসে বেঁড়াচ্ছ—

মিসেস জেনিফার উড তার বক্তব্য-শেষে তপ্ত মন্তব্য ছুঁড়েছিল।

তোমাকে আবার বলব কি, তোমার চোখ আছে না কান আছে। চোখ কান খুইয়ে তুমি এখন কোন আবেগের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমিই জানো। আমাদের নিয়ে মাথা ঘামানোব আগে তোমার ব্যাপারখানা কি শুনি?

জুলি স্যান্ডারসন বসে ছিল। হাসিমুখে তরল টিপ্পনী কেটেছিল।

দুজনার কাছ থেকে দুটো একই ধরনের অনুযোগেব ঝাপটা খেয়ে গুণী দত্ত থমকেছিল। উনিশ বছরের এক দুর্দম-মতি উদভ্রান্ত ছেলের মত সে কি সত্যিই আজও হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে আর অন্ধ মত্ত আবেগে বিহ্বল হয়ে ঘুরছে?

কথাটা উঠেছিল শিরিনের প্রসঙ্গে। শ্রাবণীদের কলেজে যে সন্ধ্যায় ম্যাজিক দেখিয়ে এসেছিল—সেই রাতে একবার। আর একবার অমোঘ দুরতিক্রমণীয় আকর্ষণে যেদিন তাদের গলিব মুখে দাঁড়িয় ছিল—পরে ডাকা সত্ত্বেও শ্রাবণী আসেনি—সেই রাতে ম্যাজিক দেখানোর পর দ্বিতীয়বার।

প্রথম বারে মিসেস উডের মুখে শুনেও গুণী দত্ত খুব খেয়াল করেনি। পরে

খোঁজ নেবে ভেবেও ভুলে গেছে। অথচ ভুলে যাবার কথা নয়। কারণ জেনিফার উড শিরিনের কথা বলছিল। শিরিনকে নিয়ে আবার সমস্যা হয়েছে সেই কথা। বলেছিল, তোমার ওই আদরের মেয়ের হঠাৎ আবার কি হল কে জানে, কারো সঙ্গে কথা বলে না, হাসে না, ভালো করে খায় না দায় না—দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে বসে থাকে, ডাকলে রেগে যায়—কি হয়েছে দেখো—

কিন্তু সত্যিই দেখার চোখও ছিল না মনও ছিল না গুণী দত্তর। তাই ভুলে গেছে। এমন কি জুলিকেও জিজ্ঞাসা করেনি। তার সঙ্গেই মেয়েটার যত ভাব, যত খাতির।

এরপর সে-দিন ম্যাজিক দেখানোর ফাঁকেই হঠাৎ একসময় মনে হয়েছে, শিরিনকে দেখছে না। মিসেস উডকে জিজ্ঞাসা করতে তার দিকে চেয়ে সে শুধু গুরুগম্ভীর একটা শব্দ বার করেছে গলা দিয়ে, হুঁঃ।

গুণী দত্ত অবাক হয়ে জুলির দিকে ফিরেছে।—কি ব্যাপার?

জুলি লঘু গাম্ভীর্যে জবাব দিয়েছে. ব্যাপার গভীর। এখন এ নিয়ে মাথা ঘামালে ম্যাজিক মাথায় উঠবে, ওদিকে কি করবে ভাবো গে যাও—

বাড়ি ফিরে গুণী দত্ত শিরিনের ঘর খোলাই দেখেছে। একফালি সরু বারান্দার মুখে প্রথমে জুলির ঘর। বারান্দা ধরে আরও কয়েক পা এগোলে উল্টোদিকে শিরিনের ঘর।

শিরিন খাটে ঠেস দিয়ে বসে ছিল। পায়েব শব্দে ঘাড় ফেরাল। সোজা হয়ে বসল, মুখখানা ধারালো কঠিন দেখাচ্ছে। চাঁদ সাহেবের মৃত্যুর পর যে নির্বাক স্তব্ধতা দেখেছিল সে-রকম নয়। ভিতরে রাগ আব ক্ষোভ পুষলে যে রকম গনগনে দেখায় শিরিনের মুখ অনেকটা সেই বকম। বোম্বাইয়ে প্রথম সাক্ষাতে যেমন দেখেছিল, তারপর হোটেলে চাঁদ সাহেবের সামনে মদ নিয়ে বসতে দেখে যে মূর্তি দেখেছিল, প্রায় সেই বকম।

তার কাছেই বসল, কি হয়েছে?

শিরিন জবাব দিল না।

গুণী দত্ত ক্লান্ত, মেজাজ যে কারণেই হোক খুব প্রসন্ন নয়। তাই একই প্রশ্ন আর একটু অসহিষ্ণু শোনালো।—কি হয়েছে?

শিরিন মাথা নাড়ল। অর্থাৎ কিছু হয়নি।

শো-তে যাওনি কেন?

নিরুত্তর।

ওটা খেয়াল-খুশিমত যাবার জায়গা নয়, ওখানে নিয়ম কবে যেতে হবে. দেখতে হবে শিখতে হবে—কেন যাওনি?

আমার ভালো লাগে না।

স্পষ্ট জবাব। গুণী দত্ত অবাক। একরোখা মেয়ের কোথাও ভীরুতার লেশমাত্র নেই। অথচ জবাবটা যে সত্যি নয় তাও জানে। তার বুদ্ধি আর একাগ্রতা দেখে কতদিন মনে মনে উৎফুল্ল হয়েছে ঠিক নেই। পর পর কতগুলো দিন তার প্রতি

মনোযোগ ছিল না, শেখানোতেও ছেদ পড়েছিল সেই অভিমান কিনা বুঝল না।

এসব আর শিখতে চাও না?

মাথা নাড়ল। চায় না। বলল, আমার এখানেও থাকতে ভালো লাগে না, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দাও—আমি এখানে থাকতে চাই নে।

ঝাঁজালো জবাব পেয়ে গুণী দত্ত একটু আশ্বস্ত হল। রাগের ব্যাপারই তাহলে। ঠাণ্ডা মাথায় রাগ কেন বুঝতে চেষ্টা করল।—আচ্ছা কি হয়েছে আগে শুনে নিই, তারপর ব্যবস্থা করব।

কিন্তু রাগ পড়ল না, কিছু বলার লক্ষণও দেখা গেল না।

গুণী দত্ত তার পিঠে হাত রাখল। মনে হল, লালচে মুখখানা ধারালো বটে, কিন্তু বেশ শুকনোও। মোলায়েম করে বলল, মিসেস উডের কাছে শুনলাম, তুমি ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করো না, কারো সঙ্গে কথা বলো না, দরজা বন্ধ করে বসে থাকো, কেন?

আমার খুশি। সাফ ঝাঁজালো জবাব।

মেজাজ দেখে এ সত্যিই লাজবন্তীর মেয়ে কি চাঁদ সাহেবের মেয়ে গুণী দত্তর এক-এক সময় সেই সন্দেহ হয়। হেসে বলল, খুশি কোথায়, আমি তো স্পষ্ট দেখছি রাগ।

কিন্তু সাধ্যসাধনা করেও রাগের হেতু বোঝা গেল না। বার বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও অবাধ্য মেয়ের মতই মুখ গোঁজ করে বসে রইল।

জুলি তখনো ফেরেনি, গুণী দত্ত মিসেস উডের ঘরে এলো। মিসেস উড ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিল। শরীরটা ক্রমেই মোটার দিকে ঘেঁষছে বলে অল্পে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঘরে সে একাই ছিল, মঞ্চের সব গোছগাছ তদারক করে এডওয়ার্ডের ফিরতে রাত হয়।

গুণী দত্ত জিজ্ঞাসা করল, শিরিনের কি হয়েছে বলো তো?

মিসেস উড তার পায়ের কাছের নিচু টুলটার দিকে তাকালো একবার। অর্থাৎ যে এলো, ইচ্ছে থাকলে সে বসতেও পারে। কিন্তু গুণী দত্ত বসল না, আরো একটু কাছে এসে দাঁড়াল শুধু।

ইজিচেয়ার থেকে মাথা না তুলে মিসেস উড প্রথমে ঠাণ্ডা অনুযোগ করে নিল একপ্রস্থ, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানোর খোঁচা দিল। এ অভিযোগ তার নিজেরই, শিরিনের নয়। ম্যাজিক অথবা তার ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কেউ বা এমন কিছু গুণীডাটাকে টানবে সেটা তার সব থেকে বেশি অপছন্দ।

আসল প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়নি তাও অবশ্য খেয়াল আছে মিসেস উডের। অনুযোগ শেষ করে কয়েক মুহূর্ত ভাবল চুপচাপ। তারপর সোজা হয়ে বসে হাত বাড়িয়ে গুণী দত্তর বুকের কাছের জামাটা মুঠো করে ধরে কাছে টেনে নিয়ে এলো। মেদবহুল বক্ষের কাছাকাছি এনে আবার আগের মতই ইজিচেয়ারে মাথা রাখল। গলার স্বর নামিয়ে বলল, তুমি যে রসের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছ তার খবর পেয়ে যায়নি তো মেয়েটা? আর ইউ সিওর, ইট্‌স নট্‌ জেলাসি!

গুণী দত্ত হকচকিয়ে গেল হঠাৎ। এ-রকম সম্ভাবনা কখনো মনের কোণেও উদয় হয়নি। ওভাবে ঝুঁকে দাঁড়াতে অসুবিধে হচ্ছিল, পায়ের কাছে নিচু টুলটাতে বসল সে। মিসেস উড নিজের হাঁটু দিয়ে তার হাঁটুর কাছটা ঠুকে দিল, আই থিঙ্ক ইট্‌স দ্যাট্‌, হোয়াট্‌ ডু ইউ সে?

গুণী দত্ত বিমূঢ় খানিকক্ষণ। একটা সম্ভাবনার ওপর আঙুল ফেলতে পেরে জেনিফার উড উৎফুল্ল।

বাজে বোকো না, জুলি কি বলে?

বিরক্তি গোপন থাকল না। ফলে জুলির কথাই তার সর্বাগ্রে মনে হয়েছে। জুলির বক্র হাব-ভাব অনেকদিন লক্ষ্য করেছে। অনেক সময় স্থূল কৌতুকে মেয়েটাকে তার দিকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছে। সে-ই ওর মাথায় কিছু ঢোকালো কিনা কে জানে। সমবয়সীর মত ভাব দুজনার। জুলি অন্তত সবই বলতে পারে, কোনো কথা তার মুখে আটকায় না।

জুলি। মিসেস উড তার অজ্ঞতার বহর দেখছে যেন।—তুমি এ বাড়িতে থাকো নাকি? ওদের ভাব ঘুচে গেছে। মেয়েটা আমার সঙ্গে যাও দুই একটা কথা বলে, ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। জুলি জানবে কি করে? সেদিন কি নিয়ে হাত ধরে সাধতে গিয়েছিল, হাত ছাড়িয়ে দিলে গালে ঠাঁই করে এক চড় বসিয়ে—আমার সামনে। জুলি বলে তার পরেও হাসল হি-হি করে, আর কেউ হলে মুশকিল হত। তোমার ওই মেয়েটাও বাপু কম বেয়াড়া নয়। পরে আবার আমাকে এসে বলে, তার ঘর বদলে দিতে হবে, আর জুলির ঘরের সামনে থাকবে না—আর তার মুখও দেখতে চায় না।

গুণী দত্তর মুখে আর কথা নেই। কি হতে পারে ভেবে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু একটু আগের সন্দেহ আরো দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল। জুলিই কিছু ক্ষতি করে থাকবে মেয়েটার, কিছু একটা জটিলতার সৃষ্টি করে থাকবে। নইলে মিসেস উডেরও এই সন্দেহ কেন—প্রথমেই ঈর্ষার সম্ভাবনাটা তার মনে এলো কেন?

পায়ের শব্দে দরজার দিকে তাকালো। এডওয়ার্ড উড দেবী সন্নিধানে ভক্তের মত গুণীডাটাকে রমণীটির পদপ্রান্তে মুখ বুজে বসে থাকতে দেখে চকিত চপলতায় থমকে দাঁড়াল। মিসেস উড তেমনি ইজিচেয়ারে মাথা রেখেই তার দিকে চেয়ে ভুরু কোঁচকালো।

ভিতরে ঢোকার আগে জানান দিয়ে আসবে—উই কুড্‌ হ্যাভ বিন কট।

এডওয়ার্ড উডের স্বভাবসুলভ ছট্‌ফটে অপ্রস্তুতের ভঙ্গি চোখে পড়ল না, গুণী দত্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

জুলির ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা দুটো আধাআধি ভেজানো। গুণী দত্ত সেদিকে এগিয়ে গেল।

হ্যালো, কাম ইন্‌! একটু আগে মিসেস উডের ঘরে গোমড়া মুখ করে কি আলোচনা হচ্ছিল দেখলাম—

অভ্যর্থনা জানিয়ে শয্যায় আধশোয়া হয়ে উঠে বসল জুলি। নিজের ঘরে পরিপাটি

বেশবাস করে কেউ শয্যা আশ্রয় করে না। তাছাড়া এ সময় কেউ ঘরে আসবে বলেও প্রস্তুত ছিল না। তবু ভিতরে একটা বিরূপতার ছায়া পড়েছে বলেই হয়ত গুণী দত্তর চোখের এই শিথিল ত্রস্ত মূর্তি দৃষ্টিকটু ঠেকল। কলকাতায় আসার পর থেকে তার ছ'বছরের বিদেশ-দেখা চোখের পরিবর্তন ঘটেছে। ঘটছে। অদূরের চেয়ারটা একটু কাছে টেনে নিয়ে বসল।—শুয়ে পড়েছ, খাওয়াদাওয়া শেষ?

এডওয়ার্ডের সঙ্গে বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।

ও....। শিরিন খেল কিনা খবর নিয়েছ?

জুলির চোখেমুখে হাল্‌কা বিস্ময়। বিস্ময়ের থেকেও কৌতুকের আভাস বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠল। তরল বিড়ম্বনার সুরে জবাব দিল, সে খবর নেবার দায়ও আমার নাকি? তুমি নাও না।

গুণী দত্ত জুলির কথার ধরন জানে। খবর না নিয়ে থাকলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এই বেশেই শিরিনের ঘরের দিকে ছুটত। তারপর ফিরে এসে হয়ত এই গোছেরই ঠাট্টা-তামাশা করত। নিজের অগোচরে গুণী দত্তর মনটা তবু এই একজনের প্রতি তিক্ত হয়ে ওঠারই ফাঁক খুঁজছে যেন। একটু থেমে গম্ভীর মুখে বলল, মিসেস উডের সঙ্গে তোমাদের কথাই হচ্ছিল।....শিরিনের কি হয়েছে?

নিরীহ মুখ করে জুলি জবাব দিল, শিরিনের কিছু হয়ে থাকতে পারে, আমার তো কিছু হয়নি।

শিরিনের কি হয়েছে?

জুলির অসহায় মূর্তি।—কি করে জানব, কাছে গেলে তো মেয়ে মারতে আসে। কনুইয়ে ঠেস দিয়ে হাতের ওপর মুখ রেখে গোটাগুটি তার দিকে ফিরল।—তা তোমার হঠাৎ এই মুখ কেন, যে-ভাবে এখন কাটাচ্ছ দিনের পর দিন, শিরিন বলে কোনো মেয়ে আছে এখানে আর তার প্রতি তোমার ভয়ানক রকমের কিছু দায়িত্ব আছে—সেটা তোমার খেয়াল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম।

জুলি এভাবে তার দিকে ফিরতে গুণী দত্তর দৃষ্টি যেন আরো ব্যাহত হল। বুকের স্বল্প আবরণে আরো একটু ঢিল পড়ল। মোমের মত সাদা নগ্ন বাহু, কাঁধ, গলা। দায়িত্বপ্রসঙ্গে জুলির খোঁচাটা তারই কথার পুনরুক্তি। এই দায়িত্বের কথা সে-ই একাধিকবার জুলিকে শুনিয়েছে। তাছাড়া সম্প্রতি কতগুলো দিন কোনো হিসেবের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল না—এও সত্যি কথাই। মঞ্চে ম্যাজিক দেখানোটাই শুধু বন্ধ হয়নি, নইলে আর কোনোদিকে বা কারো দিকে তার চোখ ছিল না।....মিসেস উডও এই ঠেস দিয়েছিল। কিন্তু জুলির উক্তি তিক্ত লাগল।....শিরিনের কি হয়েছে বা কি হতে পারে তা একমাত্র ও-ই জানে তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই।

বিরক্তি চাপা থাকল না, গুণী দত্ত বলে উঠল, বাজে কথা থাক, শিরিনের মাথায় তুমিই কিছু ঢুকিয়েছ কিনা আমি জানতে চাই।

জুলিও গম্ভীর তক্ষুনি। কিন্তু চোখের কোণে কৌতুক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ছদ্মচিন্তার প্রয়াস। শেষে কিছু মনে পড়েই গেল যেন। নির্লিপ্ত সুরে বলল, তা হতেও পারে, হয়ত আমার জন্যেই মেয়েটার মাথা বিগড়েছে—

গুণী দত্তর সন্ধানী দৃষ্টি তার মুখের ওপর বিচরণ করছে।

প্রতীক্ষার জবাবে একটা লঘু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েই যেন জুলি ফসফস করে বলে গেল, অত রাতে যে মেয়েটা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়বে কি করে জানব। এডওয়ার্ডকে এখানে দেখে হকচকিয়ে কাঠ একেবারে, তারপরেই নিজের ঘরের দিকে দৌড়। পরদিন থেকেই এই মেজাজ দেখছি।

লন্ডনে সেই আশা-আশ্বাস সহায়-সম্বলহীন সঙ্কট, সেই হৃৎপিণ্ড দুমড়নো সর্বনাশা শীতের হিমেল রাতে, এই জুলিকে—এই জুলি স্যান্ডারসনকেই কি বড় সুন্দর, বড় বিচিত্ররূপিণী মনে হয়েছিল তার? গুণী দত্তর চোখে গলিত ঘৃণা উপচে উঠতে লাগল। এমন কদর্য আর কুৎসিত কখনও মনে হয়নি তাকে। হাসছে এখনো, হাসিমুখে বলছে, অত রাতে ঘরে ঢুকে এডওয়ার্ডকে এখানে দেখে মেয়েটা হকচকিয়ে কাঠ একেবারে। এখানে বলতে জুলি ঘরটা দেখায়নি, ইঙ্গিতে শয্যাটাই দেখিয়েছে।

গুণী দত্ত সংযত করল নিজেকে। না, সে নীতি-দুর্নীতির একটা কথাও বলবে না। সে কারো প্রবৃত্তির প্রহরী নয়। কিছু বলতে গেলেই বরং খেলো শোনাবে। জুলি হাসবে, উল্টে তাকেই হয়ত অমনি নগ্ন অমনি কদর্য কোনো স্মৃতির আবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে—একদিন শুধু সে-ই তার একান্ত দোসর ছিল, সে কথা বলেও বিদ্রূপ করতে ছাড়বে না হয়ত। তার থেকে কাজের কথা বলবে গুণী দত্ত, উত্তাপ-বর্জিত সাদাসিধে কাজের কথা।

বলল, জুলি, মিসেস উডের কাছে শিরিন তার অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা করে দেবার কথা বলছিল। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তার ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আমি কারো সঙ্গে আপস করতে রাজী নই। আমার ইচ্ছে, তুমি আর কোথাও একটা ঘর দেখে নাও।

জুলির মুখ-ভাব বদলাল। ঠোঁটের ফাঁকের হাসির আভাস গেল। ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল খানিক, তারপর রাগত স্বরে বলে উঠল, তোমার মত ইডিয়টের পাল্লায় পড়েছি, যাব কি করে? তুমি মুখেই শুধু ওই মেয়েটার দায়িত্ব সম্বন্ধে বড় বড় কথা বল, দায়িত্বজ্ঞান বলে তোমার কিছু আছে? নাও না দায়িত্ব, এ বাড়ি কেন, তোমাদের এই দেশই ছেড়ে যাচ্ছি। যেতে পারলে তো বাঁচি এখন—

গুণী দত্তর দুর্বোধ্য লাগছে। কথাগুলোর মধ্যে কোন কুৎসিতের ছায়া নেই, বরং যেন কিছু একটা সত্যের তাপ আছে। গায়ের ঢাকনাটা গলা পর্যন্ত তুলে জুলি উঠে বসল। অবুঝ কাউকে ধরে দুটো ঝাঁকানি দেবার মত কৃত্রিম ঝাঁজ-ভরা চোখের দৃষ্টি। বলল, মগজে সাদা পদার্থ কিছু আছে? আমার দরজা থেকে শিরিনের ওই দরজা কদ্দূর? কতটুকু? এডওয়ার্ড কোনদিন এ-ঘরে আসতে চায়নি, এ-ঘরটা তার লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য ওই ঘর, ওই ঘরে—আমি না আটকালে এতদিনে সে ওখানেই যেত, তোমার মত বুদ্ধু তাকে ঠেকাতে পারত না।

গুণী দত্ত এখন হাঁ করেই চেয়ে আছে তার দিকে। এখন আর কিছু দুর্বোধ্য লাগছে না, এখন সবই বুঝছে। তবু নির্বাক, বিমূঢ় খানিকক্ষণ। দিশা ফিরল। মুখের রঙ বদলাতে লাগল। একটা একটা করে কঠিন রেখা পড়তে লাগল। জুলি তাকে

দেখছে চেয়ে চেয়ে, এই রূপান্তরটুকু উপভোগের বস্তু যেন। এবারে সময়োচিত সতর্কতা অবলম্বনের দিকে ঝুঁকল।—তুমি আবার সাততাড়াতাড়ি গোঁয়ারের মত এডওয়ার্ডকে নিয়ে পড়তে যেও না, তাকে আমিই সামলাতে পারব, মাঝখান থেকে বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার হবে একটা, সব কিছুতে চিড় খাবে। তাকে ভয় যা দেখানোর আমি দেখিয়ে রেখেছি।

চোখে চোখ রেখে ফিক করে হেসে উঠল জুলি। সেই হাসিই কিন্তু আর কুৎসিত লাগছে না, কদর্যও লাগছে না। কিন্তু গলার ঝাঁজ বদলায়নি, বলল, ও বেচারাকেই বা দোষ দেব কি, পুরুষমানুষ তো, তোমার থেকেও বড় ইডিয়ট মার্কা আমাদের ওই সম্রাজ্ঞী—কেবল টাকাই গুনছে আর শরীরে মুটোচ্ছে, কি যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই।

রসিকতায় যোগ দেবার মত মনের অবস্থা নয় গুণী দত্তর।—তুমি এসব আমায় এতদিন বলনি কেন?

জবাবে জুলি সেই কথা বলল, যে কথা ঘুরেফিরে পরেও বহুবার মনে হয়েছে গুণী দত্তর। জুলি বলল, তোমাকে আবার বলব কি, তোমার চোখ আছে না কান আছে। চোখ কান খুইয়ে তুমি এখন কোন্ আবেগের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমিই জানো। বলতে বলতে জুলির দু'চোখ কৌতুকে উপচে উঠেছে। তারও খোঁজ নেবার আছে কিছু। বলেছে, আমাদের নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে তোমার ব্যাপারখানা কি বলো শুনি।

কিন্তু জবাব আশা করেনি বোধ হয়। কারণ, একটু বাদে গুণী দত্ত নিরুত্তরেই উঠে চলে গেল যখন তখনো আর ডেকে বাধা দিল না।

ম্যাজিসিয়ান গুণীডাটা নিজেও জীবনের ম্যাজিক বড় কম দেখল না। এরপরে যা দেখল সেটা বড় গোছের কিছু নয়। কিন্তু ছোট আর বড়র বিচার মনের কাছে। যে দেখে সে শুধু বৈচিত্র্যটুকুই দেখে।

পরে বলতে পরদিনই। শিরিনের খোঁজ নেবার জন্য গুণী দত্ত তার ঘরে ঢুকে দেখে সেখানে জুলি বসে। হাতে বোনার কাঁটা, কোলে উলের বাণ্ডিল। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে শিরিন গুম হয়ে বসে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে।

পায়ের শব্দ অনুমান করেই ঘুরে তাকালো। গুণী দত্ত অবাক। শিরিন যেন কোনো অপরাধীকেই নাগালের মধ্যে পেয়েছে, তার চোখমুখে তাজা রোষ।

কি হল....

তুমি জুলিকে এখান থেকে চলে যেতে বলেছ?

এরকম পরিস্থিতিতে মৌন-অবলম্বন ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই বোধ হয়। জুলির মুখে নির্লিপ্ত গাম্ভীর্য।

তপ্ত-কণ্ঠে শিরিন তার শেষ সিদ্ধান্ত শোনালো।—ও গেলে আমাকেও নিয়ে যেতে বলেছি। গেলে দুজনেই যাব।

হাসা সম্ভব হলে গুণী দত্ত হাসত। হাসারই ব্যাপার। হাসতে না পারুক, শিরিনের এই পাল্টা রাগ দেখে গুণী দত্ত সুস্থ বোধ করছে। গত রাতের রূঢ়তার জন্য এরপর

জুলির কাছে অনুতাপ প্রকাশ করতে হবে না। তার দিকেই ফিরল একবার, বোনার গাম্ভীর্যের আড়ালে বসে মজাই দেখছে। শিরিনের উদ্দেশে গুণী দত্ত হাল্‌কা ফয়সালার সুরে বলল, তাহলে দুজনের কারোই গিয়ে কাজ নেই।

এরপর এডওয়ার্ডকে কাছে পেয়েও কিছু বলেনি। কিছু বলা মানে এই সব কিছুতে ভাঙন ধরানোই বটে। এ নিয়ে কথা উঠলে মিসেস উডের কানেও যাবে। ব্যাপারটা তখন আর ছোট থাকবে না, সেটা বড় নিষ্পত্তির দিকে গড়াবে। তার থেকে জুলি যদি সামলাতে পারে সামলাক। অনেক কিছুই পারে জুলি। জীবনটাকে অতি সহজেই বিলিয়ে দিতে পারে। মাড়িয়ে যাও, দুমড়ে যাও, তছনছ করে দিয়ে যাও—সবই অনুভব করবে কিন্তু অভিযোগ করবে না।

নিজের কাছে এইখানেই যেন ছোট হয়ে গেছে গুণী দত্ত। ক'টা দিন তার সামনে আসতেও সঙ্কোচ বোধ করলে। আসলে সেই রাতে জুলি স্যান্ডারসনকে কুৎসিত দেখেছিল কেন? ঘৃণা করেছিল কেন? শিরিনের জন্যে? এডওয়ার্ড জুলির ঘরে রাতের অভিসার যাপন করেছিল বলে? না। শিরিন উপলক্ষ। এডওয়ার্ডের আসাটাও উপলক্ষ। আসলে যে-কোন অজুহাতে জুলিকে সে ঘৃণা করতেই চেয়েছিল। কুৎসিত দেখতেই চেয়েছিল। যে-মন পতঙ্গের মত শ্রাবণী নন্দীর দিকে ধাওয়া করতে চাইছে, অদৃশ্য থেকে জুলি যেন তাকেই টেনে টেনে ধরছে। কিন্তু সঙ্গত কারণে তাকে কুৎসিত দেখতে পেলে অসুন্দর দেখতে পেলে বিবেকের আঁচড় পড়ে না, কৃতজ্ঞতার বোঝাও হালকা হয়। বিলেতের রেস্তরাঁর সস্তা নাচিয়ে মেয়ে জুলি স্যান্ডারসন আজ যে দাবিই করুক, দেহশুচিতার দাবী কখনও করেনি। রাতের নিভৃতে তার ঘরে কে এলো না এলো তাই দিয়ে তার বিচার হাস্যকর নয় তো কী? শ্রাবণী নন্দীকে কেন্দ্র করে তার এই বেপরোয়া নতুন অধ্যায়ে কতবার মনে হয়েছে, সমুদ্রের বুকে জাহাজের ডেকে জুলির সেই নিবিড় সান্নিধ্যের দৃশ্যটা শুভেন্দু নন্দী না দেখলেই ভালো ছিল। এ সত্যটা গুণী দত্ত নিজের কাছে অন্তত গোপন করবে কি করে।

জুলির আর একটা কথাও কানে লেগে আছে। এডওয়ার্ডের দোষ ঢাকতে বলেছিল, বেচারা পুরুষমানুষ, তার দোষ দেব কি। এডওয়ার্ডকে যে কিছুই বলা গেল না, তার এও একটা কারণ। বাসনার পতঙ্গ নয় কে? সে যে অদম্য আগ্রহ নিয়ে শ্রাবণী নন্দীর দিকে ঝুঁকেছে, সেই প্রকৃতির সাদা নামটা কি? মূলে তফাত কতটুকু?

তফাত দেখতে গিয়ে গুণী দত্ত নিজেকে দেখার মধ্যে তলিয়ে গেছে আবার। শিরিনের সমস্যা চুকেবুকে গেছে যেন। ওরা সকলেই সরল রাস্তা না হোক স্বাভাবিক রাস্তায় চলেছে। জটিলতা যা কিছু গুণী দত্তর মগজে। এডওয়ার্ডের তাড়নাটাকেই সে যদি নিজের মধ্যে অনেক গুণ বড় করে দেখতে পেত, সেও এমন কিছু অস্বাভাবিক হত না। লোক-বিশেষে ক্ষুধার কম-বেশি হয়েই থাকে। কিন্তু তাও তো নয়, গুণী দত্ত উপলব্ধি করতে পারে তফাতটা পরিমাণে নয়—তফাত মূলে, শিকড়ে।

চিন্তাচ্ছন্নের মত কেটে গেল ক'টা দিন। সত্যিই কি সে এক ধী-ভ্রষ্ট সত্তার বিভ্রমের পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ছে? জেনিফার উড বলে, সে হাওয়ায় ভেসে

বেড়াচ্ছে, জুলি জিজ্ঞাসা করে, সে কোন্ আবেগের রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে? সত্যিই শুধু হাওয়া আর শুধু আবেগ? শ্রাবণী কি ভাবে, কি বলে?

গোঁ-এর মুখে আয়না ধরলে স্ব-মূর্তি দেখে গোঁয়ার মোষও থমকায়। জুলির আর জেনিফারের কথার আয়নায় গুণী দত্ত যেন থমকে গিয়ে স্ব-মূর্তি দেখতে চেষ্টা করছে। সত্যিই কি সে ওই দূরের কবর খুঁড়ে প্রেত-কালের মধ্যেই বিচরণ করছে? শুধু এক হারানো উদ্ভ্রান্ত স্মৃতির আবর্তে মাথা খুঁড়ে চলেছে? তার বয়স বাড়েনি? সে কি বিশ্বখ্যাতির যাদুকর গুণীডাটা নয়? সে কি জানে না শ্রাবণী নন্দী স্বর্ণ নয়?

এক স্থির উদ্দেশ্য নিয়ে গুণী দত্ত কয়েকটা দিন কলকাতা আর আশপাশের পথে পথে ঘুরে বেড়াল। জনতার অলক্ষে জনতার মধ্যে মিশে থাকল। খ্যাতির মুকুট বয়ে না বেড়ালে পথের এই মঞ্চে বহুজনের চোখের সামনেও অগোচরের আড়াল মেলা শক্ত নয়। সাদাসিধে ধুতি-পাঞ্জাবি আর নীল চশমা পরা গুণীডাটাকে একজনও আবিষ্কার করে তার তন্ময়তা ভঙ্গ করেনি। আবিষ্কার শুধু একজনই করেছিল। আবিষ্কার ঠিক নয়, সদ্য বর্তমানের গুণীডাটাকে একাগ্র নিবিষ্টতায় উদ্ধার করেছিল। সেই একজন গুণী দত্ত নিজেই। সে-ই সব পথে বিচরণ করেছে যে পথে জীবনধারণের রসদ-সংগ্রহের তাড়নায় বাঁশী হাতে গুণময় ঘুরত। সে-ই সব জায়গায় বসেছে যেখানে ক্লান্ত দুটো পা আপনি ভেঙে পড়েছে—সেদিনের মতো আর চলতে চায়নি। সে-ই সব উন্মুক্ত হোটেল রেস্তরাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে দাঁড়ালে কপর্দকশূন্য পকেটেও দৃষ্টিভোজ সমাধা করা যেত। পার্কে ময়দানে সে-ই সব জায়গায় গিয়ে বসেছে যেখান থেকে নতুন বয়সের মেয়ে-পুরুষদের কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষির মেকি প্রহসন দেখা যেত।

গুণী দত্ত সমস্ত একাগ্রতা দিয়েই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে, স্মৃতি যথার্থই তার কতখানি নিয়েছে—কতখানি গ্রাস করেছে। কিন্তু না। যোগ নেই। গ্রাস করেনি। এই সব কিছুই সত্যি বটে, এইখান থেকেই একদা যাত্রা শুরু হয়েছিল বটে। কিন্তু মাঝ-দরিয়ায় এসে যেমন অস্পষ্ট তটরেখা শুধু দেখা যায়, এও তেমনি স্মৃতিতট শুধু। তার বেশি কিছু নয়—কিছুই নয়।

গুণী দত্ত এটুকু উপলব্ধি করেই ক্ষান্ত হয়নি। মিসেস উডের কাছে বলেছে এক-আধদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছে সে। কোথায় যাচ্ছে বা গেছে কেউ অনুমান করতে পারেনি। গুণী দত্ত বাঁকুড়ায় এলো, নিজের দেশে। ভরা স্মৃতির দেশে।

এই মাটি, এই বাতাস, এই আকাশ, এই গাছগাছড়া, দূরের ওই আকাশে মেশা পাহাড় সবই বড় বেশি চেনা। কিন্তু এ-সবও দূর থেকে দেখা দূরের স্মৃতিতট। তার বেশি কিছু না—কিছুই না।

এখানে সে ফিটফাট সাহেব। কেউ চেনে না তাকে। নাম শুনে বুঝল কে, জানল কে—কিন্তু চিনল না। সাহেব দেখে সসম্ভ্রমে তারাও শুধু দূরের স্মৃতিতটের দিকেই ফিরে তাকালো একবার। তার বেশি কিছু না, কিচ্ছু না।

বাড়ি আসতে প্রথমে জীবনের বাড়ি পড়ে। বাড়ির লোকদের সে চিনেছে, কিন্তু নিজের পরিচয় তাকে দিতে হয়েছে। জীবন? জীবন নেই। মারা গেছে। সেই কবেই

তো। সান্নিপাত জ্বর, তিনদিন মাত্র ভুগেছিল। সবই অদৃষ্ট। দীর্ঘনিঃশ্বাস। জীবন নেই, বাড়ির লোকের কাছেও তা এখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের ব্যাপার ছাড়া আর বেশি কিছুই নয়।

গুণী দত্তর হাল্‌কা লাগছে। হালকা পায়েই বাড়ির দিকে চলেছে। স্মৃতি তার কিছুমাত্র গ্রাস করেনি। সে সত্যিই এখন গুণময় নয়, গুণীডাটা। নইলে জীবন নেই এ খবরটা অন্তত বুকে বাজত। এখন সে-ও বড় জোর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলতে পারে, বেচারা—। তার এই জীবনে জীবন নেই এটা শুধু একটা খবর। চাঁদ সাহেব নেই, বর্তমানে সেটা বরং এ তুলনায় শতগুণ ধাক্কা।

প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বৃদ্ধা জ্যাঠাইমা কাছে বসল। সাহস করে একসময় গায়ে-পিঠে হাতও দুই একবার বুলিয়ে দিল। ঠাকুমা আর পিসী অনেকদিন চোখ বুজেছে শুনল। শুনল, তারা নাকি গুণীর জন্য অনেক চোখের জল ফেলেছে। বলতে বলতে চোখের জল কয়েক ফোঁটা জ্যাঠাইমাও ফেলেছে। কিন্তু গুণী দত্ত জীবনের মৃত্যুর খবর যে-ভাবে শুনেছে, এ খবরও তেমনই শুনল। স্মৃতিব খবর। তার বেশি কিছু নয়। ধাক্কা বরং একটু খেয়েছে জ্যাঠাকে দেখে। সেই দোর্দণ্ড মেজাজের জ্যাঠার এই মূর্তি। জ্যাঠা তামাক খাচ্ছিল আর দুই চোখের জরা ঠেলে পিটপিট করে তাকে দেখছিল। তার বিমূঢ়তার মধ্যে সঙ্কোচ নয় শুধু, কি এক অজ্ঞাত ভয়ও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল যেন।

সে যেন জানাতে চায়, সে এখন অনুকম্পার পাত্র। গুণী দত্তর স্নায়ু আরো শিথিল হয়ে গেল, আরো সুস্থবোধ করছে সে। তাব মনের কোথায় এই জ্যাঠার বিরুদ্ধেই প্রচণ্ড আক্রোশ জিয়োনো ছিল—তা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল। আক্রোশ যার উপর ছিল সে অন্য লোক, দূরের স্মৃতির লোক। এই জবুথবু অসহায় বৃদ্ধ আর কেউ। গুণী দত্ত এখন উঠে পালাতে পারলে বাঁচে। চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখে নিয়েছে—সর্বত্র অনটন যেন দাঁত বের করে আছে।

জ্যাঠাইমা জিজ্ঞাসা করেছে, সে কোথায় ছিল এতকাল? পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছিল শুনে তার দুই চোখ ঠিকরে পড়েছে, আর জ্যাঠা যেন আরো কুঁকড়ে গেছে। জ্যাঠাইমার মন্ত্রমুগ্ধ প্রশ্ন এরপর বস্তুতন্ত্রীর দিকে ঘেঁষেছে। দেওরপো মস্ত কেউকেটা একজন হয়েছে, কিন্তু কি হয়েছে, কি হয়ে এলো?

গুণী দত্ত আর বাড়াতে চায়নি নিজেকে। হেসে এড়িয়ে গেছে। বলেছে, তেমন কিছু না। স্বর্ণদের বাড়িতেও যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাদের কথা উঠতে জ্যাঠাইমার মুখ অন্যরকম। আজ সব কিছুর জন্যে মনে মনে হয়ত ওই বাড়িটাকেই দায়ী করছে সে। শুনল, স্বর্ণ কলকাতার কাছেই কোথায় থাকে। হয়ত ইচ্ছে করেই জায়গার নামটা জ্যাঠাইমা বলল না।

থাক, দেখা হলে স্বর্ণর বাবা-মা আবার কোন্ ভাবনায় পড়বে ঠিক নেই। গিয়ে কাজ নেই। উঠে বাগানে গেল। সেই পরিচিত বাগান। এখন আর বাগান বলা চলে না, জঙ্গল হয়ে উঠেছে। গুণী দত্ত দিব্বি চেয়ে চেয়ে দুরের স্মৃতি দেখছে, আর হাসছে একটু একটু। ওইখানে অদৃশ্য মানুষ হবার তাগিদে পায়রার মাথা পুঁতে দুধ ঢালত।

ওই গাছটার নিচে স্বর্ণর তিল তোলার মহড়া দিয়েছিল।

ঠিক শেষের এই স্মৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুণী দত্ত সামান্য অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। নিজেরই নিভৃতে ডুব দিল সে, রোগ কোথায়, জট কোথায় তন্ন তন্ন করে দেখবে সে, খুঁজবে। এইজন্যেই বেরুনো। এইজন্যেই স্মৃতির পথে বিচরণ। বাগান থেকে বেরিয়ে পুকুরের দিকে গেল। পুকুরের ওপারে জংলা ঝোপের দিকে। গুণী দত্ত খর-বিশ্লেষণী দৃষ্টি রেখেছে নিজের ওপর। এখানে এক উদগত আবেগ ওর এই দৃষ্টিতে ব্যাহত হচ্ছে বটে। আশ্চর্য স্থবির জ্যাঠাকে দেখেও যা উপলব্ধি করেনি, এখানে দাঁড়িয়ে তাই একটু একটু অনুভব করছে। পিঠে পিঠজোড়া শুকনো ক্ষত দাগটার নিচে জ্বালা-জ্বালা করছে, চিন-চিন করছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গুণী দত্তর চোখ ছিল, দৃষ্টি ছিল। না, তার রোগ কোথাও নেই, স্মৃতি তার কিছুমাত্র গ্রাস করেনি। শুধু এই এক জায়গায় একটুখানি জট পাকিয়ে আছে, একটুখানি আবেগ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। ম্যাজিসিয়ান গুণীডাটা তা জানত, কিন্তু ঠিক এ-ভাবে চোখ চেয়ে সরাসরি সেটা দেখেনি। এবারে দেখল। এবারে জট ছাড়ানো যাবে। যাবে কি করে তা ভাবতে গিয়ে চোখের সামনে স্বর্ণর মুখ ভেসে উঠল না, চোখের পাতা ছোঁয়া কোনো কালো তিলও না। তার বদলে শ্রাবণীর মুখখানাই স্পষ্ট হয়ে উঠল, আর চিবুকের নিচে জ্বলজ্বলে লাল জড়ুলটা।

গুণী দত্ত নিশ্চিন্ত। একটা নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের মোহনায় এসে পৌঁছুনো গেল যেন।

আসার আগে আর এক দফা আলাপ-বিলাপের ফাঁকে জ্যাঠাইমা জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বিয়ে করেছে কিনা। গুণী দত্ত অনায়াসে জবাব দিতে পেরেছিল, এখনো করেনি, তবে শিগগিরই করবে।

॥ ১২ ॥

মাস তিনেকের আগে কলকাতায় প্রাথমিক প্রোগ্রাম শেষ করা যাবে না উড-দম্পতি সেটা ধরে নিয়েছিল। তারপর একে একে ভারতের বিভিন্ন বড় জায়গাগুলো ঘুরে দূর প্রাচ্যের দিকে এগোবার কথা। সেই সফর শেষ হতে কম করে দু'বছর।

কিন্তু কলকাতায় তিন মাসের জায়গায় চতুর্থ মাস শেষ হবার মুখে হাল ছেড়ে তারা ধরেই নিল এখানে আরো মাস কয়েক অন্তত অবস্থান অনিবার্য। এমন কি আর কোথাও না গিয়ে এখান থেকেই সব গুটিয়ে একেবারে দেশে ফিরতে হবে কিনা সে সম্বন্ধেও একেবারে নিঃসংশয় নয় তারা।

তারা গুণীডাটার খেয়ালের তল-কূল পায় না।

গুণী দত্তর বিয়ে। বিয়ে শ্রাবণী নন্দীর সঙ্গে।

এ বিয়ে কেউ চায়নি। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস উড চায়নি নিজেদের স্বার্থে। এদের না চাওয়া আর জুলি স্যান্ডারসনের না চাওয়ার কারণ একেবারে এক কিনা গুণী দত্ত জানে না। সবার আগে জুলিকেই সে জানিয়েছে খবরটা। বাঁকুড়া থেকে

ফিরেই বলেছে। জুলি আরো হাঁ হয়ে যেত যদি জানত সংকল্পটা এখনো সম্পূর্ণই একতরফা। বিয়ে যার সঙ্গে সে এখনো কিছুই জানে না। অবশ্য অবিশ্বাস করত না জুলি, অসম্ভবও ভাবত না। গুণীডাটার ইচ্ছের জোর তার জানা আছে।

জুলি খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকে দেখল চেয়ে চেয়ে। বিগত কটা মাসে তার আচরণে অনেক দুর্বোধ্য অসঙ্গতি চোখে পড়েছে। শ্রাবণীকেও এযাবৎ কম দিন দেখেনি। ফাঁক পেলে ঠাট্টা-ঠিসারাও করেছে। কিন্তু ঠাট্টা করলে আগে যেমন সহজ মনে নিতে পারত, লোকটার সেই মন বদলেছে তাও লক্ষ্য করেছিল। এই নামযশ, এই চেহারা, এই চোখের টানে অনেক মেয়েকে সে কাছে আসতে দেখেছে, অনেক মেয়ের গোপন অস্থিরতা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু মনের দিক থেকে অন্তত গুণীডাটাকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত উদাসীন দেখেছে সে। কটা মাস ধরে বিপরীত কাণ্ড। উল্টে এক শিখার পায়ে কোনো পতঙ্গ মাথা খুঁড়ছে যেন। জুলির এখনো বিশ্বাস, এক অন্ধ আবেগের বশে চলেছে লোকটা।

বিয়ে বলছ? ঠিক শুনছি?

ঠিক শুনছ।

ও...। শিরিনের সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেলেছ?

গুণী দত্ত বিস্মিত।—মন স্থির করার কি আছে?

পরে পস্তাবে না?

গুণী দত্ত বিরক্ত হয়েছে। এই এক মেয়ের ব্যাপারে তার চিন্তাধারা কিছুতে ওর মাথায় ঢোকানো গেল না। বলল, শিরিনকে আমি কি চোখে দেখি তুমি জানো—সে আমার ভাগ্য নির্দেশ করতে এসেছে, ঘর করতে আসেনি।

শিরিন প্রসঙ্গে এ ধরনের উক্তিও বরদাস্ত করতে চায় না সে। বলল, সব কিছুই বিকৃত মন নিয়ে ভাবো কেন?

আবার খানিক চুপ করে থেকে জুলি বলল, তোমার ওই মেয়েটিকে আমি বেশ ভালো করেই দেখেছি। তুমি তাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ যখন তার মধ্যে তেমন কিছু দেখেছ নিশ্চয়। কি দেখেছ?

গুণী দত্ত অন্যমনস্কের মত মাথা নাড়ল। জানে না কি দেখেছে?

জুলি হঠাৎ হাসল একটু, তারপর হালকা করে বলল, কিন্তু আমি কি করি বলো তো? আমাকে যে একটা সমস্যায় ফেললে—

কি সমস্যা?

আমার আর এখানে ভাল লাগছে না সত্যি কথাই, এক বছর বাদে হোক, দু বছর বাদে হোক, শিরিনকে তুমি হাতে তুলে নিলে আমি যেতে পারব এই আশায় মন বেঁধে ছিলাম। এখন মেয়েটার বয়েস আঠারো, তোমার গোটাগুটি মুণ্ডু ঘুরতে বড় জোর আর বছর দুই লাগবে ধরে নিয়েছিলাম। এখন মুশকিল হল না?

গুণী দত্ত হাল্‌কা রসিকতার মধ্যে না গিয়ে শান্ত মুখে জবাব দিল, এবারে বাইরে ঘুরে আসা পর্যন্ত অন্তত তুমি থাকবে আমি আশা করছি। কিন্তু নিতান্ত ভাল না লাগে, শিরিনের অজুহাত দেখিয়ে তোমাকে আটকে রাখব কেন?

জুলি হাসছে।—অজুহাত তোমাকে দেখাতে হবে না বন্ধু, অজুহাত আমার এই মাথাতেই অনেক গজাচ্ছে। আমার ধারণা, পরে তুমি পস্তাবে। আর তখন কোনো পথ থাকবে না। চোখে চোখ রাখল, যেন অনভিজ্ঞ একটা ছোট ছেলেকে দেখছে।—মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখেছ ভাল করে? জোরেই হেসে উঠল।

প্রসঙ্গটা তিক্ত লাগল, জুলির এই হাসিও। সরোষে গুণী দত্ত ঘর ছেড়ে চলে যেত, কিন্তু তার আগেই জুলির গলার সুর বদলালো। এখন আর হাসছে না, মুখখানা শুধু হাসি-হাসি দেখাচ্ছে। বলল, একটা কথা তোমাকে বলি বন্ধু, শোন। তোমার ওই শিরিনকে গোড়ায় গোড়ায় আমার খুব ভাল লাগেনি, আটাশ বছর বয়সে আঠারোর সঙ্গে পাল্লা দেবার ইচ্ছেও যখন এক এক সময় হত, তখন আরো খারাপ লাগত। মুশকিল হল যখন ভালো লাগতে শুরু করল। নইলে যাবার প্রস্তাব আমি আগেই করতাম তোমার কাছে। একদিন মেয়েটা আমাকে হঠাৎ বলল, মাকে তার খুব মনে আছে, তার মা হেসে-হেসে অনেক যন্ত্রণা সইতে পারত। আমাকে তার সেই মায়ের মত মনে হয়—মায়ের মত, আবার বন্ধুর মতও। ওই বলেই আমাকে দিলে শেষ করে।....এখন এক এক সময় এমনও মনে হয়, এক-আধটা ছেলেমেয়ে থাকলে হত গুণীডাটার।

জুলি হাসতে লাগল আবার। হাসতে হাসতেই বলল, নাও গেট আউট্, নিজের ভাবনা ভাবগে যাও। শিরিনের ভাবনা আপাতত তোমাকে ভাবতেও হবে না।

গুণী দত্ত আর একটা কথাও বলেনি। শিরিনের ভাবনা ভাবতে সে সম্পূর্ণ সক্ষম, আর ভাবার ইচ্ছেও আছে। কিন্তু সে কথা বলল না। উল্টে ভারী নিশ্চিন্ত বোধ করল। এ পর্যন্ত ছোটখাটো অনেক ব্যাপারে জুলি অমন ডাকসাইটে যাদুকরের চোখ খুলে দিয়েছে। প্রথমে গুণী দত্ত তার ওপর বিরক্ত হয়েছে, পরে অনুতাপ ভোগ করেছে। আজ অনুতাপ নয়, এই জুলি স্যান্ডারসনের ওপর বিরূপ হয়েছিল বলে মুখ আড়াল করতে ইচ্ছে করছে তার। গুণীডাটা মস্ত ম্যাজিসিয়ান বটে, এদের সকলের চোখে মস্ত লোক। কিন্তু এই মস্ত লোক এক অতি-সামান্য মেয়ের কাছ থেকে দু'হাত ভরে নিয়েই গেল, দিলে না কিছু—মুখ আড়াল করেও এই অবিমিশ্র সত্যটুকু নিজের কাছে সে আড়াল করবে কেমন করে?

যা স্থির হয়ে আছে তা হবে। বিয়ে হবে। ঘর হবে। যাযাবর মানুষের ঘর যেমন হয় তেমনি ঘর। সেই ঘরে শ্রাবণী আসবে। সব কাজের আর এক ধারে, গুণী দত্তর একান্তের ঘরদুয়ারে শিয়রে শ্রাবণী থাকবে। এ হবে কি হবে না, হওয়া সম্ভব কি সম্ভব নয়, তা নিয়ে সে একবারও মাথা ঘামালো না। এতটুকু উতলা হল না। হবে যে তাতে কোনো সংশয় নেই। নেই কারণ, এ ব্যবস্থা তার নয়—অদৃশ্য নিয়ামকের। ভাগ্যের সুতো যার হাতে ধরা তার। তারই সঙ্কল্প। গুণী দত্ত কিছু স্থির করেনি, স্থির যা হয়ে আছে তাই সে জেনেছে শুধু, উপলব্ধি করেছে। নইলে ছ'বছরে বিদেশে অনেক শ্রাবণী দেখত। নইলে ফেরত-জাহাজে শুভেন্দু নন্দী বলে কেউ থাকত না। নইলে কলকাতায় এসেও ঠিক এমন একজনের সঙ্গে এই যোগাযোগ ঘটত না,

যা দেখে মিসেস উড ভাবছে সে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে আর জুলি স্যান্ডারসন ভাবছে সে আবেগের রাজ্যে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে।

গুণী দত্ত ভাগ্য মানে। এযাবৎ ভাগ্যের কম যাদু দেখল না। এই যাদুর কাছে যাদুকর গুণীডাটার মাথা অবনত।

কিন্তু তা হলেও ভাগ্যের হাতে সব ছেড়েছুড়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকে না কেউ। গুণী দত্তও থাকল না। যে আসবে তার ঘরে সে-ই এখনো জানে না কিছু। একেবারে কিছুই জানে না তা অবশ্য মনে হয় না। এক মনের অব্যক্ত বার্তা আর এক নির্দিষ্ট মনে যথাযথ পৌঁছয় বলেই তার বিশ্বাস। তবু শ্রাবণীকে ডাকা দরকার, জানানো দরকার, বলা দরকার।

আর এটুকুর জন্যে অনুকূল পরিবেশ দরকার। তাকে একান্তে পাওয়া দরকার।

কিন্তু এই আনুকূল্য দুর্লভ হয়ে উঠছিল। টেলিফোনে প্রস্তাব পাঠানো হাস্যকর। তবু গুণী দত্ত টেলিফোন করে। কখনো শোনে শ্রাবণী নেই। কখনো শ্রাবণী ধরে, বলে ব্যস্ত খুব, তার আসার সময় নেই। খুব ভদ্রভাবেই বলে। কলেজের মাস্টার মেয়ে, তার সৌজন্যবোধ আছে।

দুদিন তাদের বাড়ি এলো। শ্রাবণী একদিনই বাড়িতে ছিল। আরো অনেকে ছিল সেদিন। শুভেন্দু, ছোট ভাইয়েরা, মিলনী, প্রশান্ত, আরো দু'চারজন অভ্যাগত। বাইরের ঘরেই ছিল সকলে। জমজমাট চা-জলযোগপর্ব সবে শেষ হয়েছে। পেয়ালা ডিশগুলো তখনো সরানো হয়নি।

সকলেই শিক্ষিত এখানে। কাণ্ডজ্ঞান রুচিজ্ঞান আছে। তারও অভ্যর্থনায় ত্রুটি হল না। শুভেন্দু হাসিমুখেই সাদর আহ্বান জানাল। মিলনী হাসল। প্রশান্ত নমস্কার জানালো। তাকে দেখে শ্রাবণী যেমন নির্লিপ্ত থাকতে চেষ্টা করে তাই করল। তবু আগের সঙ্গে এই অভ্যর্থনার তফাতটুকু শুধু গুণী দত্তই উপলব্ধি করল। আগের সেই উত্তাপ ছিল না। তাকে দেখামাত্র শুভেন্দু আনন্দে লাফিয়ে ওঠেনি। মিলনী শুধু হেসেছে, আগের মত মুখরা হয়ে ওঠেনি।

এই ব্যতিক্রমও গুণী দত্ত বেশ উপভোগ করেছে। যা ঘটবেই তার মাঝে এ ধরণের ছোটখাটো বিঘ্নও যেন রসশূন্য নয়। অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয় হতে তারা অবশ্য যথেষ্ট খুশির উত্তাপ প্রকাশ করেছে। এবারে একটা ম্যাজিকের আসরই আশা করেছে তারা।

কথার মাঝে শ্রাবণী উঠে গেল। গুণী দত্ত জানে কোথায় গেল। সকলেই জানে। নির্লিপ্ত কর্তব্য করতে গেল। তার চা-জলখাবার আনতে গেল। এটুকু শুধু তারই কাজ।

গুণী দত্ত হাসছে। এরই মধ্যে একটুখানি কৌতুক রচনার লোভ সংবরণ করা গেল না। ঋজু ব্যস্তসমস্ত ভাব। প্রথমে মিলনীর দিকে পরে শুভেন্দুর দিকে তাকালো।—তোমরা তো আজ আর উঠতে পারছ বলে মনে হচ্ছে না?

যেন শো দেখাবার জন্যে সকলকে নিয়ে যেতেই এসেছিল। শুভেন্দু মাথা নাড়ল, না, এঁরা এলেন...বোসো বোসো, তোমার চা—

মিলনীও বাধা দেবার অবকাশ পেল না, গুণী দত্ত ততক্ষণে দোরগোড়ায়। সুশোভন তৎপরতায় সহজ অন্তরঙ্গ প্রত্যাখ্যান। বলল, অন্য দিন ডবল চা হবে, এখন চায়ে বসলে ওদিকে খাবি খেতে হবে—

কৌতুকই বটে। গুণী দত্ত যতটা কল্পনা করেছিল, কৌতুকটা স্নায়ুপথে তার থেকে আর একটু বেশী গড়িয়েছিল। চা-জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে শ্রাবণী দেখল যার জন্যে আনা সে নেই। ঈষৎ বিস্ময়ে দাদার দিকে তাকালো।

এসেই এভাবে চলে যাবে শুভেন্দু ভাবেনি। কিন্তু তার উক্তির মধ্যে বিব্রত ভাব না থাকলে ব্যাপারটা সহজ হতে পারত। বলল, চলে গেল তো....খুব তাড়া আছে বলল, তুইও তো কিছু বলে গেলি না....

এ ধরনের কথার ফলে তার জলখাবার আনার নির্লিপ্ত কর্তব্যবোধটাকে ওরা আগ্রহ ভাবছে মনে হওয়াই স্বাভাবিক শ্রাবণীর। বিরক্ত হলেও মুখে প্রকাশ পেল না। দাদার দিকে চোখ রেখেই সাদাসিধে মন্তব্য করল, বলে আবার যাব কি, এর মধ্যে এসে গেছেন যখন জানাই তো....বসালে পারতে।

অর্থাৎ লোকটাকে নিয়ে তোমার মনে গলদ বলেই আন্তরিকতার অভাব। যাকে বলা এক সে ভিন্ন আর কারো কিছু বোঝবার কথা নয়, বুঝলও না। আর হয়ত মিলনীও অবাক হয়েছে একটু। অভ্যাগতদের একজন লঘু খেদে বলল, ওঁর দোষ কি, যেমন এলেন তেমনি হুট করে উঠে চলে গেলেন, আমরাও আশা করছিলাম কত মজার ব্যাপার হবে এবারে, ভদ্রলোককে শুধু দেখাই সার হল—

চা-জলখাবার নিয়ে শ্রাবণী ভিতরে চলে গেল। তার কথা দাদা আর মিলনীর স্বাভাবিক লাগেনি মনে হতে বিরক্তি বাড়ল। মনে মনে তারা কি ভাবছে এখন ঠিক কি। অথচ সহজ কথাটা ওদের মাথায় ঢুকল না, ওই লোককে নিয়ে সত্যি যদি তার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকত, তাহলে চলে গেছে শুনে সে চুপ করেই থাকত। আগ্রহ নেই বলেই বলতে পেরেছে।

কিন্তু শ্রাবণী মনে মনে এও জানে, এমন তুচ্ছ কারণে এ-বকম বলাটা তার স্বভাব নয়। তাকে খাবার নিয়ে আসতে দেখে দাদা কি ভেবেছিল না ভেবেছিল তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও পারত। ফলে বিরক্তিটা ঘুরে-ফিরে তারই ওপর গিয়ে পড়ল, যে ওভাবে এলো আর চলে গেল। কেন যে এসেছিল তা শ্রাবণী কেন, দাদাও ভালো করেই জানে। আর ব্যস্ততার অজুহাতে চলে কেন গেল—তাও। সে আসর জমাতে আসেনি, আর পাঁচজনকে এখানে দেখবে বলেও আসেনি।

শ্রাবণীর মধ্যে ধীর গম্ভীর মাস্টারটি প্রাধান্য লাভ করেছে। এই স্পষ্ট নির্লজ্জতা সে আর বরদাস্ত করবে না।

কিন্তু নির্লজ্জতা হোক বা যা-ই হোক গুণী দত্তর রীতিতে এ এমন কিছু স্পষ্ট নয়। তার দ্বিতীয় দফা অতর্কিত হামলায় শ্রাবণী যত না ক্রুদ্ধ, তার থেকে অনেক বেশি অসহায় বোধ করেছে। বড় ঢেউয়ের মুখে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব বললেই যেমন থাকা যায় না, এও অনেকটা তেমনি।

দিন কয়েকের মধ্যেই গুণী দত্ত আবার এসেছে। এসে শুনেছে শ্রাবণী বাড়ি

নেই, লাইব্রেরীতে গেছে। হদিস পাওয়া গেল যখন, বাড়ি থাকার থেকে না থাকাটাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। গাড়ি ছুটল। শহরের এক নির্জন প্রান্তে লাইব্রেরি। দেশের গৌরব। জ্ঞানের ভাণ্ডার। ওখানে রত্ন চয়ন করতে ছোটে সকলে। গুণী দত্তর মজা লাগছে বেশ, সে-ও তো রত্ন চয়ন করতেই ছুটেছে।

প্রকাণ্ড হল্। হল্-এর মাঝে এ-মাথা ও-মাথা জোড়া টেবিল। এক-একধারে মেয়ে পুরুষ শতেক পড়ুয়া যে-যার বইয়ের ওপর মুখ গুঁজে আছে। হল্-এর দু'পাশে খুপরি ঘরের আকারের সারি সারি অ্যাল্কোভ। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে গুণী দত্ত পায়ে পায়ে এগুলো। এখন খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না, পায়ের শব্দ হলেও এখানকার সমাহিত তন্ময়তায় ছেদ পড়ার আশঙ্কা।

দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের অ্যালকোভে মুখোমুখি যে-দু'জন বইয়ে ডুবে আছে, তাদের একজনের কাছেই সে এসেছে। দ্বিতীয় মহিলাটিকে আগে কোথাও দেখেছে কিনা মনে পড়ল না।

গুণী দত্ত কাছে এসে দাঁড়াল। হাসছে মৃদু মৃদু।

দু'জনেই মুখ তুলে তাকালো। দু'জনেই অবাক। দু'জনে দু'ধরনের অবাক। দ্বিতীয় মহিলাটি শ্রাবণীর কলেজের সতীর্থ। কদিন আগেই তো কলেজে গুণী দত্তর ম্যাজিক দেখেছে। না চেনার কথা নয়। খুশি মুখে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। জোরে কথা বলার রীতি নয় এখানে। অনুচ্চ বিস্ময় প্রকাশ করল, কি আশ্চর্য, আপিন এখানে! ম্যাজিকের বই ঘাঁটতে এসেছিলেন বুঝি?

এখানে দেখা হলে এই অনুমানই স্বাভাবিক। জবাব না দিয়ে গুণী দত্ত তেমনি হাসছে মিটিমিটি। মহিলাটির পরিচয় জানার আগ্রহ নিয়েই যেন একবার শ্রাবণীর দিকে তাকালো সে। সঙ্গিনী নিজেই নিজের পরিচয় দিল, আমি ওর বন্ধু, কলেজে আলাপ হয়েছিল ভুলে গেছেন—সেদিন আপনার ম্যাজিক খুব ভালো লেগেছিল।

এখানে বান্ধবীর অবস্থানের সম্ভাবনা ভেবে আসেনি গুণী দত্ত। প্রশংসা শুনেও মনে মনে খুব যে প্রীত হল তা নয়। মুখে সবিনয় হাসি। বান্ধবীর সামনে বলেই শ্রাবণীরও ভিতরে ভিতরে সহজ হবার তাগিদ। বান্ধবী তাকে গম্ভীর দেখলে অবাক হবে। কিন্তু গাম্ভীর্য কাটিয়ে সহজ হওয়াটা তেমন সহজ হচ্ছিল না। একটা কাগজে কি নম্বর টুকে শ্রাবণী উঠে দাঁড়িয়েছে—ক্যাটালগ দেখতে যাবে। মুখের হাসির আভাসটুকু বিলক্ষণ প্রয়াসের ফল।

গুণী দত্ত ঘড়ি দেখল। দুজনারই উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করল, খুব দেরি হবে নাকি? পৌঁছে দিতে পারি—

বান্ধবীর দরুনই জবাবের স্বাভাবিক সুরও বজায় রাখতে হল। শ্রাবণী বলল, আমাদের যেতে অনেক দেরি। তা'ছাড়া ওর সঙ্গে গাড়ি আছে—

অ্যাল্কোভ ছেড়ে ক্যাটালগ দেখতে চলল। খুব ভালো করেই জানে, সে চলে এলো আর ওখানে দাঁড়ানো নিরাপদ নয়। দাঁড়ালে আবার কিছু বলতেও পারে, কিছু না বলে মুখের দিকেও চেয়ে থাকতে পারে। এখুনো নিঃসন্দেহ, লোকটা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে না। আসবে। তবু চেনা চোখ এড়াতে হলে শ্রাবণীর এ ছাড়া উপায়

নেই।

বান্ধবীকে হাসিমুখে নমস্কার জানিয়ে মনে মনে তার গাড়ির নিকুচি করতে করতে গুণী দত্ত অ্যাল্‌কোভ থেকে বেরুলো। সামনের অপেক্ষাকৃত ছোট হল্‌-এর এ-মাথা ও-মাথা জোড়া ডেস্ক্‌-এর একদিকের ড্রয়ার টেনে টেনে শ্রাবণী ইন্‌ডেক্স কার্ড দেখছে। গুণী দত্ত পিছনে এসে দাঁড়াল। একটা ড্রয়ার খুলে শ্রাবণী একের পর এক কার্ড উল্টে যাচ্ছে। গুণী দত্ত পিছন থেকে দেখছে আর হাসছে অল্প অল্প। বলল, যা দরকার নেই তা খুঁজলে সহজে মেলে না।

শ্রাবণী ঝুঁকে কার্ড দেখছিল। আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাত থেমে গেল। কানের দু'পাশ গবম ঠেকছে। এদিক-ওদিক লোক চলাচল করছে। দুই একজন ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে গেল। শ্রাবণী তার দিকে ফিরল। ধীর, স্থির চোখে তাকাতে চেষ্টা করল। কিন্তু সেও খুব সহজ নয়।

গুণী দত্ত অম্লানবদনে বলল, বাড়ি গেছলাম, সেখান থেকে এখানকার ঠিকানা পেয়ে এলাম।

কিছু বলবেন?

গুণী দথ মাথা নাড়ল, বলবে। দু চোখ তার মুখ আর চিবুকে ওঠা-নামা করছে। শ্রাবণীর রাগ হচ্ছে, কিন্তু এই পরিবেশে সে নিরুপায়। তা বুঝেই যেন ওই দু চোখে হাসি ঝরছে।

ফিবতে কত দেরি হবে?

শ্রাবণী সময় নির্দেশ কবল না, বলল দেরি হবে।

তারপর?

বাড়ি যাব।

তা'হলে বলব কখন?

শ্রাবণী নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে তাকালো তার দিকে। এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলা ক্রমেই বিসদৃশ হয়ে উঠছে সে জ্ঞানও নেই দেখছে। হয়ত বা ইচ্ছে করেই এই বিড়ম্বনা সৃষ্টি করছে।

গুণী দত্ত ঘড়ি দেখল। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখাটা স্বভাব। বলল, আমার কিছু কথা আছে, যত তাড়াতাড়ি হয় সেটা শোনা দরকার। নয়তো ভবিষ্যতে আরো বেশি অপ্রস্তুত হতে হবে। হাসল, আচ্ছা চলি আজ—

সামনে আর একটা প্রকাণ্ড হল। তার শেষ মাথায় দরজা। যতক্ষণ দেখা যায় তাকে, শ্রাবণী ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখছে। কি দেখছে বা কেন দেখছে জানে না।

আর একদিন।

সেই দিনই এই যোগাযোগ শেষ ধরে নিয়েছিল শ্রাবণী। মন বেঁধে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। কিন্তু কেন যে এসেছিল সেটাই আশ্চর্য। সে জানে সেদিন কিন্তু কথা হবে। কথা আছে বলেই তাকে তাগিদ দিয়ে আনা হয়েছে। কথা হবে। শ্রাবণী যা বলবার বলবে। তারপর আর কথা হবে না, আর দেখা হবে না। কিন্তু কথার শেষ

তো টেলিফোনেই করে দিতে পারত। কথার শেষও, দেখার শেষও। এলো কেন? একরকম জুলুম করেই তাকে কথা শোনাতে আনা হয়েছে। শো-এর পরে কথা হবে। তার মানে বাড়ি ফিরতে রাত হবে বেশ। বাবা জেগে থাকলে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন, এত রাত হল কেন? দাদা আর ভাইয়েরা গোপনে লক্ষ্য করবে। নিজের ওপরেই বিরক্তি বাড়ছে শ্রাবণীর। সে আসতে গেল কেন, জুলুম বরদাস্ত করতে গেল কেন? টেলিফোনটা ঝপ করে ফেলে দিলেই তো দেখাশোনার শেষ হত, শ্রাবণীর যা বলার বলা হয়ে যেত।

কিন্তু নিজের ত্রুটি দেখতে বা নিজের ওপর বিরূপ হতে কেউ চায় না। শ্রাবণী নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, সেটা করা অভব্যতা হত। অভদ্র ব্যবহার করার তো কোনো কারণ নেই।

সমস্তক্ষণ জমজমাট ম্যাজিকের পর এডওয়ার্ড উড গুণীডাটার পলায়নী খেলার প্রসঙ্গে অন্য দিনের মতই একটু চমকপ্রদ বক্তৃতা করে নিয়েছে। শ্রাবণী সারাক্ষণ মন দিতে পারেনি, বক্তৃতায়ও না। পাশের চেয়ারটা খালি, শরীর ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসেছিল।

মস্ত একটা কাঠের বাক্স আনা হয়েছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাজিয়ে সেটা দেখানো হল, কোন কারসাজি নেই। নিশ্ছিদ্র। আষ্টেপৃষ্ঠে হাত বেঁধে দর্শকদের দিয়ে সেই বাঁধন যাচাই করিয়ে নিয়ে গুণী দত্তকে সেটার ভেতর ঠেসে ঢোকানো হল। বাক্সর ডালা বন্ধ করে পেল্লায় কয়েকটা তালা আটকে চাবি দর্শকের কাছে দেওয়া হল। তারপর ওই দর্শকরাই বাক্সটা চারদিক থেকে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিতে লাগল। উত্তেজিত মুখে এডওয়ার্ড তাদের তাড়া দিল, তিন মিনিটের বেশি পার হয়ে গেলে তো লোকটা দমবন্ধ হয়ে মরবে—বাক্সটায় ছিদ্র নেই। তাড়াতাড়ি করুন।

বাক্সটার ওপর একটা ঢাকনা ফেলা হল। দর্শক উদ্‌গ্রীব উন্মুখ। তিন মিনিট তো হয়ে গেছে, এরপর কি একটা মৃতদেহ বেরুবে ওটার ভিতর থেকে? আবহাওয়া এমনই তৈরি যে শ্রাবণীর বুকের ভিতরটাও দুরু দুরু করে উঠল। এ খেলাটা সে আগে দেখেনি।

এডওয়ার্ড আস্তে আস্তে ঢাকনা সরালো। দড়ির বাঁধন খোলা হল, দর্শকদের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তালা খোলা হল। তারপর আস্তে আস্তে এডওয়ার্ড বাক্সের ডালা খুলতে লাগল। হল্‌ভরতি দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, বুক কাঁপছে। শ্রাবণীও একটু উঠে স্তব্ধ আতঙ্কে বাক্সের ভিতরটা দেখতে চেষ্টা করছে। পিঠে কার হাত পড়তে চমকে ফিরে তাকালো।

ডোন্ট্‌ ওয়ারি মাই ডিয়ার, আই অ্যাম হিয়ার!

বলে গুণী দত্ত ঘুরে দাঁড়াল, প্রেক্ষাঘরে জোরালো আলো জ্বলে উঠল। দর্শকদের চমকে দিয়ে সে গমগমে গলায় বলে উঠল, আই অ্যাম হিয়ার লেডীজ অ্যান্ড্‌ জেন্টেলমেন! হিয়ার উইথ দিস লেডী!

দর্শকরা চমকিত, পুলকিত, উল্লসিত। শ্রাবণী কাঠের মত বসে, গুণী দত্তর এক হাত তখনো তার কাঁধে।

আধ ঘণ্টা বাদে। গাড়ি ছুটেছে। দুজনের মাঝের ব্যবধান আজ আরো কম। শ্রাবণী দরজা ঘেঁষেই বসেছে, কিন্তু আর একজন অত কাছে বসলে সে কি করতে পারে। সিগারেট টানছে, সিগারেটের ধোঁয়া তার নাকে মুখে চোখে লাগছে। একটু বাদেই এই যোগাযোগ বরাবরকার মত ছেঁড়ার কথা। আঘাত না দিয়ে খুব শান্তভাবে শ্রাবণী নিজেকে সরিয়ে নেবে সংকল্প করে এসেছিল। কিন্তু সেই জোর সেই সংকল্প গেল কোথায়? শ্রাবণী নিজের ওপরেই রেগে উঠছে, নিজেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছে।

গুণী দত্ত সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করল, আজকের এস্‌কেপ্ কেমন লাগল?

সহজ হবার প্রাণান্তকর চেষ্টা শ্রাবণীরও। হাসতে চেষ্টা করে বলল, আপনি পলায়নপটু বটে।

সিগারেট ফেলে গুণী দত্ত ঘুরে বসল তার দিকে। হাসছে।—এ কথা আর যেই বলুক তুমি বলতে পার না। কলকাতায় এসে অবধি পালানো ভুলেছি।

তুমি। শব্দটা কানের ভিতর দিয়ে দেহের প্রতি রন্ধ্রে বিচরণ করল একপ্রস্থ। একটা স্পর্শ হয়ে অস্বস্তি ছড়াল যেন।

শ্রাবণী হঠাৎ টেনেই তুলল নিজেকে। তারপর খুব শান্তমুখে বলল, আপনি কথা আছে বলেছিলেন, কি কথা?

কণ্ঠস্বর শুনেই হোক বা যে কারণেই হোক, গুণী দত্তর মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়ল কয়েকটা।—কি কথা তুমি জানো না?

জানি। কিন্তু আমার মনে হয় কথাবার্তা থাক। দাদার বিশেষ আপত্তি। আর কারোও তেমন মত নেই।

তোমার?

শ্রাবণী জবাব দিল না। তার দিকে তাকালও না।

গুণী দত্ত নীরব একটু। শুভেন্দুর আপত্তির হেতু জানে। হেতু জুলি। বোনকে ভালবাসলে তার বাধা দেওয়ারই কথা। বলল, তোমার দাদার বিশেষ আপত্তির কারণ তুমিও জানো বোধ হয়।

তুমি তুমি তোমার তুমিও—। শ্রাবণী কি করবে? দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেমে নেমে যাবে? নিরুত্তর। অর্থাৎ জানে।

নির্বাক মুহূর্ত গোটা কয়েক। গুণী দত্ত আবার একটা সিগারেট ধরালো। একটু বাদেই ফেলে দিল। ড্রাইভারকে হঠাৎ নিজের বাড়ির পথের নির্দেশ দিল।

শ্রাবণী সচকিত। বলল, আমার বাড়ি ফেরা দরকার এখন—

যাবে। আমি পৌঁছে দেব।

আর কথা নেই। শ্রাবণীর বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। সে কটূক্তি করে উঠতে পারে, নেমে যেতে পারে, চলে যেতে পারে। কিন্তু কিছুই পারে না।

গুণী দত্ত সোজা তাকে দোতলায় নিজের ঘরে এনে তুলল। তারপর জুলি স্যান্ডারসনকে ডেকে পাঠালো। জুলিও খানিক আগেই ফিরেছে। হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করছিল। ডাক শুনে উঠে এলো। দুজনকে দেখে অবাক।

গুণী দত্ত বলল, বসো জুলি। আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি বলেছিলাম—একে। শ্রাবণীকে দেখাল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি মত ?

শ্রাবণীর সঙ্গে জুলির পরিচয় আগেই হয়েছিল। কিন্তু দু চোখ টান করে জুলি যেন নতুন করে দেখল তাকে খানিকক্ষণ ধরে। তারপর গুণী দত্তর দিকে চেয়ে ছদ্মরোষে চোখ পাকালো।—ইউ ব্লাডি ফুল। হোয়াট দি হেল অয়্যার ইউ ডুয়িং সো লঙ। ঘাস কাটছিলে ?

এগিয়ে এসে শ্রাবণীর একখানা হাত ধরে ঝাঁকালো।—কংগ্র্যাচুলেশনস—থাউজেন্ড্ অ্যান্ড্ মিলিয়ন কংগ্র্যাচুলেশন্স। তাকে কেন ডাকা হয়েছে কি করে বুঝে নিল সে-ই জানে। শ্রাবণীর কানের কাছে মুখ এনে বলল, আমাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই, আই অ্যাম্ গ্ল্যাড, গো অ্যাহেড।

শ্রাবণী নির্বাক, নিস্পন্দ তখনো।

জুলি আরো ফিস ফিস করে বলল, হি ইজ এ জেম, এ রিঅ্যাল জেম, জেমএর ওপর অনেকের লোভ, সামলে রাখতে পারলে আর ভাবনা নেই।

গুণী দত্তর দিকে ফিরল, গম্ভীর মুখে বুড়ীর মত উপদেশ দিল, ডু ইট টু-মরো বয়।

জুলি হাসতে হাসতে চলে গেল। যাবার আগে গুণী দত্ত বলল, ঘরে তাদের রাতের খাবার পাঠাতে।

শ্রাবণী মূর্তির মত বসে। গুণী দত্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখল খানিক। তারপর কিছু না বলে হাত-মুখ ধুতে গেল।

খেতে খেতে গুণী দত্ত আত্মমগ্নের মত জুলি স্যান্ডারসনের সম্বন্ধে বলল কিছু। শ্রাবণী খেলই না প্রায়, আঙুলে করে খাবারগুলো নাড়াচাড়াই করল। গুণী দত্তর বলার মধ্যে গোপনতার প্রয়াস ছিল না। আর দু কান সজাগ রেখে শ্রাবণীও শুনতেই চেষ্টা করেছে। কিন্তু আসলে কিছু শুনছে, কিছু শুনছে না। কিছু কানে যাচ্ছে, কিছু যাচ্ছে না। ভিতরে ভিতরে সেই থেকে আচ্ছন্নতার ঘোরটাই কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে সে।

হঠাৎ চিবুকের কাছটা অমন চিড়চিড়িয়ে উঠল কেন শ্রাবণীর ?....লোকটা চেয়ে আছে। দৃষ্টিটা ওখান থেকে আস্তে আস্তে মুখের ওপর এসে থামবে—শ্রাবণী অনেক দিন দেখেছে। অজস্রবার। তার আগেই আজ ওঠা দরকার, এখানে যেন সে নিরাপদ নয় খুব। ভাবার যদি কিছু থাকে পরে ভাববে, এখনকার ভাবনাটাও তার দখলে নেই।

উঠল। অস্ফুট স্বরে বলল, এখন যাব....

উঠল গুণী দত্তও। চেয়ে আছে তেমনি। কাছে এলো। খুব কাছে। হাত দুটো তার কাঁধের ওপর উঠে এলো, সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণীর এতক্ষণের প্রস্তুতি ধূলিসাৎ। একটা হাত তার চিবুক স্পর্শ করল, দুটো আঙুল আল্তো তুলির মত লাল জড়ুলটার ওপর স্পর্শ আর তাপ ছড়াতে লাগল। তারপর অমোঘ দুই বাহুর আকর্ষণে শ্রাবণীর দুই অধর এক উষ্ণ বিলুপ্তির গহ্বরে নিঃশেষে হারিয়ে যেতে লাগল। হারিয়ে গেল।

দুটো পায়ের ওপর নির্ভর গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত গেল কি একটা যুগ গেল শ্রাবণী জানে না।

গুণী দত্ত বলল, আমার কাজের ক্ষতি হচ্ছে, আর অপেক্ষা করব না—সম্ভব হলে কালই রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিশ পাঠালে ভালো হয়।

॥ ১৩ ॥

বিয়ে হয়ে গেল।

এ বিয়ে শুভেন্দু চায়নি, মিলনী চায়নি, এমন কি চায়নি শ্রাবণীও। তবু বিয়ে হল। আর সেটা এত আকস্মিক যে অন্য সকলের মত শ্রাবণীও প্রায় বিভ্রান্তই। তার চব্বিশ বছরের অভ্যস্ত জীবনধারা, অভ্যস্ত পরিবেশ, শিক্ষা-দীক্ষা, সব কিছু থেকে দস্যুর মত কেউ যেন অকস্মাৎ উপড়ে তুলে নিয়ে গেল তাকে। কারো কোন বিচার-বিশ্লেষণ বা চিন্তার অবকাশও থাকল না।

শ্রাবণী প্রথমে দাদাকেই বলেছিল। কিন্তু বলার আগে বাড়ির প্রতিটি লোক কিছু না কিছু অনুমান করেছিল। এমন কি বাবা পর্যন্ত এসে জিজ্ঞাসা করেছেন, তোর কি হয়েছে বল্ দেখি?

কি হয়েছে শ্রাবণী বলতে পারেনি। কেন পারেনি জানে না। অস্বাভাবিক কিছু তো হয়নি, নিরানন্দের কিছুও না। তবু এত অস্বস্তি কেন ভেবে পায় না। আসলে তার সহজ চিন্তার ধারাই তালগোল পাকিয়ে গেছে। জীবনে এক প্রবল পুরুষের আবির্ভাব সে ঠেকাতে পারেনি। পারেনি তাতে কি? সে পারাটা এমন কি? তাতে এমন কি সার্থকতা? উল্টে সবল পুরুষ আসুক একজন সব মেয়েরই তাই কাম্য।

খুব স্পষ্ট করে না হলেও শ্রাবণী অনুভব করে, এই আসাটাই স্বাভাবিক নয় খুব। কেউ আসেনি তার কাছে, তাকে টেনেছে। সে-ই যেন কারো বাসনায় আত্মাহুতি দিতে চলেছে। এ বাসনা অনুরাগপুষ্ট হলে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকত না। প্রথম দিনের প্রথম দেখা থেকে এ পর্যন্ত শুধু এক্ অনাবৃত আকর্ষণ তাকে বেষ্টন করে আছে। এর মধ্যে হৃদয় বিনিময়ের কোন অবকাশ ছিল না, চেষ্টা ছিল না। মিলনীর মত রূপ থাকলেও এ-রকম আকর্ষণের একটা অর্থ করা যেত। তাও নেই। যার কাছে যাচ্ছে তাকে চেনাও হয়নি, জানাও হয়নি। অথচ যাচ্ছে। যেতে হচ্ছে। শ্রাবণী যেন এক অজ্ঞাত অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিতে চলেছে।

কিন্তু শ্রাবণী আর ভাবতে চায় না। যা হবার হয়েই গেছে। বাড়িসুদ্ধ লোকের এই নীরব কৌতূহল আর বয়ে বেড়াতে ভালো লাগছে না। যা হবেই হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে, জানা যাবে, চেনা যাবে।

দাদাকে বলল, বিয়েতে রাজী হয়েছি, বাবাকে জানিয়ে দাও।

মন সুস্থির থাকলে দাদার হকচকিয়ে যাওয়াটুকু উপভোগ করা যেত। হতভম্বের মত চেয়ে না থেকে দাদা যদি হাসিমুখে হৈ-চৈ করে উঠত, তাও ভালো লাগত। এই নির্বাক বিমূঢ়তা বিরক্তিকর।

কোথায় বিয়ে, কার সঙ্গে বিয়েতে রাজী হল, শুভেন্দু একবারও জিজ্ঞাসা করল

না। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে সে ভাবছিল, গুণী দত্ত আর জুলি স্যান্ডারসনের সম্পর্ক নিয়ে তার সেদিনের ইঙ্গিতটা কি যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না। সে কি বলতে চেয়েছিল শ্রাবণী কি ঠিক বোঝেনি...

সুতৎপর সাংবাদিক এর পরেও ছেলেমানুষের মতই উক্তি করে বসল। আমতা আমতা করে বলল, সবই তো ভালো, এত নামযশ, রোজগারও খুব। তবু আর একটু খোঁজখবর করে নিলে হত না, একেবারে মত দিয়ে দিয়েছিস?

মত স্বেচ্ছায় দিলে শ্রাবণীর রাগ হত না। তার মতামতের যে কোনো প্রশ্নই ওঠেনি সে আর বলে কি করে! ফলে দাদার কথা, দাদার ব্যবহারটাই খারাপ লাগল। বলল, রেজিস্ট্রি অফিসে নোটিস চলে গেছে বাবাকে জানিয়ে দিও—

দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। টেলিফোনটার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে খানিকক্ষণ। খুব ইচ্ছে হয়েছে রিসিভারটা তোলে, নম্বর ডায়েল করে ডাকে। তারপর খুব সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করে, বিয়ে তো হবে, কিন্তু কেন হবে বলো তো? আমাতে কি দেখলে তুমি? কি পেলে? কি পাবে আশা করো?

বলতে পারলে বোঝা নামত। পারবে না তাও খুব ভালো করেই জানে।

বাবাকে শুভেন্দু কিছু বলেনি। মিলনীকে বাড়িতে ডেকে এনেছে। তাকে বলেছে। ইদানীং এ বাড়ির সঙ্গে গুণী দত্তর এই ঘনিষ্ঠ সংস্রব দাদার পছন্দ নয় কেন, তার একটু-আধটু আভাস মিলনী পেয়েছিল। কিন্তু একেবারে বিয়ে শুনে সে-ও হতভম্ব প্রথম। খুশি হবে কি হবে না নিজেই ঠিক পেল না। একবার ভাবল, ভদ্রলোক মানুষ বশ করতে জানে বটে—বেশ হয়েছে। আর একবার মনে হল, কেমন যেন হল, তার প্রোফেসার দিদি ম্যাজিসিয়ানের ঘরণী হবে এ যেন ঠিক আশা করা যায় না।

অবশ্য বাবাকে মহা আনন্দেই খবরটা জানালো সে। সুখবরই তো, হবে যখন বিয়ে, ভয়ানক সুখবর। বাবার নীরব বিস্ময় লক্ষ্য করে হড়বড়িয়ে গুণী দত্তর অজস্র প্রশংসা শুরু করে দিল সে। এ-রকম লোক হয় না, এ রকম লোক সচরাচর দেখা যায় না, সে-রকম লোক না হলে দিদির কাছে কেউ ঘেঁষতে পারে। বলল, খুব চমৎকার হল বাবা, ভদ্রলোক কম লোক নাকি, সমস্ত পৃথিবীর লোকে চেনে বলতে গেলে—

বাবার প্রথম বাক্‌স্ফুরণ হয়েছে রাতে খাবার টেবিলে। শ্রাবণী কলেজ থেকে ফিরে তাঁকে চিন্তাচ্ছন্ন দেখেছে। আর মিলনীকে দেখে ব্যাপারটা আঁচ করেছে। রাতে খেতে বসে শুভেন্দুকে উদ্দেশ করেই তিনি মন্তব্য করলেন, ভালোই তো হল রে, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে, নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছে।....কিন্তু রেজিস্ট্রি বিয়ে কেন, বাড়িতে কাজ হতে অসুবিধে কি?

কেউ জবাব দেয়নি। শেষের প্রশ্ন শ্রাবণীকে। তখনকার মত সে-ও নীরব। কিন্তু পরে চিরাচরিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে সে আপত্তি করেছে। আসলে কোনো আড়ম্বর মনঃপূত নয়। অথচ জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবে না, কেন আপত্তি!

এর পরেও গুণী দত্ত যেমন আসত তেমনি এসেছে একদিন। তেমনি হাসিখুশি

সহজ সরল মূর্তি। দম্ভ না থাকুক, নিজের পুরুষকার জানে যেন। শুভেন্দু আত্মীয়ের মতই উৎফুল্ল অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে। সম্পর্কে সে এখন দাদা, তাকে মান্যগণ্য করতে হবে—ছদ্মগাম্ভীর্যে এই দাবি জানিয়েছে। মিলনী কাছে না থাকলে হাল্‌কা ঠাট্টার চেষ্টাও করত হয়ত। কিন্তু প্রয়াসের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের তফাত কিন্তু হয়েই থাকে। ভাবী আত্মীয়ের স্বচ্ছ, উদ্ভাসিত একজোড়া চোখের মুখোমুখি পড়ে বার বার নিজেকে স্তিমিত মনে হয়েছে কেমন। মনে হয়েছে, সে তার ভেতর দেখছে, সঙ্কোচ ধরা পড়েছে বলেই কৌতুক উপচে উঠছে।

শুভেন্দু উঠে গেল। এক হোমরাচোমরা রাজপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা আছে নাকি।

সে ওঠামাত্র গুণী দত্ত হাসিমুখে মিলনীর দিকে ফিরল। বলল, পালালো।

মিলনী আজকের মত এত আগ্রহ নিয়ে আর কখনো তাকে লক্ষ্য করেনি। এই সহজাত দ্বিধাশূন্য ভাবভঙ্গি আগেও দেখেছে। কিন্তু আগের দেখায় আজকের দেখায় তফাত আছে। তার ভাল লাগছিল। শেষের মন্তব্যে সচকিত হল বটে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব মনে হল না।

চোখ টান করে বলল, পালাতে যাবে কেন?

গুণী দত্ত মৃদু মৃদু হাসতে লাগল শুধু।

মিলনী তার সঙ্গে লাগার জন্য আঁটসাঁট হয়ে বসল। বলল, দিদি তো খবর পেয়েছে আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন—আসছে না তো!

দুর্ভাগ্য। কি আর করব, দুধের সাধ ঘোলে মেটাই।

....ও! মিলনী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আচ্ছা মশাই বসুন, দুধই জোটে কিনা দেখি।

যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়াল। সাগ্রহে বলল, আপনি ম্যাজিক দেখালেন বটে, কি করে দেখালেন বলুন তো?

গুণী দত্ত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, এই ম্যাজিকে আমার থেকে তুমি অনেক বেশি পটু—অনেক আগেই দেখিয়ে বসে আছ শুনেছি।

মিলনী পালালো। শ্রাবণী রান্নাঘরের টুকিটাকি কাজ নিয়ে ছিল। ফাঁক পেলে রাঁধুনীর কাজ কিছুটা সে-ই এগিয়ে রাখে। মিলনী এসে বলল, কি করছিস এতক্ষণ ধরে বসে, এক পেয়ালা চা-ও তো পাঠালি না—

শ্রাবণী জবাব দিল না। ফাঁক পেলেই বাচালতা শুরু হবে জানে।

মিলনী বলল, দাদা উঠে গেল, ভদ্রলোক সেই থেকে হাঁ করে বসে আছে।

শ্রাবণী বলল, তুই তো আছিস।

মিলনী ধড়ফড় করে জবাব দিল, আমি নেই। তাঁর ঘোলে হবে না, দুধ চাই।

শ্রাবণীর রাগ করা হল না। তার আগেই মিলনী হেসে সারা। শেষে বলল, যাই বলিস দিদি, তুই ম্যাজিসিয়ান বিয়ে করবি জেনে প্রথম কেমন লেগেছিল, এখন বেশ ভালো লাগছে—ভদ্রলোক ক্ষমতাবান ব্যক্তি।

শ্রাবণী আবার গম্ভীর। চাউনিটাও ঈষৎ সমস্যাব্যঞ্জক।—তোর ভালো লাগা তো

আবার গোলমেলে ব্যাপার। প্রশান্তবাবুকে বলে দেখতে পারি—

মিলনী ঘর থেকে বেরিয়ে দুমদাম পা ফেলে হাসতে হাসতে দোতলায় উঠতে লাগল। অর্থাৎ জানান দিয়ে গেল, সে উপরে যাচ্ছে, বাইরের ঘরে একজন একা বসে আছে।

শ্রাবণীর হাত থেমে গেল। কেউ না গেলে কাউকে কিছু না বলে উঠে চলে যাবে হয়ত। উঠল। ভিতরের বারান্দা ধরে বাইরের ঘরে এলো।

গুণী দত্ত খুশি, এসো, আর দু'মিনিট দেরি করলে যা থাকে বরাতে বলে আমি অন্দরে ঢুকে পড়তাম। বোসো—

শুনতে খারাপ লাগল না কানে, শ্রাবণী অস্বীকার করবে না। যাদুমঞ্চে এই লোকের খাঁটি সাহেবিয়ানা দেখেছে, বাইরের কথাবার্তায় দিশি ধাঁচ। কখনও ভেজাল লক্ষ্য করেনি। শ্রাবণী বসল না। কাছের চেয়ারটার পিছনে দু'হাত রেখে দাঁড়াল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস।

এসে অন্যায় করলাম?

শ্রাবণী সহজভাবেই মাথা নাড়ল, না।

গুণী দত্তের চোখে-মুখে দুষ্টুমি, সাগ্রহে আবার জিজ্ঞাসা করল, তাহলে রোজই এক-আধবার এ-রকম আসা যেতে পারে?

ঠোঁটের হাসির আভাস আরো স্পষ্ট হল। শ্রাবণী বলল, না।

আসব না।

হতাশা দেখেও শ্রাবণী মাথা নাড়ল। তারপর চোখে চোখ রেখে তেমনি সহজভাবেই বলল, দু'দিন বাদে আমিই তো যাচ্ছি।

এসেছে। বিয়ে হয়ে গেছে।

পরের তিনটে মাস বলতে গেলে এক ধরনের আচ্ছন্নতার মধ্যেই কেটে গেল। দেহ-তটে ভাঙনের বন্যা নেমেছে। ভাঙছে ভাঙছে ভাঙছে, শ্রাবণীর দেহের অণুতে অণুতে এক প্রবল অবুঝের ভাঙার নেশা লেগেছে। অভ্যস্ত শিক্ষায় রুচিতে আত্মরক্ষার তাগিদে নিজের অগোচরে যতক্ষণ যোঝার চেষ্টা শ্রাবণীর ততক্ষণ যাতনা, এমন কি বিদ্বেষও। নিজেকে নিজের মধ্যে আগলে রাখার বর্ম ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিতে সময় লাগে না লুণ্ঠন-পটু মানুষটার, শ্রাবণী যুঝবে কতক্ষণ? এই ভাঙনের মুখে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই। সেই সমর্পণে মুক্তি। আর আশ্চর্য, দেহাতীত অনাবিল শান্তির মতও কিছু।

কিন্তু নিরিবিলি অবকাশে পুরুষের এই দ্বিধাহীন মত্ততা রুচিতে ঘা দেয়। স্থূল মনে হয়, নগ্ন মনে হয়। সে শিক্ষিতা মেয়ে, কলেজের প্রোফেসর, তার নিজস্ব পৃথক একটা সত্তা আছে। সে গোটাগুটি একটা মেয়ে, কাদা-মাটি নয়। দেহ-দেউলে যৌবনের স্বীকৃত-আরতির মধ্যেও কিছুটা প্রচ্ছন্নতা দরকার, একটু পরিচ্ছন্নতা-বোধ দরকার। গোড়ায় গোড়ায় শ্রাবণী হঠাৎ এক এক সময় বাপের বাড়ি চলে এসেছে। বলে এসেছে দিন কয়েক থাকবে। গুণী দত্ত বাধা দেয় না। কোনদিন মুখের দিকে চেয়ে শুধু হাসে,

কোনদিন কৃত্রিম ভয় দেখায়, এসে দেখবে আমিও কোথাও পালিয়েছি। সেটা শ্বশুরবাড়ির দিকেও হতে পারে।

একদিন বলল, যে মুখ করে যাচ্ছ মনে হচ্ছে বছরখানেকের ধাক্কা। আমি বড় জোর দু দিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারি—তার বেশি দেরি হলেই লঙ্কাকাণ্ড আর সীতা উদ্ধার অনিবার্য।

শ্রাবণী পা বাড়াতে গিয়েও থমকালো। মুখ টিপে হেসে বলল, তাহলে তারপরে তো পাতাল প্রবেশও অনিবার্য। কি বলো?

জব্দ হয়ে গুণী দত্ত চোখ পাকিয়েছে, আমি কি তোমার মত এম. এ. পাস করেছি যে ফটাফট জবাব দেব? যাও, দু দিনের দু মিনিট কাবার।

শ্রাবণী হাসিমুখেই গেছে। কিন্তু সত্যি এক দিন, বড় জোর দু দিনের বেশি কখনো থাকতে পারেনি। নিজের প্রতিই অকারণ ক্ষোভ, অকারণ অসহিষ্ণুতা। মন বাঁধতে না পারার দরুন নিজের ওপরেই বিরূপ। ছোট ভাইয়েরা নীরবে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করে, টের পায়। বাবা বা দাদার কথায় কান লাল হয়।—ক'দিন থাকবি বললি, এরই মধ্যে যাবি কেন?

মিলনী ঠোঁটকাটা, সে প্রকাশ্যেই ঠাট্টা করে। বলে, দিদি, এই ক'দিনেই তোর চেহারা বদলে গেছে।

শ্রাবণী চুপচাপ প্রতীক্ষা করে, খারাপ হয়েছে শুনলে খুশি হবে। কিন্তু মিলনী হাসে খিলখিল করে, আমার থেকেও তোকে কাঁচা আর তাজা লাগে এখন।

ফাজলামো করতে হবে না। শ্রাবণী রাগ করেই চলে যায়, কিন্তু আসলে সে পালায়। কারণ মিলনীর কথা একেবারে মিথ্যে মনে হয় না তার। বাপের বাড়ি এলে মিলনী টেলিফোনেও ঠাট্টা করে, কেন আবার এলি, কালই তো পালাবি।

ফিরে এসে নিজের ওপরেই দ্বিগুণ বিরূপ হয় শ্রাবণী। যে মানুষটা অকস্মাৎ তার জীবনে এসেছে, দু হাত বাড়িয়ে সাদরে তাকে অভ্যর্থনা করে নিতেই চায় সে। কিন্তু নিজেকে বিলুপ্ত করে দিয়ে নয়। পৃথক সত্তার একটি রমণী যে ভাবে পুরুষকে গ্রহণ করে—ঠিক তেমনি করেই। কিন্তু এই মানুষকে সে গ্রহণ করে না, এই মানুষ তাকে গ্রাস করে। আর এই গ্রাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্যেই শ্রাবণী আড়াল নেয়। অথচ দুটো দিন না যেতে আবার আসে। না এসে পারে না!

গুণী দত্ত মুচকি হাসে, চলে এলে?

হাল ছেড়ে শ্রাবণীও হেসেই ফেলে শেষ পর্যন্ত। বলে, তোমার অসুবিধে হল?

এখানকার দিনগত ধারাটি শ্রাবণীর ভালো লাগেনি। অনেকটা হোটেলবাড়ির মত ব্যবস্থা। সকলের সঙ্গে সকলের ঘনিষ্ঠ যোগ, কিন্তু সে শুধু কাজের, নয়তো স্বার্থের। শিকড়ের যোগ নেই। বিয়ের আগেই যে মেয়ে একটা গোটা বাড়ির কর্ত্রী হয়ে বসেছিল, তার চোখে এখানকার জীবনযাত্রা ছাড়া-ছাড়া লাগবেই। দু'বেলার আহার্যও নিচের হোটেল থেকে আসে। সে-পাটও রোজ থাকে না, এক জায়গা থেকে খেয়ে নিলেই হল।

এখানকার সকলকে পরিবারগত মানসিকতায় টেনে জুড়তে যাওয়া হাস্যকর, শ্রাবণী তাও বোঝে। বিদেশী মিরি ও মিসেস উড ব্যবসা করতে এসেছে—লাভের দিন ফুরালে তারা চলে যাবে। জুলি স্যান্ডারসনও বাসা বাঁধতে আসেনি, জীবিকার্জনের জন্য এসেছে। এরা যে-যার পৃথক বাস করলেই শ্রাবণী কোথাও ছোট বাসা নিয়ে যাকে বলে সংসার রচনায় মন দিতে পারত। এদের মধ্যে সে সংসারে শুধু শিরিন থাকতে পারে ধরে নিয়েছিল। এ পর্যন্ত গুণী দত্ত একমাত্র শিরিনের কথাই তাকে বলেছে। শিরিনের কথা বলতে গিয়ে চাঁদ সাহেবের কথা বলেছে। সেই হতাশার দুর্দিনে চাঁদ সাহেবের করুণার কথা—তার মদ খাওয়ার গল্প, লাজবন্তীর গল্প, শিরিনকে নিয়ে চাঁদ সাহেবের বম্বে পালানোর গল্প, গুণী দত্তকে বিলেত পাঠানোর গল্প আর বিলেত থেকে ফিরে আসার পর থেকে চাঁদ সাহেবের মৃত্যুর গল্পও।

অবাক হয়ে গল্পই শুনেছে শ্রাবণী।

আর পরে ভেবেছে, এই গল্প যার জীবনে, তার ঘর করতে আসাটাও কম বিচিত্র যোগাযোগ নয়। শ্রাবণীর জীবনে তো গল্প নেই কিছু। অথচ সে এত আকস্মিকভাবে এ-রকম জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল কি করে?

চাঁদ সাহেবের আর শিরিনের কথা শ্রাবণী কান পেতে শুনেছে। চাঁদ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েছে, তার পরিণাম শুনে ব্যথিত হয়েছে। কিন্তু অত মদ খেত অথচ এ-রকম বলিষ্ঠ উদার, অনায়াসে নিজের বিয়ে করা বউ ছেড়ে এলো অথচ আর এক রমণীর প্রতি এ-রকম প্রেমাসক্ত, অক্লেশে নিজের সন্তান বর্জন করল অথচ প্রণয়িণীর কন্যার প্রতি এ-রকম অন্ধ পিতৃত্বের আবেগ—এ সবই শুনে অবাক হবার মত সংগতি-শূন্য ব্যাপার। এদিকে শিরিনের শিখার মত রূপের দরুনই তাকে স্বতন্ত্র চোখে দেখে থাকে সকলে। সেই সঙ্গে ওই অতীত জড়িয়ে তাকে দেখলে স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডিটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। অন্তত নিজের অগোচরে অনায়াসে তাকে স্নেহবন্ধনে টেনে আনা খুব সহজ হয় না।

গোড়ার দিকে শ্রাবণী এই বিড়ম্বনাই ভোগ করেছে। কাছে এসে দাঁড়ালে ওর অস্বাভাবিক রূপের সঙ্গে অস্বাভাবিক অতীতটাও উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। এই মেয়ে কত কি হতে পারত। দু...রদৃষ্ট। তবে হাঁসের পালকে জল লেগে থাকে না, পাঁকের ফুলে পাঁকের দাগ পড়ে না—মেয়েটাও যেন সেই রকম। ও যা, ও তাই। ও শিরিন। কারো দয়ামায়ার ধার ধারে না। ওর দিকে চেয়ে কারো দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বে না। শ্রাবণীর মায়া হয়েছে ওর দিকে চেয়ে নয়, ওর প্রসঙ্গে নিজের মনে চিন্তা করতে গিয়ে। পূর্বাপর ভাবতে গিয়ে।

মনে মনে শ্রাবণী ওর প্রতি দায়িত্বটা খুব সহজ আন্তরিকতায় স্বীকার করে নিয়েছে। যার ঘরে এলো এই মেয়ের ব্যাপারে তার আন্তরিকতা স্পর্শ না করার কোন কারণ নেই। শুনেছে, মেয়েটার দিন এলো বলে। সেইদিনের রূপটা সাগ্রহে তার চোখের সামনে খুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু যাদুসহচরীর এই সার্থক রূপটাই একমাত্র কাম্য মনে হয়নি শ্রাবণীর। গুণী দত্ত যত বড় করে দেখিয়েছে শ্রাবণী ততো বড় করে দেখেনি বা দেখতে পারেনি। বলেছে, তা তো হল, কিন্তু ওর বিয়ে দেবে না?

উচ্ছ্বাসের মুখে এই গদ্যাকারের সমস্যার ধার-পাশ ঘেঁষেনি গুণী দত্ত। আর কেউ জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বিরক্ত হত। বলেছে, সে যা হয় হবে, ও এমন কি ব্যাপার।

একটা সংসার থেকে দস্যুর মত সদ্য তাকে এভাবে উপড়ে তুলে নিয়ে আসার পর এই নির্লিপ্ত উক্তি করল কি করে ভেবে শ্রাবণী কৌতুক বোধ করেছিল।

যাই হোক, এরই মধ্যে নতুন বাসা করার কথা বলা শোভনও নয়, শ্রাবণী বলেনি। তা'ছাড়া সফলকে নিয়ে মাথাও ঘামায়নি সে, শুধু যার প্রতি দায়িত্ব আছে ভেবেছে, তার দিকে একটু-আধটু মন দিয়েছে, শিরিনের দিকে। মেয়েটা তাকে আড়ে আড়ে লক্ষ্য করে, চোখাচোখি হলে দুষ্টু মেয়ের মত ঠোঁট কামড়ে হাসে। ডাকলে কাছে আসে। কিছু জিজ্ঞাসা করলে মাথা নেড়ে জবাব সারতে পারলে মুখ খোলে না। তাকে দেখে আর হাসে মিটিমিটি।

গুণীডাটার বউকে দেখে।

গুণীডাটার বউ। প্রথম শুনে কানে ভারী মিষ্টি লেগেছিল শ্রাবণীর। সবে চার পাঁচ দিন এসেছে এখানে। শিরিনের দূর থেকে তাকে দেখার মধ্যে তখন কৌতুকের থেকে বিস্ময় বেশি। রহস্যজনক কিছুই যেন ঘটেছে। ক'টা দিনের মধ্যে শ্রাবণী তাকে ঘরে ডাকার নিরিবিলি অবকাশ পায়নি। ঘরের মালিক বলতে গেলে সর্বক্ষণ ঘরে বসে। সেই দিনই প্রথম ফাঁক পেল।

ঘরের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। ঘাড় বাঁকিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে ধরা পড়ল।

শিরিন, শোনো—

পায়ে পায়ে ভিতরে এলো।

বোসো। ক'দিন ধরে দূর থেকেই খালি দেখে বেড়াচ্ছ, আমার চোখ নেই? শ্রাবণী হাসল, আমি কে বুঝেছ তো?

মায়া ভরা নিবিড় কালো আয়ত দুটো চোখ তার মুখের ওপর প্রসারিত হল। মাথা নাড়ল বুঝেছে।

কে বলো তো?

পাতলা ঠোঁটের ওধারে লালের আভাস দেখা গেল একটু। চোখে কৌতুকের ছোঁয়া লাগল।—গুণীডাটার বউ।

কানের মধ্যে বেশ খানিকক্ষণ রিনরিন করেছে। গুণীডাটার বউ। ছদ্ম বিস্ময়ে শ্রাবণী জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি গুণীডাটার বউ বলেই ডাকবে নাকি?

মিসেস দত্ত বলব।

শ্রাবণী এই পোশাকি সম্ভাষণ আশা করেনি। কিন্তু কোনো মন্তব্য না করে জিজ্ঞাসা করল, মিসেস দত্ত বলতে হবে কে শিখিয়ে দিয়েছে?

জুলি।

জুলির সঙ্গে তোমার খুব ভাব বুঝি?

এর আর কি জবাব। ঠোঁটের ফাঁকে আবার শুধু হাসির রেখা দেখা গেল একটু।

শুধু শিরিন নয়, কিছুটা বিশ্লেষণের চোখ নিয়ে শ্রাবণীকে গোড়ায় গোড়ায় পর্যবেক্ষণ করেছে প্রায় সকলেই। সাগ্রহে তার কথা শুনেছে, ধরণ-ধারণ বুঝতে চেষ্টা করেছে। মিসেস উড তার দিকে চোখ রেখেছে স্বার্থের কারণে। প্রতিষ্ঠানের ভালো-মন্দ গুণীডাটার কাঁধে—সেই কাঁধে হুট করে এসে যে মেয়ে পাকাপাকি ভর করল, তার প্রভাব কতদূর গড়াতে পারে তা আগে থাকতে বুঝে রাখা দরকার। এ বিয়েতে সব থেকে খুশি এডওয়ার্ড উড। কেন, তা শুধু জুলি আর গুণী দত্ত অনুমান করতে পারে। আর শ্রাবণীর প্রতি জুলির শুধু কৌতূহলই। তার বেশি কিছু নয়। তার বিবেচনায় গুণীডাটা বিচিত্র মানুষ। সেই মানুষ একেবারে স্ত্রীর অধিকার দিয়ে সরাসরি যাকে ঘরে নিয়ে এলো, তাকেও খুব সাধারণ মেয়ে ভাবা শক্ত। জুলি তা ভাবেওনি। এই জন্যেই তার কৌতূহল।

গুণীডাটার বউয়ের শিরিনের সঙ্গে হৃদ্যতার আগ্রহ দেখে সূচনা শুভ ভাবল জুলি স্যান্ডারসন। এই হৃদ্যতা পুষ্ট করে তোলার আগ্রহে সানন্দে সেও শ্রাবণীর ঘরে আসা-যাওয়া শুরু করল। শিরিনের জন্য মনে মনে ভয়ও আছে একটু। যে অদ্ভুত একরোখা স্বভাবের মেয়ে, গোড়াতেই কি হতে কি হয় ঠিক কি। গুণীডাটার বিয়ের পর কিভাবে চলাফেরা উচিত, কিভাবে কথাবার্তা কওয়া উচিত—সে সম্বন্ধে জুলি অনেক উপদেশ দিয়েছে শিরিনকে। আবার এক-একসময় নিজেরই মনে হয়েছে, এই মেয়েকে উপদেশ দেওয়া বৃথা।

পাঁচ কথার উত্তরে একবারও মুখ খুলতে না দেখে শ্রাবণীর মর্যাদা বাড়িয়ে শিরিনকেই যেন জব্দ করতে চেষ্টা করে সে।—এখন একেবারে বোবা কেন মেয়ে? তোমাকে টিট করার ঠিক লোক এসেছে দেখছি।

বলতে বলত শ্রাবণীর দিকে সরে বসেছে। পিঠে এক-ঘা কিল পড়বে সেই ভয় যেন।

শিরিনের অসাক্ষাতে বলেছে, তুমি প্রোফেসার শুনেছে তো, তাই একটু চুপচাপ আছে, নইলে দেখতে—

প্রোফেসার তাতে কি?

জুলির দু'চোখ গোল।—প্রোফেসার হওয়া কম কথা নাকি। আমাদের দেশে প্রোফেসারের ভয়ানক সম্মান, আমি তো এর আগে কোনো মেয়ে প্রোফেসার দেখিইনি।

শ্রাবণী হেসে ফেলেছিল।—প্রোফেসারের ভয়টা শিরিনকে তাহলে তুমিই দেখিয়েছ?

অনুমান মিথ্যে নয়। জুলিও হাসল। তারপর বলল, ও ভয় পাওয়ার মেয়েই নয়, আসলে তোমাকে দেখছে। ক'দিন বাদেই ওর দাপট টের পাবে।

পরমুহূর্তে বিপরীত প্রশংসায় পঞ্চমুখ।—যেমন সরল তেমন সবেতে ফুর্তি ওর। খুব ভালো মেয়ে। ওকে ভালো না বেসে কেউ পারে না। তবে রাগলে মুশকিল, আর বড় খেয়ালীও....

আচ্ছা, ওকে আমি বুঝে নেব'খন। শিরিনকে ছেড়ে শ্রাবণীর জুলির প্রতি মনোযোগ।—তোমার নিজের কথা বলো, শুনি।

আমার। জুলির বিব্রত মূর্তি।—আমার আবার কি কথা, আমি খুব খারাপ মেয়ে।

শ্রাবণী সাদাসিধে ভাবে জিজ্ঞাসা করেছে, এঁরাও কেউ তাহলে লোক ভালো নয় বলছ?

কেন? ভালো নয় কেন?

ভালো হলে তাদের মধ্যে একজন খারাপ মেয়ে থাকে কি করে?

জুলির মুখে হাসি ধরে না, প্রোফেসারস আর রিয়েলি ডিফ্‌রেন্ট....

না, জুলি মুখে নিজের কথা নিজে কিছুই বলেনি। একবারও বলেনি, সে না থাকলে গুণীডাটার মত ম্যাজিসিয়ান জন্মাত না, আর অনেক আগে শীতে তুষারপাতে জমে গিয়ে চোখ উল্টে দিতে হত।

গুণী দত্ত বলেছে। সে দুজনের কথাই বলেছে তাকে। শিরিন আর জুলির। শিরিনের প্রসঙ্গে তার বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করে সবিস্তারে সে চাঁদ সাহেবের গল্প করেছে। ওই মেয়েটার প্রতি তার কর্তব্যবোধ সজাগ রাখার জন্যে হয়ত। কিন্তু জুলি স্যান্ডারসনের প্রসঙ্গে সংক্ষেপে শেষ করেছে। শীতে দুর্যোগে দুঃসময়ে সে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই কৃতজ্ঞতার কথা বলেছে। তার বেশি কিছু না।

কিন্তু বললে ভালো করত বোধ হয়। শ্রাবণী মুখে না জিজ্ঞাসা করলেও মনে মনে তার জানার আগ্রহ ছিল। তাই স্বাভাবিক। যাকে কেন্দ্র করে নতুন জীবনে পদার্পণ, তার চারদিক স্পষ্ট করেই দেখে নিতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া এই একটি মেয়েকে নিয়ে দাদার মনে কিছু অস্বস্তি জমে আছে, বিয়ের আগে দাদা কিছু ইঙ্গিতও করেছিল। বিয়ে না হলে শ্রাবণী এ নিয়ে কিছুমাত্র মাথা ঘামাতো না, মাথা এখনও ঘামায় না। কিন্তু বিয়ে যখন হলই, তখন যার ঘরে এলো তাকে নিয়ে কারো কোনো সংশয়ও কাম্য নয়।

শ্রাবণী নিজেই আবার ও চিন্তা ঝেড়ে ফেলে একসময়। বলেনি যখন বলার মত কিছু নয়। অতীত ঘেঁটে কাজ কি। বর্তমানটা সত্যি হলেই হল। কিন্তু ঠিক এখানেই প্রথম থেকে শ্রাবণীর মনের তলায় ধোঁকা লেগে আছে একটু। ম্যাজিকের মতই এই বর্তমানটাও এক মস্ত বিভ্রম মনে হয় মাঝে মাঝে। মানুষটাকে তখন দেখতে চেষ্টা করে, বুঝতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাও পেরে ওঠে না, তার আগে আর একজনের দেখার গ্রাসের মধ্যে নিজেই যেন নিঃশেষে তলিয়ে যেতে থাকে। আজও, বিয়ের পরের সেই গোড়ার দিকের মতই। তারপর শ্রাবণীর দেখার অবকাশ, বোঝার অবকাশ আরো ঘুচে যায়—কেমন নির্মম নিষ্ঠুর উদ্‌ভ্রান্ত মনে হয় পুরুষের নিপীড়ন।

একটা সময় মাত্র তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে শ্রাবণী। নির্নিমেষে দেখে। যখন সজাগ থাকে তখন নয়, বিস্ময়ের ধোঁকা লাগিয়ে যখন দর্শক বিভ্রান্ত করে তখনো নয়—দেহ-তটে ভাঙন ধরানো সেই অতনু-সান্নিধ্যে তো নয়ই। দেখে যখন মানুষটা ঘুমোয় তখন। দেখে দেখে শ্রাবণী রহস্যের কূল কিনারা খোঁজে। সন্তর্পণে মুখে বুকে ঘাড়ে কাঁধে হাত বুলোয়। সত্যিই রহস্যের কিছু আছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করে, যাদু-মানুষ কিনা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে।

এই ঘুমন্ত মানুষকে দেখতে গিয়ে শ্রাবণী সেদিন ধাক্কা খেল একটা। লোকটা ঘুমোয় যখন, জোরালো ঘুম। গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে শ্রাবণীর হাতটা গেঞ্জির তলা দিয়ে পিঠের দিকে চলে গিয়েছিল। পিঠে আড়াআড়ি একটা অন্যরকম স্পর্শ আঙুলে ঠেকতে গেঞ্জি সরালো। শ্রাবণী চমকে হাত সরিয়ে নিল। এক আঙুল চওড়া সমস্ত পিঠ-জোড়া বীভৎস ক্ষতর দাগ একটা।

শ্রাবণী হতভম্বের মত বসে রইল খানিকক্ষণ। গেঞ্জিটা টেনে দিল। চোখে বেঁধে। ওটা আগে কখনো চোখে পড়েনি বা হাতে ঠেকেনি ভেবে অবাক হল। হাতে কেন ঠেকেনি নিজেই জানে। নিজের বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তখন....। কিন্তু চোখে পড়েনি কেন? ভাবতে গিয়ে খেয়াল হল, দিনে তো নয়ই, এ পর্যন্ত কোনদিন রাতের আলোতেও শুধু গায়ে দেখেনি তাকে। জিজ্ঞাসা করবে ভেবেও ভুলে গিয়েছিল। বিকেল হতে না হতে ম্যাজিকের তাড়া পড়ে যায়। রাতেও মনে ছিল না শ্রাবণীর। পরদিন হঠাৎ মনে পড়ল।

শুয়ে ছিল। অনেকক্ষণ ধরে চিবুকের জড়ুলটার ওপর হামলা চলছে। যত আদরের জায়গা ওইখানটায়। গোড়ায় গোড়ায় শ্রাবণীর অস্বস্তি হত, ঠোঁটের চাপে, দাড়ির ঘষায়, দাঁতের আঁচড়ে জ্বালা-জ্বালা করত। ক'দিন না যেতে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাও করেছিল, জড়ুলটা অত প্রিয় কেন? শুধু হাসি ছাড়া অন্য জবাব মেলেনি। কখনো বলেছে, তোমার দিকে তাকালে আগে ওইটেই চোখে পড়ে বলে।

বুকে পিঠে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে সরাতে গিয়ে পিঠের ওপর হাত পড়তেই শ্রাবণীর হাত থেমে গেল। অবশ্য হাতটা গেঞ্জির ওপর দিয়েই পড়েছিল, তবু মনে পড়ল।

দু'হাতে তার চুলের মুঠি ধরে এক-রকম জোর করেই মুখটা ঠেলে তুলল।—তোমার পিঠময় অমন বিদঘুটে একটা কাটা দাগ কিসের?

এই প্রথম আচমকা তাকে হকচকিয়ে যেতে দেখল শ্রাবণী। জলের জীবকে যেন হ্যাঁচকা টানে ডাঙায় তুলে ফেলা হয়েছে, সেই গোছের ধড়ফড় অবস্থা কয়েকটা মুহূর্ত। মনে হয়েছে জবাব পেতে অনেক সময় লাগছে।

মারের।

শ্রাবণী আঁতকেই উঠেছিল, ও-ভাবে কে মেরেছিল? কবে মেরেছিল?

বছর বারো আগে, চেলা কাঠ দিয়ে জ্যাঠামশাই মেরেছিল।

শ্রাবণীর মুখটা যাতনায় কুঁকড়ে গেল, নিজের অগোচরে গেঞ্জির তলা দিয়ে পিঠে হাত বুলালো একটু, যেন সদ্য ব্যাপার কিছু।—কেন?

গুণী দত্ত বলল, কেন! বলতে সময় লাগেনি খুব। বাহ্যিক বিচারে গোপনও কিছু করেনি।

শোনার পর শ্রাবণী বিমূঢ় অনেক... পর্যন্ত। বশীকরণ-মিষ্টি মুখে গুঁজে দেওয়ার জন্য একটা মেয়েকে ওইভাবে ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল শুনে হেসে ফেলেছিল প্রথম। কিন্তু তারপর সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কেমন যেন হাসার মত মনে হয়নি। পিঠের ওই ক্ষতচিহ্নটার জন্যেই আরো হয়নি। আড়ে আড়ে দেখল বারকয়েক, এই সান্নিধ্য সত্ত্বেও আর যেন কাছে নেই মানুষটা।

স্বর্ণর সম্বন্ধেই এটা সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগল শ্রাবণী। কিন্তু প্রশ্ন তার একটাই, সেই প্রশ্নটা করার মত ভিতরে ভিতরে বল সংগ্রহ করছিল সে।

খুব সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, তোমার সেই স্বর্ণর চিবুকে জড়ুল আছে?

হঠাৎ যেন আত্মস্থ হয়ে দূর থেকে কাছে এলো গুণী দত্ত। মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক, তারপর তার চিবুকে ঠোঁট ঠেকিয়ে তরল গলায় বলে উঠল, না, জড়ুল শুধু আমার শ্রাবণীর চিবুকে, আর কারো চিবুকে কিচ্ছু নেই।

চিবুকটা নিজের বুকের কাছে ঠেকিয়ে শ্রাবণী শুয়ে শুয়েই মুখটা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করেছে।....মিথ্যে মনে হয় না। এই লোক মিথ্যে বলতে পারে তাই মনে হয় না। মিথ্যে বলার হলে পিঠের ওই ক্ষতচিহ্নটার অন্য কারণ শুনত। একটু আগে কি একটা অনুভূতি আড়ষ্ট করে ফেলেছিল তাকে—সেটা গেল। কিছু একটা আশঙ্কা অপগত যেন। বুকের তলায় অননুভূত খুশির ঢেউ লাগল। খুশিতে আনন্দে দুই হাতে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল তাকে।

নিজে থেকে দুই বাহুর এই প্রথম অভ্যর্থনা শ্রাবণীর।

চকিতে গুণী দত্তর একবার মনে হয়েছে, কি একটা ভুলের বীজ বোনা হয়ে গেল। কিন্তু বলি-বলি কবেও আর কিছু বলা হল না।

॥ ১৪ ॥

আচম্বিতে সেই ভুলের ফসল দেখা গেল আবার একদিন।

কিন্তু মাঝে অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। ততদিনে গুণী দত্ত ভুলটাই বিস্মৃত হয়েছে।

আর বড়জোর মাসখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে তাদের। মিসেস উড বলা ছেড়েছে, তাগিদ দেওয়াও। জুলি স্যান্ডারসন হাসে, এক-একসময় শ্রাবণীকেই ঠাট্টা করে। বলে, মিসেস উড ব্যবসা তুলে দেবে কিনা ভাবছে যে। কিন্তু শ্রাবণী হাসি-ঠাট্টার ধার দিয়েও যায় না। তার ব্যবহারে সৌজন্যের ত্রুটি নেই এই পর্যন্ত।

যাওয়া আগেই হতে পারত, কিন্তু শ্রাবণীর জন্যেই হয়নি। সে কখনো বলে যাবে, কখনো গুণী দত্তকে বলে, এবারটা তোমরাই ঘুরে এসো।

সামনে তার যথার্থই বাস্তব সমস্যা একটা। যে-লোকের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে, এক জায়গায় স্থিতির জীবন নয় তার, এই খেয়ালটা আগে আদৌ হয়নি। অবশ্য খেয়াল হলেও করার কি ছিল জানে না, কিন্তু হয়নি। যত অভিজাত প্রতিষ্ঠানই হোক, একটা ম্যাজিকের দলের সঙ্গে তাকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে, এটা ভাবতেও অস্বাভাবিক লাগছে এখন। তার ইচ্ছে, এখানেই স্থায়ী বাসা নেওয়া হোক, মাঝে মাঝে দু-চার-ছ মাসের জন্য বাইরে যাক।

গুণী দত্ত হেসে আশ্বাস দিয়েছে, তাই হবে, তবে বছর আট-দশ বাদে। তার আগে সমস্ত প্রাচ্য দেশটা ম্যাজিসিয়ান গুণীডাটাকে চিনে নিক। মাথায় টাকার বৃষ্টি হোক।

এই দোটানার মধ্যে ছিল শ্রাবণী। একটা ধাক্কা খেয়েই মন স্থির করা সহজ হল।

শো দেখানো হচ্ছিল। এক প্যাকেট তাস নিয়ে গুণী দত্ত দর্শকদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ইচ্ছে-মত তাস টেনে নিতে বলছিল। এই যখন করে, তখন শুধু চড়া মাশুলের দর্শকদের কাছেই ঘোরে না, ব্যস্তসমস্তভাবে গোটা হল্‌টাই চক্কর দেয়। কম পয়সার টিকিট-ক্রেতাদেরও অবজ্ঞা করে না। পয়সা তারাও কম দেয় না।

একেবারে শেষের শ্রেণীতে দুই একটা তাস বিলি করে ফিরতে গিয়ে হঠাৎ যেন পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে গেল তার। নিস্পন্দ নিশ্চল কয়েকটা মুহূর্ত। তার সামনে বসে স্বর্ণ, পাশে বছর দশেকের রোগা ছেলে একটা। স্বর্ণও এত রোগা হয়েছে যে চিনতে পারার কথা নয়। যা দেখে চেনার কথা সেটা দেখেই চিনেছে। নাকের দু পাশের হাড় আরো উঁচিয়ে উঠেছে বলে তিলটাও আরো ঠেলে উঠেছে মনে হয়।

স্বর্ণ.... !

বিব্রত মুখে স্বর্ণ এদিক-ওদিক তাকালো, একবার ছেলের দিকেও। আশেপাশের কৌতূহলী চোখ ছেঁকে ধরেছে তাদের। হাসতে চেষ্টা করল, কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই ঘেমে উঠেছে।

একজন মহিলার সামনে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বিসদৃশ। দর্শকরা কেউ ঝুঁকে, কেউ ঘাড় ফিরিয়ে, কেউ বা ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছে। তাস দেবার ছলে গুণী দত্ত স্বর্ণর সামনে ঝুঁকল, বলল, শো ভাঙলে চলে যেও না, অপেক্ষা করো।

ওদিকে একটু দেরি হচ্ছে, আর কথা কইছে কারো সঙ্গে শ্রাবণীও লক্ষ্য করেছে। কিন্তু ফিরে আসার পরই সে অবাক। মুখের দিকে চেয়েই তার মনে হল, কিছু একটা ঘটে গেছে। তারপর যতবার গ্রীনরুমে এসেছে, ততবারই অস্বাভাবিক লেগেছে শ্রাবণীর। ওই মুখে প্রাণ নেই, খেলা দেখাবার সময়েও আর সেই বচনের জৌলুস ঠিকরোচ্ছে না।

শ্রাবণী জিজ্ঞাসা করেছে, কি হল, শরীর খারাপ হয়নি তো?

না।

কথা বলার অবকাশ কম, ব্যস্তসমস্তভাবে আবার গিয়ে স্টেজে ঢুকেছে।

শো ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গুণী দত্ত বেরিয়ে এলো। স্বর্ণ দেয়ালের একপাশে দাঁড়িয়ে ছেলের হাত ধরে অপেক্ষাই করছিল। গুণী দত্ত এসে ডেকে নিয়ে গেল। স্বর্ণ মূর্তির মত অনুসরণ করল তাকে। গ্রীনরুমের পাশে ছোট ঘর একটা, গুণী দত্ত সেইখানে নিয়ে এলো তাকে। ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, যাদুকর দেখছে। তার মা তাকে চেনে এই বিস্ময় ধরে না।

চেয়ে আছে গুণী দত্তও।

স্বর্ণ হাসল একটু, বলল, এতকাল বাদে তুমি চিনবে ভাবিনি!

গুণী দত্ত বলল না কিছু।

স্বর্ণ আবার বলল, ছেলেটা ম্যাজিক ম্যাজিক করছিল, কত নামডাক তোমার, ইস্কুলের ছেলেদের মুখে তোমার ম্যাজিকের গল্প শোনে আর বায়না ধরে, ম্যাজিক

দেখবে। ওর কাছেই প্রথম শুনি আমি। তারপর নিজেরও ইচ্ছে হল, দেখে আসি কেমন ম্যাজিসিয়ান হয়েছ!

গুণী দত্তর বাকস্ফুরণ হল এবার। বলল, ইচ্ছে হল তাই টিকিট কেটে দেখে গেলে?

ওমা, টিকিট কাটব না কেন! আমি কি একবারও ভেবেছি তোমার সঙ্গে এ-রকম দেখা হবে, আর হলেও তুমি আগের মত....

কথাটা শেষ করল না। তার আগেই একজনের দিকে চোখ গেল। এদিকেই আসছিল তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে।

আসছিল শ্রাবণী। তার দুশ্চিন্তাই হয়েছিল। ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল কিনা দেখতে এসেছিল। সেখানে ছেলের হাত ধরা আর একজনকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। ফিরে যাবে কি যাবে না ঠিক করার আগেই মেয়েটির মুখের ওপর চোখ পড়েছে শ্রাবণীর। ফেরা হয়নি, দাঁড়িয়েই গেছে।

স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করল, উনি কে?

গুণী দত্ত ঘাড় ফেরাল। শ্রাবণী এগিয়ে এলো। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। গুণী দত্ত জবাব দেয়নি। সে নিজের মধ্যে ফিরে আসেনি তখনো।

শ্রাবণী দু হাত জুড়ে নমস্কার জানালো, তারপর হাসিমুখে বলল, এসে পড়েছি যখন আর ফিরে গেলাম না।....আপনিই বলুন দেখি আমি কে?

বউদি! স্বর্ণ বিব্রত, কিন্তু উৎফুল্লও।

হ্যাঁ। আর আপনি স্বর্ণ, কেমন কিনা?

স্বর্ণ হকচকিয়ে গেল, আপনি আমাকে চিনলেন কি করে, গুণীদা বলেছে বুঝি? হাসল, কি ভাগ্যি আজ এসেছিলাম, এতকাল বাদে গুণীদা চিনবে ভাবিওনি!

শ্রাবণী হাসছে মুখ টিপে। মুখের ওপর থেকে চোখ সরেনি। বলল, আপনি বা আমি হাজারের মধ্যেও হারাব না, আপনার ওই তিল, আর আমার এই—। নিজের চিবুকটা দেখাল।

স্বর্ণ আগেই দেখেছে। কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণী হঠাৎ কেমন আড়ষ্ট হতে দেখল তাকে। সামনের লোকটাও নির্বাক।

শ্রাবণী হাসছে।—কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কেন, বাড়িতে আসুন না আমাদের সঙ্গে, আমরা এক্ষুনি যাব।

স্বর্ণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, না, আজ আর না, বাড়িতে ভাবছে। আজ যাই....।

শ্রাবণী বাধা দিল, এক যুগ বাদে তো দেখা হল আপনাদের, এক্ষুনি যাবেন কি! আচ্ছা, এখানেই বসুন তাহলে।

বসতে হল। শ্রাবণী ছেলেটিকে কাছে টেনে বসালো, নিজেও বসল। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে সহজ কৌতুকে গুণী দত্তকে বলল, তুমি ইচ্ছে করলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারো—

অগত্যা গুণী দত্তও বসল। শ্রাবণীর আচরণের এই সহজ প্রায়-প্রগল্‌ভ ব্যতিক্রমটুকু শুধু সে-ই অনুভব করতে পারে। শত সহস্র দর্শককে একসঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধ

করে রাখতে পারে যে লোক, কারো কোনো ভুলে বা নিজেরই কিছু অনবধানে বিড়ম্বনার মুখে পড়লেও হাস্য-কৌতুকে, বাগাড়ম্বরে বা একটা দিয়ে আর একটা করে অনায়াসে যে সামাল দিতে পারে, তার এই বিমূঢ় অবস্থাটা গুণী দত্ত নিজেই উপলব্ধি করতে পারে। কি এক অদ্ভুত অস্বস্তি! গুণী দত্ত বুঝে উঠছে না কি!

স্বর্ণ বলল, গুণীদার এখন এত নামডাক, টিকিট করে দেখার জন্য লোক ভেঙে পড়ে, আর ছেলেবেলায় ম্যাজিক দেখানোর জন্যে ও আমাদের ঘাড় ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসত—জানেন বৌদি?

শ্রাবণী হাসিমুখে আল্‌তো করে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ ম্যাজিকটা ভালো বলুন—এখনকার না ছেলেবেলার?

স্বর্ণর আড়ষ্টতা কেটে আসছিল। তবু এই প্রশ্ন শুনে বিব্রত বোধ করল কেমন। সব ছেড়ে গুণীদার তিল তোলার ম্যাজিকের স্মৃতিটাই অস্বস্তির কারণ। লঘু জবাব দিল, সে যা ম্যাজিক, ধরা পড়লে আবার রেগে আগুন হত। একবার ধরিয়ে দিয়ে জীবনদা কি মারটাই খেলে! বলতে বলতে মনে পড়ল কি, জিজ্ঞাসা করল, জীবনদা মারা গেছে, শুনেছ গুণীদা?

গুণী দত্ত মাথা নাড়ল। শুনেছে।

শ্রাবণী ভাবছিল, স্বর্ণকে যদি বলে ছেলেবেলার ম্যাজিকের মধ্যে বশীকরণ মিষ্টির ম্যাজিক দেখানোর জন্য স্বর্ণকে হিড়হিড় করে ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার গল্পটাই শুধু জানে, আর কিছু জানে না—তাহলে কি হয়? বলল না। এ রকম বলা স্বভাবও নয়। কিন্তু বলতে ইচ্ছে করছিল।

ছেলেটা সেই থেকে বার বার ঝুঁকে সামনের গ্রীনরুমের দিকে উঁকি দিচ্ছে। সরঞ্জাম আনা-নেওয়া দেখছে আর ভাবছে, যে ম্যাজিক দেখা হল, তার অনেক রহস্য বুঝি ওখানে গেলেই জানা যেত। শ্রাবণী লক্ষ্য করছিল, উঠে তার হাত ধরে টানল।—ওখানে কি আছে না আছে এখানে থেকে বুঝবে কি করে, এসো দেখিয়ে আনি।

ছেলেটি সানন্দে তার সঙ্গে চলে গেল। গুণী দত্ত ভাবল, ইচ্ছে করে উঠে গেল। মনে হল, না গেলে ভালো হত।

স্বর্ণ ঘুরে বসল তার দিকে। বলল, বউদি খুব ভালো হয়েছে। কবে বিয়ে করলে?

বলল।

ওমা, মাত্র সেদিন! এখানে আলাপ বুঝি?

মাথা নাড়ল।

স্বর্ণ বলল, সব শুনতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু রাত হয়ে গেল, বাড়িতে ভাবছে। ভেবেছিলাম তোমার ম্যাজিকই দেখব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।....দেশের কথা তো ভুলেই গেছ, না?

দিনকয়েক আগে গেছলাম।

বাঁকড়োয়? আমাদের বাড়ি গেছলে?

না, বেশিক্ষণ ছিলাম না।

শুধু যায়নি বলেই গুণী দত্ত চুপ করল না কেন? স্বর্ণদের বাগানে গিয়েছিল,

পুকুরধারে গিয়েছিল। বাড়ি যাবারও সময় ছিল। যায়নি। মিথ্যে বলার দরকার হল কেন? গুণী দত্ত গ্রীনরুমের দিকে ঘাড় ফেরাল। অস্বস্তি বাড়ছে—শ্রাবণী আসছে না কেন? ক্লান্ত লাগছে, বাড়ি যেতে হবে।

কিসের অস্বস্তি, কেন অস্বস্তি গুণী দত্ত জানে। আজই প্রথম উপলব্ধি করেছে। করছে। কতকালের এক জমাট-বাঁধা অনুভূতি বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে বলেই এই অস্বস্তি। যে বয়েসটার মধ্যে তার সত্তার একটা দিক আটকে ছিল এতকাল, আজ হঠাৎ তার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এলো বলেই, এই অস্বস্তি। এই মুহূর্তে সে যা, সে তাই। আজকের পরিচয়টাই তার পরিচয়, আজকের বয়েসটাই তার বয়েস। এই সদ্য বর্তমানটাই সত্যি। এই স্বর্ণও এখন অনেক অনেক দূরের স্মৃতি। মৃত স্মৃতি। মৃতকে কে সজীব করে আগলে রাখে? গুণী দত্ত রেখেছিল। সেই পাগলামি সে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে বলেই এত অস্বস্তি।

স্বর্ণ এটা-সেটা কি বলছিল ঠিক কানে যাচ্ছে না। তার শেষের কথা কানে গেল। স্বর্ণ বলল, তুমি অনেক বদলেছ—

গুণী দত্ত হাসতে চেষ্টা করল।—কি রকম?

ম্যাজিকের সময় সকলকে অত হাসাচ্ছিলে, বাইরে দেখছি বেশ গম্ভীর। কিন্তু আমার যে দেরি হয়ে গেল, বউদিকে ডাকো—

ডাকতে হল না। ছেলের হাত ধরে শ্রাবণী নিজেই এলো। হেসে বলল, কোন্‌টা দিয়ে কি হয় ওর খুব জানার শখ, মাকে নিয়ে আর একদিন সময় করে এসো, ওই ম্যাজিসিয়ান সব বুঝিয়ে দেবে।

স্বর্ণ উঠে পড়ল। ছেলের উদ্দেশে বলল, এ পারলে এখনই বুঝতে শুরু করে। আজ চলি বউদি, অনেক দূর যেতে হবে।

ছেলের হাত ধরে সে এগিয়ে গেল। শ্রাবণী সঙ্গ নিল। গুণী দত্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে। স্বর্ণর বাড়ির ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করা হল না বা করল না।....

শ্রাবণীর কাছ থেকে আর একবার বিদায় নিয়ে ছেলের হাত ধরে স্বর্ণ তাড়াতাড়ি বাস-স্টপের দিকে চলল। তার বেশ দেরিই হয়ে গেছে মনে হয়। অনেক দূর যাবে বলল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে শ্রাবণী নিজেদের একটা গাড়িও দেখল না। দেখলে ওদের পৌঁছে দিয়ে আসতে বলত। একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবার কথাও ভেবেছিল। বলে ফেললে শ্রাবণী নিজেই লজ্জায় পড়ত। টিকিট কেটে ম্যাজিক দেখতেই হয়ত ওদের অনেক খরচ হয়ে গেছে।

গাড়িতে বসে গুণী দত্ত কোণে ঠেস দিয়ে সিগারেট টানছে। শ্রাবণী সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা করল, স্বর্ণ বুঝি আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

ছেলেটাও রোগা দেখলাম। আর অবস্থাপত্রও তো তেমন ভালো মনে হল না। পয়সা খরচ করে দেখে গেল, তুমি পাস পাঠাওনি কেন?

ঠিকানা জানতুম না।

এখন জেনে নিয়েছ?

না।

বেশ। তোমার কাণ্ডই আলাদা, আর তাহলে দেখা হবে কেমন করে?

গুণী দত্ত জবাব দিল না। আগেরটার থেকেই আর একটা সিগারেট ধরাল। ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। একটাই জবাব ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চাইছে, তুমি যা-ই বুঝে থাক শ্রাবণী, বিশ্বাস কর, আজ এতদিনে এই দেখার পর স্বর্ণ-জ্বর আমার ছেড়ে গেছে।

কিন্তু এমন একটা হাস্যকর অনুভূতির কথা মুখ ফুটে বলা গেল না।

বিয়ের পর থেকে শ্রাবণী এত সহজ আর স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আর ফিরে আসেনি যেন। বিয়ের আগে যেমন ছিল প্রায় তেমনি। শ্রাবণীর কিছু ভাবতে বাকি আছে এখনো, কিছু ফাঁক জুড়তে বাকি আছে। সেইটুকু জোড়া হলে আর ভাবা হলে দিনের আলোর মত অনেক কিছু স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার তাড়া নেই, হাতে শিগগিরই অখণ্ড অবকাশ আসবে। আজ নয়, এখন নয়। তখন ভাববে। লোকটা রূপ চেনে, রূপের কদর জানে না—রূপের আগুন ঘরেই পুষছে। তবু সেদিকে না তাকিয়ে প্রথম দিন দেখার পর থেকেই শ্রাবণীকেই টেনেছে, তাকে ঘরে এনেছে। কেন এনেছে শ্রাবণী পরে ভাববে।

....চিবুকের এই চিহ্ন এত প্রিয় কেন জিজ্ঞাসা করলেই বলত, মুখের দিকে তাকালে আগে এটা চোখে পড়ে তাই। আজ শ্রাবণী একজনকে দেখল যার মুখের দিকে তাকালে জড়ুল না হোক, আগে অন্য কিছুর দিকে চোখ পড়ে। আর সেটা চোখে এমন পড়াই পড়েছিল যার দরুণ পিঠে ওই বীভৎস দাগ। কিন্তু আজ নয়। শিগগিরই সব কিছু ভাবার সুযোগ পাবে শ্রাবণী। শ্রাবণী দত্ত আর ক'দিনের, শ্রাবণী নন্দী যতদিন ছিল তখনকার মত অঢেল সময় পাবে হাতে। বাইরে শান্ত হলেও মনটাকে যেন কোন চিন্তার মধ্যে গুছিয়ে আনা যাচ্ছে না এখন। এ ভাব যখন পুরোপুরি কেটে যাবে, তখন ভাববে, তখন চিন্তা করবে।

নির্বিবাদে দিন কুড়ি কেটেছে আরো, শ্রাবণী কিছু জানতে দেয়নি, কিছু বুঝতেও দেয়নি। অবশ্য যাবার তাড়া তখন, সকলেই ব্যস্ত।

মাত্র দিন দশেক আগে শ্রাবণী জানিয়েছে যে সে যাচ্ছে না।

শুনে গুণী দত্ত অবাক। শ্রাবণী জোর করার অবকাশ দেয়নি তাকে, সহজভাবেই বলেছে, হুট করে এখন চাকরিটা ছাড়বে না, বাইরে ঘোরাঘুরি পরে তো আছেই, এবারটা থাক্।

এবার বলতে তুমি কতদিন ভেবেছ?

কতদিন! শ্রাবণী ফিরে জিজ্ঞাসা করেছে।

কম করে দু বছর। দুটো বছরের জন্যে তোমাকে এখানে রেখে যাওয়া আমার ইচ্ছে নয়।

বিদেশে গেলে লোকে এর থেকে বেশি দিনের জন্যেও রেখে যায়। শ্রাবণীর সহজতায় চিড় খায়নি।—দুটো বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হেসেছে, থাকতে যদি না-ই পার, লিখো, যেতে কতক্ষণ! কলেজে একটা নোটিস পর্যন্ত দিইনি, এভাবে

যাওয়া ঠিক নয়।

এই লোকের ইচ্ছের ওপরে নিজের ইচ্ছেটাকে এভাবে দাঁড় করানো গেল দেখে ভিতরে ভিতরে শ্রাবণী বিস্মিত, পরিতুষ্ট।

এ ব্যবস্থা গুণী দত্তর একটুও মনঃপূত হয়নি। কিন্তু সে বাধাও দেয়নি। আর আপত্তি করেনি। শুধু মনে হয়েছে, অনেক কথা শ্রাবণীকে বলার ছিল, অনেক কিছু বোঝাবার ছিল, অথচ কি বলবে, কি বোঝাবে, তা নিজের কাছেও তেমন স্পষ্ট নয়। তার একটা বিকার কেটেছে, ঘোর কেটেছে, সে গোটাগুটি নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে—এ বলার কথাও নয়, বোঝাবার কথাও নয়। উপলব্ধির কথা। কাছে থাকলে শ্রাবণী তা টের পেত। পেলেই ভালো হত।

কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামানোর খুব অবকাশও মেলেনি। অনেক দিন বাদে বেরুচ্ছে। বাইরের দিকে মন ছুটেছে। সকলেই ব্যস্ত, সকলেরই উৎসাহ। গুণী দত্তর ব্যস্ততা আর উৎসাহ সকলের থেকে বেশি। মিসেস উডের সঙ্গে বসে বাইরের প্রোগ্রাম করে, ব্যবস্থাপত্র দেখে। কারণে অকারণে জুলিকে চোখ রাঙায়। শ্রাবণীকে জিজ্ঞাসা করে, তার মন বদলালো কিনা, সত্যিই থাকবে না যাবে!

শ্রাবণী বিরক্তি গোপন করে।

জুলি স্যান্ডারসনও যাবার জন্যে অনেকবার সাধাসাধি করেছে তাকে। শেষে হেসে ভয়ও দেখাতে চেষ্টা করেছে, যে লোককে পেয়েছ এভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়, বুঝলে? যাবে তো চলো!

তার সঙ্গেও সদয় ব্যবহার করেছে শ্রাবণী। হেসেই জবাব দিয়েছে, ভয়টা কি, তুমিই তো রইলে!

দেড় বছর দু বছরের জায়গায় একটানা সাড়ে তিন বছরেরও ওপর কেটে গেল।

এই সাড়ে তিনটে বছরের প্রতিটি দিন হিসাবের মধ্য দিয়ে কাটাতে হলে যে ভাবে কাটে, শ্রাবণীর তেমনি কেটেছে।

তারা রওনা হবার পনের দিনের মধ্যে সব ভাবনা-চিন্তা যেন ফুরিয়ে গেছে। তারপর থেকেই প্রতীক্ষা শুরু। শ্রাবণীর যা ভাববার ছিল ভাবা হয়ে গেছে, যা জানবার ছিল জানা হয়ে গেছে। ভেবে আর জেনে রিক্ততা-বোধটাই বেড়েছে শুধু, যাতনা বেড়েছে। আর কিছু লাভ হয়নি।

কিন্তু আসলে শ্রাবণীর ভাবারও কিছু ছিল না, জানারও কিছু ছিল না। স্বর্ণকে দেখার পর কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই তার চোখের সামনে থেকে একটা দুর্বোধ্য যবনিকা সরে গিয়েছিল। সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর ভবিষ্যতেই বা কোথায় দাঁড়াবে—সেটা উপলব্ধি করার মত একটু নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ খুঁজছিল শুধু। কিন্তু কটা দিন না যেতে সেই অবকাশ দুর্বহ বোঝার মত বুকে চেপে বসেছে। সব জেনে আর সব বুঝেও শ্রাবণী এখন করবে কী?

যাবার ঠিক আগে আবার মানুষটা অশান্ত, অখুশি মন নিয়ে গেছে। যাবার দিনও বলেছে, এলেই না তা হলে....।

শ্রাবণী মনে মনে খুশি হয়েছিল। নিজেকে পুরোপুরি উদ্ধার করতে পেরেছে মনে হয়েছে। কিন্তু দিন-কতকের মধ্যেই অন্য রকম ভাবতে শুরু করেছে।

মানুষের চিত্তবৃত্তি ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। দেড়টা-দুটো বছরে অনেকগুলি মাস, অনেকগুলি দিন। অতদিন ওই অশান্ত অখুশি মন নিয়েই ওই লোক বসে থাকবে না। থাকার কথা নয়। শ্রাবণীর হঠাৎ মনে হয়েছে, তার অস্তিত্ব নিষ্প্রভ হওয়ার মতই দীর্ঘ সময় এই দেড়টা-দুটো বছর।

মনে হয়েছে, ভুল হল। জুলি স্যান্ডারসনের কথা শুনলে ভালো ছিল। এইখানেই যা হোক একটা বোঝাপড়া করে নিলে হয়ত সবই আবার সহজ হতে পারত। ধরা তো শ্রাবণী পড়েনি, ধরা বরং শ্রাবণীর কাছে সে পড়েছে। ধরা যে পড়েছে সে-সম্বন্ধে তাকে সচেতন করার বদলে শ্রাবণী নিজের ওপর এই শাস্তি চাপাল কেন? ওই লোক কতটুকু সচেতন হয়েছে? আর হলেও তার জের কতদিন থাকবে?

পুরুষমানুষের সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস শ্রাবণীর ভিতরে ভিতরে আগেই দানা বেঁধে ছিল। বিয়ের আগেই। রূপের মোহে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পুরুষও কতখানি নির্লজ্জ হতে পারে তা বাপের বাড়িতেই দেখেছিল। প্রশান্তকে মন দেবার মত কোন সুযোগ ঘটেনি, তাই অকাতরে মিলনীর সঙ্গে তার বিয়েও দিতে পেরেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে গোটা পুরুষ জাতটাকেই যেন যাচাই করা হয়ে গিয়েছিল।

তার এই পুরুষ আরো অশান্ত, দুর্দম। দুরন্ত ভোগবিলাসী। সেই ভোগের তাড়নার কথা মনে হলে শ্রাবণীর এখনো রুচিতে ঘা পড়ে। তাকে সে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়ে সচেতন করতে চেয়েছে, জব্দ করতে চেয়েছে।

কিন্তু কেবলই মনে হয়েছে, জব্দ হওয়ার লোক সে নয়। মনে হয়েছে, উল্টে তারই ভুল হল।

এই ভুলের চাপা যাতনা পুষছিল শ্রাবণী। ফলে গোড়া থেকেই প্রতীক্ষা শুরু হয়েছিল তার। নিজের ওপরেই ক্ষোভ আর বিরক্তি। ক্ষোভ আর বিরক্তি চতুর্গুণ বাড়ে, যখন তার সমস্ত কঠিন প্রস্তুতি আর রূঢ় বিশ্লেষণের ফাঁক দিয়ে, শিক্ষা আর রুচিবোধের ফাঁক দিয়ে অগোচর নিভৃতের একটা গোপন সত্য হঠাৎ ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চায়। যখন সদ্য ঘুম-ভাঙা বুকের ভিতরটায় একটা শূন্যতা টনটনিয়ে ওঠে আর অবুঝের মত একটা নিঃশব্দ খোঁজাখুঁজি চলতে থাকে। যখন মনে হয় ঘটনাচক্রে জীবনে যে রাজসিক ভোগীর পদার্পণ ঘটে গেছে, সে যেমনই হোক, কোনমতে হারাবার মত নয়। ওই পুরুষ নারীর কাম্য।

নিভৃতে এই সত্যটাই শ্রাবণীর অস্বীকার করার চেষ্টা। পারে না যখন তখনই অসহায় বোধ করে। তারপর ক্ষোভ, তারপর অসহিষ্ণুতা।

বাড়ির সকলে ভেবেছিল, এতকাল যে এখানকার হাল ধরে ছিল, দীর্ঘকালের জন্য সে আবার ফিরে এলো যখন—সব কিছুই আগের মত চলবে। বাইরে থেকে দেখতে গেলে আগের মতই চলেছে। শ্রাবণী পরিত্যক্ত হালটি আবার ধরেছে। গত ক'মাসে এখানকার গোছানো সংসার যেন ঢিলে-ঢালা শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। সেই শ্রী ফিরিয়ে আনতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। শ্রাবণীর মনে হয়েছে সে গেল

না বলে ভাইয়েরা মনে মনে খুশি, এমন কি বাবাও হয়তো খুশি হয়েছেন। এখানে তার প্রয়োজন অনুভব করে সকলে, কিন্তু আর এক জায়গায় সে না থাকলেও চলে। চলে যাচ্ছে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্রাবণী অনেকদিন থমকেছে। বিয়ের পর এক নাগাড়ে তিন-চারদিনও সে এখানে এসে থাকতে পারত না। বাধা দিক না দিক, আর একজনও চাইত না সে এখানে এসে থাকুক। কেন চাইত না? তার ঘর শ্রীহীন হত বলে? বুকের কাছের কেউ না থাকলে ভালো লাগত না বলে? না। তার থেকে অনেক স্থূল প্রয়োজনে শ্রাবণী নিজেকে বিলিয়েছে, নিজেকে আহুতি দিয়েছে। শ্রাবণীর ক্ষোভ হয়েছে, আফসোস হয়েছে। স্বর্ণকে আগে দেখা থাকলে ঠিক এ-রকমটা হত না। আগে শুধু তার কথা শুনেছিল, আগে দেখেনি। স্বর্ণর উপর তার একটুও ঈর্ষা নেই, ঈর্ষার কথা ভাবতেও তার শিক্ষিত মন সঙ্কোচে ভরে ওঠে। ঈর্ষা নয়। কলেজে হাজিরার খাতা নিয়ে নাম ডাকার সময় মেয়েরাও আজকাল একজনের হয়ে আর একজন প্রক্সি দেয়। শ্রাবণী সেটা জেনেও কোনদিন কাউকে ধরে অপদস্থ করেনি। কিন্তু সেদিন এক মেয়েকে রীতিমত অপমান করল, স্বল্প কথায় কঠিন কটূক্তি করল। শ্রাবণী পরে তলিয়ে ভেবেছে, কেন করল! ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এর থেকে অনেক অনেক বড় অধ্যায়ে তাকে ওই ভূমিকাই নিতে হয়েছে। একজনের হয়ে এক উদ্‌ভ্রান্ত আবেগময় শূন্যতা ভরাট করতে হয়েছে। শ্রাবণীকে কেউ বলে দেয়নি, সে নিজেই বুঝেছে। একটু একটু করে অনেক দিনে বুঝেছে। প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে স্বর্ণকে দেখা অবধি অনেক দিনের অনেক খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে বুঝেছে। ঈর্ষা নয়, সে যা সে তাই। সে কারো হয়ে প্রক্সি দিতে চায়নি।

কিন্তু তা বলে বাড়ির সকলের এই প্রচ্ছন্ন তুষ্টিভাবও শ্রাবণীর ভালো লাগেনি। সে এখানে এসে আবার সংসারের হাল ধরতে পেরে খুব খুশি হয়েছে ভাবে যদি, তাহলে চতুর্গুণ অস্বস্তি। বিয়ের পর মেয়েদের ভিন্ন সংসার হয়। মিলনীর হয়েছে। তারও তাই হয়েছে ভাবুক সকলে। সে স্বেচ্ছায় কিছুকালের জন্যে এসে আছে এখানে শুধু তাই ভাবুক।

এখানে আসার ক'দিনের মধ্যে বাবাকে গিয়ে বলেছে, এরপর এভাবে কি করে চলবে, দাদাকে বিয়ে করতে বলো।

দাদা, ভাইয়েরা, এমন কি বাবাও শ্রাবণীর হাবভাব দেখে কিছু যেন তফাত অনুভব করে। কারণ সে যা ভেবেছিল তারা সত্যিই তা ভাবেনি। সে দীর্ঘদিনের জন্য এখানে আসতে তারা শুধু খুশি হয়েছিল। কিন্তু মুখে প্রকাশ না হলেও সকলেরই মনে হত, যে এলো তার সহজাত স্নিগ্ধ সহিষ্ণুতায় কোথাও একটু চিড় খেয়েছে।

বিয়ের কথা শ্রাবণী শুভেন্দুকেও বলেছে। মনে মনে দাদার ওপরে সে বিরূপও একটু। যে লোক এতদিনের জন্য বিদেশে চলে গেল তার প্রসঙ্গ দাদা সন্তর্পণে এড়িয়ে যায় সেটা সে লক্ষ্য করেছে। তার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে না। শ্রাবণী জানে, দাদা এখনো তাকে বিশ্বাস করে না। শ্রাবণী নিজে বিশ্বাস করুক না করুক আর কেউ বিশ্বাস করবে না, সেটা বরদাস্ত করতে পারে না। দোষত্রুটি যাই থাক, ওই

লোকের তুলনায় দাদাকে সে অনেক নির্জীব মনে করে।

মিলনী আসে। দু'চারদিন থাকেও। দিদির পরিবর্তনের আভাস সেও পায়। একদিন বলল, তুই গেলে পারতিস দিদি।

কেন?

এখানে তোর মন টিকছে না।

শ্রাবণী সচকিত হয়। আর দ্বিগুণ বিরক্ত হয়। মিলনীকে ধমকে ওঠে। প্রশান্তকে দেখে মনে হয়, ওকে নিয়ে মিলনী হয়ত তার সঙ্গে জটলা করে। বলা সম্ভব হলে শ্রাবণী বলত, তুই ওকে বিয়ে করে আমার উপকার করেছিস—সুখে থাক তোরা।

অথচ যাকে কেন্দ্র করে এই উল্টোপাল্টা চিন্তা তার প্রতি চাপা ক্ষোভ দিনে দিনে বাড়ছে বই কমছে না।

বাবা অবশ্য খোঁজখবর নেন। কেমন আছে, কবে চিঠি এলো না এলো জিজ্ঞাসা করেন।

চিঠি আসে অনেকদিন পরে পরে। এই জায়গা ছাড়ল—এই জায়গা ছাড়বে। এই জায়গায় পৌঁছুলো—এই জায়গায় পৌঁছুবে। চিঠি শ্রাবণীও লেখে। স্বাভাবিক চিঠি। কোন অনুযোগ নেই, কোন অভিযোগ নেই। প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়, শরীরের প্রতি যত্ন না নিলে রাগ করবে লেখে।

ভারতবর্ষ ছেড়ে দূর প্রাচ্যে পা বাড়ানোর পর চিঠি আসা আরও কমল। তিন-চার মাস বাদে একটা খবর আসে। ভালো আছে। সর্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা পাচ্ছে। তবে সময় পাচ্ছে না। পরিশ্রম করতে হচ্ছে খুব, এক-একদিন তিন শো-এর কমে অব্যাহতি নেই। চিঠি লেখা শ্রাবণীরও কমেছে। চিঠি পেলে জবাব একটা দেয়। ওদিকের ঘোরাঘুরির ফলে সময়মত সেই জবাব হয়ত হাতে পৌঁছয় না।

দ্বিতীয় বছর গিয়ে তৃতীয় বছরে গড়াল।

তৃতীয় বছরে সর্বসমেত দুখানা চিঠি পেয়েছে। শেষ পত্র দিয়েছে আরব থেকে। কবে আসবে কোন উল্লেখ নেই। মনে যাই-ই থাক যাবার আগে শ্রাবণী বলেছিল, থাকতে যদি না-ই পারো, লিখো, যেতে কতক্ষণ। লেখা দূরে থাক, এ পর্যন্ত থাকতে না পারার কোনো লক্ষণ দেখল না। ভালোই আছে বোধ হয়। খুব ভালো না থাকলে ওই লোক এভাবে থাকতে পারে?

সমস্ত দূর প্রাচ্যে যাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়ানোর তুলনায় সাড়ে তিনটা বছর কিছু নয়, এই যুক্তি খাড়া করিয়ে শ্রাবণী নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে চেষ্টা পণ্ডশ্রম। গুণী দত্ত তার সাফল্যের বৃত্তান্ত কখনো লেখেইনি বলতে গেলে। কিন্তু যা লিখেছে শ্রাবণী দত্ত তার থেকে অনেকগুণ বেশিই জেনেছে। সমস্ত পৃথিবীর যাদু সাময়িকী-সমাচার আগে আসত। গুণী দত্তর ঠিকানায়। এখানকার এজেন্টকে যাবার আগে সে শ্রাবণীর বাপের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিল। এখন সেগুলো এখানে আসে।

অতএব প্রাচ্য দেশের দর্শকদের আবেগ কোন্ স্তরে পৌঁছেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর শ্রাবণী রাখে।

সেই সঙ্গে আর এক নয়ন-মন-হারিণী শিল্পীর আবির্ভাবের খবরও রাখে। সেই আবির্ভাবের ঘোষণা যাদু-সাময়িকী ছেড়ে সাধারণ কাগজে আর সাহিত্যপত্রেও বিস্তারলাভ করেছে।

সেই শিল্পী ভানুমতী। অনন্য যাদুকর গুণীডাটার রূপে রূপে অপরূপা প্রধান যাদুসহচরী ভানুমতী।

যাদু জগতের ভানুমতীই বটে। শ্রাবণী প্রদর্শনীরত যুগ্ম ছবি দেখেছে দুজনের। একটা দুটো নয়—এ পর্যন্ত অনেক দেখেছে। যাদু-মঞ্চে শিরিন বলে কেউ নেই। শিরিন ভানুমতী হয়েছে।

নামটা কে দিল ?

কে আবার দেবে, যে দিতে পারে সে-ই দিয়েছে। শিরিনকে দেখেছে ছুরির ফলার মত, কিন্তু ছবির এ মেয়ে স্বপ্নরাজ্যের মেয়ে। ভানুমতী ছাড়া অন্য নামে মানায় না।

শ্রাবণী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে ছবিগুলো। এই লোককেও রহস্যময়ই মনে হয় বটে। আগে যেমন মনে হত। আগে কেন, কটা মাসের যুগল জীবনের নিভৃতময় সান্নিধ্য সত্ত্বেও মঞ্চের মানুষটাকে রহস্যময়ই লেগেছে, রহস্যে ঘেরা মনে হয়েছে।

দর্শক-চিত্ত পরিক্রমা করেছে কোনো কোনো কাগজ। এক-এক জায়গায় দর্শক উন্মত্ত পাগল হয়ে উঠেছে নাকি, টিকিটের আশায় তাজ্জব কাণ্ডকারখানা করেছে। কিন্তু কাকে দেখার জন্য পাগল দর্শক ? গুণীডাটার ম্যাজিক দেখার জন্য, না ভানুমতীকে দেখার জন্য ? অনেকবারের দেখা ছবিগুলোতে আবারও চোখ বুলিয়েছে শ্রাবণী। মনে হয়েছে দুজনের জন্যেই। একসঙ্গে দুজনার জন্য।

এই শিরিনের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিল শ্রাবণী। আর চাঁদ সাহেব না কে—তার কথা। আর, একবারের হঠাৎ পাওয়া অদৃষ্টের দিশারী একটা পাথরের কথা। ওই মেয়ের সঙ্গে এই যোগ মানুষটার শুচিশুভ্র ভাগ্যের যোগ নাকি খালি। আর কিছুর না, কিছুরই না।....কিন্তু কত হল মেয়েটার বয়স এখন ? বছর বাইশ। ভাগ্যের সঙ্গে যোগ তো বটেই—তা বলে মেয়েটা পাথর নয়। এই মেয়েকে পাথর ভাবতে পারলে দুনিয়াটাকেই নুড়িপাথর ভাবা যেতে পারে।

আসছে তাহলে সাড়ে তিন বছর বাদে !

সাড়ে তিন বছর নয়, তিন বছর আট মাস সতের দিন। লোকে চার বছর বলবে, শ্রাবণী অবিচার না করে কমিয়ে বরং সাড়ে তিন বছরই বলবে। কিন্তু সাড়ে তিন বছরেরই হিসেব সে দেবে না নেবে ? দেখা যাক, আসুক। এখনো চিঠি পায়নি, আসার খবর কাগজে দেখেছে।

চিঠি পেল। বোম্বাইয়ে এসেছে। কয়েকটা দিন থাকবে। অমুক তারিখে আবার রওনা হবে। নির্দেশ, কোনো ভালো হোটেলে আপাতত দুটো ভালো ঘরের বন্দোবস্ত করা হয় যেন। তারপর দেখেশুনে ফ্ল্যাট নেবে।

সেই তারিখ এলো। বাড়ির সকলের তাড়া, শুধু শ্রাবণীর তাড়া নেই। হ্যাঁ, স্টেশনে যাবে বইকি সে। চার বছর, না, চার বছর না—সাড়ে তিন বছর বাদে আসছে,

আনতে যাবে বইকি।

বোম্বাই মেল এলো। কাগজের লোকের ভিড় আর অনুরাগীদের ঠেলাঠেলিতে যারা এসেছে তারা খানিকক্ষণের জন্যে হারিয়ে গেল। হাসি-হাসি দুটো মুখই শুধু একবার চকিতের জন্যে দেখা গেছে। দ্বিতীয় মুখটি শিরিনের। শিরিন বলবে, না ভানুমতী বলবে এখন?

ভিড় থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে শ্রাবণী। শুভেন্দু মিলনীরা ভিড়ের মধ্যেই ঢুকতে চাইছে। কিন্তু শ্রাবণীকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কি ভেবে তারাও এগোয়নি। ভিড় ঠেলে ওই বেরুল তারা। কিন্তু শ্রাবণী অবাক, তারা বলতে শুধু দুজনেই। শুধু যাদুকর আর ভানুমতী। আর কেউ না। হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। প্রথমে দাদা সামনে পড়ল, দুই হাতে কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল একটা, তারপর মিলনীর পিঠে দুই চড় পড়ল।

এইবার শ্রাবণীর মুখোমুখি।

হাসছে মিটিমিটি। এত লোকের সামনে শ্রাবণীরও একটু হাসা উচিত বইকি। হাসল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশের আলো ঝলসালো মুখের ওপর। কেউ ছবি তুলল। এতক্ষণ গুণীডাটা আর ভানুমতীর ছবি তুলেও আশ মেটেনি।

আর সব কই? শ্রাবণী খুব সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করল।

আর কে?

মিস্টার আর মিসেস উড?

চলে গেছে।

আর জুলি?

জুলিও। সব দেশের দিকে পাড়ি দিয়েছে। বলব'খন সব, চলো।

ফিরেছে তাহলে এই দুইজন। শ্রাবণী ভালো করে শিরিনের দিকে তাকালো এবার। সঙ্গে সঙ্গে শিরিন হাসিমুখে দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকাল। শ্রাবণী মাথা নাড়ল একটু। হাসি পাচ্ছে। পাথরই বটে। দুই চোখে অন্তত আলো ঠিকরানো দুটো কালো পাথর বসানো। প্রাণচঞ্চল পাথর। আর টুকটুকে দুই রাঙা ঠোঁটের ফাঁকে পাথর-চেরা হাসির আভাস।

॥ ১৫ ॥

অঙ্কের হিসেব না হোক, আর একটা হিসেবে শ্রাবণীর ভুল হয়েছে।

হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ গত চার বছরের অবকাশে এই ভুলের চক্র রচনার কোন ফাঁক নেই। সত্যের মতই প্রায় দুর্ভেদ্য সেটা।

চক্রটাকে একবার নয়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শ্রাবণী অনেকবার করে দেখেছে। বিশ্লেষণ করেছে। গুণী দত্ত ফিরে আসার পর আরো একবার তাই করল। অতীতের সঙ্গে বর্তমান জুড়ে সমগ্র পরিস্থিতির চিত্রটা যেন চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখল সে।....

উনিশ বছর বয়সেই ষোল বছরের একটা মেয়ের জন্য যৌবনের তাড়নায় উন্মাদ

পাগল হয়েছিল। পিঠের ঐ বীভৎস ক্ষতও তার বিকার ছাড়াতে পারেনি। পারেনি যে তার নজির শ্রাবণী নিজেই। সেই উদ্‌ভ্রান্ত স্মৃতি তাকে ওর দিকে টেনেছে। ওর জন্যে নয়, ও কিছু নয়।

....তারপর, যৌবন-বাস্তবেও সে প্রথম রমণী নয় এই লোকের জীবনে। সেখানে তার আগে নাচিয়ে মেয়ে জুলি স্যান্ডারসন এসেছে। আভাসে ইঙ্গিতে দাদা তার কথা বলেছিল। তেমন কিছু জেনেছিল বলেই বিয়েতে তার প্রবল আপত্তি ছিল। যাদুকরটিও তা অস্বীকার করেনি। সত্য গোপন না করার যাদুও জানে। আর এই লোকেরই অনাবৃত দুর্দম বাসনার প্রতিক্রিয়া এখনো শ্রাবণীর হাড়ে-পাঁজরে লেগে আছে। এই রীতি আর এই ক্ষুধা যার, জুলি স্যান্ডারসন ছাড়াও আরো দু'পাঁচজন আসেনি তার জীবনে এই বা কে বলবে।

....তারপর এই চার বছরের নির্লিপ্ত ব্যবধান। চার বছর নয়—শ্রাবণী অবিচার করবে না, সাড়ে তিন বছরই বলবে। এই নিরঙ্কুশ ব্যবধানে শিরিনের মধ্যে সে দিনে দিনে ভানুমতী আবিষ্কার করেছে। শ্রাবণী সেই ভানুমতীকেও দেখল।

শ্রাবণীর ভুলটাও ঠিক এইখানেই।

যে শিরিন ফিরে এসেছে, তার মধ্যে ভানুমতীও যে এসেছে সেটা অবশ্য নির্ভুল সত্য। শিরিন ছুরির ফলা, ভানুমতী মায়া। একের মধ্যে অন্যটি মিশে আছে। লোকে পাগল হবে না তো কী? শ্রাবণীর এই বিশ্লেষণ যথার্থ। কিন্তু ভুল করলে শিরিনকে দেখার এই চোখ দিয়েই সে আর একজনকে দেখতে গিয়ে।

সদ্য বর্তমানের মন নিয়ে প্রায় চার বছর পরে শিরিনকে দেখে শ্রাবণীর যা চোখে পড়েছে, প্রতিদিনের দেখা আর প্রতিদিনের সাধনার ফাঁকে গুণী দত্তর তা চোখে পড়েনি। সে যে-শিরিনকে নিয়ে গিয়েছিল তাকেই ফিরিয়ে এনেছে।

শ্রাবণীর এই ভুল ধরিয়ে দেবার কেউ ছিল না। মিসেস উডও না, জুলিও না।

ঠাট্টার ছলে মিসেস উড একবার গুণী দত্তর অন্ধ-চোখে খোঁচাও দিয়েছিল। বলেছিল, এবারে শিগগিরই একটা ডাইভোর্সের খবর পাব বোধ হয়।

এবার অর্থাৎ এমন এক ভানুমতীর আবির্ভাবের পর। গুণী দত্ত মনে মনে ঠিক আগের মতই বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু রাগ না করে ফিরে তাকেই কিছু উপদেশ দিয়েছিল। বলেছিল, না, তা পাবে না। কিন্তু ও-রকম কিছু তোমাদের মধ্যেই না ঘটে যায়। কলকাতাতেই তোমাকে বলব ভেবেছিলাম, বলতে পারিনি। এবারে তোমার লোকটির দিকে একটু চোখ দাও, টাকা তো অনেক করলে।

এত অবাক মিসেস উড জীবনে হয়নি বোধ করি। বিমূঢ় নেত্রে ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে ছিল শুধু। গুণী দত্তর কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার ছোঁয়া ছিল। মিসেস উড একটা কথাও বলতে পারেনি। পরেও দিনকতক গুম হয়ে ছিল। তারপর অবশ্য আগের মতই ফুর্তি দেখা গেছে। আগের থেকেও বেশি হয়ত। তখন নয়—আরো কিছু দিন পরে। সফরের শেষের দিকে গুণী দত্ত মনে মনে মিসের উডের বুদ্ধির তারিফ করেছে।

গত চার বছর গুণী দত্ত কি নিয়ে ছিল তা শুধু এক জুলি স্যান্ডারসনই অনুমান করতে পারে। শ্রাবণী জানবে কি করে।

সাধনার ওই সমাহিত রূপ জুলি বিলেতে দেখেছে। সে জানে। এই সাধনার, অনুশীলনের সহচরীও সে নয়, আর একজন। জুলি ঈর্ষা করেনি, বরং ভানুমতী গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে গুণী দত্তকে। তবু বিনিদ্র অবকাশে দুই-একটা বড় নিঃশ্বাস পড়েছে।

এই চারটে বছর শুধু ম্যাজিক দেখায়নি গুণী দত্ত, শুধু টাকা রোজগার করেনি। এর প্রতিটি দিন শিল্পীর নিবিষ্টতায় কেটেছে। শিরিনকে নিয়ে সে অন্তরের যাদুজগৎটি ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেছে। সেই জগৎ নতুন বিস্ময়ে প্রকাশ করতে চেয়েছে।

ভারতবর্ষে আর দূর প্রাচ্য সফরে এসে যে টাকা রোজগার করেছে উড দম্পতি, সেই টাকার অঙ্কটা তারা কল্পনাও করেনি। বহুদিন দেশছাড়া তারা, ছেলেপুলে হস্টেলে বোর্ডিং-এই পড়ে আছে। মিস্টার উড সানন্দে গুণী দত্তকে জানিয়েছে, গুণীডাটাকে নিয়ে এবারে কলকাতায় ফিরে তাদের সাগরপাড়ি দেবার ইচ্ছে। উৎফুল্ল মুখে বলেছে, মাই লেডি ওয়ান্টস্ টু গো ব্যাক হোম, আই থিঙ্ক সি ইজ্ ওয়ান্ডারফুল!

গুণী দত্ত হাসিমুখে সায় দিয়েছে, খুব ভালো—খুউব ভালো! তক্ষুনি ঘরে ঢুকে জেনিফার উডের হাত ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে তরল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে। মিসেস উড ছদ্মগাম্ভীর্যে একবার এডওয়ার্ডকে দেখিয়ে চোখ পাকিয়ে বলেছে, তোমার মন পেলে ওই র‍্যাসকেলকে একাই দেশে পাঠিয়ে আমি তোমার সঙ্গে এখানে থেকে যেতাম। তা যখন হল না, আর একবার তোমাকে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখি।

অতঃপর গুণী দত্ত তাদের স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিল, আর সে এভাবে ঘুরে বেড়াবে না। বাইরের আমন্ত্রণ এলে বেরুবে, কিন্তু বাংলা দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। ভ্রাম্যমান ম্যাজিক পার্টি নয়, সে নিজেই স্থায়ী দল গড়বে।

উড দম্পতির অনুরোধ টেকেনি। অসন্তুষ্ট হবার মত অকৃতজ্ঞ নয় তারা। উল্টে যাবার আগে যাবতীয় যাদু-সরঞ্জাম জেনিফার উড গুণীডাটার কাছেই জলের দামে বেচে দিয়ে গেল। তার বদলে অন্য যাদুকর বহাল করে আর যাদুর ব্যবসা চালানোর কথা ভাবে না সে। এক জায়গায় বসে আর কোনো ব্যবসায় নামার মত অঢেল টাকা তাদের হাতে আছে।

জুলি স্যান্ডারসন জানালো সে-ও ফিরবে।

গুণী দত্ত বাধা দেয়নি। কিন্তু তার সামনেই বাধা দিয়েছে শিরিন। তা হবে না, তুমি যাবে কেন?

জুলি হেসেছে, থাকব কেন?

আমার জন্যে। তোমার যাওয়া-টাওয়া হবে না।

জুলি ভ্রূকুটি করেছে, তুমি থাকতে আমার দিকে তাকাবে কে?

শিরিনের রাগতেও সময় লাগে না, হাসতেও না। হেসেছে, আমি তাকাব।

গুণী দত্ত জিজ্ঞাসা করেছে, এরা তো দল ভেঙে দিচ্ছে, তুমি গিয়ে কি করবে?

শিরিন সামনে না থাকলে জুলি হয়ত অশ্লীল পরিহাসই কিছু করে বসত। বলেছে, তোমার কল্যাণে টাকা তো কিছু হাতে আছে, গিয়ে ছোটখাটো একটা ডেরা নেব ভাবছি। দু-পাঁচজন গেস্ট্ রাখব, দিব্বি চলে যাবে।

শিরিন রাগ করে উঠে গেছে।

বম্বে থেকে রওনা হয়েছে তারা। বিদায় সহজ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, মর্মস্পর্শী হয়েছে। যাবার আগে জুলি এতদিনের মধ্যে এই প্রথম নিভৃতে ডেকেছে তাকে। বলেছে, শিরিনকে তুমি দেখবে জানি। কিন্তু তোমার স্ত্রীর জন্যেই কেন জানি ভয় আমার। যদিও সে খুব ভালো, খুব ভালো—তবু ভয়....

গুণী দত্ত বলেছে, কিচ্ছু ভয় নেই। চাঁদ সাহেব বলত, খোদার ইচ্ছেমতই সব হচ্ছে, সব হবে।

চাঁদ সাহেব ইজ গ্রেট! দুই বাহু বাড়িয়ে জুলি তার বুকের সঙ্গে যেন মিশিয়ে দিতে চেয়েছে নিজেকে। অধরের উষ্ণ অনাবিল বিস্মৃতি দিয়ে শেষবারের মতই নিজেকে পরিপূর্ণ করে নিয়েছে যেন! তারপর ছেড়ে দিয়েছে। মিসেস উডের মতই তার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা অল্প নাড়িয়ে দিয়েছে। হেসে বলেছে, এইটুকুই চুরি! তোমার স্ত্রীকে বোলো তুমি নিরপরাধ।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও শিরিন কাঁদেনি। জাহাজটা একটু একটু করে দূরে সরছিল। সমুদ্রে গিয়ে ঢুকছিল। ব্যবধান যত বাড়ছিল শিরিনের চোখ দুটো তত চকচক করছিল। গুণী দত্তর মনে হয়েছে, এর চেয়ে কাঁদলে ভালো হত।

ম্যাজিয়ুড কোম্পানী ভারতে এসে গুণীডাটাকে নিয়ে প্রথম প্রদর্শনী বম্বেতে শুরু করেছিল, শেষ অনুষ্ঠানও সেখানেই সম্পন্ন করে গেছে। যাবার আগে, মাত্র দিন কয়েকের জন্য। তার ফলে বম্বেতে নতুন করে নাড়াচাড়া পড়েছে আবার একটা। গুণীডাটাকে নিয়ে এখানে আলাপ-আলোচনা জল্পনা-কল্পনা অনেক হয়েছে। দর্শকচিত্তের এবারের বিস্ময় ভানুমতী। কদিনের অনুষ্ঠানে এত বড় জায়গায় জনস্রোতের তুলনায় যারা প্রবেশপত্র পেয়েছে তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলতে হবে। এদেরই মুখে মুখে বৃহত্তর গোষ্ঠীর কাছে ভানুমতী ভানুমতীর মতই রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

গুণী দত্ত রাজী হলে ম্যাজিয়ুড কোম্পানী আরো দিনকতক থেকে যেতে পারত। সে রাজী হয়নি। মঞ্চকর্তারা হাতেপায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল, তবু না। রাজী হয়নি তিন কারণে। তার এখন ফেরার তাড়া। এবারে একটা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নতুন করে সুসংবদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে। এবারে সে শুধু ম্যাজিক দেখিয়েই খালাস নয়।

দ্বিতীয় কারণ, বোম্বাইয়ে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শিরিনের ভিতরে ভিতরে একটা চাপা যাতনা লক্ষ্য করেছে সে। যে ক'দিন ছিল, সাহেবজীকে একদণ্ড ভুলতে পারেনি বোধ হয়। তার সঙ্গে রাতের নিরিবিলিতে এসে সাহেবজীর সঙ্গে যে ঘরে থাকত, সে ঘরটা চুপচাপ দেখেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। যে হাসপাতালে ছিল চাঁদ সাহেব সেখানেও গেছে। আর তার সমাধির কাছ থেকে তো টেনে তুলে আনতে হয়েছে শিরিনকে। অবশ্য যাদু-প্রদর্শনী এখানে আরো ভালো ছাড়া খারাপ কিছু হয়নি। গুণী দত্তর ধারণা, খেলা দেখাবার সময়ও শিরিন মনে মনে কল্পনা করেছে, ওই দর্শকদের মধ্যেই কোন

এক জায়গায় বসে সাহেবজীও তাকে দেখছে—দেখে আনন্দে আটখানা হচ্ছে।

আর ফেরার তাড়ার তৃতীয় কারণ, এতদিনে কলকাতায় আর একজনের নিঃশব্দ প্রতীক্ষার কথা মনে হয়েছে গুণী দত্তর। মনে হয়েছে, এই ভর-ভরতি সব কিছুর মধ্যে সেই একজন বড় বেশিরকম অনুপস্থিত। অনেক দিনের বিস্মৃত তৃষ্ণা আবার তাকে অসহিষ্ণু করে তুলেছে। শ্রাবণী তাকে টেনেছে।

কিন্তু টানের পিছনে আরো একটা ছোট উপলক্ষ আছে বোধ হয়, যা গুণী দত্ত নিজের কাছেও স্বীকার করবে না। গত চার বছরের মধ্যে এখানে একটা দিনের জন্যে বাস্তব দুই চক্ষু মেলে সদ্য-বর্তমানের শিরিনকেই দেখতে হয়েছিল তাকে। সাড়ে সতের বছরের সঙ্গে আরো পাঁচটা বছর যোগ করে। যে চোখে তাকে জেনিফার উড দেখেছে, জুলি স্যান্ডারসন দেখেছে, হাজার হাজার দর্শক দেখেছে, আর কলকাতায় পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণী দেখেছে—সেই চোখেই।

কিন্তু সে শুধু ওই একদিনের জন্য, মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। দেখতে হয়েছে বোম্বাইয়ের বাঙালী অবাঙালী কয়েকটা চিত্র প্রতিষ্ঠানের পয়সাঅলা মালিকদের দৌরাত্ম্য সামলাতে গিয়ে। একে একে তিন-চারজন এসেছে গুণী দত্তর কাছে। শিরিনকে চিত্রতারকার মর্যাদা দিতে চায় তারা। একটা দুটো ছবিতে অন্তত তাকে পাওয়ার জন্য তারা অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকার টোপ ফেলেছে। কিন্তু শিরিনের সামনেই গুণী দত্ত তাদের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। শিরিন একটি কথাও বলেনি এই নিয়ে, তার দিকে চেয়ে হেসেছে শুধু।

গুণী দত্তও হেসেছে।

কিন্তু এদেরই একজন ফিরে এসে আবার যে টাকার অঙ্কটা সামনে তুলে ধরেছিল, শুনলে মাথা ঝিমঝিম করার মতই। শিরিন ঘরে ছিল না তখন। গুণী দত্ত হঠাৎ জবাব দিয়ে উঠতে পারেনি। চাঁদ সাহেবের কাছ থেকে ওর মা লাজবন্তীকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টার কথা মনে পড়েছিল তার, শিরিনকেও ছোটবেলায় এই টাকার লোভ দেখিয়েই কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল তার বাবা। আবার সেই প্রহসনই শুরু হল!

কিন্তু চাঁদ সাহেবের ধরে রাখার সঙ্গে তার ধরে রাখার কিছু তফাত আছে। তফাৎ এই যে, এই টাকার অঙ্কটা গুণী দত্তর প্রাপ্য নয়। তার ভাগ্যের যোগ যার সঙ্গে, তাকে নিয়ে এই টানাটানি। হঠাৎ গুণী দত্তর মনে হয়েছে, এর নিঃসংশয় ফয়সলা একটা হওয়া দরকার। একজনকে বঞ্চিত করেই নিজের ভাগ্য ফেরাতে হবে কিনা সেটা নিঃসংশয়ে বোঝা দরকার।

এবারের জবাব আর নিজে দেয়নি। শিরিনকে ঘরে ডেকে ভদ্রলোকের প্রস্তাবটা তার কাছে পেশ করেছে। শিরিন ঠাণ্ডামুখে শুনেছে, সংক্ষিপ্ত রূঢ় প্রত্যাখ্যানে লোকটাকে ফিরিয়েছে, তারপর সরোষে তার মুখোমুখি হয়েছে।—তুমি আমাকে ডাকলে কেন? আমি যাব কি যাব না তুমি জানো না?

গুণী দত্ত চট করে জবাব দিয়ে উঠতে পারেনি। কারণ শিরিন ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্তোত্থিতের মত মুখে দু'লক্ষ টাকার অঙ্ক বসানো আজকের মেয়েটাকেই দেখছিল সে। চাঁদ সাহেবের ঘরের সাড়ে সতের বছরের মেয়েটা হঠাৎ তার চোখের

সমুখ থেকে উবে গিয়েছিল।

তারপরেই আত্মস্থ হয়ে সজাগ দৃষ্টিটাকে নির্মূল করেছে প্রথম। হেসে জবাব দিয়েছে, আজ খুব ভালো করে জানলাম—আর ডাকব না।

কিন্তু নিজের কাছেও গুণী দত্ত স্বীকার করুক না করুক, শিরিনকে নিয়ে সেই দিনই শ্রাবণীর আশ্রয়ে ফেরার জন্য ভিতরে ভিতরে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে।

শ্রাবণী আশ্রয়ই দিয়েছে। প্রশ্রয় নয়। কিন্তু প্রশ্রয় দিলেই জীবনের সব থেকে বড় ভুলটা এড়ানো সম্ভব হত হয়ত।

শ্রাবণীর প্রথম মাস কয়েক কাটল শুধু লোকটাকে দেখে দেখে। এদিক থেকে আগের সঙ্গে তফাত হয়নি খুব। শ্রাবণী যেন স্থিরসহিষ্ণু তটভূমি, দুরন্ত দুর্দম একজনের যৌবনের ঢেউ যথেচ্ছ আছড়ে পড়েছে, ভাঙতে চেয়েছে তাকে। কিন্তু এবারে শ্রাবণী আর হারায়নি নিজেকে। সম্মোহনে আত্মবিস্মৃত হয়নি। এজন্যে প্রাণপণ যুঝতে হয়েছে তাকে। এখনো তার স্পর্শমাত্রে সত্তার গভীরে সেই রহস্যের শিহরণ লাগে, সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে মন ঠিক তেমনি সমর্পণমুখী হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু এখন শ্রাবণী শেষ পর্যন্ত নিজেকে উদ্ধার করতে পারে। আচ্ছন্নতা কাটিয়ে যাকে দেখতে চায় তাকে দেখতে পারে।

গুণী দত্ত বলে, তুমি কেমন বদলে গেছ!

শ্রাবণী কখনো মুখের দিকে চেয়ে হাসে শুধু। কখনো হেসেই বলে, তুমিই বদলে দিয়েছ বোধ হয়।

গুণী দত্ত প্রথম ধাক্কা খেয়েছে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করতে গিয়ে। শিরিনের জন্য দু'ঘরের আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করতে হয়েছে তাকে, নিজের ফ্ল্যাটে তাকে জায়গা দিতে পারেনি। অবশ্য এও লাগোয়া ফ্ল্যাটই, তবু শ্রাবণী এই ব্যবস্থা করবে এটা সে ভাবেনি। শ্রাবণী বলেছে, কত সময় আমি হয়ত থাকব না, লোকে তখন পাঁচকথা বলবে। তার দরকার কি? কি এমন খরচ, টাকা তো অনেক পাচ্ছ!

গুণী দত্ত ফাঁপরে পড়ে শিরিনকে অন্যরকম বুঝিয়েছে। বলেছে, তার স্ত্রীটি মাস্টার মানুষ, নিজে পড়াশুনা করে, কলেজের মেয়েরা পড়তে আসে, ফলে বাড়িতে অনুশীলনের অসুবিধে, লোকের ভিড় বেশি হলেও মুশকিল। তাই আলাদা একটা ফ্ল্যাট দরকার।

শিরিন কি বুঝেছে সে-ই জানে। চুপচাপ শুনেছে, একটি কথাও বলেনি। তবে এই আলাদা থাকার খবরটা সে বিলেতে জুলিকে না লিখে পারেনি। জবাবে জুলি তাকে লিখেছে, খুব ভালো ব্যবস্থা হয়েছে। এবারে তুমি বেশ করে দেখেশুনে নিজের জন্য আলাদা একটা লোকও দেখে নাও। নয়তো এখানে চলে এসো, আমি লোক বেছে দেব। রাগ করে শিরিন চিঠিটাই কুটিকুটি করে ছিঁড়েছে। গুণী দত্তকে ছেড়ে যাবার কথা সে ভাবতেও পারে না।

দিন গেছে মাস গেছে বছর ঘুরেছে। গুণী দত্তর অবকাশ নেই বললেই চলে। একদিকে যাদুকর খেলার পরিকল্পনা, অন্যদিকে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আর

সেটাকে সুষ্ঠুভাবে চালানো। স্বার্থকতার চূড়া লক্ষ্য তার, অল্পে তুষ্ট নয়। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও একটা অস্বস্তিকর অস্বাচ্ছন্দ্য উপলব্ধি করে সে শ্রাবণীকে নিয়ে। ইদানীং আরো বেশি করছে।

যে শ্রাবণী বিয়ের তিন মাসের মধ্যে চাকরির দোহাই দিয়ে তার সঙ্গে বাইরে যেতে রাজী হয়নি, সে তার এক কথায় কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। গুণী দত্ত বলেছে, তুমি না দেখলে সব দিক আমি একা সামলাব কি করে? চিঠিপত্র লেখা, হিসেব-পত্র দেখা—এসব কি আমার কর্ম? হেসে বলেছে, কলেজে তোমাকে কত মাইনে দেয়—আমি না হয় তার ডবল দেব।

শ্রাবণীও হেসেছে, বলেছে, চাকরিটা পাকা তো?

পাকা। আমি চোখ না বোজা পর্যন্ত পাকা।

শ্রাবণী তক্ষুনি রাজী হয়েছে। বলেছে, আচ্ছা। কিন্তু তোমার জেনিফার উডের মত অত ছোটাছুটি করতে পারব না—ভালো দু'একজন লোক দিও সঙ্গে।

শ্রাবণীর এই নতুন কর্তৃত্ব কর্ত্রীর মতই। ধীর গম্ভীর অথচ মিষ্টি সদয় ব্যবহার সকলের সঙ্গে। সকলে শ্রদ্ধা করে, সমীহ করে—এরকম একটি কর্ত্রী পেয়ে তারা মনে মনে খুশি। গুণী দত্তরও অখুশি হবার কারণ নেই, যোগ্য হাতে সে কাজের ভার দিয়েছে সেটা উপলব্ধি করতে তার সময় লাগেনি। তার কোনো নির্দেশ বা পরামর্শ অবহেলাও করে না শ্রাবণী। নিজের কিছু বক্তব্য থাকলেও হাসিমুখেই বলে।

কিন্তু তবু নামযশ অর্থবৃষ্টি সুপরিচালনা—এই সব কিছু সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে একটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। গুণী দত্তর আবেগপ্রবণ মন সে ফাঁকটাই চায় না। সেই ফাঁক শিরিনকে নিয়ে। তার সঙ্গে শ্রাবণীর ব্যবহারেও কোন তারতম্য নেই। সেখানেও সে তেমনি ধীর গম্ভীর সহৃদয়া কর্ত্রী শুধু।

ঈর্ষা?

ঠিক তাও নয়। গুণী দত্ত নীরবে লক্ষ্য করেছে। সেদিক থেকে নিজের স্ত্রীটির মাথা উঁচু মনে হয়েছে। শিরিনের প্রাপ্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেবার মূলে শ্রাবণী। সে-ই তাকে বলেছে, তুমি যে টাকা পাচ্ছ তার চার আনা অন্তত শুধু ওর জন্যেই পাচ্ছ—সে টাকাটা তোমার ওকেই দেওয়া উচিত।

বাইরে যে ক'বছর ছিল, জেনিফার উড মোটা টাকাই দিচ্ছিল শিরিনকে। গুণী দত্তর নির্দেশে দিতে হয়েছিল। সে টাকা শিরিনের নামে ব্যাঙ্কে জমা হত। এখনো তাই হয়ে আসছিল। শ্রাবণীর প্রস্তাব শুনে গুণী দত্ত খুশি হয়েছে, হেসে বলেছে, তুমি মালিক—মালিক যা সুবিবেচনা করবেন তাই হবে।

তাই হয়েছে। তারপর থেকে অনেক বেশি টাকাই জমা পড়েছে শিরিনের নামে। কিন্তু যে ফাঁকটা ভরাট করার ইচ্ছে গুণী দত্তর, সেটা টাকা দিয়ে ভরে ওঠার নয়।

হাসিখুশি মেজাজী মেয়ে শিরিনও। গুণীডাটার বউ তাকে আপনজন ভাববে না এটা সে বরদাস্ত করতে চায়নি প্রথম প্রথম। যখন তখন এই ফ্ল্যাটে চলে আসে, হৈ-চৈ করে, শ্রাবণীর সামনেই গুণী দত্তকে চোখ রাঙায়। কিন্তু যার কাছে আসতে চেয়েছে, তার কাছে যে আসতে পারেনি তাও অনুভব করেছে। পরে গুণী দত্তকে

বলেছে, মিসেস দত্ত আমাকে দেখতে পারে না কেন?

গুণী দত্ত হেসে স্ত্রীর পক্ষ নিয়েছে, দেখতে পারে কি পারে না, তোমার ব্যাঙ্কের বই খুলে দেখ।

টাকা কে চায় তোমাদের কাছে? সে আমাকে একটুও দেখতে পারে না!

শিক্ষার সময় বা প্রদর্শনী-মঞ্চে গুণীডাটা তার গুরুর মত। কিন্তু অন্য সময়ে শিরিন রাগ করতে বা ধমকাতে ছাড়ে না তাকে।

গুণী দত্ত হেসে জবাব দিয়েছে, আচ্ছা তাঁকেই তাহলে জিজ্ঞাসা করে দেখো।

তার আশা, মেয়েটাকে ঠিকমত বুঝলে শ্রাবণী বেশিদিন তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

শিরিনের অত রাখা-ঢাকা নেই। আর একদিন গিয়ে সরাসরি শ্রাবণীকেই জিজ্ঞাসা করে বসেছে, তুমি আমাকে পছন্দ করো না—একটুও ভালবাসো না কেন?

জবাব না দিয়ে শ্রাবণী চুপচাপ চেয়ে ছিল।

শিরিন আবার বলল, তুমি আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারো না।

শ্রাবণী প্রথমে হেসেছে একটু, বলেছে, হাজার হাজার লোক চোখ চেয়ে দেখছে তাতে মন ভরছে না? পরক্ষণে ঠিক মনিবের মতই উপদেশ দিয়েছে, কে কি ভাবে দেখছে সেদিকে চোখ রেখো না, নিজের কাজটি ভাল ভাবে করে যাও—তাতে সকলেবই ভালো।

শেষে গুণী দত্তও একদিন না বলে পারেনি। বলেছে, শিরিনের সঙ্গেও তুমি আর সকলের মত ব্যবহার করবে?

শ্রাবণী চুপচাপ শুনেছে, চুপচাপ দেখেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, কিরকম ব্যবহার করতে হবে বলো?

ও চাঁদ সাহেবের মেয়ে, চাঁদ সাহেব না থাকলে আমার অস্তিত্ব থাকত না।

মৃদু হেসে শ্রাবণী বলেছে, সত্যিই তো চাঁদ সাহেবের মেয়ে নয়। যাক, ব্যবহারে কি ত্রুটি হয়েছে?

গুণী দত্ত শ্রাবণীর মুখে আগের কথাটা শুনে হঠাৎ ধাক্কা খেয়েছে। বলেছে, ত্রুটির কথা আমি বলিনি, ও আর পাঁচজনের মত নয় এটা তোমার বোঝা দরকার। কত লোকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ওকে ছবিতে নেবার জন্যে সাধাসাধি করছে—ও ঠিক তোমার আমার করুণার পাত্রী নয় সে কথাও তো একটু ভাবলে পারো।

ভেবেছি। শ্রাবণী রাগ করেনি, বরং মিষ্টি করেই জবাব দিয়েছে, মেয়েটার তুমি ক্ষতি করেছ।

ক্ষতি। গুণী দত্ত অবাক, ও নিজেই যায়নি।

ও ছেলেমানুষ, কিন্তু তুমি আটকে না রাখলেই ভালো করতে। চিরকাল তো ও ভানুমতী হয়েই থাকবে না।

গুণী দত্ত আর বলেনি কিছু। তার সেই চিরাচরিত দুর্দম অসহিষ্ণু ইচ্ছার বেগ হঠাৎ যেন আর একজনের ঠিক তত বড়ই ইচ্ছাশক্তির কাছে ঘা খেয়ে খানখান হয়েছে। ভিতরে ভিতরে গুমরে উঠেছে সে, অশান্ত হয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় বছরটা না ঘুরতে শ্রাবণীর ভিতরেও যে সমস্ত তোলপাড় শুরু হয়েছে একটা, সেটা গোড়ায় অন্তত গুণী দত্ত টের পায়নি।

শ্রাবণী বাইরে যত শান্তই হোক, ভিতরে ভিতরে তারও শান্তি ছিল না। তার সামনে শিরিন কোনো সমস্যা নয়—সমস্যা এই লোকই। কোন্ মত্ত আবেগের ফলে এই একজনের জীবনে তার আবির্ভাব শ্রাবণী তা ভোলেনি—ভুলবে না। তার ভোগের মত্ততা আজও দেখেছে। এই লোকই স্বচ্ছন্দ অবহেলায় তাকে ফেলে কটা বছর বাইরে কাটিয়ে আসতে পেরেছে—শ্রাবণী তাও ভোলেনি, ভুলবে না।

কিন্তু সব সত্ত্বেও লোকটার রহস্যের কূল-কিনারা পেত না শ্রাবণী। রহস্যের আকর্ষণ ছাড়িয়ে উঠতে পারত না। তার স্পর্শে এমন কি সান্নিধ্যেও রহস্যের ছোঁয়া লাগত।

সম্প্রতি সেই রহস্যের মূলধনে ঘাটতি পড়তে শ্রাবণী হঠাৎ যেন দেউলে হয়ে পড়লে লাগল।

ভুল এবারও তারই।

যোগ্য সঙ্গিনী হতে গিয়ে যাদুর খেলাগুলোর রহস্য জানার দিকে ঝোঁক হয়েছিল তার। তিনটে বছর না কাটতে একে একে সবই জানা হয়ে গেছে। এত বিস্ময়সৃষ্টির মূলে যে এত ফাঁকি সেটা যেন সে জেনেও জানত না। যত অভিনব রোমাঞ্চকর খেলাই হোক, রহস্য জানা থাকলে সেটা কিছু নয়। শ্রাবণী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল, নিজেকে অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করল, ফাঁকি তো বটেই, নইলে সত্যিই তো এত সব আজগুবী ব্যাপার ঘটানো যায় না।

কিন্তু মন যুক্তি বোঝে না। এক-একসময় মনে হয়েছে, সে একটা মস্ত ফাঁকির মধ্যে পড়ে আছে, ফাঁকি সম্বল করে বেঁচে আছে। দর্শকদের আসনে খেলা দেখতে বসে তার ভয় হয়েছে, এই বুঝি সকলের চোখে সব কিছু ধরা পড়ে গেল, এই বুঝি অপদস্থ হল। কিন্তু আশ্চর্য, কি দিয়ে কি হচ্ছে লোকগুলো ভেবেও দেখে না।

আগের চোখ থাকলে শ্রাবণী নিজের দশগুণ বেশি সম্মোহিত হত বোধ হয়। লোক কেন এমন পাগলের মত অর্থবৃষ্টি করে তা নিয়ে মাথা ঘামাত না। এই তিন বছরে দলের কর্ত্রী হিসাবে বহু জায়গায় ঘুরল সে। ভ্রাম্যমাণ প্রতিষ্ঠান না হলেও আমন্ত্রণ সব জায়গা থেকেই আসছে। এত আমন্ত্রণ যে অর্ধেকের বেশি নাকচ করতে হয়। কিন্তু সর্বত্রই শ্রাবণী দর্শকের অফুরন্ত উচ্ছ্বাসই লক্ষ্য করেছে। উচ্ছ্বাস দিনে দিনে বাড়ছে বই কমছে না।

গুণীডাটা আর ভানুমতী—এই দুটো নামও অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে।

ভানুমতীর আবির্ভাবের পর মঞ্চের খেলার ধারা কত বদলেছে শ্রাবণী সেটুকু উপলব্ধি করতে পারে। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে একটা স্বপ্নময় জগৎ সৃষ্টি হতে সময় লাগে না। রহস্যের জাল বুনে বুনে এক ছন্দোবদ্ধ রূপকথার জগতে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ। শ্রাবণী চেয়ে চেয়ে দেখে তাদের। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দর্শকদের স্তব্ধতা দেখে, বিস্ময় দেখে, আনন্দ দেখে।

....ওই ভানুমতীকে চোখের ছটায় আর হাতের পাঁচ আঙুলের কারসাজিতে

সম্মোহন করতে করতে মঞ্চে নিয়ে আসছে। ভানুমতীর দুই চোখ ঢুলু ঢুলু, তনুভার শিথিল, অবশ। সে যেন সজ্ঞানে আসছে না। একটা টুলের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল তাকে, দুই বাহুর নিচে দুটি ক্রাচ দেওয়া হল। তারপর হল্‌ভরতি লোকের স্তব্ধতার মধ্যে সম্মোহনের কাজটি সম্পূর্ণ করে নিল যাদুকর। সেই অভিব্যক্তি এমনই যে দর্শকের চোখেও সম্মোহনের ছোঁয়া লাগল যেন। মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল, মাথা ঢলে চিবুক বুকে ঠেকল, দুই শিথিল বাহু ক্রাচের ওপর ঝুলছে। যাদুকর পায়ের নিচ থেকে টুলটা সরিয়ে নিল। ভানুমতী দুই ক্রাচের ওপর ঝুলছে। তারপর একটা ক্রাচ সরিয়ে নিতে শুধু একটা ক্রাচের ওপর। এবারে যাদুকর তার কোমরের নিচে হাত রেখে আস্তে আস্তে টেনে বাতাসের ওপর শুইয়ে দিল তাকে, তারপর শেষ ক্রাচটিও সরিয়ে নিল। শূন্য বাতাসের ওপর নিদ্রিতা স্বপ্নের মেয়ে ভানুমতী।

ফ্লোটিং লেডি। ফ্লোটিং লেডি।

দর্শকদের সেই আত্মহারা আনন্দে আর উল্লাসে শ্রাবণী যোগ দেবে কেমন করে? তবে সে অভিনয়ের প্রশংসা করে বটে। কিন্তু একই অভিনয় কত দিন ভালো লাগতে পারে?

পলায়নী যাদুসম্রাট গুণীডাটার পলায়নী খেলারও ধারা বদলেছে। একটা পিপে এনে ফেলা হল মঞ্চে—একজন লোক ঢুকে বসতে পারে তার মধ্যে। ওতে দুজন ঢোকা জাগতিক উপায়ে সম্ভব নয়। তার মধ্যে ভানুমতীকে ঢুকিয়ে যাদুকর পিপের ডালা চেপে তালা বন্ধ করল। দর্শকরা উঠে এসে তালা পরীক্ষা করে চাবি নিয়ে গেল। এইবার একটা কালো চাদর হাতে যাদুকর সেই ডালাবন্ধ পিপের ওপর উঠে দাঁড়াল। সেই চাদরে নিজেকে ঢেকে পিপের ওপর বসে পড়ল—আবার তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল, চাদর সরানো হতেই দর্শক বিমূঢ়—যাকে তারা দেখেছে সে গুণীডাটা নয়, ভানুমতী। সদ্য-ঘুম-ভাঙা বিস্ময়ে সে দর্শকদের দিকে চেয়ে আছে।

ভালুকের খেলা দেখেও দর্শক তেমনি হতচকিত, বিভ্রান্ত। মস্ত একটা নকল গাছের গুঁড়ি এনে মঞ্চে দাঁড় করানো হল। সকলের সামনেই ভানুমতী পরল ভালুকের খোলস, আর গুণীডাটা শিকারীর পোশাক। তারপর সেই গাছের গুঁড়ির চারিদিকে দ্রুতবেগে চক্রাকারে ঘুরছে দুজনে। শিকারী ভালুককে তাড়া করছে—আর ভালুক প্রাণের দায়ে ছুটছে। এইভাবে অতি দ্রুত চক্রাকারে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়াল দুজনে, দুজনে দুজনার দিকে তাকালো—শিকারী আর ভালুক। দেখা গেল, ভালুকের খোলসের মধ্যে চলে গেছে গুণীডাটা, আর শিকারীর পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে ভানুমতী।

দর্শকের বিস্ময়ের কূলকিনারা নেই। এমনি অনেক আছে আরো—ছুটন্ত বুলেট কামড়ে ধরা, করাত দিয়ে দুখানা করে কাটা, অনেক রকমের পলায়নী যাদুর খেলা—প্রতিটি খেলার সঙ্গে ভানুমতী যুক্ত। গুণীডাটার যাদুর খেলার থেকে দর্শক তাকে পৃথক করে দেখবে কেমন করে?

রহস্য জানা মানে ম্যাজিকের কবর খোঁড়া।

শ্রাবণী তাই খুঁড়ে বসেছে। চেষ্টা করেও সে আর ম্যাজিকের মধ্যে ফিরে আসতে পারে না। তার উত্তাপ কমে আসছে। সকলে যখন ম্যাজিসিয়ান আর ভানুমতীর

প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সে নির্লিপ্ত। তার মনে হয়, শুধু দর্শক নয়—এই দুজনকেও ফাঁকির নেশায় পেয়ে বসেছে।

তার বাপেরবাড়ির সঙ্গেও এদিকের সম্পর্ক বেশ সহজ, স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। দূর প্রাচ্য সফর শেষে ঘুরে আসার পর থেকেই। যে বড় তাকে বড় বলে স্বীকার করে নিলেই অনেক সমস্যা ঘোচে। দাদা, ভাইয়েরা, মিলনী—এমন কি বাবাও মনে মনে এই স্বীকৃতি দিয়েছেন। ফলে ম্যাজিসিয়ানের ব্যক্তিগত দিকটা অনেকটা তুচ্ছ হয়ে গেছে। শ্রাবণী ভাবে, সাফল্যের বাড়া যাদু নেই। সাফল্য ষোলকলায় পূর্ণ হচ্ছে দিনে দিনে। অবাক যাদুকর গুণীডাটা এমন নিকট আত্মীয়—এইটুকুই গর্ব করে বলার মত। মিলনীকে ধরে বা দাদা, ভাইয়েদের ধরে তাদের বন্ধুবান্ধবেরা আসে ম্যাজিক দেখতে। ম্যাজিকের পর গুণীডাটার সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হয়, শিরিনের ঠোঁটের হাসিতে একটু অভ্যর্থনার আভাস দেখলে বিগলিত হয়।

বাবাকে এ পর্যন্ত দুবার ধরে এনেছে মিলনী।—কি কাণ্ড করে তোমার জামাই এসে দেখে যাও! দেখেছেন। দেখে শ্রাবণীর সামনেই গালে হাত বুলোতে বুলোতে অবাক বিস্ময়ে বলেছেন, তাই তো, এত সব ও করে কি করে?

কিন্তু আশ্চর্য, শ্রাবণী একটুও খুশি হয়নি—হতে পারেনি। বরং মিনলীর ওপর রাগ হয়েছে, বাবাকে আবার এ-সবের মধ্যে আনা কেন?

ভিতরে ভিতরে শ্রাবণীর হাঁফ ধরেছিল। এই প্রতিক্রিয়া কতদূর গড়াতো বলা শক্ত, কিন্তু মাঝে বেশ কিছুদিনের জন্য আর এক বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হল সে।

সন্তান এলো। প্রথম সন্তান। ছেলে।

এই সম্ভাবনার কথা গুণী দত্ত প্রথম যেদিন জানল, সেদিন ম্যাজিকের মঞ্চ থেকে শ্রাবণী যেন তাকে বাস্তবের মাটিতে নেমে দাঁড়াতে দেখেছিল। প্রথম বিমূঢ় খানিকক্ষণ, তারপর খুশি।

কিন্তু এই বিমূঢ়তার ফাঁকেই আসল মানুষটাকে দেখে নিয়েছিল শ্রাবণী। তার মনে হয়েছে, খুশির অভিব্যক্তিটুকু পরের ব্যাপার। যুক্তির নিদর্শন। খুশি হওয়া উচিত বলে খুশি হয়েছে। নইলে প্রথম হকচকানি দেখে মনে হয়েছিল, পায়ে নিগড় পড়েছে। ম্যাজিক দেখিয়ে মনের আনন্দে শূন্যে বিচরণ করছিল যে, তার পায়ে একটা হ্যাঁচকা শিকলের টান পড়েছে।

সন্তান এসেছে। তারপর যত দিন গেছে, শ্রাবণীর ওই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে। ছেলে, স্ত্রী, সংসার সব থাকুক—কিন্তু সকলের মধ্যে সর্বপ্রধান হয়ে থাকতে চায় একজন। এ ব্যাপারে কারো সঙ্গে আপস নেই। এতে ত্রুটি দেখলে মেজাজ বিগড়োয়, স্নায়ু সময় সময় তেতে ওঠে। বিশ্লেষণ করতে বসলে শ্রাবণী মানুষটার খুব দোষ ধরতে পারবে না। ছেলেকে ভালবাসে, আদর করে, তার সুখ-সুবিধের দিকেও চোখ আছে। কিন্তু তা বলে নিজেদের চাহিদার কোন দিন এতটুকু ছেঁটে দিতে রাজী নয়। শ্রাবণী এখনও দলের কর্ত্রী, কিন্তু ছ'মাস হয়ে গেল ছেলের বয়স—এখনও তার কর্তৃত্ব শিথিল, এটা আদৌ মনঃপূত নয় গুণী দত্তর। আগের মত সে আর দেখাশুনা করে না, এ অভিযোগ অনেকবার করেছে। কিন্তু শ্রাবণীর মনে মনে ধারণা, আসল অভিযোগ

শুধু এটুকুই নয়। আসল ছেলের ওপরেও এক ধরনের প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা। নিজের কোন দাবির কাছে ছেলের দাবি বড় করে দেখতে রাজী নয় ; এই অনুমানও শ্রাবণীর খুব মিথ্যে মনে হয় না।

তবে ছেলে আসতে একজন যে সত্যি সত্যি খুশি, এ শ্রাবণী মনে মনে অস্বীকার করতে পারে না। প্রথম প্রথম ধরতে সাহস করত না, বড় বড় চোখ করে ছেলেকে দেখত। শেষে ভয়ে ভয়ে একদিন কোলে করল। এখন তো দুজনার দস্তুরমত লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু হয়। বেশি রাতে ম্যাজিক থেকে ফিরলেও, নিজের ফ্ল্যাট থেকে এসে এক-চুপি ঘুমন্ত ছেলেকে না দেখে গিয়ে পারে না। ছেলেও তাকে দেখলেই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। গুণীডাটা আর শ্রাবণীর সামনেই শিরিন ছেলেকে নিয়ে অনেক রকম মন্তব্য করে। বলে, বড় হয়ে বাপের থেকেও ঢের ঢের বড় ম্যাজিসিয়ান হবে। শ্রাবণীকে ভ্রূ কোঁচকাতে দেখলে হেসে গড়ায়। কখনও বলে, না বড় হলে না, পৃথিবীর সেরা ম্যাজিসিয়ান হওয়ার বয়েস ঠিক এ-ই—সব্বাই কাবু। ছেলে হাসে, শিরিন তার দ্বিগুণ হাসে।

কখনো রায় দেয়, গুণীডাটা, ছেলে একটুও তোমার মত হবে না, দেখছ না—এক্কেবারে মায়ের মুখ ! মায়ের প্রভাব পাবে। তার পরেই হাসি, কিন্তু ওরকম গম্ভীর হলে ?

শ্রাবণীও এক-এক সময় হেসেই ফেলে। গুণী দত্তর তখন ভালো লাগে। সে আশা করে, এই ছেলের দরুনই শ্রাবণী একদিন মেয়েটাকে সত্যি সত্যি ভালবাসতে বাধ্য হবে।

ছেলে কি বলে ডাকবে তাকে তাই নিয়েও সমস্যা উপস্থিত করেছে শিরিন। ভেবেচিন্তে বলেছে, তোমাদের ওই মাসি না কি বলে, তাই ডাকবে।

শ্রাবণী বলেছে, পিসী ডাকতে পারে। শিরিন বুঝতে চেষ্টা করেছে, কি বলল। পিসী অর্থাৎ বাবার বোন। কিছু না ভেবেই মাথা ঝাঁকিয়েছে, না পিসী না, মাসি ডাকবে। মায়ের বোন। শিরিনের মুখে হাসি ধরে না, যেমন তুমি আমাকে দেখতে পারো না তেমনি জব্দ—মাসি ডাকবে।

শ্রাবণী মুখ টিপে হাসে। চকিতে অদূরে উপবিষ্ট লোকটাকেও একবার দেখে নেয়। টিপ্পনী কাটে, তুমিও হাসছ যখন, এ সম্পর্কটাই বেশি পছন্দ মনে হচ্ছে। তারপর শিরিনের দিকে চেয়ে হাল্‌কা সুরেই রায় দেয়, ও সব মাসি পিসী কিছুই ডাকবে না, বড় হলে ভানুমতী ডাকবে।

শিরিন থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেন, ভানুমতী ডাকবে কেন ?

আয়নায় দেখে এসো কেন ডাকবে। বড় হলে ওরও চোখ হবে।

জোরেই মাথা ঝাঁকিয়েছে শিরিন। সমস্ত মুখ টকটকে লাল হয়েছে। বলেছে, না কক্ষনো না, ভানুমতী ডাকলে মারব ওকে।

এইভাবে কেটে গেলেও গুণী দত্তর ভালই লাগত বোধ হয়। কিন্তু এই সহজ ঘরোয়া মাধুর্যও সামান্য কারণেই নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগল। বছর ঘুরে এসেছে, ছেলেটা সর্বদা কলকল করে, টলে টলে হাঁটে—দিনের মধ্যে বেশ কয়েক ঘণ্টা শিরিনের

ঘরে কাটে তার, ফিরে এলেই আবার আধো আধো কথায় আর ইঙ্গিতে বায়না ধরে, মাসির ঘরে যাবে। ছেলের এখন থেকেই এ ধরনের মরজি দেখে হাসিমুখে গুণী দত্ত শ্রাবণীকে কি বলেছিল একদিন। শ্রাবণী ও-রকম খুশির অভিব্যক্তি আরো দেখেছে। কিছু না ভেবেই বলে বসল, এভাবে প্রশ্রয় দিলে শেষে ছেলেটাই ভুগবে—ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে।

গুণী দত্ত অবাক।—ছেড়ে থাকবে মানে?

মানেটা যেন শ্রাবণীর স্থির করাই ছিল। সেও সহজ ভাবেই পাল্টা প্রশ্ন করল, ওকে কি এভাবে এর মধ্যেই রাখব ভেবেছ নাকি?

গুণী দত্ত জবাব দিল না। চেয়ে রইল শুধু। হাতের কাজে মন দিয়ে শ্রাবণী আবার বলল, পাঁচ বছর বয়স হলেই ওকে দেখেশুনে কোনো ভালো বোর্ডিংএ দিয়ে দেব।

পাঁচ বছর বয়স হতে এখনো অনেক দেরি। কান না দিলে বা হেসে উড়িয়ে দিলেই ব্যাপারটা সহজ হত। কিন্তু গুণী দত্ত তা পারল না, কথাগুলো তার ভিতরে ভিতরে নাড়াচাড়া করতে লাগল। শ্রাবণী ছেলে এখানে রাখবে না, কারণ তার মনে ছেলে এখানে মানুষ হবে না। এটা মানুষ হবার মত জায়গা না। তাহলে শ্রাবণী তাকে কি ভাবে?

এতদিন বাদে গুণী দত্তর আবার যেন স্পষ্ট করে কিছু চোখে পড়তে লাগল। তার কাজকর্মের ব্যাপারে, প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে শ্রাবণী যে নিজেকে বেশ গুটিয়ে নিয়েছে তা আবার চোখে পড়ল। শুধু তাই নয়, আবার তার মনে হল, ছেলে আসার পর শ্রাবণী তার কাছ থেকেও আস্তে আস্তে তফাতে সরে যাচ্ছে।

কারণে অকারণে গুণী দত্তর অসহিষ্ণুতা বাড়তে লাগল, অভিযোগ বাড়তে লাগল, ক্ষোভ বাড়তে লাগল, দাবিও বাড়তে লাগল।

শ্রাবণী প্রতিবাদ করে না খুব, কিন্তু এক এক সময় সরাসরি মুখের দিকে চেয়ে থাকে, চেয়ে চেয়ে দেখে তাকে।

হঠাৎ একদিন গুণী দত্ত জানালো, মাস দেড়-দুইয়ের জন্য দলবল নিয়ে বাইরে যাবে, একঘেয়ে ভালো লাগছে না।

শ্রাবণীও বাধা দিল না। বাইরে মাঝে মাঝে যেতেই হয়, যাওয়া দরকারও। নইলে এ পেশায় মরচে ধরে, পসার কমে। কিন্তু দূর প্রাচ্য থেকে ফিরে আসার পর দেড় মাস দু মাসের জন্য ইতিমধ্যে আর কোথাও বেরুনো হয়নি। শ্রাবণী তবু উচ্চবাচ্য করল না কিছু। শুধু বলল, ওইটুকু ছেলে নিয়ে তার যাওয়া সম্ভব নয়, সর্ব ব্যাপারে অনিয়ম হবে—সে এখানেই থাকবে।

থাকবে গুণী জানত। ছেলের অনিয়ম হবে, তাও হয়ত ঠিক। কিন্তু অনুভূতির দিক থেকে সমস্যাটাকে সহজভাবে আমল দিতে পারল না। জানাবধি অনিয়মের মধ্য দিয়েই সে আজ জীবনের এই মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছে।

শিরিন অবশ্য শ্রাবণীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এসেছিল। রাগ করে বলেছে, তুমি না গেলে ছেলেটাকে ছেড়ে আমি এতদিন থাকব কি করে?

চেষ্টা করে দেখো। পারবে।

শিরিন অনেক সময়েই ঝগড়া করতে আসে, আব্দার করতে আসে, অনেক কথা বলবে বলে প্রস্তুত হয়ে আসে—কিন্তু এ ধরনের দুই একটা ঠাণ্ডা কথা শুনেই চুপ মেরে যায়, মুখে কথা বেশি আসে না।

দেড় মাসই ছিল বাইরে। তার মধ্যে গুণী দত্তর মাত্র একখানা চিঠি পেয়েছে শ্রাবণী। কিন্তু শিরিনের চিঠি পেয়েছে খানতিনেক। দুখানা চিঠিতে খোঁজ নিয়েছে আর তার ম্যাজিসিয়ানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। কিন্তু সে অভিযোগ খুব স্পষ্ট নয়। লিখেছে, কারো কোনো কথা শোনে না, দিনকে দিন খেয়াল আর মরজি বাড়ছে।

তৃতীয় চিঠিটা স্পষ্ট নালিশের সুরে লেখা। গুণীডাটা আজকাল দিব্বি মদ খাচ্ছে—রোজই প্রায় খায়। মদ সে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। মিসেস দত্তর, অর্থাৎ শ্রাবণীর উচিত বেশ কড়া করে গুণীডাটাকে ধমকে চিঠি লেখা।

শ্রাবণী কিছুই লেখেনি। ফিরে আসার পরেও কিছু বলেনি। কিন্তু ফিরে আসার পর গুণী দত্ত কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে।

ছেলের জন্য একজন আলাদা আয়া আগেই রাখা হয়েছিল। এখন ভদ্রগোছের একজন বয়স্ক লোকও রাখা হয়েছে দেখল। ছেলের সব দেখাশুনার ভার ওই দুইজনের হাতে ছেড়ে দিয়ে শ্রাবণী যেন মুক্ত করে নিয়েছে নিজেকে। মুক্ত করে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের কাজে মন দিয়েছে, ব্যবস্থাপনার ভার সব আবার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। সে কর্ত্রী। মাঝে যেমন ছিল তেমনি—তার থেকেও বেশি কর্তব্যনিষ্ঠ।

গুণী দত্ত আর ক্ষোভের কারণ খুঁজে পায় না, অভিযোগের কারণ খুঁজে পায় না। এমন কি যখন-তখন অবুঝ দাবি নিয়ে দু'হাত বাড়াতেও বাধা নেই খুব। কিন্তু তবু সুস্থির বোধ করে না খুব—সহজ জীবন-যাত্রায় কোথায় যেন অদৃশ্য ফাটল ধরেছে একটা।

॥ ১৬ ॥

ম্যাজিকের ব্যাপারে অন্ততঃ শ্রাবণীর মোহ গেছে, সেটা গুণী দত্ত অনুভব করতে পারত। নতুন জায়গায় এলে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে শ্রাবণী এক-আধদিন খেলা দেখতে আসে, নইলে আসেই না। তার যা দায়িত্ব সেটুকু নিখুঁতভাবে পালন করে যায় শুধু। দিনে দিনে গুণী দত্ত যশের শিখরে উঠছে যে গুণে, যে খেলা দেখে সকলে পাগল—তারই প্রতি এই নিস্পৃহতা দেখে প্রথমে অবাক হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছে, আমার খেলা আর বোধ হয় তেমন ভালো লাগে না তোমার!

শ্রাবণী হেসে ফিরে ঠাট্টাই করেছে, খেলা আর কাঁহাতক ভালো লাগবে? তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, কেন, নতুন কিছু দেখাচ্ছ নাকি?

এ যে নেহাত মন-রাখা ঔৎসুক্য, বুঝতে দেরি হয়নি। একদিন শ্রাবণী খেয়াল না করেই মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলল।—তুমি এত সব অসম্ভব কাণ্ড করো, অথচ

আশ্চর্য, লোকে ফাঁকির দিকটা নিয়ে একবার মাথাও ঘামায় না।

গুণী দত্ত একটু একটু করে উপলব্ধি করেছে, শ্রাবণী এই ফাঁকির দিকটা নিয়েই এখন মাথা ঘামাচ্ছে। তার শিল্পের মধ্যে শ্রাবণী ফাঁকিই দেখছে এখন। এই জোরে এম. এ. পাস কলেজের শিক্ষয়িত্রী মেয়েকে সে ঘরে আনতে পেরেছিল। শ্রাবণীর মোহ ভেঙেছে—গুণী দত্তর সম্বল গেছে। এখন সে কি পাবে তার কাছ থেকে?

ভিতর থেকে এককালের সেই দুরন্ত দুর্বার গোঁয়ার ছেলেটাই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে থেকে থেকে। অশান্ত ক্ষোভে ছটফট করে। ক্ষোভ আর অসহিষ্ণুতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে।

শিরিন এক-একদিন চুপচাপ লক্ষ্য করে তাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, গুণীডাটা, তোমার কি হয়েছে?

জবাব দিতে পারে না বলেই ভিতবে ভিতরে আরো বেশি উষ্ণ হয়ে ওঠে গুণী দত্ত, বিরক্তি বাড়ে।

শিরিন ভেবে পায় না কি হতে পারে। ক'দিন আগেও তো সে গুণীডাটার বউকে নিয়ে তার সঙ্গে কত কৃত্রিম ঝগড়া করেছে। শিরিন চোখ পাকিয়ে নালিশ করেছে, তোমার বউ এই বলেছে, এইভাবে তাকিয়েছে আমার দিকে, তোমার বউ এমন কথা বলে যে আমি ঠাণ্ডা মেরে যাই। জবাবে গুণীডাটা হেসেছে, হেসে বউয়ের পক্ষ নিয়ে তাব সঙ্গে তর্ক করেছে। দুজনারই গাম্ভীর্য তরল হতে সময় লাগেনি।

কিন্তু দিনকে দিন সব যেন অন্যরকম হয়ে গেল। বউএর নামে নালিশ করলেও এখন আর তার হয়ে কিছু বলে না গুণীডাটা। ফলে শিরিন অপ্রস্তুত হয়। মিসেস দত্তকে ভিতরে ভিতরে কত শ্রদ্ধা করে শিরিন তা শুধু সে-ই জানে। অন্যমনস্কের মত কি রকম যেন এক-এক সময় চেয়ে থাকে তার দিকে গুণীডাটা, তাই দেখেও শিরিন মনে মনে চিন্তিত হয়। গুণীডাটার মুখে হাসি নেই কেন? গুণীডাটার মত মানুষ দুনিয়ায় আর একজনও আছে বলে সে মনে করে না। এ রকম একজনের হাতে তাকে তুলে দিয়েছে বলে আজ সে তার সাহেবজীর কাছেও মনে মনে কৃতজ্ঞ। গুণীডাটাকে শুধু সাহবজীই চিনেছিল। কিন্তু মিসেস দত্ত কি চেনেনি? মিসেস দত্তর সব দিকে এমন চোখ, এত বিবেচনা—সে না চিনে পারে?

মনে একবার কিছু উদয় হল কি শিরিন তা ব্যক্ত না করে পারে না। ছেলে আনতে গিয়ে সেদিন ফস করে শ্রাবণীকেই জিজ্ঞাসা করে বসল, গুণীডাটার কি হয়েছে?

টেবিলে মুখ গুঁজে বসে শ্রাবণী কি হিসেব মেলাচ্ছিল। গরমিল হয়ে গেল। আস্তে আস্তে মুখ তুলল।—কেন?

এ-রকম ঠাণ্ডা চাউনি দেখলে আর এ-রকম ঠাণ্ডা ছোট্ট পাল্টা প্রশ্ন শুনলে শিরিন অস্বস্তি বোধ করে। তার দুরন্ত খুশিভরা মন এই কারণেই এখানে এসে যেন হোঁচট খায়। তবু জোর দিয়েই বলল, তুমি কিচ্ছু লক্ষ্য করোনি? তোমার কিচ্ছু চোখে পড়ছে না?

শ্রাবণীর কানের কাছটা মুহূর্তের জন্য উষ্ণ ঠেকল একটু। আস্তে আস্তে চেয়ারটা

ঠেলে সে সোজাসুজি তার দিকে ঘুরে বসল। বলল, কি লক্ষ্য করব? কি চোখে পড়ছে না?

শিরিনের ধৈর্য গেল। গুণীডাটার ওপর তার দাবি কারো থেকে কম ভাবে না সে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, গুণীডাটার মুখে হাসি নেই কেন? তার আনন্দ নেই কেন? তুমি জানো না, আগে কত মজার মানুষ ছিল সে, সর্বদা কত ফুর্তি, সবেতে কত উৎসাহ ছিল তার? গুণীডাটার হাসিখুশি গেলে থাকল কি—শেষে ম্যাজিকও তো খারাপ হয়ে যাবে!

শ্রাবণী চেয়ে আছে। দেখছে। এই মেয়ে এই ধরনের কথা আগে কখনো বলেনি। একসঙ্গে এত কথাও হয়ত বলেনি।—আচ্ছা যাও এখন, পরে ভেবে দেখব। ব্যস্ত আছি।

আস্তে আস্তে হিসেবের দিকে ঝুঁকল আবার। ছেলে না নিয়েই শিরিন দুমদাম পা ফেলে চলে গেল। শ্রাবণীর আর হিসেব লেখা হল না।

রাতে যথাস্থানে কথাটা তুলল।—শিরিন জিজ্ঞাসা করছিল, তোমার কি হয়েছে? আগে তুমি নাকি অন্যরকম ছিলে, আনন্দে থাকতে, হাসিমুখে থাকতে—

শুনে গুণী দত্ত যদি হাসত, সেটা স্বাভাবিক হত। কিন্তু তার বদলে রেগে গেল সে। বলল, ওকে ধমকে দিলে না কেন?

ধমকাব কেন, মেয়েটা সরল, যা মনে হয়েছে সরল মনেই বলেছে। শ্রাবণী তার মুখ থেকে চোখ সরায়নি, জিজ্ঞাসা করল, তোমার শরীর খারাপ, না সত্যিই কিছু হয়েছে?

গুণী দত্ত মাথা নাড়ল, কিছু হয়নি। প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলল, একটা নতুন খেলা ভাবছি কিছুদিন ধরে।

শ্রাবণী আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। বলল না, নতুন খেলা নিয়ে ভাবতে সে বেশি না দেখুক, শিরিন আগেও দেখেছে—তাহলে সে এমন কথা বলে কেন?

ম্যাজিক নিয়ে চিন্তা হামেশাই করতে হয় বটে। নতুন নতুন খেলা দেখাতে হলে একাগ্র নিষ্ঠা আর অনুশীলন দরকার। ভাবা দরকার, মাথা ঘামানো দরকার। গুণী দত্ত ভাবে, শিরিনের সঙ্গে নতুন প্ল্যান নিয়ে মাথা ঘামায়। অনুশীলনেও ত্রুটি নেই। কিন্তু জুলি স্যান্ডারসনের মত শ্রাবণী যে এটাকে শুধু একাগ্র সাধনার চোখেই দেখে না, তাও সে উপলব্ধি করতে পারে। ঘড়ি ধরে লোক পাঠায় তাকে ডাকতে। না গেলে চুপচাপ নিজে এসে দাঁড়ায়। সেটা আরো অস্বস্তিকর।

কিন্তু সাধনার সেই সমাহিত তন্ময়তা যে সত্যিই কমে আসছে, সেটা গুণী দত্তর থেকে আর বেশি কে জানে? ক'বছর আগেও এই শিরিনকে সে বোম্বাইয়ের সেই সাড়ে সতের বছরের মেয়েটার মতই দেখে এসেছে। তার সঙ্গে ভাগ্যের যোগটাই আত্মিক নিষ্ঠায় অবিচ্ছিন্ন দেখেছে। একান্ত সান্নিধ্যেও কোন সংকোচ উঁকিঝুঁকি দেয়নি। কিন্তু জেনিফার উড যা পারেনি জুলি স্যান্ডারসন যা পারেনি, শ্রাবণী তাই পেরেছে—তাই করেছে। একটু একটু করে মেয়েটাকে দেখতে শিখিয়েছে সে—দেখার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

গুণী দত্ত অন্তত তাই ভাবে। ভেবে আরো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

বছর সাতাশ হতে চলল শিরিনের বয়স, যদিও কুড়ি-একুশের বেশি দেখায় না। নিরিবিলি সান্নিধ্যে এখন আর আগের মত তার দিকে তাকাতে পারে না, আগের মত অসংকোচে সান্নিধ্যের বিড়ম্বনা ভুলে খেলা শেখাতে পারে না। করে সবই, শেখায়ও, কিন্তু এখন আগের মত সহজতার একটা মুখোশ পরতে হয় তাকে। সংকোচ বোধ করে, গ্লানি বোধ করে, নিজের প্রতি অবিশ্বাসের দরুন নিজেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

শেষে সব রাগ গিয়ে পড়ে শ্রাবণীর ওপর। সেই রাগও নিঃশব্দে সংযত করতে হয়। প্রকাশ হয়ে পড়লে শ্রাবণী মুখের দিকে চেয়ে চুপচাপ দেখবে তাকে। মনে হবে, উঁচু স্তরে দাঁড়িয়ে যেন নীচু স্তরের মানুষ দেখছে। শ্রাবণী ঝগড়া করবে না, কথা-কাটাকাটি করবে না, মিষ্টি করে এমন একটা দুটো কথা বলবে যার জবাব সে খুঁজে পায় না চট করে। ওই স্থৈর্যের প্রতিমূর্তির কাছে ঠোঁটকাটা গুণীডাটা অনেক সময়েই জব্দ হয়েছে।

নিঃশব্দে একটা মানসিক ব্যবধান ক্রমশ পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল দুজনের মধ্যে। গুণী দত্তর মাথায় একটা যাতনা ঘুরপাক খেতে থাকে সর্বদা। নিবিষ্ট মনে কাজ করতে পারে না, কাজের কথা ভাবতে পারে না। হঠাৎ আবার মদ ধরল গুণী দত্ত। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনেও তো লোকে খায়।

শ্রাবণীকে গোপন করার প্রয়োজন বোধ করল না। গুণী দত্ত নতুন করে নিজের পুরুষকার পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হল আবার।

শ্রাবণী স্তব্ধ হয়ে রইল দিন দুই। শিরিনের চিঠিতে মদ খাওয়ার নালিশ নিয়ে সে উচ্চবাচ্য করেনি। কিন্তু এবারে আর চুপ করে থাকা গেল না। আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, গেল বারে বাইরে গিয়েও এ-সব খেয়েছ শুনেছি, এ অভ্যাসও আগে ছিল নাকি, না নতুন শুরু হল?

গুণী দত্ত হাসছে। এতটা প্রতিক্রিয়া হবে জানলে আরো অনেক আগেই ধরত। জবাব দিল, আমার গুরু চাঁদ সাহেব জলের বদলে মদ খেত।

শ্রাবণী আর একটা কথাও বলেনি। নিঃশব্দে সরে গেছে। এক ঘরে পৃথক শয্যায় শুত দুজনে, এবারে ঘর পৃথক হল।

গুণী দত্ত হাসতে হাসতে তার ঘরে গেছে। বলেছে, এই ঘরে আমার আসতে বাধা কি?

মুখের দিকে চেয়ে একটু চুপ করে থেকে শ্রাবণী জিজ্ঞাসা করেছে, তাহলে বাড়ী থেকে যেতে হবে বলছ?

গুণী দত্ত ফিরে এসেছে। সেই মদও আগুন হয়ে মাথায় জ্বলছে। সেটা নেভাবার জন্য আরো মদ খেয়েছে।

কিন্তু মদ খেয়ে সে শিরিনের কাছে যায়নি এক দিনও। ওই একজনের কাছেই শুধু গোপন। পরিমাপে এখনো কমই খায়। শিরিন টের পায় না। পেলেই বকাবকি করবে জানে, নয়ত রাগ করে তিনদিন পর্যন্ত কথাই বলবে না।

অনেক দিনের একটা থিতনো দুর্যোগ ঝড়ের মত ভেঙে পড়ল মাস ছয়েক বাদে।

উপলক্ষ গুণী দত্তর একটা নতুন খেলা।

শ্রাবণীসহ সদলবলে আর এক দফা কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসার পর কলকাতায় ফিরে এসেই গুণী দত্ত নতুন করে আসর মাত করেছে। সে খেলা দেখে দর্শক শুধু বিস্মিত নয়, মুগ্ধ নয়—তাদের চিত্ত উদ্বেলিতও। যে খেলার দরুন নতুন করে আবার কাগজে কাগজে গুণী দত্ত আর শিরিনের প্রশংসার ছড়াছড়ি।

গুণী দত্ত ওই খেলার নাম দিয়েছে শিল্পীর স্বপ্ন—আর্টিস্ট্‌স্ ড্রীম।

ম্যাজিক নয়, এই খেলার অভিনয়ের দিকটাই হঠাৎ শ্রাবণীকে গোটাগুটি বিক্ষিপ্ত করেছে।

মঞ্চে শুধু এই খেলাটা কদিন ধরেই দেখতে আসছে শ্রাবণী। আসবে না ঠিক করেও আসছে। সব শেষের খেলা এটি, তাই শেষের দিকেই আসে সে। চুপচাপ বসে দেখে। এতটুকু খুঁটিনাটিও বাদ যায় না।....মঞ্চে বড় একটা তিনপায়া স্টান্ড এনে দাঁড় করানো হল। তার ওপর মস্ত একটা কার্ডবোর্ড আঁটা হল। স্ট্যান্ডের নিচের দিকটা দু'হাত প্রমাণ ফাঁকা। কার্ডবোর্ডেরও পিছন দিয়ে কেউ এলে বা গেলে দর্শক তা দেখতে পাবে। বোর্ডের ওপর ছবি আঁকার মস্ত একটা ক্যানভাস আঁটা হল। সামনে রঙ, তুলি, আঁকার সরঞ্জাম।

যাদুকর এলো শিল্পীর বেশে। যেন কোন্ দূরের স্বপ্নে বিভোর সে। বসে, দাঁড়িয়ে, ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকতে লাগল। দেখতে দেখতে কাগজের গায়ে ফুটে উঠল তার লোকান্তরিত প্রিয়ার ছবি। অপরূপা মূর্তি। শিল্পী নির্নিমেষে দেখছে তাকে। শ্রান্ত, শোকবিহ্বল। নেপথ্যে সঙ্গীতে বেদনার মূর্ছনা।

শিল্পী একটু দূরের একটা মোড়ায় বসেছে। চেয়ে আছে। তন্দ্রার ঘোরে দেখছে ক্যানভাসের ওই ছবি। ছবি নয়, সত্যিই বুঝি তার প্রিয়া ওখানে দাঁড়িয়ে। হাসছে মৃদু মৃদু। তন্দ্রাচ্ছন্নের মতই দু হাত বাড়ালো শিল্পী—অব্যক্ত নীরব ব্যাকুলতা, এসো এসো এসো!

এবারে দর্শকের মন্ত্রমুগ্ধ বিস্ময়ের পালা। ছবির নারীমূর্তি সত্যি সত্যি প্রিয়ার রূপ ধারণ করেছে। সত্যিই মৃদু মৃদু হাসছে শিল্পীর দিকে চেয়ে। আর সত্যিই ফ্রেম থেকে নেমে পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে আসছে শিল্পীর প্রিয়ারূপিণী ভানুমতী।

নিদ্রার ঘোরেই শিল্পী উঠে দাঁড়িয়েছে। একখানা হাত বাড়িয়ে মর্মচ্ছেদী আকূতি নিয়ে তাকে ধরতে যাচ্ছে। প্রিয়া তখন পায়ে পায়ে পিছনে সরছে। শিল্পী যত এগোয় সে ততো সরে সরে যায়। শেষে একেবারে ক্যানভাসের গায়ে গিয়ে দাঁড়াল, আস্তে আস্তে ওটার সঙ্গে যেন মিশে গেল।

শিল্পীর তন্দ্রা ভাঙল। দু চোখ রগড়ে দেখে, না, কেউ আসেনি—প্রিয়া ওই ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সে স্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু দর্শকও কি স্বপ্ন দেখে উঠল? এ তারা কি দেখল? এ কেমন করে সম্ভব হল? খেলাটার প্রভাব এমনই যে, খানিকক্ষণ পর্যন্ত বোবা হয়ে বসে থাকে তারা। তারপর যখন খেয়াল হয়, তখন তাদের উল্লাসে কানে তালা লাগার উপক্রম।

পয়সা?

এই এক খেলা কত পয়সা দিচ্ছে ঠিক নেই। বহু দূর থেকেও দর্শক শুধু আর্টিস্টস্ ড্রীম দেখার জন্য ছুটে আসছে। ক'দিন আগে টিকিট বুক করতে এসেও নিরাশ হয়ে ফিরছে। এ খেলা দেখিয়ে গুণীডাটা আর শিরিন কি কাণ্ড করছে সেটা ভালো করে উপলব্ধি করা যেত জেনিফার উড থাকলে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে হয়ত নাচ শুরু করে দিত।

কিন্তু শ্রাবণী শুধু হিসেব মেলায়, টাকার অঙ্ক লেখে, আর ব্যাঙ্কে টাকা পাঠিয়ে দেয়। এই খেলার পর শিরিনের প্রাপ্য আরো বাড়া উচিত। উচিত কাজে কার্পণ্য নেই তার, টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে শিরিনের নামে জমা করে দেয়। শুধু এটুকুই। এ ছাড়া সাফল্যের আর কোনো বারতা তার মুখ দেখে অন্তত আঁচ করা যায় না।

দূর থেকে সে দাদাকে দেখেছে, আনন্দে পরম আত্মীয়ের মত ম্যাজিসিয়ানের দু'হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে। সেদিন মিলনীর ঠাট্টা শুনেও সচকিত হয়েছিল। ভগ্নীপতিকে বলেছিল, এই ম্যাজিকটা দেখে মনে হয়েছে, সত্যি কোনদিন কোনো প্রিয়াকে আপনি হারিয়েছেন।

যাকে বলা হয়েছে, তক্ষুনি তার দিকে চোখ ঘুরেছে শ্রাবণীর। না, বিব্রত হতে দেখেনি। এক হারানো মেয়ের শূন্যতা ঘুচে গেছে তা সে জানে। জানে, কারণ থুতনির নিচে লাল জড়ুলটার ওপর এখন আর কোনরকম হামলা হয় না। স্বর্ণকে যেদিন দেখেছে, সেদিন থেকেই স্বর্ণ দূরে সরে গেছে—শ্রাবণী তা উপলব্ধি করতে পারে। মিলনীর ঠাট্টার সপ্রতিভ জবাবও কানে এসেছে। ঘাড় নেড়ে মিলনীকেই দেখিয়েছে সে। বলেছে, এই প্রিয়া হারিয়েছি।

মিলনী ছদ্ম কোপ প্রকাশ করেছে, আপনার তো লোকান্তরিত প্রিয়া।

না, হস্তান্তরিত প্রিয়া।

নতুন ম্যাজিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে শেষে ছদ্ম খেদে শ্রাবণীকেও ঠাট্টা করেছে মিলনী, বলেছে, আর্টিস্টট্ ড্রীমে তুই নেমে গেলে পারতিস দিদি, সেটা বেশি র‍্যাশানাল হত।

শ্রাবণী ভুরু কুঁচকেছে প্রথম, তারপর হাসিমুখেই ফিরে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি কি স্বপ্ন?

আর্টিস্টস্ ড্রীম নিয়ে কাগজে কলমে অনেকরকম গবেষণা হয়েছে। কবে কে কোথায় এ খেলার বীজ বুনে গেছে। কোন্ কোন ম্যাজিসিয়ান কিভাবে এ ধরনের যাদু আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছে। গুণীডাটার উদ্ভাবনীয় মৌলিকতা কোথায় ইত্যাদি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই খেলাটাই বিচলিত করল শ্রাবণীকে। এক-একদিন ইচ্ছে হয়েছে দর্শকদের ডেকে বলে দেয় ফাঁকি কোথায়, ভাঁওতা কোথায়—কত সহজে বোকা বনছে তারা।

মাঝে শিরিন সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বলে দিনকতক কোন প্রোগ্রামই করা হয়নি। শ্রাবণী তখন প্রস্তাব করেছিল, আরো দুই-একটি মেয়েকে ট্রেনিং দেওয়া দরকার। দলে যে মেয়েরা আছে তাদের পছন্দ না হলে দেখেশুনে আরো দুই-একজনকে নেওয়া যেতে পারে। মিলনীর সেদিনের ঠাট্টা থেকেই এ-প্রস্তাব তার মাথায় এসেছিল হয়ত। একজনের অসুখে বা অনুপস্থিতিতে শো বন্ধই বা থাকবে কেন?

গুণী দত্ত সেদিন কোন জবাব দেয়নি, প্রস্তাব যুক্তিহীন নয় বলেই মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল সে। ঈর্ষার কথা ভাবতেও লজ্জা, তবু বাড়ি ফিরে শ্রাবণী সেদিন একটা কাণ্ড করে বসল।

ম্যাজিকের পর দুজনে একসঙ্গেই বাড়ি ফিরেছে। গাড়ির দু কোণে দুজন। শ্রাবণীর মনে হল তখনো 'শিল্পীর স্বপ্নের' ঘোর কাটেনি। অনুষ্ঠান জমজমাট হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাঝে এ ক'টা দিন ছেদ পড়ায় শিল্পীর বিরহ-বেদনা যেন আরো মর্মস্পর্শী, আরো মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বাড়ি ফেরার পরেও শ্রাবণী অনেকবার লক্ষ্য করেছে তাকে, বিস্মৃতির তন্ময়তা লক্ষ্য করেছে। তার মনে হয়েছে, এ তন্ময়তা প্রায়ই আজকাল লক্ষ্য করছে সে। খানিক বাদে তার ঘরে এসে বসল শ্রাবণী। বিনা ভণিতায় জিজ্ঞাসা করল, ট্রেনিংয়ের জন্য তোমাকে যে আরও দুই-একটি মেয়ে দেখতে বলেছিলাম, তার কি হল?

তন্ময়তা ভেঙে গেল। গুণী দত্তর দু চোখ খরখর করে উঠল। জবাব না দিয়ে চেয়ে রইল শুধু।

শ্রাবণী বলল, তোমার সময় না হয় আমি কাগজে অ্যাডভারটাইজ করে দিই, তারপর দেখেশুনে নিও। একজনের মুখ চেয়ে বসে থাকা ঠিক নয়।

হঠাৎ ধৈর্য হারালো গুণী দত্ত। চাপা রাগে বলে উঠল, তোমার এই ইচ্ছেটা কেন আমি জানি। তুমি লেখাপড়া শিখেছ, নিজের মর্যাদা নিয়ে চলতে শিখেছ—তোমাকে অন্তত আমি এ-সবের অনেক উঁচুতে ভেবেছিলাম।

শ্রাবণী সামলে নিল। ধীর শান্ত।—এখন আর ভাবতে পারছ না?

না। এতদিনের মধ্যেও মেয়েটাকে তুমি আপন ভাবতে পারলে না কেন?

শ্রাবণী জবাব দেবার আগে স্থিরনেত্রে তাকে চেয়ে দেখল খানিক। তারপর স্পষ্ট করেই জবাব দিল, তোমার জন্যে। ওই মেয়েটা কোন সমস্যা নয়, সে ভালো মেয়ে, ও-রকম মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু তোমাকে আমি বিশ্বাস করি কি করে!

গুণী দত্ত বসেছিল, উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। সরোষে ঝাঁজিয়ে উঠল, আমাকে তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না, কেমন?

না। চেঁচিও না, চাকর-বাকর শুনবে। বোসো। তোমাকে বিশ্বাস করব কি করে, একটা লাল জড়ুলের মধ্যেও কালো তিল দেখে তুমি পাগলের মত আমাকে নিজের জীবনে টেনে এনেছ—আমার জন্যে আমাকে আনোনি। এখন আবার তুমি স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছ, এরপর স্বপ্নটাকে সত্যি ভাবতে তোমার খুব সময় না-ও লাগতে পারে। কিন্তু আমার তাতে আপত্তি আছে।

শ্রাবণী নিজেই উঠে চলে গেল। গুণী দত্ত তড়িতাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ।

কে যেন তার এতকালের গোপনতার মুখোশটা একটানে খুলে ফেলে তার মুখের ওপরেই ছুঁড়ে দিয়ে গেল। দেহের সমস্ত রক্তকণা মুখে এসে জমাট বাঁধতে লাগল। জড়ুলের মধ্যে তিল দেখাটা এত স্পষ্ট করে জানে শ্রাবণী, এক দিনও তার মনে হয়নি। বুকের মধ্যে অর্গলমুক্ত এক বন্যপশুর দাপাদাপি শুনছে সে। যেমন শুনত দেড় যুগ আগে। তার থেকেও বেশি, তার থেকেও অসংযত, উদ্‌ভ্রান্ত। মুখোশটা খসে পড়তে গুণী দত্ত হঠাৎ যেন বেপরোয়া মরীয়া হয়ে উঠল।

আলমারি খুলে আস্ত একটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসল। চাঁদ সাহেব বলত, মদ না খেলে মাথা সাফ থাকে না, বাজে আবেগে সব গণ্ডগোল হয়ে যায়। কিন্তু আবেগের সঙ্গে সঙ্গে বিবেক বলে একটা অনুভূতিকেও রসাতলে পাঠাতে চায় সে। কতটা খেলে তা সম্ভব হবে!

শ্রাবণী আর একবার এসে দাঁড়াল। দেখল চুপচাপ। কি দেখছে গুণী দত্ত জানে। তারই মদমত্ত দুই চোখে গ্রাসের লোলুপতা দেখছে। ভুল কিছু দেখছে না।

শ্রাবণী চলে গেল।

গুণী দত্ত হাসছে। হেসে হেসে কাঁচা মদ গলায় ঢালছে। তার ভিতরের শিল্পী নিশ্চিহ্ন হোক আগে, যাদুকর নিশ্চিহ্ন হোক।

আধঘণ্টা বাদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পা দুটো টলছে। শুধু মাথাটা ঝিমঝিম করছে—তার বেশি কিছু নয়। পাশের ঘরের দিকে চোখ পড়তেই দেখল দরজাটা বন্ধ। প্রায়ই বন্ধ থাকে আজকাল। বিশেষ করে তার প্রয়োজনের সময়। প্রয়োজনটা কেমন করে যেন টের পায় শ্রাবণী। মুখে কিছু বলে না। তার প্রত্যাখ্যানের রীতি আলাদা। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

বন্ধ দরজায় কোনদিন ঘা পড়েনি। কিন্তু আজ দরজা বন্ধ দেখেই মাথায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল গুণী দত্তর। গুণী দত্তর নয়—ও নামের আর কারো। ক্রূর অভিলাষে দুই চোখ ধকধকিয়ে উঠল। স্বর্ণকে একদিন সকলের নাকের ডগা দিয়ে পুকুরপাড়ের ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সে, তাকে কে রক্ষা করতে পেয়েছিল? স্বর্ণ চুলোয় যাক! শ্রাবণী দরজা বন্ধ করেছে এই বাড়িরই একটা ঘরের। ওই বন্ধ দরজার কলকব্জার জোর কতটুকু?

পায়ের একটা আসুরিক ঘায়ে যেন কব্জার জোরটাই পরখ করে দেখতে গেল সে।

দরজা দুটো বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল। সশব্দে খুলে গেল।

ভিতরে কেউ নেই। শূন্য ঘর।

গুণী দত্ত অবাক। শব্দ শুনে ওদিক থেকে চাকর এসে সামনে দাঁড়াল। জানালো, মাইজি খোকাকে নিয়ে তার বাপেরবাড়ি চলে গেছেন, আজ আর ফিরবেন না বলে গেছেন।

গুণী দত্ত নিজের ঘরে এলো। টেবিলের বোতল গ্লাস আছড়ে ভাঙতে ইচ্ছে

করল। তা না করে ফোন তুলে নিল। ডায়েল করল। ওদিক থেকে শ্রাবণীর সাড়া পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি হঠাৎ চলে গেলে?

শ্রাবণী জবাব দিল না।

গুণী দত্ত বলল, একটা ট্যাক্সি ধরে এক্ষুনি চলে এসো।

কেন?

দরকার আছে।

টেলিফোনেও মদের গন্ধ নাকে আসছে।—কাল দেখা হবে।

ঝপ করে টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ।

গুণী দত্ত আবার এসে টেবিলে বসল। বোতলটা একেবারে নিঃশেষ করে গলায় ঢালল। ভিতর থেকে হাস্যে-লাস্যে যৌবনমদির যে মূর্তি এবার চোখের সামনে এগিয়ে আসতে চাইছে—উদ্‌ভ্রান্ত গুণময়কিশোর দত্ত নয়, ম্যাজিসিয়ান গুণীডাটা শেষবারের মতই তাকে চোখের সমুখ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল।

তারপর হার মানল। হার মেনে চাপা উল্লাসে খলখলিয়ে উঠল। চোখের সামনে শিরিন যেন হাসছে। শিরিন, না ভানুমতী? গুণী দত্ত স্বপ্ন দেখছিল—শিল্পীর স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন দেখার কি দরকার? এই শিরিনকে সে দেখেনি কেন? সকলে দেখেছে—শুধু সে-ই দেখেনি। আশ্চর্য!

আজ সে দেখবে। দেখতে চলল।

সন্ধ্যা থেকে পরিশ্রম গেছে। খাওয়া-দাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে শিরিন শয়নের উদ্যোগ করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ হতভম্ব একেবারে।—তুমি!

গুণী দত্ত দেখছে তাকে। এই যেন প্রথম দেখছে।

শিরিন ঘাবড়ে গেল, তাড়াতাড়ি কাছে আসতে আসতে বলল, গুণীডাটা, কি হয়েছে তোমার? শরীর—

শেষ করার আগেই হাত দিয়ে নাক চাপা দিল। আর্তনাদ করে উঠল প্রায়, তুমি মদ খেয়েছ?

অনেক।

কেন? কেন? কেন? ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল শিরিন।

রোজই খাই। আজ বেশি খেয়েছি। নইলে তোমার কাছে আসতে পারছিলাম না।

শিরিন বিমূঢ়, চিত্রার্পিত হঠাৎ। দুই চোখের ভিতর দিয়ে যেন মানুষটাকে দেখল এতক্ষণে। পায়ে পায়ে সরে গিয়ে বিছানায় বসল। দেখছে হাঁ করে।

গুণী দত্ত কাছে এগিয়ে এলো। খুব কাছে। গা ঘেঁষে বসল। দুই হাত দিয়ে তার মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। নির্নিমেষে দেখছে। সমস্ত স্নায়ুর রক্তে নেশা লেগেছে। মুখের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলল, আমি তোমাকে এতদিন দেখিনি কেন শিরিন? সকলে দেখল, শুধু আমি দেখলাম না কেন?

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে নির্বাক বিস্ময়ে শিরিন চেয়ে আছে। সুরাসিক্ত দুই ঠোঁটের নিষ্পেষণ, বাহুর নিষ্পেষণ যাতনার মত লাগছে। মত নয়, অসহ্য যাতনাই।

বাধা দেবার শক্তি নেই, দুই চোখ টান করে লোকটাকে দেখছে সে। নিঃশেষে হারিয়ে যেতে যেতেও দেখছে।

আর, তারপরেও শুধু দেখেছেই।

কল্পান্তক ঝড়ের অবসান। নিস্পন্দ স্থাণুর মত মেয়েটা শয্যায় পড়ে আছে।

গুণী দত্ত এবারে কি করবে? এ-ঘরে তো মদ নেই।

উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা চেয়েই আছে। চকচকে দুই চোখ তার মুখের সঙ্গে আটকে আছে। তার নির্বাক দু চোখ যেন অস্ফুট তরল আগুন ঢালছে তার কানে, কি করলে গুণীডাটা? এ তুমি কি করলে?

ওই দৃষ্টি থেকে সবলে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে এলো গুণী দত্ত। টলতে টলতে নিজের ঘরের উদ্দেশে চলল। রসদ চাই এক্ষুনি, তার ঘরটা কত দূর!

ঘরে ঢুকে আলমারির দিকে এগিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়েই রইল।

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল তারপর। বাইরে জ্যোৎস্না। চাঁদটা রুপোর থালার মত সাদা দেখাচ্ছে। আকাশে তারার মিছিল। চাঁদসাহেব, তুমি কি দেখেছ? তুমি কি আছ কোথাও?

উল্কা হয়ে তুমি কি এই মাথার ওপর নেমে আসত পার না?

॥ ১৭ ॥

শ্রাবণী ফিরল পরদিন সন্ধ্যার পরে।

শনিবারের আগে শো নেই, আজ বা আগামী কালও না এলে চলত। এসেই পড়ল। গতরাতে টেলিফোনে বলেছিল, কাল দেখা হবে। শ্রাবণী কখনো কথার খেলাপ করেছে বলে মনে পড়ে না।

ছেলেটা পথেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। আয়া তাকে জায়গামত শুইয়ে দিয়েছে। শ্রাবণী পায়ে পায়ে এধারের ঘরে এলো, তারপর মাঝের দরজা দিয়ে পাশের ঘরটাতেও।

নেই কেউ।

ঘরটার বিশৃঙ্খলা অবস্থা। বিছানাটা অবিন্যস্ত। ছোট টেবিলের সামনে চেয়ার দুটো দু'দিকে ফেরানো। টেবিলে বোতল গেলাস।

শ্রাবণীর মুখে কঠিন রেখা পড়ল গোটাকতক। দরজার কাছে এগিয়ে একজন চাকরকে ডাকল। অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, ঘরের এ অবস্থা কেন?

লোকটা ভয়ে ভয়ে কর্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো শুধু। জবাব দিল না। ওর মুখের দিকে চেয়েই শ্রাবণীর কেমন মনে হল, ঘরের মালিক কিছু বলে থাকবে যার দরুন ওরা এ-ঘরে পদার্পণ করতেও সাহস করেনি। নীরব থেকেও ও যেন বোঝাতে চাইছে অপরাধ ইচ্ছাকৃত নয়।

বাবু কোথায়?

বলতে পারল না কোথায়। শ্রাবণীর বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করতেও সঙ্কোচ। ঘরটা

ঠিক করে রাখতে বলে ছেলের কাছে এসে বসল।

একটানা দু'ঘণ্টা কেটে গেল আরো। কারো দেখা নেই। দশটা বেজে গেছে রাত্রি, শ্রাবণী উঠল। কতক্ষণ আর লোকগুলোকে বসিয়ে রাখবে, তাদের ছুটি দেওয়া দরকার।

বারান্দায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে আয়া ঝিমুচ্ছে। ওধারের লোক দুটো চুপচাপ বসে। শ্রাবণীর আবারও মনে হল, গতরাত্রে তার যাওয়ার পর থেকে এই সময়টুকুর মধ্যে কিছু একটা ব্যতিক্রম ঘটেছে।....ওদের মুখে চাপা গাম্ভীর্য, চকিত হাবভাব।

অপেক্ষাকৃত পুরনো লোকটা তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়াল।

বাবু কখন বেরিয়েছেন?

সকালের দিকে—

শ্রাবণী থমকালো। সে কি জিজ্ঞাসা করেছে শুনেছে কিনা সেই সংশয়। ঠিকই শুনেছে, আর ঠিকই বলছে মনে হল। বিস্ময় গোপন করে আবার জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলে যাননি?

লোকটা ঘাড় নাড়ল।

আচ্ছা আমাদের খাবার টেবিলে ঢেকে রেখে তোমরা খেয়ে নাওগে।

সহজ নির্দেশ দিতে চেষ্টা করে শ্রাবণী ঘুরে দাঁড়াল। কথাবার্তা কানে যেতে আয়ার তন্দ্রা ছুটেছে। সে-ও উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখ এড়িয়ে শ্রাবণী ঘরে চলে এলো।

গ্লানি বোধ করছে। কোনো খবর না দিয়ে সকালে বেরিয়ে এত রাত পর্যন্ত না ফেরার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এই অসঙ্গত দিকটা নিয়ে ঝি-চাকরও মনে মনে অন্তত বিশ্লেষণ করছেই। ঘরের লোকের এ-রকম মেজাজ আর এই আচরণ বড় স্থূল মনে হয় শ্রাবণীর।

এগারোটা বাজতে চলল। আয়াকে ডেকে ঘরে বসিয়ে শ্রাবণী শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিল। স্লীপারটা পায়ে গলিয়ে শব্দ না করে নিচে নেমে এলো। সামনের কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে মোড়ের বাড়িটার নিচের তলায় শিরিনের ঘর।

ঘরের দরজা বন্ধ। এদিকের কাচের জানলা কটাও। ঘরে নীল আলো জ্বলছে। শ্রাবণী আস্তে আস্তে কড়া নাড়ল। ঈষৎ জোরেও।

সাড়া নেই।

বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্রাবণী আবারও কড়া নাড়বে কিনা ভাবছে, ওদিক থেকে একজন বুড়োমত লোক সেলাম ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে এলো। লোকটা তাদের প্রতিষ্ঠানের একজন বেয়ারা। ওদিকের একটা খুপরি ঘরে থাকে, শিরিনের ফাইফরমাস খাটে।

সে খবর দিল, মিসি সাহেবের তবিয়ত বোধ হয় ভালো নেই, বলতে গেলে সকাল থেকেই দরজা বন্ধ। কেবল ঘুমুচ্ছে। ভাবনায় পড়ে সে অনেকবার সাহেবকে খবর দিতে গিয়েছিল, কিন্তু সাহেবেরও দেখা মেলেনি।

শ্রাবণী ঘরে ফিরে এসে রাতের মত আয়াকে বিদায় দিয়েছে। তারপর একটা

বই নিয়ে বসেছে। পড়তে চেষ্টা করেছে। মোট কথা, কিছু না জেনেশুনে সে ভাবনার জাল বুনতে বসবে না। ওতে অনেক ভুল থাকে। মনটা বড় অশালীন ভাবে নানাদিকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ফেরে। স্নায়ু বশে থাকে না।

কিন্তু লোকটা গেলই বা কোথায়? কলকাতার পথে পায়ে পায়ে দুর্ঘটনা। শ্রাবণীর স্বাভাবিক ভাবেই দুশ্চিন্তা হওয়া উচিত। উতলা হওয়া উচিত। বই বন্ধ করে শ্রাবণী মাঝে মাঝে তাও ভাবছে। ভাবা উচিত বলেই ভাবছে হয়ত, নইলে সত্যিই কোনো বিপদের সম্ভাবনা মনে আসছে না। এলে এতক্ষণে অনেক কাণ্ড করত। বাড়িতে খবর দিত, হাসপাতালে হাসপাতালে টেলিফোন করত।

রাতের মধ্যে ধড়মড় করে বারতিনেক উঠে বসেছে। বাইরের ঢাকা বারান্দার টেবিলে তাদের খাবার ঢাকা পড়ে আছে তেমনি। পায়ে পায়ে এদিকের ঘরে এসে দেখে গেছে। শূন্য ঘর, শূন্য শয্যা।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ শ্রাবণী শিরিনের কাছে লোক পাঠালো। তাকে ডেকে আনতে বলল। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল একজন বাড়ি ফেরেনি, আর চুপ করে থাকা চলে না। কিন্তু কি যে করবে তাও বুঝছে না। তাই শিরিনকেই ডাকল।

কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেও সে এলো না দেখে সেই লোককেই আবার জিজ্ঞাসা করল, খবর দেওয়া হয়েছে কিনা। হয়েছে। মিসি সাহেবা শুনেছে, কিছু বলেনি। শ্রাবণী আরো খানিক অপেক্ষা করল, তারপর নিজেই নেমে এলো।....রাগ করে একজনের চব্বিশ ঘণ্টা বাইরে থাকার কারণ বুঝতে পারে, কিন্তু এই মেয়ের আচরণ দুর্বোধ্য। দু'দিন ছেলেকে দেখেনি, নিজে না আসুক তার জন্যেও লোক পাঠানোর কথা। নিজে না এলে তাই করে, ছেলেকে নেবার জন্য বুড়ো বেয়ারাটাকে পাঠায়। আরো আশ্চর্য, শ্রাবণী ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও এলো না....অবশ্য অসুখ-বিসুখ করে থাকতে পারে। কিন্তু তাও তো জানাতে পারত।

দরজার একটা পাট খোলা। শিরিন বিছানায় বসে। লালচে মুখ কাগজের মত সাদা। শুকনো। উসকোখুসকো চুল, জট বেঁধে আছে। ঘরে কে এলো দেখেছে, কিন্তু ফিরে তাকায়নি।

তোমার শরীর খারাপ নাকি?

জবাব নেই। তাকালোও না। যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল।

শ্রাবণী অপেক্ষা করছে। দেখছে। হয়েছে কিছু। রাগ নয়, রাগলে ওই মুখ সাদা হয় না, লাল হয়। ফুলসমেত সুন্দর একটা গাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে তুলে ফেললে যেমন হয় দেখতে, তেমনি লাগছে ওকে। অসুখ নয়। অসুখ হলে চুপ করে থাকবে কেন?

কানের দু'পাশ গরম ঠেকছে শ্রাবণীর। গলার স্বর চড়ল না বটে, কিন্তু কঠিন শোনালো।—আমার কথা তোমার কানে যাচ্ছে?

নিষ্প্রভ মুখখানা আস্তে আস্তে তার দিকে ফিরল এবারে।

কি হয়েছে তোমার?

মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। কিছু হয়নি।

তোমাকে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলাম, তুমি তাকে কিছু বলোনি, আসওনি। হঠাৎ এ-রকম অবাধ্য হওয়ার কারণ কি?

নিরুত্তর। চেয়ে আছে তেমনি।

শ্রাবণী তবু ধৈর্য হারালো না। সে অবাধ্যতার কৈফিয়ত নিতেই আসেনি। শান্ত গম্ভীর মুখে বলল, পরশু রাতে আমি বাড়ি ছিলাম না, কাল সন্ধ্যেয় এসে শুনলাম উনি সকালে বেরিয়েছেন। আজ এখন পর্যন্ত ফেরেননি। কোথায় গেছেন জানো?

নির্লিপ্ত মুখে এবারে যেন প্রতিক্রিয়ার রেখা পড়তে লাগল একটা একটা করে। প্রথমে বিস্ময়, তারপর বিদ্বেষ। শ্রাবণীর মনে হল বিদ্বেষ তারই ওপর। নিষ্পলক চেয়ে আছে তার দিকে, শুকনো মুখের সাদাটে ভাব গিয়ে লালের ছোপ পড়ছে। চাউনিটা খরখরে হয়ে উঠছে। একটা উদ্‌গত অসহিষ্ণু অভিব্যক্তি শেষ পর্যন্ত আর যেন চেপে রাখতে পারল না মেয়েটা। জবাব না দিয়ে অস্ফুট হিসহিস শব্দে পাল্টা প্রশ্ন করল, তুমি বাড়ি ছিলে না কেন?

শ্রাবণী কি করবে? রাগবে, অবাক হবে, না উতলা হবে? যেভাবে বলল, আর যেভাবে চেয়ে আছে, মনে হল কোনো অজ্ঞাত অপরাধের একমাত্র আসামী যেন সে-ই। শ্রাবণী নির্বাক খানিকক্ষণ।

আত্মস্থ হল। অনুচ্চ কঠিন স্বরে বলল, তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। তোমাকে কিছু বলে গেছেন?

না। অন্যদিকে মুখ ফেরালো। আর এদিকে তাকাবে না বা কোন কথার জবাব দেবে না তা সুস্পষ্ট।

শ্রাবণী ঘরে ফিরে এলো।

কিছু অনুমান করতে চেষ্টা করবে? না, থাক। মানুষের নিভৃতে অনেক অনুভূতি আনাগোনা করে, যা একবার মাথায় টেনে আনলে জট বাঁধতে থাকে। তখন বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—সবই দেখতে শুনতে বুঝতে ভুল হয়।

সকাল গড়িয়ে দুপুর এলো, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বিকেলের আলোর জোরও কমে আসছে একটু একটু করে। শ্রাবণী বসে আছে, অপেক্ষা করছে। বাড়িতে খবর দেয়নি। থানা বা হাসপাতালে খবর নেয়নি। সকালে শিরিনের সঙ্গে দেখা না হলে সবই করতে হত। কিন্তু দেখা হওয়ার পর মনে হয়েছে কিছুই করার দরকার নেই। বাইরের কোনো দুর্ঘটনার ছায়া অন্তত তার মনে রেখাপাত করেনি।

শিরিনের ওখানকার আধবুড়ো বেয়ারাটা দুপুর থেকে বারতিনেক এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে। প্রথম দুবার শ্রাবণী কিছু জিজ্ঞাসা করেনি, শেষের বারে করল।

কি চাই?

লোকটা আমতা আমতা করে বলল, সাহেব ফিরলেন কিনা....

কে খবর নিতে বলেছে?

লোকটা বিব্রত মুখে তার দিকে তাকালো শুধু, কিছু বলে উঠতে পারল না।....বলতে নিষেধ করে দিয়েছে বোধ হয়, হয়ত শুধু দেখে আসতে বলেছে এলো

কিনা। কি বলেছে বা কার এই দুশ্চিন্তা শ্রাবণী বোঝে।

ফেরেননি। যাও—

একটু বাদে বাড়ির দোরে ট্যাক্সি থামল একটা। শ্রাবণী দোতলার রেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে স্থির, নিস্পন্দ। প্রতীক্ষা করছিল বটে, কিন্তু এই মূর্তিতে দেখবে ভাবেনি।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। তারপর বারান্দায়। শ্রাবণী আস্তে আস্তে ফিরে দাঁড়াল। তার দিকে এক-নজর তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে লোকটা ঘরে ঢুকে গেল। কিন্তু পা দুটো টলছে স্পষ্ট বোঝা যায়। দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেল একটা। মুখ কালীবর্ণ। বেশবাস আধময়লা' ঝাঁকড়া চুলে মুখের আধখানা ঢাকা।

পায়ে পায়ে শ্রাবণী ঘরের চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়াল।

কোট খোলা হয়েছে, পায়ের জুতোও। শ্রাবণীকে না দেখলে মোজা দুটোও খুলত হয়ত। দেখে বিছানায় শুয়ে ওপাশ ফিরল।

শ্রাবণী সামনে এসে দাঁড়াল। দেখছে। মানুষটার সর্বাঙ্গ এক-একবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে হল স্নায়ুগুলোও কাঁপছে। দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছে, ফেলছে। এক ঝটকায় উঠে বসল। শ্রাবণীর দিকে না তাকিয়ে পায়ের কাছ থেকে চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে চাপা দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল।

উতলা হবারই কথা। শ্রাবণী উতলা হয়েছে। আরো এগিয়ে এসে একখানা হাত তার কপালে রাখল।

গুণী দত্ত সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফেরাল। দু চোখ টকটকে লাল। চোখের কোলে কালির প্রলেপ। কিন্তু কপাল বরফের মত ঠাণ্ডা।

শ্রাবণী জিজ্ঞাসা করল না কি হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল না, কাল সকাল থেকে এ পর্যন্ত কোথায় ছিল। জিজ্ঞাসা যা করল তার জন্য গুণী দত্ত প্রস্তুত ছিল না। বলল, ফোনে ডাক্তারকে একটা খবর দেব?

গুণী দত্ত মাথা নাড়ল। তার কিছু হয়নি।

নিঃশ্বাসের একটা উগ্র গন্ধ লাগছে শ্রাবণীর নাকে। তবু সামনে দাঁড়িয়ে দেখল আর একটু। দু'দিনের মধ্যে শুধু মদ ছাড়া আর বোধ হয় কিছু পেটে পড়েনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। একজন চাকরকে বলল, বাথরুমে গরম জল দিতে। আর একজনকে নির্দেশ দিল, সাহেবের জন্য এক গেলাস গরম দুধ আর কিছু খাবার প্রস্তুত রাখতে। সামনে ছেলে কোলে আয়া দাঁড়িয়ে। শ্রাবণী এক মুহূর্ত ভেবে নিল কি, তারপর আয়াকে বলল, শিরিনকে বলে এসো সাহেব ফিরেছেন—ওকে নিয়েই যাও।

শ্রাবণী সেই ঘরেই ফিরে এলো আবার। শয্যার দিকে চেয়ে মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে। কাছে এসে দাঁড়াল। ঘুমিয়েই পড়েছে। অবিন্যস্ত চুলগুলো মুখে এসে পড়েছে। শ্রাবণী হাতে করে সরিয়ে দিল। টের পেল না। অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

অদূরে একটা চেয়ার টেনে বসল শ্রাবণী। দেখছে। বিবর্ণ, শান্ত, অসহায় মূর্তি। এ মূর্তি আর যেন দেখেনি শ্রাবণী। বুকের ভিতরটা টনটনিয়ে উঠতে চায়। উঠে

কাছে বসে গায়ে পিঠে হাত বুলোতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তাও পারে না। একই সঙ্গে এক বিপরীত ক্ষোভও বুকের ভিতর জমাট বেঁধে আছে। তার নীরব প্রতিক্রিয়াও কম নয়।

পরের ছ'মাসের মধ্যে শ্রাবণীর নির্দেশে চার-পাঁচদিন দর্শকদের টিকিটের দাম ফেরত দিতে হয়েছে। দাম যারা ফেরত চায় তাদের, অন্যথায় ওই টিকিটে তারা পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখতে পারে।

এভাবে হঠাৎ এক-একদিন প্রোগ্রাম বন্ধ করার কারণ গুণী দত্তর অসুস্থতা। দর্শকদের তাই জানানো হয়। অসুখ হয়ে পড়লে কে আর অভিযোগ করবে?

কিন্তু গোপনতা সত্ত্বেও দলের লোকেরা জানে অসুখটা কি। শ্রাবণী জানে। শিরিন জানে। এমন কি মঞ্চ-পরিচালকেরাও জানে।

সাধারণত রাতের প্রোগ্রাম শেষ করেই গুণী দত্ত মদ নিয়ে বসে। মাত্রা বাড়ছেই ক্রমশ। কিন্তু এক-একদিন সকাল থেকেই শুরু হয়। শ্রাবণী তখনি বুঝতে পারে সেদিন আর প্রোগ্রাম হবে না। আগে থাকতেই প্রোগ্রাম বাতিলের ব্যবস্থা করে সে।

বাইরে শান্ত হলেও ভিতরে ভিতরে বিচলিত হয়েছে সে। গোড়ায় গোড়ায় এক-একদিন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, এই ভাবেই চলবে তাহলে?

জবাব পায়নি। যাদু-মঞ্চে ভিন্ন কথাবার্তা গুণী দত্ত আজকাল বলেই না প্রায়। কারো সঙ্গেই না।

শ্রাবণী তবু জিজ্ঞাসা করে, এ-রকম করছ কেন? কি ভুলতে চাও?

এরও জবাব মেলেনি। মিলবে না জানত। তবু শ্রাবণী অপেক্ষা করেছে। জবাবের প্রতীক্ষা করেছে। তারপর নিজের বুকের ভিতরটা সংযত করে আরো কিছু বলেছে। বলেছে, আমাকেই যদি তোমার অসহ্য হয়ে থাকে তাও বলো, আমি না হয় চলে যাব এখান থেকে। আমি তো কারো জীবনে অশান্তি আনতে চাইনি।

এ-রকম বলার ফলে মদের মাত্রা হয়ত দুই-একদিন একটু কমেছে, কিন্তু তারপর আবার যে কে সেই। সত্যি চলে যাবে কিনা, শ্রাবণী যথার্থই ভেবেছে। গেলেও বাধা দেবে না হয়ত। কিন্তু তার যাবার নামে যে অব্যক্ত অস্থিরতা চোখে পড়ে, শ্রাবণীর শেষ পর্যন্ত যেতে মন সরে না। মনে হয় সে সরে গেলে এই লোকের আত্মঘাতী হওয়া বিচিত্র নয়।

এক রাতের সেই ধাক্কার চেয়ে মদে ডোবার ধাক্কাটা শিরিনের কাছেও কম নয়। প্রোগ্রাম বাতিলের খবর পেলে সে-ও নিঃশব্দে গুণী দত্তর ঘরে এসে দাঁড়ায়। দেখে। দৃষ্টি ধারালো কঠিন হয়ে ওঠে। সেই দৃষ্টি শ্রাবণীকে দগ্ধ করতে চায়। তারপর নিঃশব্দেই চলে যায় আবার।

এই মেয়েটার পরিবর্তন শ্রাবণীকে বিস্মিত করেছে। আগের মতই যাদুমঞ্চে আবির্ভাব তার। যাদু-সহচরী ভানুমতী সে। শতসহস্র দর্শকের চোখে যাদুকন্যার মতই। শ্রাবণী তীক্ষ্ণ মনোযোগে লক্ষ্য করেছে তাকে। একমাত্র মঞ্চে এসে দাঁড়ালেই

মেয়েটার মুখের ভোল বদলায়। ঠোঁটের ফাঁকে যাদুর মায়া ফোটে। কালো চোখের চাউনিতে যাদুর ছোঁয়া লাগে। উল্টে সে-ই যেন ম্যাজিসিয়ানকে ধীরে ধীরে সজাগ সজীব করে তোলে। না, মঞ্চে এসে দাঁড়ালে আগের থেকে তফাত খুব শ্রাবণীও অনুভব করতে পারে না। বরং এই ঈষৎশান্ত বিজয়িনী মূর্তি সময় সময় যেন অদ্ভুত ক্ষমাসুন্দর মনে হয় তার। কিন্তু তফাত অনুভব করে মঞ্চের বাইরে এলেই। সেখানে সে ভানুমতী নয়, শিরিন। সেখানে তার মুখের ধারালো গাম্ভীর্য সদা সজাগ, সদা অসহিষ্ণু। একটি কথা বলে না, ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সকলকে। তাকে, তার ম্যাজিসিয়ানকে। এই মেয়ের প্রতি ঘরের লোকটির আচরণেও অনেক তফাত দেখছে শ্রাবণী। ঘরোয়া অনুশীলন বন্ধ হয়েছে। মঞ্চের বাইরে দিনান্তে দুজনের একটা কথা হয় কিনা সন্দেহ। দু'জনকে দেখে একজনের এই আত্মধ্বংসী বিস্মৃতির কিছু একটা হেতু অনুমান করেছে শ্রাবণী। অনুমান সেই এক রাতের পর থেকেই করে আসছে।

মাস দুই আগে আবার এক চিত্র-প্রতিষ্ঠান থেকে একটা ছবির জন্য শিরিনকে চুক্তিবদ্ধ করার চেষ্টা চলছিল। শোনামাত্র শ্রাবণী শিরিনকে গুণী দত্তর সামনেই ডেকে বলেছে, তুমি ইচ্ছে করলেই যেতে পারো, ভবিষ্যতের কথা ভেবে যাওয়াই উচিত।

শিরিন হাঁ-না কিছুই বলেনি। তবে তীক্ষ্ণ ধারালো দুই চোখ শ্রাবণীর মুখের ওপর থেকে গুণী দত্তর মুখে এসে থেমেছে। তারপর চলে গেছে। শ্রাবণীর বিবেচনায় সব প্রলোভন ছেড়ে যাদু-সহচরী হয়ে থাকতে চাওয়াটাও স্বাভাবিক নয়।

এই ত্রি-ধারার চূড়ান্ত সংঘাত ঘটে গেল জয়পুরে এসে। ম্যাজিকের আমন্ত্রণে দিন-চার-পাঁচ আগেই তারা এসেছিল। রাজা-মহারাজার ব্যাপার, লোভনীয় চুক্তি। আরো বহু বিশিষ্ট রাজনীতি-কূটনীতিজ্ঞের সমাবেশ হবে। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছানোর পরদিন থেকে অবিশ্রান্ত মদ খাচ্ছে গুণী দত্ত। এটা কলকাতা নয়, অবাক-যাদুকর-অতিথির খোঁজখবর নিতে মানী-জনেরা হামেশা আসছেন। গুণীডাটার শরীর সুস্থ নয় জানিয়ে শ্রাবণী তাঁদের বিদায় করছে। কিন্তু এদিকে রাগে আর চিন্তায় অস্থির সে। ভিতরে এসে মানুষটার ওপর ঝলসে উঠে তাকে সচেতন করতে চেয়েছে। কোনো ফল হয়নি।

এটা কলকাতা নয় যে সব গোপন থাকবে। তার ওপর তারা অতিথি। যাদুকরের অসুস্থতার কারণ নিয়ে এরই মধ্যে বেশ কানাকানি শুরু হয়ে গেছে। শো-এর দুদিন আগের রাতে শিরিন শ্রাবণীর কাছে এলো। এভাবে আগে কখনো আসেনি। একই দালানে আছে, তবু শুধু খাওয়ার সময় ছাড়া এ দুদিন তাকে দেখেওনি শ্রাবণী।

শিরিন ধীর শান্ত কণ্ঠে বলল, তুমি তাহলে গুণীডাটাকে মদ ছাড়াতে পারলে না?

শ্রাবণী অবাক প্রথম। তারপর সহজাত সংযমে নিজেকে বাঁধল।—না। এবারে তুমি চেষ্টা করবে?

আমি ছাড়িয়েছিলাম। তুমি আবার ধরিয়েছ। তুমি তাকে ভালবাসতে পারলে

সে মদ খেত না।

স্পর্ধার কথা শুনে শ্রাবণী স্তব্ধ। কিন্তু কিছু বলার আগে একটা উদ্গত অনুভূতি ঠেলে উঠতে শিরিন আর একটু কাছে সরে এলো। অস্ফুট ত্রাসে কাতরোক্তি করে উঠলো, এই মদ খেয়ে আমার মা মরেছে, আমার সাহেবজী মরেছে। তুমি দেখছ না গুণীডাটা কোন দিকে যাচ্ছে? তুমি কি বুঝছ না কি হবে

জবাব দিতে সময় লাগল শ্রাবণীর। আস্তে আস্তে বলল, বুঝছি। এবারে তুমি তাহলে ভালবেসে দেখো মদ ছাড়ে কিনা।

নিষ্পলক দুটো কালো চোখ শ্রাবণীর মুখের ওপর যেন তপ্ত বিদ্বেষ ছড়ালো খানিকক্ষণ ধরে।—আমি তাকে ভালবাসি। এবারে সে মদ ছাড়বে। কাল থেকেই ছাড়বে।

বেরিয়ে এসে শিরিন সোজা গুণী দত্তর ঘরে চলে এলো।

শ্রাবণী চিত্রার্পিতের মত বসেছিল খানিকক্ষণ। কোথায় গেল টের পেয়ে সচেতন হল। বিস্ময়ে ক্রোধে স্তব্ধ। সমস্ত রক্তকণা মুখের ওপর ছুটোছুটি করছে। সেও উঠে এলো। ভিতরে ঢুকল না, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

গুণী দত্ত শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিল। পাশের টেবিলে শূন্য বোতল শূন্য গেলাস। কে এসে দাঁড়াল টের পেয়ে শয্যার পাশ থেকে একটা বিলিতি জার্নাল টেনে নিল সে।

শিরিন জিজ্ঞাসা করল, আজকের মদ খাওয়া শেষ করেছ?

গুণী দত্ত একবার তাকাল শুধু, জবাব দিল না।

খুব ধীর, খুব শান্ত স্পষ্ট কণ্ঠে শিরিন বলল, কাল থেকে তুমি আর মদ খাবে না।

জবাব নেই।

আমার কথা শুনছ? কাল থেকে তুমি আর মদ খাবে না। হ্যাঁ কি না জবাব দাও।

গুণী দত্ত কাগজ ফেলে উঠে বসল। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। দেখল একটু।—খেলে কি করবে?

খেলে আমাকে আর পাবে না।

কোথায় যাবে? কণ্ঠস্বর চড়ল।

যাবার জায়গা আছে। তুমি জবাব দাও।

গুণী দত্ত আরো একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল, বলল, কালকের জবাব কাল পাবে, আজ যাও।

শিরিন চলে এলো। দোরগোড়ায় শ্রাবণী দাঁড়িয়ে। তার দিকে তাকালও না।

পরদিন। দুপুরে তিনজনে খেতে বসেছে টেবিলে। শ্রাবণী গুণী দত্ত আর শিরিন। গুণী দত্ত আজ সকালে মদ খায়নি। কিন্তু খেতে খেতে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। বলে গেল এক্ষুনি আসছে। ফিরল বড় একটা বোতল নিয়ে। গ্লাসে মদ ঢালল। খেল। আবার ঢালল। এবারে শুধু গ্লাসে নয়, ভাতে তরকারিতে মাছে মাংসয়।

সব কিছুতে মদ ঢেলে মদ মিশিয়ে তারপর খাচ্ছে।

পরিচালকরা তটস্থ। শ্রাবণী স্তম্ভিত। শ্রাবণী নিস্পন্দ কাঠ!

গুণী দত্ত আজ জবাব দেবে বলেছিল। জবাব দিয়েছে। আসববর্জিত কোন ভোজ্য মুখে তুলবে না।

খাওয়া ছেড়ে শিরিন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ফর্সা মুখ কাগজের মত সাদা। এক পা এক পা করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে।

শ্রবাণীর হুঁশ ফিরল। চাকর-বাকরের সামনে লজ্জায় মাথা কাটা গেছে। রাগে বিতৃষ্ণায় দিশেহারা সে। এক ঝটকায় উঠে বাইরে এলো সে-ও। সব কিছুর মূলে যেন এই মেয়েটাই।

দাঁড়াও!

শিরিন দাঁড়াল। ফিরল।

তিক্ত চাপা কণ্ঠে ঝলসে উঠল শ্রাবণী, এবারে কি করবে তুমি? এরপর মুখ দেখাতে লজ্জা করবে না তোমার? ভালবাসার জোর দেখা হয়েছে, না আরো দেখবে?

শিরিন নির্বাক।

আরো মৃদু আরো চাপা রোষে শ্রাবণী বলল, এতটুকু আত্মসম্মান-বোধ যদি থাকে এই মুহূর্তে তুমি এখান থেকে চলে যাবে আমি আশা করছি।

জ্বলতে জ্বলতে আবার ঘরে ঢুকল সে।

পরদিন।

সকাল থেকেই রাতের শো-এর তোড়জোড় চলছে। পর পর দুদিনের প্রোগ্রাম। গুণী দত্ত দুদিনে কি কি দেখানো হবে ঠিক করছে। ধীর গম্ভীর সে।—ফ্লোটিং লেডি? না, ওটা হবে না, ওটার জন্য অভিজ্ঞ সহচরী দরকার। পিপের খেলা আর ভালুকের খেলাও সেই কারণেই বাদ। আর অভিজ্ঞ সহচরী ভিন্ন 'স-ইং থ্রু এ লেডি' দেখাতে যাওয়া তো বিপজ্জনক। মনস্তত্ত্বগত যাদুও কিছু কিছু বাতিল। সব শেষে শিল্পীর স্বপ্ন। না, সেটা আর হয় কি করে! কিন্তু তবু গুণী দত্ত বলছে, ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

গতকাল থেকেই শিরিন নেই। কোথায় গেছে শ্রাবণী জানে না।

কিন্তু আজ সে বড় অসহায় বোধ করছে। গতকাল ক্রোধে অতটা দিশেহারা হবার দরুণ নিজেকে নিয়েই আজ বিড়ম্বিত সে। মনে হচ্ছে আসন্ন অনুষ্ঠানের সব বাঁধনই যেন ঢিলে হয়ে গেছে। অবাক যাদুকর গুণীডাটার নিরুত্তাপ যাদুর খেলা দেখে গণ্যমান্য দর্শকরা হয়ত আশাহত হবে। দলের অন্যান্যদেরও যেন উৎসাহের অভাব।

বিকেলের দিকে অন্যমনস্কের মত গুণী দত্ত একসময় শ্রাবণীকে জিজ্ঞাসা করল,কাল শিরিনকে তুমি চলে যেতে বলেছ, না?

শ্রাবণী নীরব।

গুণী দত্ত হেসেছে একটু।—আমিও তো বলেছি, আমি যে-ভাবে বলেছি তোমার

বলাটা তার তুলনায় অনেক কম। যাকগে, সব ঠিক আছে।

শ্রাবণী বলেই ফেলল, ঠিক তো কিছু দেখছি না। আসল খেলাগুলো সবই তো প্রায় বাতিল করে দিলে।

যা আছে তাতেই হবে। ভেবো না।

গুণী দত্ত চলে গেল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার বদলে শ্রাবণী কেন জানি আরো বেশি অসহায় বোধ করতে লাগল।

যথাসময়ে অনুষ্ঠান ছাড়া-ছাড়া ভাবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ গ্রীনরুমের ভিতরে একটা উৎসাহের জোয়ার এলো যেন। ভিতরে শিরিন বসে। যাদু-সহচরী হবার জন্যে যেমন আসে সেইভাবে প্রস্তুত হয়েই এসেছে।

শ্রাবণী একটা বিরূপ অভিব্যক্তি দমন করল। তবু ভারী নিশ্চিন্ত বোধ করছে। গুণী দত্ত দেখল তাকে। একটিও কথা বলল না।

সেদিনের অনুষ্ঠান জমজমাট। পরের দিনেরও। শ্রাবণীর কেমন মনে হল, এমন সার্থক যাদুর খেলা সে-ও বেশি দেখেনি।

সেই সব শ্বাসরোধী পলায়নী যাদুর খেলা আজ কোন্ যাদুর মায়ায় তার চোখেও শিল্পের পর্যায়ে এসে পৌঁছুলো? সেই শিকারী আর ভালুকের সাজ বদলের জানা রহস্য আজ তাকেও নতুন করে অভিভূত করল কেমন করে? সেই 'পীপল্ অফ্ অল্ নেশনস্'এ আজ বুঝি জুলি সত্যিই এক অনাবিল মিলনের উৎসমুখে এসে দাঁড়াল। সেই ফ্লোটিং লেডির জানা-রহস্য দূরে সরে গিয়ে আজ যেন শ্রাবণীর চোখের সামনে শূন্যের মায়া-শয্যায় ঘুমিয়ে পড়ল এক ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা। আর সব শেষে সেই 'আর্টিস্ট্স্ ড্রীম'! শ্রাবণী ভেবে পায় না, দর্শকদের সঙ্গে আজ তার হৃদয়ের নিভৃতেও দয়িত হারানোর এক বেদনা মূর্ত হয়ে উঠল কি করে!

এই ভানুমতী আর এই যাদুকর গুণীডাটার বুঝি তুলনা নেই।

॥ ১৮ ॥

হাওড়া স্টেশন।

নিজের কামরা থেকে নেমে গুণী দত্ত আর শ্রাবণী অপেক্ষা করছে। ওদিক থেকে জিনিসপত্র এবং সরঞ্জামসহ দলের সকলেও নেমেছে। ওধারের একটা প্রথম শ্রেণীর ছোট খুপরিতে শিরিন ছিল। সে নামছে না।

গুণী দত্ত এগিয়ে দেখতে এলো। তার পিছনে শ্রাবণীও কয়েক পা এসেছে। দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল, সামনের মানুষটা হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়েছে। বিমূঢ় মুখে কামরার ভিতরটা ঝুঁকে দেখল একবার, তারপর নিজের অগোচরেই এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

শ্রাবণী চোখে চোখ পড়তে সচকিত হল। সামলে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, চলো—

শ্রাবণী অবাক। সেই সঙ্গে অজ্ঞাত শঙ্কাও।—শিরিন?

সে অন্য কোথাও নেমে গেছে।

তাড়াতাড়ি গেটের দিকে পা বাড়াল গুণী দত্ত।

শ্রাবণী হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে। মানুষটা গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সে দেখছে, কিন্তু বাধা দিতে পারছে না। তাকে অনুসরণও করতে পারছে না। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দিশা ফিরল যেন তার। এখনো অনেক লোক প্ল্যাটফর্মে, নিজেরা নামছে, মাল-পত্র নামাচ্ছে, কুলির জন্য হাঁক-ডাক করছে। তাদের দেখার ভুল হতে পারে—হয়ত শিরিন এরই মধ্যে আছে কোথাও।

শ্রাবণী শিরিনের কামরার দিকেই এগিয়ে গেল। দু'চোখ তার তন্নতন্ন করে খুঁজে ফিরল খানিকক্ষণ ধরে। তারপর অবসন্নের মত দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। শেষে শ্লথ পায়ে গেটের দিকে এগলো।....মেয়েটা তাহলে তাদের সুনাম আর সম্মান রক্ষা করার জন্যেই দুটো দিন ছিল। সম্মান বাঁচিয়ে দিয়ে তারপর চলে গেল। তাকে তো যেতেই বলা হয়েছিল, কিন্তু বুকের ভিতরটা হঠাৎ এত খালি হয়ে গেল কেন শ্রাবণী জানে না।

গুণী দত্ত গেটের সামনে অপেক্ষা করছিল। টিকিট তার কাছে। কিছু জিজ্ঞাসা করল না, শ্রাবণীর দিকে তাকালও না। নিঃশব্দে গেট পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে গাড়িতে উঠল।

এক কোণে ঠেস দিয়ে বসে আছে চোখ বুজে। এধার থেকে শ্রাবণী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দুই একবার। মনে হয় ঘুমুচ্ছে। শ্রাবণীর দু'চোখ সজল, কিন্তু নিজেকে সে সংবরণ করে আছে। দুজনের মাঝে সামান্য ব্যবধান। তবু এ ব্যবধান যেন আর ঘোচাবার নয়।

কিন্তু তা না, ব্যবধান ঘুচেছে।

দিন গেছে, মাস গেছে, বছর ঘুরেছে। শ্রাবণীর মনে হয়েছে এ এক প্রবল পুরুষ যেন হার মেনে আত্মসমর্পণ করেছে তার কাছে। পরাজিত মানুষ তার প্রবল সত্তা ঝাঁঝরা করে করে বিনা প্রতিবাদে জীবনের মাশুল গুনে যাচ্ছে। শান্তি ফিরেছে বইকি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে অবিমিশ্র শান্তি। কিন্তু শ্রাবণীর মনে হয় সমাধির শান্তি। এই শান্তি সে চায়নি। প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক ত্রুটিহীন যান্ত্রিক ছকে বাঁধা। শ্রাবণীর এক-একদিন হাঁফ করে, অসহায় মনে হয় নিজেকে।

সকলের অজ্ঞাতসারে শিরিনকে শুধু সে-ই খুঁজেছে। কলকাতার যত জায়গায় তার হদিস মিলতে পারে সর্বত্র খবর নিয়েছে। শিরিনের ব্যাঙ্কে গেছে। ব্যাঙ্কের বই-পত্র একদিন শিরিনকে ডেকে দিয়ে দিয়েছিল মনে পড়েছে। সেখানে সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু সেখান থেকেও নির্বাক বেদনা নিয়েই ফিরেছে। শিরিন সমস্ত টাকা তুলে নিয়ে গেছে—ব্যাঙ্কে তার নামে কোনো অ্যাকাউন্ট নেই।

নতুন করে আবার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণে মন দিয়েছে শ্রাবণী। ম্যাজিক বন্ধ হয়নি। একজনের বদলে নতুন যাদু-সহচরী নিয়োগ করেছে দুজন। তারা মোটামুটি অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে এখন বলা যেতে পারে। দর্শক ভানুমতীকে ভুললেও ভুলতে পারে একদিন। ভোলে যাতে প্রতিষ্ঠানের সকলেরই সেই চেষ্টা।

কিন্তু চেষ্টাটা কোথায় ব্যর্থ সে শুধু শ্রাবণীই জানে। শুধু সে-ই উপলব্ধি পরতে পারে।

দু'বছর বাদে বিলেত থেকে গুণী দত্তর নামে একটা চিঠি এলো।

চিঠিটা পড়া হতে শ্রাবণী তার মুখের দিকে চেয়ে শঙ্কা বোধ করল কেমন। মনে হল অকস্মাৎ একটা মর্মান্তিক ধাক্কা খেয়েছে। সমস্ত মুখ নিঃসাড়, পাণ্ডুর।

কার চিঠি?

জবাব না দিয়ে গুণী দত্ত চিঠিটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

জুলি স্যান্ডারসনের চিঠি। শ্রাবণী রুদ্ধশ্বাসে পড়তে লাগল।

বন্ধু, আশা করি একেবারে ভুলে যাওনি। চিঠি পেয়ে হয়ত অবাক হবে। এই চিঠি তোমাকে লিখব আমিও ভাবিনি। গোপনে লিখছি। গোপন শিরিনকে। সে আমার কাছেই আছে। এদেশের এক যাদুকরের যাদু-সহচরী হয়ে আছে। কিন্তু তার জন্য আমি চিন্তিত। ক্রমশ তার মদের মাত্রা বাড়ছে—এখন দু-বেলাই মদ খায়। নিষেধ করলে হাসে। বলে, গুণীডাটা যা ছাড়তে পারল না, দেখি সে কেমন জিনিস। বন্ধু, মিথ্যে করেও কি তুমি তাকে একবারটি লিখবে, তুমি আর মদ খাও না।—জুলি স্যান্ডারসন।

শ্রাবণী কাঁদ-কাঁদ মুখে তক্ষুনি চিঠির জবাব দিতে চেয়েছে। লিখতে চেয়েছে, শিরিন, তোমার গুণীডাটা দু'বছরের মধ্যে আর একটা দিনও মদ ছোঁয়নি। তোমার ভালবাসারই জিত হয়েছে।

কিন্তু গুণী দত্ত নিষেধ করেছে। বলেছে, থাক। যা হচ্ছে সবই ওপরের যাদুকরের ইচ্ছেয় হচ্ছে। নিজেকে আমার এখনো চিনতে বাকি শ্রাবণী।

আরো তিন বছর পরে।

যাদুর পেশা থেকে গুণী দত্তর বিদায় সংবর্ধনা সেদিন। খবরটা আচমকা প্রকাশ হয়েছে। কেউ প্রস্তুত ছিল না। এমন কি শ্রাবণীও না। দিন কয়েক ভয়ানক অন্যমনস্ক দেখেছে তাকে। কিছু বলতে এলে হঠাৎ চমকে চমকে উঠতে দেখেছে। মনের ওপর দিয়ে একটা নীরব ঝড় অতিক্রম করতে দেখেছে শুধু। কিন্তু জিজ্ঞাসা করেও কোনো জবাব পায়নি। মাথা নেড়েছে শুধু, কিছু হয়নি। বলেছে, শরীরটা ভালো না। তারপর সত্যিই অসুখে পড়েছিল দিন-কতক। সেরে ওঠার পর এই সঙ্কল্প।

সংবর্ধনার ভাষণে একজন সখেদে বললেন, পলায়নী যাদুকর গুণীডাটার এমন অবিশ্বাস্য পলায়ন-যাদুর বারতা শোনার জন্য কেউ তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। দেশের হয়ে এখনো তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, গুণীডাটা যেন অচিরে মত পরিবর্তন করেন।

গুণী দত্ত হেসেছে শুধু। কোনরকম আশ্বাস দেয়নি। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছে।

রাত্রি।

ওধারের ঘরে ছেলেটা দাপাদাপি করে খেলা করছে। বারান্দার রেলিং ধরে গুণী দত্ত দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ। আকাশ দেখছিল। চাঁদ দেখছিল। তারার শোভা দেখছিল।

শ্রাবণী এসে পাশে দাঁড়াল। অভিমানাহত সুরে বলল, এ তো আমি চাইনি, এরপর কি নিয়ে থাকবে তুমি?

গুণী দত্ত এক হাত বাড়িয়ে তাকে শুধু আর একটু কাছে টেনে আনল। অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বলল, ওই ওপরের দিকে চেয়ে দেখ। ওই দেখে দেখে এই যাদুর খেলা দেখাতে আমার লজ্জা করে শ্রাবণী।

শ্রাবণী সজোরে মাথা ঝাঁকালো। বলল, না, ও আমি শুনতে চাইনে—কোন কিছুরই তো তাহলে অর্থ হয় না। আমার মন বলছে সব কিছুর জন্যে আমিই দায়ী।

গুণী দত্ত হাসল একটু। বলল, মিথ্যে কষ্ট পাচ্ছ। তুমি জান না, তোমার ক্ষমার মধ্যে তুমি কত সুন্দর হয়েছ।

আমি সুন্দর হতে চাইনে। আমার কথা শোন, লক্ষ্মীটি। চলো, আমরা দুজনে গিয়ে শিরিনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। তুমি বিশ্বাস করো, আমি তাকে আপন করে নিতে পারব।

আবছা অন্ধকারে গুণী দত্ত নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল খানিক। দুই চোখে আশার আকৃতি নিয়ে শ্রাবণী চেয়ে আছে তার দিকে।

কিছুক্ষণ বাদে, যেন অনেকক্ষণ বাদে, বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে গুণী দত্ত আস্তে আস্তে বলল, তা আর হয় না শ্রাবণী। দিনকয়েক আগে জুলির আর একখানা চিঠি এসেছে। আমার ড্রয়ারে আছে। পড়ে দেখগে।

শ্রাবণী অবাক কয়েকটা মুহূর্ত। হঠাৎ-ই যেন অজ্ঞাত ত্রাসের ঝাঁকুনি লাগল একটা। তাড়াতাড়ি এসে ড্রয়ার খুলে চিঠি বার করল। পড়ল। পড়তে পড়তে বসে পড়ল। থেকে থেকে চোখের সামনে অন্ধকার দেখছে।

বন্ধু, শিরিন আর নেই খবরের কাগজে সে খবরটা পেয়েছ কিনা জানি না। এখানে সকলেরই ধারণা, যাদুর খেলা দেখাতে গিয়ে নিজের ভুলে এই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনাই বলবে সকলে। ছুটন্ত বুলেট কামড়ে ধরার খেলাটা তোমার কাছেই বোধ হয় শিখেছিল সে। কিন্তু নকল বুলেট নয়, আসল বুলেটই ছুটেছিল যাদুকরের হাত থেকে। দুর্ঘটনা ঘটে যেতে যাদুকর নিজেও হতভম্ব। তার আর দোষ কি বলো, সকলকে আসল বুলেট দেখিয়ে বন্দুকে গুলি তো শিরিনই পুরেছিল। কিন্তু মর্মান্তিক ব্যাপারটা ঘটার পর দেখা গেল, শিরিনের হাতে নকল বুলেট, আসল বুলেটটাই সে বন্দুকে পুরে যাদুকরের হাতে দিয়েছে। সকলে জানল নিজের ভুলে মেয়েটা মরল।

কিন্তু আমি তো জানি ভুল নয়। ক'দিন আগে থেকেই অন্যরকম দেখছিলাম তাকে। মাত্র দিন তিনেক আগেই প্রচুর মদ খাচ্ছিল আর হাসতে হাসতে বলছিল, হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়ে যায়, গুণীডাটাকে জানিও। এ-রকম যে হবে ভাবিনি।

হাসপাতালে চার-পাঁচ ঘণ্টা বেঁচে ছিল। জ্ঞান ছিল। আমাকে ডেকে ফিসফিস করে বলেছে, গুণীডাটা মদ ছাড়ল কিনা জানা হল না।

একটা অনুরোধ বন্ধু, যদি না ছেড়ে থাকো, ছেড়ে দিও।

—জুলি স্যান্ডারসন।

অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ না পেয়ে গুণী দত্ত পায়ে পায়ে ঘরে এলো। শ্রাবণী টেবিলের ওপর দুই বাহুতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। কাঁদছে।

গুণী দত্তর দুই চোখও জলে চিকচিক করছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

কিন্তু সে কাঁদছে না। হাসছে।

অন্তত চেষ্টা করছে হাসতে।

বকুল বাসর

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

রাস্তার একটা লোককে জিজ্ঞাসা করতে সে আঙুল তুলে দূরের পাঁচিল-ঘেরা বাড়িটা দেখিয়ে দিল।—ওই বকুলবাড়ি।

মফঃস্বল শহরে বাড়ির নম্বর না থাকলেও নাম আছে। কিন্তু রাস্তার নাম না জেনেও বাড়িটা এত সহজে খুঁজে পাবে কমলেশ ভাবে নি। মা শুধু বলেছিল গঙ্গার ধারে বাড়ির আর বাড়ির নাম বকুলবাড়ি। বাড়িটা না পাওয়া গেলেও কমলেশ অখুশি হত না। সে বাড়ি খুঁজতে বেরোয় নি। বিকেলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে বেরিয়েছিল। আর মনে মনে নিজের জন্যে বরং একটা সুবিধেমত আস্তানা খুঁজে নেবার তালে ছিল। ছেলেদের সঙ্গে এক ছাদের নীচে মাথা গোঁজা মাস্টারের পক্ষে সুবিধেজনক নয়। বিশেষ করে আসতে না আসতে রসিক লোক বলে যে মাস্টারের খ্যাতি রটে গেছে। গাছগাছড়ার শেকড় পড়াতে পড়াতে দরজার ধারে উঁচু গ্যালারির একটি মোটা ছেলের উদাস চোখ মেঘলা আকাশের দিকে উধাও হতে দেখেছিল। পড়াতে পড়াতে গম্ভীর মুখেই গাছের শিকড় থেকে মনের শিকড়ের প্রসঙ্গে এসে গিয়েছিল সে। পঠনের হঠাৎ এই অবান্তর গতি-পরিবর্তনে ভালো ছেলেরা হয়তো একটু অবাক হয়েছিল। শিকড় থেকে মন তফাত হলে দেহভাবের অবস্থা কেমন হয় বোঝাতে গিয়ে কমলেশ আঙুল দিয়ে আকাশ-মুগ্ধ মোটা ছেলেটিকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

ক্লাসে হাসির রোল উঠেছিল। অন্যমনস্ক মোটা ছেলেটি সচকিত হয়ে হাসির কারণ বুঝতে চেষ্টা করেছিল। নির্লিপ্ত মুখে কমলেশ পড়ার বইটা টেনে নিয়ে বলেছিল, ভদ্রলোকের সূক্ষ্ম চিন্তায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে আমরা আবার স্থূল শিকড়-প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চেষ্টা করি।

বিকেলে হকি-স্টিক হাতে ছেলের দল ঘিরে ধরেছিল।—সার, খেলবেন চলুন।

কমলেশ মৃদু গম্ভীর তৎপরতায় একটি ছেলের হাতের স্টিক নিয়ে দু'হাতে বাগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিল, কাকে দিয়ে শুরু করব ?

ছেলেরা হেসে সারা। তবু বায়না ধরেছিল, না সার চলুন, আপনি নিশ্চয় জানেন খেলতে।

কমলেশ অস্বীকার করে নি। বলেছে, জানি। কিন্তু তার আগে প্রিন্সিপালের কাছে তোমরা প্রত্যেকে একটা করে বণ্ড লিখে দিয়ে এসো, হাত-পা খসলে তোমরা নিজেরাই দায়ী।

ক'দিনের মধ্যে এরকম ছোটখাটো অনেক হাসির ব্যাপার হয়েছে। মফঃস্বল কলেজের ছেলেরা গুরু-গম্ভীর মাস্টারদের কাছে অনেকটা স্কুলের ধরনের ব্যবহার পেয়ে অভ্যস্ত। তার মধ্যে একজনের এই ব্যতিক্রম দেখে তারা খুশি। সে পড়ায় কেমন সেই আলোচনা এখনো কানে আসে নি। কিন্তু সে যে গাম্ভীর্যের আড়ালে মজার লোক এবং ভালো লোক—এই অভিমত এরই মধ্যে তার কানে গেছে।

অফিসের চাকরি ছেড়ে সে কলেজে কাজ নিচ্ছে শুনেই মা বলেছিল, তুই যে বিশ্ব-

ফাজিল, তুই ছেলে পড়াবি কি করে? ছেলেরা তোর কাঁধ থেকে মাথায় উঠবে।

কমলেশ নিরীহ মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছিল, নাগাল পাবে বলছ?

ছেলে মায়ের মাথা ছাড়িয়েও দেড় হাত লম্বা। কলেজ উতরে য়ুনিভার্সিটির ভব্য পরিবেশে ঢোকার পর তার লম্বা-দা নাম ঘুচেছিল।

মা বহুকাল ইউ. পি.-র বাসিন্দা। বাবা বরাবর উত্তর প্রদেশের সরকারী চাকুরে। ওদিকেই পাকাপাকি বাড়ি-ঘর করেছে। ভাই-বোনেদের মধ্যে এক কমলেশই কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করেছে। মায়ের কাছে গেলে সকলের সঙ্গেই সে জোর গলায় হিন্দী চালায়, আর সকলে হেসে কুটিপাটি হয়।

বাংলা দেশের কোন্ মফঃস্বল কলেজে চাকরি নিয়ে যাচ্ছে শুনেই মা খুশি হয়ে বলেছিল, ওখানে তো সুরমা থাকে, তোর মাসি হয়—আমার নিজের মামাতো বোন। ছেলেবেলায় একসঙ্গে কত খেলাধুলো করেছি, খুব মিষ্টি দেখতে আর মিষ্টি স্বভাব ছিল। সকলে মিষ্টি বলে ডাকত। বিয়ের পরেও বার-দুই দেখা হয়েছিল, তারপর তো সবই গেছে।

সব কি গেছে সেটা কমলেশ দিনকতক ধরে শুনেছে। মায়ের মামাতো বোন এই অদেখা মাসিটির সম্বন্ধে অনেক কথা তাকে শুনতে হয়েছে। মা বার বার করে বলে দিয়েছে, সেখানে গিয়েই আগে মিষ্টিমাসির সঙ্গে দেখা করবি, খুব যত্ন-আত্তি করবে দেখিস'খন।

যে কলেজে কাজ নিয়েছে, সেই শহরে তার ওই বোনটি থাকে বলেই যেন মা ছেলের ব্যাপারে খানিকটা নিশ্চিন্ত। মায়ের খুশির আর একটা কারণও কমলেশ সভয়ে অনুমান করতে পারে। বাংলাদেশের বাসিন্দা এই আত্মীয়টির কথা এতকাল মনে পড়ে নি বলেই মায়ের খেদ। বাংলাদেশের তেমন চেনাজানা কারো ঠিকানা পেলেই মা ঘন ঘন তাঁকে কয়েকখানা চিঠি লিখে ফেলেন। তাঁর ছেলের জন্য একটি ভাল মেয়ের সন্ধান চাই। সম্ভব হলে মাস কতকের জন্য কলকাতায় একটা বাসা নিয়ে বেশ দেখে-শুনে ছেলের একটা বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় কিনা, সেই চিন্তাও করেছেন। কিন্তু ছেলেই তাঁকে হতাশ করেছে। কলকাতায় বাসা পাওয়া নাকি রাজকন্যে পাওয়ার সামিল। আর বাসা যদি পাওয়াই যায়, তার মাশুল গুনতে গিয়ে শুধু হাওয়া খেয়েই থাকতে হবে।

ছেলের সব কথা মা ধরেন না, তবু ঘাবড়ে যান। কতকাল তো বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, জানবেন কি করে। তবু বলেন, তাহলে কি হবে, তিরিশ তো পেরুতে চলল, আর বিয়ে করবি কবে?

এখন এই মিষ্টিমাসির বাড়ির হদিস পেলে তার কাছে যে দু'চারবার পত্রাঘাত চলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই সব কারণেই মিষ্টিমাসির বাড়ির খোঁজ না পেলেও কমলেশ অখুশি হত না। এক ধার ধরে শহরের এ-মাথা ও-মাথা গঙ্গা। কোন্ মাথায় মিষ্টিমাসির বকুলবাড়ি কে জানে। তাছাড়া গঙ্গার ধারের বড় রাস্তার পাশ দিয়েও ভিতরে ভিতরে কত রাস্তা আর কত বাড়ি—কোথায় আন্দাজে বকুলবাড়ি খুঁজবে সে? কিন্তু মাকে বোঝানো শক্ত, এরই মধ্যে চিঠিতে তাগিদ দিয়েছেন, মিষ্টিমাসির কথা কিছু লিখিস নি কেন, তার সঙ্গে এখনো দেখা করিস নি কেন?

নির্জলা মিথ্যার দায় এড়ানোর জন্যেই বেড়াতে বেড়াতে আশেপাশের বাড়িগুলোর দিকে চোখ রেখে চলেছিল সে। আর মনে মনে ভাবছিল, এই গঙ্গার ধারেই খান-দুই নিরিবিলি ঘর পেলে মন্দ হয় না। ছেলেদের মধ্যে থাকা কোনো কাজের কথা নয়, তাছাড়া সেখানেও ঠাসাঠাসি ভিড়। হোস্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁর নিজের দখলের বাইরের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন বলে সাময়িক সুবিধে হয়েছে। ঘর পেলে তাঁর ঘর ছেড়ে দেওয়ার কথা। এখন যত তাড়াতাড়ি ঘর মেলে তত নিশ্চিন্দি।

কি খেয়াল হতে বাইরের রকে বসা একজন আধবয়সী লোককে জিজ্ঞাসা করেছিল, এখানে বকুলবাড়ি নামে কোনো বাড়ির হদিস জানা আছে কিনা।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি হাত তুলে দূরের পাঁচিল-ঘেরা দোতলা বাড়িটা দেখিয়ে দিল, ওই বকুলবাড়ি...কার কাছে যাবেন, মোক্তারবাবুর কাছে? তিনি সকালের গাড়িতে কলকাতায় গেছেন।

এক কথায় বাড়ির খোঁজ মিলতে কমলেশের মনে হয়েছিল, মিষ্টিমাসি এখানকার ফেমাস কেউ। পরের কথায় ঘাবড়ে গেল, মিষ্টিমাসির বাড়িতে কোনো মোক্তারবাবুর অবস্থানের বিষয়ে মা কিছু বলে নি। মা বলেছিল, মিষ্টিমাসির নিজের বলতে কেউ-ই নেই। ভাইয়েরা ছিল এবং আছেও, কিন্তু মায়ের যতদূর ধারণা, তাদের সঙ্গে মিষ্টিমাসির বনিবনা হয় নি। ভাবল, মোক্তারবাবু দূর-সম্পর্কের কোনো আত্মীয় হবেন, একেবারে কেউ না থাকলে ভদ্রমহিলা ওই বাড়ি নিয়ে আছেন কি করে? এগিয়ে যেতে যেতে কমলেশের আশাও হল, উকিল মোক্তার-টোক্তারের সাহায্য পেলে সুবিধেমত ভালো দুই একখানা ঘর কোথাও জুটতেও পারে।

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো কমলেশ। মোটামুটি বড় বাড়ি বলা যেতে পারে। দোতলা, সেকেলে ধাঁচের গঠন। সামনে পিছনে জমি আছে খানিকটা করে। পিছনটায় এক কালে বাগান ছিল মনে হয়, এখন আগাছাই বেশি চোখে পড়ে। বাড়িটার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, দীর্ঘকাল কেউ যত্ন নেয় নি। চারিদিকের দেয়ালও চুন-বালি খসা, নোনা-ধরা, কোনো দিক বা ভাঙাচোরা।

সামনে জং-ধরা লোহার গেট। গেটের পাশের দেয়ালে সাদা পাথরের ফলকে নিষ্প্রভ কালো অক্ষরে বাড়ির নাম লেখা—বকুলবাড়ি।

ভিতরে গেটের পাশেই আধ-বুড়ো বকুলগাছ একটা।

এটা বকুলের সময় নয়। আর কিছুদিন বাদে সেই সময়। কিন্তু এ গাছে ফুল ধরে বলে মনে হল না। বাড়িটার মতই শুকনো টান-ধরা মূর্তি গাছটার।

এই গাছটার দরুনই বকুলবাড়ি নাম কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

গেট খোলাই ছিল। কমলেশ ভিতরে ঢুকল। তিনটি সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠল। ও-ধারের একটা ঘর থেকে সরু মোটা ভারী কয়েকটা পুরুষ-কণ্ঠ শোনা গেল। কিন্তু দু-তিনবার কড়া নাড়া সত্ত্বেও কেউ দরজা খুলে দিল না।

দরজার পাশে কলিং বেল চোখে পড়তে কমলেশ এবারে সেটা একটু জোরেই টিপে দিল। ভেতরের কর্কশ শব্দটা তার নিজের কানেও পৌঁছল।

কেউ দরজা খুলল।

একটি মেয়ে। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে বয়েস ; দীর্ঘাঙ্গী, পরিপুষ্ট স্বাস্থ্য। না কালো, না ফর্সা। গম্ভীর। অত জোরে কলিং বেল টেপার দরুন ঈষৎ বিরক্তও হয়তো। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওধারের পুরুষ-কণ্ঠগুলি আরো একটু স্পষ্ট হল।

মেয়েটির জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। কমলেশের সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল, সে মাসির বাড়িতে এসেছে, মাসির বাড়িতে কেউ কাঁচুমাচু মুখ করে আসে না। সপ্রতিভ প্রশ্ন করল, এটা সুরমা দেবীর বাড়ি ?

দেখার ভুল কিনা জানে না, জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির দৃষ্টি ঈষৎ সচকিত এবং সন্ধিৎসু মনে হল তাঁর।

হ্যাঁ, ভিতরে আসুন।

কমলেশ ভিতরে ঢুকল।—আছেন তিনি ?

দুই-এক মুহূর্তের বিলম্বিত জবাব।—আছেন, বসুন।

কমলেশ বসল। ঘরটা উকিলের দপ্তরের মতই মনে হল। একজন মোক্তারবাবু থাকেন শুনেছেও। মেয়েটি এবারে হয়তো সে কে বা কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। বাধা পড়ল। আর কমলেশ একরকম আঁতকেই উঠল।

রমণীর ললিত কণ্ঠস্বরকেও অনেক রমণীয় সাজ পরিয়ে থাকেন কবিরা। সামনে যে প্রায়-সুদর্শনা মেয়েটি দাঁড়িয়ে, তার কণ্ঠস্বরও বেশ পুষ্ট, মিষ্টি। কিন্তু ভিতর থেকে আচমকা যে রমণীর জ্বালাময়ী কাংসকণ্ঠের ধাক্কা খেল, কমলেশ কবি নয় বলেই রক্ষা। ভিতরে কোনো রমণী কোনো এক বীতশ্রদ্ধ পুরুষের প্রতি রসনার সম্মার্জনী ছুঁড়ছে। তার বক্তব্য, উঠতে বসতে মুখে ঝাঁটার ঘা না পড়লে অমন মেনিমুখো লোক সজুত হয় না—'নাই' দিয়ে দিয়ে সকলে একেবারে মাথায় তুলেছে—মাকে বলে আজই সে একটা হেস্তনেস্ত করবে। ওই ঘোষণার ফাঁকে ফাঁকে কম করে বার-দশেক কোনো অদৃশ্যবর্তীকে মুখে ঝ্যাঁটা বোলানোর ক্রুদ্ধ তপ্ত বাসনা এ ঘরের দু-জোড়া কানে এসে ঢুকল।

রাগে ঈষৎ বিকৃত মুখ করে মেয়েটি চকিতে ভিতরে ঢুকে গেল। পরক্ষণে চাপা অনুশাসন কানে এলো, আঃ সপ্তমী ! বাইরে ভদ্রলোক রয়েছে—

থাক্ তোমার ভদ্দরলোক, চাকরি করি বলে মান-ইজ্জৎ নেই ! মাকে বলে হাড়াগলে পাজী ছুঁচো মেনিমুখোকে—

তুই থামবি কিনা ? তারপর আরো চাপা অথচ আরো স্পষ্ট তর্জন, কাকিমাকে বলে আজ তোকেই তাড়াব বাড়ি থেকে, ভদ্রলোক কাকিমার কাছে এসেছেন—

সম্মার্জনী-ব্যবস্থাকারিণীর আর প্রতিবাদ শোনা গেল না। কমলেশের কেমন মনে হল, ভদ্রলোক কাকিমার কাছে এসেছে এটাই রসনা-শাসনের বড় কারণ।

মেয়েটি ফিরে এল। অপ্রস্তুত ভাবটা গাম্ভীর্যের বাড়তি প্রলেপে ঢাকার চেষ্টা। জিজ্ঞাসা করল, তাঁকে কি বলতে হবে ?

কমলেশ জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখের কথা আবারও মুখেই থেকে গেল।

'প্রেম ? সে যে কি বস্তু তোমাকে কেমন করে বোঝাব সুনৃতা ? লতার মত প্রেম দেহকেই আশ্রয় করে বটে, কিন্তু সে কি শুধু দেহেরই বাসনা ? প্রেম যে ঘর বাঁধতে চায় সে কি শুধু ইঁট-মাটিরই ঘর ? সে ঘর কি খোলা আকাশের নীচে উন্মুক্ত পৃথিবীর বুকেও

বাঁধা চলে না সুনৃতা?'

ওধারের ঘরের মিলিত পুরুষকণ্ঠের মধ্য থেকে শুধু একটি ভারী কণ্ঠের সংযত প্রেম-বিশ্লেষণের স্পষ্ট বয়ানগুলো এ ঘরেও পরিষ্কার ভেসে এল। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশংসাসূচক মিলিত উচ্ছ্বাস।

মেয়েটি আরো একটু ফর্সা হলে বিড়ম্বনাটুকু আরো স্পষ্ট ধরা পড়ত! তার নিরুপায় গাম্ভীর্যে শেষ পর্যন্ত একটু ফাটল ধরলই বুঝি। সামলে নিতে চেষ্টা করে আবার জিজ্ঞাসা করল, কি বলব তাঁকে?

...আমাকে ঠিক চিনবেন না তিনি, আমার মাসিমা হন সম্পর্কে। বলুন, রায়বেরিলি থেকে তাঁর নিরুদির ছেলে এসেছে।

পাশের ঘরের রিহার্সাল শোনা যাচ্ছে আবার। হয়ত সুনৃতা সম্ভব কোনো ছেলেরই জবাব। কিন্তু এবারে সেদিকে কান নেই মেয়েটির, দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর থেমে রইল একটু। এই দৃষ্টি এবারেও কেমন সন্ধানী মনে হল কমলেশের।

আপনার নিজের মাসি হন ইনি?

খুব প্রাসঙ্গিক বা প্রত্যাশিত প্রশ্ন মনে হল না। কমলেশ জবাব দিল, না, মায়ের মামাতো বোন—

বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।

ভিতরে চলে গেল।

'প্রেম আমার দেহ আশ্রয় করেছে কি হৃদয় আশ্রয় করেছে, সে কি তুমি আজও বোঝ নি? আমার প্রেমের ঘর যে এই বুকের মধ্যে, সে কি তোমার আজও জানতে বাকি?'

পুরুষকণ্ঠী সুনৃতার ক্ষুব্ধ চিত্ত ঠাণ্ডা হয় নি এখনো। পুরুষের সংশয়ে সে অভিমানাহত, উদ্বেলিত।

কমলেশ একবার ভাবল উঠে পালায়। কাজ নেই মাসির সঙ্গে দেখা করে। মেয়েটির সন্ধিৎসু দৃষ্টি, সপ্তমীর রসনা-সম্মার্জনী, আর পাশের ঘরের এই প্রেমের বন্যা—সব একসঙ্গে মাথায় ঢুকে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে কেমন। তাছাড়া এ-বাড়ির মানুষই শুধু অপরিচিত নয়, এখানকার বাতাসও কেমন অপরিচিত লাগছে।

বসতে বলে খবর দিতে গেছে, সত্যিই উঠে পালানো যায় না। কিন্তু কমলেশের মনে হল, সে অনেকক্ষণ বসে আছে। পাশের ঘরে কিছু একটা বিতর্ক উপস্থিত হয়তো, প্রত্যেকে গলা চড়িয়ে যে-যার মতের প্রাধান্য বজায় রাখতে চাইছে।

আসুন বাবু, মা ডাকছেন।

কমলেশ সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। এটিই বোধ হয় সেই খর-জিহ্বা সপ্তমী। বেঁটে-খাটো ছিপছিপে গড়ন। ম্যাটমেটে মুখ দেখে বয়স ঠাওর করা শক্ত। এই ঠাণ্ডা মূর্তির মধ্যে অতখানি তেজ থাকা সম্ভব, দেখলে বিশ্বাস হবে না।

ভিতরে ঢাকা বারান্দা। বারান্দা সংলগ্ন সিঁড়ি। সপ্তমী দোতলা দেখিয়ে দিল, ওপরে যান—

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল। সপ্তমী অনুবর্তিনী হল। বাড়িটার বাইরে যেমন, ভেতর

তেমন নয়। অনেকগুলো ঘর আছে মনে হয়। সিঁড়ি, বারান্দাও বেশ তকতকে পরিষ্কার।

দোতলায় সিঁড়ি-মুখো বড় ঘরের দরজায় একটা পুরু পরদা ঝুলছে। শেষ সিঁড়িতে পা দিতেই পরদার ওপার থেকে এই তৃতীয় নারীকণ্ঠ কানে এল। ঘরের ভেতরেরই কারো উদ্দেশে নির্দেশ, তুই যাচ্ছিস কেন, এখানে বসে থাক্—

সম্ভবত ইনিই মিষ্টিমাসি। কিন্তু কণ্ঠস্বর মিষ্টিও লাগল না, মোলায়েমও না।

সপ্তমী এবার এগিয়ে গিয়ে পরদা ফাঁক করল। গলার স্বরে চিনি ঢেলে জানিয়ে দিল, মা, উনি এসেছেন—

আসতে বল্।

পরদা সরিয়ে সপ্তমী প্রবেশপথ সুগম করল। কমলেশের মনে হচ্ছিল সে যেন পরীক্ষার্থী ছাত্র। সে ভাব কাটিয়ে সপ্রতিভ মুখে দরজার কাছে জুতো খুলে ভিতরে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। ধাক্কা নয়, তার মাথায় যেন সরাসরি একটা ডাণ্ডাই বসিয়ে দিয়েছে কেউ। প্রশস্ত ঘরের ওধারের জানলা-ঘেঁষা পুরু গদীর খাটে যিনি পা ঝুলিয়ে বসে আছেন, তাঁকে দেখা মাত্র এই অবস্থা। সমস্ত ঘরটাই যেন সবেগে দুলে উঠল বারকতক, পায়ের নীচের মেঝেটা মাথার দিকে উঠতে লাগল। কমলেশ সামলে নিল। বিভ্রান্ত, বিমূঢ়—আর না এগিয়ে অদূরে দাঁড়িয়েই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সে।

এই বিসদৃশ অবস্থা মহিলার লক্ষ্য না করার কথা নয়। তাঁর পিছনের দিকের খানিক আড়ালে বসা সেই মেয়েটিও নিরীক্ষণ করেছে। হতচকিত বিমূঢ় আচরণের জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক, সামনের বর্ষীয়সী মহিলার গম্ভীর মুখে রুক্ষ ছায়া নামল একটা। মুখখানা এমনিতেই রুক্ষ, তার ওপর যেন কঠিন রেখা পড়ল গোটাকতক।

খাটের অদূরে একটা কাঠের চেয়ার এনে পেতে দেওয়া হয়েছিল। ইঙ্গিতে সেটা দেখিয়ে ডাকলেন, এসো, বোসো—

কমলেশ কি করবে ? ঘুরে দাঁড়িয়ে চোঁ-চোঁ দৌড় লাগাবে নীচের দিকে ? তারপর উর্ধ্বশ্বাসে পালাবে বাড়ি ছেড়ে? এ কার অন্তঃপুরে এসে ঢুকল সে ?

কিন্তু পালাতে গেলে এরা চেঁচামেচি করে উঠবেই, আর তাতে বিপদ বাড়বে।...নীচে এক দঙ্গল ছেলে থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছে।

ঢোঁক গিলে বলতে চেষ্টা করল, আপনি—

বোসো।

এবারে প্রায় আদেশের মতই শোনাল। মহিলার আধা-আড়ালে দ্বিতীয়ার মুখখানা যেন এবারে একটু সদয় মনে হল কমলেশের। সে যেন তার কিছু একটা বিড়ম্বনা উপলব্ধি করেই নিঃশব্দে ভরসা দিচ্ছে। কমলেশ এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল। ভাবল, বসে সুশোভন ভাবেই ভুলটা শুধরে নিয়ে উঠে পালাবে। কিন্তু এত ভুলই বা হয় কি করে ? সে বকুলবাড়ি দেখে ভিতরে ঢুকেছে। কার ছেলে জানিয়েছে, কাকে চায় তাও জানিয়েছে, মেয়েটিও বলেছিল যাঁকে চায় তিনি বাড়িতেই আছেন, তাহলে...

তুমি নিরুদির ছেলে ?

কমলেশ আবার থতমত খেল। দুর্বোধ্য দৃষ্টিটা আর-একবার মহিলার কপালে সিঁথিতে আর পরনের শাড়িটার ওপর থমকাল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বরাবর যিনি ইউ. পি-তে...

ভাই-বোনদের মধ্যে তুমিই বড়?

প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝেই জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহিলা দু'চার মুহূর্ত ভাবলেন কি। তোমার নাম তাহলে কমল?

এর পরেও ভুলের সম্ভাবনার কথা ভাববে কি করে কমলেশ? মাথা নাড়ল। নামটা তারই। কিন্তু চোখ দুটো তার লালের ধাক্কা খাচ্ছে আবার। কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, সিঁথিতে আগুনের শিখার মত সিঁদুর, পরনে টকটকে লালপেড়ে শাড়ি। কিন্তু মা তাকে কি বলেছিল তাহলে? কার দুঃখের ফিরিস্তি মা কার ঘাড়ে চাপিয়ে বসে আছে?

মহিলা অন্যমনস্কের মত বললেন, একবার তোমাকে দেখেছিলাম, তখন বছর দুই-তিন বয়েস তোমার।

দ্বিধা-সংকোচ সব রসাতলে। কমলেশ উৎফুল্ল মুখে বলে উঠল, আপনি মিষ্টিমাসিমা?

ওই নামের ডাক বহুকাল বাদে শুনলেন বোধ হয়। মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। রুক্ষ গাম্ভীর্যও নরম হল একটু। ওদিকে মেয়েটিরও ঈষৎ বিস্মিত চাউনি। এই নাম সে-ও এই প্রথম শুনল বোধ হয়।

মিষ্টিমাসি মাথা নাড়লেন। তিনিই।

কি আশ্চর্য! তাড়াতাড়ি উঠে কমলেশ তাঁর পায়ের ধুলো নিল এবার। প্রণাম করার কথা এতক্ষণ মনেও পড়ে নি। আর যে ধাঁধায় পড়েছিল, না বুঝে প্রণাম করবেই বা কাকে।

প্রণাম সেরে ফিরে চেয়ারে বসতে মাসির শীর্ণ মুখে আগের রুক্ষ ছাপটাই চোখে পড়ল আবার। তার মুখের দিকে চেয়ে মাসি যেন জানতে চাইছেন, আশ্চর্য কিসের। বোনপোকে দেখে তিনি খুশি হয়েছেন সেটা অন্তত একবারও মনে হল না কমলেশের। তার কেমন মনে হল, ঘরে ঢোকামাত্র অমন হকচকিয়ে যাওয়ার কারণও বুঝি মহিলার গোপন নেই।...মায়ের বর্ণনা মিলছে না। মা বলেছিলেন, চেহারা আর স্বভাব দুই-ই মিষ্টি ছিল বলে সকলে মিষ্টি বলে ডাকত। কিন্তু এঁকে যদি মিষ্টি বলতে হয়, তাহলে নিমও মিষ্টি। রুক্ষ শীর্ণ মুখ, শীর্ণ বাহু, কাগজের মত সাদা রঙের ওপর দিয়ে নীলাভ শিরা-উপশিরা উঁচিয়ে আছে। কেবল চাউনি উজ্জ্বল—মুখের দিকে তাকিয়ে যেন ভিতর দেখে নেন।

কমলেশ পারলে উঠে পড়ত। কিন্তু দুটো কথা না বলে ওঠেই বা কেমন করে? মায়ের মারাত্মক ভুলটা শুধরে নেবার জন্যেই সহজ আন্তরিকতায় জিজ্ঞাসা করল, মেসোমশায় কোথায়, কলকাতায়?

মোক্তারবাবু কলকাতায় গেছেন শুনেছিল রাস্তার লোকের মুখে, সেই অনুমানে এই প্রশ্ন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা নিঃশব্দ বিপর্যয় ঘটে গেল বুঝি ঘরের মধ্যে। সুরমা দেবী, অর্থাৎ মাসিমার চোখে-মুখে কয়েক মুহূর্তের নির্বাক বিস্ময়। তার পরেই নিরুত্তর দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওর মুখে বিঁধে রইল। ওধারে মেয়েটিও এক দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে সোজা

হয়ে বসেছে। কমলেশের মনে হল, তার চোখে চকিত ইশারা, চকিত নিষেধ দেখল।

পরিচিত মহলে তার তৎপর, বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি ছিল। কিন্তু এই নির্বোধ মূর্তি দেখলে সেই খ্যাতি ঘুচত। আবার কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেল বুঝেছে। কিন্তু কি গণ্ডগোল না জানলে সামাল দেবেই বা কেমন করে? কপালে সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর দেখছে, পরনে রাঙাপেড়ে শাড়ি—তাহলে এমন কি বেফাঁস কথা জিজ্ঞাসা করে বসেছে সে!

মিষ্টিমাসির দৃষ্টিটা শুধু তীক্ষ্ণ নয়, সন্দিগ্ধও।—তুমি কোথা থেকে আসছ?

কলকাতা থেকে।

তোমার মায়ের সঙ্গে কতদিন দেখা হয় না?

চোখ-কান বুজে কমলেশ মিথ্যার আশ্রয় নিল। কেন নিজেও জানে না।—অনেক দিন। এ জায়গায় আসার পর থেকেই মায়ের প্রত্যেক চিঠিতে তাগিদ, মিষ্টিমাসির সঙ্গে দেখা হল কিনা—

এ জায়গায় কেন এসেছ?

জেরার মত শোনাল। বলল, কলেজে কাজ নিয়ে এসেছি।

কলেজে কি কাজ?

মাস্টারি।

মিষ্টিমাসির চোখের ধার এবারে একটু নরম হল বোধ করি। অবিশ্বাসের ছায়াটাও খানিক ফিকে হল যেন।—এখানকার কলেজের প্রফেসর তুমি?

অতটা নয়, লেকচারার।

এই জবাব শুনেও মিষ্টিমাসি ঈষৎ তুষ্ট হলেন মনে হল। আর কথা শুনে বেশ বুদ্ধিমতীও ভাবল কমলেশ। বললেন, লেকচারাররা নিজেদের প্রফেসর বলে, আর মোক্তাররা নিজেদের উকিল বলে চালায়।

শেষের কথা ক'টা খট্ করে কানে লাগল। এ-বাড়ির সঙ্গে একজন মোক্তারের যোগ আছে শুনেছে বলেই হয়তো।

এই প্রসঙ্গেই মিষ্টিমাসি পার্শ্ববর্তিনীর সম্বন্ধে সচেতন হলেন সম্ভবত। একবার তাকে দেখে নিয়ে বললেন, এই মেয়েটারও পড়াশুনা করার ইচ্ছে খুব, এম. এ. পরীক্ষা দেবে মনে মনে ঠিক করেই রেখেছে। কিন্তু এতকালের মধ্যে তার আগে বি. এ. পরীক্ষাটাই দেওয়া হয়ে উঠল না।

মেয়েটির বিড়ম্বিত মুখের দিকে চেয়ে কমলেশের মনে হল ভয়ানক একটা সঙ্কোচের জায়গাতেই ঘা পড়েছে। তার গাম্ভীর্য আর মর্যাদা এক হ্যাঁচটা টানে যেন ধূলিসাৎ করে দিলেন মিষ্টিমাসি। কিন্তু যিনি বললেন, তাঁর মুখভাবে পরিবর্তন নেই খুব। ঠাণ্ডা, নির্বিকার।

বললেন, ওর নাম দেবী, আমার ভাসুরঝি—

পরিচয় পেয়ে দু'হাত যুক্ত করল কমলেশ। কিন্তু যার উদ্দেশে করা, সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। খুব সম্ভব বিরূপ অভিব্যক্তি গোপন করার প্রয়াস।...দেবী। নামটা মন্দ লাগল না কানে। রূপের দরুন না হোক, ওই স্বাস্থ্যের দরুনও ওই নাম মানায়। কমলেশের অনুমান যদি ঠিক হয়ে থাকে, অর্থাৎ মেয়েটির বয়েস যদি পঁচিশ-ছাব্বিশই

হয়, তাহলে বি. এ-র সিঁড়ি টপকে এম. এ-র দরজা পার হওয়ার আশা সুদূর-পরাহতই বটে। তবু এই প্রসঙ্গের সূতোটা ছেড়ে দিল না কমলেশ। বলল, পড়লেই তো হয়...

মাসি এবারে ভাসুরঝির দিক টেনেই নির্লিপ্ত মন্তব্য করল, হয়ে ওঠে না, স্কুলে চাকরি করে, তার ওপর আমার দেখাশুনা করা আছে—

কমলেশের সব থেকে বেশি দুর্বোধ্য লেগেছে মাসিটিকেই। শুধু দুর্বোধ্য নয়, তাঁর সিঁদুর আর লালপেড়ে শাড়ির ধাক্কা এখনো ভালো করে সামলে উঠতে পারে নি। মা কি বলেছিল, আর সে কি দেখছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও এই মাসিটিকে শুধু বুদ্ধিমতী নয়, সুরসিকাও মনে হয়েছে তার। এ পর্যন্ত একবারও তাঁর মুখে হাসি দেখে নি। তবু। কথার ধরন তির্যক, স্বরও মিষ্টি নয়, তবু কেমন যেন কৌতুকপ্রচ্ছন্ন। যে কৌতুকে শ্লেষের ভাগ বেশি।

ভাসুরঝির, অর্থাৎ দেবীর পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব হল না। সে খাট ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। মাসি ঘাড় ফেরাতে অস্ফুট কৈফিয়ৎ দিল যেন, আমি যাই কাকিমা—

উনি মুখে কিছু বললেন না, এক পলক দেখলেন শুধু। তারপর এদিকে মুখ ফেরালেন। কিন্তু মেয়েটি এদিকের দরজার ওধারে পা দিতে না দিতে কিছু মনে পড়ল বোধ হয়, ডাকলেন, এই শোন্—

দেবীর প্রত্যাবর্তন। চৌকাঠের সামনে দাঁড়াল।

সপ্তমীকে জিজ্ঞাসা কর তো স্বর্ণসিন্দূর আর কখন দেবে। আর ওকে জল ঠিক করতে বল্, আমি চান করব—

দেবীর আধ-ফর্সা মুখে আবার বিড়ম্বনার ছায়া পড়তে দেখল কমলেশ। আড়চোখে একবার তার দিকে তাকিয়ে দ্বিধা কাটিয়ে বলল, সকালে গা গরম হয়েছিল, এখন চান করবে কি—

রাগ করা বা বিরক্ত হওয়ার মত নয়। কিন্তু এটুকুতেই মাসির চাপা বিরক্তি লক্ষ্য করল কমলেশ। অসহিষ্ণু জবাবও শুনল।—গরম হয়েছিল, জল ঢাললেই ঠাণ্ডা হবে, তুই বল্‌গে যা।

এর আর নড়চড় নেই যেন। দেবীর প্রস্থান। তার গাম্ভীর্য সত্ত্বেও এটুকু স্পষ্ট যে, খুড়িটিকে সে ভয় করে। মেয়েটি অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমলেশেরও যেন অস্বস্তি বাড়ল। সহজ আলাপের মধ্যে ফেরার চেষ্টায় বলল, গা গরম মানে জ্বর-টর নাকি?

হ্যাঁ। তুমি ডাক্তার?

অর্থাৎ, অনধিকার চর্চা বিরক্তিকর। জ্ঞান-বয়সে প্রথম দেখা মিষ্টিমাসির আপ্যায়নে এবারে অন্ততঃ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার কথা কমলেশের। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ এর পরেও খানিক টেনে রাখল তাকে। মায়ের কথায় নিরুৎসাহ চিত্তে সে এই মাসিটিকে দেখতে এসেছিল। কিন্তু দেখার পর থেকে একটা কৌতূহল দানা বেঁধে উঠছে। কমলেশ বাকপটু, কথার পিঠে কথা বলতে সময় লাগে না। মাসির প্রচ্ছন্ন বিরক্তির জবাবে বাৎসল্যভাজন আত্মীয়ের মতই হাসিমুখে বলল, আমি বাড়ি থাকলে আর মায়ের কিছু হলে তার ওপর আমিই প্রথম ডাক্তারী ফলাই, মা বাইরের ডাক্তারের কথা হেলাফেলা

করলেও আমার বিধান তার কাছে একেবারে বিধান রায়ের বিধান।

মিষ্টিমাসি চেয়ে আছে তার দিকে। নিষ্প্রভ পাণ্ডুর মুখ, মুখেরও ফর্সা চামড়ার নীচে নীলাভ শিরা দেখা যায়। চোখ দুটো শুধু উজ্জ্বল। সেই চোখে শুধু কৌতুকের ছায়া।

মুখ একবার খুললে অনর্গল চলে। বিন্যাসপটু কমলেশ তার চিকিৎসা-প্রসঙ্গ আরো একটু বিস্তার করল। তেমনি হালকা খুশির আমেজে বলে গেল, মায়ের একবার কম্প দিয়ে জ্বর হয়েছিল, আমি ম্যালেরিয়া ধরে নিয়ে দিলাম কুইনিন ঠুকে। দুদিন না যেতে ডাক্তার এসে বলল, ম্যালেরিয়া নয়, অন্য ব্যাপার। সে দেখে-শুনে ওষুধ দিয়ে গেল আর কুইনিন দেবার জন্য আড়ালে আমাকে বকে গেল। কিন্তু মা এখন কি করে? কার ওষুধ খাবে? ভেবেচিন্তে বলল, কমলের ওষুধ খেয়েও তো এক রকম ভালই ছিলাম, এক কাজ করি, দুটোই খাই।

কমলেশ নিজেই হেসে উঠল। কিন্তু সুরমা দেবী হাসলেন না। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। শোনার পরেও চেয়েই রইলেন। পলকের মধ্যে কিছু যেন দেখে উঠল কমলেশ। সচকিত হয়ে উঠল। নিষ্প্রভ মুখে এই দুটো চোখই অস্বাভাবিক জীবন্ত শুধু। চকচকে দু চোখ তার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। সেই চোখের গভীরে নিমেষে কি যে দেখে উঠল কমলেশ, নিজেও ভালো জানে না। এক অব্যক্ত তৃষ্ণা আর অব্যক্ত যাতনার সমুদ্র বুঝি মুহূর্তের জন্যে উদ্বেলিত হয়ে চকিতে মিলিয়ে গেল। মা আর ছেলের এই মিষ্টি গল্পটা মিষ্টিমাসি যেন শুধু কানে শুনল না, সমস্ত সত্তা দিয়ে পান করল।

কিন্তু মিষ্টিমাসির সামলে নিতে সময় লাগল না। টান-টান দু-চোখে মনে হল হাসির ছোঁয়া লাগল একটু।—তাহলে চান করব না বলছ?

কমলেশ মাথা নাড়ল। না। মনে মনে এবারে ওঠার কথা ভাবছে সে। চারদিক খোলামেলা বেশ প্রশস্ত ঘর। কিন্তু গুমোটের মত লাগছে।

তুমি কি পড়াও?

হঠাৎ এ প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝা গেল না। হয়তো স্বাভাবিক আলাপেরই সূত্রপাত। জবাব দিল, গাছ-গাছড়া, শেকড়-বাকড়—

বটানি?

কমলেশের মনে হল, মহিলাটিকে অজ্ঞ ঠাউরে ভুল করেছিল। সে যে বিষয়ে পাস, তার বিষয়বস্তু কি মা-ও সঠিক জানে কিনা সন্দেহ। কিন্তু অবাক লাগল মাসির প্রচ্ছন্ন ঔৎসুক্য দেখে। বিষয়বস্তুটা যেন বেশ মনঃপূত হয়েছে।

দুই-এক কথার পর আবার নির্লিপ্ত মুখে ঘর-বাড়ির খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন তিনি। মায়ের কথা, বাবার কথা, ভাই-বোনদের কথা। ভাইয়েরা কে কি করছে, কোন্ বোনের কোথায় বিয়ে হল, সে এখনো বিয়ে করে নি কেন ইত্যাদি।—খুব যে আগ্রহ নিয়ে কথা কইছেন তা নয়। মাঝদরিয়া থেকে উদাসীন চোখে দূরের স্মৃতিতটের দিকে তাকানোর মত লাগছিল।

শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে আছ কোথায়?

কমলেশ বলল কোথায় আছে, এবং কি রকম অসুবিধের মধ্যে আছে। দুখানা ঘরের খোঁজে আছে তাও জানাল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মাসির নির্লিপ্ত মুখখানা যেন আরো নিরাসক্ত

দেখাল। মন্তব্য করলেন, ঘর আর এখানে সুবিধেমত পাচ্ছ কোথায়, দেখো চেষ্টা করে—

কর্তব্য সমাধা হয়েছে। মায়ের কাছে এবারে ফলাও করে মিষ্টিমাসির কথা লেখা যাবে। তার চিঠি পেয়ে মা আর তাকে মাসির সঙ্গে দেখার তাগিদ দেবে না বোধ হয়। ওঠার আগে আবার জলযোগের ছকে-বাঁধা আপ্যায়নের মধ্যে পড়তে না হয় কমলেশের সেই আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সেটা অমূলক।

এবারে উঠি আমি—

মিষ্টিমাসি যেন এরই অপেক্ষায় ছিলেন। তক্ষুনি ডাকলেন, দেবী—

বারান্দার দরজা দিয়ে দেবী দেখা দিল। মাসি বললেন, কমল যাবে এখন—

তাকে নীচের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার নির্দেশ বোধ হয়। কথাটা শেষ না করে তিনি উঠে সামনের দিকে বারান্দার দিকে এগোলেন। মাঝে মধ্যে ছেড়ে বোনপোকে আর একবার আসার কথাও মুখে বললেন না।

এই দুজনের সঙ্গে কমলেশ সামনের বারান্দার দরজা দিয়েই ঘর থেকে বেরুল। বারান্দাটা সুন্দর। রেলিংয়ের কাছে দাঁড়ালে রাস্তার ওধারে গঙ্গা দেখা যায়। দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখার বাসনা কমলেশের আর নেই।

কিন্তু তার দেবী-অনুসরণেও বাধা পড়ল হঠাৎ। মিষ্টিমাসি রেলিংয়ের কাছাকাছি এসে বাইরে বা নীচে কি দেখে তড়িতাহতের মত দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপরেই অস্ফুট আর্তনাদ।—কি সর্বনাশ !

সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রভ মুখে যেন রক্ত উঠে এল এক ঝলক। অব্যক্ত ক্রোধে প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত সামনের দরজা দিয়ে আড়াল হয়ে গেলেন তিনি।

কমলেশ হতভম্ব। নীচের দিকে তাকিয়ে সর্বনাশের মত কিছু চোখে পড়ল না তার। কিন্তু তার পার্শ্ববর্তিনী ব্যাপারটা বুঝেছে মনে হল। তার মুখখানা ঈষৎ উতলা এবং বিব্রত দেখাল।

কি হল ? কমলেশ জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

কিছু না, আসুন।

আর একটা ঘরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে নীচের সিঁড়ি। দেবী আগে আগে নামল, পিছনে কমলেশ। নীচে বাইরের ঘর থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে এবং হাঁ করে চেয়ে রইল। মিষ্টিমাসির রণরঙ্গিণী মূর্তি। ছোট একটা ছ্যাতলা-পড়া বাঁশ হাতে গেটের পাশে বকুলগাছটার দিকে ছুটছেন তিনি।

বকুলগাছটার নীচে সিমেন্টের বাঁধানো বেঞ্চ একটা। গাছের ছায়ায় দিবানিদ্রাসুখের বাসনায় অস্থিচর্মসার একটি সারমেয় শয়ান। ষষ্ঠ চেতনায় কিছু একটা বিপদের আভাস পেয়েই যেন ওটা ঘাড় বাঁকিয়ে এদিকে তাকাল একবার। তার পরেই বিশ্রামের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে এক লাফে বেঞ্চি থেকে নেমে লেজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল ওটা।

মাসি রাগে বিবর্ণ, সাদা। কাঁপছেন। হাতের বাঁশটা ফেলে দিয়ে খোলা গেটটার দিকে তাকালেন একবার, তারপর এদিকে ফিরলেন। নিজের অগোচরে কমলেশও পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিল। ওদিকে দেবীও বোধ হয় খুড়ি-সন্নিধানে আসা প্রয়োজন বোধ করেছে।

মিষ্টিমাসির দু চোখে যেন দুটো কয়লার টুকরো জ্বলছে। অদূরের রিহার্সাল-ঘরের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণগলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি জানতে চাই গেট খোলা ফেলে ভিতরে ঢুকেছে কে? কে গেট খুলেছে? যত সব হা-ভাতে এসে জুটেছে এখানে—দূর করে দেব, সব দূর করে দেব বাড়ি থেকে, সব দূর দূর করে তাড়াব।

কমলেশ কাঠ। এ-রকম দৃশ্য সে জীবনে দেখে নি। কিন্তু কাঠ সে জন্যে নয়। তার যতদূর মনে পড়ে সে-ই গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকেছিল এবং ঢোকার পর আর সেটা বন্ধ করে নি।

ওদিকে চাকরটা সভয়ে কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। নীচের বারান্দার থামের আড়ালে সপ্তমী গলা বাড়িয়েছে। মিষ্টিমাসির রাগের ঝাপটা এবারে এই দুজনের ওপর এসে পড়ল।—দূর হয়ে যা সব, এক্ষুনি বেরো বাড়ি থেকে হতচ্ছাড়া-হতচ্ছাড়ীর দল, গেট কে খুলে এসেছে আমি জানতে চাই।

দুই-একজন পথচারী গতি শ্লথ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। কমলেশ সচকিত হঠাৎ, গম্ভীর অনুযোগ-ভরা চোখে দেবী তার দিকেই চেয়ে আছে। আসামী কে একমাত্র সে-ই বুঝেছে। যেভাবে তাকাল, খুড়িকে আঙুল দিয়ে আসামী দেখিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয় বোধ হয়।

তা করল না অবশ্য। চোখাচোখি হতে বিরূপ মুখখানা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

মিষ্টিমাসি ততক্ষণে আর এক কাণ্ড করেছেন। রাগে গজগজ করতে করতে ফর্সা শাড়ির আঁচল দিয়ে আধময়লা সিমেন্ট-বাঁধানো বেঞ্চটা ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করতে লেগে গেছেন।

মস্তিষ্কের তপ্ত ব্যাপার কিছু কমলেশ বুঝেছে। এই পরিস্থিতি থেকে এখন মানে মানে প্রস্থান সমীচীন। কিন্তু আজকের নাটকের আরও একটা বিচিত্র অঙ্ক বাকি তখনো জানত না। আর অদৃষ্টকারের প্ররোচনায় এবারেও সে-ই উপলক্ষ।

মাসির দিকে দৃষ্টি রেখে বেরুতে গিয়ে হঠাৎ গাছটার দিকেই চোখ পড়ে গেল তার। শুকনো বাকল ফেটে ফেটে গেছে, পাতাগুলো বিবর্ণ। দাঁড়িয়ে পড়ে নিরীক্ষণ করল একটু, এই গাছ বা বকুলতলার সঙ্গে মাসির কঠোর শুচিতার কিছু একটা যোগ আছে ধরে নিয়ে তাঁকে জব্দ করার জন্যেই যেন বলে বসল, গাছটার গুঁড়িতে পোকা ধরে গেছে, এটা বেশিদিন আর টিকবে না—

কানে যেতেই মাসি বিষম একটা ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। কয়েক নিমেষের মধ্যে সমস্ত উত্তাপ যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল একেবারে। নিঃসাড়, বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ। এক মর্মান্তিক মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা কানে এসেছে যেন।

কমলেশ নিজেও হতভম্ব।

মিষ্টিমাসি চকিতে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার মন্তব্য অনুসরণ করে অব্যক্ত ত্রাসে গাছের গুঁড়িটা নিরীক্ষণ করলেন। কিন্তু অনভ্যস্ত চোখে গাছটার ব্যাধি কোথায় আবিষ্কার করতে পারলেন না। না পেরে ভয়বিহ্বল দিশেহারা দুই চোখ কমলেশের মুখের ওপর তুললেন আবার। কমলেশের মনে হল কোনো রমণীর চোখে এত ব্যাকুলতা আর দেখে নি।

সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করল, আরো এক রমণীর দুই চোখ নীরবে ভর্ৎসনা করছে তাকে। তাই-ই। বুষ্ট দেবী তাকে যেন গেট পার হয়ে অব্যাহতি দিতে বলছে। মাসি আবার দুই চোখ টান করে গাছের গুঁড়ি নিরীক্ষণ করছেন।

দেবী এগিয়ে এসে তাঁর একখানা হাত ধরল, ভয়ে ভয়ে বলল, ও কিছু নয় কাকিমা, চলো—। চাকরকে নির্দেশ দিল, গেটটা বন্ধ করে দিস—

গেটের বাইরে এসে কমলেশ দ্রুত পা চালিয়ে দিল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। শরীরটা ভালোমত নাড়াচাড়া না খেলে যেন সুস্থ হবে না। অনেকগুলো ব্যাপার একসঙ্গে মাথার মধ্যে গিসগিস করছে, কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা ভাববে?

একের পর এক স্নায়ুর ওপর আজ অনেকগুলো ধকল গেছে কমলেশের।

মিষ্টিমাসির কি মাথা খারাপ? এইজন্যেই কি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে মেয়েটির সন্ধানী দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর থমকেছিল একবার? তাই যদি হয়, মেয়েটি বলল না কেন, জিজ্ঞাসা করল না কেন কি দরকার তার? উল্টে এই খুড়িটিকে বিলক্ষণ ভয় আর সমীহ করে চলে বলেই তো মনে হল।

মিষ্টিমাসিকে দেখেই কমলেশের অতখানি বিমূঢ় হবার মত কারণ অবশ্যই আছে। সে-রহস্য এখনো একটুও স্পষ্ট হয় নি। রহস্য, কপাল আর সিঁথির ওই জ্বলজ্বলে সিঁদুর আর পরনের লালপেড়ে শাড়ি। তার সেই বিস্ময় উপলব্ধি করেই যেন মহিলার মুখখানা অমন কঠিন হয়েছিল। কিন্তু কমলেশ এ-রকম একজনের সামনে এসে দাঁড়াবে তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিল!

মায়ের মুখে শুনেছিল চৌদ্দ বছর বয়সে মিষ্টিমাসির বিয়ে হয়েছিল। ভাল ঘরে-বরেই বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু একুশ না পেরুতে সব শেষ। মাসি বিধবা। একটা ছেলেপুলেও হয় নি। সেই সব দুঃখের কথা মা ফেনিয়ে ফেনিয়ে কম বলে নি।

এ কাহিনী শোনার পর কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর আর পরনে লালপেড়ে শাড়ি দেখলে ধাক্কা খাবে না তো কি? ভুল বাড়িতে বা ভুল কারো কাছে আসে নি, সেটা বোঝার পর চকিতে দুটো সম্ভাবনার কথা কমলেশের মাথায় এসেছে। এক, মা ভুল করে কার দুঃখের বোঝা কার ঘাড়ে চাপিয়েছে ঠিক নেই। দুই, বয়েসকালে মিষ্টিমাসির রূপের খ্যাতি ছিল—বিধবা হবার পর আবার যদি কাউকে বিয়ে করে থাকেন! আজকালকার ছেলে হলেও মন থেকে সায় মেলে নি। মিষ্টিমাসি আর যাই হোক, আজকালকার মেয়ে নয়। অথচ এই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা মন থেকে একেবারে বাতিল করে দেওয়াও সহজ নয়। সিঁদুর আর লালপেড়ে শাড়ি দেখেই যে ও অমন হকচকিয়ে গিয়েছিল, তা মাসি বুঝলেন কি করে? বুঝেছেন যে, তাতে কমলেশের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

যাই হোক, মেসো একজন আছেন ধরে নিয়েই তাঁর খোঁজ করেছিল। কিন্তু তাতেও অবাক কাণ্ড। মাসির ওই মুখ আর দেবীর ওই সচকিত হাব-ভাব। সেই একটা মুহূর্তের জন্যে মেয়েটিকে ইঙ্গিতজ্ঞা মনে হয়েছিল তার।

তারপর যতক্ষণ ছিল, নিজেকে মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে, কিন্তু মাসির বিকৃতি কোনো লক্ষণ দেখে নি। শেষে এই তাজ্জব ব্যাপার। তখন অবশ্য একটুও

সুস্থ মনে হয় নি তাঁকে। সামান্য কথাটার এমন অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া হবে জানলে সে নিশ্চয় মুখব্যাদান করত না। তার ত্রুটিতে কুকুর ঢুকেছে, আর তারই গাছে পোকা ধরার মন্তব্যে রাগ ভুলে মাসির সেই অব্যক্ত ত্রাস।...মেয়েটি ভয়ানক চটেছে তার ওপর। কিন্তু কমলেশও ঘাবড়েই গিয়েছিল। সে এখনো ভেবে পাচ্ছে না কি হতে পারে।

ঘরে ফিরেই মাকে একটা লম্বা চিঠি লিখবে ভেবেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখল না। নতুন যোগাযোগের সূতো ধরে মা হয়তো চিঠিপত্রে আবার পুরনো সম্পর্কটা ঝালিয়ে নিতে যাবে। সেটা বাঞ্ছনীয় মনে হল না। মা যাকে জানত আর যাকে সে দেখে এল—তারা একই মানুষ হলেও এক নয়। অথচ ঠিক কাকে যে দেখে এল তাই দুর্বোধ্য।

কমলেশ তার রিক্ততা দেখেছে, আবার অনমনীয় প্রভাবও লক্ষ্য করেছে।

॥ ২ ॥

দিন চারেক পরের কথা।

পর পর তিন দিন কলেজ ছুটি। সকালে খবরের কাগজ খুলে কমলেশ মনে মনে ভাবছিল একবার কলকাতায় ঘুরে আসবে, না সকালবিকেল ঘরের খোঁজে বেরুবে। কলেজ থাকলে একরকম কেটে যায়, কিন্তু না থাকলে দিনগুলো বোঝার মত লাগে। ঘর একটা নিতান্তই দরকার, আবার খোঁজাখুঁজির ধকলও তার ধাতে পোষায় না।

দরজার কাছে কার ছায়া পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গলাও শোনা গেল।—বাবু, ভিতরে আসব কি ?

কমলেশ ফিরে তাকাতে লোকটা আনত বিনয়ে দুহাত জুড়ে প্রণাম জ্ঞাপন করল। মুখ তুলতে চেনা-চেনা লাগল, কিন্তু কমলেশ চট্ করে ঠাওর করে উঠতে পারল না কে ! কালো, চওড়া কপাল, ছোট ছোট চোখ, নাকের নীচে সজারুর কাঁটার মত খানিকটা থুবড়ানো গোঁফ।

লোকটা ভিতরে এসে দাঁড়াল। সবিনয়ে নিবেদন করল, আজ্ঞে আমি গণেশ, বকুলবাড়ির চাকর, মা-ঠাকরোণ পাঠিয়ে দিলেন।

অপ্রত্যাশিত বলেই দূত চিনতে দেরি হয়েছিল কমলেশের।—ও হ্যাঁ, কি খবর ?

খপর তো বাবু বলতে পারব নি, সকালে উঠেই মা-ঠাকরোণ তাড়া দিলেন, কলেজের দাদাবাবুকে গিয়ে বলে আয় অবিশ্যি যেন একবার আসে—সম্ভব হলে একেবারে ধরেই নিয়ে আসবি।

কমলেশ ফাঁপরে পড়ল।—আমাকে !

আজ্ঞে বাবু।

কিছু না ভেবেই কমলেশ দ্রুত মাথা খাটালো।—এখন তো যাওয়া সম্ভব নয়, একবার কলকাতা যাব ভাবছি। বলোগে পরে একসময় যাব। কিন্তু বকুলবাড়ির চাকর বকুলবাড়ির কর্ত্রীর হুকুমটাই অনড় ধরে নিয়েছে।

সাদা-সাপটা বলে বসল, আজ্ঞে, মা বিশেষ করে বলে দিছেন, কলকেতা যাবার আগে একবার হয়ে যান না হয়।

স্বভাব অনুযায়ী কমলেশের কৌতুক বোধ করার কথা। কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই বলেই ঈষৎ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল।—যা বললাম গিয়ে বলো গে যাও।

মুখ দেখে মনে হল লোকটা কিছুটা সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। ইতিমধ্যে হোস্টেলের বেয়ারা সকালের চা আর টোস্ট নিয়ে এসেছে। তার হাত থেকে পেয়ালা নিতে গিয়ে কমলেশ গণেশের চোখেও যেন চায়ের তৃষ্ণা দেখল। কৌতুকের রসদ পেলে সে চাকর-বাকরের সঙ্গেও আলাপ জমিয়ে তুলতে পটু। এক্ষেত্রে কৌতুক না হোক বকুলবাড়ি সম্বন্ধে মনের তলায় বেশ একটু কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে। এই লোকটার মুখ থেকে কিছু খবর অন্তত সংগ্রহ করা যাবে।

তুমি চা খাবে একটু গণেশ?

গণেশ বিগলিত। তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে কাঁধের গামছা দিয়ে দু'ঝাপটা মেঝেটা একটু ঝেড়ে নিয়ে বসে পড়ল। বেয়ারাকে কমলেশ চায়ের সঙ্গে একখানা টোস্টও দিতে বলল। গণেশও তার উদ্দেশে সরল নির্দেশ দিল, গেলাসে চা দিও, বাবুর সামনে পেয়ালায় দিও না।

কমলেশ হাসল। সেই হাসি দেখে গণেশ আরো বেশি হেসে লজ্জা জ্ঞাপন করল। তারপর বলল, আজ সকালোয় এখানো চা খাওয়া হয় নি বাবু, মা-ঠাকরোণের সকালের কাজ সেরে সপ্তমীর চা করতে একটু বিলম্ব হয়ে যায় তো।

বিলম্ব শুনে হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু এই এক কথা থেকে আলাপের কয়েকটা সূত্র পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করল, তোমার মা-ঠাকরোণের কাজ সব সপ্তমীই করে বুঝি?

হাঁ বাবু।

সংক্ষিপ্ত জবাব। চাকর-বাকরেরা সাধারণত ফাঁক পেলে এক কথার জবাবে তিন কথা বলে থাকে।

কমলেশ ঘরোয়া আলাপ বিস্তার করে চলল।—বাড়ির লোকেরাও তাহলে দেরিতে চা খায়?

আজ্ঞে না। দিদিমণি চা করেন, সকলে খেয়ে নেয়। আমি আগেভাগে খেয়ে বসে থাকলে সপ্তমী দিনমান ঝগড়ার তাল খোঁজে।

সোজা বক্তব্যের মধ্যে ক্ষোভও নেই, প্রীতিও নেই। ঝি-চাকরের চিরাচরিত মনান্তরের রাস্তা ধরেই ওকে একটু উসকানি দিতে চেষ্টা করল কমলেশ—তা সপ্তমী ইচ্ছে করেই তোমাকে বিলম্বে চা দেয় না তো?

জবাবে হাসিমুখে ডাইনে বাঁয়ে মাথা দোলাল গণেশ। না বাবু, ও খুব ভালো লোক।

কমলেশ হাসি চাপছে। লোকটা যে চতুর ধুরন্ধর এই এক জবাবেই বোঝা গেল। নিজের স্বভাবও তেমনি বলেই ওকে একটু জব্দ করার লোভ ছাড়তে পারল না সে। আলতো কণ্ঠে বলল, সেদিন তোমাকে খুব বকাবকি করছিল শুনছিলাম—

এবারে খড়কে গোঁফের নীচে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু জবাব শুনে কমলেশ আরো বেশি কৌতুক বোধ করল। গণেশচন্দ্র বিনয়ের অবতার।—সমস্ত দিন খাটা-খাটুনি করে বলে মেজাজ অমনি হয়ে থাকে, একটু বকাবকি করতে না পেলে মন ভালো থাকে না।

তার চোখ এড়াবার জন্যেই কমলেশ হাতের কাগজটা টেনে নিয়েছিল। ইত্যবসরে ওর চা-টোস্ট এল। হাত বাড়িয়ে প্রীতমুখে সে তা গ্রহণ করল। গেলাসটা গরম। গামছায় জড়িয়ে নিল। অতঃপর বাবুটিকে বেশ ভালো লোক ভেবেই হয়তো বকুলবাড়ির প্রসঙ্গে আর অতটা বাকসংযমের প্রয়োজন বোধ করল না। ওর হাতের ভরতি গেলাসটা খালি হবার ফাঁকে কমলেশের মোটামুটি একটা চিত্রগ্রহণের কাজ সারা।

...বাড়ির কর্তা ? বাড়ির কর্তা বলতে বাইরের লোক সিদুবাবুকেই জানে। কিন্তু আসল কর্তা কেউ নেই। 'সব্বোময়' কর্ত্রী মা ঠাকরোণ। সিদুবাবু আর বীরুবাবু হলেন 'তেনার ভাসুরের ছেলে'—তাও নিজের নয়, জ্যাঠতুত ভাসুরের ছেলে। মা-ঠাকরোণের নিজের দেওর-ভাসুর কেউ নেই। আর দেবী দিদিমণি ওর দু'ভায়ের বোন। সব ছেলেবেলা থেকেই আছে মা-ঠাকরোণের কাছে। তেনাদের আগে মা-ঠাকরোণের নিজের ভাই-ভাইপোরা থাকতেন এখানে। বাড়ির উপর লোভ হয়েছিল, মা-ঠাকরোণ তাঁদের তাড়িয়েছেন। সে অনেক কালের কথা, গণেশচন্দ্র তখন বকুলবাড়ির চাকর নয়—এই 'গল্প' সে সপ্তমীর মুখে শুনেছে।

সিদুবাবু হলেন, নামকরা মোক্তারবাবু, এই বয়সেই বিষয়-আশয় ভালো বোঝেন, ভালো রোজগার করেন। আগে খুব ডানপিটে রগচটা ছিলেন। এখন ঠাণ্ডা মানুষ। বিয়ে-থাওয়া করেছেন, বউদিও এখানেই থাকেন। ছোট ভাই বীরুবাবু এখন আর দল করে মারামারি করেন না বটে, কিন্তু অনেকটা আগের মতই আছেন। কাগজের মিলে চাকরি করেন, কখনো দিনে ডিউটি, কখনো রাতে ডিউটি। এখন নেশা বলতে থিয়েটারের নেশা। রোজগারের টাকা বেশির ভাগ ওতেই ঢালেন। মা-ঠাকরোণ এসব আবার দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, এইজন্য মেজদাদাবাবুর 'স্বভাব চরিত্তিরে'র পরেও তাঁর সন্দ।

রাগ করেন বুঝি ?

রাগ ! রাগ বলে রাগ ! এক-একদিন তো কুরুক্ষেত্র। দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে গলা খাদে নামাল গণেশচন্দ্র। আরো একটু সামনের দিকে ঝুঁকল। মা-ঠাকরোণ নিজে যখন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আপনাকে আর বলতে বাধা কি বাবু—আসলে কি জানেন, মা-ঠাকরোণ এনাদেরও একটুও বিশ্বাস করেন না, শুধু দিদিমণিকে মাঝে মাঝে একটু যা ভালো চোখে দেখেন। তা তেনাকেও নিজের কোনো কাজ ছুঁতে দেন না, সপ্তমী করে। সপ্তমী হল তাঁর নিজের লোক, তাকে খুব বিশ্বাস করে। ওই জোরেই সপ্তমীর মেজাজ একটু কড়া।

আর গণেশ নিজে ? সে তো বাবুদের চাকর, সিদুবাবুর মাইনে খায়। তাকে মা-ঠাকরোণ ভালো চোখে দেখবেন কি করে ? তার এতটুকু ত্রুটি হলে তুমুল হয়ে যায়। সচেতন হয়ে গণেশচন্দ্র তক্ষুনি বক্তব্যটা শুধরে নিল আবার, অবিশ্যি সব সময় মেজাজ ঠিক থাকে না বলেই, নইলে মা-ঠাকরোণ খুব ভালো, সাক্ষাৎ ভগবতী।

গণেশচন্দ্র গাত্রোত্থান করল। এবারে তার ব্যস্ততা দেখে মনে হল ফিরে গিয়ে কৈফিয়ৎ দেবার ভাবনা আছে—খুব কম ক্ষণ কাটিয়ে গেল না। কিন্তু এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য ভোলে নি সে। সবিনয়ে প্রশ্ন করল, বাবু আপনি কলকেতায় যাবেন ভাবছেন, না সাব্যস্তি করেছেন ?

প্রশ্নের বক্র-গতি লক্ষ্য করেও কমলেশ নির্লিপ্ত জবাব দিল, দেখি—

তাহলে একবারটি এলে ভালো হত বাবু। সকলে ভাববেন, মা-ঠাকরোণ পাঠালেন, তবু গণশা বাবুকে নিয়ে আসতে পারল না। আমার অপযশ হবে।

মনে মনে লোকটার বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না কমলেশ। হাসি চেপে গম্ভীর মুখেই বলল, যাব'খন একসময়, তুমি যাও—

আনত প্রণাম নিবেদন করে সে বিরস মুখেই প্রস্থান করল। কমলেশের যাবার ইচ্ছে আদৌ নেই, একদিনেই যথেষ্ট ঘায়েল হয়েছে। কিন্তু তার আসল কৌতূহল থেকেই গেল। মাসির সিঁদুর আর লালপেড়ে শাড়ির কৌতূহল। এই রক্তিম মাঙগল্যের মালিক কেউ থাকলে এত কথার ফাঁকে গণেশ বলতই। অথচ একটি কথাও বলল না, কমলেশও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারল না। তাছাড়া মাসির মস্তিষ্কের কিছু গোলযোগ থেকে থাকলেও গণেশের এত কথার মধ্যে দুই-একবার অন্তত তা প্রকাশ পেয়ে যেত। কিন্তু তার বদলে মা-ঠাকরোণের ভীতিপ্রদ প্রভাবটুকুই বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই মা-ঠাকরোণটির সন্নিধানে গাম্ভীর্যের আচরণ-আঁটা ভাসুর-ঝি, অর্থাৎ দেবীর মুখখানাও বড় বিব্রত আর রমণীয় মনে হয়েছিল। কর্ত্রী হোন আর যাই হোন, কারো রোগের কারণে ঠিক ও-রকমটি যেন হবার কথা নয়।

মাসির তলবের নিগূঢ় হেতু কিছু আছে সেটা আরো স্পষ্ট হল পরের দিন।

কিন্তু এই কাণ্ড হবে জানলে সে আগের দিনই গিয়ে হাজিরা দিত। গত কাল মাসির সঙ্গে দেখা করার থেকে ঘর খোঁজাটা বেশি দরকারী মনে করেছে। দুই-একজনের সঙ্গে কথা বলেছে, আশ্বাসও পেয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর ছুটির দিনে দিবানিদ্রার আকর্ষণ ফেলনা নয়। বিকেলেও বেড়ানোর ফাঁকে ঘর দেখার তাগিদ, সন্ধ্যায় নিজের একটু পড়াশুনা আছে—মাঝে তো কয়েকটা বছর বইপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গিয়েছিল। পাস করার পর থেকে এক বনবিভাগীয় দপ্তরে চাকরি করে আসছিল।

আজও হাই তুলে, বার দুই চা খেয়ে, সাপ্তাহিক মাসিকপত্র উল্টে বেলা ন'টা পর্যন্ত কেটেছিল। এইবার কলেজের একজন সতীর্থের বাড়ি থেকে ঘুরে আসবে ভাবছিল।

ভগ্নদূত উপস্থিত। গণেশচন্দ্র।

মা-ঠাকরোণ আজ আবার পাঠালেন বাবু, আপনি কাল গেলেন না, সব্বক্ষণ আপনার পিত্যেশে ছিলেন।

কমলেশ মনে মনে বিরক্ত। এ এক ভালো ঝামেলা হয়েছে।—কেন বলো তো? ভালো আছেন তো উনি?

তেনার তো খ্যানে ভালো আর খ্যানে মন্দ...সেজন্যে নয়, আপনাকে খুব দরকার মনে হল।

আচ্ছা তুমি যাও, বিকেলের দিকে যাব'খন—

গণেশ ঢোঁক গিলল। একটা বিড়ম্বনা তল করতে চেষ্টা করল যেন। তারপর খুব মোলায়েম গলায় নিবেদন করল, বাবু, মা-ঠাকরোণ আজ ঠিক আমাকে পাঠান নি, ইয়ে—দিদিমণিকে পাঠিয়েছেন।

দিদিমণিকে! কমলেশের বিব্রত এবং সচকিত দৃষ্টি বাইরের দিকে ধাওয়া

করল।—কোথায় তিনি ?

তিনি অনেক দূরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। এখানে ছেলেদের মধ্যে হুট করে এসে হাজির হয় কি করে বলুন ? মা-ঠাকরোণ অতশত ভাবেন না, হুকুম করেই খালাস। না শুনলেও রক্ষে নেই। দিদিমণি তখন চুপি চুপি আমাকেই ধরলেন, বললেন, আমি যাই কি করে, আমি এখানে দাঁড়াই, তুমি বাবুকে বিশেষ করে বলে এসো, এ-বেলাতেই একবারটি এসে যেন কাকিমার সঙ্গে দেখা করেন—

কমলেশ তক্ষুনি জামা পরে নিয়ে বলল, চলো—

কিন্তু গণেশচন্দ্রের বিনীত-বদনে এর পরেও সমস্যা কিসের ? ভয়ে ভয়ে নিবেদন করল, দিদিমণি তো ওদিকে আবার আপনাকে বলতে বারণ করেছেন যে উনি দাঁড়িয়ে আছেন—

কমলেশের হাসিই পেল। ওই এক মহিলার, অর্থাৎ মিষ্টিমাসির দাপট বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। ভাসুরঝিটিকে নেহাৎ দায়ে পড়েই আসতে হয়েছে বোঝা গেল।

আচ্ছা, তুমি কিছু বল নি, এসো—

বেরিয়ে এলো। গণেশচন্দ্র কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে অনুসরণ করল।

হোস্টেল থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা দোকানের সামনে দেবী দাঁড়িয়েছিল। দূর থেকে দুজনকে একসঙ্গে দেখে তার গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর হল। কমলেশ হাসিমুখেই দেবী-সন্নিধানে এল।

নমস্কার—

জবাবে হাত তেমন উঠল না, মাথা একটু নোয়াল বটে।

গণেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি জানান দিল, আমি খবরটা দিতেই উনি আমার সঙ্গে চলে এলেন দিদিমণি—আপনারা যান তাহলে, আমি ইদিকে একটা কাজ সেরে যাই।

অনুমতির অপেক্ষা না রেখে সে হন হন করে পাশের একটা গলির রাস্তা ধরে অদৃশ্য হল। কমলেশ মনে মনে আবারও তার বুদ্ধির তারিফ করল। সামনের দিকে পা বাড়িয়ে সৌজন্য প্রকাশ করল, ওকে পাঠালেই তো হত, আপনি আবার কষ্ট করে আসতে গেলেন—

ওকে কাল পাঠানো হয়েছিল, আপনি কষ্ট করে গেলেন না বলেই আমাকে কষ্ট করে আসতে হল।

আসতে হল বলে অখুশি যে সেটা তার গাম্ভীর্য আর কণ্ঠস্বরেই প্রমাণ। আসতে হয়েছে বলে মর্যাদায় লেগেছে। কমলেশের বিনয়ে খাদ নেই, অভিযোগ এড়িয়ে বলল, এতটা পথ হেঁটে যাবেন, আপনি না-হয় একটা সাইকেল-রিক্সা নিয়ে চলে যান, আমি আসছি—

স্বাস্থ্য বেশ ভালো বলেই এটুকুও অনুকম্পার মত লাগল দেবীর। না থেমেই জবাব দিল, আমার হাঁটতে অসুবিধা হবে না—

কমলেশের এমনিতেই হালকা মেজাজ, তার ওপর কাউকে গম্ভীর দেখলে খুনসুড়ি করার লোভ সামলাতে পারে না। খুশি মুখে বলল, চলুন তাহলে, আমার অবশ্য ভালই লাগছে, আপনার কষ্ট হতে পারে ভেবে বলেছিলাম, যা কুনো সব আজকালকার

মেয়েরা—হাঁটার নামে গায়ে জ্বর আসে।

জবাবে দেবী ঘাড় ফিরিয়ে একবার তার দিকে তাকাল শুধু। গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম ঘটল না। মুখে কিছু বলল না বটে, কিন্তু এই তাকানোর অর্থ অস্পষ্ট নয়। অর্থাৎ আজকালকার ক'গণ্ডা মেয়েকে আপনার দেখা আছে?

কমলেশের সত্যিই মন্দ লাগছিল না। গায়ের রং মাজা হলেও দৃষ্টিটা বেশ আয়ত গভীর। সকালে চান করেছে, পিঠের চুল খোলা। আর স্বাস্থ্য আড়চোখে লক্ষ্য করার মতই ভালো। হাঁটার ভঙ্গিটুকুও বেশ বলিষ্ঠ। মুখের ওই ঘোরালো গাম্ভীর্যটুকুই যা আপত্তির কারণ কমলেশের।

সদালাপী হতে চেষ্টা করল।—আপনি স্কুলে কি পড়ান?

পড়াই না।

অজ্ঞাতসারে আবার একটা দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়ে ফেলেছে.মনে হল কমলেশের। স্কুলে কেরানীর কাজ-টাজই কিছু করে ধরে নিল। সেটা প্রকাশ করতে হল বলেই হয়তো কয়েকটা বাড়তি বিরূপতার আঁচড় পড়েছে মুখে।

কিন্তু কমলেশ নাছোড়। দরদী শুভার্থীর মত করে বলল, আপনি স্কুলে আছেন যখন পড়ার তো সুবিধে—পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে দিলেই তো হয়।

এবারে রাগের চিহ্ন আরো সুস্পষ্ট। মাসি ঠাট্টা করে বলে সে-ও ঠাট্টাই করছে ধরে নিল হয়তো। এ ব্যাপারে বিশেষ দুর্বলতা না থাকলে রাগ হবার কথা নয়। ঘাড় ফিরিয়ে এই দ্বিতীয়বার তাকাল তার দিকে। জবাব দিল—পড়লেও বটানী পড়ব না।

এইখানেই জিত কমলেশের। কেউ সমান মুখর বা মুখরা হলে সে এতটা উৎসাহ বোধ করে না। জোরেই হেসে উঠল।—আমি বটানীর মাস্টার শুনেছেন দেখছি। বটানী পড়তে যাবেন কেন, ওটা কি মেয়েদের পড়ার সাবজেক্ট!

সরল উক্তি; কিন্তু খুব সরল নয় যেন।—কাল কাকিমা লোক পাঠাল আসার জন্য, তবু এলেন না কেন?

কানে যেন কর্কশ লাগল একটু। পরিবারগত যে কারণেই হোক, সেদিন সে খুব বাঞ্ছিত আগন্তুক ছিল না—এ-রকমের একটা অনুভূতি এর আচরণেও প্রকাশ পেয়েছিল যেন। আজও তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে নিরুপায় বলে।

হাল্কা করেই জবাব দিল, আপনার কাকিমা লোক পাঠালেই যে ছুটতে হয় সেটা আজ বোঝা গেল।

লোকটাকে এবার যেন দেখা দরকার, বিচার করা দরকার। দেবী নিঃশব্দে তাই করল দুই-এক মুহূর্ত। কমলেশ আবার সহজভাবেই সামলে নিতে চেষ্টা করল।—কিন্তু এ-রকম জোর তলব কেন বলুন তো, আপনাকে ভয়ানক গম্ভীর দেখছি, কোনো গণ্ডগোলে ব্যাপার নয় তো?

তবু জবাবটা সদয় মনে হল না একটুও। বরং অসহিষ্ণুতাই প্রকাশ পেল।—গণ্ডগোল তো আপনিই পাকিয়ে এসেছেন।

আমি!

গেট খোলা রেখে কুকুর ঢুকিয়েছেন, তার ওপর গাছ নিয়ে ওই সব বলে এসেছেন।

কমলেশ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সভয়ে বলে উঠল, বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে মাসি এই জন্যে শেষে—

বাকিটুকু অসমাপ্ত থাকলেও অস্পষ্ট নয়। সাধারণ স্থলে তার মুখের ভয়ের বিন্যাসটুকু দেখলেই হেসে ফেলার কথা। কিন্তু পার্শ্ববর্তিনী হাসির ধার দিয়েও গেল না। নীরবে দেখল এবং শুনল, তারপর আবার অগ্রসর হল।

সঙ্গ নিয়ে কমলেশ এবার উৎফুল্ল মুখেই বলল, ব্যাপার কি জানেন ? আসলে ভয়ে যাই নি কাল, সেদিন মাসির রকম-সকম দেখে ঘাবড়ে গেছলাম—

আজ আদর পাবেন।

কমলেশ ভিতরে ভিতরে সচকিত একটু। এ-রকম আশ্বাস আশা করে নি। কথা ক'টার মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন ধার আছে একটু। সেদিন আত্মীয় শোনা-মাত্র এই মেয়েটির চোখে সন্দিগ্ধ ছায়াপাত হতে দেখেছিল। কেন ? আজকেও এই বিরূপ ভাবটুকু শুধু তাকে ডেকে আনার জন্য পাঠানো হয়েছে মনে হল না। গণেশচন্দ্র বলেছিল, মা-ঠাকরোণ কাউকে বিশ্বাস করেন না। আর আজ মনে হচ্ছে, এরও ভিতরে ভিতরে কিছু একটা অবিশ্বাসের ব্যাপার চলেছে। অন্যথায় দুদিনের পরিচিত এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এ-রকম পরিণত বয়সের এক মেয়ের এ-রকম ব্যবহার খুব স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাকে কিসের অবিশ্বাস ? ওই বাড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগ কাম্য নয় বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন নয় ? এই যোগাযোগের পিছনে পিছনে তার কিছু স্বার্থগত উদ্দেশ্য আছে ভেবেছে ?

এ-রকম মনে হতে কমলেশের সহজাত খুশির ভাবটুকু গেল। কিন্তু সেটা বাইরে প্রকাশ পেল না। ক'দিন ধরে মাথার মধ্যে যে কৌতূহল ঘুরপাক খাচ্ছে, এবারে খানিকটা বেপরোয়াভাবে সেই আলোচনার দিকে ঝুঁকল।

চুপচাপ কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, সেদিন আমার ব্যবহারেও আপনারা একটু অবাক হয়েছিলেন বোধ হয়, তাই না ?

দেবী একবার ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্নটা শুনল। শোনার পরেও নিরুত্তর।

কিন্তু সেদিন মাসিকে দেখে আমি সত্যিই হকচকিয়ে গেছলাম। মায়ের মুখে শুনেছিলাম, মেসোমশায় অনেক কাল আগে গত হয়েছেন। এ-রকম একটা ভুল হতে পারে ভাবব কি করে ?

ভুল হয় নি। কাকিমা বিধবা। নির্লিপ্ত, সংক্ষিপ্ত জবাব।

কমলেশ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল খানিক। রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে এই শুনবে ভাবে নি। দ্বিধা কাটিয়ে বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাহলে ওই...

এর বেশি কিছু জানি না।

অর্থাৎ আর প্রশ্ন করলে জবাব মিলবে না। সেদিন মেসোর প্রসঙ্গে সেই স্তব্ধ ব্যতিক্রমটুকুর তাৎপর্য বোঝা গেল। জিজ্ঞাসা করে বসল, মাসিমা কোনোরকম মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন কিনা তা তো জানেন ?

এবারে তাকে সচেতন করে দেবার মতই কিছু যেন হাতে এল দেবীর। চলতে চলতে তার চোখে চোখ রাখল একবার। বলল, তাও জানি না। তবে আপনি এই জানতে চেয়েছেন, কাকিমাকে জানাতে পারি।

শোনামাত্র মেজাজ বিগড়লো কমলেশের। আবারও মনে হল কোনো অজ্ঞাত স্বার্থের কারণে সে এই মেয়েরও অবাঞ্ছিত। অন্যথায় চব্বিশ-পঁচিশ বছরের কোনো মেয়ে নতুন পরিচয়ে এ-রকম বিরূপ উক্তি করে না। কিন্তু রাগলেও হাসতে পারে কমলেশ। বলল, তা জানান, আপনার কাকিমা আমার গার্জেন নন, আর তাঁর বাড়িতেও আমি থাকি নে।

উষ্ণ প্রতিক্রিয়াটুকু উপভোগ্য। আড়চোখে লক্ষ্য করে কমলেশের মনে হয় জায়গামত ঘা পড়েছে। রাগ গেছে, তবু আরো একটু জব্দ করার লোভ সংবরণ করা গেল না। কমলেশ দাঁড়িয়েই পড়ল।

এই দাঁড়ানোর অর্থ সুস্পষ্ট না হলেও দেবীর গম্ভীর মুখে ঈষৎ বিস্ময়ের আঁচড় পড়ল। তাকেও থামতে হল।

নির্লিপ্ত সহজ মুখে কমলেশ প্রস্তাব করল, তার থেকে আমি বরং ফিরেই যাই। আপনার কাকিমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার নিজের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। আপনি গিয়ে বলুন—তিনি এলেন না।

রমণীয় গাম্ভীর্যে এই চকিত বিড়ম্বনার মাধুর্যটুকুও সুদৃশ্য মনে হল কমলেশের। এভাবে বিপদগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা যেন কল্পনাও করে নি। আয়ত দৃষ্টি তার মুখের ওপর নিবদ্ধ। নিরুপায় অসহিষ্ণুতায় নিজের পূর্বোক্তি প্রত্যাহার করল যেন, কাকিমা অপেক্ষা করছেন, চলুন—

কমলেশ হাসি চাপতে চেষ্টা করল।—চলুন তাহলে।

মিষ্টিমাসি দোতলার বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। দূর থেকে মুখখানা থমথমে মনে হল কমলেশের। হয়তো তার প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে।

দেবী আগে ঢুকেছে, পিছনে কমলেশ। মাসিকে দেখেই সভয়ে পিছনে ফিরে তাকাল, গেটটা খোলা। ফিরে এসে তাড়াতাড়ি গেটটা বন্ধ করে দিল।

দেবী ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, কিন্তু এ-সবে তার কৌতুক বোধ করার মেজাজ নয় এখন।

নীচের বারান্দায় যে লোকটিকে কোমরে হাত দিয়ে পায়চারি করতে দেখা গেল, বিনা পরিচয়েই কমলেশ অনুমান করল, সে কাগজের কলের চাকুরে নাট্যানুরাগী বীরুবাবু—দেবীর মেজ ভাই। পরনে আধময়লা ঢোলা পায়জামা, গায়ে হাফশার্ট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল—হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। বয়সে কমলেশের থেকে কিছুই ছোটই হবে হয়তো।

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতে সে পায়চারি থামিয়ে আগন্তুক নিরীক্ষণে মনোনিবেশ করল। কোমর থেকে দুই হাত নামে নি, যেন সে-ই বাড়ির মালিক। কারো অনধিকার প্রবেশ ঘটল কিনা যাচাই করছে।

কমলেশ দু'হাত জুড়ে কপালে ঠেকাল। জবাবে বীরুবাবুও। ঈষৎ সচকিত হয়ে একটু সরে দাঁড়াল সে, অর্থাৎ পথ ছাড়ল।

কমলেশ নিঃশব্দে সঙ্গিনীকে অনুসরণ করছিল। বাধা পড়ল।

এই দেবী, শোন্ তো—। বারান্দার আর একটু ওধারে সরে গিয়ে আরো একটু

মোলায়েম করে ডাকল, শোন না, তোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

কিন্তু বোনের মুখে বিরক্তির রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা গেল। সে যেন এই আহ্বানের তাৎপর্য জানে। হয়তো বাইরের লোক আছে বলেই শোনার জন্য এগিয়ে যেতে হল তাকে। অতঃপর চাপা গলায় বীরুবাবু বোনের কাছে যা দাবি করল বাইরের লোকের তা শোনার কথা নয়, কিন্তু স্পষ্টই কানে এল।

পাঁচটা টাকা দে তো, এক্ষুনি দরকার, মাসকাবারে দিয়ে দেব।

উদ্‌গত বিরক্তি দমন করতে না পেরে দেবী একবার বাইরের লোকটির দিকেই ফিরে তাকাল, আর সে আছে বলেই হয়তো সমুচিত জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। নিরুপায় গাম্ভীর্যে হাতের ছোট লেস্ দেওয়া থলে খুলে পাঁচটা টাকা তার হাতে জলাঞ্জলি দিয়ে ফিরে এল। বীরুবাবুর মুখের চাপা তুষ্টি লক্ষ্য করে কমলেশের ধারণা হল, বিনা প্রতিবাদে প্রাপ্তির আশাতেই মাথা খাটিয়ে সে বাইরের লোকের সামনে এভাবে টাকাটা চেয়েছে।

ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্ক। ছুটির দিনের ওকালতির সেরেস্তা বসেছে। তবে বাইরের লোক জনাতিনেক মাত্র আছে। সকলেই একেবারে নিম্ন মধ্যশ্রেণীর। টেবিলের ওধারের প্রধান আসনের ফতুয়া গায়ে লোকটিই যে মোক্তার সিদুবাবু, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বীরুবাবুর মতই মুখের আদল, তবে তার মাথার চুল কদম-ছাঁটা, চোখ দুটোও কনিষ্ঠের মত অত ভাসা-ভাসা নয়। বুদ্ধিজীবীর চোখ।

এই দাদাটিকে বোন একটু সমীহ করে মনে হল। কারণ সেরেস্তা ঘর অতিক্রম করার আগে সে দাঁড়াল। যাকে নিয়ে এসেছে তার পরিচয় দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করল। বলল, বড়দা, ইনি কমলবাবু, কাকিমা ডেকে পাঠিয়েছেন...

ও...। তৎপর সৌজন্যে বড়দার দু'হাত যুক্ত হল।—আমার নাম সিদ্ধেশ্বর দত্ত, সিদু মোক্তার বললে সকলেই চেনে। আপনি আর একদিন এসেছিলেন শুনেছি, এখানকার কলেজে চাকরি নিয়ে এসেছেন?

কমলেশ সবিনয়ে মাথা নাড়ল। হাসিমুখে বলল, নতুন এলেই লোকে আত্মীয়-পরিজন খোঁজে, আমিও খুঁজে বার করেছি—

এ-রকম বলার কারণ আছে। কারণ সে ঘরের মধ্যে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি যেন দু-চোখে তাকে ওজন করে নিচ্ছিল, আর প্রাথমিক আলাপের ফাঁকেও যেন তাই করছিল। বয়সে সিদুবাবু বছর তিনেকের বেশি বড় হবে না তার থেকে, আর এ-ও হৃষ্টপুষ্ট বেশ। কিন্তু এর মুখ দেখে মনে হয় বয়সের গাছপাথর নেই।

বেশ, বেশ। ভিতরে যান, কাকিমা কাল থেকেই আপনার কথা বলছিলেন শুনছিলাম—

এই ঘরের পর ভিতরের সেই ফালি বারান্দা। বারান্দার এক কোণে বসে সপ্তমী কুলোয় চাল ছড়িয়ে কাঁকর বাচছে। মুখ তুলে যেভাবে নিরীক্ষণ করল, মনে হল সে-ও কাউকে দেখার প্রতীক্ষাতেই ছিল। তার পিছনের দরজার ফাঁকে ঘোমটা-টানা একটি বউয়ের মুখ উঁকি দিয়ে গেল। সিদুবাবুর বউ হবে। কিন্তু কমলেশ ভিতরে ভিতরে ঘাবড়াতে আরম্ভ করেছে। তার কেবলই মনে হতে লাগল, বকুলবাড়িতে তাকে নিয়েই একটা নীরব প্রহসনের স্রোত বয়ে চলেছে।

সিঁড়ির মুখে থমকাতে হল। হাস্যবদন গণেশচন্দ্র দাঁড়িয়ে। কাজ সেরে কোন পথ দিয়ে আগেই চলে এসেছে অনুমান করা গেল না।

আসুন বাবু, আপনারা খুব ধীরে হেঁটে এলেন বুঝি। আমি তো সেই কখন এসে গেছি—

দেবীর ভ্রূকুটি লক্ষ্য করেই হয়তো শশব্যস্তে আরো একটু পথ ছেড়ে দাঁড়াল।

সিঁড়ি। কমলেশ আগে। সঙ্গিনী এবারে অনুবর্তিনী। সিঁড়ির মাঝে বাঁক। বাঁক ঘুরতে যার সাক্ষাৎ, তিনি মিষ্টিমাসি। ওকে দেখে ওপরের বারান্দা থেকে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন।

বিষণ্ণ-গম্ভীর। বোনপোকে দেখেই যেন ওই মুখে একটুখানি আশ্বাসের আলো জ্বলল। তাঁর আহ্বান শুনে কমলেশ আরো বিস্মিত। মা-মাসিরই কণ্ঠস্বর বটে।

আয়। কাল এলি না কেন? মাসির আদর-আপ্যায়ন দেখে একদিনেই ভয় ধরে গেছে বুঝি?

হাসি ছাড়া গতি নেই। দোতলায় উঠে কমলেশ কৈফিয়ৎ দিল, ঘর খোঁজার তালেই দিন কেটে গেল, কাল আর সময় করে উঠতে পারলাম না।—

তবে যে গণেশ বললে তুই কলকাতা যাচ্ছিস, বিকেলের আগে ফিরবি না?

মনে মনে নিজের উদ্দেশ্যেই কটূক্তি করতে হল।—ভেবেছিলাম যাব, ওই জন্যেই হয়ে উঠল না।

বলতে বলতে মাসির সঙ্গে তাঁর ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরে আজ আর চেয়ার নেই। মাসি খাটের শয্যা দেখিয়ে বললে, বোস এখানে। নিজেও বসলেন। ঘরের মধ্যে দরজার কাছাকাছি দেবী দাঁড়িয়ে। আসবে না যাবে ঠিক করতে পারছে না। বিনা নির্দেশে দুইয়ের কোনোটাই করা সমীচীন বোধ করছে না যেন।

মাসি অনুযোগ সম্পূর্ণ করলেন, আসলে তুই ফাঁকি দেবার মতলবে ছিলি তাহলে, ওই জন্যেই তো আজ দেবীকে পাঠালাম—

আজও টকটকে সিঁদুর আর লালপেড়ে শাড়ির অস্বস্তি কাটানো সহজ হচ্ছিল না। তার ওপর পথে শুনেছে মাসি বিধবা। ফলে আলাপের হাল্‌কা দিকটাই আঁকড়ে ধরল কমলেশ। ছদ্মগাম্ভীর্যে বলল, পাঠিয়ে খুব বিপদে ফেলেছিলেন আমাকে। উনি গিয়েই শাসালেন, এক্ষুনি আসবেন তো আসুন, নইলে আপনার মাসিমা ছড়ি উঁচিয়ে আছেন, পরে গেলে আর রক্ষে থাকবে না।

শীর্ণ-বিষণ্ণ মুখে আরো একটু খুশির ছোঁয়া লাগল। মুখ ফিরিয়ে ঈষৎ স্নেহদৃষ্টিতে একবার ভাসুরঝিকে দেখলেন। দৌত্য-কার্যে সফল হওয়ার জন্যেই তার প্রতি তুষ্ট যেন।

বাজে কথা বলছিস!

অম্লানবদনে কমলেশ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকেই সাক্ষী মানল।—জিজ্ঞাসা করে দেখুন। শুধু এই, হোস্টেলের একগাদা ছেলে একেবারে অবাক, তাদের মাস্টারের ওপর আর কে মাস্টার এল!

মাসিও হাসলেন এবারে। আর-এক নজর ভাসুরঝির দিকে তাকিয়ে তার উক্তির সমর্থন করলেন আগে।—তা যা বলেছিস, যে মুখ করে থাকে, মাস্টার ছেড়ে ওকে

হেডমাস্টার ভাবে সকলে। খুব জব্দ, ফের না এলে ওকেই পাঠাব—

কমলেশ প্রমাদ গুনল। সত্যি বলে ধরে নিল কি না মাসি কে জানে। ওদিকে রমণীটির দিকেও আর ভরসা করে তাকাতে পারছে না। একবার তাকিয়েই অনুভব করেছে, তাকে নিয়ে এই রসিকতা পছন্দ করছে না, আবার কর্ত্রীর ভয়ে স্পষ্ট বিরূপতাও প্রকাশ করতে পারছে না।

সামাল দিতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে মুখ দিয়ে প্রথমে 'তুমি' বেরিয়ে গেল, পরে সংশোধন করল।—না না, কাউকে তোমার ইয়ে—আপনার, পাঠাতে হবে না—মাঝে মাঝে আমি নিজেই আসব'খন।

মাসির ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। সোজাসুজি মুখের দিকে তাকালে ওই জ্বলজ্বলে সিঁদুর আরো বেশি চোখে লাগে।—'তুমি'ই বল না, আবার 'আপনি' কেন ?...তোর মা আমাকে কত ভালবাসত জানিস না। দরজার দিকে মুখ ফেরালেন, দেবী, কমলের জন্য একটু চা কর, আর সপ্তমীকে বল ওর খাবারটা দিয়ে যেতে।

বাধা দেবার আগেই দেবীর প্রস্থান। তবু বিব্রত মুখে কমলেশ মাসিকেই নিরস্ত করতে চেষ্টা করল।—এখন আবার এ-সব কেন ! ওঁকে বারণ করুন, এখন কিছু খাব না—

খাবি না কেন ? সেদিন তো শুধু-মুখে ফিরে গেছিস। যে নরকের মধ্যে আছি, আমার মাথারও ঠিক থাকে না সব সময়।

আজ গতদিনের একেবারে বিপরীত দেখছে কমলেশ। সিঁদুর আর লালপেড়ে শাড়ি সত্ত্বেও আচরণ অস্বাভাবিক লাগছে না একটুও। এমন কি শেষের এই কথার পরেও না। নরকের মধ্যে আছে শুনে একটু বিব্রত বোধ করল শুধু, কোন্ নরক জানেও না, জিজ্ঞাসা করারও উপায় নেই।

আজকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল নিশ্চয়, নইলে এরই মধ্যে থালা-ভরতি খাবার নিয়ে উপস্থিত হল কেমন করে !

দু চোখ কপালে তুলল কমলেশ।—সর্বনাশ ! আমি কি রাক্ষস ! এত খাব কেমন করে ?

সপ্তমী একটা ছোট টেবিলে থালাটা রেখে চলে গেল। মাসি বললেন, আস্তে আস্তে খা, এই বয়সে খাবি না তো কবে খাবি ?

কমলেশ মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়ল। কি উদ্দেশ্যে তাকে ডেকে আনা, আর কি উদ্দেশ্যেই বা এত যত্ন-আত্তি ! মাসির মুখখানা আবার করুণ গম্ভীর, যেমন গোড়ায় দেখেছিল। কিছুটা বা চিন্তাচ্ছন্ন। খুব সংগোপনে যেন কিছু একটা দুশ্চিন্তা পোষণ করছেন।

খাবার নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে কমলেশ থালাটা টেনে নিল। একটু বাদে দেবী চায়ের পেয়ালা নিয়ে এল। তাকে দেখে কমলেশ হাসিমুখেই বলল, দেখুন, সেদিন আর আজ—দুদিনেরটা একসঙ্গে পুষিয়ে নিচ্ছি।

দেবী নির্লিপ্ত মুখে একবার তাকাল শুধু, তারপর পেয়ালাটা টেবিলের এক ধারে রাখল। তার পথের উক্তি মনে পড়তে কমলেশ সঙ্কোচ বোধ করছিল কেমন। দেবী বলেছিল, আজ আদর পাবেন।

কিন্তু এই আদরের ঠেলায় ভিতরে ভিতরে সে যে খাবি খাচ্ছে, এ আর মুখ ফুটে

বলে কি করে!

তুই যা, আর দরকার নেই। মাসির অস্ফুট নির্দেশ শেষ না হতেই সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব একধারে ঠেলে সরিয়ে যেন প্রস্তুত হলেন মাসি। সামনের দিকে ঝুঁকলেন একটু, গলার স্বরও সংযত।—আচ্ছা তুই যে সেদিন বলে গেলি বকুলগাছটার গুঁড়িতে পোকা ধরে গেছে—কি করে বুঝলি? আমার চোখে তো কিছু পড়ল না!

কমলেশ বিস্ময়ে নির্বাক খানিকক্ষণ। এইবার আর যেন অস্বাভাবিক লাগছে না মিষ্টিমাসিকে। যেন খুব আপনার কারো ব্যাধি প্রসঙ্গে অতি প্রিয়জন ব্যাকুল।

কি জবাব দেবে কমলেশ ভেবে পেল না। তাঁকে বুঝ দেবার জন্য বলল, আমার ভুলও হতে পারে।

আশঙ্কায় অসহিষ্ণু ভাবে মাথা নাড়লেন তিনি।—তাহলে সেদিন ও-কথা বললি কেন, গাছটা আর বেশিদিন টিকবে না! তাছাড়া কিছু একটা না হলে দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন গাছটা? পাতাগুলো কেমন হয়ে যাচ্ছে, আগে যা ফুল-ফল হত, এখন তার অর্ধেকও হয় না—কিছু একটা না হলে এ রকম হবে কেন? তুই ঠিকই বুঝেছিস নিশ্চয়, কিন্তু কি করে জানলি?

খাবার তল করতে এবারে কষ্ট হচ্ছে কমলেশের। তবু এই ফাঁকেই একটু সময় নিল। মাসি যত উদ্‌গ্রীব, ওর তত যেন সঙ্কট।

বাকল দেখে অনেক সময় বোঝা যায়—ফুটো-ফুটো হয়ে গেছে। তাছাড়া এমনিতেও ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

চিন্তা-কাতর প্রিয়জনকে কোনো পরম-আত্মীয়ের অন্তিম ব্যাধির কথা শোনানো হয়ে গেল যেন। মাসি মূর্তির মত বসে রইলেন খানিকক্ষণ। নিশ্চল, বিবর্ণ, পাণ্ডুর। সামলে নিতে সময় লাগল। তারপর আবার তাকালেন তার দিকে। এমন কাতর দুই চোখের তারা কমলেশ আর বুঝি দেখে নি।

তুই তো গাছ-গাছড়ার সম্বন্ধে অনেক জানিস, ওটা বাঁচে এমন কোনো উপায় নেই?

বিস্ময় দমন করতে না পেরে কমলেশ ফিরে জিজ্ঞাসা করল, গাছটাকে তুমি খুব ভালবাস বুঝি?

মনে হল, মাসির সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলো কেঁপে উঠল বুঝি, চোখের কোণ সিরসির করে উঠল। দাঁতে করে ঠোঁট চেপে নিজেকে সংবরণ করতে চেষ্টা করে মাথা নাড়লেন। ভালবাসেন।

কমলেশ আত্মস্থ হতে চেষ্টা করল। সহজ আশ্বাসের সুরে বলল, উপায় থাকবে না কেন, পোকা নষ্ট করে দিলেই আবার গাছ তাজা হবে—আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব'খন—

কবে? কবে ব্যবস্থা করবি? মাসির দেহে যেন প্রাণের আশ্বাস ফিরে এল। কমলেশ এক হাতে খাচ্ছিল, হঠাৎ তার অন্য হাতটা ধরলেন তিনি, আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, তুই আজই যা-হোক কিছু ব্যবস্থা কর্, আজ তো তোর ছুটি—

কালও ছুটি। আজ হবে না, অনেক চুন লাগবে, কলেজ থেকে কিছু অ্যাসিড-

ট্যাসিড নিয়ে আসব—কাল হবে। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, একদিনে কোনো ক্ষতি হবে না।

কাল ঠিক আসবি তো? মাসির চোখে কাতর সংশয়, না এলে কিন্তু আমি যাব।

তাও যে অসম্ভব নয়, কমলেশ তা উপলব্ধি করল। হেসে আশ্বাস দিল, আসব, এ-রকম একটা ডাক্তারি করার সুযোগ পাচ্ছি, আসব না।

মাসি ঠাট্টার ধার দিয়েও গেলেন না।—কখন আসবি?

এই সময়েই।

যা খরচ লাগে আমি দেব, তুই খরচের জন্য কিচ্ছু ভাবিস না, যা লাগে নিয়ে আসবি।

খরচের কি অন্ত আছে, কমলেশ গম্ভীর, আগে রোগী তো সারাই। আপনি খানিকটা চুন আনিয়ে রাখবেন।

কথার খেলাপ করে নি। পরদিন সময়মতই এসেছে। হাতে একটা বীজাণুনাশক আরকের বোতল—এরও দরকার ছিল না, শুধু চুনেই কাজ চলত। কিন্তু এমন ব্যাপারে আড়ম্বরের দিকটা তাহলে জলো হয়ে যায়।

গেট দিয়ে ঢুকে দাঁড়াল একটু। গাছটাকে ভালো করে দেখল। বেশিদিন বাঁচবে কিনা সন্দেহ, শুকনো টান ধরেছে মনে হয়।

এগোতে গিয়ে ওপরের দিকে চোখ গেল। রেলিংয়ের ধারে আজ মিষ্টিমাসি নয়, দেবী দাঁড়িয়ে। দোতলা থেকে নির্লিপ্ত মুখে তার গাছ দেখা লক্ষ্য করছে। কমলেশের হঠাৎ কেমন মনে হল, তাও না, দাঁড়িয়ে যেন একটা বুজরুকি দেখছে। কিছু বলার উপায় থাকলে বলত, নেই বলেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুধু দেখেই যাচ্ছে।

নীচের ঘরে পা দিতে এই ধারণাটাই আরো বদ্ধমূল হল। আজ মোক্তারবাবুর সেরেস্তা বসে নি—তার চেয়ারে বসে সামনের টেবিলে পাজামা-পরা দুই পা তুলে দিয়ে ঘরের কড়িকাঠ দেখায় মগ্ন বীরুবাবু। মুখে বিড়ি।

বহিরাগতের পদার্পণ অনুভব করে পা নামাল। আগন্তুক দেখে একটা কৌতুকদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল। পরিচিতের মত বীরুবাবু আপ্যায়ন জানাল, আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন—আপনি একজন ভালো বৃক্ষ-চিকিৎসক শুনেছি, দেখুন, আপনার পেসেন্টকে যদি আবার নতুন করে সবুজ করে তুলতে পারেন, কাকিমা বড় দুশ্চিন্তায় আছে।

গতকাল এ ধরনের ঠাট্টা মিষ্টিমাসির কাছে সে নিজেই করেছে। কৌতুকপ্রিয় হলেও, উক্তিটা কানে বেসুরো লাগল। সে যেন এই হাস্যকর অজুহাতে বকুলবাড়িতে আনাগোনার পথ সুগম করে নেবার চেষ্টায় আছে।

হেসে জবাব দিল, আপনি যত নাম-করা আর্টিস্ট, আমি তত নাম-করা বৃক্ষ-চিকিৎসক নই—সবে হাত পাকাতে শুরু করেছি।

কালচে ঠোঁটের ফাঁকে কৌতুক স্পষ্ট হল আরো।—আমার খবরও এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন তাহলে? কাকিমা বলেছে?

না। প্রথম দিন নিজের কানেই রিয়ার্সাল শুনে গেছি।

বসুন না, বিড়ি চলে?

না। কমলেশ বসল না, একা সরাসরি ওপরে উঠে যেতে বাধো-বাধো ঠেকছে।

ও-ঘরে সিগারেট আছে, এনে দিতে পারি।

তাও চলে না।

আপনি তো প্রায় অচল দেখি। যান তাহলে, আপনাকে আটকে রেখেছি টের পেলে কাকিমা এক্ষুনি সাবড়ে দিতে আসবে—

উক্তিটা নির্বিঘ্নে শেষ হবার আগেই ঘরে সপ্তমীর দেখা মিলল। সঙ্গে সঙ্গে বীরুবাবুর কণ্ঠস্বরে নাটকীয় পরিবর্তন, মোলায়েম করে বলল, এই যে, বাবুকে কাকিমার ঘরে দিয়ে আয় সপ্তমী, আমিই নিয়ে যাচ্ছিলাম—

অর্থাৎ দোতলার দিশারিণী এসে যেতে সে আর উঠল না। সপ্তমীর কালো মুখে কোনরকম ব্যস্ততা প্রকাশ পেল না। এ বাড়িতে নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে তাকে বেশ সচেতন মনে হল।

দোতলায় উঠতে উঠতে কমলেশের সেই পুরনো কথাই মনে হল। এ বাড়ির প্রায় অচেনা লোক সে, এই নিয়ে মাত্র তিন দিনের আনাগোনা। অথচ এক মাসি ছাড়া আর সকলের কাছেই যে সে অবাঞ্ছিত, সেটা এরই মধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি করা গেছে। অবাঞ্ছিত গোড়ার দিনে মাসির কাছেও ছিল। কি যে ব্যাপার—কমলেশের দুর্বোধ্য, সে কার কোন্ স্বার্থে ঘা দিতে পারে?

মাসির ফ্যাকাশে মুখ উৎকণ্ঠায় কাতর। বাড়িতে একবার কমলেশের এক বোনের একটা মাঝারি গোছের অপারেশন হয়েছিল। সার্জন বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার মায়ের যেন অনেকটা এই মুখ হয়েছিল।

আয়, আমি তোর দেরি দেখে ভাবছিলাম।

নীচে বীরুবাবুর সঙ্গে আলাপ করছিলাম, তারা তো আমায় গাছের ডাক্তার ঠাউরে বসেছেন!

প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যেই বলা, কিন্তু নিমেষে এতটা রুক্ষ কঠোর পরিবর্তন কমলেশ কল্পনা করে নি। দু-চোখ হঠাৎ যেন হিংস্র হয়ে উঠল মাসির, তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে উঠলেন, দেবী!

কমলেশ হকচকিয়ে গেল।—কি ব্যাপার?

তোকে ঠাট্টা করেছে!

জবাব দেবার অবকাশ পেল না। দেবী দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই ডাক থেকেই বুঝে নিয়েছে শঙ্কার কিছু কারণ ঘটেছে।

বীরুকে ডাক তো—

কমলেশ বসেছিল, একেবারে উঠে দাঁড়াল। বিড়ম্বনার একশেষ। আগে দেবীর উদ্দেশে নিষেধ জ্ঞাপন করল, ডাকতে হবে না। তারপর মাসির দিকে ফিরল, আমি চললাম তাহলে, ঠাট্টা উনি করবেন কেন, আমিই করছি—বুঝছেন না?

মাসি ঠাণ্ডা। মাঝখান থেকে ও রাগ করে চলে গেলে তাঁর যেন সমূহ বিপদ।—বোস্। ভাসুরঝিকে বললেন, যা—

তবু কমলেশ ভিতরে ভিতরে বিব্রত এবং বিরক্ত। আঁচড় যেটুকু পড়ার পড়েই গেছে, ওই মেয়েটি ধরেই নিয়েছে মাসিকে সে এমন কিছু বলেছে যার দরুন তাঁর এই উগ্র মূর্তি।

বাড়িতে স্প্রে আছে? কমলেশ চট করে কাজের কথা তুলল।

মাসি পুরোপুরি আশ্বস্থ হয়ে মাথা নাড়লেন, নেই তো...

কাউকে পাঠিয়ে একটা আনিয়ে নাও তাহলে, যে-কোন ওষুধের দোকানে পাবে।

ধড়মড় করে উঠে মাসি নিজেই দরজার দিকে এগোলেন। ব্যস্ত হয়ে হাঁক দিলেন, সপ্তমী! গণেশ—।

সপ্তমী!

সপ্তমী হাজির। মাসি ধমকে উঠলেন, থাকিস কোথায় তোরা সব? গণেশ কোথায়, শীগগির ডাক—

সপ্তমী গণেশের সন্ধানে ছুটতে গিয়ে তার সঙ্গেই ধাক্কা খাওয়ার উপক্রম—কারণ গণেশও হাজিরা দেবার জন্য পড়ি-মরি করে ছুটে আসছিল। কমলেশ উৎকর্ণ, এবারে সপ্তমীর তপ্ত-অভ্যর্থনার প্রত্যাশা। কিন্তু কর্ত্রীর ভয়েই হয়তো সপ্তমী সেটুকু চোখ দিয়ে সেরে নিল। গণেশচন্দ্র তার পাশ কাটিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

দাদাবাবু কি আনতে বলছে চট করে নিয়ে আয়, সাইকেলে যাবি আসবি। ভালো করে বুঝে নিয়ে যা।—আঁচল থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিলেন মাসি।

কি আনতে হবে বুঝে নিয়ে গণেশ চলে গেল। গাছের চিকিৎসা করতে এসেছে, কিন্তু কমলেশের মনে হচ্ছিল, এরপর তার নিজেরই হয়তো একটু আধটু চিকিৎসার দরকার হবে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতায় মাসি যেন চিকিৎসকেরই মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করলেন।—হ্যাঁ রে, গাছটা ঠিক বাঁচবে তো?

বাঁচবে।

আশায় আশ্বাসে দু-চোখ উজ্জ্বল।—গাছ-ভরতি আবার ফুল-টুল হবে?

হতে পারে।

হতে পারে কেন, কোন রোগ না থাকলে আবার আগের মত হবে না কেন?

হবে কিনা কমলেশ জানে না, তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্যেই জবাব দিল, হবে।

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ ভারী লোভ হয়েছিল জিজ্ঞাসা করে বসে, আপনার কপালে সিঁথিতে সিঁদুর আর পরনে লালপেড়ে শাড়ি কেন মাসিমা? ও-রকম বলে বসা তার পক্ষে বিচিত্র নয়, চেষ্টা করে মুখের লাগাম টেনে রেখেছে।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হতেই মাসির আপ্যায়নের ত্রুটির কথা মনে পড়ল। বললেন, তোকে তো আজ একটু চা-টাও দিল না কেউ, আমি আছি ভাবনা-চিন্তায় অস্থির হয়ে, না বলে দিলে কারো যদি কিছু খেয়াল থাকে, দেবী—

চা এক পেয়ালা পেলে যদিও খেত, কিন্তু শেষের ডাক শুনেই তৃষ্ণা গেল। ব্যস্ত হয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করল, না না, কিছু চাই নে—

ওদিকে এ-বাড়ির সকলের একটি করে কান কর্ত্রীর ডাকের প্রতীক্ষায় থাকে কিনা জানি না, পায়ে পায়ে দেবীর আবির্ভাব ঘটতে সময় লাগে না।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কমলেশ এই এক সুগম্ভীরাকে ব্যতিব্যস্ত যে করে তুলেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মাসি নির্দেশ দেবার আগেই ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হল সে। তাড়াতাড়িতে এই দ্বিতীয়বার 'আপনি' 'তুমি'তে গোল পাকিয়ে বলে উঠল, তোমার গাছের চিকিৎসা-টিকিৎসা আর হবে না, এরকম করলে আর আমি আসবই না এখানে।

মাসি থতমত খেলেন, এ-রকম কথা শুনতে অভ্যস্তও নন।—কি হয়েছে?

সেই থেকে হাঁক-ডাক করে অস্থির করে তুলছেন সকলকে, আমার চা-টা-র কিছু দরকার নেই এখন।

মাসি কয়েক নিমেষ চুপচাপ চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। এ-রকম তাকালে তখন আবার অন্যরকম লাগে, ভারী বুদ্ধিমতী মনে হয়।

আমাকে 'আপনি' বলবি কি 'তুমি' বলবি আগে ঠিক করে নে। সেদিন তো বলেছিলাম 'তুমি' বলতে—তোর মুখে 'আপনি' 'আপনি' ভালো লাগে না।

এই হঠাৎ মিষ্টিবচনে দেবী ঈষৎ বিস্মিত যেন। কমলেশ পলকে লক্ষ্য করে নিল। তারপর অন্তরঙ্গ বিরক্তিতে হেসে মাসির প্রতি দোষারোপ করল, তোমার ভালো না লাগাই ভালো, বেশি ভালো লাগলে তুমি লোককে বড় নাজেহাল করো।

এই বচনেও কর্ত্রীকে রুষ্ট হতে না দেখে দেবীর নীরব বিস্ময় আরো একটু বাড়ল হয়তো।

মাসি তেমনি চেয়ে আছেন, ঠোঁটের ফাঁকে হঠাৎ একটু কৌতুকের উন্মেষও দেখা গেল বুঝি। কমলেশের অনুমান, ওর বয়েস আর ভাসুরঝির বয়েসটাই হয়তো হঠাৎ খেয়াল করলেন তিনি। মুখ ফিরিয়ে এবারে ভাসুরঝির দিকে তাকালেন। তাকেও দেখলেন একটু। কিন্তু পরক্ষণে মোলায়েম করে তাকে যা জিজ্ঞাসা করলেন শুনে কমলেশ আবারও সচকিত।

তোদের কি বাজার হয়েছে, গণেশ ভালো মাছ-টাছ এনেছে কিছু?

এ-রকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। দরজা-সংলগ্নার মুখে হাঁ-না দুইয়ের মাঝামাঝি গোছের অভিব্যক্তি একটু।

গণেশ ফিরে এলে আর একবার পাঠা না-হয়, একটু কিছু নিয়ে আসুক—কমল এখানেই খেয়ে যাবে, এত বেলায় আর না খেয়ে যায় না, একটু চা-টাও তো করে দিলি না। এ-ঘরে সপ্তমী কি রাঁধছে দেখ, তাকেও বলে দে—

কমলেশের হাল-ছাড়া অবস্থা। গাল ফুলিয়ে বড় করে আর শব্দ করে নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। কিন্তু বাধা দেবার আগেই মাসি তার দিকে চেয়ে তপ্ত অনুযোগ নিক্ষেপ করে বসল, তোর এ-বাড়ির সকলকে সঙ্কোচ কিসের, বাড়িটা তো আমার, না কি?

যারা এখানে বাস করে এই উক্তিও তাদের ভালো লাগার কথা নয়। ভালো লাগলও না। দেবী দাঁতে করে নখ খুঁটছে। কমলেশ এবারেও জবাব দিতে ছাড়ল না, অদূরবর্তিনীকে যেন খুশি করার জন্যই বলল, হ্যাঁ, বাড়িটা যে তোমার সে তুমি বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দিচ্ছ। তারপর দরজার দিকে ফিরে মাসির নির্দেশ খণ্ডন করল, শুনুন আপনাকে কিছু করতে হবে না, যেখানে খাই সেখানে তো কিছু বলে আসা হয় নি, সেখানকার খাবারটা ফেলা যাবে।

মুখের দিকে চেয়ে দেবী এই কথাও নীরবে শুনল। মাসি বাধা দিতে গেলেন, যায় যাবে—

কিন্তু শেষ করার অবকাশ পেলেন না। স্প্রের যন্ত্র হাতে গণেশচন্দ্র হাজির।

সঙ্গে সঙ্গে কি বলছিলেন মাসির ভুল হয়ে গেল, তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যে কথাই বলুন, মনের তলায় একটা দুশ্চিন্তা থিতিয়েই আছে।

এনেছিস...দাদাবাবুকে দে...কমল দ্যাখ, এই চেয়েছিলি তো?

কমলেশ মাথা নাড়ল।

পরের দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ির হাওয়াই যেন বদলে গেল। কর্ত্রীর উৎকণ্ঠার একটা কৃত্রিম ছোঁয়াচ লাগল সর্বত্র। সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে কমলেশ বকুলতলায় প্রস্তুত। মাসি কাছেই বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে, তাঁর পাশে দেবী। বীরুবাবু বাড়িতেই ছিল, সিদুবাবুও কখন ফিরেছে কমলেশ জানে না। পায়ে পায়ে তারাও এগিয়ে এসেছে। আসাটা যেন কর্তব্য বোধ করেছে। নির্দেশের অপেক্ষায় কাটারী হাতে গণেশচন্দ্র পাশেই দাঁড়িয়ে। ওদিকে বারান্দা থেকে সপ্তমী দেখছে, আর কমলেশের মনে হল নীচের ঘরের জানালা দিয়ে একটি বউয়ের মুখও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

কমলেশই প্রথম আবহাওয়াটা সহজ করে তুলতে চেষ্টা করল।—বা-বাঃ, একটা সাঙ্ঘাতিক কিছু করতে যাচ্ছি মনে হচ্ছে।

ফল হল না। বাড়ির কর্ত্রীর মুখ দেখে কারো হাসার সাহস নেই। এই পরিস্থিতিতে নিজের হাসিটাই কানে বেখাপ্পা লাগল কমলেশের। তার ইঙ্গিতে কাটারী রেখে গণেশ গাছে উঠল। কমলেশ বালতির আরক-জল স্প্রেতে করে তার হাতে তুলে দিতে লাগল। গণেশ সুপটু তৎপরতায় গাছময় তা স্প্রে করতে লাগল।

হঠাৎ মাসির অস্ফুট ধমক কানে এল, গণেশকে বকছেন, অত হড়বড় করছিস কেন? দেখেশুনে আস্তে আস্তে দে না।

ফলে শুধু গাছ স্প্রে করতেই তিন কোয়ার্টার কাবার প্রায়। কোথায় কোন্ ডাল আর কোন্ পাতাটা বাকি থেকে গেল, তাও মাসির নজর এড়ায় নি।

চিকিৎসার দ্বিতীয় পর্বে মাসি শক্ত কাঠ একেবারে। দাঁড়াতে না পেরে সিমেন্ট-বাঁধানো বেঞ্চটার ওপর বসে পড়েছেন। আর এক দিকে ঘাড় ফিরিয়ে আছেন, এদিকে তাকাতেও পারছেন না।

কাটারীর ঘা দিয়ে গণেশ গাছের গুঁড়ি থেকে কাঁধ পর্যন্ত পুরনো বাকল ছাড়াচ্ছে। কমলেশও টেনে টেনে আলগা ছালগুলো খুলে আনছে।

মাসির দিকে চেয়ে দৃশ্যটা যেন সত্যি মর্মান্তিক মনে হচ্ছে তারও। একটা গাছের ছাল ছাড়ানো দেখে এত যাতনা পেতে পারে কেউ, তা চোখে না দেখলে ভাবা যায় না।

ছাল ছাড়ানো এবং পরিষ্কার করা হতে দগদগে ঘায়ের মত হল দেখতে।

কমলেশ এবারে নিজে হাতে সেখানটায় ভালো করে স্প্রে করে দিল। স্প্রে শেষ হতে সেই সবটা জায়গায় পুরু করে চুনের প্রলেপ দেওয়া হল। দেখলে সমস্ত গুঁড়িটাই

ধপধপে সাদা মনে হবে।

ব্যস্, অপারেশন সাকসেসফুল। এরপর একদিন গুঁড়ির চারপাশে মাটি খুঁড়ে খানিকটা ভালো সার ফেলে দিলেই হবে—আর পুরনো চুন তুলে বার দুই নতুন চুন লাগাতে হবে।

মাসি এবারে ঘুরে বসলেন। এখন আর চোখে অতটা লাগছে না। সিদুবাবু মুখ মচকে অন্যদিকে ঘাড় ফেরাল। বীরুবাবু সচেতন বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে কমলেশের দিকেই চেয়ে আছে। দেবীর মুখে কোনো ভাববিকার নেই, তেমনি নির্লিপ্ত গম্ভীর।

মাসি অস্ফুট স্বরে বললেন, যা করার তুই এসে করে দিয়ে যাবি—

কমলেশ বিব্রত বোধ করল। অন্তরঙ্গতা দীর্ঘ করার চেষ্টাই ভাবছে হয়তো এরা। বিশেষ করে সিদুবাবুর নির্বাক অভিব্যক্তি সেই থেকেই ভালো লাগছিল না। তার পছন্দ হবে না অনুমান করেই মনের ভাব চেপে বিপরীত উক্তি করল সে। বলল, সে হবে'খন, তোমার গাছ কি হয় এবারে দেখো না, একেবারে চেহারা বদলে যাবে।

পলকে সিদুবাবু আর বীরুবাবু চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিল একবার। তারপর সিদুবাবু ঘরের দিকে রওনা হল। বীরুবাবুর ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস একটু। দেবী দ্রষ্টা। বালতি আর কাটারী নিয়ে গণেশ সরে গেছে।

আনন্দে খুশিতে কৃতজ্ঞতায় মাসির দুই চক্ষু উদ্ভাসিত। কমলেশ যেন নিজের হাতে করে প্রাণ দিয়েছে তাঁকে। সস্নেহে চুন-লেপা গাছটার দিকে তাকালেন একবার। যাতনা ত্রাস গিয়ে মুখে এরই মধ্যে হাসির ছোঁয়া লেগেছে।

চল্ ভিতরে চল্, অনেক পরিশ্রম হয়েছে তোর।

হাত-মুখ ধুয়ে কমলেশ মাসির ঘরেই এল আবার। পালাবার ইচ্ছে। কিন্তু ঘরে কেউ নেই, কাউকে না বলে যায়-ই বা কেমন করে! মাসি তার আগেই হাত-মুখ ধুয়ে গাছের কল্যাণে হয়তো বা ঠাকুরঘরেই ঢুকেছেন।

শয্যার দিকে এগোতে দোতলার বারান্দায় চোখ গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে দেবী হয়তো গাছটাই দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে তক্ষুনি বাতিল করে দিল। রমণীর নিটোল স্বাস্থ্যেও বিশেষ একটা রূপ বটে, কিন্তু পিছন থেকে চুপিসাড়ে এই রূপ দেখাটা খুব নিরাপদ বোধ করল না। এই বাড়ির মধ্যে এই মেয়েটিই বোধ করি সব থেকে বেশি বিরূপ তার প্রতি। কারণ, মাসি এ ক'দিনে অনেকবার তার সামনেই ওকে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছে। যে কোন মহিলারই তাতে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কথা। তার ওপর এই মহিলার মর্যাদাজ্ঞান একটু বেশিই মনে হয়।

চৌকাটের সামনে এগিয়ে এল কমলেশ। গলায় একটু জোর দিয়ে আচমকা গাম্ভীর্যে ডাকল, দেবী-দেবী, দয়া করে একটা কথা শুনবেন!

সুফল হবে না ধরেই নিয়েছিল। হলও না। বিচিত্র সম্বোধন কানে যেতে দেবী সেখানেই ঘুরে দাঁড়াল। সরাসরি তার দিকে চেয়ে ঠাট্টার পরিমাণ ওজন করল যেন। তারপর দু-এক পা এগিয়ে এসে বলল, আমার নাম দেবযানী।

কিন্তু শুরুতেই ছন্দপতন এক দফা। ঘরের ভিতরে চোখ পড়তে দেবীর গাম্ভীর্য হঠাৎ সচকিত হল একটু। কমলেশও ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ অপ্রস্তুত।

মাসি ঘরেই ছিলেন, খাটের ওধারে উবু হয়ে বসে বাক্স থেকে কিছু বার করছিলেন। এখন মাথা উঁচিয়ে সবিস্ময়ে এদিকে চেয়ে আছেন।

দেবী-দেবী কি রে?

কলেজের ছাত্র বোঝানোর মুখ করে কমলেশ এগিয়ে গিয়ে শয্যায় বসল।

প্রথমে বাইরের দিকে চেয়ে ভারিক্কি আহ্বান জানাল, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভিতরে আসুন—

ঘরে আর একজনের অবস্থান হেতুই তাকে চৌকাটের এধারে এসে দাঁড়াতে হল।

কমলেশ মাসির দিকে ফিরল।—ওনার নাম দেবী জানতুম, মহিলাদের নামের শেষে আর একটা দেবী জুড়তে হয়। তাই দেবী-দেবী করেছিলাম। এখন শুনছি উনি দেবযানী দেবী—নাম শেষ করতেই কাহিল অবস্থা।

মাসি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে আর একখানা ধোপদুরস্ত চওড়া টকটকে লালপেড়ে শাড়ি। চান হয় নি, চানে যাবেন। সকালের মুখের সঙ্গে মাসির এই মুখের অনেক তফাত। অতটা ফ্যাকাশেও লাগছে না আর এখন। অনেক তাজা, অনেক জীবন্ত মনে হচ্ছে। মুখে যাই বলুক, ওই আধমরা গাছের ভবিষ্যৎ সত্যি পুষ্পিতময় কিনা, কমলেশ নিজেও সঠিক জানে না। না হলে দফা রফা। কিন্তু কোন গাছের সঙ্গে কারো এমন নিবিড় আত্মিক যোগ থাকতে পারে, এ যেন প্রায় অবিশ্বাস্য।

হাসতে হাসতে মাসি বললেন, তুই মহা ফাজিল। তোর অত বলার দরকার কি, বয়সে বড়ই তো, দেবী বলে ডাকবি।

কটাক্ষে একবার দেবীমূর্তি পর্যবেক্ষণ করে নিল কমলেশ। তারপর মাসির উদ্দেশে চোখ পাকালো, বাড়িই না-হয় তোমার, তা বলে নামের ওপরে তোমার কি অধিকার? আঙুলে করে ভাসুরঝিটিকেই দেখিয়ে দিল, ওই দেখো—

অর্থাৎ, মুখ দেখে কথা বলবে।

মাসিও যেন সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকের খোরাক পেলেন তার দিকে চেয়ে। বললেন, সত্যি তো, সব সময় তুই অমন মুখ করে থাকিস, বাইরের ছেলে ভরসা পাবে কেমন করে।

দেবী এ কথারও প্রত্যুত্তর করল না। ফিরে তাঁর দিকেই চেয়ে রইল একটু।

মাসি না বুঝুক, ওই চাউনির মধ্যে কমলেশ একটা নীরব পাল্টা প্রশ্নই অনুভব করল। সে যেন বলতে চাইছে, আমার মুখই ও-রকম, তা তোমার বাইরের ছেলের বেশি ভরসা পাওয়ার দরকারটা কি? এমন উক্তির ফল কি হতে পারে জানা আছে বলেই হয়তো বলল না। কমলেশের দিকে ফিরে ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, আপনি কি বলছিলেন?

কমলেশের মনে আছে, কিন্তু না থাকার ভান করল। আমি? আমি কি বলব...

আরো ঠাণ্ডা, আরো স্পষ্ট করে দেবী আবার জিজ্ঞাসা করল, তখন কি বলার জন্য ডেকেছিলেন?

ও তাই তো...বলছিলাম, এবারে কি দয়া করে এক পেয়ালা চা দেবেন আমাকে?

শোনার পর দেবী হয়তো দু-চার সেকেন্ড দাঁড়িয়েছিল, আর তারপর যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু মাসি তার মধ্যেই আবার গণ্ডগোল বাধিয়ে বসলেন।—দেখো কাণ্ড,

মুখ ফুটে বলবে তবে দিবি, যা শীগগির নিয়ে আয়—

দেবী দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ফিরে তাকিয়ে অনুযোগ এবং নির্দেশ শুনে আবার পা বাড়াল। ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, এই মাসিটিই গোড়া থেকে মেয়েটিকে বিরূপ করে তুলেছে তার প্রতি। গাছের শুশ্রূষা আরম্ভ করে এই একদিনের মধ্যে মাসির ওপর যেন অনেক জোর বেড়ে গেছে তার। প্রস্থানরতা দেবীকে শুনিয়েই মাসির উদ্দেশে ক্ষোভ প্রকাশ করল তাড়াতাড়ি।

আচ্ছা, আমি তো বললাম, তোমার আবার এভাবে তাড়া দেবার দরকারটা কি?

মাসি এ অনুশাসন গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। মন প্রসন্ন, তাই মুখও প্রসন্ন। শাড়ি হাতে ঘুরে শয্যার এ-ধারে এসে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে সিঁড়ির দিকে তাকালেন একবার, দেবী নিচে নেমে গেছে। অন্তরের দাক্ষিণ্যে উদার হতেও বাধল না, মন্তব্য করলেন, এই মেয়েটা সত্যিই ভালো, আমার জন্য করেও খুব—

আর তার বদলে তুমিও সর্বদাই বেশ মিষ্টি ব্যবহার করো দেখলাম!

তিনিও হেসে ফেললেন। ছেলেটাকে যত বেশি পছন্দ হচ্ছে, স্নেহও তত বাড়ছে। আর, আজ যে উপকার করেছে তার বুঝি তুলনা নেই। বললেন, খারাপ ব্যবহারটা কি দেখলি?...মেয়েটা ভাল হলেও ওই ওদেরই তো বোন, বেশি আশকারা দিতে ভরসা হয় না। কার মনে কি আছে কে জানে, স্বার্থ ছাড়া কেউ তো এক পা নড়ে না।

কি কথায় কি কথা! কমলেশ তাড়াতাড়ি ঘরোয়া আলাপে মগ্ন হল।

জিজ্ঞাসা করল, বরাবর এখানেই কাটিয়ে দিলে তাহলে?

কোথায় আর যাব?

কেন, বাইরে থেকে একটু-আধটু ঘুরে এলেও তো পার। কলেজ ছুটি হলে আমার সঙ্গে ইউ পি-তে চলো না হয়, মা তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবে।

মাসি হঠাৎ ছোট মেয়ের মতই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, কেউ এভাবে তাঁকে কখনো ডাকে নি যেন।—সত্যি নিয়ে যাবি? কতকালের মধ্যে কাউকে দেখি না, তোর মায়ের সঙ্গে কি ভাবই না ছিল! নিরুদিকে সব থেকে ভালো লাগত। মুখের দিকে চেয়ে কি যেন নিরীক্ষণ করলেন, তারপর মন্তব্য করলেন, তুইও খুব ভালো, প্রথম দিন তোকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম...

প্রথম দিনের অভ্যর্থনা মাসি ভুললেও কমলেশ ভোলে নি। বকুলগাছের রোগ ধরার আগে পর্যন্ত অন্তত তাঁকে একটুও সহৃদয়া মনে হয় নি। আর রোগ ধরার পরে তো সেই ত্রাস-বিহ্বল মূর্তি। কমলেশ ঘটা করে মাথা ঝাঁকাল—উঁহু, কক্ষনো তা ভেবো না, কার মনে কি আছে কে জানে!

মাসি থতমত খেলেন, একটু আগে নিজেই ওই কথা বলেছিলেন। হেসে আরো জোর দিয়ে বললেন, তোর মন আমি দেখতে পেয়ে গেছি, তুই তো সেই নিরুদির ছেলে, অন্যরকম হবি কি করে?

কমলেশ হাসছিল বটে, কিন্তু মনে মনে অবাকও হচ্ছিল। মিষ্টিমাসির ব্যথা কোথায়, কোথায় যন্ত্রণা, বলতে গেলে কিছুই জানে না। কিন্তু সেই ব্যথা-যন্ত্রণা উপশমের জন্য এতটুকু প্রলেপ হাতে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে জানলে মানুষ কত সহজে না ভোলে। ক'দিনের

মাত্র পরিচয়—মাসি তো ভুলেইছে, কমলেশেরও ভোলার উপক্রম।

দরজার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই অনুমান করল চায়ের পেয়ালা হাতে দেবযানী আসছে। দেবীর থেকেও দেবযানী নামেই ভালো মানায়। নিমেষে মুখের ভাব বদলাতে সুপটু অনুচ্চকণ্ঠে মাসিকে যেন ইশারাই করল সে, আস্তে, শুনে ফেলবে—

হঠাৎ বোধগম্য না হতে মাসি বিস্মিত নেত্রে একবার ভাসুরঝিকে দেখে আবার তার দিকে ফিরলেন।—কি শুনে ফেলবে?

দেবী ততক্ষণে ঘরের মাঝামাঝি এসেছে, দুজনের কথাই কানে যেতে থমকেছে একটু। কমলেশ মাসির দিকে চেয়ে নিরীহ মুখে পাল্টা প্রশ্ন করল, শুনলে আপত্তি নেই বুঝি? তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হাসিমুখে পেয়ালার জন্য হাত বাড়াল।—মাসিমা এতক্ষণ আপনার খুব প্রশংসা করছিলেন।

মাসি তার দিকে চেয়ে দিনকে রাত করা দেখছেন যেন। বলে উঠলেন, তুই তো মিথ্যুক কম না!

কমলেশ তক্ষুনি নিজের উক্তি প্রত্যাহারের জন্য প্রস্তুত যেন।—ওগুলো সব নিন্দের কথা তাহলে? যান্ত্রিক গাম্ভীর্যে দেবীকে বলল, যা বলছিলেন একটাও প্রশংসা নয়, সব নিন্দে, বুঝলেন?

মেঘের নীচে রোদ ঝলসালে যেমন দেখায় দেবীর মুখখানাও অনেকটা সেরকম দেখতে হল। কাকিমার এমন প্রশ্রয়-ভরা মূর্তি সে-ও খুব বেশি দেখে নি। আর সে-কথা মনে হতেই হয়তো যে-মুখ সেই মুখ আবার।

কমলেশ সমনোযোগে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। মাসির বাকস্ফূরণের আগেই মগজে নতুন কৌতুক উপস্থিত। নির্লিপ্ত মন্তব্য করল, প্রশংসা যাঁর করছিলে তাঁর হাতটিও বড় মিষ্টি মাসিমা, গলা থেকে পেট পর্যন্ত মিষ্টি হয়ে গেল—

মাসির বুঝতে সময় লাগল কয়েক মুহূর্ত, দেবীরও বিভ্রান্ত মূর্তি। মাসি বলে উঠলেন, একগাদা চিনি দিয়ে ফেলেছে বুঝি?

সঙ্গে সঙ্গে এ-ধার থেকে প্রতিবাদ, কক্ষনো না, আমি নিজে খেয়ে দেখে এনেছি—

কমলেশের হাতের পেয়ালা কোলের ওপর নেমে এল। প্রায় বিমূঢ় বিস্ময়।

সে কি কথা, আগে নিজে খেয়ে তারপর অতিথিকে দিলেন?

অতটাই রাগ হতে পারে তা বোধ করি কমলেশও ভাবে নি। তপ্ত জবাব এল, আপনি মিছে কথা বলছেন, চিনি বেশি হয় নি।

সঙ্গে সঙ্গে মাসির ভ্রূকুটি, ও-কি! ও ঠাট্টা করছে বুঝেছিস, তাতেও তোর এই মেজাজ কেন?

কমলেশ তৎক্ষণাৎ নির্লিপ্ত টিপ্পনী ছুঁড়ল, তোমার ট্রেনিংয়ের ফল!

চাপা হাসিতে দু-চোখ বড় বড় করে মাসি এবারে তার দিকেই চেয়ে রইলেন। ছেলেটাকে সত্যিই খুশির দূত মনে হল তাঁর। হালকা অনুশাসনের সুর।—তুই কি কাউকে বাদ দিবি না! উঠে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল মুখে ভাসুরঝির দিকে ফিরলেন, তুই বোস এখানে, ওর সঙ্গে হাসিমুখে দু-চারটে কথাবার্তা বল্—আমি চট করে চানটা সেরে আসি।

শোনো—

এগোবার আগে বাধা পড়ল। ঘুরে দাঁড়ালেন।

কমলেশ গম্ভীর। চট করে নয়, বেশ সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে এসো।

হালছাড়া বিড়ম্বনায় আর একপ্রস্থ দেখলেন তাঁকে। বললেন, তুই রাজ্যের ফাজিল, দাঁড়া তোর মা-কে লিখছি আমি।

সহজ আনন্দে প্রস্থান করলেন। মুখ ফিরিয়ে দেবী সিঁড়ি পর্যন্ত দেখল তাঁকে।

এই পরিবর্তনটুকু বড় বেশি অপ্রত্যাশিত। এমন অসাধ্য-সাধন করল যে, তাকেই যেন ভালো করে নিরীক্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করল এবার।

কমলেশ সুবিনীত।—চায়ে চিনি বেশি হয় নি স্বীকার করছি। তবে আমার একটু বেশি লাগছিল...

মাসির প্রশ্রয়ে ছোট মেয়ের মতই তার সঙ্গে রসিকতা করা হয়েছে ধরে না নিলে দেবীর অত রাগ হত না হয়তো। তাছাড়া এই লোকের সামনে এ পর্যন্ত একাধিকবার বিড়ম্বিত হতে হয়েছে, তাও ভোলা সহজ নয় তার পক্ষে। এবারে মুখ খুলল তার। সরাসরি মুখের দিকে চেয়েই জবাব দিল, আপনার মাসিমা এলে বলবেন, তিনি আপনার কথা শুনলে বেশ খুশি হন দেখলাম।

কমলেশের ঠোঁটের ফাঁকে হাসি লেগে আছে, মাথা নেড়ে সায় দিল।—খুশি অনেকেই হন, একবার আমার কথা শুনে আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল এত খুশি হয়েছিলেন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে কলেজ থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করে ফেললেন। জোরেই হেসে উঠল সে, তারপর বলল, আপনাকে অবশ্য অতটা সুযোগ দেব না, একটু অপেক্ষা করুন, চায়ের পেয়ালাটা খালি হলেই আমি পালাব।

দেবী আবারও নিরীক্ষণ করছে। সত্যি চলে যাবে, না, কথার কথা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর ঠাণ্ডা মুখে জানান দিল, আপনার খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

সে কি। আমি তো বলে দিলাম খাব না।

দেবী জবাব দিল না। এই নীরবতার অর্থ, আপনার বলায় কিছু যায় আসে না।

এই থেকেই কমলেশ আবার এক কৌতুকের খোরাক পেল। সে চলে গেলে সমহ বিপদটা কার, ভালই অনুভব করতে পারে। পেয়ালা নামিয়ে রেখে ওঠারই উপক্রম করল, বলল, কিচ্ছু ঝামেলার দরকার নেই, মাসিকে শুধু বলে দেবেন চলে গেছি, পরে আমি বুঝব'খন।

প্রতিক্রিয়া জানাই ছিল, ওঠার আগে ঈষদুষ্ণ বাধা পড়ল, ঝামেলা যা হবার হয়েই গেছে। বসুন।

ইয়ে...কিন্তু আমি তো এ-রকম নেমন্তন্ন নিই না, বেশ বিনয় করে বললে তবে বিবেচনা করি।

ঠাট্টা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা ধৈর্য গেল। এগিয়ে এসে ঝুঁকে পেয়ালাটা তুলে নিল।—আপনাকে নেমন্তন্ন আমি করি নি, আপনার মাসিমা এলে তাঁকে বলে যাবেন।

পেয়ালা নিয়ে চলে গেল। কমলেশ ফিরে দেখছে। হাসছে।

॥ ৩ ॥

বামন-পুরাণের একটা গল্প শোনা ছিল কমলেশের।

অবশ্য এই নীরস গল্পে বিশ্বাস করলে বসন্তসখা মদনকে কতবার চোখের আগুনে ভস্ম করেছিলেন মহেশ্বর সে প্রশ্ন উঠবে। কারণ, এ আখ্যানে হরপার্বতীর মিলন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে কামদেবের পঞ্চশর নিক্ষেপের কথা লেখা নেই। তবু গল্পটা মনে পড়েছে কমলেশের, কারণ এতে বকুলের উল্লেখ আছে।...একদিন মদন দেখলেন ভোলানাথ তাঁর সামনে দিয়েই দিব্বি পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। এরকম নির্লিপ্ততা মদনের সহ্য হল না। তাঁর হাত নিশপিশ করে উঠল, শিকারের মত শিকার দেখলে পাকা শিকারীর মেজাজ ঠিক থাকে? তিনি সম্মোহন ফুলধনু তুলে নিলেন।

ওদিকে ভোলানাথের মাথার পিছনেও একটা গোপন চোখ আছে কিনা কে জানে। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। মদনের মতলব বুঝলেন। ব্যস্, অমনি আগুন ছুটল চোখ দিয়ে। বেগতিক দেখে মদন তাড়াতাড়ি হাতের ফুলধনু ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা পাঁচ ভাগ। সেই পাঁচ ভাগ থেকে পাঁচটি ফুলের জন্ম—চম্পক, বকুল, পাটলা, জাতি আর মল্লিকা।

এর মধ্যে বাকি চারটে ছেড়ে দিয়ে কমলেশ অনেক মাথা ঘামিয়েছে আর ঘামাচ্ছে শুধু বকুল নিয়ে। মিষ্টিমাসির অস্বাভাবিক বকুল-প্রীতির কারণ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছে। বকুলগাছের ছাল-বাকল থেকে পাতা-ফুল-ফলের বহু উপকারের কথা উদ্ভিদ-তত্ত্বে লেখা আছে। কিন্তু কোনো উপকারের প্রত্যাশায় মাসি বকুলগাছ লালন করছেন, সেটা অবিশ্বাস্য। এই লালনের ব্যাপারে তাঁর সমস্ত স্নেহ-প্রীতি-উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ যেন এক মোহনায় এসে মিশেছে।

ওই গাছটাকে কেন্দ্র করেই ইতিমধ্যে অনেকবার কমলেশকে বকুলবাড়িতে যেতে হয়েছে। সার ফেলা, নতুন করে চুন লাগানো, স্প্রে করা—সবই কমলেশের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। কিছু করার না থাকলেও শুধু একবার রোগীটিকে দেখে আসার জন্যেই তাকে যেতে হয়। নিজে থেকে না গেলে মাসির তলব নিয়ে গণেশচন্দ্র এসে হাজির হয়। তাকেও একদিন কাজের অজুহাত দেখাতে সে মাথা চুলকে বলেছিল, আজ্ঞে, আপনি না গেলে তো এরপর আবার দিদিমণিকে কষ্ট করে আসতে হবে!...

কমলেশ অতঃপর বিনা ওজরেই হাজিরা দিয়েছে। দিনে খুব বেশি হলে চার ঘণ্টা মাত্র ক্লাস। তারপর ঢালা অবকাশ। পড়াশোনার ঝোঁকও এমন নয় যে সময় কেটে যাবে। কলেজের পাকাপোক্ত মাস্টাররা আর যাই হোক তার মত আড্ডাবাজ নয় কেউ। ছাত্রদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে একটু-আধটু মস্করা করা চলে, আড্ডা দেওয়া চলে না। কমলেশের সময় কাটে কি করে?

এদিক থেকে মিষ্টিমাসির বকুলগাছ তাকে রক্ষা করেছে।

কিছুদিন বাদে হঠাৎ একদিন নিজের মন অনুসন্ধান করল কমলেশ। দেখা গেল, কলেজ থাকলে সে বিকেলের প্রতীক্ষা করে, আর না থাকলে রাতে সকালের প্রতীক্ষা করে। দুদিন নিজে থেকে না গেলে গণেশচন্দ্রের প্রতীক্ষা করে।

মিষ্টিমাসির গাছ দেখা তাকে পেয়ে বসল নাকি, তাঁর ধমক-ধামক অনুযোগ গঞ্জনা আর বাৎসল্যের আকর্ষণ এমন বড় হয়ে উঠল ? কিন্তু ওই বকুলবাড়িও দুই-একদিন নীরস লেগেছে। নিজেকে দেখতে বসে চক্ষুলজ্জা করে লাভ কি, সত্যি দুই-একদিন ভালো লাগে নি। অথচ, সেই বকুলগাছ তো ছিলই, মাসি ছিলেন, আর তাঁর আদর-আপ্যায়ন ছিল, সিদুবাবু বীরুবাবু ছিল, আর তাদের চোখে সেই সচেতন ঔদাসীন্য ছিল।

সেই দুই-একদিন দেখা মেলে নি শুধু একখানি গম্ভীর মুখের, কর্ত্রীর এক ডাকে সাড়া দেবার জন্য যাকে সর্বদা কাছে কাছে থাকতে হয়। যার গাম্ভীর্যে ফাটল ধরানোর ঝোঁকে মাসির প্রশ্রয়ের আড়াল থেকে অনেক প্রগল্‌ভ উক্তি করে বসেছে। কমলেশ নিঃসংশয়ে জানে, মাঝখানে মাসি না থাকলে দেবযানীর অমন নিরুপায় সহ্যগুণ দেখা যেত না। মাসি থাকতেও এক-একদিন তার মুখের দিকে চেয়ে প্রমাদ গোনে কমলেশ। আবার দুই-একদিন যে হাসাতে না পেরেছে তাও নয়।

দেবীটা নেই, অমুক জায়গায় গেছে। বা, দেবীর ফিরতে দেরি হবে বলে গেছে, সপ্তমীকে বলি তোকে এক পেয়ালা চা করে দিক—

সেদিন কমলেশের চায়ের তৃষ্ণা তেমন আর প্রবল হয় নি, সপ্তমীর চায়ের কোনো খুঁতও চোখে পড়ে নি—চায়ের চিনি-দুধ-রং সব ঠিক হয়েছে।

মাসির বকুল-প্রীতির রহস্য খুঁজতে গিয়ে নয়, এই আত্মবিশ্লেষণ করতে বসে কমলেশের পুরাণের বকুলের গল্প মনে পড়েছে। বকুল কি সত্যিই পঞ্চশরের এক শর নাকি ?

কথায় আছে চোখ পড়লে মন পড়ে। এই ক'দিনের পরিচয়ে চোখ বা মন পড়েছে বলে কমলেশ অবশ্য মনে করে না। রূপে-গুণে দেবযানীকে পাঁচটা সাধারণ মেয়ের উর্ধ্বে ভাবারও কারণ নেই কিছু। ওই গাম্ভীর্যও খুব স্বভাবগত মনে হয় নি তার, বরং অনেক সময়েই আত্মসচেতন বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া ধাক্কা লাগার মতই আর একটা অনুভূতি মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দেয়। সিদুবাবু বীরুবাবু তাকে পছন্দ করে না, কারণ এই যোগাযোগে তাদের কোনো স্বার্থের ওপর কাল্পনিক ছায়া অন্তত একটা পড়েছে। দেবযানীর সঙ্গেও যেন সেই স্বার্থের যোগটা আছে। তার বিরূপতার পিছনে এও একটা কারণ মনে হয়। প্রথম দিন আত্মীয় পরিচয় শুনে তার চোখের সেই চকিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা কমলেশ ভোলে নি।

কিন্তু বকুলবাড়িতে গিয়ে পড়লে পরে আর অত সব মনে থাকে না। সিদুবাবুর সঙ্গে দেখা হলে তিনি গাছটাকেই নিরীক্ষণ করেন খানিক, তারপর মন্তব্য করেন, কই, ভালোমন্দ তো কিছু বোঝা যাচ্ছে না। একদিন বললেন, দেখুন চেষ্টা করে, এদিকে কাকিমার ব্যাপার তো বুঝতেই পারছেন, গাছটা তরতাজা হলে যদি আবার একটু স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। চিকিৎসাও তো অনেক করলাম...

এই কথায় বাড়ির কর্ত্রীটির মস্তিষ্ক সুস্থ নয় এবং সেজন্য তিনি চিন্তিত—দু'কথায় এইটুকুই বুঝিয়ে দিলেন।

বীরুবাবুর কথাবার্তার ধরণ-ধারণ আর একটু খোলামেলা। সামনা-সামনি পড়লে মুচকি হেসে খোঁজ নেন, আপনার পেশেন্ট কেমন—

খুব ভালো। আপনাদের নাটকের কত দূর?

আর মশায় নাটক! যা যা পার্টস্ ছিল এই ঘন্টাকলের জাঁত্যায় পড়ে সব গেল। নাইট ডিউটি দিতেই হাড় কালি, দেব একদিন সব ছেড়েছুড়ে—

কি ছাড়বেন, নাটক না চাকরি?

বীরুবাবুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। অর্থাৎ কোনোটাই ছাড়া সহজ নয়।

ভদ্রলোকের অভিনয়-প্রীতির মধ্যে ভেজাল নেই। সাক্ষাৎমাত্রে নাটকের প্রসঙ্গ তুলে ফেলতে পারলে গাছ নিয়ে কৌতুক-বিদ্রূপ করার কথা যে মনে থাকে না, একাধিকবার কমলেশ তার প্রমাণ পেয়েছে।

বাইরের ঘর থেকে ভিতরের বারান্দায় পা দিলে সেখানে সপ্তমীর সাক্ষাৎ মেলে। একটা না একটা কাজে ব্যস্ত সে। বারান্দার এধারে বা ওধারে ব্যস্তগাম্ভীর্যে গণেশচন্দ্রকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মুখ দেখলে বোঝা শক্ত সে কার হুকুমের চাকর। অন্তত বারান্দায় যখন দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সপ্তমীরই মনে হয়। শুধু দাঁড়িয়েই যে থাকে তাও নয়। তবে সেটা বোধ হয় সপ্তমীর মেজাজের ওপর নির্ভর করে। একদিন কাছাকাছি মুখোমুখি বসে গল্প করতে দেখেছিল। সপ্তমী কুলোয় চাল ছড়িয়ে বসেছিল, আর সামনে বসে গণেশচন্দ্র তাকে শোনার মতই কিছু শোনাচ্ছিল বোধ হয়।

ব্যাঘাত ঘটল। সপ্তমী সচকিত হয়ে চালে হাত দিল। কিন্তু গণেশচন্দ্র তখনো তার বক্তব্যবিস্তারে তন্ময়। ফলে সপ্তমীর যে চাপা তর্জন শুধু ওরই উদ্দেশে, তার রেশ কমলেশেরও কানে এল।

সরে বোস না মুখপোড়া, একেবারে গায়ের ওপর এসে বসেছে।

গণেশের উদ্ভাসিত বদন নিমেষে আশাহত।

কোনোদিন বা একটি রোগা বউয়ের মুখ চোখে পড়ে। পড়লেই সে ঘোমটা টেনে আড়াল নেয়। সিদুবাবুর বউ। এই বাড়িতে তার অস্তিত্ব স্তিমিত মনে হয়।

দোতলায় উঠলে সামনের দক্ষিণমুখো বড় ঘরটি মিষ্টিমাসির। তার পাশের ছোট ঘরটা পূজোর ঘর। আর এপাশের ঘরটা খুব সম্ভব দেবযানীর। অন্যথায় মাসির এক ডাকে সে এসে উদয় হয় কোথা থেকে?

মাসির সাক্ষাৎ বেশির ভাগ তাঁর ঘরেই মেলে। আর দেবযানীর সাক্ষাৎও। কখনো দেখা যায়, মাসিকে একটা বই-টই পড়ে শোনাচ্ছে, নয়তো তার কোন কাজ করে দিচ্ছে, আর না হয় চুপচাপ শুধুই কাছে বসে আছে। একদিন দেখা গেল মাসিই ভাসুরঝির চুল বেঁধে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে মুখও চলছে, এই শরীরে এই ক'টি তো চুল, তাও অলক্ষ্মীর বাসা।

কাকিমার এই গাল-মন্দ শোনার ব্যাপারে তাকে অনভ্যস্ত মনে হয় না, কিন্তু সে-সময় সামনে কেউ থাকলেই একেবারে অন্য মুখ। যেন যে এল তারই অপরাধ। কমলেশ এলে সে কোনো এক ফাঁকে হয় বারান্দায় চলে যায়, নয়তো পাশের ঘরে। আর ওরও তখন আড়ি করে এক এক বিকেলে হয়তো তিনবার করেই চায়ের তেষ্টা পেয়ে যায়। তাছাড়া অন্য ছল-ছুতোরও অভাব হয় না, গাছে ক'বার জল দেওয়া হয়েছে অথবা ক'টা ডাল শুকিয়েছে, জিজ্ঞাসা করলেই মাসি তৎক্ষণাৎ 'দেবী' বলে হাঁক দেবেন।

কাছাকাছি দেখলে কমলেশের কেমন মনে হয়, ওই সচেতন গাম্ভীর্য বিরূপতা আর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সত্ত্বেও এই এক সাধারণ মেয়ের মধ্যেই কিছু যেন আবিষ্কারের বস্তু আছে। যার সন্ধান ও নিজেও জানে না। মাসির তাড়নায়, সামান্য চাকরি করে সেই ব্যর্থতায় আর হয়তো ভাইদের স্বার্থের সঙ্গে কিছুটা যুক্ত বলেও এইরকম দেখায়। এ-সবের থেকে আসল মেয়েটিকে বার করে আনতে পারলে সে যেন তেমন মন্দ হবে না। অন্যথায় এই গাম্ভীর্যও মাধুর্য-শূন্য মনে হত।

বলা বাহুল্য, এই আবিষ্কারের চেষ্টার ফল বিপরীত হয়েছে। তার পদার্পণমাত্রে মর্যাদার আবরণটা দেবযানীর মুখে আরো আঁট হয়ে বসে। আর কমলেশেরও বেপরোয়া চেষ্টা সেটা ছিঁড়েখুঁড়ে মাধুর্যের ছটা একটু দেখবেই। ফলে দেবযানী পারলে কাছে থাকতে চায় না। কাছে থাকতে হলে স্থির অচপল দৃষ্টিবাণে তাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে যে, সে কারো ঠাট্টার পাত্রী নয়। আর দৈবাৎ কাকিমা কাছে না থাকলে কথার জবাবে চট্‌পট দু'কথা শুনিয়েও দেয়।

কিন্তু এই করে যে অনেক ব্যবধান আবার অনেক সহজে উত্তীর্ণ হওয়াও চলে, সে সম্বন্ধে সচেতন নয় দুজনের কেউ।

কাছাকাছি এলে এই সাধারণ মেয়ের একটা সম্পদ অন্ততঃ কমলেশ সংগোপনে অনুভব না করে পারে না। বাঙালী মেয়ের অমন নিটোল স্বাস্থ্য সচরাচর দেখা যায় না। এই প্রাচুর্যভারে অনেক সময় অবনত মনে হয় তাকে। কিন্তু তা যে নয়, সেটা বোঝা যায়, যখন কোনো বেখাপ্পা মন্তব্য শুনে সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় বা সোজা হয়ে বসে সরাসরি মুখের দিকে তাকায়।

ইতিমধ্যে এই স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গেই একদিন অম্লমধুর পরিস্থিতির সূচনা। মাসির কিছু মনে এলে তো বলতে মুখে আটকায় নায়। দু'ভাইয়ের বিশেষ করে সিদুবাবুর ওপরে উনি সদা রুষ্ট। ভদ্রলোককে বাতাস থেকেও টেনে এনে এক হাত নিতে ছাড়েন না, বা তাঁর সম্বন্ধে কটূক্তি না করে কোনো কথা সাঙ্গ করেন না। ছেলেবেলা থেকেই এই তিন ভাইবোন যে তাঁর কাছেই আছে, সেই কথা বলছিলেন মাসি। তখন কে আর জানত যে, বড় হলে অমন নেমকহারাম হবে। এক ওই মেয়েটা ছাড়া মাসি মরে গেলেও ওরা দুজন ফিরে তাকাবে কিনা সন্দেহ। বদলে ওদের বরং হাড় জুড়োবে।

অতঃপর শুধু দেবী-প্রসঙ্গ। এইটুকু থেকে মাসিই তাকে মানুষ করেছেন।

মেয়েটা তখন অমন গোমড়ামুখো ছিল না। দিব্বি হেসে খেলে নেচে বেড়াত। বড় হয়ে এইরকম হয়েছে। হবে না তো কি, ওই ভাই তো গার্জেন—সে যেমন তেমনি হবে। তার কথায় ওঠা-বসা, এখন তবু চাকরি-বাকরি করে একটু স্বাধীন হয়েছে। সময় থাকতে মাসি পই পই করে বলেছেন বোনের বিয়ে দে, বিয়ে দে—তা বিয়ে দেবে কি, ছোটটা তো থিয়েটারের কেষ্ট-বিষ্টু, আর বড়টা কার বোঁচকা হাতাবে সেই চিন্তাই করছে দিন-রাত। এখন চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস হয়ে গেল মেয়েটার, কারো কোনো ভাবনাও নেই, চিন্তাও নেই।

মাসির ক্ষোভের ফাঁকে কমলেশ ঈষৎ ঝুঁকে সন্তর্পণে একবার ঘরের লাগোয়া বারান্দার রেলিংয়ের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপের অবকাশ পেল। দেবীমূর্তির আধখানা মাত্র দেখা যাচ্ছে।

মাসি পুরনো-প্রসঙ্গ বিস্তারের একটু আগে উঠে গিয়ে ওইখানে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়েই আছে। ঘরের সব কথাই যে কানে যাচ্ছে, ওই আধখানা মুখের আঁচেই তা স্পষ্ট অনুভব করা চলে। দৃষ্টি বাইরের দিকে, কান দুটো ঘরের দিকে তা বুঝতেও কষ্ট হয় না। কমলেশের মনে হল, যিনি বলছেন তার থেকেও যে শুনছে, তার অপরাধটা যেন বেশি। কিন্তু মাসিকে থামাবেই বা কেমন করে ?

কিন্তু মাসি থামা দূরে থাকুক, সখেদে আরো যেন গভীরে নিবিষ্ট হলেন। প্রসঙ্গত কিছু আবার মনে পড়ে থাকবে, বললেন, আজকালকার ছেলেদের কথাও আর বলিস নি বাপু, কি যে হাড়গিলে পছন্দ সব। সতেরো-ঝামেলা পুইয়ে একবার একটা সম্বন্ধ যাও এগিয়ে আনা গেল, তাও আর শেষ পর্যন্ত জোড়া লাগল না—মেয়ের মস্ত খুঁত—কি না, স্বাস্থ্য ভালো। বাপ না খুড়ো-জ্যাঠার দেখার পর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ছেলে এল মেয়ে দেখতে, আমি ভাবলুম হয়েই গেল। ওমা, শেষে কিনা বাপের চিঠি, ছেলের তুলনায় মেয়ের স্বাস্থ্যটি একটু বেশি পুষ্ট—তাই কাজ হবে না। বোঝ কাণ্ড—এরপর কেউ দেখতে আসবে শুনলে মেয়ে মারমুখো হবে না তো কি !

নিজের অগোচরে কমলেশের ঘাড় ফিরল আবার। বারান্দায় একটু আগেও যে ছিল সে নেই। অর্থাৎ মাসির এই উক্তিও কানে গেছে এবং সেটা অসহ্য হয়েছে। কমলেশের এই মুখখানাও দেখার লোভ, কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না।

সুযোগ আপনিই এল। দিনের ওপর সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে আসছিল। ঘরের আলোটা জ্বেলে দিয়ে মাসি ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপ্রণাম সারতে গেলেন। এদিক থেকে সন্ধ্যের ধুনচি হাতে দেবযানী ঘরে ঢুকল। ধুনচিতে গনগনে গোটাকয়েক কাঠকয়লার আগুন জ্বলছে, ধুনোর গুঁড়োও বেশি পড়েছে মনে হয়।

এই ঘরের চার দেয়াল প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যা দেখানোর রীতি। ঘরে দ্বিতীয় কারো অস্তিত্ব সম্বন্ধে কঠিন অবহেলা প্রকাশের চেষ্টায় মুখ থমথমে। এই মুখ দেখে কমলেশের দুই ঠোঁট সেলাই করে থাকার কথা। কিন্তু জিভটা তার সব সময়ে নিজের দখলে থাকে না হয়তো, মুখ দিয়ে ফস করে একটা উক্তি বেরিয়ে গেল। যেন নিজের মনেই ঘোষণা করছে, যে লোকের স্বাস্থ্যজ্ঞান নেই, তাকে আমি মানুষ বলে মনে করি না।

সন্ধ্যা দেখিয়ে চলে যাচ্ছিল, যাওয়া হল না। আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল।

রমণীর এই রোষ সুদৃশ্য হলেও ভয়েরও বটে।

আপনি কি আমাকে ছেলেমানুষ ঠাউরেছেন ?

তা কেন, ইয়ে, মাসিমা বলছিলেন চব্বিশ-পঁচিশ—

দুই চোখ তার মুখের ওপর একবার নড়া-চড়া করে আবার স্থির হল খানিক। তারপর ধীর মন্থর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিজের কাছে অস্বীকার করবে না, সেই সন্ধ্যায় খুব বিমর্ষ চিত্তে ঘরে ফেরে নি কমলেশ। বরং এতটা পথ ভেঙে কখন হোস্টেলের দোরগোড়ায় এসে গেছে খেয়াল করে নি। কোনো এক ভগ্ন-স্বাস্থ্য পুরুষ এই স্থির-প্রাচুর্যময়ীটিকে ঘরে নিয়ে তোলে নি, মাসির সেই তপ্ত খেদের সঙ্গে আর যাই হোক, তার সহানুভূতি অন্তত যুক্ত হয় নি। হয় নি যে সেইটুকু উপলব্ধি করতে করতে ঘরে ফিরছিল।

কিন্তু এই মাসিটি যে তাকে কোন্ ফ্যাসাদের দিকে টেনে নিয়ে যাবেন, কমলেশ তা কল্পনাও করে নি। করলে বকুলবাড়ির রাস্তা কিছুটা অন্তত পরিহার করে চলত। টের পেল যখন, তখন একেবারে দিশেহারা অবস্থা।

মিষ্টিমাসি ইনিয়ে-বিনিয়ে কোন প্রস্তাব করেন না, বা আগে থাকতে তার কোনরকম আভাসও দেন না। যেটা আসে, সরাসরি একেবারে নির্দেশের আকারে আসে। বলার আগে হয়তো বিচার-বিবেচনা করেন, কিন্তু বলা হয়ে গেলে আর নড়চড় করতে চান না।

কি কুক্ষণেই কমলেশ সেদিন আসর জমাতে চেষ্টা করেছিল। আর মাসির দুর্বলতা জানে বলে দুর্বল দিকটাই বেছে নিতে গিয়েছিল।

দেবযানী চৌকাঠের ওধারে বারান্দায় বসে ছুঁচ-সুতো দিয়ে কি একটা সেলাইয়ে নিবিষ্ট। মাসিরই কিছু হুকুম তামিল করছে মনে হয়। এদিকে ঘরের মধ্যে গাছ নিয়ে ভাবনা-চিন্তার ব্যাপার চলেছে। গোড়ায় এক দফা এ-রকমই হয়।—গাছটা যেমনকে তেমনই আছে, কিছুই উন্নতি বোঝা যাচ্ছে না, এবার কি করবি কর, ইত্যাদি।

কমলেশ পরামর্শ খুঁজে না পেয়ে বলে উঠল, তোমার চোখ দুটো ওই গাছ থেকে সরাও দেখি, নইলে কিছু হবে না।

মাসি থতমত খেলেন, দু চোখ করুণ হয়ে উঠল, যেন সত্যি অপরাধী।

কমলেশ তেমনি জোর দিয়ে বলল, একটা গাছ নিয়ে আছ, বাড়ীর পিছনটা তো ওদিকে আগাছার জঙ্গল হয়ে গেল, অতটা জমি—ওখানে বাগান করলেও তো পারো।

একটু অন্যমনস্ক দেখাল তাঁকে। দূরের একটা বিষণ্ণ স্মৃতির দিকে ফিরলেন যেন। বললেন, একসময় বাগান ছিল, এখন কে আর করে, সব যে-যার স্বার্থ নিয়ে আছে—

কমলেশ চকিতে দরজার দিকে চোখ চালাল একবার, দেবযানীর মাথা সেলাইয়ের দিকে আর একটু ঝুঁকেছে। আবার এক অসন্তোষের ইন্ধন যুগিয়ে বসল ভেবে কমলেশ নিজেও শঙ্কিত। কিন্তু কি ভেবে মাসির উত্তাপ বিপরীত আগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠল একেবারে—তুই করবি বাগান? কর না?

আমি। আমি কখন করব?

তুই একা কেন, আমি আছি, দেবী আছে, গণেশ আছে, কম মাইনের আর একটা লোক না হয় রাখা যাবে—তুই সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিবি। করবি?

নিজেই প্রস্তাব দিয়ে সরাসরি নাকচ করা শক্ত। হেসে জবাব দিল, কলেজের চাকরি ছেড়ে তোমার বাগানের মালী হব?

মাসি আমল দিলেন না, ছাড়তে হবে কেন, ক'ঘণ্টারই বা চাকরি তোর—দাঁড়া, লোক ডেকে কালই সব আগাছা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করছি। হঠাৎ যেন মনের মত কিছু উদ্দীপনা পেলেন তিনি।

তোমরা করো, আমি যতটা পারি দেখব'খন, আমার ডেরা তো আর এখান থেকে এখানে নয়।

শুনলেন। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে ভাবলেন কি। চোখ দুটো চকচক করছে।

নিজের মায়ের কথা উঠতে এ-রকম চোখই যেন প্রথম দিনেও দেখেছিল কমলেশ।

তোকে ক'দিনই একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবছি, মনে থাকে না। তুই ঘর খুঁজছিলি, কি হল?

দুর্যোগের ছায়া আগে পড়ে। তেমনি একটা বিপদের আভাসে কমলেশের ষষ্ঠ চেতনা আপনা থেকেই সজাগ হয়ে উঠল। কোনোরকম দ্বিধা না করেই জবাব দিল, পেয়েছি। মাসের গোড়ায় উঠে যাব।

কোথায় পেলি?

যে জায়গার নাম মনে এল কমলেশ তাই বলে দিল।

ক'খানা ঘর?

তিনখানা। দু'খানা বলতে গিয়েও বলাটা নিরাপদ বোধ করল না কমলেশ।

তিনখানা ঘরে তোর কি দরকার? কণ্ঠস্বরে অসহিষ্ণুতার আঁচ।

পেয়ে গেলাম। ছেলেরা পড়তে-টড়তে আসবে, কাজে লাগবে।

কত ভাড়া? মাসি মনোযোগ দিয়ে জেরা করছেন।

কমলেশ ঢোঁক গিলল।—পঁচাত্তর টাকা।

পঁচাত্তর টাকায় তোকে তিনখানা ঘর দিলে কোন্ শ্বশুর? ক'টা দোকানঘরের ভাড়া আদায় করি মাসকাবারে, কোথাকার কি ভাড়া আমি জানি না? আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিস? দেবী—

কমলেশ কোণ-ঠাসা। ওদিকে দেবযানীর হাতের সেলাই থেমে গিয়েছিল। ডাক শুনে মুখ তুলল।

নীচের দক্ষিণের ঘরটা খোলগে তো, আর সপ্তমীকে বল্ জানালা-দরজাগুলোও সব খুলে দেবে।

সেলাই-হাতেই উঠল্। প্রস্থানের আগে যে ঠাণ্ডা তির্যক দৃষ্টিটা কমলেশের মুখের ওপর নিক্ষেপ করে গেল, তার ভাষা প্রাঞ্জল, কিন্তু মর্ম তীক্ষ্ণ।

কি ব্যাপার?

জবাব না দিয়ে মাসি শয্যা ছেড়ে উঠলেন। লালপেড়ে শাড়ির আঁচলটা কাঁধে ফেললেন। সঙ্কল্প নড়চড় হবার নয় যেন।—চল্।

কি মুশকিল! যাবটা কোথায়?

নীচে। দ্বিতীয় অনুরোধ না করে তিনি দরজার দিকে এগোলেন।

সপ্তমীকে না বলে দেবযানী নিজের হাতেই জানালাগুলো খুলছিল। মাসি যে ঘরে থাকেন ঠিক তার নীচের ঘর। তেমনি প্রশস্ত, পূব-দক্ষিণ খোলা।

মাসির পিছন পিছন কমলেশও নিরুপায় মুখে ঘরে ঢুকেছে। জানালা খোলা শেষ করে দেবযানী ভাবলেশশূন্য মুখে দাঁড়াল।

দ্যাখ্। অগত্যা কমলেশের ঘাড়টা ঘরের চারদিকে এক চক্কর ঘুরে মাসির মুখোমুখি হল।

কেমন?

আছে এক-রকম, ইয়ে, তবে খুব সুবিধের নয়, লাগোয়া বাথরুম নেই—

না থাকুক, এই ঘরেই তোকে থাকতে হবে, একা পুরুষমানুষ থাকবি তোর আবার এটা নেই ওটা নেই ! ঘর বড় আছে, এধারে চেয়ার-টেবিল পেতে ছেলে পড়াতে পারবি।

না না না না, আমার ভয়ানক অসুবিধে হবে, তুমি বুঝছ না মাসিমা, এখান থেকে কলেজ অনেক দূর, এক-একদিন সকাল দশটায় ক্লাস আমার—

দেবী রোজ সকাল দশটায় খেয়েদেয়ে ইস্কুল করে, সপ্তমী ওদের থেকেও তোকে আগে রেঁধে দিতে পারবে, গণেশ তো মাছ আনেই, আলাদা করে তোর জন্যেও না-হয় একটু আনবে।...আর সাইকেলও একটা বাড়িতে আছে, হাতে টাকা এলে নিজেও একটা কিনে নিস্, তাহলে আর কোনো অসুবিধে হবে না। গোটা প্ল্যানটা যেন ছকাই ছিল তাঁর। মুখ ফিরিয়ে একবার ভাসুরঝিকে দেখে নিলেন, থমকালেন এক মুহূর্ত, তারপর আবার এদিকে ফিরে বললেন, তোর ওই পঁচাত্তর টাকা করেই দিস আমাকে, থাকা-খাওয়া দুই হয়ে যাবে, পঁচাত্তর টাকা ঘর-ভাড়া দিয়ে থাকবি, মাইনে পাস কত ?

বেগতিক দেখে কমলেশ বলে উঠল, তোমার মাথাই একদম খারাপ মাসিমা, এই নিয়ে জোর জুলুম করো তো চাকরি ছেড়েই চলে যাব আমি।

কেন ? কেন ? মাসিরও যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তোর মা হলে কি করতিস ? হোস্টেলে-বোর্ডিংয়ে থাকতিস ? এত বড় মাথা তোর যে, এখানে থাকতে বললাম বলে আমার মাথাই খারাপ বলিস ? মাসকাবারে এলি তো এলি, নইলে যেমন একধারে পড়ে আছি থাকব—কারো সঙ্গে কোন সম্পর্কের দরকার নেই আমার।

আগুন হয়ে প্রস্থান করলেন তিনি। সেই সঙ্গে চোখে জলও এসে গিয়েছিল হয়তো। কমলেশ বিমূঢ়। দেবী নির্লিপ্ত মুখে চেয়ে আছে তার দিকে। এই গাম্ভীর্যে ঈষৎ বিদ্রূপের ছোঁয়া লেগে আছে মনে হল। সে যেন এই পরিণতি জানত। চোখাচোখি হতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার জানালা-দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হল।

কমলেশ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আর ওপরে গেল না, পায়ে পায়ে গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল। অবসন্ন লাগছে। না, বকুলবাড়িতে এসে থাকার কথা সে এখনো ভাবছে না। একটা প্রীতির বন্ধন সত্যি ছিঁড়ল কিনা ভাবছে। আসলে সে কিছুই ভাবতে পারছে না।

পাঁচ ছ দিন আর বকুলবাড়ি-মুখো হয় নি। কি করে যাবে, ও-বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মূলে তার এই উদ্দেশ্যই ছিল, বাড়ির আর সকলে নিঃসন্দেহে তাই ধরে নিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, মাসি ওই রকম করতে পারেন জেনেই গোড়া থেকে কেউ সুবাঞ্ছিত ভাবে নি তাকে।

দিন দুই আগে গণেশচন্দ্র এসেছিল। মাসির তলব ধরে নিয়েছিল। কিন্তু না। নিজেই এসেছে বলল, কেউ পাঠায় নি। বাড়ির সমাচার জানাল। সবাই ভয়ে ভয়ে আছে, মা-ঠাকরোণের মুখ থম্‌থমে সারাক্ষণ, কাউকে কিছু বলছেন না বলেই বেশি ভয়। বকাঝকা করলে সেটা স্বাভাবিক হত। এ-রকম হলেই মা-ঠাকরোণের একটা না একটা কঠিন ব্যামো হয়। গণেশচন্দ্র নিজে থেকেই আরজি পেশ করে গেল, বাবু যেন অতি অবিশ্যি একবারটি আসেন—

কমলেশ হাঁ-না কিছুই বলে নি। কিন্তু মনে মনে সে আর একপ্রস্থ ঘাবড়েছে।

কলেজের সময়টুকু ছাড়া সারাক্ষণ একা একা কেটেছে, বিকেলে মাঠে মাঠে ঘুরেছে আর মাসির কথা ভেবেছে। রাতেও।...ওই বকুলগাছের প্রতি মাসির অমন অস্বাভাবিক আকর্ষণ কেন? তাঁর কপালে সিঁথিতে সিঁদুর কেন? পরনে লালপাড় শাড়ি কেন? মাসির এত রাগ, এত দাপট, কিন্তু তাঁর মত রিক্ত অসহায় বুঝি আর কেউ নয়। ওকে পেয়ে মাসি যেন একটা মস্ত আশ্রয় পেয়েছিলেন। কিন্তু কেন?

ছ'দিনের দিন মায়ের চিঠি এল। মাসির মনে ব্যথা দিয়েছে বলে মা প্রকারান্তরে তাকে অনুযোগই করেছেন। লিখেছেন, তোর মিষ্টিমাসি মস্ত একখানা চিঠি লিখেছে। সে এত আগ্রহ করে তোকে রাখতে চাইছে, তুই আপত্তি করিস কেন? এত আগ্রহ করে বলছে যখন কয়েকদিন গিয়ে থাক্, অসুবিধে হলে বলে চলে আসিস। চিঠি-ভরতি তোর কত প্রশংসা করেছে ঠিক নেই, লিখেছে তোর মত এমন ছেলে নাকি আর হয় না।

বিকেল চারটে না বাজতে গণেশচন্দ্র আবার এসে হাজির। গম্ভীর মুখে ফতুয়ার পকেট থেকে সেও একটা চিরকুট বার করে তার হাতে দিল। এও কম অপ্রত্যাশিত নয়।

—আপনি এসে কাকিমার সঙ্গে দেখা করলে আমার পরিশ্রমের লাঘব হয়।—দেবযানী।

গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। হাতের লেখা দেখে কেউ কেউ অন্তর চিনতে পারে নাকি? কমলেশও চিনুক না-চিনুক তেমনি করেই দেখছে।

হঠাৎ কি যেন মনে হল তার। মুখ তুলে সরাসরি গণেশচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাল। তাকে প্রস্তুত হবার সময় না দিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, আচ্ছা গণেশ, পরশু দিন এখানে তোমাকে কে পাঠিয়েছিল বল দেখি?

গণেশের গোপনতা ফাঁস হল যেন।—কেন, দিদিমণি কিছু লিখেছেন নাকি?

আগে বলো শুনি, তোমার দিদিমণিই পাঠিয়েছিলেন তাহলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একবার দেখা করে আসতে বলেছিলেন—

আর তিনি যে পাঠিয়েছেন সেটা বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন?

ধরা পরে গণেশের লজ্জা-লজ্জা মুখ।—আপনি বাবু বড় চালাক লোক।

আচ্ছা তুমি যাও, আমি যাব'খন।

আধঘণ্টার মধ্যেই জামা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির কাছাকাছি সস্ত্রীক সিদুবাবুর সঙ্গে দেখা। সাইকেল-রিকশয় চড়ে দু'জনে কোথায় চলেছেন। তার দিকে চোখ পড়তেই মহিলা এক-গলা ঘোমটা।

এই রোখো—

রিকশ থামিয়ে সিদুবাবু নেমে এলেন।—আমাদের ওখানে চলেছেন বুঝি? বেশ।—শুনলাম সব, আপনি আসতে চান না তাও শুনলাম। সকলের সুখ-সুবিধে আছে সেটা উনি বুঝলে তো আর কথাই ছিল না। আপনারা কলেজের প্রফেসর, আপনাদের কি এর মধ্যে পোষায়। তাছাড়া বুঝছেনই তো সব—

আর একদিনও সিদুবাবু কোনো অনুক্ত কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন মনে পড়ল। কমলেশ এ-প্রসঙ্গ এড়াতে চেষ্টা করল। দেখি বলে-কয়ে, আপনি চলেছেন কোথায়?

এই একটু শ্বশুরবাড়ির দিকে যাব।...ও-রকম বলে-কয়ে কিছু হবে না, যা বলার

শক্ত করে বলতে হবে। অবশ্য যদি চান বলতে, আচ্ছা—

রিকশয় উঠলেন।

নীচতলায় আর কারো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মেজটির ডিউটি চলছে বোধ হয়। সিঁড়ির বারান্দায় গণেশ হাত নেড়ে কিছু কৌতুকের কথাই শোনাচ্ছিল হয়তো—বাবু কত চালাক সেই কথা হওয়াও বিচিত্র নয়। নইলে তাকে দেখে সপ্তমী অত বড়সড় জিবই বা কাটবে কেন, আর গণেশেরই বা হঠাৎ চোরের মত মুখ হবে কেন?

দোতলার ঘরে মাসি একাই বসে। গণেশচন্দ্র যতটা থমথমে মুখের বর্ণনা দিয়েছিল ততটা নয়। পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন। আয়—

কমলেশ হাসিমুখে শয্যার আর এক ধারে বসল।...তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল শুনছিলাম?

আমার শরীর খারাপ হয়েছিল তাতে তোর কি? শরীর খারাপ হয়েছে কে বললে?

হাসিমুখেই জবাব এড়াতে চেষ্টা করল করলেশ, বলল, বাতাসে খবর গেছে। তোমার এই শরীরের আবার ভালো-মন্দ বোঝার জো আছে।

কমলেশ শুরুতেই ভুলের রাস্তা ধরল। ওর এই ধরনের কথাগুলোই যে মাসিকে টানে, সে আর জানবে কি করে।

তোর মায়ের চিঠি পেয়েছিস? বিনা ভূমিকায় সরাসরি প্রশ্ন।

পেয়েছি। তুমি তো কাণ্ড করেছ দেখছি।

বালিশের তলা থেকে আর একটা খাম বার করে তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন।—পড়্।

খামটা এক নজর দেখেই কমলেশ চিনল। এও মায়ের চিঠি। নিরুপায় মুখে পড়লও। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসান্তে মা ছেলের নিন্দে করেছেন। ও যেমন ফাজিল, তেমনি অবাধ্য আর গোঁয়ার। মিষ্টি যে ওকে ভালো চোখে দেখেছে সেটা মিষ্টিরই গুণ। লিখেছেন, ছেলেকে খুব বকে চিঠি লিখে দেওয়া হচ্ছে, তবে নেহাৎ যদি চাকরি-বাকরির ব্যাপারে অসুবিধে হয়, তাহলে মিষ্টি যেন কিছু মনে না করে। ছেলে যেখানেই থাক, সে তার মাসির কাছে আছে জেনেই মা নিশ্চিন্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

পড়া শেষ করে কমলেশ আর হালকা কথার ধার দিয়ে গেল না, সানুনয়ে বলল, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে মাসিমা, নইলে ছুটে ছুটে আসি? মিথ্যে রাগ করছ, তুমি বুঝতে পারছ না, এতে সত্যি খুব অসুবিধে—

কি অসুবিধে আমাকে বুঝিয়ে বল্ তাহলে।

আমি এখানে থাকি সেটা এক তুমি ছাড়া আর কারোরই তেমন পছন্দ হবে না। আর পছন্দ হবেই বা কেন।

সঙ্গে সঙ্গে মাসির শীর্ণ মুখ ধারালো হয়ে উঠলো।—বাড়ি আমার। কার পছন্দ হবে না?

কি মুশকিল। কমলেশ সভয়ে বারান্দার দিকে ঝুঁকল।

এই ঝোঁকার অর্থও মাসির কাছে সুস্পষ্ট।—দেবী বাড়ি নেই, আসতে দেরি হবে বলে গেছে। তুই বল্—ওই বড়টাকে বিশ্বাস নেই; ও তোকে কিছু বলেছে?

না, উনি বলতে যাবেন কেন?

মাসির দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, মুখের ওপর বিঁধে আছে যেন।—দেবী কিছু বলেছে?

না না, কেউ কিছু বলে নি। আমার নিজেরই মনে হয়েছে—কারো ভালো লাগার কথা নয়।

মাসি শান্ত হলেন একটু, একটু যেন নিশ্চিন্তও। বললেন, তোর এখানে থাকাটা কেউ পছন্দ করবে না আমি জানি, তবে দেবীকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ও আমার কোনো ইচ্ছেয় আপত্তি করে না।...যেদিন প্রথম তুই এলি এখানে, সেদিন আমিও তোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি নি, স্বার্থ ছাড়া কেউ তো কোনো সম্পর্ক রাখে না আমার সঙ্গে, কী করে বুঝব...। হঠাৎ দুই ব্যাকুল চক্ষু মেলে তিনি সামনে ঝুঁকে এলেন আরো, চাপা উত্তেজনায় বলে গেলেন, তুই চাস না, কিন্তু তোকে আমি চাইছি আমার সুবিধের জন্য, বুঝতে পারছিস না? ওদের আমি মনে মনে ভয় করি, দেবীটা এত ভালবাসে আমাকে, কিন্তু ওদের বোন বলে ওকেও আমার এক-একসময় সন্দেহ হয়। এ যন্ত্রণা তুই বুঝবি না। ওই বড়টার এত সাহস যে, কার কাছে আমাকে পাগল পর্যন্ত বলেছে—ওর জন্যে পাড়াপড়শী কেউ আর এ-বাড়ি মাড়ায় না—আমি ঠিক জানি ওরই জন্য। দুধ-কলা দিয়ে আমি কালসাপ পুষেছি, ওর বিষদাঁত আমি ভাঙব।

রাগে উত্তেজনায় এলোমেলো কথা বলে হাঁপাতে লাগলেন তিনি। মাসির এই মূর্তি দেখলে সিদুবাবুর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত খুব মিথ্যেও মনে হয় না। অপ্রকৃতিস্থই মনে হয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অসহায় আবার। হাত বাড়িয়ে তার একটা হাত ধরে ফেললেন, গলার স্বরে সমস্ত আকূতি ঢেলে ফিসফিস করে বললেন, তোকে দেখার পর থেকে আমার ভয়-ডর যে সব চলে গেছল রে কমল, রাতে ঘুমোতে পারছিলাম। একটু আগে বলছিলি মাসিকে ভালবাসিস, আমার জন্যে এখানে থাকতে পারবি না?

কমলেশ নির্বাক খানিকক্ষণ। জবাব দিতে পারল না, মাথা নাড়ল শুধু। পারব। মুখোমুখি বসে এর পরেও পারবে না বলার মত হৃদয়শূন্য কেউ হতে পারে না বোধ হয়।

মাসি কতটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনিই জানেন, কিন্তু কমলেশের চিন্তা বাড়ল। এ-রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হবে জানলে এখানে চাকরি নিয়ে আসত কিনা সন্দেহ। যত ভাবছে তত অস্বস্তি। মাসকাবার হলে আসবে মাসিকে কথা দিয়েছিল। অর্থাৎ আর তিনটে দিন বাকি। আর তিন দিন পরে সে বকুলবাড়ির বাসিন্দা হবে। মাসি খুশি হবেন। কিন্তু খুশি যারা হবে না, তাদের কথা মনে হতে যেতে মন সরে না। বলা বাহুল্য, এই অখুশির তালিকা থেকে দেবযানীকেও বাদ দিতে পারে নি সে।

একটা দিন গেল, কমলেশের অস্বস্তি একপ্রস্থ চড়ল। এমন কি কোনরকম বুঝ দিয়ে মাসিকে দিনকতক ঠেকিয়ে রাখা যায় কিনা, সে কথাও ভাবল।

রোজ একবার করে বকুলবাড়িতে হাজিরা দেবে আপাতত এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলেই বা কি হয়?

মোট কথা, সম্ভব-অসম্ভব অনেক চিন্তাই করল সে। আর যত ভাবল, ভিতরটা

তত তিক্ত হয়ে উঠতে লাগল। কতটুকুই বা সম্পর্ক, মাঝখান থেকে এই দুর্ভোগ তার কেন ?

সেদিন একটা পর্যন্ত ক্লাস ছিল। একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত ঘরে বসে কাটিয়েছে। মেঘলা আকাশ, রোদের তাত নেই। কমলেশ বেরিয়ে পড়ল।

একটা সঙ্কল্প মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের জোর থাকবে কিনা সে-সম্বন্ধে নিজেই খুব নিঃসন্দেহ নয়।

মেয়েদের স্কুলের গেট। এত আস্তে হেঁটেও হাত-ঘড়িতে মাত্র সাড়ে তিনটে। চারটের আগে স্কুল ছুটি হয় না। কিন্তু এই আধঘণ্টাই বা করে কি ? মেয়েদের স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটা খুব সুশোভন মনে হল না—শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর ছাড়পত্রও এ-যুগে অনেকের চোখে জলো। তাছাড়া তার কোনো ছাত্র এ-পথ দিয়ে গেলে পরদিন ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে হয়তো কিছু লিপিকারু ফলাবে।

মনে হতেই গেট দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে পড়ল কমলেশ। ছুটির পরেও তো এক দঙ্গল মেয়ে থাকবে, অন্য শিক্ষয়িত্রীও থাকতে পারে। মেয়ে পড়ায় না যখন, ক্লাস থেকে তো আর ডেকে আনতে হবে না। আত্মীয় পরিচয় দিয়ে অফিস থেকে ডেকে আনার সুবিধেই হয়তো বেশি।

কিন্তু ডাকতেও হল না, স্লিপ পাঠাতেও হল না। যে দৃশ্য দেখল, তা কমলেশ দেখবে বলে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু দেখে হঠাৎ মনটা খুশি হয়ে উঠল তার।

বাইরের আঙিনায় আমতলায় এক দঙ্গল মেয়ে ড্রিল করছে—দশ থেকে বারো বছরের মধ্যে সব। ড্রিল করাচ্ছে দেবযানী। সে মুখে নির্দেশ এবং মহড়া দিচ্ছে, মেয়েরা তাই করছে।

কমলেশ দাঁড়িয়ে পড়েছে। হাঁ করে দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দেবযানী ওদিকে ফিরে বলে তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু মেয়েরা এদিক ফিরে আছে এবং দেখছে তাকে। একজন লোককে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বভাবতই তাদের মনোযোগ ভঙ্গ হয়েছে।

সেটা লক্ষ্য করেই হয়তো দেবযানীও পিছন ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে বিব্রত। তারপর বিরক্ত। তারপর সেই চিরাচরিত গাম্ভীর্য। ইঙ্গিতে মেয়েদের অপেক্ষা করতে বলে শ্লথ পায়ে এগিয়ে এল।

কমলেশ প্রথমেই বিস্ময় প্রকাশ করল, আপনি ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টার ? যেন কি সে—এই জানতেই আসা !

আপনি এখানে যে ?

আশ্বস্ত হল।—আমার বিশেষ একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে, তাই বাইরে অপেক্ষা না করে ঢুকেই পড়লাম—

দেবযানী চেয়েই আছে মুখের দিকে। এইখানে যে মাসি নেই কমলেশ এটুকুর মধ্যেই তা অনুভব করে নিল। দেবযানী নিজের হাত-ঘড়িটা দেখল একবার। তারপর কিছু না বলেই তেমনি শিথিল গতিতে মেয়েদের কাছে ফিরে চলল। কমলেশ চোখ ফেরাতে পারে নি। কাঁধের আঁচল ঘুরিয়ে কোমরে আঁট করে জড়ানো, কোমরে একটা রুমাল গোঁজা, সেটা তুলে নিয়ে মুখের স্বেদবিন্দু মুছতে মুছতে মেয়েদের কাছে ফিরছে।

তাদের কি বলতে তারা লাইন ভেঙে ক্লাসের দিকে ছুটল। দেবযানী অদূরে যে ঘরের দিকে চলল সেটা বোধ হয় টিচারস্ রুম। একটু বাদে একটা ছোট ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এল, কোমরে জড়ানো আঁচল আবার কাঁধে উঠেছে।

পাশাপাশি গেটের দিকে এগোচ্ছে, কমলেশের উৎফুল্ল মুখ, কি প্রয়োজনে এভাবে স্কুলের মধ্যে এসে হাজির হয়েছে সে সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা নেই বলেই আরো বেশি সহজ হবার চেষ্টা। তার বিস্ময়ই যেন শেষ হয় নি—সত্যি আপনি ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টার একবারও ভাবতে পারি না, পড়ান না বলতে আমি ধরে নিয়েছিলাম অফিস ওয়ার্ক-টোয়ার্ক করেন।

উচ্ছ্বাসের বিনিময়ে পার্শ্ববর্তিনীর একটা নীরব শিথিল দৃষ্টিপ্রাপ্তি ঘটল শুধু। এবারে কমলেশ যেন উতলা একটু—কিন্তু সকাল থেকে এসেই আপনাকে এই ক্লাস নিতে হয় নাকি?

বিরক্ত হলেও নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরেই জবাব দেওয়া। বলল, সকালের দিকে ড্রইং-ক্লাস থাকে।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় যেন। গতি থামিয়ে কমলেশ প্রায় ঘুরেই দাঁড়াল। আপনি আর্টিস্টও নাকি? কই, কেউ বলে নি তো।

একে তো মেয়েদের ড্রিল করাতে দেখে ফেলেছে বলে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হযেছে, তার ওপর এই স্তুতির সুরও মেকি লাগছে কানে। দেবযানী একবার ঘুরে পিছনের দিকটা দেখে নিল। তারপর ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর আটকে নিয়ে বলল, আপনার উৎসাহিত হবার মত আর্টিস্ট নই, কোথায় যেতে হবে?

যতটা না তার থেকে আরো বেশি বিড়ম্বিত দেখাল কমলেশকে।—চলুন। এসে পড়ে আপনাকে বিরক্ত করলাম বুঝতে পারছি, কিন্তু কি যে করি—

গেট পার হল। ওদিকের একটা ছাপরা ঘর থেকে দারোয়ান উঁকি দিল। ছুটির আগে কে বেরোয় তার দেখা কর্তব্য। দেখল।

কোনো নির্দেশ না পেয়ে দেবযানী বাড়ির রাস্তায় দু'পা এগোলো। কোথায় যাবে কমলেশ জানে না, তবু দাঁড়িয়ে পড়ল।—ইয়ে বাড়িতে হলে তো সেইখানেই দেখা করতাম, কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো?

দেবযানী শান্ত ধৈর্যের প্রতীক যেন। বাড়ি এখান থেকে কাছে নয়, তার মধ্যে আপনার কথা শেষ হবে না?

কথা হবে, পরামর্শ হবে না...আপনার একটু পরামর্শ দরকার ছিল আমার। এদিকে কোনো রেস্তরাঁ-টেস্তরাঁ নেই?

নির্লিপ্ত দুই চোখ একবার কমলেশের মুখের ওপর বিচরণ করে নিল। আবারও ভয় ধরল, মাসির অনুপস্থিতিতে পরিস্থিতি বুঝি সম্পূর্ণ এই মেয়েরই দখলে।

আসুন।

কমলেশ হৃষ্টচিত্তে সঙ্গ নিল। আরো খানিক নিঃশব্দে এগিয়ে দেবযানী একটা সরু বাঁক নিয়ে যে রাস্তায় এসে পড়ল, তার ওধারেই গঙ্গা। এ-পথে রেস্তরাঁ কোথায় থাকতে পারে ভেবে পেল না। কিন্তু রেস্তরাঁর বদলে যেখানে তাকে নিয়ে আসা হল, তাও বেশ

মনঃপূত। গঙ্গার চওড়া বাঁধানো ঘাট একটা। দুদিক থেকে দুটো অশ্বত্থগাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ঘাটের ওপরে যেন চাঁদোয়া রচনা করেছে।

চমৎকার নিরিবিলি জায়গা তো! বে-ফাঁস আনন্দ জ্ঞাপন করে ফেলে কমলেশ ঘাটের সিঁড়ি ধরে বেশ খানিকটা নীচে নেমে এল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, পথচারীর কৌতূহলী দৃষ্টি এ পর্যন্ত আসতে পারে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়ল।

ধীর পদক্ষেপে দেবযানীও নেমে এল। এক সিঁড়িতে না বসে লাগোয়া উঁচু ধাপটায় বসল সে। তারপর হাত-ঘড়িটা একবার দেখে নিল। অর্থাৎ সময় অপচয়ের প্রয়োজন নেই, সে শোনার জন্য প্রস্তুত।

আর ভণিতা না করার মত বুদ্ধি কমলেশেরও আছে। নীচের ধাপে সে তার মুখোমুখি ঘুরে বসেছে।—সামনের মাসের গোড়া থেকে আমার আপনাদের বাড়িতে থাকার কথা হয়েছে, জানেন?

বাড়ি আমাদের নয়। কাকিমার। শুনেছি। তিনি সব ব্যবস্থাও করে রেখেছেন।

কমলেশ জোর দিয়ে বলল, আপনি দয়া করে সেই ব্যবস্থাটা বাতিল করার উপায় করতে পারেন? আমার সত্যিই ভয়ানক অসুবিধে হবে, আর আমি তা চাইও না।

কাকিমাকে বলুন। নিরুৎসুক জবাব।

তাঁকে যতদূর বলা সম্ভব বলেছি, সেদিন আমাকে চিঠি পাঠিয়ে আপনি ইচ্ছে করেই বাড়ি ছিলেন না বোধ হয়, থাকলে আমার দুরবস্থা দেখতে পেতেন। সেদিন যা করলেন তিনি, আমি আর কোন পথ পেলাম না—

তাহলে আর কি! আসুন। নিরাসক্ত উক্তি।

সেটা এত সহজ হলে কাউকে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি আমাকে এখানে থাকার জন্য বলছেন কেন?

একটা উষ্ণ অভিব্যক্তি গোপন করতে চেষ্টা করল দেবযানী। তবু খুব গোপন থাকল না। চোখে চোখ রেখে চুপ করে রইল একটু, তারপর সংযত স্বরেই বলল, আমাদের তিতি বিশ্বাস করেন না বলে। আপনাকে তিনি আপনার জন মনে করেছেন। দাদাকে আলাদা বাড়ি দেখার জন্য অনেকবার বলা হয়েছে, দাদা কানে তোলে না, এরপর হয়তো আমাকে একলাই অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

বিব্রত মুখে কমলেশ মাসির হয়ে ওকালতি শুরু করে দিল। তাড়াতাড়ি বলল, কিন্তু আপনাকে তো তিনি খুব বিশ্বাস করেন, একেবারে ছেলেবেলা থেকে আপনি তাঁর কাছে আছেন বললেন, নিজের মানসিক অবস্থা রোগে দাঁড়াচ্ছে বলে কাঁদলেনও—

সঙ্গে সঙ্গে রমণীর মুখভাবে একটু যেন নরম পরিবর্তন দেখা গেল। চোখের দৃষ্টি বদলাল, মুখখানা কোমল হল। সেই কয়েকটা মুহূর্তে কমলেশের মনে হল, অভিমান সত্ত্বেও ওই কাকিমার স্নেহ এই মেয়ের কাম্য।

কমলেশ আবার বলল, সে যাই হোক, আমার একটা রাস্তা বার করুন। আমি মাঝখান থেকে এই টানা-হেঁচড়ার মধ্যে পড়তে যাই কেন?

কণ্ঠস্বরও এবারে একটু নম্র শোনাল।—আপনার অসুবিধে কিসের?

ঘোরানো জবাব দিতে গিয়েও দ্বিধা কাটিয়ে কমলেশ সত্যি কথাটাই বলে

ফেলল।—দেখুন, আমার অসুবিধে সত্যিই কিছু নেই, এখানে আত্মীয়স্বজনও নেই কেউ, আপনাদের ওখানে গেলে বরং ভালই কাটে। কিন্তু গোড়া থেকেই আমার মনে হয়েছে, আমি যে ও-বাড়ি যাই সেটা এক মাসিমা ছাড়া আর কেউ পছন্দ করেন না। এমন কি আপনিও ভাবেন, আমি কিছু একটা স্বার্থ নিয়েই আনাগোনা করি। মাসিমার গাছ নিয়ে কি ব্যাপার আপনারাই জানেন, না গেলে গণেশ আসে, নয়তো আপনি আসেন, আর নয়তো আপনার চিঠি আসে। কিন্তু এর মধ্যে আমার স্বার্থটা কি থাকতে পারে?

খোলাখুলি আক্রান্ত হবার ফলে একটু আগের কমনীয়তা গেল। অভিযোগের সঙ্গে সে নিজেও জড়িত আর অভিযোগটা মিথ্যে নয় বলে হয়তো সহিষ্ণুতা কমল। দেবযানীও মন্তব্য করার মত করেই বলে বসল, আপনার মাসিমার সুনজরে থাকলে স্বার্থের প্রশ্ন একদিন উঠতেও পাবে।

এতক্ষণের ভালো লাগাটুকুর ওপর যেন একটা নীচু স্তরের ছায়াপাত ঘটল।

স্বার্থের স্থূল দিকটা এভাবে প্রকাশ হয়ে যেতে পারে ভাবেনি। কমলেশের হাসিই পেল, আশ্রয় এমনই জিনিস যে, সেটা হারানোর ভয়ে এই বয়সের এক মেয়েরও উদার হতে বাধা। সকৌতুকে তাকাল তার দিকে, আপনাদের তাহলে নিশ্চিন্ত কি করে করতে পারি তাই বলুন এখন—

জবাবে একটা রুক্ষ দৃষ্টির সম্মুখীন হল শুধু। নিরুত্তর।

কমলেশ তেমনি হাল্কা কৌতুকে বলে গেল, সেদিন পথে আপনার বড়দার সঙ্গে দেখা, রিকশ করে আপনার বউদির সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন। রিকশ থেকে নেমে তিনিও আমাকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। সুবিধে পেলেই সকলে সুবিধে নেবার লোক নয়, সেটা সেদিন আর তাঁকে বোঝানো গেল না। যাক, আপনি নিশ্চিন্ত হোন আর আপনার দাদাকেও নিশ্চিন্ত হতে বলুন। মাসিমাকে যা হোক কিছু বলে দেবেন—

মুখের ওপর নিবদ্ধ দৃষ্টিটা এবারে যেন সচকিত হল একটু।—আপনি আসছেন না?

না।

সে কথা তাহলে আপনি নিজেই বলে আসুন, আমি বলতে যাব কেন?

তিনি আঘাত পান তা চাই না বলেই বলতে বলেছিলাম, না বলতে চান বলবেন না। তিনি ধরে নেবেন একটা বাজে ছেলেকেই ভালো ভেবেছিলেন, ভাবুন—তাতে কিছু যায় আসে না। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

স্যাণ্ডেলজোড়া খুলে পা গুটিয়ে বসেছিল, পা নামিয়ে ও দুটো পরে নিল। অর্থাৎ, এবারে ওঠা যেতে পারে।

ইঙ্গিত সত্ত্বেও দেবযানী বসে রইল, চেয়েই রইল। সঙ্কল্প কতটা স্থির, তাই যেন বুঝতে চেষ্টা করল। গম্ভীর মুখের সঙ্কোচটুকুও উপভোগ্য। শেষে শান্তভাবেই বলল, আপনার আসাই উচিত।

কেন?

কাকিমার জন্য। আপনি আসার পর থেকে তাঁকে হাসতে দেখা গেছে। মনে হয়, তিনি ভালো থাকবেন। সেটা আমার কাছে অন্তত কম কথা নয়। আপনি আসুন। আমাদের

দিক থেকে যাতে আপনার অসুবিধে কম হয়, সে চেষ্টা করা যাবে।

নির্জন ঘাট। সামনে গঙ্গা। পরিবেশগুণে কিনা জানে না, কমলেশের মনে হল আজকের সাক্ষাতে এর থেকে বেশি আর বোধ হয় কিছু আশা করার ছিল না। শেষ পর্যন্ত নিজের লাভ-ক্ষতির চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছে, উদার হতে পেরেছে।

কমলেশ হাল্কা বোধ করছে। হাসছে মৃদু মৃদু। বলল, উঁহু, ওতেও হবে না। এক শর্তে যেতে পারি। আপনি অন্তত কখনো ভাববেন না আমার কিছুমাত্র স্বার্থ আছে।

দেবযানী চেয়ে আছে। দেখছে। গভীর কালো চোখ তার চোখে এসে মিলছে। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির আভাসের মতও দেখা গেল বুঝি। সামান্য মাথা নাড়ল। ভাববে না।

গুড চলুন।

কমলেশ বাতাস সাঁতরেই ঘরে ফিরেছিল কিনা জানে না। সে যে কলেজের মাস্টার, তাও মনে ছিল না। ওই গাম্ভীর্যের আড়ালে একদিন যে আবিষ্কারের বস্তু আছে মনে হয়েছিল, তার কিছু হদিস যেন আজ মিলছে। ঘরে ফিরে এই ভরা বিকেলেই বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল। স্কুলে মেয়েদের ড্রিল করানোর দৃশ্যটা চোখে ভাসছে। আর, গঙ্গার ঘাটের শেষের ওইটুকু। কমলেশ নিজের মনেই হাসছে অল্প অল্প।...মাসির প্রতি কৃতজ্ঞ। আর, বিকৃতি যদি কিছু থেকেই থাকে মাসির, তার প্রতিও।

॥ ৪ ॥

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা মনের দিকে চেয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, আর কিছু না করো তো চুপচাপ বসে বাগান করো। অর্থশূন্য উক্তি যে নয়, ক'টা দিনের মধ্যেই কমলেশ অনুভব করল। শুধু কমলেশ কেন, অনুভব সকলেরই করার কথা। এই এক বাগান করার উৎসাহ আর উদ্দীপনায় বকুলবাড়ির বহুদিনের একটা রুক্ষ অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া যেন সচকিত হয়ে উঠল। বকুলবাড়িতে খোলা দক্ষিণের হাওয়া এসে লাগল।

সিদুবাবু আর বীরুবাবু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বীরুবাবু লোকটা এমনিতে কৌতুকপ্রিয়, তার স্ফূর্তিও একটু বেশি। কিন্তু বিষয়-আশয়ের ব্যাপারে বা মগজ চালনায় অগ্রজের ওপর তার গভীব আস্থা। ফলে তার ভালো লাগলেও জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চেয়েই সে-ও ব্যাপার-গতিক সুবিধের মনে করল না। ওদিকে গণেশচন্দ্রর কাজ বিলক্ষণ বেড়েছে, সপ্তমীরও কিছু বেড়েছে, সপ্তমী একদিন গজগজ করে উঠতে কর্ত্রী ঠাকরুণের কাছে গিয়েছিল। তিনি শুধু একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলেন তার দিকে। তারপর থেকে তারাও শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছে, আর নিতান্ত নিরাপদ নির্জনতা ভিন্ন মুখ খোলে নি।

দেবীও থেকে থেকে কাকিমাকে লক্ষ্য করে। জ্ঞান-বয়সে এই যেন প্রথম তার ভেতরটি দেখতে পাচ্ছে সে। তিনি যেন শক্ত মাটির ওপর দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছেন আবার। ওই একটি লোক বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যেন অনেক জোর বেড়েছে। দেবযানীর প্রতি তাঁর বকাবকিও বেড়েছে একটু, আবার সেই সঙ্গে তার প্রতি লক্ষ্য আর

যত্নও যেন একটু। দেবযানী সেটুকু অনুভব করতে পারে, আগে বকতে পারেন মনে হলেই ভয় ধরত, অথচ এখন বকলেও অত ভয় করে না। এই বকাঝকার তলায় তলায় সে অন্তত একটা প্রীতির আমেজ উপলব্ধি করতে পারে। বহুকাল এক চিন্তায় অভ্যস্ত হওয়ার দরুন অগ্রজের দুশ্চিন্তা তাকেও একেবারে যে স্পর্শ করে না, তাও না। কারো প্রতি কাকিমার এত প্রসন্নতা সে-ও এক এক সময় সন্দেহের চোখেই দেখে, আবার গঙ্গাঘাটের শর্তের কথা মনে পড়লে মন থেকে তা ছেঁটে ফেলতেও চেষ্টা করে।

কমলেশ বাগান করার থেকে বাগান করার আড়ম্বরটাকে চারগুণ ফাঁপিয়ে তুলেছে। মাসিমা একসঙ্গে চার-পাঁচটা লোক লাগিয়ে পিছনের জমিটা কয়েক দিনের মধ্যেই একেবারে সাফসুফো করে ফেলেছেন। দেখতে দেখতে জমি চষাও সারা। তারপর কমলেশকে বলেছেন, এখন তুই হেড মালী, যা করার কর।

হেড মালীর মর্যাদায় কমলেশ তক্ষুনি গম্ভীর, দেবযানীকে শুনিয়ে জবাব দিয়েছে, ঠিক আছে, এবারে ছোট মালী-মালিনীরা কথা না শুনলে রক্ষে রাখব না।

ভাব-ভঙ্গি দেখে মাসি হেসেছেন, তুই বীরুর থিয়েটারের দলে ভর্তি হয়ে যা।

জমিতে সার ফেলার পর বাগান কি রকম হবে না হবে, তাই নিয়ে সরগরম আলোচনা চলল কয়েকদিন। মাসি প্রস্তাব দিয়েছেন, এখানেও আর একটা বকুলগাছ হোক।

কমলেশ তখুনি প্রস্তাব নাকচ করেছে, তুমি এক বকুল ছাড়া আর কিছু চেনই না, হেড মালীর ওপর হস্তক্ষেপ কোরো না।—দেবী!

হঠাৎ নাম ধরে গম্ভীর ডাক শুনে দেবযানী বিস্মিত নেত্রে তাকিয়েছে, মাসির একটু অন্যরকম লেগেছে কানে। গণ্ডগোলটা যেন তাদের দিকে তাকিয়ে খেয়াল হয়েছে কমলেশের।—এই যাঃ! ওটা মানে—দ্বিতীয় দেবী, নামের পরের দেবী। বক্তব্যে ফিরে এল, আপনি আর্টিস্ট, বাগানটা কি-রকম হলে হয়, অর্থাৎ আপনার মনে যা আছে আপনি তার একটা ছবি এঁকে ফেলুন দেখি দেবী, তারপর বিবেচনা করা যাবে।

আমার মনে কিছু নেই। দেবীর সাফ জবাব।

মাসি বললেন, তাহলেই তোর বাগান করা হয়েছে।

কমলেশ মন্তব্য করেছে, হেড মালীর অবাধ্য হতে শুধু মেয়েরাই পারে, যাক কিছু বললাম না।

এরপর তাড়াতাড়ি করেই যেন দেবীকে খাটাতে চেষ্টা করেছে কমলেশ।—এই বীজগুলো এভাবে ছড়িয়ে দিন, ধুপ-ধুপ করে ফেলবেন না, মেয়েদের কিছু বিশ্বাস নেই।

এই চারাগুলো ওই সারিতে লাগিয়ে আসুন, বেশ ফাঁক ফাঁক করে লাগাবেন, মেয়ে অ্যাসিস্টান্ট নিয়ে হয়েছে বিপদ, সবই বলে দিতে হয়।

মুখের ওপর একটা তির্যক দৃষ্টি ছুঁড়ে দেবযানী এ-কাজও করেছে।

এই জলের ঝাঁঝরিটি নিয়ে ওই ওধারের সারিটায় জল দিয়ে আসুন তো। আবার নাইয়ে দেবেন না একেবারে—মেয়েদের কাজের কথা বললেই মুখের অবস্থাখানা দেখছ মাসিমা—

দেখুন, মেয়ে মেয়ে করবেন না বলছি, ওই তো ওদিকে গণেশ বসে আছে, তাকে দেখতে পান না?

কমলেশ যেন বিমূঢ় খানিকক্ষণ। তারপর ঘোষণা করল, আমি হেড মালীগিরিতে ইস্তফা দিলুম মাসিমা, মেয়েদের মেয়ে পর্যন্ত বলা চলবে না এমন তাজ্জব কথা শুনি নি।

মাসি হাসি চাপতে চেষ্টা করেছেন, শেষ পর্যন্ত পারেন নি। লঘু বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, তোরা ঝগড়াই কর তাহলে। ভাসুরঝির দিক টেনেই বলেছেন। আর তুই-ই বা ওর পেছনে এত লাগিস কেন?

কমলেশের দু'চক্ষু টান।—পক্ষপাতিত্ব! আচ্ছা, হেড মালী যাবে তবু গণেশ আসবে না। বলে নিজেই ঝাঁঝরি তুলে নিয়ে হন হন করে জল দিতে গেছে।

মুখ দেখলে মনে হবে, এই বাগানের সঙ্গে দেবযানীর মনের কোনো যোগ নেই। শুধু মাসির দায়েই আসা, বসা। কিন্তু সেদিন খুব সকালে কমলেশের ঘুম ভেঙে যেতে কমলেশ উঠেই পড়েছিল। ভিতরের বারান্দায় জানালায় দাঁড়িয়ে একটা দৃশ্য দেখেছিল সে। সকালে জল দেবার কথা গণেশের। কিন্তু ঝাঁঝরি হাতে ঘুরে ঘুরে নিবিষ্টমনে জল দিচ্ছে দেবযানী—গণেশ দ্রষ্টার মত দাঁড়িয়ে শুধু।

ভোরের শুচির আলোয় দৃশ্যটা দেখার মতই যেন। কমলেশ নড়তে পারে নি।

একপ্রস্থ জল দেওয়া শেষ হতে দেবযানী ঘুরে দাঁড়িয়েই ঝাঁঝরি ফেলে দিয়ে প্রস্থান। ধরা পড়তে নিজের উপরেই বিরক্ত যেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে চা দিতে এল। গোড়ায় গোড়ায় সপ্তমী দিচ্ছিল।

কমলেশ তখন আবার ওকে শুনিয়ে সপ্তমীর চায়ের ত্রুটি ধরেছে। দু'চার দিন শোনানোর পরেও ফল হয় নি দেখে শেষে বলেছে, সকালের চা-টা আর নাই খেলাম, যা চা, গলা দিয়ে আর নামতে চায় না। অবশ্য মন্তব্যটা আবার সপ্তমীর কানে না যায় এইভাবেই বলেছে।

তারপর থেকে দেবযানীই দিচ্ছে। আর কমলেশের পরিতৃপ্তির ঘটা দেখে মনে হয়েছে, এমন চা যেন আর জীবনে খায় নি।

সেদিন চা দিতে এলে অন্যদিকে চোখ রেখে কমলেশ মন্তব্য ছুঁড়ল, আজ সকালে ঠাণ্ডা ছিল, জল খেয়ে গাছগুলোর বোধ হয় গঙ্গা-প্রাপ্তি ঘটল।

দেবযানী তেমনি জবাব দিল, গাছগুলোকে কাল থেকে জল না খাইয়ে গরম চা খাওয়াব তাহলে।

দুবেলা, বিশেষ করে রাতে খাওয়ার সময় বাড়তি দুই একটা বাটি দেখেই কমলেশ অনুমান করতে পারে ওই বস্তু কোথা থেকে এল। তবু নিরীহ মুখে সপ্তমীকে কখনো বলে, এত করলে কখন? কখনো বা বলে, এত করতে গেলে কেন?

যেদিন মাসি থাকেন সামনে মাসি বলেন, নয়তো সপ্তমী জানায়, এই দুটো ও-ঘর থেকে দিদিমণি পাঠিয়েছে—

সেদিন ওই কথা বলতেই সপ্তমী তিক্ত-বিরক্ত।—জানি না বাবু, রোজ রোজ বাটি পাঠাবেন, আবার বললে দোষ হবে। আপনি জিগ্যেস করলে আমি কি মিছে কথা বলব?

কমলেশ আর জিজ্ঞাসা করে নি। জীবনের এই বৈচিত্র্যের স্বাদ গ্রহণ করেছে শুধু।

আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে ছায়াপাত ঘটে নি এমন নয়। সিদুবাবুর হাবভাবে অনেক সময় বিড়ম্বিত বোধ করেছে। বীরুবাবুর হাসি-ঠাট্টাও নিছক কৌতুক মনে হয় নি সব সময়। তাছাড়া হিসেবপত্র নিয়ে মাসির ক্ষোভ কানে এসেছে যখন, তখনো কম বিব্রত বোধ করে নি। প্রথম প্রথম বোঝে নি, সিদুবাবুর টাকা-পয়সা দেওয়া নিয়েই মাসির সংশয় কিসের। আবার, ফল-মূল,—তার কমতি হলেও মেজাজ চড়তে দেখেছে। হিসেব বা পাওনাগণ্ডার ব্যাপারে মাসিটিকে দস্তুরমত কড়া মনে হয়েছে—নাকের ডগায় চশমা এঁটে কি সব হিসেব দেখেন।

তাই মাসকাবারে কমলেশ বেশ ভয়ে ভয়ে পঁচাত্তরের বদলে একশো টাকাই দিয়ে দিতে গিয়েছিল মাসির হাতে।

টাকা দেখে মাসি অবাক।—কিসের টাকা? টাকার অঙ্কের ব্যাপারে কমলেশ আশ্বস্ত হয়েছে। বা রে, দিতে হবে না?

সেই একদিনের কথা মাসির মনে পড়েছে বোধ হয়। গলা খাটো করে ফিসফিস করে বলেছেন, সেদিন দেবী ঘরে ছিল বলে ওই কথা বলেছিলাম, ভাইয়েরা জানবে আমি টাকা না নিয়ে কাউকে থাকতে বলছি না। তোকে টাকা দিতে হবে না।

কমলেশ সজোরে মাথা ঝাঁকিয়েছে, তাহলে আমি আজই চললাম এখান থেকে। যেভাবে আছি একশো টাকাতেই হয় নাকি?

মাসি গম্ভীর। তোর মায়ের কাছে থাকলে দিতিস?

দিতুন না তো কি! আমরা না দিলে মা খরচ চালাবে কোথা থেকে?

মাসি হাসলেন, তোর মায়ের না হয় রোজগার নেই, আমার আয় কম ভাবিস নাকি? আচ্ছা দে—। হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে বলেছেন, তোর বউয়ের জন্য তোলা থাকবে, তোর কাছে থাকলেই তো ওড়াবি।

মাসির এই আয়ের দিকটা কমলেশ ক্রমশ জেনেছে—কিসের এত হিসেব-নিকেশ তা-ও। শুধু এই কেন, বকুলবাড়ির সম্বন্ধে অনেক কিছুই জেনেছে সে। কখনো মাসি গল্প করেছেন, কখনো বাধ্য শ্রোতার মত গণেশচন্দ্রর গালগল্প শুনেছে, আর কিছু বা নিজে অনুমান করেছে।

মেসোমশাইয়ের এটা পৈতৃক বাড়ি। ওই এক ছেলে, অবস্থা ভালো ছিল। বাজারের ওপর দোকানঘর আছে পাঁচ-ছটা। তাছাড়া তাদের হাটের জায়গায় হাট বসে বলে নগদ ছাড়াও 'তোলা' পান। সপ্তমী অথবা গণেশ তোলা আদায় করে নিয়ে আসে। ভাড়া-টাড়া আদায়ের দায়িত্ব সব সিদুবাবুর। একবার মাসির খুব অসুখ করেছিল, অনেক কাল আগের কথা, মাসি তখন এই সব দেখাশুনা এবং আদায়ের পরোয়ানা তাঁকেই লিখে দিয়েছিলেন। দিয়ে এখন মনস্তাপী হয়েছেন,—সারাই, মেরামত, এটা-সেটার জন্য যা খরচ হয় তাতে মাসির সংশয়। তার হাত থেকে সব নিয়ে নিতেও পারছেন না, নিলে সব দিক দেখাশোনা করে কে? একবার বলেছিলেন বলে সব কাগজপত্র সিদুবাবু নাকি তাঁর হাতে ফেলে দিয়ে বলেছিল, সে আর কোন কিছুতেই নেই। ছোটটার, অর্থাৎ বীরুবাবুর হাতে দিলে সে তো সব থিয়েটারে ঢালবে। তাছাড়া, মামলা-মোকদ্দমাই বা সামলায় কে, দোকান-ভাড়াটেরা বেশির ভাগই হাড়বজ্জাত।

তারপর খানিকটা ইতিবৃত্ত গণেশচন্দ্রের মুখে শোনা। গণেশচন্দ্রকে বলেছে সপ্তমী। আর, সপ্তমী পাড়াপড়শীর মুখ থেকে সমাচার সংগ্রহ করেছে। কারণ, বিধবা কর্ত্রীর কপালে সিঁথিতে সিঁদুর আর লালপেড়ে শাড়ি দেখে সে-ও তো কম অবাক হয় নি।

মেসোমশাই মারা যেতে দুটো বছর মাসির নাকি একেবারে মুহ্যমান অবস্থা। মাথা খারাপ হয়ে গেল কিনা এই সন্দেহও নাকি হয়েছিল অনেকের। সন্দেহ বদ্ধমূল হল কারো কারো হঠাৎ তাঁর আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে। বলা নেই কওয়া নেই বাড়ি থেকে সব থান-টান দূর করে দিলেন। শাখা-সিঁদুর পরলেন, চওড়া চওড়া লালপেড়ে শাড়ি আনালেন—দু-বছর মাছ না খাওয়ার দরুন কেবল মাছটাই ছুঁলেন না। বাড়িতে তখন জাঁকিয়ে বসেছে মাসির বড় ভাইয়ের ছেলেরা, তারাই তো কর্তা তখন। সেই ভাইপোরা তো মাসিরই সমবয়সী প্রায়।

কিন্তু তারপর থেকে সিঁদুর আর লালপেড়ে শাড়ি দেখে যারা পাগল ভেবেছিল, তারা আবার অবাক হল। বিষয়-আশয়ের ভার মাসি সব আবার নিজের হাতে তুলে নিলেন, আর বুদ্ধিমতীর মত চালাতে লাগলেন। ভাইয়ের ছেলেরা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। ঠাকরোণ তাদের তাড়িয়ে ছেড়েছেন।

ভাইয়ের ছেলেদের তাড়ানোর কাহিনী সখেদে মাসিই বলেছিলেন একদিন। বলেছিলেন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছিলেন, সেই কাঁটাই আবার এখন বিঁধছে। শুধু মেয়েটাকে রেখে আর সব দূর করে দিলে নাকি ঠিক হত। কিন্তু তিনি সেই ভুলটা অনেক দেরিতে বুঝেছেন।

ভাইয়ের ছেলেরা সব কিছু গ্রাস করতে চেয়েছিল। তাঁকে দিয়ে সব লিখিয়ে-পড়িয়ে নেবার ব্যবস্থাও করে এনেছিল। এমন কি বেগতিক দেখে নিজের পিসির নামে দুর্নাম পর্যন্ত রটাতে শুরু করেছিল ওই পাজিরা। এমন দিনে অসহায় এই তিন ভাই-বোন তাঁর আশ্রয়ে এসে পড়ে। জ্যাঠতুতো ভাসুরের ছেলে-মেয়ে—বংশেরই। ভাই দুটো তখন ষণ্ডা-গুণ্ডা, বোনটা ছোট। মাসি তখন তাদের আঁকড়ে ধরলেন, তাঁর প্রশ্রয়ে ওই দুই ভাই-ই নিজের ভাইপোদের তাড়াবার ব্যবস্থা করল। ওদের নামে তাঁর কাছে তারা নালিশ করতে তিনি সাফ জবাব দিলেন, তোমরা চলে যাও, ওদেরই তো সব, তোমাদের জন্যে বংশের ছেলেমেয়েদের তো আর তাড়াতে পারি না।

শেষে ওদের আর ওদের বন্ধু-বান্ধবের দাপটে একরকম ভয় পেয়েই ভাইপোরা বিদায় হয়েছে। মাসির তখন বাড়ি-ঘর বিষয়-আশয় রক্ষা করার চিন্তা। বড়টা অর্থাৎ, সিদুবাবু তখন তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছে—কলেজের পড়া শেষ করে আইন পড়তে অনেক দেরি, মাসি বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে মোক্তারি পড়তে লাগিয়ে দিলেন। এই মোক্তারি পড়েই ছেলেটা নাকি অন্যরকম হয়ে গেল, এখন আর কি খাবে সেই দিশা। মাসির অমতে বিয়েও করেছে এক উকিলের মেয়েকে, বউ তো বছরে পাঁচ মাস থাকে বাপের বাড়ি—এখন উকিল শ্বশুরই মস্ত সহায় তার, তার সঙ্গেই যত ফিসফিস, গুজগুজ। মাসির ধারণা, উকিল শ্বশুরই এখন পরামর্শ দিয়ে চালাচ্ছে বড়টাকে।

দুই ভাইয়ের সম্পর্কে কিছু বলতে হলে মাসি বড়টা বা ছোটটা ভিন্ন অন্য উক্তি বড় করেন না।

গণেশের ধারণা, কমলেশ বকুলবাড়িতে আসার ফলে সব থেকে সুবিধে হয়েছে বীরুবাবুর। বাড়ির মধ্যে বীরুবাবু কেবল ধার চায় না মা-ঠাকরোণের কাছে আর সপ্তমীর কাছে। গণেশ এযাবৎ তাকে অনেক ধার দিয়েছে, অবশ্য তার ধার বীরুবাবু শোধও করে, মাসকাবার হলেই নিজে ডেকে চুকিয়ে-বুকিয়ে দেয়। বেশি ধার নেয় দিদিমণির কাছ থেকে। এ নিয়ে ভাইবোনে ঝগড়া লেগেই ছিল। এখন দিদিমণিকে আচ্ছা জব্দ করেছে বীরুবাবু। না দিলেই বলে, তবে কমলবাবুর কাছে চেয়ে দেখি পাই কিনা, খুব দরকার—

ব্যস, দিদিমণি রাগে জ্বলতে জ্বলতে মুখ বুজেই দিয়ে দেয়।

কমলেশের মনে পড়ল, দেবযানীর সামনে বীরুবাবুকে দুই-একবার বলতে শুনেছে, আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল কমলবাবু—আচ্ছা, পরে বলব'খন—

দেবযানীকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখেছে বটে, কিন্তু তখন জানা ছিল না বলে তার রুষ্ট গাম্ভীর্যের কোনো মর্ম উদ্ধার করতে পারে নি। বরং মনে মনে এই ভেবে তুষ্ট ছিল যে, পাছে এ-বাড়িতে আছে বলে তাকে কিছু বলে বসে কেউ এটাই তার শঙ্কার কারণ।

কিন্তু গণেশের মুখ থেকে এ-কথা শোনার পরেও দুই-ভাইয়ের মধ্যে বীরুবাবু লোকটাকে খারাপ লাগত না তার। অনেক খোলা মনের মানুষ মনে হত। বড় অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সুযোগের আশায় গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রায়ই কলকাতায় যায়। দেখা-সাক্ষাৎ ধরপাকড় করে। কমলেশ প্রথমে ভেবেছিল, সামান্য মাইনে পায় এই জন্যেই বোধ হয় খরচে কুলোতে পারে না। কিন্তু ক্রমশ জানল, সংসারেও সে কিছু দেয়ই না বলতে গেলে। গোড়ার দিকে দাদার হাতে যা দেয়, মাস শেষ না হতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাদার কাছ থেকে হাত পেতে একটু একটু করে তার অর্ধেকেরও বেশি আবার চেয়ে নেয়। তার থিয়েটারের দলের পিছনে পৃষ্ঠপোষক আছে, তবু এত টাকা কেন লাগে ভদ্রলোকের—কমলেশ ঠাওর করতে পারে না।

কলকাতা থেকে ফিরলেই কমলেশ জিজ্ঞাসা করে, কিছু সুবিধে হল?

বীরুবাবু কোনদিন বিরক্ত মুখে জবাব দেয়, ঘোড়ার ডিম হল। কোনদিন বলে, সব শালার পা তেল দিয়ে চুপসে দিলাম, কেউ দয়া করে এক সীনের রোল দিতে চায়, কেউ দেড় সীনের। গোটাগুটি একটা বড় রকমের কিছু না পেলে এর ওপর ভরসা করে চাকরি ছাড়া যায়?

কমলেশ মাথা নাড়ে, তা যায় না বটে।

আর একদিন তাকে ভালই লেগেছিল কমলেশের। খুশি মুখে ফিরতে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল, সুখবর আছে মনে হচ্ছে?

এখন বীরুবাবুও তাকে খানিকটা সদয় চোখে দেখে, তার কারণ, এ সব আলোচনা সে ঠাট্টা ভাবে না। গোড়ায় গোড়ায় ভাবত। এখন খানিকটা গুণমুগ্ধ এবং সহানুভূতি-সম্পন্নই মনে করে। তাদের একটা নাটক দেখে সে খুব প্রশংসা করেছিল, সময় পেলে বসে নিবিষ্ট মনে রিহার্সাল শোনে, স্পষ্ট করে নিজের মতামতও জানায়—এই সবই ঠাট্টা হতে পারে না। তাছাড়া একজন কলেজের প্রফেসর ধৈর্য-সহকারে তার সব বক্তব্য শোনে এও একটা খুশির কারণ।

হ্যাঁ—মানে, আমার কিছু হয় নি, শ্যামলের ছোটখাটো একটা হয়েছে—একটা ছবিতে চারদিনের কন্ট্রাক্ট।

শ্যামল বীরুবাবুর দলের সব থেকে প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন অভিনেতা। তার একনিষ্ঠ শিষ্য এবং ভক্ত। ডানহাতের ক'টা আঙুল ইলেকট্রিক শকে দুমড়ে যাওয়ার পর থেকে অভিনয়-চর্চা নিয়ে আছে। বীরুবাবু অনেকবার ঘোষণা করেছে, দেখবেন সব শালারা ওই শ্যামলের পায়ে তেল দিয়ে বেড়াবে একদিন।

সেই শ্যামলের কিছু হওয়ার খুশিতে এই খুশিমূর্তি দেখে কমলেশের মন্দ লাগে নি।

এ বাড়িতে ঢোকার দ্বিতীয় মাসের শেষে পনেরো দিনের মধ্যে পর পর দুটো ঘটনা ঘটল, যার উত্তাপ চেষ্টা করেও কমলেশ কমাতে পারল না। দুটিই মিষ্টিমাসির আর্থিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ঘটনা। একটির আসামী বীরুবাবু, অপরটি সিদুবাবু।

প্রথম ঘটনাটি ঘটনা হিসেবে সামান্য। এ-রকম আগেও ঘটেছিল শুনল কমলেশ। কিন্তু সিদুবাবু এমন কি দেবযানীরও হয়তো ধারণা, কমলেশের এখানে অবস্থানের জোরেই মাসি অমন নির্দয় রকমের ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পেরেছেন। যদিও দিন না যেতে সে-ই তাকে ঠাণ্ডা করেছে, তবু তার প্রতি একটা সন্দেহ সিদুবাবু প্রায় স্পষ্ট প্রকাশ করেছে।

হাটের তোলা কম আসছে এ নিয়ে প্রায়ই গজগজ করতে শোনা যেত মাসিকে, এই নিয়েই তুমুল কাণ্ড একদিন। তাঁর হাটের জায়গায় যারা বসে, মাসি অতর্কিতে একদিন সেই ব্যাপারীদের ডেকে পাঠালেন। খুব সম্ভব সপ্তমীকে দিয়েই ব্যবস্থা করেছেন। এমন দিনে ডাকলেন, যখন দুই ভাইয়ের কেউ বাড়ি নেই। তাদের শাসালেন, তাঁর জায়গায় আর তাদের বসতে দেওয়া হবে না।

বেগতিক দেখে তারাও উল্টে চোখ রাঙাল, তোলা কম হবে না তো কি, বীরুবাবু তো ফি হপ্তায় দুই হাটেই তোলার বদলে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে ছাড়ে। আবার চোখ রাঙায়, ঠাকরোণ জানলে গর্দান নেবে—তারা গরীব মানুষ, তারা কি করবে?

ব্যস্, ভাইয়েরা ফিরতে সেই বিকেলে মাসির চণ্ডীমূর্তি। বীরুবাবুকে যেভাবে আর যে ভাষায় কটূক্তি করে বাড়ি থেকে তাড়াতে চাইলেন তিনি, শুনে কানে আঙুল দিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাবার কথা। বর্ষণ সম্পূর্ণ হবার আগে বীরুবাবুও অবশ্যই পালাল, কিন্তু সে তার নিজের ঘরে।

কিন্তু মাসির উগ্র গর্জন সহজে থামল না, চোর থেকে চরিত্রহীন পর্যন্ত সবই বললেন তিনি বীরুবাবুকে, আর স্পষ্টই ঘোষণা করলেন, এর পরও ওকে যারা বাড়িতে ঠাঁই দেবে তারা সকলেই যেন পত্রপাঠ বিদেয় হয়।

সিদুবাবু শান্ত, ঠাণ্ডা। বীরুবাবু নির্বিকার। দেবযানীর মুখ অন্ধকার।

কিন্তু সিদুবাবুকে যতটা শান্ত দেখাল, ভিতরে ভিতরে ততটা শান্ত যে নয় সেটা বোঝা গেল পরদিনই। কমলেশের মনে হয়েছে, আড়ে আড়ে সে অনেকবার তাকে লক্ষ্য করেছে। শেষে একসময় তার ঘরে এসে দাঁড়াল। মোলায়েম করেই জিজ্ঞাসা করল, পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত নাকি?

না, বসুন—

সিদুবাবু বসল। আর ভণিতা না করেই বলল, স্বভাব-চরিত্র মন্দ হলে নিজের ভাই বলে আমি খাতির করতুম না, নেশার মধ্যে এক বিড়ি খায় আর থিয়েটার করে অথচ কাকিমা কি না বললে কাল।

কমলেশ জিজ্ঞাসা করল না, অন্যের প্রাপ্য এভাবে আত্মসাৎ করাটা সৎ-চরিত্রের মধ্যে পড়ে কিনা, বা অন্য নেশা-টেশা যখন নেই, তার এত টাকার দরকারই বা কেন হয়। মাসির একদিনের একটা মন্তব্য শুধু মনে পড়ল, কি কারণে তখন মেজাজ খুবই প্রসন্ন ছিল। বলেছিলেন, বড়টা যত কু-চক্রীই হোক ওই হতচ্ছাড়া ছোটটার ওপর টান খুব—জগাই-মাধাই ছিল তো দুজনে। তবে, যে শ্বশুরের পাল্লায় পড়েছে এ টানও যে বেশিদিন থাকবে না সেই ভবিষ্যদ্বাণীও মাসি এক মুখেই করেছিলেন।

সিদুবাবু বলল, ক'টাই বা টাকা, কাকিমা আমাকে ডেকে বললেই আমি দিয়ে দিতাম।...আগেও এ-রকম একবার হয়েছিল, আশ্চর্য—কাকিমা তখন এতটা করে নি।

'আশ্চর্য' শব্দটা খট্ করে কানে লাগল কমলেশের। অর্থাৎ যে অন্যায় একদিন আরো সহজে সহ্য হয়েছিল, তাই আজ এত অসহ্য হল কোন জোরে বা কার জোরে? কিন্তু কমলেশের এই মুখ প্রায় নির্বোধের মুখ। তার কানে ঢুকলেও মগজে কোনো ইঙ্গিত ঢোকে নি যেন।

ফলে সিদুবাবুর বিস্ময় আরো একটু স্পষ্টতর হল। সপ্তমীকে দিয়েই বোধ হয় ওদের ডাকিয়েছে কাকিমা, কিন্তু একেবারে মুখের ওপর এ-সব বলে গেল ওদেরই বা এত সাহস হল কি করে—বীরুকে তো ভয়ই করত সকলে।

এরও সাদা অর্থ, সপ্তমীকে দিয়ে ডেকে আনলেও আর কারো কাছ থেকে তারা বল-ভরসা পেয়েছে এ-রকম সন্দেহই সিদুবাবু করছে। কমলেশের রাগ হলেও মুখে তা প্রকাশ করল না। সাদাসিধেভাবে বলল, ভয় করলেও উপোস করতে হবে জানলে ভয় আর থাকে না বোধ হয়। তাছাড়া ব্যাপারটা সত্যি হলে বীরুবাবু কাজটা তো ভালো করেন নি—

মুহূর্তের জন্য মনে হল সিদুবাবু কঠিন উক্তিই কিছু করবে এবার। কিন্তু তা না করে একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে এলেন। মোলায়েম প্রশ্ন করলেন, তারপর আপনার গাছের খবর কি, বাঁচবে মনে হয় ওটা?

বোধ হয় না।

আপনার মাসিমাকে বলেছেন?

না। বাগান করে তাঁর মনটা ওদিক থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ঠিক পারা যাচ্ছে না।

ও...। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির আভাসও দেখা গেল। উঠল,—আচ্ছা।

দরজার দিকে একটু এগিয়েও আবার ফিরল, এখানে আপনার অসুবিধে হচ্ছে না তো কিছু?

না, খাসা আছি।

দেখুন, ক'দিন থাকতে পারেন, এদিকের অবস্থা তো দেখলেন, কখন কার ওপর খড়্গহস্ত হন ঠিক নেই। এককালে ওঁর ভাইয়ের ছেলেদের এখানে এনে রেখেছিলেন,

শেষ পর্যন্ত তারাও টিকতে পারেনি।

অর্থাৎ মাসিকে উপলক্ষ দাঁড় করিয়ে প্রকারান্তরে তাকেও সতর্ক করে দেওয়া হল। কমলেশ হাসিমুখে জবাব দিল, না থাকতে পারলে চলে যাব তার আর কি—

সিদুবাবু ঘর থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে হাসি পেল। সিদুবাবু একটা ভুল করে গেল। যাকে সতর্ক করা হল, তার সদাপ্রসন্ন মূর্তিটাই দেখেছে, একরোখা গোঁয়ার মূর্তিটা দেখে নি। অবশ্য সে মূর্তিও বাইরে প্রসন্নই। সে অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে কমলেশ একটা সঙ্কল্প করে ফেলল। মাসি এই একজনকে ভয় করেন নিজের মুখেই বলেছেন। এই ভয় তাড়ানোর জন্যই তাঁর এত দাপট, এত উগ্র কর্ত্রীত্ব। আর এই জন্যেই ব্যাকুল আগ্রহে তাকে এখানে নিয়ে আসা। কমলেশ স্থির করল, মাসি না চাইলে এখান থেকে যাবে না। যে আকূতি নিয়ে তিনি ওকে এখানে এনেছেন, সেটা ভোলবার নয়। তাঁকে আবার হতাশার মধ্যে ফেলবে না।

এই সঙ্কল্প না করলে সেই সন্ধ্যায়ই তার বাক্স-বিছানা গোটাবার কথা।

বাইরে থেকে ফেরার সময় খোলা জানলা দিয়ে দেখল, বীরুবাবু নিজের ঘরের একটা ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে শুয়ে আছে। কি ভেবে তার ঘরেই গেল। সে-ই কিছু গণ্ডগোল পাকিয়েছে ভেবেছে কিনা তা বোঝার জন্যেই হয়তো। লোকটা এভাবে মুষড়ে পড়ে আছে দেখেও হতে পারে। কমলেশ একমাত্র তার ঘরেই যখন-তখন আসে, বসে আড্ডাও দেয়।

কি ব্যাপার, এসময়ে ঘরে যে, ক্লাবে যান নি?

বীরুবাবু খুব ধীরভাবে তাকে দেখল, একটু নড়ল-চড়ল না।—গেলে আপনার কিছু সুবিধে হয়?

কমলেশ মাথা নাড়ল, যান নি বলেই তো সুবিধে হল, আড্ডা দিতে এলাম—

অভিনয় করে বলেই হয়তো বীরুবাবু কণ্ঠস্বরের সংযম শিখেছে। নিরুত্তাপ গলায় বলল, দেখুন মশাই, আমি লোকটা খুব সুবিধের নই—এ আপনার জানা নেই বোধ হয়—

কমলেশ তক্ষুনি ছদ্মগাম্ভীর্যে বলল, তাহলেও আপনাকে ভালো লাগে। আপনার মনটা ভালো নেই দেখছি, আমারও খুব দুঃখ হয়েছে। কিন্তু সত্যি বলুন তো, আপনি একা মানুষ, আপনার এত খরচ কিসের?

আগুনে ঘি পড়ল। চকিতে সোজা হয়ে বসল বীরুবাবু, তারপর চেঁচিয়ে উঠল, আপনার মাসির কাছে গিয়ে শলা-পরামর্শ করুনগে যান, এখানে ভালোমানুষি ফলাতে আসবেন না, আমি খুব ভদ্র-সভ্য মানুষ নই।

এর পরেও কারো মুখে হাসি দেখা যেতে পারে, সে বোধ হয় বীরুবাবুও ভাবে নি। চেয়ার ছেড়ে এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে উঠল সে, আপনি যাবেন কিনা এ-ঘর থেকে আমি জানতে চাই।

আপাতত। কিন্তু বাড়ি থেকে তো যাচ্ছি না, মুখ দেখাদেখি বন্ধ করবেন কি করে?

কমলেশ নিজের ঘরে চলে এল। আর বাকি থাকল দেবযানী—তার সামনেও একবার দাঁড়ানোর ইচ্ছে কিন্তু ভিতরটা তেতে আছে, এখন থাক। মাসিও এখন নীচে না নামলে বাঁচে, হয়তো বেফাঁস কিছুই বলে বসবে ও, আর তার ফলে আবার একটা চেঁচামেচি শুরু হবে।

একটা পড়ার বই সামনে রেখে প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপচাপ বসেছিল। দরজার কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে মনে হতে ঘাড় ফেরাল।

বীরুবাবু! উগ্র মূর্তি তো নয়ই, বরং অনুশোচনায় কাতর যেন।

কমলবাবু, রাগ করলেন নাকি?

একজন ভদ্রলোককে ঘর থেকে বার করে দেবার পরেও খুশি হতে বলছেন?

ভিতরে এসে বীরুবাবু তার সামনেই শয্যায় বসল।—সত্যি, আমার মাথার ঠিক ছিল না, কিছু মনে করবেন না। আপনার মাসিমার ভয়ে বলছি না, আপনাকে কেন জানি অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না।

কমলেশ নির্লিপ্ত জবাব দিল, আপনি নিজেই অন্যায় করেছেন, মাসিমার বিশ্বাস নষ্ট করেছেন, আমাকে বিশ্বাস করা না করার কি আছে—কাজটা তো আপনি ভালো করেন নি।

প্রায় রাগত স্বরেই বীরুবাবু বলে উঠল, ভালো তো আপনারা বলবেনই না, কিন্তু আমি কি করব—একগুষ্টি লোক না খেয়ে উপোস করে মরবে, আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখব?

হতভম্বের মত কমলেশ আস্তে আস্তে ঘুরে বসল এবার, কে না খেয়ে মরছে?

ওই শ্যামলের বাড়ির সব, একগাদা লোক, রোজগার নেই, এখানে ওখানে থিয়েটার করে ক'টা টাকা আর হয়, দুরবস্থাটা যদি একবার চোখে দেখতেন—

কমলেশ কারো দুরবস্থা দেখে নি, কিন্তু এই মুখের দিকে চেয়ে কি যে দেখেছে জানে না। কথায় কথায় যে চিত্রটি সংগ্রহ হল, তার মধ্যেও যেন এই মুখখানাই জ্বলজ্বল করছে।...শ্যামলেরা তিন ভাই, তিন বোন, তাছাড়া বিধবা মা আছে। শ্যামল বড়, পরের বোন গৌরী কমলেশদের কলেজে বি. এ. পড়ে—অনেকদিন তার কথা বলবে বলবে করেও বীরুবাবু বলে উঠতে পারে নি। গৌরী ছাত্রী মন্দ নয়, কমলেশের সাহায্যে যদি ফ্রী পড়তে পায়, সেই চেষ্টা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বীরুবাবু মুখ ফুটে বলে উঠতে পারে নি। সমস্ত মাস সে টাকা দেয় বলেই সংসারটা টেনে-হিঁচড়ে এক-রকম করে চলছে। আর গৌরী চমৎকার মেয়ে, সংসারের যাবতীয় কাজ করে, তারপর পড়ে—পড়ার ভয়ানক সাধ। তার পড়ার খরচও এযাবৎ গোপনে সে-ই চালিয়ে আসছে। গোপনে, অর্থাৎ শ্যামলের হাত দিয়ে। শ্যামলকে শাসিয়ে রেখেছে, গৌরী জানলে ওর আর একটা হাতও বীরুবাবু ভেঙে দেবে, তাই গৌরী জানে দাদা থিয়েটার করে কায়ক্লেশে তার পড়া চালাচ্ছে। তবে সংসারটা যে সে-ই টেনে বেড়াচ্ছে, তা অবশ্য গোপন নেই। শ্যামলের মায়ের মুখে তো অভাবের কথা সারাক্ষণই লেগে আছে—লজ্জা করেই বা করবে কি...।

গৌরী বি. এ. পাস করার পর আপনি তাকে বিয়ে করবেন? এত কথার মধ্যে কমলেশ এই এক কথাই জিজ্ঞাসা করেছিল।

বিয়ে! বীরুবাবু অবাক হয়েছিল। সেই অবাক মুখ বড় কোমল, বড় কমনীয় মনে হয়েছিল কমলেশের।—আমি বিয়ে করব কি! আমি তো মুখ্যু, ম্যাট্রিকটাও পাস করতে পারি নি।—ও বি. এ. পাস করে একটা চাকরি-টাকরি পেয়ে গেলে কত ভালো বিয়ে হবে ওর, আপনি দেখেনি নি, কিন্তু সত্যি খুব ভালো মেয়ে।

না, কমলেশ আর কিছু বলে নি। বীরুবাবুও একসময় উঠে গেছে। কিন্তু কমলেশ ভিতরে ভিতরে চুপ করে ছিল না। তারপর অনেকক্ষণ ধরে একটা কথাই বার বার ভিতর থেকে উঠছিল।—মুখ্যু বীরুবাবু, তোমাকে প্রণাম। তোমার বুকের নাগাল কোনোদিন পাই যেন।

মিষ্টিমাসির থমথমে মুখ দু'দিনেও নরম হয় নি। ওদিকে ভাইয়ের কারণে দেবযানীরও মর্যাদায় বিলক্ষণ লেগেছে বোঝা যায়। দু'দিনের মধ্যে সে-ও বাগানে আসে নি, বা কারো সঙ্গে একটা কথাও বলে নি।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে একটা চপল উপলক্ষে এই গুমোটের উপশম হল। এই প্রহসনের প্রধান পাত্র-পাত্রী সপ্তমী এবং গণেশচন্দ্র।

সপ্তমী বিশেষ দরকার জানিয়ে কর্ত্রীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে দুপুরে বেরিয়ে গিয়েছিল। ওদিকে সেই দুপুরেই দেশের লোকের সঙ্গে অনিবার্য কারণে দেখা করার প্রয়োজনে গণেশচন্দ্রও দিদিমণির কাছ থেকে ছুটি মঞ্জুর করে নিয়ে প্রস্থান করেছিল। দুজনের অনুপস্থিতির দরুণ কর্ত্রীর বিগড়নো মেজাজ আরো বিগড়েছে। কিন্তু দেবযানী সপ্তমীর ছুটির কথা না জেনে গণেশকে ছুটি দিয়েছে শুনে তিনি মনে মনেই গজগজ করেছেন, মুখে তখন পর্যন্ত কিছু বলেন নি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুজনেই খানিক আগে-পরে ফিরল।

মনের আনন্দ চাপতে না পেরে সপ্তমীই গণ্ডগোল করে ফেলল। সিদুবাবুর বউকে কেউ দেখতে পারে না জেনেই নির্ভয়ে তার কাছে গোপনতা ফাঁস করে বসল। ফিসফিস করে বলল, কি ছবিই দেখে এলাম গো বউদি, চোখ ফেরানো যায় না, এমন ছিনেমা আর দেখি নি, দাদাবাবুকে সঙ্গে করে তুমিও চুপি চুপি গিয়ে দেখে এসো।

দু'দিন আগের ব্যাপারটার দরুন সকলে তার ওপর কতটা বিরূপ, আনন্দের বেলায় তাও বোধ হয় খেয়াল ছিল না। সিদুবাবুর বউ তেমনি ফিস ফিস করে খবরটা কর্ত্রীর কানে তুলে দিয়ে এল। ফলে গণেশ কোথায় গিয়েছিল তাও আর গোপন থাকল না।

সপ্তমীর ওপর এক-পশলা বর্ষণের পর মাসির রাগ গিয়ে পড়ল গণেশের ওপর। কমলেশকেই হুকুম করলেন, ওকে কান ধরে বাড়ি থেকে এক্ষুনি তাড়া শীগগির, এত বড় সাহস!

দেবযানী অধোমুখে বসেছিল, ওকে দেখে আর একদিকে ঘাড় ফেরাল।

কমলেশ হাসিমুখে মাসির সামনে বসল, বলল, তাতে কি হয়েছে, ছবিটার খুব নাম শুনছি, চলো না, আমরাও গিয়ে দেখে আসি।

মাসি ওকেও তপ্তকণ্ঠে ঝাঁজিয়ে উঠলেন, তোর ফাজলামো রাখ। চুপি চুপি দুজনে গিয়ে সিনেমা দেখে এল, অ্যাঁ! ভাসুরঝি'র দিকে ফিরলেন, ভালো চাস তো এর একটা বিহিত করতে বল, নইলে সপ্তমীকে নিয়ে বাড়ি থেকেই ও পালাবে একদিন, এই বলে রাখলাম!

দেবযানী গম্ভীর তন্ময়তায় জানলা দিয়ে আকাশ দেখছে, আর মনে মনে ভাবছে রাগলে কাকিমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে, যা মুখে আসে তাই বলে বসবে। কিন্তু

ওদিক থেকে মন্তব্যের সূরে যে উক্তি কানে এল, তার মর্ম না বোঝা গেলেও ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে ফিরে না তাকিয়ে পারল না।

কমলেশ নিস্পৃহ মুখে বলল, তা পালায়ই যদি, মইটা না-হয় তুমিই ধোরো—

রাগের মুখে এ-রকম একটা উক্তি শুনে মাসিও থমকালেন হঠাৎ।

কমলেশ হাসল, মই ধরার গল্প জানো না বুঝি ?—একটা ছেলে আর একটা মেয়ে পালাবে ঠিক করেছে। বেশি রাতে ছেলেটা মই বেয়ে মেয়েটার জানলা পর্যন্ত উঠে ডাকল, চলে এসো। মেয়েটা সত্রাসে বলল, আস্তে, আমার বড় ভয় করছে, বাবা না জেনে ফেলে। ছেলেটা বলল, কিচ্ছু ভয়ের নেই। মইটা নীচে থেকে তোমার বাবাই ধরে আছে।

হাসি চাপতে না পেরে দেবযানী তাড়াতাড়ি আবার অন্যদিকে ফিরল। মাসিরও রাগ জল, হেসে সারা তিনি। হাসির দমকে তাঁর ফ্যাকাশে মুখ লাল। হাসছে দেবযানীও, আর অবাক হচ্ছে, কাকিমার সামনে এ-রকম কেউ বলতে পারে তার ধারণা ছিল না।

হাসি সামলে মাসি বললেন, হ্যাঁ রে, তোর কি মা-মাসি জ্ঞান নেই, যা মুখে আসবে তাই বলবি ?

কাকিমার এক হাসিতে কদিনের বাড়ির গুমোট যে কেটে গেল, তা দেবযানীও অনুভব করছে। আবার বাগান আর বকুলগাছ নিয়ে পড়েছেন তিনি, অর্থাৎ স্বাভাবিক হয়েছেন।

পরের অনুরূপ দুর্যোগটা এত শীগগির ঘনাবে, কেউ জানত না, এমন কি কমলেশও হকচকিয়ে গেল।

সিদুবাবুর ওপর মাসির অবিশ্বাস হয়তো অনেক আগে থেকেই দানা বেঁধেছিল, এতদিন পাশে কেউ নেই ভেবেই অসহায় বোধ করছিলেন, আর চুপ করে ছিলেন। কমলেশ আসার পর থেকে তাঁর ভয় গেছে। কিন্তু তলায় তলায় তিনি কিভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কেউ জানত না।

সেটা যখন জানা গেল, সিদুবাবুর আর তখন কিছু ঢাকবার অবকাশ থাকল না।

মাসি বহুদিন গজ গজ করেছেন, কতকাল ধরে সেই এক ভাড়াতেই দোকানঘরগুলো চলছে, সর্বত্র সব-কিছুর অগ্নিমূল্য, অথচ তাঁর দোকানঘরের ভাড়া বাড়ছে না। সিদুবাবুকে বলা সত্ত্বেও সে নাকি কোনো কথা কানে তোলে নি, বেশি বললে জবাব দিয়েছে, কেস করে সব তুলতে হলে তিন-চার বছরের ধাক্কা, অতদিন ভাড়া আদায় বন্ধ থাকলে চলবে ? আর কেসের অত ঝামেলাই বা পোহাবে কে ? খরচও তো কম নয়—

ভাড়া আদায় এবং দেখাশোনার পরোয়ানা অনেককাল আগের সেই এক অসুখের সময় মাসি সিদুবাবুকে দিয়ে রেখেছিলেন। সিদুবাবু সব দোকানঘরের ভাড়া আদায় করে তার থেকে ট্যাক্সের টাকা কেটে রেখে বাকিটা মাসির হাতে তুলে দেয়। মাসি এক-আধ সময় ভাড়ার রিসিট-বই তলব করেছেন, তাতেও দেখা গেছে কোনো গলদ নেই।

কিন্তু এখন দেখা গেল, যে টাকা তিনি মাসে মাসে পান, তা আদায়ের অর্ধেকও নয়। অর্থাৎ প্রতি ঘরের ভাড়াই দ্বিগুণেরও বেশি করে নিয়েছে সিদুবাবু। আলাদা রিসিট-বই ছেপে নিয়েছে, নিজেই সই করে যখন অসুবিধে কিছু নেই। ভাড়াটেদের কাছ থেকে বেশি টাকা আদায়ের নতুন রিসিট স্বচক্ষে দেখে তবে মাসি নিঃসংশয় হয়েছেন।

এবারে ঝড়টা গোটাগুটি বর্ষাল না। একটা আসন্ন দুর্যোগের মতই থমকে রইল।

কারণ ধরা পড়ে সিদুবাবুও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। চিৎকার গালিগালাজ শুরু হতেই সে ওপরে উঠে এল। গম্ভীর মুখে বলল, বাজে চেঁচামেচি কোরো না, তুমি সব ঠিক-ঠিক বুঝলে এই ব্যবস্থা করতাম না, ফি মাসে ঘর-সারাই ঘর-মেরামতের কত খরচ হয় তা জানো? তাছাড়া এই বাড়ি ঠিক রাখার পিছনেও মোটা টাকা খরচ হয় এক-একবার—তোমার কাছে চাইলে এক পয়সাও দাও তুমি?

মাসির মুখ বন্ধ হল। স্তম্ভিত তিনি। দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ করলেন শুধু।

এরপর মাসির প্রায় নির্বাক নির্দেশমত সমস্ত ভাড়াটেদের কাছে রেজিস্ট্রি নোটিশ লিখে পাঠাতে হল কমলেশকে—সব ঘর-ভাড়া তাঁর রিসিটে আদায় হবে, ভাড়া হয় তারা নিজেরা এসে দিয়ে যাবে, নয়তো ডাকে পাঠাবে। এর ব্যতিক্রম হলে ভাড়া আদায় হয় নি বলে ধরে নেওয়া হবে। এ ছাড়া আর যদি কিছু দেখা-শুনার থাকে সেটা করবে কমলেশ—

কমলেশ বিব্রত মুখে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল—এর মধ্যে আবার আমাকে কেন মাসিমা?

মাসি আগুন হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, জেনেশুনেও সব চোরের হাতে ছেড়ে দিতে বলিস?

দিন কয়েকের মধ্যেই নোটিসের ব্যাপারটা জানাজানি হল। সিদুবাবু কমলেশের ঘরে এল, ঠাণ্ডা বিদ্রূপের সুরে বলল, এই করে কি কিছু সুবিধে হবে? কাকিমার লিখিত নির্দেশমতই আমি এতকাল সব দেখে-শুনে আসছি—মাঝখান থেকে সব আটকে থাকবে, আর একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে শুধু। ব্যবসায়ী ভাড়াটেদের একজনও লোক সুবিধের নয়।

শুনে কমলেশের গা জ্বলে গেল। তবু ঠাণ্ডা মাথাতেই জবাব দিল, আমাকে বলছেন কেন, আপনার কাকিমাকে গিয়ে এ-কথা বলুন—

আপনার মারফতই সব নোটিশ গেছে শুনেছি।

তা গেছে। আমি না থাকলে মাসিমা বাইরের লোককে টাকা দিয়ে করাতেন।

ও, আপনি তাহলে বাইরের লোক নন?

না। সিদুবাবুর বক্রহাসির জবাবে কমলেশও হাসল—আপনাদের জ্যাঠতুত ভাসুরের ঘর, আমার মাসতুত বোনের ঘর—সম্পর্কের দিক থেকে আমরা সকলেই প্রায় সমান কাছাকাছি।

সিদুবাবুর ব্যঙ্গ হাসি গেল। খরখরে চোখে চেয়ে রইল একটু। তারপর বলল, আপনার সম্পর্কটা আপাতত আর একটু বেশি কাছাকাছি দেখছি, সেই জন্যেই বোধ হয় কাকিমা বীরুকে ডেকে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে বলেছে?

কমলেশ হাসিমুখেই বলল, বললেও তো আপনি যাচ্ছেন না, আর যাওয়ার দরকারই বা কি, ওঁর হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিন না, আজ হোক, কাল হোক, রাগ পড়বেই তাহলে।

পারলে সিদুবাবু তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আনত বোধ করি। পারা গেল না বলেই চলে গেল।

সিদুবাবু বাড়ি ছেড়ে না গেলেও তার বউটি আপাতত বাপের বাড়ি। দ্বিতীয় গণ্ডগোলের শুরুতেই গেছে, আর ফেরে নি। সিদুবাবুও রাত্রিতে মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়িতে অবস্থান করছে, সকালে এসে দপ্তর খুলে বসে।

বীরুবাবুও কমলেশের কাছে ঘেঁষে না বড়। বাড়িতে থিয়েটারের রিহার্সাল বন্ধ হয়েছে। কখন বাড়ি থাকে, কখন থাকে না, টের পাওয়া যায় না।

কিন্তু কমলেশ সব থেকে বেশি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে দেবযানীর জন্য। তার এই গাম্ভীর্যের সঙ্গে ভিতরের অশান্তির যোগটুকু স্পষ্ট। এখন আর এটা আবরণ মাত্র মনে হয় না।

এতদিনে এই মেয়ের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হয়ে গিয়েছিল তার। আর দোষেগুণে মিশিয়ে ভালোও লেগেছিল।—গম্ভীর বটে, কিন্তু প্রকৃতি গম্ভীর নয়। নিজের সম্বন্ধে একটু বেশি সচেতন। অল্পেতে রেগে যায়। বি. এ. পাস না করার দুর্বলতা আছে বলে সকলের চোখের আড়ালে একটু-আধটু বই নিয়েও বসতে দেখেছে। কিন্তু পড়ার ধৈর্য যে নেই, সেটা কমলেশ বুঝে নিয়েছে। প্রসাধন-প্রীতি আছে কিন্তু সেটা লুকিয়ে-চুরিয়ে—বুঝতে দিতে চায় না। যেটুকু প্রসাধন করে, কাকিমার বকুনির তাড়াতেই করে যেন। কাঁচা আম-জাম-কুল-পেয়ারা প্রিয়, কিন্তু ধরা পড়লে লজ্জা। ধরা পড়ার পর কমলেশ নিজেই একদিন তার টেবিলে অনেকগুলো পেয়ারা আর একগাদা চিনেবাদাম রেখে এসেছিল। সে ভাইদের স্বপক্ষে, আবার তার কাকিমারও স্বপক্ষে। কাকিমাকে তো ভয় করেই, আবার বিশেষ করে বড়দাদাটিকেও ভয় করে। কিন্তু দাদাকে যে ভয় করে সেটা বুঝতে দিতে চায় না।

এই সব মিলিয়েই কমলেশের ভালো লেগেছিল। এখনো বড় ভাইয়ের এই হীনতা মনে মনে সে অনুমোদন করে না বলেই কমলেশের বিশ্বাস। তবু ওই মুখে তার প্রতিও সংশয়ের ছায়া যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। বাক্যালাপ বন্ধ, চা-ও কদিন ধরে সপ্তমী দিয়ে যাচ্ছে। হয়তো সিদুবাবুর সঙ্গে তার সেদিনের কথাবার্তার বিবরণ শুনেছে। হয়তো বা তার উদ্দেশ্যটাই ভাই-বোনকে বিশেষভাবে বুঝিয়েছে সিদুবাবু। তাকে নিয়ে তাদের মধ্যে একটা জটলা যে হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ বাড়ির কর্ত্রীর এখন একমাত্র অবলম্বন তো সে-ই।

দেবযানীকে নিরিবিলিতে পাওয়ার একটা সুযোগ খুঁজছিল কমলেশ। অভাবিত সুযোগই মিলল একটা। দুর্যোগ তরল করে আনার মত সপ্তমী আর গণেশচন্দ্র যে সুযোগ দিয়েছিল—সেই গোছেরই একটা। কিন্তু তার থেকেও চিত্তাকর্ষক।

মাসির নির্দেশমত কমলেশ সেদিন বেলা দশটা নাগাদ বাজারের দিকে সাইকেল নিয়ে এক দোকানের ভাড়াটের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে বেরিয়েছিল। তেমন তাড়া ছিল না, ছুটির দিন, সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়েই ফিরছিল—ভিড়ের দিকটা ছাড়িয়ে সাইকেলে উঠবে।

ওঠা হল না। পাশের সিনেমা-হলটার পাশ কাটানোর আগেই পা থেমে গেল। সপ্তমীদের দেখা সেই ছবিটা এখনো চলছে। টিকিট-কাউণ্টারের সামনে জনাতিনেক লোকের পিছনে যে টিকিট কাটার জন্য দাঁড়িয়ে—তাকে চেষ্টা করে দেখতে হয় নি, অনেকের মত আপনিই চোখে পড়েছে। কিন্তু কমলেশ যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

দেবযানীর পিছনেও টিকিটের প্রত্যাশায় জন দুই-তিন লোক দাঁড়িয়ে গেছে।

কমলেশ বাইরের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল। সাইকেলটা ভিতরের চায়ের দোকানের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে নিজে দরজার আড়ালের চেয়ারটায় বসল।

দু মিনিটও অপেক্ষা করতে হল না। টিকিট কেটে দেবযানী হাতের বটুয়ায় সেটা রাখতে রাখতে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। গোলাপী রঙের টিকিট। কোনদিকে দৃকপাত করল না—যেন কর্তব্য সমাধা করেই ফিরে চলল।

কিন্তু কমলেশের আপাতত তাকে দরকার নেই। সে চোখ রেখেছে তার পিছনে যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত গোছের লোকটা টিকিট কাটছে তার ওপর। এও গোলাপী টিকিটই। সে রেজকি গুনতে গুনতে গেট পেরুবার আগেই কমলেশ উঠে গিয়ে পিছন থেকে তাকে থামাল। সবিনয়ে জানাল তার সঙ্গে একটু কথা আছে—

কমলেশ দেবযানীর নাগাল পেল দুপুরে খেতে বসে। নীচের বারান্দা দিয়ে ওদিকের ঘরে যাচ্ছিল। কমলেশ ডাকল, একটা কথা শুনে যান—

দেবযানী এসে দাঁড়াল।

আমি খানিক পরেই একবার কলেজের দিকে বেরুব, সেখান থেকে আর এক জায়গা যাব। ফিরতে সন্ধ্যে হতে পারে।...বিকেলে চারটে সাড়ে চারটেয় এক জায়গা থেকে কিছু ভালো ফুলের চারা নিয়ে কেউ আসতে পারে, এলে যত্ন করে রেখে দেবেন।

আমি বিকেলে বাড়ি থাকব না, কাজ আছে।

তাহলে তো মুশকিল হল, খুব দরকারী কাজ?

এ রকম জিজ্ঞাসা করাও ধৃষ্টতা। দেবযানী ঈষদুষ্ণ জবাব দিল, হ্যাঁ।

আচ্ছা, দেখি তাহলে কি ব্যবস্থা করতে পারি।

খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে দুটো নাগাদ বেরিয়ে পড়ল সে। সত্যি সত্যি কলেজেই গেল। একটা ঘণ্টা কোথায়ই বা ঘুরবে। ইচ্ছে করেই সিনেমা হলে দেরিতে এল একটু। নিউজ-রীল শেষ হয়ে ছবিও পাঁচ সাত মিনিট এগিয়ে গেছে তখন। অন্ধকার হলে আসন-নির্দেশকের পিছনে পিছনে জায়গায় এসে পৌঁছল। একে অন্ধকার, তায় শো আরম্ভ হয়ে গেছে। তবু কমলেশ আসন নিয়ে এক হাতে পার্শ্ববর্তিনীর দিক থেকে নিজের গালটা আড়াল করল। একটু বাদে সন্তর্পণে তাকাল দুই-একবার। বেশ নিবিষ্টচিত্ত। কমলেশেরও তাড়া নেই, মফঃস্বল হলে মাঝপথে হাফ টাইম হয়। কিন্তু সে-পর্যন্ত তার কতকুটু ছবি দেখা হয়েছে সে-ই জানে।

হাফ-টাইমের আলো জ্বলল।

দেবযানী এমনিতেই একবার মুখ ফেরাল। সঙ্গে সঙ্গে কমলেশও। মুখোমুখি।

দেবযানী বিভ্রান্ত, বিমূঢ়।

কেমন লাগছে? কমলেশের যেন জানাই ছিল কে পাশে বসে।

অস্ফুট স্বর নির্গত হল।—আপনি কোত্থেকে...

সোজা কলেজ থেকে। আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল, গোড়ার দিকটা কি দেখলেন একটু বলে দিন তো।

দেবযানী হতভম্বের মত চেয়েই আছে। আশপাশের লোক এই তাকানোটা লক্ষ্য

করছে খেয়াল নেই।—আপনি এখানে সীট পেলেন কি করে?

আস্তে। লোকে দেখছেও, শুনছেও। পয়সা দিয়ে টিকিট করে।

কমলেশের মনে মনে শঙ্কা জাগল, মুখখানা যা হয়েছে, এক্ষুনি উঠে চলে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অতএব সে-ই মনোনিবেশ সহকারে প্রচার বিজ্ঞাপন দেখতে লাগল।

আলো নিভল। ছবি আরম্ভ হল। ছবি এগিয়ে চলল। অন্ধকার প্রেক্ষাঘরে ক'বার যে দুজনের নিঃশব্দ দৃষ্টি-বিনিময় হল কমলেশ হিসেব করে নি। দুই একবার মনে হল, পরদার দিকে চোখ রেখে সঙ্গিনী নীরবে হাসছেও।

একসময় অস্ফুট স্বরে যেন নিজের মনেই বলল, সপ্তমীর মত মাসির কাছে ধরা না পড়া পর্যন্ত ভালো লাগছে না।

সাড়া পেল না। দেবযানী ছবি দেখছে। কিন্তু হাসছেও। ছবিতে তখন একটা বিয়োগান্ত দৃশ্য চলেছে।

শেষ হল। বিয়োগের অধ্যায়ের পরে প্রীতিপদ মিলন-পর্বে এসে ছবির শেষ।

কিন্তু এবারে দেবযানী গম্ভীর। তবু তার চোখে যেন বিগত চাপা হাসির ছটা লেগে আছে।

বাইরে বেরিয়েই কমলেশ প্রস্তাব করল, এখন চা খেতে হবে।

দেবযানী বলল, আমাকে বাড়ি যেতে হবে।

চায়ের আগে বাড়ি গেলে সব ফাঁস হয়ে যাবে।

দেবযানী এবার সত্যি রাগল বোধ হয়।—কি ফাঁস হবে?

কিছু না, চলুন।

দুই-একটা ভালো চায়ের দোকানই আছে এ তল্লাটে। একটায় ঢুকে কোণের দিকের কেবিন বেছে নিয়ে বসল কমলেশ। নিরুপায় দেবযানীও।

বয় এল।

কি খাবেন?

দেবযানী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, শুধু চা—

আমার খিদে পেয়েছে, আমি অনেক কিছু খাব, আপনি বসে দেখুন তাহলে।

কিন্তু বয় ডবল অর্ডারই নিয়ে গেল।

কমলেশ এবারে সোজা হয়ে তার দিকে ফিরল।—আপনাকে আপাতত আমার কথামত চলতে হবে।

কেন?

কমলেশ হাসল, আমি লোকটা সুবিধের নই দেখতেই পাচ্ছেন।

দেবযানী তার চোখে চোখ রেখে সামান্য মাথা নড়ল। অর্থাৎ পাচ্ছে। কিন্তু ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস একেবারে গোপন করতে পারল না—আপনার ফুলের লোক ফিরে গেছে?

না। আপনার এমন দরকারী কাজ—আসতে বারণ করে দিলাম।

মুখের দিকে চেয়েই মিথ্যেটা বরদাস্ত করল দেবযানী।—আপনি ওই সীটই পেলেন কি করে?

কমলেশ নির্লিপ্ত জবাব দিল, আপনার আগেই তো দাঁড়িয়ে টিকিট কাটলাম—আপনি আগে ছিলেন না।

তাহলে বোধ হয় পিছনে ছিলাম।

মিথ্যে কথা, আপনি আমার সামনে-পিছনে কোথাও ছিলেন না। রাগতে গিয়েও দেবযানী হঠাৎ হেসেই ফেলল। সামনা-সামনি এতটা হেসে ফেলা এই প্রথম বোধ হয়।

কমলেশ উৎফুল্ল।—তাহলে একটা ম্যাজিক দেখলেন বলুন?

বেয়ারা খাবার নিয়ে এল। পরে চা।

সে চলে যেতে কমলেশ খেতে খেতে হাসিমুখেই ম্যাজিকের রহস্য ব্যক্ত করল।

খাওয়া ভুলে দেবযানী চেয়ে আছে। এই লোকের অসাধ্য যেন কিছু নেই। সে অবাক হবে, না হাসবে?

কিন্তু খানিক বাদেই দুজনের কথাবার্তার সুরটা বক্রগতি নিল। ছন্দপতন অবশ্য কমলেশই প্রথম ঘটিয়ে বসল। বলল, আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা ছিল, কিন্তু সুযোগমত কিছুতে আপনাকে ধরা যাচ্ছিল না। তাছাড়া বাড়িতে যে মেজাজে আছেন কদিন ধরে—

দেবযানীর চাউনিটা স্থির হল আস্তে আস্তে। জিজ্ঞাসু।

আচ্ছা, আপনার দাদা কতটা অপরাধ করেছেন না করেছেন আপনি আমার থেকেও ভাল জানেন, কিন্তু সে যাই হোক, এ ব্যাপারে আপনি আমার ওপর বিরূপ কেন? ..শুধু তাই নয়, কেমন যেন সন্দেহের চোখেও দেখছেন—

দেবযানী অস্বীকার করল না। একটা অবাঞ্ছিত সত্যের ছায়াও পড়ল মুখে।—আপনি দাদাকে কি সব বলেছেন?

কি বলেছি? ও, সেই সম্পর্কের কথা...তো সেটা কি মিথ্যে?

মিথ্যে না হলেও তার অনেক রকম অর্থ হয়।

কমলেশ মুচকি হাসল।—কি অর্থ হয়? মাসির বাড়ির প্রতি আমার কোন লোভ আছে সেই অর্থ?

ক্ষোভে নীরব দেবযানী, খেতে হচ্ছে বলেও অনুশোচনা যেন।

কমলেশ হালকা প্রশ্ন ছুঁড়ল, তা সেজন্যে আপনার দাদার রাগ হতে পারে, আপনার রাগ কেন?

দেবযানী না ভেবেই রুক্ষ জবাব দিয়ে বসল, দাদার সঙ্গে আমার স্বার্থও যুক্ত থাকতে পারে।

কমলেশের চপলতা গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, তা পারে। কিন্তু মাসিমা বেঁচে থাকতে তাঁর বাড়ি নিয়ে আপনাদের এই স্বার্থের টানা-হেঁচড়া আমার ভালো লাগছে না—আপনাকে ও নিয়ে ভাবতে দেখলে বিশেষ করে আরো খারাপ লাগে।

সাদা-সাপটা উক্তিটা কানে ঢুকতে দেবযানী ভিতরে দপ্ করে জ্বলে উঠল।—আপনার কি ভালো লাগে না লাগে তাতে আমার কি আসে যায়?

কিছু না, ভালো লাগে না তাই বললাম। শুনুন, আপনার দাদা আমাকে শাসাতে এসেছিলেন, আমি কারো শাসানির ধার ধারি না বলেই ও-কথা বলেছি। আর মাসি

যা করতে বলেছেন, তা না করে পারা যায় না বলেই করেছি, আমি না থাকলে আর কাউকে দিয়ে করাতেন তিনি। যাক, আপনাকে একদিন গঙ্গার ঘাটে বলেছিলাম, আজও বলছি, ওই বাড়ির কোনো স্বার্থ আমার দিকে ঘেঁষতে চাইলেও আমি ঘেঁষতে দেব না, তার আগে চলে যাব। আপনার সন্দেহ হয় যদি বলেন, আজই যেতে পারি। কিন্তু এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আপনার দাদা করছেন করুন, আপনাকে মানায় না।

চা-ও শেষ হয়ে এসেছিল। এতগুলি স্পষ্ট উক্তি শোনার পর আর ধৈর্য ধরে বসে থাকাও গেল না। থমথমে মুখে দেবযানী উঠে দাঁড়াল। তারপর কেবিন থেকে বেরিয়ে আগে আগে চলল। আত্মসম্মানে লেগেছে। ও নিজে যা বলে ফেলেছে তার সবটাই সত্যি নয় বলেই আরো জ্বলছে। নইলে কাকিমা থাকতে তার বাড়ি নিয়ে স্বার্থের চিন্তা আজকাল অন্তত সত্যি ছেড়েছে সে। কাকিমাকে এখন একেবারে মায়ের মত ভাবতেই ভালো লাগে তার। কাকিমাকে একটু হাসতে দেখলে আজকাল ওর মনে খুশি ধরে না। দাদার এই ব্যবহারে তার বরং মাথাই কাটা গেছে। দাদার এসব কাজ সে সমর্থন করে না, করতে পারেও না। কিন্তু সে কথা বলা গেল না। বলা গেল না যে, দাদার ঘরে তাকে নিয়ে জটলা হতে সে দুজনের কারো ওপরেই খুশি হয় নি, উল্টে বরং কমলেশের জন্য ভিতরে ভিতরে একটু উতলা হয়েছিল, অস্বস্তি বোধ করেছিল। এই করে কাকিমাকে লোকটা হাত করছে—দাদার এই উক্তি দেবযানী একেবারে যে উড়িয়ে দিতে পারে নি এ অবশ্য সত্যি কথা, সে হাত না করুক কাকিমা যে তাকে হাতে টানছে সে তো মিথ্যে নয়। তা বলে যেভাবে বলা হল, সে-রকম স্বার্থের চিন্তা দেবযানী কখনই করে নি।

কিন্তু সেটা অপ্রকাশ্যই থেকে গেল, শুধু রাগ করাই সার হল।

দেবযানী আগে আগে একটা বাসে উঠল। পিছনে কমলেশ। দুজনে পাশাপাশি বসল। কণ্ডাক্টর কাছে আসতে একবার শুধু এদিকে তাকিয়েছিল, পাশের লোক টিকিট কাটছে দেখে আবার বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

বাস থেকে নেমে খানিকটা হাঁটা পথ। পাশাপাশি এল, দুজনেই নির্বাক।

কিন্তু বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণের জন্য আর রাগ মনে থাকল না দেবযানীর। ফিরেই শুনল, কাকিমার জ্বর। তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে বসল। গায়ে হাত দিয়ে মনে হল জ্বর বেশিই বটে।

কোথায় ছিলি এতক্ষণ? হাতের স্পর্শ পেয়ে তিনি চোখ মেলে তাকালেন।

দেবযানী থতমত খেল একটু।—দেরি হয়ে গেল। তোমার আবার হঠাৎ জ্বর হল কেন?

তিনি জবাব দিলেন না। একটু বাদে জ্বর শুনে কমলেশও উঠে আসতে দেবযানী গম্ভীর মুখে এদিকের ঘরে চলে এল।

নিজেই তারপর হঠাৎ উপলব্ধি করল, চেষ্টা করেও আর তেমন রাগতে পারছে না। উল্টে থেকে থেকে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে কেমন। কমলেশের শেষের কথাগুলো ঘুরে ফিরে বার বার কানে বাজছে। কিন্তু তবু রাগ আর হচ্ছে না। শেষে নিঃশব্দে হেসেই উঠল একবার। বেশ খোলাখুলি হাসি।...হাফ টাইমে লোকটাকে পাশে দেখে নিজের সেই হতভম্ব মূর্তির কথা চিন্তা করছে। আর কি করে তার পাশে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে,

সে-কথা মনে পড়েছে।

তারপর দেবযানী কবার যে হেসেছে ঠিক নেই।

॥ ৫ ॥

ছ'সাত দিনেও মাসির জ্বর ছাড়ল না দেখে কমলেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। বিকেলের দিকে জ্বর বাড়তেই থাকে। স্থানীয় ডাক্তার এসে দেখে যাচ্ছে। ভয়ের কিছু নেই বলছে বটে, কিন্তু কমলেশ খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছে না। একে তো ওই স্বাস্থ্য আর ওই মন—তার ওপর অসুখের ধকলে মেজাজ আরো খিটখিটে হয়েছে। সর্বক্ষণ কেউ কাছে বসে না থাকলে রাগ হয়, ঠিকমত ওষুধও খাওয়ানো যায় না। শেষের ক'টা দিন দেবযানীর ইস্কুল কামাই হয়েছে। তাকে সারাক্ষণই এক রকম ঘরে থাকতে হয়।

সিদুবাবুর কর্তব্যে ত্রুটি নেই। দু' বেলাই একবার করে দোতলায় ওঠে। ঘরে ঢোকে না, বাইরে থেকে দেখে। জ্বর কতটা উঠল নামল খোঁজখবর নেয়। কি করা উচিত না উচিত কমলেশের সঙ্গে পরামর্শও করে।

অসুখের খবর বীরুবাবুও রাখে। কিন্তু তাকে একদিনও ওপরে উঠতে দেখা যায় না। তার দুশ্চিন্তা আছে কি নেই বোঝা দায়, বলে, দেখতে যাব কি, গেলেই তো কাকিমা ভাববে কবে সটকাবে সেই আশায় আছি—।

দূরের শহর থেকে বড় ডাক্তার এনে দেখাবে ভাবছিল কমলেশ। দেবযানীকে বলতে সে-ও মাথা নেড়েছে, আর দেরি না করে তাই করা উচিত। কিন্তু পরের কয়েকটা দিনে জ্বরের গতি ঘুরল। মনে হল এইবার ছেড়ে যাবে। তাই চিকিৎসা আর বদলানো হল না।

কিন্তু কদিন পরে জ্বরটা আবার ঠেলে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। কিন্তু তিন-চারদিন পর্যন্ত মাসি অন্য ডাক্তার আনতে দিলেন না, বললেন, আনলেই তো এককাঁড়ি খরচ—আমার ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগেছে, ছেড়ে যাবে।

কমলেশ সামনে অবশ্য সে-কথায় আমল দিল না, কিন্তু একটু ভাবনায়ও পড়ল। যে রোগী, ডাক্তারের সামনেই চেঁচামেচি গালিগালাজ শুরু করাও বিচিত্র নয়, মেজাজখানা সেই রকমই হয়েছে আজকাল। রোগীর মরজি অনুযায়ী চিকিৎসা চালাতে হলে যে মুশকিল হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই। তবে সকালে দেবযানী বলে গেছে, আপনার যা ভালো মনে হয় করুন, কাকিমার কথা শুনবেন না।

বিকেলে সেইদিনই কলেজ থেকে ফিরে এক অভিনব সংবাদ পেল কমলেশ। হাত-মুখ ধুয়ে চা-জলখাবার খেয়ে তারপর ওপরে ওঠে সে। আজ ভাবছিল, খবরটা নিয়ে বড় ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টায় বেরুবে।

এই ফাঁকেই সংবাদটি দিয়ে গেল গণেশচন্দ্র। বলল, বাবু, আজ তো কলকাতা থেকে ডাক্তার এসে মা-ঠাকরোণকে দেখে গেলেন—

হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে কমলেশ তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে এগুলো। তারপর থেমে জিজ্ঞাসা করল, মাসিমা কেমন আছেন?

গণেশ জবাব দিল, এক রকমই, সপ্তমী দিদিমণির কাছ থেকে শুনেছে একটু বরং ভালো।

অতঃপর যে খবরটা শুনল, অবাক হবার মতই। দাদাবাবু অর্থাৎ সিদুবাবু নিজে কলকাতায় গিয়ে নিজের টাকা খরচ করে একেবারে সঙ্গে করে কলকাতার বড় ডাক্তার নিয়ে এসেছেন।

কমলেশ ঘরে এসে বসল আবার। খবরটা একেবারে অপ্রত্যাশিতই বটে। কলকাতার বড় ডাক্তারকে গাড়ি-ভাড়া আর তিনগুণ ফী দিয়ে এখানে নিয়ে আসা মোটা খরচের ব্যাপার। কাউকে কিছু না বলে সেই মোটা খরচই সিদুবাবু করেছে। কমলেশের ভাবতেও ভাল লাগছে। মানুষের অন্তরের এই দিকটাই তার বড় প্রিয়। কার ভিতরে ঠিক কি যে আছে কে জানে, বীরুবাবু সম্বন্ধে তো গোড়ায় সে অন্য ধারণাই করেছিল।

ওপরে মাসির ঘরের আবহাওয়া আজ কেমন অন্যরকম ঠেকছে কমলেশের কাছে। মাসি চুপচাপ শুয়ে আছে, পাণ্ডুর মুখখানা ধীর, শান্ত। শিয়রের কাছে দেবযানী বসে। সে-ও যেন কিছু নিয়ে চিন্তামগ্ন। ঘরের মধ্যে একটা নীরবতা অনেকক্ষণ ধরে থিতিয়ে আছে মনে হয়।

কেমন আছ?

মাসি সামান্য মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ ভালো।—বোস।

কমলেশ শয্যার আর-এক ধারে বসল।— ' জ কলকাতার বড় ডাক্তার এসে দেখে গেলেন শুনলাম? খুব ভালো হয়েছে। কি বললেন তিনি?

প্রশ্নটা দেবযানীকে লক্ষ্য করে। সে অস্ফুট জবাব দিল, ওষুধ দিয়ে গেলেন—

ঠিক এই জবাব প্রত্যাশিত নয়। কমলেশের মনে হল, সিদুবাবুর এই সুবিবেচনার দরুন ভিতরে ভিতরে এরা দুজনেই যেন বিস্মিত একটু। টেবিলের ওপর কয়েকটা নতুন ওষুধের প্যাকেট চোখে পড়তে কমলেশ সেগুলি দেখল। প্যাকেট খোলা হয় নি এখনো।

কে ডাক্তার?

দেবযানীর চোখে চোখ পড়তে কমলেশ অবাক হল একটু, মনে হল, এই রোগ বা ডাক্তারের সম্বন্ধে সে যেন অস্বস্তি বোধ করছে একটু।

দাদা জানে...

কমলেশ টেবিলটা চোখ দিয়ে খুঁজল, প্রেসক্রিপশন কই?

দাদার কাছে।

ও ওষুধ খাওয়ান নি?

আজ জ্বর একটু কম আছে দেখে কাল থেকে খাওয়াতে বলেছেন, যদি জ্বর বা[illegible]

এই প্রথম বাক্যস্ফূরণ হল মাসির, চোখ তুলে ভাসুরঝির দিকে তাকালেন। [illegible]খন বলেছে?

ও-ঘরে বসে প্রেসক্রিপশন লেখার সময়।

মাসি বললেন, তাহলে সাত তাড়াতাড়ি এগুলো কিনে এনে দেবার দরকার ছিল কি? সবেতে বাড়াবাড়ি—

নিরুত্তর। অর্থাৎ কেউ কিনে এনে দিয়ে গেলে সে আর কি করতে পারে। কমলেশের

দুর্বোধ্য লাগছে কেমন। কলকাতা থেকে ডাক্তার এসে দেখে গেল, আজকের কোনো ব্যবস্থা না দিয়ে সবই তিনি কালকের জন্য রেখে গেলেন, তাও যদি অসুখ বাড়ে। অথচ ওষুধ সব আগে থাকতেই চলে এল। সিদুবাবুর কাছ থেকে সব শোনা যাবে ভেবে কমলেশ আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। এমনও হতে পারে, কলকাতার ডাক্তার এমন কিছু বলে গেছে, যা দেবযানী এইখানে রোগীর সামনে বলতে চায় না।

মাসি খোঁজ নিলেন, খেয়েছিস কিছু?

না, এই যাব...।

হাত-মুখ ধুয়ে নিগে যা। দেবী, সপ্তমীকে ওর খাবারটা ঠিক করতে বল—

আচ্ছা, তোমার ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই, আমিই বলতে পারব। কমলেশ উঠে নীচে চলে এল।

হাত-মুখ ধোয়া হল। সিদুবাবু বাড়ি নেই দেখে নিজের ঘরে এসে বসল।

সপ্তমী চা-জলখাবার দিয়ে গেল।

খানিক বাদে দেবী এসে ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে কমলেশ নিঃসংশয়, সে কিছু বলবে বলেই এসেছে। শুধু তাই নয়, এই বলার প্রস্তুতিতে নিজের সঙ্গে সে অনেকক্ষণ ধরে যুঝেছে। ঘরে ঢুকে দরজার পরদাটা ভাল করে টেনে দিল। পারলে দরজাটাও বন্ধ করত হয়তো, স্বাভাবিক সঙ্কোচবশতই করল না। শান্ত পায়ে তার বিছানার এক ধারে বসল।

কমলেশ উতলা।

আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে...ওই ওষুধ চলবে না, আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

কমলেশ নীরব, জিজ্ঞাসু।

দ্বিধা কাটিয়ে দেবযানী আবার বলল, আমার বিশ্বাস, দাদা যাকে এনেছে তিনি মানসিক চিকিৎসক, কাকিমার সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা কইছিলেন তিনি, তাতেই সন্দেহ হয়েছে। তারপর পাশের ঘরে দাদাকে যা বলছিলেন, তাতেও মনে হয়েছে তাই—।

কমলেশ বিমূঢ় খানিক।—আপনার দাদাকে জিজ্ঞাসা করেন নি?

করেছিলাম। বলল, যা ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন সেই মত চলতে হবে।

ওষুধ তাহলে কাল থেকে খাওয়ার কথা কিছু বলে যান নি?

না। আজই খাওয়ার কথা।

কমলেশ দ্রুত মাথা চালিয়েও সিদুবাবুর উদ্দেশ্য সঠিক বুঝে উঠতে পারল না। কিছু একটা আভাস যেন পাচ্ছে, কিন্তু সেও অস্পষ্ট।

দেবযানী আবার বলল, বছর দুই আগে দাদা আর-একবারও একজন মানসিক চিকিৎসক এনে কাকিমাকে দেখিয়েছিল—

কেন বলতে পারেন?

দেবযানী প্রথমে মাথা নাড়ল একটু, পরে বলল, দাদার ধারণা কাকিমার মাথার ঠিক নেই।

সে চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যেতে গিয়েও দাঁড়াল। দ্বিধা...আরো কিছু বলতে চায়। শেষে বলেই ফেলল, কাকিমার যা শরীর, এ-সব তাঁর কানে না গেলেই ভালো হয়...

কমলেশের হঠাৎ স্নায়ু তেতে ওঠে না বড়, কিন্তু শোনা মাত্র রাগ হয়ে গেল কেমন। বলল, দেখুন, আপনার কি এখনো ধারণা আমি আপনাদের ক্ষতি করার জন্য এখানে বসে আছি? এসব তার কানে গেলে কি হতে পারে, সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে।

দেবযানীর গভীর দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর পড়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর যেমন এসেছিল, তেমনি ধীরে শান্তমুখে প্রস্থান করল সে।

নিজের রূঢ়তার দরুন নিজেই ঈষৎ অপ্রস্তুত কমলেশ। এভাবে বলাটা তার উচিত হয় নি, সত্যি সত্যি ভয়ে বিচলিত হয়েই এই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে ফেলেছে দেবযানী—শুধু তার কাকিমার ভয়ে নয়, দাদার ভয়েও হয়তো। নইলে বিশ্বাসের সব থেকে বড় পরিচয়ই সে আজ দিয়েছে তার কাছে। সব সন্দেহের কথা খোলাখুলি তাকেই এসে বলেছে। আর সব থেকে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে ওষুধ খাওয়ানোর ব্যাপারটা কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে। ওই কাকিমাটিকে যে কতখানি ভালবাসে সে, তা যেন এই প্রথম উপলব্ধি করল কমলেশ। নইলে এত বিচলিত হত না, অথবা নিজের দাদার সম্বন্ধে এভাবে এসে তাকে বলত না।

সিদুবাবুর সঙ্গে দেখা আরো ঘণ্টাখানেক বাদে। সেরেস্তায় বসেছে টের পেয়ে কমলেশ ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসল। সিদুবাবুর সচকিত দৃষ্টি তার দিকে ফিরল।

আজ কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এনেছিলেন শুনলুম, কে বলুন তো? ওষুধগুলো জেনারেল গ্রুপের মনে হল না—

ইচ্ছে করেই উক্তিটা অসমাপ্ত রাখল সে। সিদুবাবুর দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।—আপনি কি ডাক্তারী ওষুধপত্রও বোঝেন নাকি?

বুঝি না ঠিক, তবে লিটারেচার পড়লে কিছুটা আঁচ করতে পারি। কে ডাক্তার বলুন তো? আর প্রেসক্রিপশনটাই বা কোথায়?

প্রেসক্রিপশন আমার কাছে। ডাক্তারেরও নাম করল সিদুবাবু, বলল, কলকাতার নাম-করা ডাক্তার—

কমলেশ তখুনি বলে বসল, ওই নামে তো একজন মেণ্টাল ফিজিশিয়ান আছেন—তিনি?

বিরক্তির ভাব দেখিয়ে সিদুবাবু অস্বস্তি গোপন করতে চেষ্টা করল।—মেণ্টাল ফিজিশিয়ান হলেও এম. বি. পাস, সব-রকম চিকিৎসাই জানেন।

শক্ত ঘা বসাবার জন্যই কমলেশ গম্ভীর মুখে চেয়ে রইল খানিক।—এম. বি. পাস হলেও কলকাতার স্পেশালাইজড্ ডাক্তাররা জেনারেল ট্রিট্‌মেণ্ট করেন না। হঠাৎ আপনার তাঁকে আনার কথা মনে হল কেন?

চোখ-মুখ ধারালো হয়ে উঠছে সিদুবাবুর, হিংস্র জন্তুকে কোণ-ঠাসা করতে গেলে যেমন হয়। গম্ভীর জবাব দিল, আপনি আর ক'দিন আপনার মাসিকে দেখছেন? তাঁর প্রতি আমাদের দরদ আপনার থেকে কম ভাবার কারণ নেই। এই ডাক্তার এনেছি সব-রকম চিকিৎসা করা যাবে মনে করেই। কতকাল বিধবা হয়েছে এখনো সধবার মত থাকেন, তাছাড়া যেভাবে চলছেন—মানসিক ভাবে তাঁকে খুব সুস্থ মনে করেন নাকি আপনি?

কিন্তু সেই চিকিৎসার কি এখুনি খুব দরকার হয়েছিল ?

পরে বুঝতে পারলে এই চিকিৎসা কাকিমা হতে দেবেন না, আগেও সে চেষ্টা করা হয়েছে। জ্বরের ওষুধ দিয়ে গেছেন উনি...সে যাই হোক, আপনার এই অবিশ্বাস কেন ?

কমলেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। খুব সহজ সুরেই বলল, অবিশ্বাসের কারণ আছে, আমাকে বোকা ঠাওরালে আমার আপত্তির কারণ নেই সিদুবাবু। ওই ওষুধ আপাতত বন্ধ থাকবে, আমি আশা করছি আপনি তা নিয়ে আর কিছু উচ্চবাচ্য করবেন না—

নিষ্ক্রান্ত হবার আগে বাধা পড়ল, শুনুন—

কমলেশ ফিরল।

সিদুবাবুর মুখে বিড়ম্বনার অভিব্যক্তি একটু। মোলায়েম করে বলল, আমার বিবেচনার ভুল হতে পারে, এতদিন ধরে অসুখটা ছাড়ছে না, ভাবলাম একসঙ্গে যদি দুই চিকিৎসাই হয়ে যায়। যাক এতে তো আর গণ্ডগোলের কিছু নেই, আর যদি কাউকে আনতে হয় বলুন, আমি নিয়ে আসছি।

মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে কমলেশ জবাব দিল, ভেবে দেখি...।

নিজের ঘরে ফিরেও বেশ খানিকক্ষণ অস্বস্তির মধ্যে কাটল। মনের তলায় যে সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, সেটা কারো কাছে ব্যক্ত করাও সম্ভব নয়। সিদুবাবু নিগূঢ় কোনো অভিসন্ধি নিয়েই এ কাজ করেছে তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

তার ইঙ্গিতমত পরদিন সকালে থার্মোমিটার লাগিয়ে দেবযানী কাকিমাকে জানাল, জ্বরটা প্রায় ছেড়েই গেছে—

তিনি বললেন, ছাড়ার মত লাগছে না তো।

ঘণ্টা তিনেক বাদে আবার দেখে এক কথাই বলল, জ্বর নেই-ই প্রায়। এবপর কমলেশ এসে জানাল, কলকাতাব ডাক্তারকে টেলিফোন করা হয়েছিল, জ্বর কম শুনে তিনি গতকালের সব ওষুধ বাতিল করে নতুন ওষুধ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এই নতুন ওষুধ সব স্থানীয় চিকিৎসকই দিয়েছেন।

মাসি রাগ করলেন, সাত-তাড়াতাড়ি এতগুলো টাকার ওষুধ আনা হয়েছে, ওগুলো সব ফেরত নেবে এখন ?

নেবে নেবে, এগুলো বদলেই তো এই ওষুধ আনব। কমলেশ তাড়াতাড়ি টাকার খেদ দূর করল তাঁর। ওষুধগুলো নিজের ঘরে এনে রাখল, তারপর সিদুবাবু আসতে চুপচাপ তাকে দিয়ে এল। মুখে একটি কথাও বলল না।

দিন দুই দেখে কমলেশ শহর থেকে অন্য ডাক্তার আনবে ঠিক করেছিল। মাসিকে বলবে, ওসব কলকাতার ডাক্তার দিয়ে মফঃস্বলের চিকিৎসা হয় না, দরকারে কবার পাচ্ছ তাদের ? কিন্তু কিছুই দরকার হল না, জ্বরটা কমতে কমতে ছেড়েই গেল। কমলেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। দেবযানীও।

কমলেশ বকুলবাড়িতে আসার পর যে নেপথ্য নাটকের সূচনা রচনা হয়েছিল, তার একটা প্রকাশ্য মুহূর্ত উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল আরো মাস দেড়েক বাদে। মাসিমা সুস্থ হয়েছেন

বটে, কিন্তু অসুখটার ধকল যেন এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মেজাজ আরও খিটখিটে হয়েছে। বকুলগাছটার এক রকমই অবস্থা দেখে কমলেশের ওপরেও বিরূপ হন মাঝে মাঝে। কমলেশ এটা-সেটা বলে ভোলাতে চেষ্টা করে তাঁকে। ওদিকে বাগান করার উৎসাহেও যেন একটা সামগ্রিক ছেদ পড়েছে।

সিদুবাবু মাসের মধ্যে কম করে পনেরো দিন শ্বশুরবাড়িতে থাকে। তার বউকে এ-বাড়িতে আরো কম দেখা যায়। বীরুবাবুর নাটকের উৎসাহেও যেন ভাঁটা পড়েছে। টাকা ধার করা নিয়ে ভাইবোনের চাপা খিটিরমিটিরও আর তেমন টের পাচ্ছে না কমলেশ। এমন কি সপ্তমীর গলাও আজকাল যেন আর তত শোনা যায় না।

সব থেকে বেশি অস্বস্তি ভোগ করছে কমলেশ। তার বিশ্বাস, কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলছে। যেদিন কলকাতা থেকে মাসির জন্য মানসিক চিকিৎসক এনে হাজির করেছে সিদুবাবু, সেইদিন থেকে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে। দেবযানী বরাবরই গম্ভীর বটে, কিন্তু এখন যেন সর্বদা নিরানন্দ মনে হয় তাকে। তার চাউনি চলাফেরা সবই কেমন ভয়চকিত। ওদিকে কারণে-অকারণে বীরুবাবুর মুখের হাসিটাও দুর্বোধ্য লাগে। আড়ে আড়ে তার দিকে তাকায় আর হাসে।

কমলেশের ধারণা, সিদুবাবু চুপ করে বসে নেই। বাড়ীর কর্ত্রী সোজা পথে তাদের দু ভাইকে আর কিছু দেবে এটা আর সে বিশ্বাস করে না নিশ্চয়। বাড়িভাড়া আদায়ের চুরি ধরা পড়ার পরেই তার সেই আশা নির্মূল হয়েছে বোধহয়। তারপর পাগলের ডাক্তার আনার কথাও গোপন থাকবে না, তাও হয়তো সে ধরেই নিয়েছে। অতএব মরীয়া হয়ে সে কিছু একটা করে বসতে পারে এই আশঙ্কা কমলেশের ছিলই।

আগামী মাসের শেষের দিকে কমলেশের কলেজ ছুটি হয়ে যাবে। ছুটি হলে মায়ের কাছে যাওয়ার নাম করে দুটো মাসের জন্য অন্তত এই আবহাওয়া থেকে পালিয়ে বাঁচবে। ফেরার পরেও সম্ভব হলে আর এখানে এসে ওঠার ইচ্ছে নেই তাঁর। যাবার আগে বা ফিরে এসে দেবযানীর সঙ্গে একটা স্পষ্ট আলোচনা করে নেবার ইচ্ছে আছে। তার জীবনে সে ওকে সাদরে ডেকে নিতে প্রস্তুত। যদি দেবযানী একটা মাত্র শর্তে রাজী হয়। বকুলবাড়ির কোন স্বার্থ যদি না সে নতুন জীবনে টেনে আনে। এদিকের সমস্ত প্রত্যাশা যদি একেবারে মন থেকে বর্জন করে আসতে সে আপত্তি না করে। কমলেশের ভাবতে ভালো লেগেছে, দেবযানী রাজী হবে। এই সমস্ত স্বার্থের উর্ধ্বেই উঠবে সে। ডাকার মত করে ডাকতে পারলে কোনো রমণী তার পুরুষকে এই সামান্য স্বার্থের জন্য ত্যাগ করবে—এ সে একবারও ভাবে নি।

কবে ছুটি হবে কমলেশ এখন থেকেই দিন গুনছে।

তার আগেই বিপর্যয়।

খবরটা চুপিচুপি তাকে প্রথম জানাল গণেশচন্দ্র। এসব নিগূঢ় খবর গণেশ জানতে পারে কিভাবে সেটাই আশ্চর্য। শুধু জানা নয়, বেশ গুছিয়ে বলতে পারে।

সাদামাটা ভাবেই বলল, বাবু, বীরুবাবু তো আজ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

কমলেশ আচমকা ধাক্কা খেল একটা।—কেন? মাসিমা কিছু বলেছেন?

না। বড়বাবুর সঙ্গে বনিবনা হল না, নিজেই চলে গেলেন।...দু ভাইয়ের এক সময়

খুব ভাব ছিল।

বনিবনা হল না কেন?

কেন হল না গণেশ রয়ে-সয়ে সেই ফিরিস্তি দিল।

কোর্টে মামলা করে সিদুবাবু সব বিষয়-আশয় বুঝে নেবার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু ভাইবোনের সই নিতে গিয়ে ভাই-ই প্রথম বাগড়া দিল। বীরুবাবু সই তো দিলই না, উল্টে হাসতে হাসতে বড় ভাইয়ের মুখের ওপর পাঁচকথা শুনিয়ে দিল। বীরুবাবু নাকি বলেছে, তোমার শ্বশুরের প্যাঁচে পড়ে কাকিমার বিষয়ে নিজেদের পৈতৃক অংশ আছে বলে যখন দাবি করতে পারছ, ও বিষয় হাতে এলে অনায়াসে তখন ভাইকেও দূর করে তাড়াবে—আমার বিষয়ে কাজ নেই। আর যদি কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে হয় তো মিথ্যেও বলতে পারব না বাপু, বলব, না খেয়ে মরতাম, কাকিমা দয়া করে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছিল, বিষয়-আশয় আমাদের কানাকড়িও ছিল না—

সিদুবাবু তাকে অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল, বলেছিল সই না দিলে সব অন্য লোকে খাবে। শেষে কিছুতে রাজী না করাতে পেরে মারতে গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতটা সাহস করে নি।

বীরুবাবু তারপর সুটকেস আর বিছানা নিয়ে চলে গেছে। বোনকে ডেকে বলে গেছে আর আসবে না। গণেশচন্দ্র স্বচক্ষে নাকি কাঁদতে দেখেছে দিদিমণিকে—কোনদিন যা দেখে নি।

কমলেশ সন্ধ্যে পর্যন্ত ছটফট করে কাটাল, কিন্তু দেবযানীর সাক্ষাৎ পেল না। শেষে ওপরে উঠল। মাসি আহ্নিকে বসেছেন। দেবযানী তাঁর ঘরেই মূর্তির মত বসে।

কমলেশ ডাকল, একবার নীচে আসতে হবে, কথা আছে।

দেবযানীর সাড় ফিরল যেন। চকিত দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর নিবদ্ধ থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর উঠে দাঁড়াল।

নীচের ঘরে এসে চেয়ারটা তার দিকে এগিয়ে দিল কমলেশ। নিজে শয্যায় বসল। কোন রকম ভণিতা না করে জিজ্ঞাসা করল, বীরুবাবু আজ বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন শুনলাম।

দেবযানী নিরুত্তর।

কমলেশ বলল, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, আজ সে শ্রদ্ধা আরো বেড়েছে। কিন্তু কি ব্যাপার সব আমার জানা দরকার বোধ হয়, বলতে আপত্তি আছে?

দেবযানী এবারও জবাব দিল না, কিন্তু দৃষ্টিটা বড় অসহায় মনে হল।

খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে তার সংক্ষিপ্ত জবাব থেকে কমলেশই ব্যাপারটা বুঝে নিল। গণেশের সমাচার শোনার পর যা ভেবেছিল, তাই বটে। এখানকার বিষয়ে তাদেরও পৈতৃক অংশ আছে জানিয়ে এবং বর্তমান কর্ত্রীর মস্তিষ্ক-বিকৃতির সাক্ষী-প্রমাণ দাখিল করে সমস্ত সম্পত্তির অভিভাবকত্ব দাবি করতে যাচ্ছিল সিদুবাবু। প্রকারান্তরে এতদিন সে-ই অভিভাবক ছিল তারও নজিরের অভাব নেই।

দেবযানী বলল, ছোড়দা সই করবে না দাদা সেটা ভাবে নি।

কমলেশ নীরব খানিকক্ষণ। চেয়ে আছে।—ছোড়দা তো সই করে নি, এখন আপনি

কি করবেন ?

মনের এ অবস্থায় প্রশ্নটা হঠাৎ বরদাস্ত করতে পারল না দেবযানী। প্রশ্নটা কমলেশের বলেই হয়তো পারল না। রুক্ষ জবাব দিল, আপনার কি মনে হয়, সই করব ? একটু বাদে নিজেকে কিছুটা সংযত করে দেবযানী আবার বলল, আমার কিছু করার দরকার হবে না, এরপর দাদা তার অংশের দাবি করবে না, কাকিমার মাথার ঠিক নেই প্রমাণ করে সব কিছুর গার্জিয়ানশিপ নেবার মতলবে আছে—এতকাল সে-ই সব দেখাশুনা করত, সাক্ষী-প্রমাণ-টমাণও সংগ্রহ করেছে মনে হয়—এর কি বিহিত করা যেতে পারে ভাবা দরকার।

উঠে আস্তে আস্তে চলে গেল। কমলেশের মনে হল, দাদার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি-সংগ্রহের চেষ্টা করেও সে যেন পারছে না। অসহায় বোধ করছে। ভারী ইচ্ছে হল, উঠে হাত ধরে থামায় ওকে, বলে, আর একটু বোসো—

পরদিন সকালে মাসির ঘরে উঁকি দিয়েই বুঝল, বিপদ যা ঘটবার ঘটে গেছে। বাইরের দিকে মুখ করে শয্যায় বসে আছেন স্থাণুর মত। কমলেশ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পেলেন। সমস্ত মুখে যেন একফোঁটা রক্ত নেই, বিবর্ণ পাণ্ডুর। এই শরীরে পর পর ক'রাত না ঘুমোলে যেমন হয়—একদিনেই সেই রকম দেখাচ্ছে।

আবার শরীর খারাপ হল নাকি ? কমলেশ কাছে এসে জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

দিশা ফিরতে সময় লাগল। আস্তে আস্তে এদিকে মুখ ফেরালেন। দৃষ্টিটা স্বাভাবিক নয়, এদিকে তাকাতে কমলেশ শঙ্কিত হয়ে উঠল। ওই মুখে দুই চোখের গভীরে শুধু সাদা আগুন জ্বলছে। তাও সংযত হল একটু একটু করে। সামান্য মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ শরীর খারাপ হয় নি। অস্ফুট স্বরও নির্গত হল, শুনেছিস ?

কমলেশ নির্বাক।

বীরুটা কাল চলে গেল...আমাকে দয়া করে গেল, একবার দেখাও করল না...নেমকহারাম, বেইমান...

এই পরিস্থিতিতে ঠিক এই কথাগুলো কানে কেমন অসংলগ্ন ঠেকল কমলেশের। এর বদলে মাসি যদি ক্ষিপ্ত হয়ে সিদুবাবুর উদ্দেশে চিৎকার চেঁচামেচি করে উঠতেন, তাহলেও হয়তো কিছুটা স্বাভাবিক মনে হত। আবার অন্য দিকে মুখ ফেরালেন তিনি। নিজের মধ্যে যে উপস্থিত নেই সেটা সুস্পষ্ট।

কমলেশ বেরিয়ে এল। দেবযানীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। টেবিলের সামনের চেয়ারটায় সে-ও মূর্তির মত বসে। পায়ে পায়ে কমলেশ কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, আমায় জিজ্ঞাসা না করে এ ব্যাপারটা মাসিমাকে হঠাৎ না জানালেই ভালো হত।

দেবীর চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বিস্ময়ের আঁচড় পড়ল কয়েকটা। তার দিকে চোখ রেখে বলল, আমি তো ওঁকে কিছুই জানাই নি...

কমলেশ বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। স্পষ্ট বোঝা গেল, দেবযানীর ধারণা ছিল ব্যাপারটা অবিবেচকের মত কমলেশই তাড়াতাড়ি জানিয়ে বসেছে। তা নয় বুঝে সে-ও বিস্মিত।

কমলেশ জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, তাহলে কে বলল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার আর

দরকার হল না। কে বলেছে বোঝা গেল। এবারে বুঝেছে হয়তো দেবযানীও। কমলেশ নীচে নেমে এল।

বলেছে গণেশ। নয়তো গণেশের মারফৎ সপ্তমী। কমলেশ আগেও অনেকবার অবাক হয়েছে, সিদুবাবুর সব গোপন খবর ঠিক ঠিক মাসির কানে পৌঁছয় কি করে? সপ্তমীকে এরা আদৌ বিশ্বাস করে না। গণেশ এ তরফের খাস চাকর, সিদুবাবুর মাইনে খায়। মাসিমা উঠতে বসতে ওকে যেভাবে গালিগালাজ করেন, তাতে দু'দিনে ওর বাড়ি ছেড়ে পালাবার কথা। অথচ এতকাল ধরে টিকে আছে। কমলেশের ধারণা ছিল, টিকে আছে শুধু সপ্তমীর টানে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে আরো অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে কমলেশের চোখের সামনে। মাসিমার চর আর কেউ নয়, ওই গণেশ। বীরুবাবুর হাটের 'তোলা'র বদলে টাকা খাওয়া, বা দোকানঘরের ভাড়াটেদের কাছ থেকে সিদুবাবুর আলাদা রিসিটে বেশি ভাড়া আদায়ের অত গোপনীয় খুঁটিনাটি মাসি ধরলেন কি করে? গণেশকে দিয়েই ধরেছেন, আর গণেশকে দিয়েই তাদের ডেকে আনিয়েছেন—এতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই কমলেশের।

কয়েকটা দিন কাটল। এই কটা দিনের প্রতিটি মুহূর্তে যেন বকুলবাড়ির আবহাওয়ার সমস্ত সহজতাটুকু টেনে শুষে নিচ্ছিল। কমলেশের ছুটি এগিয়ে আসছে, ছুটি এলে বাঁচে। কিন্তু কি যে করবে, সে ভেবে পাচ্ছে না—এ অবস্থায় সে পালাবেই বা কেমন করে? মাসি দিন-কে-দিন স্তব্ধ হয়ে আসছেন, বেশি কথা বললেও বিরক্ত হন। তাছাড়া ওই মুখের দিকে তাকালে কথা আসেও না বড়। এদিকে ক'দিনের মধ্যে দেবযানীকেও তাঁর ঘরে আর দেখে না বললেই হয়।

তবু দুবেলা চুপচাপ খানিক মাসির কাছে বসে থাকাটা কমলেশের একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অবস্থা বুঝে যদি দুটো পরামর্শের কথা হয়। সেদিন বিকেলে প্রায় রাগ করে বলেই ফেলল, অনিয়ম করে না খেয়ে না ঘুমিয়ে শরীরখানা যা করে তুলছ—বাড়ি নিয়ে আর বেশিদিন তোমাকে ভাবতে হবে না।

মাসি ভাবছিলেন কিছু। কথাটা কানে না তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, ও এখনো আসে এই বাড়িতে?

ও বলতে কে, কমলেশ জিজ্ঞাসা করল না। জবাব দিল, বিকেলের দিকে প্রায়ই আসেন—

ভালো দেখে একটা দারোয়ানের খোঁজ কর, তোদের কলেজের কাউকে পাস কিনা দেখ, আর আমার কথা বলে ওকে আসতে নিষেধ করে দে।

কমলেশ তক্ষুনি বলল, ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে এসব করে তো কোনো ফল হবে না, কিছু করার আগে ভালো কোনো উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু তুমি যেভাবে কাটাচ্ছ, দুটো কথা বলাই তো দায় তোমার সঙ্গে—দেবযানীকেই বা কদিন এ-ঘরে দেখছি না কেন?

উদ্‌গত রোষে মাসির মুখখানা ঘোরালো হয়ে উঠল। অস্ফুট উক্তি করলেন, কে জানে, কাউকে আর আমি বিশ্বাস করি না—

কমলেশ সময় নিল একটু, তারপর আস্তে আস্তে বলল, কাউকে বিশ্বাস না করলে

তোমার চলবে মাসিমা?...আমার ধারণা, একমাত্র ওকেই তুমি বিশ্বাস করতে পারো,—পারো যদি, দু'জনেই তোমরা ভালো থাকবে।

একটু থেমে তেমনি ধীরে ধীরে বলে গেল, একটা কথা তুমি বোধ হয় আজও জানো না মাসিমা, তোমার সেই অসুখের সময় সিদুবাবুর কলকাতা থেকে পাগলের ডাক্তার নিয়ে আসার ব্যাপারটা ও-ই প্রথম ধরে, ওষুধ যাতে না খাও তুমি সে-ই ব্যবস্থা করে—তারপর চুপি চুপি আমাকে সব বলে। তোমার অসুখের সময় সে আমার থেকেও অনেক বেশি উতলা হয়ে পড়েছিল, আর দাদার ব্যবহারে সে তোমার থেকে কম যন্ত্রণা পাচ্ছে না।...আমার মনে হয়, মা নেই বলে তোমাকেই সে মা বলে ভাবে...ভাবতে চায়, কিন্তু মাঝখানে তোমার এই বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারটা মাথা উঁচিয়ে ওঠে বলে যতটা কাছে আসতে চায়, ততটা পারে না—তোমার সন্দেহের ভয়েই পারে না।

একসঙ্গে এ ধরনের এতগুলো কথা কোনদিন মাসিকে বলে নি কমলেশ। বলার ফল কি হতে পারে তাও ভাবে নি।

মাসির দু চোখ তার মুখের ওপর চকচক করছে। মা আর সন্তানের প্রসঙ্গে সেই প্রথম দিন যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য এমনি তৃষ্ণার্ত দুটি চোখ দেখেছিল কমলেশ। দৃষ্টিটা ওর মুখের ওপর ঝাপসা হয়ে আসছে টের পাচ্ছে, কিন্তু মাসির হুঁশ নেই। সমস্ত মুখের ওপরেও যেন একটা কোমলতার প্রলেপ পড়ছে।

চোখ দুটো বেশি রকম ঝাপসা হয়ে উঠতে মাসি সচেতন হলেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন তিনি। কমলেশের মুখেও আর কথা নেই। অনেকদিন বাদে সে হালকা বোধ করছে।

সিঁড়িতে মৃদু পায়ের শব্দ শোনা গেল। দেবযানী ফিরল। একবার এ ঘরের দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরের দিকেই পা বাড়িয়েছিল, কমলেশের সামান্য ইশারার তাৎপর্য না বুঝে দাঁড়াতে হল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে চৌকাঠের সামনে দাঁড়াল।

মাসি এবারে এদিকে তাকালেন। দুই এক মুহূর্ত দেখলেন। তারপর বললেন, যা, একেবারে কাপড় বদলে হাত মুখ ধুয়ে এখানে এসে বোস।

কিছু না বুঝে দেবযানী তাড়াতাড়ি নির্দেশ পালন করতে চলে গেল।

এ কণ্ঠস্বর কানে অন্য রকম লেগেছে শুধু। আট-দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। মুখখানি ভিজে ভিজে, জলের দাগ ভালো করে মিলোয় নি, সামনের চুলের ফাঁকেও মুক্তোর মত দু ফোঁটা জল আটকে আছে।

শয্যার একধারে বসতে গেল, মাসি তাকে নিজের কাছে টেনে বসাল—

গণেশ ও সপ্তমী! কোথায় থাকে সব—

চিরাচরিত প্রায় কর্কশ আহ্বান শুনে বাকি দুজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল একবার। এদিকে গণেশ নয়, সপ্তমী হাজির।

দিদিমণির খাবার কি আছে দেখ, এখানে নিয়ে আয়।

কমলেশ হাঁপ ফেলে বাঁচল। দেবযানীর বিস্ময়ভরা বিড়ম্বনাটুকুও উপভোগ্য।

বেশ। আবহাওয়া আরো তরল করে তুলতে চায় কমলেশ, একেই বলে পক্ষপাতিত্ব, আমি সেই কখন থেকে মুখ শুকিয়ে বসে আছি, একটা খোঁজ নেই!

মাসি অপ্রস্তুত।—তুই খাস নি?

আগে থাকতে খেয়ে বসে আছি বলেই তো নিজের ওপর রাগ হচ্ছে এখন।

হাসলেন তিনি। অনেক দিন পরে হাসলেন হয়তো। নিজের মেয়েকেই যেন ফিরে পেয়েছেন তিনি। দেবযানীর গায়ে-পিঠে শীর্ণ হাতখানা বুলোতে লাগলেন। শেষে বললেন, তোর দাদা হতভাগা এই কাজ করেছে তাতে তোর দোষ কি, তুই পালিয়ে বেড়াস কেন?

কমলেশের ওঠা দরকার, সে থাকলে এই চিত্রটা সম্পূর্ণ হবে না, একটা উদ্‌গত আবেগ সংযত করার চেষ্টাতেই দেবযানী নীচের ঠোঁটটা দাঁতে করে চাপছে মনে হল। ওঠার উদ্যোগ করে কমলেশ বলল, আপনি আদর খান, খাবার খান, আমি পালাই।

বোস্—। মাসি তৎক্ষণাৎ বাধা দিলেন, তোর সঙ্গে কথা আছে।

ওঠা হল না। সপ্তমী থালায় করে দেবযানীর খাবার নিয়ে এল। সঙ্কোচ করলে সঙ্কোচ বাড়বে বলেই দেবযানী চুপচাপ খেয়ে নিয়ে থালাটা দেয়ালের ধারে সরিয়ে রেখে আবার এসে বসল। মাসি অন্যমনস্কের মত ভাবছেন কি। কোমলতা গিয়ে একটা সঙ্কল্প যেন মুখে এঁটে বসছে আবার।

হঠাৎ বললেন, আমি ওকে আক্কেল দিয়ে ছাড়ব, ওই বড়টাকে—এমন আক্কেল দেব যে ভুলবে না। তুই ভালো দেখে একজন উকিল ঠিক করে পরামর্শ কর। আমাকে পাগল বানিয়ে সব খাবে বলে ও অনেকদিন ধরে মতলব ভাঁজছে, এত বড় সাহস ওর—ও ঠিক জানে এই বাড়ি চলে গেলেও সিঁদুর দেওয়া আর লালপেড়ে শাড়ি পরা ছাড়ব না আমি, আর বলবও না কেন দিন, কেন পরি—তাই এত জোর ওর—লোককে পাগল বোঝাতে সুবিধে হবে।

গলার স্বরে আগুন ঝরছে, চোখ দুটোও ধক ধক করছে। কমলেশ বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত, দেবযানীও।

কমলেশের হঠাৎ মনে হল, এই একটু সময়—হয়তো একটাই সময়, যখন আঘাত পেলেও আঘাত দিতে হবে। সব থেকে বড় সমস্যার প্রসঙ্গ মাসি নিজেই উত্থাপন করেছেন যখন, এই সুযোগ হারালে সুযোগ আর না-ও আসতে পারে। জোর দিয়ে বলল, কিন্তু তুমি বলবেই বা না কেন? না বললে উকিলের সঙ্গে শুধু পরামর্শ করে কি হবে? আমারই তো প্রথম মনে হয়েছিল তোমার মাথার ঠিক নেই—অন্য লোকে বিশ্বাস করবে কেন? কেন তুমি সিঁদুর দাও, লালপেড়ে শাড়ি পরো? ওই একটা মরা গাছকে নিয়েই বা তোমার এত—

কি বললি তুই। কি বললি তুই? তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ঘরের স্তব্ধতা যেন দুখানা হয়ে চিরে গেল। কমলেশ হতভম্ব, দেবযানী নিজের অগোচরে দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে তাঁকে ধরে ফেলেছে। মাসির চোখেমুখে এক উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলতা, সর্বাঙ্গে অব্যক্ত যাতনা। অকস্মাৎ উঠে দেবযানীর হাত ছাড়িয়ে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি। দু চোখ টান করে, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে যেন বকুল গাছটা দেখতে লাগলেন।

দেবযানী একরকম প্রায় টানতে টানতে তাঁকে ঘরে এনে বসাল আবার। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন তখনো, চোখ দুটো টেনে তুলে কমলেশের মুখের ওপর রাখলেন আবার, বিড় বিড় করে জিজ্ঞাসা করলেন, গাছটা বেঁচে নেই বললি?

এমন নির্মম দায়িত্ব কমলেশ আর যেন জীবনে পালন করে নি। বলল, একটু ঠাণ্ডা হও, তুমি দুঃখ পাবে বলেই বলি নি, গাছটা অনেক দিনই বেঁচে নেই মাসিমা—

বলতে বলতে দেখলে, মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজছেন উনি, অনেকটাই গুঁজে ফেললেন। প্রাণপণে একটা মর্মান্তিক আঘাতের সঙ্গে যুজতে চেষ্টা করলেন যেন। শরীরটা বেঁকে শক্ত হল, দু চোখ বুজে এল। দেবযানীর কোলের ওপরেই মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন তিনি।

ভয়ে বিস্ময়ে বেদনায় ক্ষোভে দেবযানী কমলেশের দিকে তাকাল। বলে উঠতে চাইছে, বাড়ির জন্য এ কি করলেন আপনি ? বলা হল না, তার আগে কিছু একটা করা দরকার। কমলেশ তাড়াতাড়ি উঠে একটা গেলাসে খানিকটা জল এনে মাসির চোখ-মুখ ভিজিয়ে দিতে লাগল।

রাত মন্দ নয়। ঘরের মধ্যে একটা নীরবতা ক্রমশ যেন ভারি হযে বুকের ওপর চেপে বসতে চাইছে।

মাসিমা অনেকক্ষণ আগেই আবার উঠে বসেছেন। অতি প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় সব ভেঙে গেলেও যেভাবে বসে থাকে তেমনি বসে আছেন। দেবযানী একখানা বাহু দিয়ে তাঁকে ধরে জড়িয়ে আছে।

সামনে কমলেশ বোবার মত বসে।

এতদিনের সব বিস্ময় সব কৌতূহলের শেষ হয়েছে। যা জানতে চেয়েছিল জানা হয়েছে। একটু একটু করে মাসিমাই বলেছেন। যা বলেছেন, এই আবহাওয়া থেকে, রাতের এই ব্যথাতুর নিবিড়তা থেকে ছিনিয়ে এনে বিশ্লেষণ করলে তা এমন কিছুই নয় হয়তো। এক রিক্তা রমণী মন-গড়া এক বিচিত্র আবেগে নিজেকে ভোলাতো, সেই ভোলানোটা ঘুচেছে শুধু।

কমলেশের মত পুরুষের চোখে জল সচরাচর আসে না—আসেও নি হয়তো, কিন্তু তবু এই রাতের একটানা কতগুলো মুহূর্তে বুঝি একটা জমাট কান্নার মত গলার কাছে আটকে ছিল।

দেবযানীর দুই গাল বেয়ে ধারা নেমেছে।

...মাসিমার সুখের সংসার ছিল। মাঝে মাঝে ভয় হত এত সুখ বুঝি সইবে না। সংসার বলতে তখন মাসি আর মেসোমশায়। শ্বশুর-শাশুড়ী গত হয়েছেন। শুধু চাকরির সময়টুকু বাদ দিয়ে মেসোমশায় সর্বক্ষণ মাসির কাছে থাকতেন। বাগান আর গাছগাছড়ার নেশা ছিল তাঁর। অবসর পেলেই ওই নিয়ে থাকতেন, আর মাসিকে সঙ্গে থাকার জন্য জুলুম করতেন।

হঠাৎ একসময় মাসির মনে হল, মেসোমশায়ের শরীরটা কেমন খারাপ হচ্ছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেও কিছু বলেন না। হেসে উড়িয়ে দেন—কিছু হয় নি।

হাসেন বটে, কিন্তু মাসির সন্দেহ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। ওই হাসির তলায় তলায় কিছু যে দুশ্চিন্তা থিতিয়ে আছে, হঠাৎ সেটা প্রকাশ হয়ে যায়। প্রায়ই মেসোমশায় কলকাতা যান, কিন্তু কেন যে যান সেটা গোপন করে এটা-সেটা মাসিকে বোঝান। শরীর খারাপ

হয়েই চলেছে, এখানকার ডাক্তার দেখেন—মেসোমশায় আর আপত্তি করেন না, কিন্তু ফল কিছু হয় না।

বাড়িতে একটা বকুল গাছ লাগাবেন ঠিক করেছিলেন মেসোমশায়। ভালো দেখে একটা বড়-সড় চারাগাছও যোগাড় করে এনেছিলেন। কিন্তু ক'দিন আবার শরীর খারাপ হতে সেটা লাগানো হয় নি। মনেও ছিল না বোধ হয়।

সেদিন ভরা পূর্ণিমার রাত ছিল। সেই জ্যোৎস্নায় সব কিছু সাদাটে দেখাচ্ছিল। মাসির সঙ্গে বাগানে যাবেন বলে পা বাড়াতে দেয়ালের কোণে চারাগাছটা চোখে পড়ল।

সেই বান-ডাকা জ্যোৎস্নায় দু'জনে বসে মহা আনন্দে গেটের কাছে বকুলগাছ পুঁতলেন তাঁরা। কিন্তু পোঁতা শেষ হতে কেমন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন তিনি। আর কেমনভাবে যেন তাকাতে লাগলেন মাসির দিকে। মাসি ঘরে নিয়ে যাবার জন্য টানাটানি করতে লাগলেন, কিন্তু গেলেন না। একসময় বললেন, দেখো, কখনো যদি আমি না-ও থাকি, এই গাছটা থাকবে—এর মুকুল ধরবে, ফুল হবে, ফল হবে। যতদিন এই গাছটা বাঁচবে, ততদিন আমিই বেঁচে আছি ভেবো, এই গাছটার মধ্যেই আমাকে দেখো—তোমার কাছে আছি, তোমাকে আমি দেখছি জেনো।

সেই রাতে মাসি অনেক কেঁদেছিলেন।

কিন্তু তবু আর কোনো কথা বার করতে পারেননি। মেসোমশায় শুধু হাসতে চেষ্টা করেছেন আর বলেছেন, ও কিছু নয়, দুটো ভাবের কথা বলে তোমাকে ঘাবড়ে দিতে চেয়েছি।

কত যাতনা তিনি নিঃশব্দে সহ্য করেছেন সেটা বোঝা গেছে আরো ছ মাস বাদে। যখন সব শেষ হয়েছে। মেসোমশায় ক্যানসারে ভুগছিলেন, পেটে ক্যানসার।

কটা বছর কি ভাবে কেটেছে তারপর, মাসি জানেন না। পাগলের মতই কেটেছিল। তখন তিনি বিধবার বেশই পরতেন।

হঠাৎ এক রাতে ধড়মড় করে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। বাতাসে বকুলের গন্ধ আসছে। মাসির সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মেসোমশাই যেন অনুযোগ করছেন, বলছেন, এই তো আছি আমি, আমাকে দেখছ না ? গন্ধ হয়ে তোমার পাশে ঘুরছি—টের পাচ্ছ না ? আমি তোমার কাছেই আছি,—আর আমার জন্যেই শোক। ওঠো, উঠে আমাকে দেখো—

আলো নিয়ে মাসি ছুটলেন বকুলতলায়। বকুল ফুটেছে।

পরদিনই মাসি বেশ-বাস বদলালেন আবার। দুপুরে লালপাড় শাড়ি পরলেন। রাতে কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন। সেই থেকে বাতাসে গাছের পাতার শব্দ ভেসে এলেও যেন মেসোমশায়ের কথা শোনেন তিনি—আর যখন খুশি ওই গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই যেন তাঁকে চোখের সামনে দেখতে পান।

পরদিন সকাল থেকে রাতের মধ্যে কমলেশ একবারও দোতলায় ওঠে নি।

তার পরদিন কলেজের সময়-সময়ে দেবযানী সোজা তার ঘরে এসে দাঁড়াল। চোখ-মুখ ফোলা। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, কি করেছেন গিয়ে দেখে আসুন, তাকানো

যায় না—

কমলেশ জিজ্ঞাসা করল না, কি হয়েছে। সে জানে কি হয়েছে, দেবযানী কি দেখে আসতে বলছে। খানিক আগে সে উপরে উঠেছিল, সকলের অগোচরেই আবার নেমে এসেছে।

মাসিমার কোরা থান-পরা নিঃস্ব রিক্ত বিধবার বেশ সে দেখে এসেছে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, দেখেছি। কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই তো স্বাভাবিক...এই স্বাভাবিকতার মধ্যে তাঁকে ফিরিয়ে আনা দরকার ছিল।

কলেজের অজুহাতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। এরই মধ্যে সে আর একটা কর্তব্য সম্পন্ন করেছে, দেবযানী এখনো জানে না। গণেশকে একটা বাজে কাজের অছিলায় বাইরে পাঠিয়েছে সে—যেখানে সিদুবাবুর শ্বশুরবাড়ি সেই দিকে। বলেছে ফেরার সময় অমনি সিদুবাবুকে তোমার মা-ঠাকরোণের খবরটা দিয়ে এসো।

আসলে এই কাজটুকুর জন্যেই তাকে পাঠানো। গণেশ সবিস্তারেই খবর বলবে।...সব থেকে বেশি নির্ভর যে অস্ত্রের ওপর, সেটা যে হাত থেকে খসেছে, সেটা সিদুবাবুর জানা দরকার। তার অভিভাবকত্বের দাবি এই খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ হবে আশা করা যায়।

॥ ৬ ॥

দু মাসের ওপর ছুটি কমলেশের। কিন্তু দু মাস না গড়াতে সে অধীর হয়ে উঠল। কানপুর আর এক মুহূর্ত ভালো লাগে না। এমন কি তার বাবা-মাও একটা গোপন ছটফটানি লক্ষ্য করেছেন।

ছুটি হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বাড়ির দিকে ছুটবে, সেটা দেবযানীর ইচ্ছে ছিল না। অনিচ্ছাটা প্রকারান্তরে সে প্রকাশও করেছিল। বলেছিল, কাকিমার এরকম মনের অবস্থা, আর ক'টা দিন পরে গেলে হত না?

এর বেশি নরম হয়ে অনুরোধ করা দেবযানীর ধাতে নেই। কমলেশ হাসিমুখেই তার প্রস্তাব নাকচ করেছিল, বাবা-মা আশায় দিন গুনছেন বলেছিল। আর বলেছিল, তাছাড়া ঝামেলা তো কিছু নেই এখন, বাড়ি নিয়ে এরপর আর গণ্ডগোল হবে বলে মনে হয় না। মাসিমার মন কিছুদিন এখন এরকম থাকবেই।

দেবযানী আর কিছু বলে নি। সে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বোঝা গিয়েছিল। কমলেশের তাও খারাপ লাগে নি।

তবু সাত-পাঁচ ভেবে আসার আগে দেবযানীর সঙ্গে কথা বলে সে বীরুবাবুর সঙ্গে দেখা করে এসেছিল। আগে ধারণা ছিল, বীরুবাবু তার প্রিয় শিষ্য শ্যামলের বাড়িতেই আছে। আর আশা করেছিল, বীরুবাবু যা-ই বলুক, ও-বাড়ির এক বি. এ. পড়া মেয়ে শেষ পর্যন্ত লোকটাকে চিনবে। কিন্তু চেনার সুযোগই দেয় নি বীরুবাবু, সে ও-বাড়িতে থাকেই না। তার খোঁজ করতে সর্বজ্ঞ গণেশচন্দ্র জানিয়েছিল খবরটা। বলেছিল, ছোটবাবু তাঁদের ক্লাব-ঘরে থাকেন, আর দু'বেলাই হোটেলে খান।

কমলেশকে দেখে বীরুবাবু মহা খুশি। কোথায় বসাবে কি ভাবে আপ্যায়ন করবে ভেবে অস্থির। কমলেশ সংক্ষেপে উদ্দেশ্যটুকুই ব্যক্ত করেছে। জানিয়েছে সে সেইদিনই চলে যাচ্ছে, বীরুবাবুকে বকুলবাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে।

বলেন কি মশাই, বীরুবাবুর দুই চক্ষু বিস্ফারিত, এত কাণ্ডর পর আমাকে ওখানে বিশ্বাস করবে কে ?

সকলেই করবে। আপনার বোনই আমাকে পাঠিয়েছে। এ-সময়ে থাকা দরকার একজনের—

বীরুবাবু খুশি চিত্তে রাজী তক্ষুনি। বাঁচালেন মশাই, এদিকে হোটেলে খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে—খাবার সময় হলে এখন কান্না পায়। দেবীকে বলবেন আজ রাতেই যাব'খন, তবে কাকিমার কাছে বেশি ঘেঁষতে-টেষতে পারব না বলে দিলাম। গণেশ বলছিল, বিধবা হবার পর থেকে নাকি একেবারে কথা বন্ধ—

ব্যবস্থা পাকা করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই কমলেশ রওনা হয়েছিল। কিন্তু সাতটা দিন না যেতে ছুটিটা বড় বেশি দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর ঠেকতে লাগল।

একটা মাস যা-হোক করে কাটল, দ্বিতীয় মাসটা আরো অসহ্য হয়ে উঠল। এখানে যা-হোক কিছু বলে দিন-কয়েকের জন্য একবার ঘুরে আসবে কিনা তাও ভেবেছে। এসে পর্যন্ত বকুলবাড়ির কোনো খবর না পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটু উতলাই হয়ে পড়েছিল সে। আসার সময় মাসিমা তাকে একবারও বাধা দেন নি। আসার পর এ পর্যন্ত দুখানা চিঠি লিখেছে তাঁকে—একটারও জবাব মেলে নি। তিনি না লিখুন, তাঁর হয়ে দেবযানী দুলাইন লিখতে পারে, মনে মনে এরকম একটা আশা ছিল।

শেষে দেবযানীকেই লেখার কথা ভেবেছে অনেকবার। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত বাধায় পেরে ওঠে নি। ওই বাড়ি নিয়ে যা ব্যাপার, বেশি আগ্রহ দেখাতেও সঙ্কোচ সম্ভবত। ভেবে-চিন্তে শেষে বীরুবাবুকেই একটা সাদামাটা চিঠি লিখেছিল। অনেকদিন খবর-বার্তা নেই কোনো, মাসিকে চিঠি লিখেও জবাব পাওয়া যায় নি, কে কেমন আছে, ইত্যাদি—

সেই চিঠিরও জবাব এল মাসের প্রায় শেষে। কলেজ খুলতে তখন দশ-বারো দিন মাত্র বাকি। লম্বা চিঠি লিখেছে বীরুবাবু। চিঠির ওপর তার সেই ক্লাবঘরের ঠিকানা। হাল্কা সুরে লিখেছে, ফ্যাক্টরি ঠেঙিয়ে আর দুবেলা পেটের দায়ে হোটেলে ছুটোছুটি করে ইতিমধ্যে চিঠি লেখার সময় পেয়ে ওঠে নি সে, নইলে তার চিঠি দেবী অনেকদিন আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। পুনর্মূষিক হয়ে আবার ক্লাব-ঘরে ফিরতে হয়েছে তাকে—কারণ কাকিমার মগজের কল আবার বিলক্ষণ বিগড়েছে। সম্প্রতি দেবীর বাড়ি রক্ষার দুশ্চিন্তায় সদা অস্থির তিনি—বকুলবাড়ি এখন গোটাগুটি দেবীর বাড়ি। লিখেছে, কমলেশ চলে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই কাকিমা তোড়জোড় করে বাড়িটা দেবীর নামে দানপত্র করে দিয়েছেন। একেবারে পাকাপোক্ত দানপত্র। এখন ভাবছেন, এরা দু ভাই দেবীর বাড়ি আত্মসাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে। ষড়যন্ত্রের চেষ্টা কেউ করছে না—এ কথা অবশ্য হলপ করে বলতে পারছে না বীরুবাবু। দেবীর নামে বাড়ি দানপত্র হতে দাদা, অর্থাৎ সিদুবাবু, প্রথমে মন্দের ভালো ভেবেছিল। এর পর তাদের তিনজনের নামে আবার লেখাপড়া করে নিতে বেগ পেতে

হবে ভাবে নি। ইদানীং সিদুবাবু আবার বকুলবাড়িতে সেরেস্তা খুলে বসা শুরু করেছিল। কিন্তু চিরকালের বাধ্য বোনের সেই উগ্রমূর্তি দেখে সিদুবাবু প্রথমে অবাক, পরে ক্রুদ্ধ এবং শেষে চিন্তিত।

দেবী সেদিন খুব স্পষ্ট করে তাকে জানিয়েছে, এ বাড়িতে আর সেরেস্তা বসানো চলবে না, আর এখানে তার ঘন ঘন না আসাই ভালো।

যে বোন চিরকাল ভয় করে এসেছে, তার মুখে এই কথা শুনে সিদুবাবু হকচকিয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছে, কেন?

কাকিমা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁর স্বাস্থ্যের দিকেই এখন সকলের আগে তাকানো দরকার।

কেবল তাঁব স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়েই তুই এই ব্যবস্থা করতে চাস তাহলে? আর কোনো কারণ নেই?

কিছু না। শুধু ওই জন্যেই চাই, তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না বলে।

কিন্তু বাড়ির লোভে, বিষয়ের লোভে নিজের বড় ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আপত্তি নেই বুঝি?

বীরুবাবু এতক্ষণ মজা দেখছিল, কিন্তু এইবার দেবীর উগ্রমূর্তি দেখে আর তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেছে। দেবী বলেছে, চোখ রাঙিও না দাদা, তোমাকে আর আমি ভয় করি নে। বাড়ি আর বিষয়ের লোভে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, কেমন? পথের থেকে কুড়িয়ে এনে যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, লোভে লোভে তুমি তার বুকের ভেতরসুদ্ধ জ্বালিয়ে দিয়েছ, তাকে ঠকিয়ে তার টাকা নিয়েছ, তাকে পাগল বানাতে চেষ্টা করেছ, বাইরে থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন—তাঁকে তাড়াবাব ষড়যন্ত্র করেছ—আব সর্বদা আমাকে কাকিমার পাশে থাকতে বলেছ শুধু স্নেহের সুযোগ কাড়তে—আজ তুমি আমাকে লোভ দেখাচ্ছ?

আরো দু-পাঁচ কথা লিখে বীরুবাবু লম্বা চিঠি শেষ করেছে। শেষে পুনশ্চ দিয়ে এক লাইন লিখেছে, সম্ভব হলে দেবী আপনাকে একটু তাড়াতাড়ি চলে আসতে বলেছে।

কমলেশের যাবার উদ্দীপনা এরপর আপনিই আস্তে আস্তে জুড়িয়ে এসেছে। নিজে থেকে আগবাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে যেন একটা স্বার্থের ছায়া পড়ছে বলে মনে হয়েছে। কারণ আগে সে প্রস্তাব করে নি, দেবীও বলে নি কিছু।... বাড়ি-বিষয় এখন দেবীর, মাসির দিক বিবেচনা করলে এটাই স্বাভাবিক পরিণতি—কিন্তু এমন অস্বাভাবিক তাড়াহুড়োর মধ্যে সেটা এগিয়ে এল ভেবেই অবাক লাগছে। এত বড একটা ব্যাপার ঘটে গেল, কেউ তাকে ঘুণাক্ষরেও জানায় নি কিছু, একটা পরামর্শ চায় নি। দেবীও না, মাসিও না। কমলেশ সচেতন হয়ে উঠল, সে তো বাইরের লোক, বাইরের লোককে এসব জানাবেই বা কেন?

নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে উঠল সে। কিন্তু তবু এলোমেলো ভাবনা আর অস্বস্তি গেল না।

কলেজ খোলার দিন চারেক আগেই চলে এল সে। দেবী ভাইয়ের মারফৎ আসতে বলেছে বলে নয়, ভালো লাগছিল না বলে। কিন্তু বাক্স-বিছানা নিয়ে বকুলবাড়িতে উঠল

না। হোস্টেলের সেই ঘরেই এসে উঠল। হোস্টেল বন্ধ, ছেলেরা কেউ নেই, কেবল সপরিবারে সুপারিন্টেন্ডেণ্ট আছেন।

পৌঁছনোর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একটা সাইকেল-রিকশ নিয়ে বকুলবাড়িতে এল।

গেটের সামনে নামতেই পা থেমে গেল। বকুলগাছটা নেই। অনেকদিন আগেই উপড়ে ফেলা হয়েছে বোঝা যায়, কারণ হাঁ-করা গুঁড়ির গর্তটাও বুজে এসেছে।

পায়ে পায়ে ভিতরে এল। নিচের তলাটার পরিত্যক্ত দশা। বাইরের ঘরে সিদুবাবুর ভাঙা-সেরেস্তার কিছু কিছু নিদর্শন এখনো পড়ে আছে। ইচ্ছে করেই সিদুবাবু সব-কিছু নিয়ে যায় নি কিনা বুঝল না।

নীচের বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে গণেশচন্দ্র আর সপ্তমী নিশ্চিন্ত মনে গল্প করছে। তাকে দেখে সপ্তমী ছ' আঙুল জিব কাটল, আর গণেশচন্দ্র একলাফে উঠে দাঁড়াল।

কমলেশ ততক্ষণে দোতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে গেছে।

কিন্তু সবটা ওঠা হল না।

সিঁড়ির মুখে বারান্দায় মাসিমা দাঁড়িয়ে। মুখের দিকে চেয়ে কমলেশ ভয়ই পেয়ে গেল হঠাৎ। মাথার রুক্ষ চুল অবিন্যস্ত, থানের আঁচল মেঝেয় লুটোচ্ছে—প্রায়-হিংস্র, কঠিন শীর্ণ এক প্রেত-মূর্তি সিঁড়ি আগলে দাঁড়িয়ে যেন।

জ্বলন্ত চোখ দুটো তার মুখের ওপর ঘুরল একপ্রস্থ। হিস হিস করে বললেন, তোকে আমি গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেছি, দেবী ফিরে এলেই গেটে তালা দিতে বলব। আবার কেন এসেছিস? বড় লোভ তোদের, কেমন? দেবী ছেলেমানুষ বলে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সব নিবি এই মতলব—তার মাথার ওপর আর কেউ নেই, ভাবিস? দূর হ! দূর হ! দূর হ এখান থেকে বলছি—গণেশ।

কমলেশ যেন আচমকা একপশলা চাবুক খেয়েই নীচে নেমে এল। চিন্তা-বুদ্ধি সব গুলিয়ে গেল তার। নীচের সিঁড়ির গোড়ায় গণেশ আর সপ্তমী দাঁড়িয়ে। কোনোদিকে দৃকপাত না করে কমলেশ বাইরের দিকে দ্রুত পা বাড়াল, এখান থেকে না বেরুনো পর্যন্ত কিছুই ভাবতে পারছে না।

গণেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে চাপা গলায় তাকে থামাতে চেষ্টা করল, বাবু, আপনি নীচের ঘরে বসুন, দিদিমণি আজ একটু দরকারে ইস্কুলে গেছেন, আগেই ফিরবেন—

কর্ণপাত না করে কমলেশ একেবারে গেটের বাইরে এসে নিঃশ্বাস ফেলল। মাসিকে তার একবারও সুস্থ মনে হয় নি বটে, কিন্তু তাঁর বিকৃত অবিশ্বাসের আওতায় সে সুদ্ধ যে পড়েছে, তাতে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এত দ্রুত পা চালিয়েছে কমলেশ যে, একটা রিকশ নেবার কথাও খেয়াল নেই।

বেলা তখন তিনটে। কমলেশ বিছানায় গা ছেড়ে দিয়ে পড়েছিল। ট্রেনের ধকল কাটে নি, একটু ঘুমোতে পারলে ভালো লাগত। ঘুম চোখের কাছাকাছি নেই। চেষ্টার ফলে শ্রান্তি বরং বেড়েছে। বকুলবাড়ির অধ্যায়টা মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে চাইছে। একটা বড়গোছের মুক্তি ভেবে হালকা বোধ করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু মুক্তিটা থেকে থেকে বড় বেশি শূন্য লাগছে। প্রায় বাতাস-শূন্য মুক্তির মত, নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে লাগে।

হঠাৎ চমকে বিছানায় উঠে বসল কমলেশ। দরজার কাছে দেবযানী দাঁড়িয়ে। স্থির-গম্ভীর চোখে দেখছে তাকে।

কি আশ্চর্য, ভিতরে আসুন, আপনি এখানে!

দেবযানী ভিতরে এল, ঠাণ্ডা সুরে বলল, টেনে আনলে না এসে কি করব—

কি বলবে কমলেশ ভেবে পেল না। নিজেকে সংযত করল, বসুন—

এই চৌকি ছাড়া দ্বিতীয় বসার জায়গা নেই। দেবযানী শয্যার একধারে বসল। চুপচাপ দেখল দুই-এক মুহূর্ত, তারপর বলল, আমি বসতে আসি নি, বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, চলুন—

একটা উদ্‌গত অনুভূতি দমন করে কমলেশ নিরুত্তাপ বিস্ময় প্রকাশ করল, আমি আবার কোথায় যাব...

কিছু না বলে দেবযানী তেমনি চেয়ে রইল শুধু। কমলেশ অস্বস্তি বোধ করছে। সে-ও ফিরে এইবার যেন ভালো করে লক্ষ্য করল দেবযানীকে। বিষণ্ণ আর শ্রান্ত লাগছে তাকে। সেই শ্রান্তির বোঝা নিয়েই আবার যেন এক অবুঝকে ফেরাবার চেষ্টায় আসতে হয়েছে তাকে।

কমলেশ আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, সকালের খবর সব শুনেছেন?

শুনেছি বলেই তো এলাম। আপনি চলে না এসে কাকিমার জন্যে চিন্তিত হলে সেটা বরং স্বাভাবিক হত।...কাল রাতেই বলছিল, কমল এলে বাঁচি, আমার আর কোনো ভাবনা-চিন্তা থাকে না। আর, আজ এই—

তার মুখে নিজের নামটা কানে যেতে আবার একটা দুর্বল অনুভূতির সঙ্গে যুঝতে হল। দেবযানী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, আপনি রাগ করে চলে না এসে গণেশের সঙ্গেও তো কথা কইতে পারতেন—এতদিন যে ভয় করি নি, এখন সেই ভয়ের দিকেই যাচ্ছে কাকিমা, তার কথা শুনেও আপনি বুঝতে পারলেন না?

কমলেশ বুঝেছিল। বুঝেও কেন চলে আসতে হয়েছে তা নিয়ে আর কথা বাড়াল না। বলল, কিন্তু এখন আমি ও-বাড়িতে যাব কেমন করে, আমাকে দেখলে উত্তেজিত হবেন, স্বার্থের ভাগীদার ভাববেন—

আমি সঙ্গে থাকলে ভাববে না।...তাছাড়া সব-সময় ও-রকম হয় না, মাঝে মাঝে হয়, তখনি সব গণ্ডগোল করে ফেলে—

কমলেশ চুপচাপ ভাবল একটু, তারপর খুব স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করল, এখানে এতসব হয়ে গেল, আমাক তুমি কিছুই জানানো দরকার বোধ করলে না কেন?

এই প্রথম তার মুখে 'তুমি' শুনে দেবযানী থমকে তাকাল। গভীর বিষণ্ণ মুখে একটুখানি খুশির আভাস মাত্র দেখা দিয়ে চকিতে মিলাল বুঝি। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত অসহিষ্ণুতায় বলে উঠল, আমাকে এর মধ্যে একলা ফেলে চলে যাওয়ার আগে ভাবার কিছুই দরকার ছিল না, কেমন? আমি বলে সামলেছি, আর কেউ হলে বাড়িঘর ছেড়ে কোথায় পালাত ঠিক নেই—নিজে পাগল হই নি তাই যথেষ্ট!

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল। একটু বাদে সংযত মৃদুস্বরে আবার বলল, তাও চেষ্টা করেছিলাম, গুছিয়ে লেখাটেখা আসে না, কৈফিয়ৎ দেবার মত

হয়ে যায়—আপনার মত লোকের তাতে আরো বেশি ভুল বোঝার সম্ভাবনা ছিল।

দুর্বলতার চরম মুহূর্তই বুঝি এটা কান পেতে শোনার মত, সমস্ত অনুভূতি দিয়ে আস্বাদন করার মত। তবু কোথায় দ্বিধা কমলেশের, কোথায় সঙ্কোচ বলবে কেমন করে ? যদি বলতে পারত, দেবযানী, তুমি ওই ঘর-বাড়ি ছাড়ো, আমি চাকরি ছাড়ি—তারপর চলো কোথাও চলে যাই—বলত। কিন্তু আজ আর তা বলা চলে না। বললে সেটা নির্বোধের উক্তি হবে।

দ্বিধা কাটিয়ে নরম করেই বলল কমলেশ, আমার অনেক দিন আগের একটা কথা বোধ হয় তোমার মনে আছে দেবযানী, আমার ওখানে যাওয়ার মধ্যে কোনো স্বার্থের কথা ওঠার আগেই আমি চলে আসব বলেছিলাম—এই সেই সমস্যা। তোমার আমার মাঝখানে মাসিমার বাড়ি আর বিষয় এসে দাঁড়াচ্ছে।

রাগে ক্ষোভে দেবযানী উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল একেবারে। স্থান-কাল ভুল হয়ে গেল, এতক্ষণের ধৈর্য গেল। হোস্টেলে ছেলে নেই তাই রক্ষা, নইলে তারাও সচকিত হত বোধ করি। দেবযানী তীক্ষ্ণ গলায় ধমকে উঠল, আপনি এক্ষুনি আমার সঙ্গে যাবেন কিনা আমি জানতে চাই ?

নিজের এই কণ্ঠস্বর নিজের কানে যেতে এই ক্ষোভের মুখেও থমকাল আবার। চেষ্টা করে কণ্ঠস্বর সংযত করল বটে, কিন্তু উষ্মা গেল না। বলল, কাকিমার ব্যাপার দাদার কাছে কিছু গোপন নেই, বিষয়-আশয় সব বুঝে নেবার জন্য সে এখন উঠে-পড়ে লেগেছে। আগে পাগলের ডাক্তার দেখিয়ে রেখেছে, এখন এই অবস্থা—এর মধ্যে কাকিমা সুস্থ মাথায় যে তার বিষয়-আশয় দান করে নি সেটা প্রমাণ করতে খুব বেগ পেতে হবে না বোধ হয়।

দেবযানীর আয়ত-গভীর দুই চোখ তার চোখের সঙ্গে মিলিত হয়ে রইল স্বল্পক্ষণ, গলার স্বর আরো সংযত গম্ভীর। বলে গেল, আর দাদা যদি কিছু করতে না-ও পারে, এই শরীর নিয়ে কাকিমা আর খুব বেশিদিন দাঁড়িয়ে থাকবে বলে মনে হয় না, দেড় মাস হল তাঁর চোখে ঘুম নেই, একেবারে চোখ বুজলে ওসব যাকে দিয়ে দিতে বলবেন দিয়ে দেব, দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পারে তেমন বিষয়-আশয় আমি চাই নে। একদিন স্বার্থের চিন্তা করতাম বলে আজও যে করি না, আপনাকে কি সেকথা হাতজোড় করে বলতে হবে ?

মুখের দিকে চেয়ে আছে কমলেশ। সব দ্বিধা, সব সঙ্কোচ আগেই ধুয়ে-মুছে গেছে। একটা দুর্বল প্রলোভন সবলে নিষ্পেষণ করে উঠে জামাটা গায়ে পরে নিল। হাসছে মৃদু মৃদু।

ঘোড়ার গাড়ি বকুলবাড়ির পথে ছুটেছে। দুই আসনে দুজনে মুখোমুখি বসে। কারো মুখে কথা নেই একটাও। কিন্তু কমলেশের ঠোঁটের ফাঁকে হাসিটুকু লেগে আছে। কমলেশ এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করছে। বেশির ভাগ মাসির কথা। ডাক্তার দেখছে তাকে, দেড় মাস হয়ে গেল স্বাভাবিক ঘুম নেই, ওষুধ খাইয়ে বেহুঁশ করে রাখতে হয়।

কমলেশ বলল, বীরুবাবুর চিঠি পেয়েছিলাম, তোমার দাদাকে সাহস করে খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছ শুনলাম ?

দেবযানী অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল একটু, কথা কানে যেতে তার দিকে চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুটি করল।—ভয়টা কিসের, আমার পাশে কেউ নেই নাকি।

কমলেশ চেয়ে আছে, হাসছে। আবারও অদম্য প্রলোভন একটা। বলল, উঠে পাশে যাব নাকি তাহলে?

গাম্ভীর্যের আড়ালে দেবযানীর মুখেও হাসির আভাস স্পষ্ট হল। সে-ও ফিরে চেয়েই আছে। অনেকদিন আগে গঙ্গার ঘাটে যে-রকম দেখেছিল, পাশাপাশি সিনেমায় বসে যেমন দেখেছিল—সেই হাসিমুখে যেন সম্পূর্ণ করে দেখল আজ।

বকুলবাড়ি। দুজনে নামল। গেট ছাড়িয়ে ভিতরে ঢুকল।

দোতলার বারান্দায় মাসি এসে দাঁড়ালেন। চোখ টান-টান করে দেখছেন।

দোতলায় উঠতেই তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি আবার। খুশিতে আটখানা।—কমল এল নাকি, অ্যাঁ? দেখেছ কাণ্ড, বলি এতদিনে তোর সময় হল।

কমলেশ হাসিমুখে সকালের কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেবযানীর ইঙ্গিতে থেমে গেল। তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিল মাসির।

মাসি পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন, আবার রাগও করলেন।—থাক থাক, মাসির ওপর কতটা টান তোর বুঝেছি, হাড়মাস কালি হয়ে গেল, একটা খবর পর্যন্ত নেই—আয়, ভিতরে আয়।

দিন পনেরো কাটল। কমলেশ একটা বিশেষ দিনের প্রতীক্ষায় আছে। কাল সেই দিন। ভরা পূর্ণিমা কাল।

মাসির কি চিকিৎসা হচ্ছে সব খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছে। যে ডাক্তার দেখছেন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেছে। কলকাতা থেকে বিশেষজ্ঞ এনে দেখিয়েছে।

এ পর্যন্ত মাসি মোটামুটি সুস্থ আছেন বটে, কিন্তু সমস্ত রাত না ঘুমিয়ে মাঝে মাঝে ভুল বকতে থাকেন। তখন ওঁষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। ওষুধও খেতে চান না, বিশেষ করে রাত্রিতে। সমস্ত রাত গেটের দিকে চোখ রেখে বারান্দায় পাযচারি করেন তিনি। টানাটানি করেও সব সময় ঘরে আনা যায় না।

এই থেকেই কমলেশের মাথায় চকিতে একটা সঙ্কল্প দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তেজনা বোধ করেছে। কিন্তু কাউকে কিছু বলে নি সে। ফল কিছু হবে কিনা জানে না, কিন্তু যা ভেবেছে তা একবার করে দেখবে।

সংগোপনে প্রস্তুত হয়েছে সে, আর সংগোপনে প্রতীক্ষা করছে। পূর্ণিমার প্রতীক্ষা।

পূর্ণিমা এল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দেবযানীকে বলল, ওপরে যেও না, কাজ আছে।

দেবযানী অবাক, কদিন ধরে তাকে চিন্তামগ্ন দেখছে।

কি কাজ?

একটু পরেই জানবে।

খানিক বাদে গণেশ আর সপ্তমীর কাজ মিটতে বাড়ি নিঝুম হল। কমলেশ সন্তর্পণে একবার মাসির ঘরে উঁকি দিয়ে এল। সকালেই আজ দেবযানীকে ঘুমের ওষুধ দিতে বারণ

করে রেখেছিল সে।

রাত প্রায় এগারোটা। কমলেশ উঠল। বাইরে ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ছুটেছে, তবু একটা গ্যাস-লণ্ঠন জোরাল করে জ্বেলে নিল সে। ঘরের এক কোণের আড়াল থেকে ভিজে কাপড় জড়ানো বেশ বড় একটা বকুলচারা বার করল সে। বলল, কোদাল আর খুরপি আগেই রেখে এসেছি, চলো।

দেবযানী হতভম্ব তখনো।—ওটা কি গাছ, কি হবে ওতে?

বকুল। পুঁতব। চলো—

বাইরে এসে দাঁড়াল দুজনে। ব্যাপারটা যেন কিছুটা বোধগম্য হয়েছে দেবযানীর। সে-ও একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করছে। জিজ্ঞাসা করল, বাইরে এত জ্যোৎস্না, আলো কি হবে?

দরকার আছে।

গেটের সামনে সেই বকুলতলায় এসে দাঁড়াল তারা। দেবযানী দেখল জল, খুরপি, কোদাল সব আগে থাকতেই এনে রাখা হয়েছে। সভয়ে সে একবার ফিরে দোতলার দিকে তাকাল। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না।

কমলেশ হঠাৎ জোরে জোরে কথা কইতে শুরু করল, নাও, মাটি খোঁড়ো ভালো করে, আমি কোদাল চালাই—

একটু বাদেই আবার বলল, হাত চলছে না কেন? হাত চালাও, মেয়েছেলে বলে আমার সঙ্গে খাতির নেই কারো!

দেবযানী অস্ফুট স্বরে বলল, আঃ! চেঁচাচ্ছ কেন অত? কাকিমা জেগে আছে—

গলা খাটো করে কমলেশ বলল, সেই জন্যেই চেঁচানো দরকার।

দেবযানী তক্ষুনি বুঝল। কাকিমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই চায়। সেইজন্যেই ওষুধ বন্ধ, সেইজন্যেই আলো, আর সেইজন্যেই এত কথা।

কমলেশ হাসছে, বেশ জোরে জোরেই কথা কইছে, জ্যোৎস্নার কাব্য কিছু জানা নেই বলে দুঃখ করছে। কিন্তু তার হাত দ্রুত চলছে।

দুজনেই লক্ষ্য করেছে দোতলার বারান্দায় একটি মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রস্তুত ছিল তবু একটু বাদে সচকিত হল দুজনেই। নীচের বাইরের ঘরের দরজাটা খুলে গেল। ভরা জ্যোৎস্নায় শ্বেতবসনা এক শীর্ণমূর্তি কি এক অন্ধ আকর্ষণে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে এদিকে। আসতে কষ্ট হচ্ছে, তবু না এসে উপায় নেই বুঝি।

দেবযানী উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, তার হাত চেপে কমলেশ বসিয়ে দিল। ক্ষিপ্রহাতে গাছ পোঁতা শেষ করল সে। মুখ চলছে, গাছটা হোক না আগে, তখন দেখবে কি জিনিস এনে লাগিয়েছি, বকুলের প্রথম মালাটা—

চমকে উঠল যেন। ফিরে তাকাল।—ও মাসিমা, তুমি...

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে, সমস্ত আকৃতি এক করে তিনি শিশু বৃক্ষচারাটা দেখছেন। কি এক আবেগে, আবেশে ভালো করে দাঁড়াতেও পারছেন না যেন। কিছু বলতে চাইছেন, ঠোঁট দুটো নড়ছে, দু চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে।

বিড় বিড় করে বললেন, ওরে...! ওরে তোরা কি করছিস?